মণি-মুক্তা
২
Peace tv
ডা. জাকির নায়েক
লেকচার
সমগ্র

Dr. Zakir Naik Lecture Series

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ডা. জাকির নায়েক

সংকলন

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনা

পিস সম্পাদনা পর্ষদ
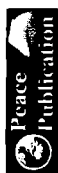
পিস পাবলিকেশন-ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Dr. Zakir Naik Lecture Series - 2

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র - ২

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট

ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল

জুন ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

মাহফুজ কম্পিউটার

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN 978-984-8885-02-4

Dr. Zakir Naik Revealed & Published By Md. Rafiqul Islam,
Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 400.00 Only.

সূচিপত্র
[দ্বিতীয় খণ্ড]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দু'টো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয় আলহামদুলিল্লাহ্।

কোলকাতা বইমেলা– ২০০৮-এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ্।

বাংলা ভাষায় ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। আমাদের পিস পাবলিকেশন হতেও বিষয়ভিত্তিক ৩০ খানা বই বাজার রয়েছে। তবে ব্যাপক পাঠক চাহিদার জন্য ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র নামক ১, ২, ৩ ও ৪ শিরোনামে চার খণ্ড পুস্তক ইতোমধ্যেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এতে ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক রচিত অধিকাংশ বইয়ের সমাহার ঘটেছে। আশা করি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক মহলের অন্তরের নানা প্রশ্ন ও তার সমাধান পাবে। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক কামনা করি।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি। আমিন।

জুন, ২০০৯ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক একই দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস্ বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ

আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে'– 'আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠান করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১শ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২শ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি

সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সব বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখলদারিত্ব। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

সালাত

SALAT

রাসূলুল্লাহ -এর নামায

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

আছাদুল হক

বি.এস.এস (সম্মান), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ .

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো, সেভাবে নামায আদায় করো। – সহীহ্ আল বুখারী ও মুসনাদে আহমদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দরূদ ও সালাম মহানবী ﷺ-এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবী (রা)-এর প্রতি।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ - وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ - يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বাহা : ২৫-২৮)

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

অর্থ : তিলাওয়াত করো আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা থেকে আর সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, সকলকে ইসলামী রীতি অনুসারে অভিবাদন করছি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

আজকের এই সকালের অধিবেশনে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু 'সালাত' যাকে আমি বর্ণনা করি 'প্রোগ্রামিং টুওয়ার্ডস ব্রাইটসনেস' বা 'আলোর দিকে অগ্রযাত্রা'।

সালাত-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

অধিকাংশ মানুষ সালাতের অনুবাদ করে থাকে "Prayer" (প্রার্থনা) হিসেবে। বস্তুত "Prayer" সালাতের যথাযথ অনুবাদ নয়। "Prayer" অর্থ নিবেদন করা, অনুনয় করা বা যথার্থভাবে আবেদন করা। যেমন বলা হয় তুমি কিভাবে আদালতের কাছে প্রার্থনা করেছো? তাই বলা যায় Pray শব্দটি "সাহায্য চাওয়া" অর্থ হিসেবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য যা আরবি প্রতিশব্দ দোআ-এর প্রতিরূপ। অতএব Pray সালাত এর ধারে কাছেও যায় না; বরং বলা যায় সালাত আরো ব্যাপক অর্থযুক্ত একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শব্দ।

সালাতের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর দরবারে শুধু সাহায্যের আর্জিই পেশ করে না। সালাত আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনাও দিয়ে থাকে। সাথে সাথে

সালাতকে "প্রোগ্রামিং," কন্ডিশনিং বা লেম্যানিও ভাষায় "ব্রেন ওয়াশিং" বলা যায়। কিন্তু যখন কেউ সালাতে যায়, তখন বলে না আমি যাচ্ছি প্রোগ্রামিং বা কন্ডিশনিং অথবা ব্রেন ওয়াশিং-এ। অনুরূপভাবে সালাতকে কেবল "Pray" বা প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাও মানুষের উচিত নয়। আবারও ঘুরে ফিরে সেই একই কথা বলতে হচ্ছে যে, সালাত শুধু প্রার্থনা বা চাওয়া নয়; বরং তার চেয়েও অধিক। অর্থাৎ, নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সামনে সমর্পন করা।

যখন আমরা প্রোগ্রামিং-এর কথা বলি, তখন আমাদের Computer-এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু মানুষ হচ্ছে যন্ত্রের চেয়েও বড় যন্ত্র। এমনকি বর্তমান সময়ের সর্বাধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও মানুষের দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন ও কর্মপদ্ধতি অধিকতর জটিল। আমরা মানুষেরা অর্থাৎ মানবজাতি হচ্ছি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখলুকাত। মহান আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের সূরা আত্বীন-এ বলেছেন ঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থ : আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত্ব তীন ঃ ৪)

সালাতে মন এদিক-সেদিক কেন যায়?

মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে, আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাদের শরীর সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইচ্ছে করলেই আমরা পারি আমাদের হাতকে ঊর্ধ্বমুখী করতে, আবার খেয়াল-খুশি মতো নিচে নামাতে। সহজ ভাষায় বলা যায়, আমাদের মনোভাব অনুযায়ী সব আদেশ নিষেধ শরীর গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের চালিকা শক্তি মন আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুব একটা গ্রাহ্য করে না। আমরা অধিকাংশ মানুষ হয়তো লক্ষ্য করে থাকবো মন স্থির নয়; বরং সবসময় চলমান বা গতিশীল।

উদাহরণস্বরূপ, সদ্য পরীক্ষায় অংশ নেয়া একজন ছাত্রের কথা বলা যায়। যখন ছাত্রটি পরীক্ষা শেষ করে সালাতে দাঁড়ায়, তার মাথার মধ্যে আপনা-আপনি পরীক্ষা মূল্যায়নের বিষয়টি চলে আসে। সে সালাতের মধ্যে চোখ বুলায় প্রশ্নপত্র ও উত্তর পত্রের দিকে। মিলিয়ে নেয় কী চাওয়া হয়েছে আর সে কী লিখেছে। সর্বোপরি সে তার পুরো পরীক্ষার ওপর একটি সার্বিক মূল্যায়ন করে নেয়। অনুরূপভাবে একজন ব্যবসায়ী যখন সালাতে দাঁড়ায় তার মনোযোগ চলে যায় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে। 'আজ কত বিক্রি হলো' অথবা 'আজকের লভ্যাংশটা বেশ ভালোই'। সম্ভবত একথাগুলোই সে অবচেতন মনে আউড়ে যায়। এ ধারার বাইরে কেউ নয়। এমনকি একজন গৃহবধূ সেও সালাতে দাঁড়িয়ে ভাবে 'তাহলে আজকে কী রান্না করা যায়; পোলাও নাকি বিরিয়ানি?'

এভাবে সার্বিকভাবেই বলা যায়, যখনই আমরা সালাতে দাঁড়াই, আমাদের মন তখনই উড়াল দেয় এখানে সেখানে। কিন্তু প্রশ্ন আসে কেন এমন হয়? কেন

আমরা পারি না মনকে স্থির রাখতে? উত্তরটা হলো মনের শূন্যতা। আরো খোলাসা করে বলা যায়, যখন আমরা সালাতে দাঁড়াই মনকে তখন কোনো কাজ দিই না। কিন্তু মন কোনো কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই মন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

মনকে কীভাবে স্থির রাখা যায়? মনটাকে কাজ দিন

বেশির ভাগ সালাত আদায়কারী সালাতের মধ্যে কুরআনের যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে থাকে– যথা সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য অংশ সেগুলো পুরোপুরি মুখস্থ আশ্বস্ত। এমনকি সে ঘুমের মধ্যেও তা পড়ে যেতে পারে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ......

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি।

একজন মুসলিম সূরা ফাতিহা অবচেতন মনেও হাজার মাইল বেগে অবলীলায় তিলাওয়াত করতে পারে। এই যে যান্ত্রিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা এর কারণে তিলাওয়াতের সময় তার মস্তিষ্কের খুব ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু বেশিরভাগ মুসলিম সালাতের মধ্যে কুরআনের যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে সে অংশসমূহের কোনো অর্থ জানে না। যেহেতু তারা আরবি জানে না এবং অর্থও বুঝে না। সে কারণে অবচেতনভাবেই তার মন এদিক-সেদিক চলে যাওয়ার বড় ধরনের সম্ভাবনা থেকে যায়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন মনকে কাজ দেয়া বা ব্যস্ত রাখা। তাই সালাতে পবিত্র কুরআন থেকে যখন যে অংশ তিলাওয়াত করা হয়, তার অর্থ ও বিশ্লেষণের কাজে মনোনিবেশ একটি উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে। যদি তুমি কথা বলো ইংরেজিতে, অনুবাদ কর ইংরেজিতে, আর যদি হিন্দি হয়, তবে হিন্দিতে। অনুরূপভাবে উর্দু, মারাঠি, গুজরাটি তথা যে ভাষাটি তুমি সবচেয়ে বেশি বুঝো সেই ভাষায় তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদ করো। উদাহরণস্বরূপ ফাতিহা তিলাওয়াতের সময়–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **অর্থ :** সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **অর্থ :** যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ **অর্থ :** বিচার দিবসের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ **অর্থ :** আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত (দাসত্ব) করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ **অর্থ :** আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ

অর্থ : যে পথের পথিক পেয়েছে করুণা, তোমরা দাও মোরে দিশা সে পথের। সে পথে নয়, যেথায় রয়েছে তোমার অভিশাপ এবং যারা বিভ্রান্ত।

এভাবে যদি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে তার অর্থটি অনুধাবনের প্রয়াস চালানো হয়, তবে আমাদের মস্তিষ্ক কাজ পাবে। যখন মস্তিষ্ক তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদের কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন সে আর এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে না। কিন্তু কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে এ পদ্ধতিটিও আর কাজে লাগবে না। কেননা ততদিনে এ কাজটিও মস্তিষ্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে সক্ষম হয়ে যাবে। আমি আগেই বলেছি, আমাদের মস্তিষ্ক খুব শক্তিশালী। তাই একসাথে দু'টি কাজ তথা তিলাওয়াত ও অনুবাদ যৌথভাবে করা তার জন্যে তেমন কঠিন নয়। তাই হয়তো আবার এক সময় মন এদিক-সেদিক চলে যেতে পারে। তবে সম্ভাবনা একটু কম। যেহেতু মস্তিষ্কের একটি অংশ তিলাওয়াত ও অন্য অংশ অনুবাদে ব্যাস্ত থাকবে তাই মনছুট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

এভাবে মনের ঘাড়ে লাগাম পরিয়ে তাকে এদিক সেদিক চলে যাওয়া থেকে নিবৃত্তির কার্যকর পন্থা হচ্ছে আল-কুরআনের যে অংশ তিলাওয়াত করা হয় সে অংশের যিনি অনুবাদ করবেন তার মাতৃভাষায় অনুবাদ করা। এ দুটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ তীব্র করা। আপনারা জানেন মস্তিষ্ক একই সাথে একটির অধিক বিষয়ে শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। অতএব যখন দু'টি বিষয় একই সময়ে শতভাগ মনোযোগের চেষ্টা করা হবে তখন মনের ছোটাছুটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

এক কথায় বলা যায়, মস্তিষ্ক কুরআন তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ এ দু'টি কাজে নিবদ্ধ করে অর্থের প্রতি শতভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আল্লাহ্ চাহেতো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মনের বেখেয়ালি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

সালাত : অপকর্ম প্রতিরোধের ঢাল

আমি আমার আলোচনা শুরু করেছিলাম সূরা আনকাবুত-এর ৪৫ নং আয়াত -এর তিলাওয়াত দিয়ে। আল্লাহ বলেন–

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

অর্থ : আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশজগৎ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্যে। তিলাওয়াত করো আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা থেকে আর সালাত প্রতিষ্ঠা করো। কেননা নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে। (সূরা আনকাবুত : ৪৪-৪৫)

পবিত্র কুরআন নিশ্চিত করেছে সালাত অন্যায় ও অপকর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এজন্যেই আমি সালাতকে 'প্রোগ্রামিং' বলার প্রয়াস পেয়েছি। এটা সেই প্রোগ্রামিং যা আলোকজ্জ্বল পথের প্রতি ধাবিত করে। এজন্যেই আমরা মুসলমানেরা প্রতিদিন নিজেদের প্রোগ্রামিং করে নিই পাঁচবার পাঁচটি সালাতের মাধ্যমে। আমরা প্রোগ্রামিং শুরুর দিকেই বলি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থ : আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও।

এটা আমাদের অধিকতর কল্যাণের দিকে ধাবিত করে পরবর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পর সূরা মায়িদার ৯০ আয়াতটি তিলাওয়াত করে। যথা–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ -

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া ও ভাগ্য নির্ধারণী তীর, এগুলো সবই শয়তানের কর্ম, এগুলো থেকে বিরত থাকো।

এভাবে আমাদের প্রোগ্রামিং চলতেই থাকে। আবার ইমাম সাহেব হয়তো সূরা ফাতিহার পর তিলাওয়াত করতে পারেন সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ -

অর্থ : তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত পশুর গোশত, রক্ত, শূকরের গোশত আর যা কিছু আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়।

এভাবে সালাতের মাধ্যমে আমরা বারবার আমাদের পথ নির্দেশনাগুলো প্রোগ্রামিং করা অবস্থায় পেয়ে থাকি। ইমাম সাহেব, অনুরূপভাবে, হয়তো সূরা ফাতিহার পর তিলাওয়াত করতে পারেন– সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত নং (২৩-২৪)।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ

لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

অর্থ : আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন– তোমরা শুধু তার ইবাদাত করো। পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করো। যদি তাদের কোনো একজন বা দু'জনই বার্ধক্যে তোমার কাছে এসে যায় তাদের সামনে উহ্ শব্দটিও বলো না; এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিও না বরং তাদের সাথে আদব রেখে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর এ বলে, হে আমার প্রতিপালক তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

এভাবে, আমি বার বার বলছি, সালাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবন ইসলামী অনুশাসনে চালানোর পথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হই যেমনটি একটি 'প্রোগ্রাম' কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজের দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার দিকে ধাবিত করে।

সালাত পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা

একটি কম্পিউটার চালানোর জন্যে প্রয়োজন সর্বসাকুল্যে একবার প্রোগ্রামিং। কিন্তু আমাদের মন যার নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে যা কম্পিউটারের নেই তাকে পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন নিত্য প্রোগ্রামিং। পৃথিবীতে দুষ্কর্মের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তাই মানুষকে প্রতিদিনই সৎপথে থাকার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর সালাত নিঃসন্দেহে এ কাজটিই করে। মানুষ সৎপথ থেকে অন্যান্য পথ তথা খুন, হত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ইত্যাদিতে যেকোনো সময় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ জন্যেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটার প্রশিক্ষণ তথা প্রোগামিং হিসেবে সালাত প্রতিদিন পালন আল্লাহ্ অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, সালাত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত-এর পরিবর্তে এক ওয়াক্ত হলো না কেন? বিজ্ঞানের বদৌলতে সকলেই জানে যে, সুস্বাস্থ্যের জন্যে একজন মানুষের প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার পরিমাণ মতো ও যথাযথ পুষ্টিকর সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন। যদি কেউ প্রতিদিন একবার খাদ্যগ্রহণ করে তা সে যতই পুষ্টিকর হোক না কেন, তার জন্যে সেটি প্রয়োজন মাফিক নয়। তেমনিভাবে একজন মানুষের মনকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন পাঁচবার প্রশিক্ষণ বা প্রোগ্রামিং-এর প্রয়োজন আছে। এজন্যেই মুসলমানের জন্যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। ইহুদি সম্প্রদায় প্রতিদিন তিন বার তাদের উপাসনা করে থাকে। (ওল্ড টেস্টামেন্ট, ডানিয়েল অধ্যায় ৬, অনুচ্ছেদ ১০)

আমি আবারো উল্লেখ করছি, আমরা মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা, প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ বার সালাত সম্পন্ন করি, যা আল্লাহ্ আমাদের প্রতি একান্ত বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা রূম-এর (১৭-১৮) নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ـ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ

অর্থ : সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয়। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাঁর জন্যই প্রশংসা এবং তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের কাছে এসে যায় যোহরের সময়। সূরা হুদ ১১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ : এবং তুমি সালাত কায়েম করো দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্মকে বিলুপ্ত করে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্যে এক উপদেশ।

সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৭৮-তে বলা হয়েছে–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

অর্থ : সালাত কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কুরআন পড়ার ব্যবস্থা করো। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সূরা ত্বহা, আয়াত ১৩০-তে বলা হয়েছে–

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ـ

অর্থ : তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।

সালাতের সময় সীমা

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি সালাত অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। প্রথম হলো সালাতুল ফজর। এটি আমরা সুবেহ্ সাদেক অর্থাৎ প্রথম ভোর বেলা থেকে শুরু করে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করি।

এর পরেই দ্বিতীয় আসে সালাতুজ্ জোহর। এটি শুরু হয় সূর্য যখন পূর্ণভাবে মাথার উপরে থাকে তখন থেকে হেলে পড়া পর্যন্ত অর্থাৎ দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত।

তৃতীয়টি হলো আসরের সালাত। এটি শুরু হয় যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বপর্যন্ত।

পরবর্তী চতুর্থ ধাপে মাগরিবের সালাত যা সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত আদায় করার সময়সীমা।

আর পঞ্চম সালাতুল ইশা আকাশে লালিমার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যেকোনো সময় আদায় করা যায় তবে রজনীর প্রথম অংশে আদায় করা উত্তম। আমরা মুসলমানেরা প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করি।

পবিত্রতা : সালাত আদায়ে অন্যতম অনুষঙ্গ

আর যখন আমরা সালাত আদায় করি এবং মসজিদে প্রবেশ করি, তখন পবিত্রতা অর্জন করে নিই। এ একই নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কেও দিয়েছিলেন। সূরা ত্বহায় (১১-১২) নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۔ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔

অর্থ : সেখানে পৌঁছলে (আগুনের কাছে) তাকে ডেকে বলা হলো– হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, তোমার জুতো খুলে ফেলো। কেননা তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছো।

একই বার্তা বাইবেলেও এসেছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর exodus (এক্সোডাস) অধ্যায় ৩, আয়াত ৫-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ মূসাকে নিষেধ করেছেন সিক্রেট ডোম-এ পায়ে জুতা নিয়ে না আসতে। একই ধরনের আরেকটি নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে অ্যাক্টস চ্যাপ্টার ভার্সেস ৩৩-এ। যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ (Lord) মূসা মসীহকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো সিক্রেট ডোমস-এর সম্মানার্থে। কিন্তু মুসলিমরা মসজিদে এমনকি সালাত আদায়ের সময়ও জুতো পায়ে রাখতে পারে। আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'যদি জুতোর তলা পবিত্র থাকে তবে তা পায়ে দিয়ে সালাত বৈধ।' আবু দাউদ (১ম খণ্ড) কিতাবুস সালাত ২৪০ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৫২-এ বলা হয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'তোমরা ইহুদিদের থেকে ভিন্নতর হও। তারা সব সময় প্রার্থনা করে জুতো বা স্যান্ডেল খুলে রেখে।'

একই কথা বলা হয়েছে আবু দাউদ ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাত ২৪০ অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৫৩-এ। যেখানে আমর ইবনে শোয়েব বলেন, তাঁর পিতামহ বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে জুতোসহ ও জুতো ছাড়া উভয় অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে দেখেছি। মুসলিমগণ জুতো খুলবে কি খুলবে না, তা পুরোপুরি নির্ভরশীল তার জুতোর তলা পরিষ্কার কিনা তার ওপর। আমরা মুসলিমেরা হচ্ছি স্বাস্থ্য সচেতন জাতি। আমরা আমাদের ইবাদাতের স্থান পরিষ্কার রাখতে চাই। এ জন্যেই মুসলিম জাতি পবিত্রতাকে এতো গুরুত্ব দেয়। তাই সালাত বা নামাযের স্থানের পবিত্রতা রক্ষার্থে জুতো খুলে সালাত পড়াই উত্তম।

আযান : ভেঙ্গে দাও ভ্রান্তি, ভ্রান্তির বেড়াজাল

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি তাদের ধর্মীয় প্রার্থনায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। যেমন ইহুদিরা তাদের সান্ধ্য প্রার্থনায় ব্যবহার করে নিকৃষ্ট ধরনের শব্দ। খ্রিস্টান সম্প্রদায় চার্চের ঘণ্টা বাজায়। অনুরূপ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে দিয়ে থাকে আযান। যিনি আযান দেন তাকে বলা হয় মুয়াজ্জিন। এ আযান অনেক সুমধুর, ঘণ্টা ধ্বনি বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে। আযানের প্রভাবও মানব মনে অধিকতর কার্যকর। পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্মান্তরিত মুসলিম আছেন যারা কেবল আযানের সুমিষ্টতা এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেই মুসলিম হয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মুম্বাইয়ের মসজিদগুলোর আযান সেই সুমিষ্টতা ও সুরলহরী থেকে অনেক দূরে। তাই আমি মুয়াজ্জিন সাহেবদের বলেছি মসজিদে হারামাইন, মক্কা মুয়াজ্জমা বা মদিনা শরীফের আযান অনুসরণ ও অনুকরণ করতে। আমাদের আযানের ধ্বনি সুমধুর ও শ্রুতিমধুর নয়; বরং এর একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও আছে। কিন্তু আমরা নিজেরা অনুধাবনও করি না। আবার অমুসলিমদের কাছে আযানের দাওয়াত ও ব্যাখ্যাও পৌঁছাই না। গত ডিসেম্বরে কেরালায় একটি ইসলামিক কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, যেখানে একজন অমুসলিম মন্ত্রীকেও নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, 'আমরা ভারতের মুসলমানদের নিয়ে গর্বিত। তাঁদের প্রাচীন স্থাপত্য ও বিভিন্ন শাসকের অসাম্প্রদায়িক শাসন প্রণালী আমাদের গর্বের ও অনুকরণের বিষয়। তাই মুসলমানেরা এখনো মুঘল শাসক আকবরকে প্রতি আযানে চারবার স্মরণ করে থাকে।'

দেখুন, অমুসলিমরা আযান সম্পর্কে কত অজ্ঞ। ভারতের শুধু অমুসলিম নয়, এমন কি অনেক মুসলমানও মনে করে আযান-এর মধ্যে চারবার করে সম্রাট আকবরের নাম স্মরণ করা হয়। অপরদিকে পাশ্চাত্যের অনেকেই "আল্লাহু আকবার" ধ্বনির অর্থ বুঝে থাকে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের গুরু হিসেবে। এই যে আযান সম্পর্কে

অমুসলিমদের বিভ্রান্তি, এটা দূর করার দায়িত্ব মুসলমানদেরই, তাদেরকে নিজেদের সুমহান অর্থ ও বাণী অমুসলিমদের মাঝে পৌঁছে দিতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে, আমরা বলি– اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থ : আল্লাহ্ মহান।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।

সালাতের দিকে আসো।

কল্যাণের দিকে আসো।

আল্লাহ্ মহান।

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'

আযানের এই শাশ্বত, অন্তর্নিহিত বাণী তার অর্থ, বার্তা অমুসলিমদের কাছে পৌঁছানো খুবই জরুরি।

অজু : সালাতের প্রত্যক্ষ প্রযুক্তি

এরপরেই আসে অজুর কথা যার অর্থ আমাদেরকে পরিষ্কার করা বা অজু করা। এ ব্যাপারে সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াও, তোমরা ধুয়ে নাও তোমাদের মুখমণ্ডল, তোমার দু হাত কনুই পর্যন্ত, মুছে নাও মস্তক এবং ধৌত কর দু পা টাখনুসহ। (সূরা মায়িদা : ৬)

তাই সালাত বা নামায আদায়ের পূর্বে অজু করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। এই একই ধরনের নির্দেশ এসেছে বাইবেলেও। এক্সোডাস বইয়ের ১৪ নং অধ্যায় এবং শ্লোক নং ৩১ ও ৩২-এ। সেখানে বলা হয়েছে, 'মূসা ও তার সন্তান হাত ও পা ধুয়ে নিল এবং মন্দিরে প্রবেশ করলো। আর তারা ধৌত করলো তাদের প্রভুর নির্দেশানুসারে।'

একই ধরনের নির্দেশ এসেছে Actrs-এর অধ্যায় ২১, শ্লোক নং ৩৬-এ।

অজু আমরা সালাত আদায়ের পূর্বে করি, কারণ আমরা মুসলমানেরা স্বাস্থ্য সচেতন জাতি। অবশ্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ছাড়াও অজু মানসিক প্রস্তুতি হিসেবেও কাজ করে। আমরা মহান আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সালাত আদায় করি। এর প্রস্তুতি পর্বই হলো অজু। নবী করিম (সা)-এর উদ্ধৃতি যা বুখারী শরীফ

১ম খণ্ড কিতাবুস সালাত-এর ৫৬ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৪২৯-এ বলা হয়েছে, 'পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে আমি ও আমার অনুসারীদের সিজদার স্থান হিসেবে অর্থাৎ মসজিদ হিসেবে। মসজিদ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে বিশ্বাসীরা সিজদা করে।' নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের জন্যে পুরোপুরি পৃথিবীই মসজিদ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যেখানে আমরা সিজদা করবো সেটা হতে হবে পরিষ্কার ও পবিত্র।'

রুকূ' ও সিজদাহর গুরুত্ব

এ একই বিষয় সহীহ্ আল বুখারী ১ম খণ্ড কিতাবুল আযান-এর ৭৫ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৯২-এ যেখানে বলা হয়েছে, 'যখন জামায়াতে সালাত আদায় করা হয়, যেন কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলে যায় একজন নামাযির সাথে অন্য নামাযির।' এ বিষয়টি আবু দাউদ-এর কিতাবুস সালাত হাদীস নং ৬৫৬ অধ্যায় ২৪৫। যেখানে নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'সোজা করে দাঁড়াও সালাতের কাতারে। কাঁধে কাঁধ মেলাও, কোনো ফাঁক রেখো না, শয়তান যেন স্থান না নিতে পারে।' এখানে মহানবী ﷺ শয়তান বলতে ইবলিসকে বুঝান নি। বরং বুঝিয়েছেন মানুষের সাথে মানুষের বিভেদ। উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-গরিব এর বিভেদ। তাই যখন জামাআতে সালাত আদায় করা হয় এই বিভেদ যেন ঘুঁচে যায়। না থাকে কোনো ব্যবধান কারো মধ্যে।

সালাত আদায়ের পদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারাহ্-এর ১৪৪ নং আয়াতে–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط

অর্থ : আমি বারবার আপনাকে আকাশ পানে তাকাতে দেখি। আপনার পছন্দানুযায়ী কিবলাকেই আমি ঘুরিয়ে দিলাম। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান। এখন তোমরা যে যেখানেই অবস্থান করো না কেন এদিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকো।

অর্থাৎ আমরা যেখানেই থাকি না কেন সালাতের সময় আমরা মুখ করি পবিত্র কা'বার প্রতি। আর এই উপ মহাদেশে আমরা সালাত আদায় করি পশ্চিমমুখী হয়ে, কেননা এটাই আমাদের কিবলা। আমি যখন দিক বুঝতে অপারগ হই এবং কোনো অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, তখন তাকে সুধাই পূর্ব দিক কোন্‌টি এবং তার উল্টো দিকে মুখ করে সালাত আদায় করি। পশ্চিম বলতে যেন সে পশ্চিমা বিশ্ব না বুঝে এ জন্যেই এ ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারাহ্ ২৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা সালাতের অত্যাবশ্যকীয় অংশ। সূরা আল-হিজর-এর ৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে দিয়েছি ৭টি আয়াত যা বারবার পড়া হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

এখানে বারবার পঠিত ৭টি আয়াত দ্বারা সূরা আল ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। একে বলা হয় 'মাইনর কুরআন' (সংক্ষিপ্ত কুরআন) বাকি অংশকে বলা হয় 'মহান কুরআন'। সালাতের প্রতিরাকাআতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত অত্যাবশ্যকীয়।

'রুকূ'' শব্দটি যার অর্থ সম্মানার্থে মাথা ঝুঁকানো। পবিত্র কুরআনে ১৩ বার শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সজুদ' বা 'সিজদা' শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৯২ বার উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ৩২টি ভিন্ন ভিন্ন সূরায় 'সজুদ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি পবিত্র কুরআনের একটি সূরা রয়েছে আস সাজদাহ নামে যার অর্থ মাটিতে উপুড় হওয়া। সূরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

অর্থ : সিজদা কর আমাকে, মাথা ঝুঁকাও আমার প্রতি তাদের সাথে, যারা ঝুঁকায় (রুকূ' করে)।

সূরা হাজ্জ-এর ৭৭ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সিজদা করো, রুকূ' করো, আল্লাহর ইবাদাত ও সৎকর্ম কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।

আল্লাহ্র প্রেরিত সমস্ত নবী যখনই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, সিজদা ও রুকূ' করেছেন। এমন কি বাইবেলেও এমন সাদৃশ্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট জেনোসিস-এর ১৭ নং অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদ-এ বলা হয়েছে–

'ইব্রাহীম সিজদায় পড়েছিলেন।'

লূক-এর অনুচ্ছেদ ২০ শ্লোক নং ৬-এ বলা হয়েছে–

'মূসা ও হারুন (আ:) তাদের পায়ে ভর দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন।'

জোশোয়া অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ নং ১৪-এ বলা হয়েছে, 'জোশোয়া তার মাথা ঠেকালেন ইবাদত ও দাসত্ব করলেন।'

পবিত্র বাইবেলের গসপেল অভ্ ম্যাথিউ, অধ্যায় ২৬, অনুচ্ছেদ ৩৯-এ বলা হয়েছে–

'যিশু খ্রিস্ট যখন বাগানে গেলেন, তিনি কয়েক পা সামনে এগোলেন, মাটিতে উপুড় হলেন এবং প্রার্থনা করলেন।'

পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলই আমাদের মতো সিজদা করতেন এবং প্রার্থনা করতেন।

সার্কাসের লোকেরাও কপাল মাটিতে ঠেকায় আজকাল। তবে তাদের ঠেকানো ও আমাদের এবং বাইবেলে বর্ণিত ঠেকানোর নিয়ম অনুযায়ী ঠেকানোতে পার্থক্য আছে। আমি আগেও বলেছি সালাতের সময় আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়। এজন্যেই আমাদের মনকে নরম করতে হয়। আর মনকে বশে আনার সর্বোত্তম পন্থা হলো শরীরের সবচেয়ে ওপরের অঙ্গ কপাল যার উপরেই ব্রেন রয়েছে সেই অংগকে মাটিতে ঠেকানো এবং বলা, 'আল্লাহ্ সর্ব মহান, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।' আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় যেমন– কেমন করে দাঁড়াতে হবে, কেমন করে হাত বাঁধতে হবে, কেমন করে সিজদা দিতে হবে, কত রাকাআত সালাত ইত্যাদি খুব যত্নের সাথে মনোযোগ দিয়ে করবেন। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অনুকরণ কর।

এ বাণীটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে যথা আলে-ইমরানের ৩২, ১৩২ নং আয়াত, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত, সূরা মায়িদার ৯২ নং আয়াত, সূরা আনফাল-এর ১ম আয়াত, ২০ নং, ৪৬ নং আয়াত, সূরা নূর-এর ৫৪ ও ৫৬ নং আয়াত। এ সূরা মুহাম্মদ -এর ৩৩ নং আয়াত এবং সূরা মুজাদিলাহ্-এর ১৩ নং আয়াতসহ আরো বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর।' কথাটি এসেছে।

তাই খুঁটিনাটি বিষয়ে নবীজির দৃষ্টান্ত দেখুন ও অনুসরণ করুন। সহীহ্ আল বুখারী ১ম খণ্ড কিতাবুল আযান, অধ্যায় ১৮, হাদীস নং ৬০৪, ৯ম খণ্ড হাদীস ৩৫২-এ

নবীজি ﷺ বলেছেন– 'তোমরা ইবাদাত করো, যেভাবে আমাকে ইবাদাত করতে দেখেছো।'

এজন্যেই আমি বারবার উল্লেখ করছি সকল নিয়ম পদ্ধতি হাদীস থেকে জেনে নেয়ার কথা।

সালাত হচ্ছে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস তথা ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

সূরা যারিয়াত আয়াত নং ৫৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'আমি মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়কে কেবল আমার ইবাদাত তথা দাসত্ব করার জন্যে সৃষ্টি করেছি।'

সালাতের সামাজিক গুরুত্ব

'ইবাদাত' শব্দটি আরবি আব্দ (عَبْد) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ একজন দাস বা ভৃত্য। প্রত্যেক ভৃত্যের উচিত বা অবশ্য কর্তব্য মনিবের দাসত্ব করা। যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আল্লাহর দাস তথা ভৃত্য, তাই সব মানুষের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হওয়া। যখন আপনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলছেন তখনই বলা যায় তার ইবাদাত বা দাসত্ব করছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে কাজগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকেন তবেই আল্লাহ্র ইবাদাত করছেন।

অনেকেরই ধারণা, সালাত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের একমাত্র ইবাদাত। এটি সর্বাংশে ভুল ধারণা। ঈমানের পরে সর্বোত্তম ইবাদাত সালাত, তবে এছাড়াও অনেক ইবাদাত আছে। আল্লাহর আদেশ মান্য করা আর নিষেধ বর্জন করার নামই ইবাদাত। সালাত হচ্ছে যেসব নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে তাদের মধ্যে একটি, তবে অন্যতম।

সালাত-এর আরেকটি অর্থ আনুগত্য। আনুগত্য এই অর্থে যে সে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করবে, সিজদা করবে এবং সালাতের মধ্যে যেসব আয়াত তিলাওয়াত করে থাকে সে বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। যদি সে আরবি না বুঝে তবে তার উচিত হবে আল-কুরআনের অনুবাদ পড়া, যেন সে নামাযে যে অংশটুকু তিলাওয়াত করে সেঅংশটুকুর আদেশ নিষেধ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে।

সালাত আদায় না করার বহুমুখী সমস্যা

যদি কেউ সালাত আদায় না করে তবে সে বহুমুখী ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যেমন– প্রথমেই আসে বিশ্বাস তথা ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা। এমন কি অবিশ্বাসী হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। কেননা সে তখন বস্তুগত জিনিসের প্রতি দুর্বল হয়ে বস্তুবাদী হয়ে যেতে পারে, এমন কি মনে করতে পারে পৃথিবীর বস্তুবাদী

ব্যবস্থায়ই ভোগ বিলাসের একমাত্র উপকরণ। যখন সে এটা ভেবে বসবে তখন তার দ্বারা যেকোনো অন্যায় সংঘটিত হতে পারে। কেননা বস্তুবাদী অবস্থায় মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ বা চেতনা আর কাজ করে না। এভাবে 'সিরাতাল মুসতাকিম' থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

আর যারা সালাত আদায় করে না, তারা অজ্ঞানতাবশত তা করে না। সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

অর্থ : প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে। তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। একমাত্র সেই ব্যাক্তিই সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ইহকালটা আসলে ছলনা ছাড়া আর কি?

সালাত আদায়ের উপকারিতা

সালাত আদায় করলে অনেক উপকার হয়। এটি আসলে একটি জীবন দর্শন। সালাত আনে আত্মিক পরিশুদ্ধতা, শান্তি ও দৈহিক অনুশীলন। বিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি আত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। সূরা আনফালের ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا -

অর্থ : সত্যিকারের বিশ্বাসী তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠে যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়। আর যখন আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমানও বৃদ্ধি পায়।

সূরা ফাতিহার আয়াত (৪-৭)-এ বলা হয়েছে–

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ -

অর্থ : আমরা তো আপনারই দাসত্ব করি আর চাই আপনারই সাহায্য। আমাদের দেখান সহজ সরল পথ। সে পথ, যে পথে রয়েছে আপনার করুণা। নয় তাদের পথে যারা পেয়েছে আপনার অভিশাপ।

এ জন্যেই একজন প্রকৃত মুমিন তার দিন শুরু করে ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে যাতে আহ্বান করা হয়–

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ

অর্থ : ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম।

আর প্রকৃত মুমিন দিন শেষ করে সালাতুল এশা দিয়ে।

সালাতের একটি সামাজিক দিকও আছে। এটি সামাজিক বন্ধনও দৃঢ় করে। সবাই জামাআতে অংশ নিতে মসজিদে যায়। ফলে একে অন্যের খবর নিতে সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, মমতা, সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য অনেক বড় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাত-এর ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : হে মানবজাতি আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্রে যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদার অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহা জ্ঞানী, সব কিছুর খবর রাখেন।

তাঁর কাছে মানুষের মূল্যায়নের মাপকাঠি নয় কোনো বর্ণ গোত্র বা অন্য কিছু বরং তাকওয়া তথা খোদাভীতিই মূল্যায়নের মাপকাঠি।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা হুমাজাহ্-এর প্রথম আয়াতে বলেন–

"দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে ও পেছনে মানুষের নিন্দা করে।"

আর সালাত মানুষকে পরনিন্দা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাই দেয়।

মহান আল্লাহ্ সূরা হুজরাত-এর ১১ নং আয়াতে বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ .... وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যেন কেউ অন্যকে উপহাস না করে। কেননা উপহাসকারীর চেয়ে যার উপহাস করা হয় সেও উত্তম হতে পারে .... তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না।

মহান আল্লাহ্ সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে আরো বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গোনাহ। তোমরা একে অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না। তোমরা কারো পশ্চাতে নিন্দা করো না, এমনকি কেউ আছে তোমাদের মধ্যে যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে!

এখানে কারো পেছনে নিন্দা করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুটো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে যার একটি হলো মানুষের গোশ্ত খাওয়াই হারাম। অন্যটি হচ্ছে যার গোশ্ত খাওয়া হালাল সেগুলোও মৃত হলে খাওয়া যায় না। তাই দু'টো হারাম একসাথে করার কথা বলে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু যারা মানুষের গোশত খায় তারাও মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খায় না। এভাবে বিষয়টি অর্থাৎ পরনিন্দার কদর্য দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

সালাত মানুষকে সত্য বলতেও শেখায়। আমি আগেই বলেছি পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন–

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

অর্থ : তুমি তিলাওয়াত করো যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং সালাত কায়েম করো। কারণ সালাত নিশ্চিতভাবেই মানুষকে বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ـ

অর্থ : বল সত্য এসেছে মিথ্যার যবনিকাপাত করে।

সালাত আমাদের সত্যবাদী হতে শেখায়। মহান আল্লাহ সূরা বাকারাহ্-এর (৪১–৪২) নং আয়াতে বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে কোনো সত্য গোপন করো না।

পবিত্র কুরআন সত্যবাদী হতে শেখায়। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় ১৮৮ নং আয়াতে বিধান আরোপ করেন–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ ـ

অর্থ : তোমরা অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না। আর কারো সম্পদের সামান্যতম অংশও অন্যায় দখলের নিমিত্ত্বে আদালতমুখী হইও না।

এইভাবে পবিত্র কুরআন আমাদের সৎ ও ন্যায়ের পথে চলাচলের পন্থা বলে দেয়। কিভাবে সমাজে সততা ও ন্যায়ানুবর্তিতা হয়ে দিনাতিপাত করা যায় কুরআন আমাদের তা দেখায়। পবিত্র কুরআনের সূরা রা'দের ২৮ নং আয়াতের ঘোষণা–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থ : যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে।

আল্লাহ্কে স্মরণ করলে মনে, আত্মায় ও সমাজে শান্তি আসে। আর আল্লাহ্কে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো সালাত। তাহলে দেখা যাচ্ছে সালাত কায়েম থাকলে, মানুষের মনে, হৃদয়ে, আত্মায়, পরিবারে এমন কি সমাজেও শান্তি বিরাজমান থাকবে। আল্লাহর সাথে যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম সালাত। মহান আল্লাহ্ সূরা বাকারাহ্-এর ১৫৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে থাকেন।

এভাবে দেখা যায় আল্লাহ্ সালাত আদায়কারীদের সাথে সব সময় আছেন। সালাত আমাদের মানসিক, সামাজিক এবং বহুমুখী কল্যাণ সাধন করে। উপরন্তু সালাত দৈহিক তথা শারীরিক অনেক উপকারও দিয়ে থাকে।

দৈহিক উন্নয়নে সালাত

আমরা যখন রুকূ'তে যাই তখন মাথা ঝুঁকাই ফলে আমাদের শরীর বাঁকা হয় এবং মাথার দিকে রক্ত বাড়তে থাকে। এরপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াই তখন রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং শরীর আরামপ্রদ হয়ে যায়। এরপর আসে সিজদার কথা। এটি সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের শরীরেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মাথা, আর মাথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্রেন। আমাদের শরীরে ইলেক্ট্রোমাটিক্স তৈরি হয়। আপনারা দেখেছেন ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার হয়

তাতে আর্থিন-এর ব্যবস্থা থাকে। সিজদাতে মাথা নোয়ানের মাধ্যমে সেই ইলেকট্রোসটিক্স বের হয়ে যাওয়ার উপায় পায়। ফলে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি কমে যায়।

ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সেটা মাথার উপর থাকে না। সেটা থাকে ফ্রন্টাল লোবে। সেজন্যেই আমরা সালাতের মাঝে সিজদা করি। যখন আমরা সিজদায় যাই তখন আমাদের ব্রেনে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়ায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্যে খুবই উপকারী। বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি যেমন ফাইব্রোলাইটিস ও চিলব্রেইন, যখন সিজদা করি তখন পারালাইন সাইনোসাইটিস ড্রেনেইজ তৈরি হয়। এতে করে সাইনোসাইটিস-এর সম্ভাবনা কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ।

আমরা সারাদিন সারারাত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর ম্যাক্সিলারি সাইনাস-এর ড্রেনেইজ থাকে শরীরের উপরের অংশে ফলে এর চলাচল হয় না। সেজন্যে যখন সিজদায় যাই, ব্যাপারটি এমন যেন একটা ভরা পাত্র উল্টে দিলাম। এতে করে ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরে ড্রেনেইজ তৈরি হয় ফ্রন্টাল সাইনাসের সাথে মোডিয়াল সাইনাসের এবং স্পেরিয়াল সাইনাসের। এতে করে সাইনোসাইটিসের সম্ভাবনা কমে যায়। এতে তার সাইনোসাইটিস থেকে থাকলেও এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এছাড়াও সিজদা তাদের জন্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা যারা ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগতে থাকে। এতে করে ব্রঙ্কিলট্রি দিয়ে রস মিশ্রিত হতে পারে। সিজদার কারণে ব্রঙ্কিলট্রিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। ফলে বিভিন্ন পালমোনারি অসুখের চিকিৎসা করা যায়। যেখানে আমাদের শরীরে রস জমা হয়।

আমাদের শরীরে রস ছাড়াও ধূলোবালি এবং রোগজীবাণু জমা হতে পারে। সিজদার মাধ্যমে এসব অসুখের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই, তখন আমরা ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ ফুসফুস থেকে যায়। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ তাপ বাতাস আমাদের ফুসফুসে ঢুকে ও বের হয়ে যায়। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বাতাসকে বলে রেসিডিয়াল এয়ার, আমরা যখন সিজদা করি তখন আমাদের তলপেট চাপ দেয় ডায়াফ্রামে। আর এই ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে, ফলে ফুসফুসের সেই রেসিডিয়াল এয়ার বের হয়ে যায়।

তাহলে এ বাতাস বের হয়ে গেলে আরো গরম বাতাস ফুসফুসে ঢুকে, এতে করে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সিজদা করি যেহেতু অভিকর্ষ বল কমে যায়

এবং তলপেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তলপেটের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভেতর রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। সিজদা এবং রুকূ' এগুলোর মাধ্যমে হারনিয়া, ফিসোরাল ইত্যাদি অসুখের নিরাময় হয়ে থাকে। এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়, তার মধ্যে একটা হলো হেমোরয়েট, যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে থাকে পাইলস। এছাড়াও সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থানচ্যুতিকে রোধ করা যায়। যখনই সিজদা করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাঁটুর উপর আমাদের পা থাকে নমনীয় এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যালট্রোনিমিয়াস থালস {(এ থালসগুলোকে বলা হয় প্যারিফেরিয়াল (২টি)}। কারণ এ মাসলগুলোতে অনেক ধমনী আছে। আর এ ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, এতে করে শরীরের নিচের অংশে আরাম ও বিশ্রাম হয়।

যখন সিজদায় যাই, আমাদের হাঁটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে এ পদ্ধতিতে কার্বোইন্টাইল ইস্পাইন-এর বিভিন্ন অসুখের নিরাময় হয়। কারণ এ সিজদার মাধ্যমে ইন্টারবায়োট্রিক্যাল জয়েন্টের উন্নতি হয়। সিজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে হাঁটু গেড়ে বসি শরীরের উপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরেরও Relaxed হয়। তখন আমাদের উরু ও পিঠের ধমনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। পিঠের মাংসপেশী নরম ও আরাম হয়। সিজদার মাধ্যমে আমরা উপকার পাই কোষ্ঠ কাঠিন্য আর বদ হজমের। এতে করে যারা ভোগছেন পেপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর জন্যে তারাও উপকার পাবেন, যখন আমরা বসা থেকে উঠে দাঁড়াই। যখন সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াই, আমাদের শরীরের ভর থাকে পায়ের বলের উপরে। এতে করে আমাদের পিঠের মাসল, হাতের মাসল ও পায়ের মাসল শক্ত হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি, তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা শুধু শারীরিক উপকারিতার জন্য সালাত আদায় করে থাকে না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রশংসা করার জন্য, তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য এবং সঠিক পথ লাভের জন্য। নামাযের এই সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানের লাভগুলো অবিশ্বাসী এবং যারা মুসলিম নয় তাদের আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ এটি আল্লাহ তা'আলার আদেশ, কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, কিছু মুসলমান প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। কিন্তু তারা প্রতারক এবং অসৎ প্রকৃতির ও নীতিহীন লোক, তাহলে আপনি কী করে বলেন যে, Salat is the programme towards righteousness. এই প্রশ্নের শুরুতেই উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা আল-মুমিনুনের ১-২ আয়াতে বলেছেন–

মু'মিনের সালাত

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ

অর্থ : অবশ্যই সে সকল বিশ্বাসীরা সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাযে বিনয়ী।

আরবি শব্দ خاشِ এটা خشوع থেকে এসেছে। এর অর্থ দৃঢ় মনোযোগ, সহৃদয়তা, অনুকম্পা, বিনয়।

সুতরাং আল্লাহ বলেন, তারা সফলকাম হবে এবং প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবে যারা মনোযোগ ও বিনয়সহকারে সালাত আদায় করবে, কিন্তু তারা লাভবান হবে না যারা মনোযোগ ও বিনয় ব্যতীত সালাত আদায় করে। সুতরাং যে সকল মুসলমান নামায আদায় করার পরও অসৎ ও নীতিহীন, তারা মূলত মনোযোগ ও বিনয় সহকারে নামায আদায় করে না।

নামাযে মনোযোগী হওয়ার জন্যে অর্থ বুঝতে হবে এবং আল্লাহ যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী নামায আদায় করতে হবে। যেমন নামাযের মাঝে সূরা ফাতিহার পর ইমাম পাঠ করেন –

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

অর্থ : (হে নবী!) আপনি বলুন আল্লাহ্ একজন।

যে সকল মুসলমানরা নামাযে আসে তারা সকলেই একমত আল্লাহ্ এক, কেউ বলে না আল্লাহ একাধিক, যিনি ইমাম তিনি সকলকে নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং ঘোষণা করছেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

অর্থ : (হে নবী !) আপনি বলুন! আল্লাহ এক।

অর্থাৎ আপনি মুসলমানদের অবিশ্বাসীদেরকে মাঝে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিতে বলুন। আর তাদের মাঝে আল্লাহর কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলুন।

অনেক মুসলমান নামায আদায় করার পরও নামাযে যে সুসংবাদ ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা তাদের জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে না। কারণ নামাযে যে কথা বলা হয়েছে তা তারা বুঝতে পারে না। তাহলে কীভাবে তারা তা বাস্তবায়ন করবে? আপনাকে নামাযে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে, তাহলেই কেবল নামায থেকে লাভবান হওয়া যাবে। যেমন আপনার একজন ভৃত্য আছে, যিনি নিয়মানুবর্তী এবং প্রতিনিয়ত কাজে আসে। সে অফিসে আসে এবং আপনার প্রশংসা করে, আপনি যদি তাকে কোনো কাজের কথা বলেন এমনকি এক গ্লাস পানি আনার

আদেশ দেন, সে তা না করে আপনার প্রশংসা করে। যখন আপনি বেল বাজান তখন সে দৌঁড়িয়ে আসে এবং 'বলে কি স্যার'? আপনি বললেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এটি Client-এর নিকট পৌঁছিয়ে দাও। সে বলল, আমি আপনার অনুগত এবং আপনার প্রশংসা করি কিন্তু সে কাজটি করলো না আপনি তাকে চাকুরিতে রেখে কি পদোন্নতি দেবেন? না বরং তাকে চাকরিচ্যুত করবেন।

এমনিভাবে আমরা হচ্ছি আল্লাহর ভৃত্য। আর আমাদের তাঁর আদেশ অনুসরণ করতে হবে। কেবল তাঁর প্রশংসা করা আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে প্রতিদিন তিনবার ওষুধ খেতে বললেন। সে বিনয় ও অনুগতভাবে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করলো। আর ওষুধ খাওয়ার পরিবর্তে দিনে তিনবার তা তিলাওয়াত করলো। আপনি কি মনে করেন সে সুস্থ হয়ে যাবে?

সুতরাং একইভাবে আমাদের নামায থেকে উপকার পেতে হলে তা নির্দেশনা অনুযায়ী আদায় করতে হবে। নামায থেকে লাভবান না হওয়ার মূল কারণ হলো এটি তার দাবি অনুযায়ী আদায় করা হয় না। আল্লাহ্ এ সকল লোকদের ব্যাপারে সূরা মাউন-এ বলেন–

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ لا اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ لا

অর্থ : আফসোস! সে সব নামাযীদের জন্যে। যারা তাদের নামাযকে ভুলে থাকে। আর আফসোস তাদের জন্যে যারা লোক দেখানো নামায পড়ে। (সূরা মাউন : ৫-৬)

আল্লাহ্ তাআলা সূরা নিসায় ১৪২ নং আয়াতে আরো বলেন–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْآ اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাজে দাঁড়ায়, তখন তারা নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায় শুধু লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না বললেই চলে।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশ্য কর্তব্য, এর কোনো বিকল্প নেই। এমনকি সফরের সময়ও সালাত আদায় করতে হবে। তবে আল্লাহ্ এ সময় কিছুটা ছাড় দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন–

অর্থ ঃ যখন তোমরা জমিনে পরিভ্রমণ করবে, তখন তোমরা নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। যোহর, আসর এবং এশার চার রাকাআতকে সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাআত করে পড়া যাবে। এমনকি যোহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে আদায় করা যাবে।

বিভিন্ন অবস্থায় সালাত : যুদ্ধাবস্থা

নামাযের ব্যাপারে কোনো আরাম-বিশ্রাম নেই এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও সালাত আদায় করতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে আল্লাহ্ আল কুরআনে সে নির্দেশও দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন–

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً ج اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : যদি তোমারা ভয় বা গোলোযোগের আশঙ্কা করো, তবে পায়ে হেটে অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। (সূরা আল-বাকারা-২৩৯)

তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা, বিপদের সময় যুদ্ধের সময় ও সর্বাবস্থায় সালাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। সূরা নিসায় ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا .

অর্থ : যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাকো দাঁড়ানো, বসা এবং শায়িত অবস্থায়। তারপর তারপর মানসিক প্রশান্তি লাভ করার পরে পুরো নামায পড়ে নাও। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (আদায় করা) ফরজ করা হয়েছে।

যুদ্ধের সময় বা অন্য কোনো বিপদের সময় দাঁড়িয়ে, বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। এমনকি অসুস্থাবস্থায়ও। আল্লাহ্ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

অর্থ : তারা (মুমিনরা) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে বসা, শোয়া ও দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে।

বিভিন্ন অবস্থায় সালাত : অসুস্থতা

সহীহ্ আল বুখারীতে আছে–এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো সে পাইলসের সমস্যায় ভুগছে। কীভাবে সে সালাত আদায় করবে? নবী করীম ﷺ বললেন দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। যদি তা না পারো বসে নামায পড়ো, যদি তাতে অক্ষম হও, শুয়ে আদায় করো তাতেও অক্ষম হলে ইশারায় আদায় করো। (বুখারী শরীফ)

সুতরাং কেউ অসুস্থ হলেও নামাযের ব্যাপারে কোনো ওজর নেই। কুরআনে আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান আনে তারা।

আবু দাউদ শরীফের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ـ

অর্থ : যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে এবং রুকূ' করে অত্যন্ত বিনীত অবস্থায়।

আবু দাউদ শরীফের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যে জিনিসের হিসাব প্রথম নেবেন তা হল সালাত।

সালাত মুমিন ও কাফিরের পার্থক্যকারী

নবী করীম ﷺ মুসলিম শরীফে বলেন, একজন কাফের এবং একজন মুসলমানের মাঝে পার্থক্য হলো নামাযের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো।

তাহলে হাদীস অনুযায়ী যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় অথবা তা ছেড়ে দেয়, সে কাফেরের সমান।

পবিত্র কুরআনে রয়েছে –

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ـ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

অর্থ : কোন্ বস্তু তোমাদের দোজখে প্রবেশ করালো? তারা বলবে আমরা নামায পড়তাম না। (সূরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত ৪১-৪৩)

আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۤءِ ـ

অর্থ : হে প্রভু! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করে রাখো এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। তুমি আমার দোআ কবুল করো। (সূরা ইব্রাহিম আয়াত-৪০)

وَمِنْهُمْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

অর্থ : আর তাদের মধ্য হতে কেউ বলবে, হে আমার প্রভু! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও এবং আমাদেরকে দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আল বাকারা-২০১)

অর্থ : কুরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সূরা আল-আনআম-এ আছে–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمُحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থ : আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত আমার কুরবানি, আমার জীবন আমার মৃত্যু সব কিছুই কেবল সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালকের জন্যেই উৎসর্গ করছি। (সূরা আনআম - ১৬২)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. আরবি না বুঝেও নামাযে কেন তা ব্যবহার করা হয়? আমরা কি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারি না? ওয়াহিদা খান– বি.এড

উত্তর : কেন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, বেশির ভাগ মুসলিমই আরবি ভাষা বুঝতে পারেন না। এটা করলে কেমন হয়, আমরা প্রত্যেক এলাকায়ে সালাত নিজস্ব ভাষায় পড়বো। আমি তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলাম যে, আমরা স্থানীয় ভাষায় সালাত আদায় করবো। তাহলে মুম্বাইতে কিছু লোক বলবে, আসুন আমরা ইংরেজিতে পড়ি। কেউ হয়তো বলবে উর্দুতে, কিছু লোক বলবে হিন্দি, কেউ হয়তো বলবে গুজরাটি, তখন সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ সমস্যার সমাধান যদি করি, কেউ হয়তো বলবে, চলুন, এক নম্বর মসজিদে যাই। সেখানে ইংরেজিতে নামায পড়বো, দুই নম্বর মসজিদে উর্দুতে, তিন নম্বর মসজিদে হিন্দিতে, চার নম্বর মসজিদে গুজরাটি আর এভাবেই চলতে থাকবে। তারপরও সেখানে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকবে। কেউ বলবে আমরা এক নম্বর মসজিদে ইংরেজিতে সালাত আদায় করবো। আমরা সেখানে আল্লামা হযরত ইউসুফ আলী আবদুল্লাহর অনুবাদে পড়বো। কেউ বলবে, আমরা পিকটেল-এর অনুবাদ পড়বো, কেউ বলবে আল্লামা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী, আর কেউ বলবে মহসিন খান-এর অনুবাদ পড়বো। তাহলে আবারও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। যদি এটাও মেনে নিই যে, আমরা একটা অনুবাদ পড়বো, তবুও সেই অনুবাদটা হলো মানুষের করা অনুবাদ। এটা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ও নবী করীম ﷺ -এর কথাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। আর এ অনুবাদে অনেক ভুল থাকতে পারে। আর যদি ভুল থাকে তাহলে বলা হবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ভুল করেছেন।

যেমন ধরুন, আপনি যদি দুই নম্বর মসজিদে সালাত আদায় করেন, সেখানে উর্দুতে পড়া হয়। আর ধরুন ইমাম যেখানে সূরা লুকমানের ৩৪ নম্বর আয়াত থেকে তিলাওয়াত করলো। আর যদি উর্দু অনুবাদ পড়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানেনা মায়ের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গটা কী হবে? যদি আরবিতে কুরআন শরীফ পড়েন লিঙ্গ শব্দটা কুরআনের কোথাও নেই। উর্দুতে অনুবাদ করার সময় বেশির ভাগ অনুবাদক এভাবেই করেছেন। আর যদি কোনো ডাক্তার সালাত আদায় করেন তিনি ভাববেন এটা কোন্ ধরনের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না আমাদের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গটা কী হবে এখনতো আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারি সন্তানের লিঙ্গ কি হবে। তাই সে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। আর সেজন্যে আপনি

অনুবাদটা পড়তে পারবেন না। কারণ আপনি যদি কুরআনের ভুল অনুবাদ করেন, সেটা বলা হবে আল্লাহ তাআলা ভুল করেছেন। অথবা কোনো হাদীসে বলা হবে নবী করীম ﷺ ভুল করেছেন। আর আপনি অনুবাদের মাঝে কখনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ পাবেন না যাতে করে মনোযোগ দিত পারেন। যেমন ধরুন, আমি প্রায়ই বিভিন্ন দেশে যাই, আমি যদি ফ্রান্সে যাই। আপনার কথানুযায়ী সেখানে নামায পড়া হবে ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফরাসি ভাষায়। যদি সালাত আদায় করা হয় ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাহলে সেখানে আযানও দেয়া হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় আযান দেয়া হলে আমি হয়তো ভাববো সে কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমি যদি মসজিদে যাই, আর ইমাম যদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় সালাত পড়ান তাহলে বুঝতে পারবো না তিনি কি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, নাকি গল্প করেছেন। আর সালাত যদি আরবিতে হয় আমি যদি ভারতীয় হই তাহলে বুঝতে পারবো তিনি কী পড়াচ্ছেন।

আর আরবিতে আযান পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্যে জাতীয় সঙ্গীত। তাই যে কোনো ভাষার লোক পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় থাকুক না কেন আরবিতে আযান দিলে সে বুঝতে পারবে। কারণ এটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। প্রিয় বোন এজন্যে সবচেয়ে ভালো উপদেশ হলো আমাদের পবিত্র কুরআনের ভাষাটা শিখতে হবে। যদি আমরা আরবিটা নাও বুঝি, তাহলেও অন্তত কুরআনের অর্থটা বুঝতে হবে। যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন সে ভাষায় কুরআনের অনুবাদটা পড়ুন। তাহলে আপনি সালাত আদায়ের উপকারিতা পাবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২. আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম রফিক। আমি একজন ব্যবসায়ী। অনেক অমুসলিম বলে যে, ইসলাম যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে, তখন মুসলমানরা কেন কা'বার সামনে নতজানু হয়?

উত্তর : ভাই, আপনি বললেন, আমরা কা'বা শরীফের কাছে মাথা নোয়াই। যার অর্থ আমরাই সবচেয়ে বড় মূর্তিপূজারি। ভাই আমরা মুসলমানরা মাথা নোয়াই কা'বা শরীফের দিকে। কারণ, কা'বা আমাদের কিবলা বা দিকনির্দেশনা। আমরা কিন্তু কা'বাকে উপাসনা করি না। সালাতের সময় আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করি না। ইসলাম ধর্মে আমরা এক কথায় বিশ্বাস করি। ধরুন, এখন মুসলিমরা সালাত আদায় করবে। কেউ বলবে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াই, কেউ বলবে দক্ষিণে, কেউ বলবে পূর্বে, আবার কেউ বা বলবে পশ্চিম দিকে, তাহলে আমরা কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়াবো। তাই আল্লাহ পৃথিবীর সকল মুসলমানদের কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আপনি থাকেন পশ্চিমে তাহলে পূর্বদিকে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি থাকেন পূর্বদিকে তাহলে পশ্চিমে

ফিরে দাঁড়াবেন, যদি দক্ষিণে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি উত্তরে থাকেন, তাহলে দক্ষিণে ফিরে দাঁড়াবেন (অর্থাৎ কা'বার দিকে)। সব মুসলিম একতার জন্যে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। আর ইতিহাসে মুসলিমরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল। যখন মানচিত্রটি আঁকা হয় সেখানে দক্ষিণ মেরু ছিল উপরে আর উত্তর মেরু ছিল নিচে। আলহামদুলিল্লাহ কা'বা অর্থাৎ মক্কা শরীফ ছিল কেন্দ্রে।

পরবর্তীতে পশ্চিমারা এসে এ মানচিত্রটা দিল পাল্টে। উত্তর মেরু উপরে আর দক্ষিণ মেরু নিচে। আলহামদুলিল্লাহ কা'বা শরীফ এখনো কেন্দ্র বিন্দুতেই রয়ে গেছে। আর মুসলমানরা যখন হজে যায়, তখন তাওয়াফের সময় কা'বার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। আর আমরা এর মাধ্যমে বুঝাই যে, সকল বৃত্তেরই একটা কেন্দ্র থাকে। আমরা ইবাদাত করি কেবল আল্লাহর, আর কারো নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছিলেন হযরত উমর (রা)। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেন, 'তুমি কেবল একটি পাথর, আমার উপকারও করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। হযরত মোহাম্মদ ﷺ যদি তোমাকে চুমু না দিতো। আমি তোমাকে স্পর্শও করতাম না, চুমুও দিতাম না।'

এ হাদীসটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, আমরা কা'বার উপাসনা করি না। আরেকটি উত্তর দিতে পারেন। আমাদের নবীজির সময়ে সাহাবীগণ কা'বা শরীফের ওপরে উঠে আযান দিতেন। আমি তাদের প্রশ্ন করতে চাই, কোনো পূজারি কি তার পূজা করা মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে পূজা করে?

প্রশ্ন ৩. আমার নাম এরশাদ, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ছি। অমুসলিমরা বলে যে, সালাত আসলে এক ধরনের ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উত্তরে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন অমুসলিমরা বলে, সালাত আসলে ব্যায়াম ছাড়া আর কিছু নয়, এর জবাব চেয়েছেন।

সালাত ও ব্যায়ামে একই উপকার ও একই ধরনের দাঁড়ানো, মাথা নিচু করা, আবার উঠানো ইত্যাদি একই ধরনের মন্তব্য করা যায়। ভাই আসলে সালাত ও জিমন্যাস্টিকের বা ব্যায়ামের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সালাতে আমাদের শরীর এবং আত্মার উপকার হয়। ব্যায়ামে আমাদের শরীরের উপকার হতে পারে; কিন্তু আত্মার কোনো উপকার হবে না। সালাতে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন, কিন্তু ব্যায়ামে তা পাবেন না। সালাতে আপনি নড়াচড়া করবেন ধীরে ধীরে ঝাঁকি ছাড়া; কিন্তু ব্যায়ামে নড়াচড়া করবেন ঝাঁকি দিয়ে। সালাতের পর অলসতা দূর হয়ে

যাবে। ব্যায়ামের পর শরীর অবসন্ন হয়ে যাবে। সালাতের পর আপনার কাজ করতে ইচ্ছা করবে। ব্যায়ামের পর আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন, সালাত সব বয়সের মানুষ আদায় করতে পারে; কিন্তু ব্যায়াম সব বয়সের মানুষ পালন করতে পারে না।

সালাতে কোনো টাকা লাগবে না। আর কোনো ভালো জিমন্যাস্টিকে গেলে টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবেন। সালাতের জন্যে কোনো যন্ত্রপাতির দরকার নেই। কিন্তু ব্যায়ামের জন্যে প্রয়োজন হয় যন্ত্রপাতি। যেমন প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি। সালাতে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। এছাড়াও ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি বৃদ্ধি পায়। ব্যায়ামে সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। সালাত আদায় আপনাকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি উন্নত মানুষ হবেন না। অথবা আপনার ন্যায় নিষ্ঠার উন্নতি হবে না। সালাতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি। যেখানে একটি নিয়ত থাকবে। বাহ্যিকভাবে মিল থাকলেও দুটো এক নয়, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আর শত চেষ্টা করেও ব্যায়ামে তা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ৪. আস্‌সালামু আলাইকুম ভাই, আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন? এতে তার কী উপকার হবে?

উত্তর : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন– আমরা যে ইবাদাত করি তা আল্লাহর কী প্রয়োজন অথবা তার উপকারই বা কী? বোন আমরা যখন আল্লাহর প্রশংসা করি অথবা কেউ ধরুন বললো : اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহ মহান। এতে করে আল্লাহ্ আরও সর্বশক্তিমান হবেন না। আপনি ১০ লক্ষ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলেন আর নাই বলেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমানই থাকবেন। আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা তাঁর উপকারের জন্যে করি না। এটার উত্তর দেয়া আছে সূরা ফাতির-এর ১৫ নম্বর আয়াতে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ـ

অর্থ : হে মানবজাতি! তোমরাই তো আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য।

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহর কোনো উপকার হবে না; বরং আমাদেরই উপকার হবে।

আমাদের জন্যে এটাই স্বাভাবিক আমরা উপদেশ মেনে চলবো। আমরা এমন কোনো লোকের উপদেশ মানবো না যে অপরিচিত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী নয়। এজন্যে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। কারণ, তিনি সর্বশক্তিমান, বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞানী এবং

সবার উপরে। আমরা যেন তাঁর নির্দেশগুলো সবসময় মেনে চলি। আর এ কারণেই সূরা ফাতিহায় আছে যা সব সালাতের সময় পড়া হয়।

সূরা আল ফাতিহায় আল্লাহ পাক বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔

এ আয়াতে আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে নিজেদের বুঝাচ্ছি তিনি সর্বশক্তিমান আমরা তার কাছে সব ধরনের সাহায্য চাই। এরপরে আমরা সূরা ফাতিহার অন্য আয়াত পড়ি।

তাঁর কাছে আমরা সৎ সুন্দর পথ কামনা করি। যেমন কুরআনের ভাষায়–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔

সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি আমাদের উপকারের জন্যে, আর তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর বিভিন্ন উপদেশ আমরা চাই।

যেমন ধরুন কোনো ব্যক্তি হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত। এমন সময় কোনো অপরিচিত ব্যক্তি যাকে কেউ চেনে না তার উপদেশ মানবেন, নাকি যিনি বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ তার পরামর্শ গ্রহণ করবেন? আপনি এখানে হার্ট বিশেষজ্ঞ-র কথা গ্রহণ করবেন যিনি একজন ডাক্তার। সেজন্যে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি যাতে করে আমাদের উপকার হবে। কিন্তু আমরা আল্লাহ তাআলার যতই প্রশংসা করি না কেন সেটা যথেষ্ট নয়। সূরা কাহাফের ১০৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۔

অর্থ : (হে মুহাম্মদ!) বলো যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্রের পানি কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারো আনি তাহলেও তা যথেষ্ঠ হবে না।

একই ধরনের কথা সূরা লোকমানের ২৭ নং আয়াতে এসেছে –

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط

অর্থ : পৃথিবীর সব বৃক্ষকে যদি কলম বানাও, আর সাত সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয় তারপরও আল্লাহ তাআলার কথা লিখে শেষ করা যাবে না।

আপনি যতোই প্রশংসা করুন সেটা আসলে যথেষ্ট নয়। তারপরও আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। কারণ এতে তাঁর কোনো উপকার হবে না। বরং আমাদেরই উপকার হবে। আসুন আমরা তাঁর কথাই মেনে নিই। আমরা যেন صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বা সরল পথের উপর থাকতে পারি।

প্রশ্ন ৫. আস্‌সালামু আলাইকুম জাকির ভাই, আমার নাম জাহাঙ্গীর, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার প্রশ্ন হলো– যদি অফিসের সময়-স্বল্পতার কারণে সালাত আদায় করতে না পারি তখন কী করবো?

উত্তর : ভাই, আপনি প্রশ্ন করেছেন– আপনি কী করবেন যদি অফিসের সময় স্বল্পতার কারণে সালাত আদায় করতে না পারেন। যদি আপনি লক্ষ করেন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জন্যে ফরজ। আপনারা দেখবেন যে, ফজরের সালাত ভোরবেলার সালাত। আর এশার সালাত রাতের সালাত– এ দুটোর জন্য অফিস টাইমের কোনো বিরোধ নেই। মাগরিবের সালাতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে যোহরের সালাতের কথা যদি বলেন, এ সালাত আদায় করা যায় অফিসের দুপুরের খাবারের সময়। আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন আসরের ওয়াক্তে। এছাড়া আপনি রাতের বেলায় কাজ করলে অন্যান্য ওয়াক্তের সমস্যায়ও পড়তে পারেন। আর আপনার অফিস সময়ের সাথে সালাতের কোনো বিরোধ হলে আপনার স্যারকে অনুরোধ করবেন দশ মিনিট সময় দেয়ার জন্যে যাতে সালাত আদায় করতে পারেন। তবে বেশির ভাগ মুসলিম সালাতের জন্যে বসের কাছে সময় চাইতে লজ্জা পান।

তবে আমরা অন্যান্য ব্যাপারে অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য যেমন পিকনিকে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে সময় চেয়ে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে আমরা লজ্জা পাই। বেশির ভাগ মুসলিম সালাতের সময় চাইতে হীনমন্যতায় ভোগেন। আর আপনার কর্তা ব্যক্তি যদি অমুসলিম হন আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে তিনি ৯৯% সময়ের অনুমতি দিবেন। তবে অনুরোধ করবেন ভদ্র ও নম্রভাবে। কিছু মুসলিম আছে সালাতের জন্যে এক ঘণ্টা সময় নেন এবং বলেন দূরে একটা মসজিদে গিয়েছিল। তখন স্যার চিন্তা করেন তিনি সালাতে গিয়েছিলেন, নাকি বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমার কোনো আপত্তি নেই যদি মসজিদে যান আর মসজিদ যদি কাছাকাছি হয়। যদি সেটা কাছাকাছি না হয় অনেক দূরে হয়, তাহলে আপনি অফিসে সালাত আদায় করতে পারেন। আপনি একটি জায়নামায যোগাড় করে সেটা আপনার ড্রয়ারে রেখে দিন।

আমি আগেও বলেছি নবী করীম ﷺ সহীহ্ বুখারীতে বলেন, এ পৃথিবীকে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্যে বানানো হয়েছে একটি মসজিদ হিসেবে, একটি সিজদার স্থান হিসেবে। (সহীহ্ বুখারী, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৪২৯)

সেখানে যখনই সালাত আদায়ের ওয়াক্ত আসবে তখনই সালাত আদায় করবেন। আপনি আপনার অফিসে একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। এখন নফল সালাত আদায় করার দরকার নেই। ফরজ সালাত আদায় করেন এবং তার পাশাপাশি সুন্নাত সালাত আদায় করেন। আপনি আরেকটি সমস্যায় পড়তে পারেন। দেখলেন আপনার সামনে একটি ছবি আছে। তখন ছবিটা নামিয়ে ফেলুন অথবা একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। যদি ছবির কারণে সালাত আদায়ে সমস্যা হয় অন্য স্থানে চলে যান। কেন আপনাকে ছবির সামনে সালাত আদায় করতে হবে। আরেকটি স্থানে চলে যান। কিছু মুসলিম আছে অমুসলিম বসের অফিসে জামাআতে সালাত আদায় করে। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখবেন একসাথে সালাতে চলে গেলে অফিসের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এজন্য আলাদা জামাআতে সালাত আদায় করতে পারেন। আর আপনারা দেখবেন এটা সহীহ্ বুখারীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে দু জন ব্যক্তিকে নিয়েও জামাআত হতে পারে।

আর যদি কোনো মুসলিম কাজ করেন নিষ্ঠার সাথে তাহলে কোনো অফিসের অমুসলিমরাই সালাত আদায়ে বাধা দেবে না। যদি কোনো অফিসার একরোখা হন তাহলে আপনি চা-পানে বিরতির পরিবর্তে কিছু সময় চেয়ে নিন। অথবা যদি এভাবে বলেন, ছুটি শেষে আমি দ্বিগুণ কাজ করে দিব বা তিনগুণ কাজ করে দিব বিনা পারিশ্রমিকে। যেকোনো ব্যবসায়ী এটা মেনে নেবেন। আপনি দশ মিনিট ছুটি নিয়ে আধঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করে দিবেন।

আর যদি আপনার স্যার চরমপন্থী হন, নামাযের সময় না দেন তাহলে আপনার জন্যে উত্তম হলো চাকুরিটা বদলানো। সালাত আদায় করা ফরজ। যদি স্যার সময় না দেন তাহলে চাকুরিটা ছেড়ে দিন, হয়তো আল্লাহ্ তাআলা আপনার জন্যে তার চেয়ে ভালো চাকুরির ব্যবস্থা করবেন। সেখানে আপনি বেশি আয় করবেন। তবে নতুন চাকুরিতে আপনি বেশি বেতন পান আর না পান, সালাত আদায় করলে আপনি পরকালে উপকার পাবেন। চাকুরির কারণে সালাত আদায় না করলে সে উপকারটা আপনি পাবেন না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম অফিসেও দেখবেন, সেখানে বেশির ভাগ কর্মচারী মুসলিম। কিন্তু সালাত আদায় করে না। একাও করে না, জামাআতেও করে না।

আমি অনুরোধ করবো, আপনারা যারা মুসলিম নিজেরা এবং আপনাদের কর্মচারীরা সকলেই সালাত আদায় করবেন। আর আপনারা এভাবে ব্যবস্থা করে নেন যাতে

অফিসে কাজেরও কোনো সমস্যা হবে না। আর একটা সময় দেখবেন যদি কর্মচারীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন, এতে আপনার ব্যবসার উন্নতি হবে এবং আপনি আরো উন্নতি লাভ করবেন জামাআতে নামায আদায় করে না এমনকি একাও পড়ে না, সেই মুসলিম অফিসকর্তাদের উচিত তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে নামায আদায় করা। এতে তার অফিসের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং তাদের নিয়ে নামায পড়ার কারণে বেশি লাভবান হবেন। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৬. মুসলমান মহিলারা কীভাবে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি পাবে?

উত্তর : কুরআনে এমন কোনো দলিল নেই যা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে। এমনকি কোনো হাদীসও নেই যেখানে বলা আছে মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে না। বরং এর বিপরীতে অনেক হাদীস আছে। সহীহ্ আল বুখারী শরীফে আছে 'যখন তোমার স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চায় তখন তাদের নিষেধ করো না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, সালাতের বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় ৮৪, হাদিস নং ৮৩২)

এমনকি সহীহ্ আল বুখারীতে আছে–

'যদি তোমার স্ত্রী রাতের বেলায়ও মসজিদে যেতে চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দাও।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, সালাতের বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় ৮০, হাদিস নং ৮২৪)

মুসলিম শরীফে আরো আছে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহিলাদের জন্যে মসজিদে সবচেয়ে ভালো স্থান হচ্ছে তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে, আর পুরুষরা শেষ লাইনে দাঁড়াবে। অথবা পুরুষরা প্রথম লইনে দাঁড়ালে মহিলাদের জন্যে ভালো হলো শেষ লাইনে দাঁড়ানো। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৮১, সালাত, হাদিস নং ৮৮১)

এ হাদীসে একসাথে নামায আদায়ের ইঙ্গিত দেয়া আছে।

মুসলিম ও বুখারী শরীফে আরো আছে–

'আল্লাহর বান্দাহদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত করো না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ১৭৭, সালাত অধ্যায়, হাদিস নং ৮৮৪)

সহীহ্ মুসলিমে আরো আছে।

'তোমরা মসজিদের ভেতরে মহিলাদের জায়গা কেড়ে নিও না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ১৭৭, হাদিস নং ৮৯)

যার অর্থ রাসূল ﷺ -এর সময়ে মহিলারা মসজিদে যেতেন। এবং রাসূল ﷺ কখনো মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু মহিলারা মসজিদে গেলে তারাও সমান সুবিধা এবং নামাযের পৃথক ব্যবস্থা পাবে।

মহিলা-পুরুষরা একসাথে নামায আদায় করবে না। এতে কিছু মানুষ নামাযের নামে সমস্যার তৈরি করবে। মহিলাদের জন্যে আলাদা প্রবেশ করার এবং নামায পড়ার

ব্যবস্থা থাকবে। আর মহিলারা পুরুষের সামনের লাইনে থাকবে না। এতে অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যাবে। তবে মহিলাদের সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। যদি আমরা লক্ষ করি, সৌদি আরবে মহিলারা মসজিদে যায় এমনকি হারামাইন শরীফ (মক্কা) এবং মসজিদে নববীতেও মহিলারা নামায পড়েন। আমেরিকায়, বৃটেনে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। কেবল ভারতে অধিকাংশ মসজিদে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দেয় না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যতদূর জানি মুম্বাইতে কিছু মসজিদ আছে যেখানে মহিলারা যেতে পারেন। এমনকি কেরালাতে প্রায় পাঁচশ মসজিদে মহিলাদের আলাদা নামাযের ব্যবস্থা আছে। আশা করি সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী মুম্বাইতেও মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হবে না। উত্তর পেয়েছেন আশা করি।

প্রশ্ন ৭ : আমার নাম শেখ আহমদ। আমি চাকুরি করি। আমরা তাকবীর দিতে গিয়ে হাত উপরে তুলি। এর গুরুত্বটা কী?

উত্তর : ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন– সালাত আদায় করার সময় আমরা হাত উপরে উঠাই। এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে। হাত হলো ক্ষমতা এবং শক্তির একটি প্রতীক। আমরা মুসলমানরা যখন সালাতের সময় হাত ওঠাই এটা তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটি হচ্ছে হাত উত্তোলনের মাধমে আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি। হাত উত্তোলনের মাধ্যমে বুঝাই– হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। যেমন আমরা কাউকে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে বলি Hands up যেমন পুলিশ বলে গ্রেফতারকৃতদের উদ্দেশে। এর মানে 'আত্মসমর্পণ' করতে বলা হচ্ছে। তাই আমরা যখন হাত তুলি তখন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

এছাড়াও এটা দ্বারা আরো বুঝায় আমরা আমাদের মুখের কথা ও কাজের দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্বকে প্রমাণ করছি। اَللّٰهُ اَكْبَرُ – অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এটা দ্বারা আরো বুঝায় জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমি আমার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি এবং আমি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোযোগ পেশ করছি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৮. আমার নাম ইউসুফ দিসায়ী। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমার প্রশ্ন, নবীজির জীবনের কোন্ সময়টাতে আল্লাহ্ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন? আর শবে মিরাজের সাথে সালাতের সম্পর্কটা কী? আমার ধারণা, প্রশ্ন দুটো প্রাসঙ্গিক তাই একসাথে বললাম।

উত্তর ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন যে, ঠিক কোন্ দিন কোন্ সময়ে আমাদের নবীজিকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর শবে মিরাজের সাথে সালাতের সম্পর্কটা কী? ভাই জন্ম এবং মৃত্যুর দিনটা আমরা যেভাবে সঠিকভাবে

জানি, সালাত ফরজের সঠিক দিনটি সেভাবে জানি না। তবে নির্দেশটা এসেছিল নবুয়ত লাভের প্রথম দিকে। কারণ, একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, ফেরেশতাদের প্রধান হযরত জিবরাঈল (আ) নবীজিকে সালাতের নিয়মটা দেখিয়েছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে তার পা মাটিতে রাখলেন আর তা থেকে পানি বের হয়ে আসতে লাগলো। জিবরাঈল (আ) নবীজিকে অজু করার নিয়মটা দেখালেন। আর সালাত আদায়ের নিয়মটাও দেখালেন। তিনি এ কাজগুলো হুবহু বিবি হযরত খাদিজা (রা)-এর সামনে করে দেখালেন। এ থেকে বুঝা যায় নবীজি এ নির্দেশটা পেয়েছিলেন নবুওয়াতের প্রথম দিকে।

এবার কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ শবে মিরাজের ব্যাপারে বলি। এ ঘটনাটি উল্লেখ আছে পবিত্র কুরআনে সূরা বনি ইসরাঈলের ১ নং আয়াতে। আমাদের নবীজি ভ্রমণ করেছিলেন মসজিদে হারামাইন থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। সহীহ্ বুখারীসহ আরো অন্যান্য হাদীসে আছে, নবীজি সেখানে দেখা করেছিলেন মুসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সাথে। আল্লাহ্ তাআলা সেখানে নবীজিকে নির্দেশ দিলেন যে মুসলিমরা দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে সহীহ্ বুখারী অনুযায়ী তারপর মুসা (আ) নবীজিকে বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় মুসলমানদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে এটা কমিয়ে নেন। নবীজি সালাতের ওয়াক্ত কমাতে গেলেন এবং সবশেষে দিনে পাঁচবার সালাতের নির্দেশ পেলেন। আর আল্লাহ্ বললেন, এই পাঁচ ওয়াক্তের মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৯. আমি একজন মহিলা। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কেন আমাদের দু'আর উত্তর দেন না অথবা সব দোয়া কবুল করেন না কেন?

উত্তর : এ প্রশ্নটার উত্তর পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয় সম্ভবত তোমরা যেটা নিজেদের জন্যে কল্যাণকর মনে করো, সেটা হতে পারে

অকল্যাণকর। আবার যেটা তোমরা নিজেদের অকল্যাণ মনে করো সেটা তোমাদের জন্যে হতে পারে কল্যাণকর। আল্লাহ সবকিছু জানেন আর তোমরা জানো না।

যেমন ধরুন একজন ধার্মিক লোক দুআ করলো আল্লাহ আমাকে একটি মটর সাইকেল দাও। যাতে আমার যাতায়াত সুবিধা হবে। আর আল্লাহ সে দুআ কবুল করলেন না। আপনি হয়তো বলবেন সে খুব ভালো লোক, ধার্মিক লোক, তার দুআ কেন কবুল হলো না? আল্লাহ তাআলা জানেন যদি লোকটার মটর সাইকেল থাকে তাহলে সে দুর্ঘটনায় পড়তে পারে এবং পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আর পবিত্র কুরআন বলছে, 'তোমরা যেটা পছন্দ করো সেটা অকল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।'

এবার খুব ধনী একজন ব্যবসায়ী যিনি লন্ডনের একটি ফ্লাইট ধরতে এয়ারপোর্ট যাচ্ছিলেন একটি চুক্তি করার জন্যে, চুক্তিটি করলে তার লাভ হবে ১০০ কোটি রুপি। যখন তিনি এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাস্তায় খুব বড় একটি যানজট ছিল। তাই তিনি সময়মতো এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে পারলেন না। তিনি যখন পৌঁছলেন ততক্ষণে ফ্লাইটটি উড়াল দিয়েছে। তিনি তখন বললেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে একটি বাজে ঘটনা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে যে রেডিওটি ছিল তাতে সর্বশেষ খবরটি শুনলেন– তিনি যে ফ্লাইট ধরতে চাচ্ছিলেন সেটা ক্র্যাস করেছে এবং বিমানে যে কয়জন যাত্রী ছিল তারা সকলেই মারা গেছেন। তখন সেই ব্যবসায়ী বললেন, এ ঘটনা হলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি ঘটনা। কিছুক্ষণ আগেই ট্রাফিক জ্যামকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। কারণ এটার কারণে তার ১০০ কোটি রুপী লোকসান হয়েছে।

আর এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি সে ট্রাফিক জ্যামকে ধন্যবাদ জানালেন। কারণ, এতেই তার জীবনটা বেঁচে গেছে। পবিত্র কুরআন বলছে যেটা তোমরা কল্যাণকর মনে করো সেটা অকল্যাণ হতে পারে। আর আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না। আল্লাহ জানেন সেই ব্যক্তির জীবন তার ১০০ কোটি রুপীর চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। আপনি যে দু'আ করেন অনেক সময় দেখা যায় আল্লাহ তাআলা সে দুআটি পূরণ করছেন না। তিনি সে দু'আ কবুল করেন না। আর পবিত্র কুরআনে সূরা শূরার ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ -

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যদি তার সকল বান্দাকে জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিতেন, তাহলে এরা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।

কিন্তু আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমতো পরিমাণেই নাযিল করেন এবং তিনি জানেন তিনি কী দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– যখন মানুষ আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করবে, তাদের বলো আমি তাদের নিকটেই আছি। তাদের খুব কাছেই আছি এবং আমি আমার ভৃত্যদের সব আহ্বান শুনতে পাই।

পবিত্র কুরআনের সূরা গাফেরের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ

অর্থ : আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।

মানুষ ভাবতে পারে এ আয়াতটির কথা পূরণ হবে না। যদি দুআ কবুল না হয়। যদি আপনি ভালো করে লক্ষ্য করেন আপনি দেখবেন আল্লাহ তাআলা প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর না দেয়ার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ জানেন কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ আপনার জন্যে। আর কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো বলবে, আমরা অনেক অবিশ্বাসীকে দেখেছি, অধার্মিক মানুষ যারা ভুল ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। অবিশ্বাসীরা নকল ঈশ্বরের উপাসনা করে টাকার জন্যে, আর তারা সম্পদশালী হয়। যদিও এসব অধার্মিক ও অবিশ্বাসী লোকেরা নকল ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন জিনিসের প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে থাকেন। কারণ তিনি জানেন তারা সেটার প্রার্থনা করছে ভবিষ্যতে এদের দ্বারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরকালে এসবের জন্যে তারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্যে এটা কোনো ব্যাপারই না যে, সে ধনী না গরিব, এখন তার সুসময় না দুঃসময়। আর তারপর আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সেইসব লোক যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় করে ও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে স্মরণ করা, যাকাত প্রদান করা, সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেকের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তারা শুধু আখিরাতে ভয় করে, রোজ কিয়ামতের দিন যেদিন আমাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসী সব সময়ই বলে আলহামদুলিল্লাহ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন। 'আলহামদুলিল্লাহ' মানে 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে'। এমনকি তার যদি ক্ষতিও হয় সে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আর আল্লাহ তাআলা যখন তার ক্ষতিটা হতেই দিলেন এতে করে ভবিষ্যতে তার উপকারই হবে। এক কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাসী মনে করে যা কিছু হয়েছে তা ভালোর জন্যেই হয়েছে।

প্রশ্ন ১০. আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার নাম বাইয়ার। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। জুমার খুৎবা এটা সালাতের অংশ নয়, এটা আরবি ভাষায় দেয়া কি আবশ্যক?

উত্তর : জুমার খুৎবা আরবিতে দেয়া প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। এখানে কেবল ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, আরবিতে পড়া অত্যাবশ্যক। অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞরা যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেছেন এটা যেকোন ভাষায় পড়া যাবে। জুমার খুৎবার মাঝে যে বিষয়গুলো থাকতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা আমাদের নবীজির জন্যে দু'আ করা আর জুমআর খুৎবায় যে সকল আরবি আয়াতগুলো পড়া হয় সেগুলো অবশ্যই আরবি হতে হবে। বাকি অংশটা যেকোন ভাষায় হতে পারে। আর এমন কোনো সহীহ্‌ হাদীস খুঁজে পাবেন না, যেখানে নবীজি বলেছেন যে, জুমার খুৎবা অন্য ভাষায় দেয়া যাবে না। তবে আমি এটাও জানি নবীজি সকল সময় আরবিতে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ সে সময় আরব দেশের লোকেরা কেবল আরবি ভাষা বুঝতে ও পড়তে জানতো। তাই নবীজিও কেবল আরবি ভাষায়ই খুৎবা দিয়েছেন। কিন্তু কোনো হাদীসই বলছে না আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না। নবীজি কোনো লোককেই বলেন নি যে, আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না।

জুমার সময় খুৎবা দেয়ার কারণ হলো, এতে করে সমবেত লোকদের আল্লাহ এবং নবীজির নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা যায়। এছাড়াও এতে সমবেত লোকজন জানতে পারে আশে-পাশে কী ঘটনা ঘটছে। এক কথায় খুৎবার মাধ্যমে মুসলমানদের পথনির্দেশনা দেয়া হয়। এটা খুবই অযৌক্তিক হবে যদি বলি যে, আমি কাউকে এমন ভাষায় উপদেশ দিব যে ভাষাটা সে বোঝে না। বাস্তবক্ষেত্রে আপনি কাউকে উপদেশ দিবেন এমন ভাষায় যে ভাষাটা সে বোঝে। আপনি যদি আমেরিকায় যান তাহলে দেখবেন আমেরিকার অনেক মসজিদেই ইংরেজিতে খুৎবা দেয়া হয়।

এ পৃথিবীতে এমন অনেক মসজিদ আছে যেখানে খুৎবা দেয়া হয় স্থানীয় ভাষায়। আমেরিকা, বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অনেক স্থানেই খুৎবার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। যদি আপনি আরব বিশ্বে যান, যেহেতু সেখানকার মানুষ আরবি বুঝে তাই সেখানকার খুৎবা আরবিতে হয়। তবে কিছু দিন আগে আমি কুয়েতে গিয়েছিলাম যদিও সেখানকার বেশির ভাগ মানুষ আরবি বুঝে তারপরও কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজিতে। কিছু মসজিদে খুতবা দেয়া হয় উর্দুতে, কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় মালায়ম এবং অন্যান্য ভাষায়। মসজিদগুলোকে সরকার বিশেষভাবে

অনুমতি দিয়েছে যাতে করে বিদেশী লোকজন যে সকল ব্যক্তি কুয়েতের নাগরিক নন যারা বিভিন্ন দেশ থেকে কুয়েতে এসেছে চাকুরি করার জন্যে, তাদের জন্য এ খুৎবার ব্যবস্থা। তাহলে খুৎবা যেকোনো ভাষায় দেয়া যাবে। কিন্তু এখানে শর্ত হলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসা আরবিতে হতে হবে।

আর নবী করীম ﷺ-এর জন্যে দু'আও আরবিতে হতে হবে। খুৎবার সময়ের দু'আ আরবিতে হতে হবে। এই দুআয় মাত্র কয়েকটা আয়াত আরবিতে রয়েছে। খুৎবার সময় সেটার অনুবাদও করতে পারেন। তাহলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তাই মানুষকে বুঝাতে হবে খুৎবার ভাষা স্থানীয় হলে সমস্যা নেই। আর ভারতবর্ষে ও বিদেশে যে সকল মসজিদ ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোতে আরবিতে খুৎবা দেয়া হয়। কিছু মসজিদে দেখবে ফ্রি খুৎবা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়, কিছু মসজিদে খুৎবার অনুবাদ করা হয় জুমুআর সালাতের পর। তাই আমি ভারতের জন্যে দুআ করবো আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াত করেন। যাতে করে খুৎবা স্থানীয় ভাষায় হয় এবং আমরা খুৎবার মাধ্যমে সঠিক নির্দেশ পেতে পারি।

প্রশ্ন ১১. ভাই জাকির, আমি আব্দুল্লাহ। আমি একজন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী। আপনি বললেন মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। এছাড়াও বললেন মিরাজের বিভিন্ন ঘটনা। কীভাবে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশটা পেলাম। আমরা কিছু মানুষকে দিনে তিনবার সালাত আদায় করতে দেখি। এভাবে সালাত আদায় করার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?

উত্তর : আমি আগেও বলেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। আল-কুরআনে এ কথার উল্লেখ আছে। কিছু মানুষ তিন ওয়াক্ত নামায পড়ে এর কোনো যুক্তি আছে কি-না? পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবো। তবে এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। সূরা ত্বহার ১৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা–রুম এর ১৭-১৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এ আয়াতগুলো পড়েন যেখানে আমাদের বলছে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা উচিত। তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তোমরা সফর করনে তখন তোমরা সালাত সংক্ষিপ্ত করতে পারো। আমি আগেও বলেছি যোহর, আসর ও এশার সালাত চার রাকআতের বদলে দুই রাকআতও পড়া যায়। আর যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমরা দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়তে পারো। যোহর ও আসরের সালাত, এছাড়াও মাগরিব ও এশার সালাত একসাথে পড়তে পারেন। এভাবে দুই ওয়াক্ত একসাথে পড়লে ঠিক আছে। সফরের সময় কেউ এভাবে সালাত আদায়

করলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। এমনকি হাদীসও বলছে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে। একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, লোকজন মাগরিবের সালাতের পর এশার জামাআতের জন্যে আসতে পারবে না। নবীজি তাই দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে পড়লেন। তাহলে কোনো বিপর্যয় হলে, কোনো অসুবিধা হলে নবীজি দুই ওয়াক্ত একসাথে আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে আমাকে তো অফিসে যেতে হবে সেজন্যে আমি আসরের সালাত আগে পড়ে নিব। অথবা আপনি কেনাকাটা করতে মার্কেটে গেছেন। সেখানে কিছু সময় লাগবে। তাই আপনি যোহর ও আসর একসাথে পড়ে নিলেন। এটার অনুমতি নেই। সফরের সময় অথবা যখন সত্যিই অসুবিধায় পড়বেন তখন অনুমতি আছে। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১২. পৃথিবীর প্রথম আযান কে দিয়েছিলেন? কোথায় দিয়েছিলেন? আর এ আযান কোন্ দেশ থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তর : আযান শুরু হয়েছিল আরব দেশে, আরবের মদীনায়। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে মদীনায় মসজিদ তৈরি করার পর নবীজি এবং সাহাবীরা সালাতের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন কীভাবে মানুষকে আহ্বান করা হবে। কেউ কেউ বললো, ড্রাম বাজাও, কেউ বললো, শাঁখ বাজাও। একেকজন একেক কথা বললো। হাদীস বলছে তখন একজন লোক তার স্বপ্নের মধ্যে আযান শুনলো। সে শুনলো আযানের আওয়াজ যেটা আমি আগে বলেছিলাম মানুষের কণ্ঠে। খবরটা তখন নবীজির কাছে পৌঁছে গেল। আর নবীজি বললেন, সে যে কথাগুলো শুনেছে সেগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে। আর সালাতের জন্যে মানুষকে আহ্বান করতে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই, যেখানে সবাইকে ডাকা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ দিয়ে। এজন্যে তখন নবীজি আদেশ দিলেন যখন মানুষকে সালাতের জন্যে ডাকবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করবে। ড্রাম, শাঁখ ইত্যাদি ব্যবহার করো না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১৩. এ প্রশ্নটা করেছেন ভাই আব্দুল্লাহ। সালাত আদায়ের অনেক নিয়ম রয়েছে। এর সবই কি ঠিক? নাকি সালাত আদায়ের কোনো বিশেষ নিয়ম রয়েছে?

উত্তর : যদি আপনি মার্কেটে যান যেখানে কয়েক শত বই রয়েছে সালাতের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে। বেশিরভাগ বইতেই কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো সহীহ্ হাদীস নয়। বেশিরভাগ বইয়ে সালাত আদায়ের কেবল একটি নিয়মই রয়েছে। আমাদের নবীজি বলেছেন এটার উল্লেখ আছে। (সহীহ্ বুখারী)

'সালাত আদায় করো সেভাবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।' আমরা সালাত আদায় করবো সেই নিয়মে যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করেছেন। সালতের অন্য কোনো নিয়ম নেই। তাহলে সালাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো যেমন কীভাবে হাত বাঁধতে হবে, রুকূ' করতে হবে, সিজদা দিতে হবে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি এসব ব্যাপারে মাত্র একটাই নিয়ম আছে। একটাই পদ্ধতি। আর সহীহ্ হাদীসে এ নিয়মগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সালাতের কিছু কিছু ব্যাপারে এ নিয়মগুলো কিছুটা শিথিল। যেমন ধরুন আমরা রুকূ'তে যেটা পড়ি সহীহ্ হাদীস বলছে কখনো কখনো নবীজি বলেছেন- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ। অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুমহান।' কোনো কোনো সময় বলেছেন- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِكَ অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুমহান, সমস্ত প্রশংসা তাঁর।'

তাহলে এমন কিছু নিয়মের ব্যাপারে শিথিলতা আছে যেগুলো আমাদের নবীজি করেছেন রুকূ'র সময়, সিজদার সময়। যেমন ধরুন বিতরের সালাতের বিজোড় রাক'আতের সালাত আদায় করতে হয়। নবীজি কখনো পড়েছেন এক রাক'আত, তিন রাক'আত, পাঁচ রাকআত, সাত রাক'আত। তবে বেশির ভাগ সময়ই পড়েছেন তিন রাক'আত। তাহলে এমন কিছু ব্যাপারে শিথিলতা আছে। যখন আপনি রুকূ'তে অথবা সিজদায় গিয়ে কিছু পড়ছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ দেহের অঙ্গ-ভঙ্গি যেভাবে দাঁড়াবেন, যেভাবে বলবেন, যেভাবে মাথা নোয়াবেন, যেভাবে একটাই। আর এগুলো উল্লেখ করা আছে সহীহ্ হাদীসে। আর এখানে আমি যে বইটার কথা বলতে পারি বইটা মার্কেটে পাবেন। এ বইটা খুবই সংক্ষিপ্ত খুবই ছোট। এখানে আপনারা পাবেন সহীহ্ হাদীস, বইটির নাম 'The Guide to Salah' written by MA Sakib. আপনাদের যদি বেশি সময় থাকে আর বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে আরেকটি বইয়ে বিস্তারিত আছে। কীভাবে সিজদায় যাবেন, কোন্ অঙ্গ প্রথম মাটিতে স্পর্শ করবে, কীভাবে উঠে দাঁড়াবেন। এসব কিছু বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'The payer of the Prophet'.

সালাতের বিভিন্ন নিয়ম এখানে বিস্তারিতভাবে পাবেন, লিখেছেন শেখ মোঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী। বইটিতে সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি পাবেন। এ বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো যে সালাত আদায়ের সময় এ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিয়মমাত্র একটাই, আপনারা যদি বইগুলো পড়তে চান তাহলে যোগাযোগ করুন আমাদের Islamic Research Foundation-এর লাইব্রেরিতে। সেখানে আপনারা এ বইগুলো পাবেন।

প্রশ্ন ১৪. 'আমার নাম জগবন্ধু সিধু। ইসলাম সম্পর্কে আমি খুব কম জানি। আমার আজকের প্রশ্নটাও সালাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, প্রশ্নটা কি করতে পারবো?' আপনার প্রশ্নটা আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আমি প্রশ্নের উত্তরটা অনেকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু উত্তরটা সেভাবে পাইনি।' আপনি প্রশ্নটা করতে পারেন। আমি এটাই আশা করছিলাম। দুটো প্রশ্ন না আপনি একটি প্রশ্ন করবেন একটার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছি, আর না ঠিক আছে, আমি এ প্রশ্নটা আগে আমার কয়েকজন বন্ধুর কাছে করেছি এবং মোহাম্মদ আলী রোডে কয়েকজন ইমামের কাছেও করেছি। আর আমি যতটুকু জানি الم। حم . নবীজি এ শব্দগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দেননি। এগুলোর ব্যাপারে কি সাহাবীরা কিছু জানতেন? এগুলো কি কেউ জানতো না? নাকি কখনো বলা হয়নি? নাকি কেউ জানেনা? ঘটনাটা কী? الم। এরপর থেকেই কুরআনের শুরু?

উত্তর : ভাই আপনি অনেক মুসলিম ও ইমামের কাছে এ প্রশ্ন করে উত্তর পাননি। এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো সম্পর্কে আপনি বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে আমার ভিডিও আছে সেখানে জানতে পারবেন। তারপরও আপনি যেহেতু সংক্ষেপে প্রশ্ন করেছেন তাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যেগুলো পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু সূরার পূর্বে আছে। এগুলো কুরআনের ২৯টি সূরার পূর্বে আছে। যদি আরবি হরফগুলো গুনেন ا . ب . ت . ث . ج। এ রকম ২৯টি অক্ষর।

আর পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার কোনোটির পূর্বে একটি অক্ষর ص কোনোটির পূর্বে দুটি অক্ষর حم আবার কখনো তিনটি অক্ষর الم। কখনো চারটি, কখনো পাঁচটি। আর এ ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিছু মানুষ বলে এ অক্ষরগুলো আল্লাহ তাআলার সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার কিছু লোক বলে এটা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সিফাত। কিছু লোক বলে এটা আল্লাহর নাম, কিছু লোক বলে হযরত জিবরাঈল (আ) এটার মাধ্যমে নবীজির মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আর নবীজি এগুলো বলে অন্যান্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এরকম আরো অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। আর সবচেয়ে খাঁটি ও সঠিকটা হলো এই যে, এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যদি আপনারা ভালো করে দেখেন, এগুলো অনেক সূরার প্রথমে রয়েছে। এগুলো দিয়ে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় আছে। চেষ্টা করে কুরআনের মতো একটা বই লেখ। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয়েও তারা কুরআনের মতো আরেকটি বই রচনা করতে পারবে না।

পবিত্র কুরআনের সূরা তূরের ৩৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে–

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ ـ

অর্থ : তোমরা কুরআনের মতো আরেকটি বই রচনা করতে পারবে না।

সূরা হুদ-এর ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ ـ

অর্থ : তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে কুরআনের মতো ১০টি সূরা রচনা কর।

এছাড়া সূরা ইউনুসের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ ـ

অর্থ : তোমরা পারলে কুরআনের মতো আরেকটি সূরা রচনা করো।

আর এ চ্যালেঞ্জটা আস্তে আস্তে সহজ হয়েছে। এর চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটা করা হয়েছে সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতে।

আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তাহলে এর মতো একটি সূরা অবতীর্ণ করে দেখাও তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের অন্য অভিভাবকদের ডাকো।যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, আর তোমরা যদি তা না পারো, আসলে তোমরা কখনোই পারবে না। সুতরাং তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এখানে মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন পবিত্র কুরআনের মতো একটি সূরা রচনা করতে।

তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যখন বলছেন الم । حم ـ يس ـ তিনি এখানে বলছেন আরবদের। কুরআন নাযিল হয়েছিল আরবি ভাষায়। কারণ সেখানে স্থানীয় লোকদের ভাষাও ছিল আরবি। তাই আল্লাহ্ এখানে পরোক্ষভাবে বলছেন, আরবিতো তোমাদেরই ভাষা যে অক্ষরগুলো নিয়ে তোমরা খুব গর্ব করো।) কারণ কুরআন যখন নাজিল হয়েছিল আরবরা তাদের ভাষা নিয়ে খুব গর্ব করতো। আরবি

ভাষা ছিল তখন উন্নতির চরম শিখরে। তখন আরবরা যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করতো সেটা তাদের ভাষা। তখন ছিল সাহিত্যের যুগ। তারা সাহিত্যে খুবই উন্নত ছিল। তাই আল্লাহ বলেছেন এগুলো তোমাদের ভাষার অক্ষর, এগুলো নিয়ে তোমরা খুব গর্ব করো। আমি রচনা করেছি তোমাদের জন্যে এ পবিত্র কুরআন। আল্লাহ পৃথিবীর সব মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রয়োজনে জ্বিনদের সাহায্য নিতে বলেছেন। তবে আল্লাহ ব্যতীত পারলে তোমরা একটি সূরা তৈরি করো। পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা মাত্র তিনটি আয়াত দশটি শব্দ। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন যে, তোমরা যদি সক্ষম হও এমন একটি সূরা তৈরি করো।

তাহলে আল্লাহ যখন বলছেন الم। حم. এভাবে যখন আল্লাহ এগুলো ব্যবহার করেছেন দেখবেন এরপরই পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন ধরুন সূরা আল-বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে –

الٓمٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : الم। এটাই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশক।

তাহলে যখনই এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো আসবে তারপরেই দেখবেন সেখানে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাহলে যখনই এ অক্ষরগুলো দেখবেন মনে করিয়ে দিচ্ছে এগুলো আল্লাহর কালাম। আর এখানে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে পবিত্র কুরআনের মতো করে একটি সূরা রচনা করো। তোমরা এটা করতে পারবে না। এ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। তবে অনেকেই চেষ্টা করেছে। অনেক অমুসলিম চেষ্টা করেছে তারা এখনো পর্যন্ত পারেনি। আর ভবিষ্যতেও কেউ ইনশাআল্লাহ পবিত্র কুরআনের মতো সূরা রচনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন ১৫. পুরুষ এবং মহিলারা যখন সালাত আদায় করে তখন আলাদা নিয়মে কেন আদায় করে?

উত্তর : আমি আগেও বলেছি, বাজারে অনেক বই পাবেন যেখানে সালাত আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দেয়া আছে। বেশির ভাগ বইয়েই আলাদা একটা অধ্যায় থাকে যে, মহিলারা কীভাবে সালাত আদায় করবে এবং পুরুষরা কীভাবে সালাত আদায় করবে। আর সেখানে নিয়মগুলোও আলাদা। সত্যি বলতে এমন একটি সহীহ্ হাদীসও খুঁজে পাবে না, যেটা বলছে মহিলারা সালাত আদায় করবে পুরুষদের থেকে ভিন্ন নিয়মে। এমন কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।

আর আপনারা যদি সহীহ্ বুখারী পড়েন এক নম্বর খণ্ডে পাবেন, হযরত উম্মে দারদা (রা) তাশাহহুদে বসেছিলেন পুরুষদের মতো করে। (সহীহ্ বুখারী)

আর তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন, এরকম আরো অনেক সহীহ্ হাদীস আছে যেগুলোর বর্ণনা দিয়েছিলেন হযরত আয়েশা (রা) ও নবী (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীরা আর অন্য মহিলা সাহাবীরা। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন।

আর এর উল্লেখ আছে সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফে। তবে তাদের কেউই বলেননি পুরুষ এবং মহিলাদের সালাত আদায় করার নিয়ম একেবারে আলাদা। উত্তরটা খুব পরিষ্কারভাবে দেয়া আছে আমার লেকচারে আগেও বলেছি। নবী করীম ﷺ বলেছেন ইবাদাত করো সেভাবে যেভাবে আমাকে ইবাদাত করতে দেখো। (সহীহ্ বুখারী) তাহলে পুরুষ এবং মহিলারা সালাত আদায় করবে একই রকম নিয়মে এবং একই পদ্ধতিতে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১৬. আস্সালামু আলাইকুম, ভাই সালাত আদায় করা কি আবশ্যক? নিজের মতো করে প্রার্থনা করা যাবে না? আল্লাহ্ কী সেটা কবুল করবেন না? পূর্বের নবী রাসূলরাও কি আমাদের মতো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন– আমরা কি সেভাবে সালাত আদায় করবো যেভাবে কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে। নাকি নিজের মতো করে আদায় করা যাবে। আর পূর্বের নবী রাসূলরাও কি এ নিয়মে সালাত আদায় করতেন?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দিই, আল্লাহ্ তাআলার সকল রাসূলই সালাত আদায় করেছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই সিজদা দিয়েছেন যেটা সালাতের প্রধান অংশ। তবে আমরা যেভাবে সালাত আদায় করি সকল রাসূল হয়তো সেভাবে সালাত আদায় করেননি। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার তিন নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ : আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণাঙ্গ করলাম, আর তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে স্থির করে দিলাম ইসলামকে।

পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর আমাদের দীন সম্পন্ন হয়েছে। আর এর আগে রাসূলগণ সালাত আদায় করেছেন, সিজদাও দিয়েছেন। তবে সব নিয়ম-কানুন হয়তো এক রকম ছিল না, হয়তো কিছু গড়মিল ছিল। এ সম্পর্কে আগেও বলেছি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি ইত্যাদি। হয়তো মিল ছিল কিন্তু একই নিয়ম ছিল না।

এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলি যে, আমাদের ইচ্ছেমতো কি সালাত আদায় করতে পারি? কেন একই নিয়মে সালাত আদায় করতে হবে? আমি কারণটা বলেছিলাম কেন আমরা একই নিয়মে সালাত আদায় করি? সামাজিক উপকার পাবো, আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে যাবে, আমাদের একতা বাড়বে, আমাদের সাম্যতা বাড়বে। যদি বলেন চেয়ারে বসে আমি বাসায় সালাত আদায় করবো, তাহলে এসকল উপকারগুলো পাবেন না। সামাজিক সাম্যতা ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আত্মার উন্নতি। সালাতের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি। নিয়ম মানলে এ উপকারগুলো পাবেন। কিন্তু আপনার নিয়মে সালাত আদায় করলে এ উপকারগুলো পাবেন না। আর এ নিয়মগুলো আমাদের শিখিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ যদি আপনি নিজেকে নবীর চেয়ে বড় মনে করেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে সফল হবেন না। আর পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ : অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলি।

তাহলে আল্লাহ বলছেন এটা শ্রেষ্ঠ নিয়ম। যদি আপনি নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে করেন তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন কুরআনের মতো একটি সূরা রচনা করুক মানুষ চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। যদি কেউ মনে করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চাইতে সে উন্নত, যদিও এটা একটি কুফর এজন্যেই অবিশ্বাসীরা নিজেদের নিয়মে প্রার্থনা করে। কিন্তু যে লোক পবিত্র কুরআনকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে তাঁরা শুধু নবীজির নিয়মেই সালাত আদায় করবে। আর কুরআন বলছে– اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১৭. এবারের প্রশ্নটা এসেছে ভাই রিদওয়ানের কাছ থেকে। আস্সালামু আলাইকুম। আমি সৌদি আরবের জেদ্দায় চাকুরি করি। একবার আমি আমার এক ফিলিপিনি বন্ধুকে নামায আদায় করতে বলি। সে বলে আমি কা'বা শরীফে অনেকবার সালাত আদায় করেছি। আর কা'বা শরীফে একবার সালাত আদায় এক লক্ষবার আদায় করার সমান। তাই আগামি কয়েক বছর আমার সালাত আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। কীভাবে এটার উত্তর দিবো?

উত্তর : তার এ কথার কিছু অংশ ঠিক যে, এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে আছে। যেখানে আমাদের নবীজি বলেছেন, মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করা মদীনার

অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার বার সালাত আদায় করার সমান। কেবল মক্কার পবিত্র মসজিদ ব্যতীত। আর কেউ যদি মক্কায় এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করে সেটা অন্যান্য যে কোনো মসজিদে এক লক্ষবার সালাত আদায় করার সমান। আর আমিও একমত এ ব্যাপারে। কম জ্ঞানী মানুষেরা এ হাদীসের আসল অর্থটা বুঝতে পারে না। এখানে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন এ মসজিদে সালাত আদায় করলে। কিন্তু এতে করে আপনার অন্যান্য ফরজ সালাত মাফ হবে না।

আমাদের নবীজি এমনটি বলেন নি যে, এ মসজিদে এক ওয়াক্ত ফজরের নামায পড় তা একলক্ষ ফজরের ওয়াক্তের সমান। এখানে সওয়াব বেশি। আপনি এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব পাবেন। তার অর্থ এ নয় যে, আপনার এক লক্ষ ওয়াক্ত ফজরের সালাত আদায় না করলেও চলবে। আপনার বুঝার সুবিধার জন্যে আমি আরেকটি উদাহরণ দিই। যখন আমরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দিই অনেক জায়গায় বোনাস মার্ক থাকে। যদি আপনি ক্রিকেট খেলোয়াড় হন তাহলে আপনি পাঁচ নম্বর পাবেন। মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার সময় কিছু বাড়তি নম্বর থাকে NCC আর খেলাধুলা যেমন ব্যাডমিন্টন বা ফুটবলের জন্যে। যদি আপনি ক্রিকেটার হন অথবা ফুটবলার হন এর জন্যে আপনি ৩ অথবা ৪ নম্বর পাবেন। এখানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো।

এ নম্বরটা কাজে লাগবে তখন যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে নম্বর লাগবে ৯৫%। আপনি যদি ৯৪% পান এ নম্বরটা কাজে লাগিয়ে আপনি তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি সারাদিন ধরে শুধু ক্রিকেটই খেলব এভাবে সারা বছর ও সারা জীবন খেলে অতিরিক্ত নম্বর যখন পাঁচ পাঁচ করে একশো নম্বর হবে, তখন আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যাবো। সে কি ভর্তি হতে পারবে? সে দিন রাত ক্রিকেট খেলতে লাগলো সারাদিন আর সারারাত। এভাবে সে পুরো বছরই ক্রিকেট খেলতে লাগলো। দশ বছর খেললো। তারপর সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে বললো, 'আমি এতোদিন ক্রিকেট খেলেছি। এই ক্রিকেট খেলার নম্বরটা হলো বোনাস মার্ক যে এখানে পরীক্ষার নিয়মিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এঅতিরিক্ত কিছুর জন্যে এ বোনাস মার্ক পাবেন। তাহলে সওয়াব পাবেন। কিন্তু এই সওয়াবের জন্যে আপনার অন্যান্য ফরজ সালাত মাফ হয়ে যাবে না। যেগুলো আমাদের জন্যে ফরজ সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। তাহলে কেউ যদি মসজিদে হারামাইনে সালাত আদায় করে, এর জন্যে সে অতিরিক্ত সওয়াব পাবে। কিন্তু তার ফরজ আদায় মাফ হয়ে যাবে না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১৮. আমি বিষ্ণু মহেশ মেহতা। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি ভারতে দেখেছি সারা মসজিদে নামায পড়ে তাদের জন্যে মসজিদে টুপি পরাটা আবশ্যক, কিন্তু ইরান ও মরক্কোতে যারা মসজিদে নামায পড়তে যায় তারা মাথায় টুপি পরে না বা কিছু দিয়ে মাথা ঢাকে না কেন?

উত্তর : ভাই পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই অথবা সহীহ্ হাদীসও নেই যেটা বলছে মাথায় টুপি দেয়া ফরজ বা সালাত আদায়ে টুপি দেয়া আবশ্যক। এমন কথা কোথাও নেই। তবে সহীহ্ হাদীসে এমন কথা আছে। সাহাবারা সালাত আদায়ের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। আর যখন আপনি আপনার মাথা ঢেকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। যদি ভালো করে দেখেন আমাদের প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা টুপি পরি। কিন্তু যদি ইংল্যান্ডে যান 'হ্যালো ম্যাম' বলে তারপর টুপি খুলে ফেলে। হ্যালো ম্যাম 'How are you' তারপর টুপি খুলে ফেলে। পশ্চিমা কালচারে শ্রদ্ধার জন্যে টুপি খোলে আর প্রাচ্যে আমরা টুপি পরি। তবে আমরা মুসলিমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমের সংস্কৃতি মেনে টুপি পরি না। রাসূলের অনুকরণের জন্যে আমরা শ্রদ্ধা দেখাই। আর হাদীসেও আছে সাহাবীরা সালাতের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। টুপি অথবা অন্য কোনো কাপড় দিয়ে। সৌদি আরব গেলে দেখতে পারবেন। তবে সহীহ্ হাদীসে কোথাও নেই টুপি পরা ফরজ। যদি মুসলিমরা টুপি ছাড়া সালাত আদায় করে সেই সালাতও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করবেন। এটা ফরজ নয়, তবে সালাত আদায়ের সময় টুপি পরা ভালো। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১৯. এবারের প্রশ্ন স্লিপে। কোনো অমুসলিম কি সালাত আদায়ের সময় অংশগ্রহণ করতে পারে? প্রশ্ন করেছেন ভি. এস. জো?

উত্তর : কোনো অমুসলিম লোক যদি মন থেকে সালাত আদায়ে অংশ নিতে চায়। তাহলে প্রথমে তাকে ঈমান আনতে হবে। যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চান শুভেচ্ছ স্বাগতম। আর সালাত তখনই কবুল হবে যদি বিনয়ী ও নম্রভাবে আদায় করেন। যদি আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সালাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি বলে আল্লাহকে বিশ্বাস করি না আপনার সাথে সাথে এ কাজটা আমি করতে চাই। তাহলে সালাত আদায় করতে পারে কিন্তু তা হয়ে যাবে জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম। বিশ্বাস না থাকলে, ঈমান না থাকলে সালাত কোনো কাজে আসবে না। যদি কোনো অমুসলিম সালাত আদায় করে ইসলাম গ্রহণের পর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সেটা কবুল করবেন। যদি সে আল্লাহকে বিশ্বাস না করে কেবল লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করে সূরা আল মাউনে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলছেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ -

অর্থ : দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্যে যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করে।

আর সূরা নিসার ১৪২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ - وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا -

অর্থ : মুনাফিকরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসতাসহ দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

তাহলে কুরআন মুনাফিকদের ব্যাপারে বলছে এরা সালাতকে অবহেলা করে। অমুসলিমরা সালাতে দাঁড়াতে পারে, এতে তারা ন্যায়নিষ্ঠার পথে পরিচালিত হবে না। তারা মুনাফিক, তারা ধোঁকাবাজ, তবে কেউ যদি ঈমান এনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে তাহলে সেটা করতে পারে।

প্রশ্ন ২০. আস্‌সালামু আলাইকুম, ভাই আমরা কি অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি?

উত্তর : কেন আপনি প্রশ্ন করলেন আমরা অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি কিনা?

কেন আমি আগেও বলেছিলাম আমাদের নবীজি বলেছেন এটার উল্লেখ আছে সহীহ্ বুখারীতে। 'এই পৃথিবীকে আমার ও আমার উম্মতের জন্যে সিজদা করার স্থান বা মসজিদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সহীহ্ বুখারী)

আপনি পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় সালাত আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটা হতে হবে পবিত্র। এছাড়াও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যদি কোনো অমুসলিমের ঘরে নামায পড়তে চান তবে কোনো পবিত্র কাপড়ের উপর পবিত্র জায়গায় সালাত আদায় করতে পারেন। খেয়াল রাখবেন যেখানে নামায পড়বেন, তার সামনে যেন কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে, মাঝে একটি সুতরা রাখতে হবে। আমাদের নবীজি একথা বলেছেন। দেয়ালের সাথে একটু দূরত্ব রাখবেন, মাঝে একটা সুতরা রাখবেন। এমনকি একটি তীরও সুতরা হতে পারে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে এই সুতরা একটি দড়িও হতে পারে। আপনি যদি সালাতের নিয়মগুলো মেনে চলেন তাহলে অমুসলিমদের ঘরেও সালাত আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটা যেন পবিত্র হয় এবং সামনে যেন কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২১. এবারের প্রশ্ন স্লিপে। সালাত আদায়ের জন্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পোশাক কোন্‌টি? কোর্তা পায়জামা, প্যান্ট, শার্ট না কি অন্য কিছু?

উত্তর : একেবারে ন্যূনতম শর্ত হলো মহিলাদের জন্যে হাত, মুখ ব্যতীত পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে। জামা ঢিলেঢালা হবে। জামা টাইট হবে না। হিজাবের বিভিন্ন শর্তগুলো পুরুষদের জন্যে নাভি থেকে গোড়ালি হাঁটু পর্যন্ত সাধারণত গ্রহণযোগ্য হলো পুরো শরীর ঢেকে রাখা এমনকি আপনার কাঁধও। এখন কথা হলো কোর্তা পায়জামা পরবেন নাকি প্যান্ট, শার্ট, টাই যদি আপনি সালাতে পোশাকের ন্যূনতম অংশটা পূরণ করেন যেটা সহীহ্ হাদীসে রয়েছে আপনি যেটাতে আরাম বোধ করবেন সেটা পরবেন। যদি আপনি পশ্চিমা ব্যক্তিকে কোর্তা পায়জামা পরতে বলেন তাহলে সে নামাযে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবে। যদি কোনো গ্রামের মানুষকে কোর্ট টাই পরতে বলেন তাহলে সে স্বস্তি পাবে না। তাহলে আপনি যদি সালাতে পোশাকের ন্যূনতম অংশ পূরণ করেন যেটা বলা আছে সহীহ্ হাদীসে, সে শর্ত মেনে আপনি যে কোনো পোশাক পরতে পারেন। তবে সেটা ইসলামী শরীয়াহর বিরুদ্ধে যাবে না। যদি সে পোশাকটা শরীয়াহ অনুযায়ী হয়ে থাকে আপনি সেটা পরতে পারেন। তবে গলায় যেন কাপড় ঝুলানো না থাকে। এটা পরে আপনি সালাত আদায় করতে পারেন না। কারণ এটা হারাম। তবে পোশাকটা যদি হারাম না হয় সব শর্ত পূরণ করে তাহলে আপনি কোর্তা, প্যান্ট, শার্ট যেটা পরে আরাম পান সেটা পরতে পারেন। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২২. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মৌলিক চন্দ্র রানা। আমি একজন অমুসলিম। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, মুসলিমদের সালাত এবং হিন্দুধর্মের উপাসনার মাঝে পার্থক্য কী? যেমন পূজা পার্বন, আর সালাত বাদে এসব প্রার্থনা করলে কি কোনো রকম সমস্যা আছে?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন, মুসলিম এবং অমুসলিমদের প্রার্থনার মাঝে পার্থক্যটা কী– যেমন পূজা। এখানে প্রধান পার্থক্য হলো আমরা যখন সালাত আদায় করি তা করি আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। আর মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে মেনে চলে। আমি মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আগেই বলেছি। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যার উপাসনা করে থাকে, মহান সৃষ্টিকর্তা বলে মানে আমরা তাকে মানি না। যেমন ধরুন একজন লোক মূর্তিপূজা করে। আমরা বলি সে যে মূর্তিপূজা করছে সেটা মহান স্রষ্টা নয়। আর যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন সেগুলোও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। তাই আমরা মুসলিমরা যা কিছু করব পবিত্র কুরআন বলছে, 'আস সেই কথায় যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক।'

যদি কোনো হিন্দু লোক আমাকে জিজ্ঞেস করে সে যে মূর্তিপূজা করে তা সঠিক না ভুল?– আমি সেই লোককে বলব যদি আপনি পড়েন বেদ ৩২ নম্বর অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদে বলছে, 'না আমি প্রতিমা আস্তি' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রতিমূর্তি বানানো যাবে না। আপনারা যেটা করছেন সেটা ভুল। ভগবত গীতায় এটার উল্লেখ আছে ৭ নম্বর অধ্যায়ের ১৯-২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে যে সকল জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করে তারা নকল ঈশ্বরে পূজা করে ও যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে আমি তাদের মনের ইচ্ছেও পূরণ করি। যারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা নকল, মিথ্যা ঈশ্বরের রাজত্বে যাবে। যারা আমার উপাসনা করে তারা আমার কাছে আসবে। আমি একজন মুসলিম হিসেবে অমুসলিমদের এ কথাটা বলব আপনারা যেটা করেছেন আমি কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীও সেটা ভুল, আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এভাবে প্রার্থনা করা ভুল। যদি কোন খ্রিস্টানকে প্রশ্ন করেন সে কিন্তু পবিত্র বাইবেলের নিয়মগুলো মেনে প্রার্থনা করে না। পবিত্র বাইবেল বলছে আমি একথা আগেও বলেছি সকল নবী-রাসূল সালাত আদায়ের আগে সিজদা করেছিলেন। সালাত আদায়ের আগে হাত ধুয়েছেন, হযরত মূসা ধুয়েছেন, হযরত হারুন (আ:) (তারা সবাই শান্তিতে থাকুন) সিজদা দিয়েছেন, তবে এখন খ্রিস্টানরা প্রার্থনার আগে হাত পা ধৌত করে না, সিজদাও করে না।

আমি তাদের প্রথমে বলবো তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটা তারা মেনে চলছে না। এরপরও আমি তাদের বলব আল কুরআন হল আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এখানে প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়মের কথা বলা হয়েছে। আর কিছু লোক এখানে পাল্টা যুক্তি দেখাবে কেন তারা বিভিন্ন ধরনের মূর্তির পূজা করে এ ব্যাপারে অন্য একটি ভাষণে বলেছিলাম পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরের ধারণা এ ক্যাসেটটি দেখলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। উত্তরটি পেয়েছেন আশা করি।

প্রশ্ন ২৩. এ প্রশ্নটি করেছেন তানজিমে খতিব। ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আপনি বলেছেন, নামায পড়তে হবে কাঁধে কাঁধ রেখে। মহিলারাও কি একইভাবে নামায আদায় করবেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন– আমি একটি অফিসের উদ্ধৃতি দিয়েছি যে, আমাদের নবীজি বলেছেন সালাতের সময় তোমরা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও মহিলারাও কি একই কাজ করবে? আমি আগেও বলেছি মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। তাই বলে পুরুষ মহিলা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে এটা ঠিক না। বর্তমানে আমাদের মেডিকেল সাইন্স বলে মহিলাদের শরীরের তাপমাত্রা ১° বেশি গরম। যখন মহিলার শরীর আপনার শরীরের সাথে লাগবে আপনি তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার দিকে তাকাবেন, সুতরাং পুরুষরা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে মহিলারা মহিলাদের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু পুরুষ ও

মহিলা একসাথে সালাত আদায় করবে না। সালাতের অন্যান্য নিয়মগুলো পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে সমান। মহিলা ও পুরুষের সমান ও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২৪. আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আপনি বললেন যে, মহিলারা মসজিদে নামায পড়তে পারবে আলহামদুলিল্লাহ। তবে আপনাকে প্রশ্নটা করছি কারণ রমযান মাস সামনে। এ সময়টাকে আমরাও কাজে লাগাতে চাই। তখন এটা দেখা যায় যে, এশার নামাযের সময় আমরা মহিলারা পারিবারিক সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে পারি না। তাহলে আমরা যদি বাসায় এশার নামাযের পর ২০ রাকাআত নফল নামায পড়ি, সেক্ষেত্রে একই সওয়াব পাবো, নাকি আমরা মসজিদে যাবো?

উত্তর : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, রমযান মাসের সময়ে আমরা তারাবীর নামায পড়ি এশার পরে। তবে পারিবারিক কারণে মহিলারা মসজিদে যেতে পারেন না। আর আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুম্বাইতে কিছু মসজিদ দেখা যায় যেখানে মহিলারা তারাবীর নামায পড়তে পারে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বেশ কিছু মসজিদ আছে। আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু যদি যেতে না পারেন তাহলে কি বাসায় পড়া যাবে? হ্যাঁ বোন অবশ্যই পড়তে পারেন। তবে ভাল হয় যদি মসজিদে যান। বিশেষ কোন কারণে যদি মসজিদে যেতে না পারেন তবে বাড়িতে একা পড়তে পারেন। আর এখানে কি সওয়াব সমান? স্বাভাবিকভাবেই মসজিদে যাওয়ার নেকী পাবেন। পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনবেন। আর যদি কুরআনে হাফেজ না হন তাহলে আপনি তারাবীর নামাযে কুরআন শরীফ খতম দিতে পারছেন না তবে নামায না পড়ার চেয়ে বাসায় পড়া অনেক ভালো। আর সওয়াবের কথা বললে জামাআতে পড়লে সওয়াব বেশি। আমাদের প্রিয় নবী সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডে বলেন– তোমরা মসজিদে জামাআতে নামায পড়লে ২৫ গুণ অথবা ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। তাহলে জামাআতে সালাত আদায় করলে বেশি সওয়াব পাবেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমেরিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা

ডা. রিচার্ড হেইন্‌স : আস্‌সালামু আলাইকুম। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মুখ্য বিষয়। একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকানরা ধর্ম মানে না। আমি মনে করি এটা সঠিক নয়। আমেরিকানরা খুবই ধর্মানুরাগী। ধর্ম আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের কাছে এটা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যখন একটি ধর্ম গ্রহণ করে, তখন সে একই সাথে ঐ ধর্মের ভাগ্য ও পরিণতিও গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার নিজের পরিবারের কথাই বলতে পারি। আর আমি এটা সাজিয়ে বলছি না। আমার নিজের পরিবারেই রয়েছে মেথোডিস্ট খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ, আরেকজন ইহুদি, আছে একজন ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথলিক, একজন শিয়া মুসলিম আর সবশেষে একজন রোমান ক্যাথলিক। এভাবে আপনি বেশির ভাগ আমেরিকান পরিবারেই দেখতে পাবেন যে, এক এক লোক এক এক ধর্ম পালন করছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের ব্যাপারে খুবই আবেগপ্রবণ।

আমি ভারত বর্ষে বিশেষত শ্রীনগর ও চেন্নাইতে যে লড়াইটা দেখেছি, সে লড়াইটা যারা ধর্ম মানে আর যারা মানে না তাদের মধ্যে নয়। লড়াইটা আসলে তাদের মধ্যে যারা সব ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল। আর যারা কোনো ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল নয়। ইউনাইটেড স্টেটস বললেই মনে হবে কোকাকোলা, পেপসি, এমটিভিসহ উপভোগের আরো অনেক সামগ্রীর কথা। যা আপনি শুধু উপভোগই করবেন। যেগুলো জীবনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আমি বলবো যে, আমেরিকা আমাদের পৃথিবীকে দিয়েছে সহিষ্ণুতা আর স্বাধীনতা। আরো শিখিয়েছে এ সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করা। আমেরিকা পৃথিবীতে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য চায়, চায় প্রত্যেকটা মানুষ সম্পূর্ণ নিজের মতো করে স্বাধীনতা উপভোগ করুক। আমেরিকা এমন কোনো পৃথিবী চায় না যা শুধু আমেরিকাই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। বরং আমরা চাই যে, আপনারা সবাই আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবেন, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি স্বাধীনতার পথে।

আর এ আমেরিকা চায় এমন একটা পরিবেশ যেখানে সবাই বেছে নিতে পারবে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমেরিকার এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সবার সামনে ভালো সাজার জন্যেও নয়। কারণ, এটা সবার জন্য ভালো। আমেরিকা বিশ্বাস করে শান্তিতে। আমেরিকা আরো বিশ্বাস

করে যে, সমস্ত পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে আমরা চাই স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস চালায় আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো, লড়াই করবো, যাতে আমরা এ সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে পারি। সাধ্যমতো চেষ্টা বলতে আমি বোমা, প্লেন, বন্দুক, ছুরি এগুলো বুঝাই নি। আমি বলছি, ভালো শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর পানি, স্যানিটেশন, সুস্বাস্থ্যের কথা। বলছি যাবতীয় হিসাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা।

আমি বলছি, আপনার সরকারকে সহযোগিতা করার কথা। পাশাপাশি অন্য দেশের সরকারকেও অপরাধ দমনের জন্য সাহায্য করা। আমি বলছি, মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ বন্ধের কথা, এটা থেকেই অনেক সন্ত্রাসী তৈরি হয়। আমি বলতে চাচ্ছি মাদক পাচার বন্ধ করার কথা, যেখানে অন্য মানুষ তা ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারটাই আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের মূলকথা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধটাই সবার নজরে পড়ে। যেখানে আসলে আপনি, আমি ও আমরা সবাই এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকা যে কোনোভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদের বলছি, এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ধারণা।

আমেরিকায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানও রয়েছেন। রয়েছে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফ্রিকা আর ভারতের মুসলমানগণ। আর তাই আমেরিকার এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ–মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এটা আমেরিকা বনাম ইসলামের যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধের এক পক্ষ আমরা, যারা এখানে বসে আছি মানব সভ্যতার পক্ষ নিয়ে। অন্যপক্ষ তারা, যারা এ মানব সভ্যতা ধ্বংস করতে চায়। এসব বিপদের মোকাবেলা করতে আর আমাদের আশা জাগিয়ে রাখতে আমেরিকা অতীতে এবং বর্তমানে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারতের মতো দেশের সাথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানি যে, শুধু এক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি সেটা যদি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও হয়, সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও জানতে চাই। কারণ, আমরা জানি যে গণতন্ত্র পুরোপুরি নিখুঁত নয়।

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতার প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলকথা। এটাই আমাদের কাছে মুখ্য বিষয়, ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিষয়টা। আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। ইন্ডিয়া আমেরিকার মতোই বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের মানুষের এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মতো আপনাদের সংবিধানও ভারতের সব মানুষকে তার নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দেয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। আমি বলবো না যে, আমেরিকা মনে করে এটাই ঠিক। আমি বলবো না যে, প্রত্যেক আমেরিকান এটা বিশ্বাস করে, যতটা

গভীরভাবে আমি বিশ্বাস করি সহিষ্ণুতায়। তবে আমি আপনাদের কাছে শপথ করে বলছি যে, সব ধর্মের স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা আমাদের মূল আদর্শ।

একইভাবে ভারতে এটাই আপনাদের মূল আদর্শ। সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকা আর ভারতের উচিত স্বাধীনতাকে সমর্থন করা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আর তাই আসুন! আমাদের সাথে যোগ দিন— আমরা যুদ্ধ করি স্বাধীনতার জন্য, ধর্ম পালনের স্বাধীনতার জন্য, এমন একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখানে বসে থাকা একজন শিশুও দেখবে। যেটা ভবিষ্যতে আপনার সন্তান দেখবে। আর সেটা নির্ভর করবে এ কঠিন সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা আর সহযোগিতার ওপর। যাহোক, স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতার প্রতি আমাদের আদর্শের এ মিল এক সুঁতোয় বাঁধা। আমাদের মিলটা বা সাদৃশ্যটা খুবই মূল্যবান। এটা আমাদের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কাজ করে যাবো আপনাদের আর আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ।

আবদুল হাকিম : আস্সালামু আলাইকুম। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. জাকির নায়েকের সাথে। ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক হলেন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তাঁর প্রেরণাতেই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এ প্রচেষ্টা– ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলো দূর করা। পেশায় একজন ডাক্তার হলেও বর্তমানে তিনি ইসলামের আদর্শ পৃথিবীর সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চান। মাত্র ৩৬ বছর বয়স থেকেই পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি, যুক্তি, বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেন এবং অকাট্যভাবে ইসলামের নামে অপ্রচারের ভুল ধারণাগুলো খণ্ডন করেন।

ডা. জাকির নায়েক পবিত্র আল-কুরআন এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেন। ডা. জাকির তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং স্বতঃস্ফূর্ত আর অকাট্য উত্তরের জন্য বিখ্যাত। যেখানে দর্শকরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাঁর বক্তৃতার পরে কারো কোনো সন্দেহ থাকলে তা দূর করতে পারেন, তিনি গত ৬ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর বিশেষ করে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ৬ শতের অধিক বক্তৃতা দিয়েছেন । তিনি ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর বই লিখেছেন অসংখ্য। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : আজকের এ মহতি সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি ডা. রিচার্ড হেইন্স, ডা. অমর সিনহা, মিস্টার কৃষ্ণা অর্চন চৌরাসিয়া, অন্যান্য অতিথি এবং আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের ইসলামিক শুভেচ্ছার সাথে স্বাগতম জানাচ্ছি। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত, বরকত ও শান্তি আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক। আজকের বিকেলের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে– 'সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদ'। আপনাদের হয়তো জানা আছে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ২০ জন লোক হচ্ছে মুসলমান। অর্থাৎ পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক হলো মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর বেশির ভাগ ধর্মের বেশিরভাগ মানুষেরই ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে। তারপরও ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ গতিতে বেড়েই চলছে। এসব ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে।

বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ নিয়ে ভুল ধারণাটি এক নম্বরে রয়েছে ইসলামে। যখন কোনো ব্যক্তি একজন মুসলমান সম্পর্কে শোনে বা জানে, তার মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি একজন মুসলমান? নাকি একজন জঙ্গি সন্ত্রাসী? 'মৌলবাদী' শব্দটির অর্থ কী? একজন মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো একটি বিষয়ে মৌলিকত্বকে কঠোরভাবে মেনে চলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ডাক্তারকে ভালো ডাক্তার হতে হয়, তবে তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যদি সে একজন মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে কখনোই ভালো ডাক্তার হতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানীকে ভালো বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যদি সে ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে কখনোই ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

একজন গণিতবিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। গণিতবিদকেও একজন মৌলবাদী হতে হবে। যদি গণিত বিষয়ে তিনি মৌলবাদী না হন, তাহলে কখনোই তিনি ভালো গণিতবিদ হতে পারবেন না। আপনি সব মৌলবাদীকে এক পাল্লায় ওজন দিতে পারেন না। কারণ, ভালোও আছে, মন্দও আছে। তাদের মধ্য থেকে মৌলবাদের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে বিচার করতে হবে কে ভালো মানুষ, আর কে খারাপ মানুষ! যেমন, একজন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত অথবা চোর হয়। যার পেশা হচ্ছে ডাকাতি বা চুরি করা। সমাজের জন্য অবশ্যই সে একটি অভিশাপ। সে কখনোই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। অন্যদিকে আপনি যদি একজন প্রকৃত ডাক্তারকে দেখেন যার কাজ হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা। তাহলে সে সমাজের জন্য উপকারী, একজন ভালো মানুষ। তাই সব মৌলবাদীকে একই মাপকাঠিতে পরিমাপ না করে, যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা উচিত। আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি।

কারণ, আমি জানি, মানি এবং ইসলামের মৌলিকত্বকে ঠিকভাবে পরিচর্চা করি এবং আমি এটাও জানি, ইসলামে মানবতা বিরোধী কোনো মৌলিকত্ব নেই এবং চ্যালেঞ্জ করতে পারি, পৃথিবীতে একটি মানুষও পাওয়া যাবে না, সে প্রমাণ দেখাতে পারবে যে, ইসলামের মৌলিকত্ব মানবতা বিরোধী। এমন কিছু মানুষ আছে যারা

মনে করে ইসলামের শিক্ষা ও আল-কুরআনের শিক্ষা মানবতা বিরোধী। যখন আপনি এর একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করবেন, এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন, তখন একটি মানুষও পাওয়া যাবে না যে বলবে, ইসলামের মৌলিকত্বের মধ্যে মানবতা বিরোধী কিছু আছে। এ কারণে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, একজন হিন্দুকে পরিপূর্ণ হিন্দু হতে হলে, হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে সে একজন পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পারবে না। একজন খ্রিস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিকে খ্রিস্টান ধর্মে তার জীবনের পরিপূর্ণতা আনতে হলে তাকে খ্রিস্টান ধর্মে মৌলবাদী হতে হবে। নইলে সে একজন পরিপূর্ণ খ্রিস্টান নয়।

যদি আপনারা ওয়েবস্টারের অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, 'মৌলবাদী' শব্দটি আবিষ্কারের পর একদল আমেরিকান খ্রিস্টানদের বর্ণনা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। যাদেরকে বলা হতো প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা গির্জার প্রতি আপত্তি জানায়। পূর্বে খ্রিস্টান গির্জায় এটি বিশ্বাস ছিল যে, বাইবেলের আদেশ সব ছিল খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা প্রতিবাদ করে বলে যে, শুধু বাইবেলের আদেশই নয়... আদেশ, শব্দ, বর্ণ সব কিছুই খোদা প্রদত্ত। যদি কোনো মৌলবাদী প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদা প্রদত্ত, তাহলে সেই মৌলবাদীদের এ পদক্ষেপ একটি সফল পদক্ষেপ। আর কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদা প্রদত্ত নয়, তাহলে সেটি ভালো পদক্ষেপ নয়। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করে থাকেন। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণটি পড়েন, তাহলে দেখবেন, সেখানে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। সেটা হলো, মৌলবাদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করেন, বিশেষ করে ইসলাম। পরিবর্তিত সংস্করণে 'বিশেষ করে ইসলাম' শব্দগুলো যোগ করা হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি 'মৌলবাদী' শব্দটি শোনেন, তখনই আপনি একজন মুসলমানের কথা চিন্তা করেন যে কি-না সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে, ডা. জাকির নায়েক এসব কী কথা বলছেন যে, প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটা কী? সন্ত্রাসীর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে অন্যায়ভাবে সমাজে মানুষকে ভয় দেখায়। একজন ডাকাত যদি কোনো পুলিশকে দেখে ভয় পায়,

তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসী। তাই এ ধারণার ভিত্তিতে ডাকাতের কাছে প্রতিটি মুসলমানই একজন সন্ত্রাসী। যখন একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষণকারী একজন মুসলমানকে দেখে, সে ভয় পায়। এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের এক একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। আমি মনে করি, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অন্য কোনো নিরীহ ব্যক্তিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে কোনো মুসলমান নিরীহ কোনো ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না।

মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা অনুসারে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে দুটি ভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ষাট বছর পূর্বে আমরা যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিলাম, তখন কিছু ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। এ সব ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'সন্ত্রাসী' নামে পরিচিত ছিল। আবার এ সব ব্যক্তি সাধারণ ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড কিন্তু পরিচয় হচ্ছে দুটো। একদলের কাছে তাদের পরিচয় সন্ত্রাসী, আরেক দলের কাছে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে কোনো লেবেলে ফেলতে হলে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, সেই ব্যক্তিকে ঐ লেবেলে ফেলার কারণ কী? আপনি যদি ব্রিটিশ সরকারের সাথে একমত হন যে, ব্রিটিশদের উচিত ভারত শাসন করা, তাহলে আপনি এ ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ ভারতবাসীর সাথে একমত হন যে, ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল শুধু ব্যবসা করতে, শাসন করতে নয়, তাহলে আপনি এদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলবেন। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, পরিচয় হচ্ছে তার দুটো। এখন আমি আপনাদের কাছে একজনের নাম বলবো। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। যিনি নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে শ্বেতাঙ্গদের সরকার ম্যান্ডেলাকে আখ্যায়িত করেছিল একজন সন্ত্রাসী হিসেবে। আর আফ্রিকানদের কাছে ঐ ম্যান্ডেলাই একজন বীর হিসেবে পরিচিত। একই ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গরা বললো সন্ত্রাসী আর কৃষ্ণাঙ্গরা বললো বীর। একই কর্মকাণ্ড কিন্তু দুটি ভিন্ন স্তর।

আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছে, তাহলে আপনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী মনে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সাথে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে নি তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা আপনার নিকট একজন বীর হিসেবে সম্মানিত হবেন।

যেমন আল-কুরআনে সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ط

অর্থ : হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি নর-নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'আলার চোখে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন মুত্তাকী। আল্লাহ মানুষকে বর্ণ, লিঙ্গ, সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করেন না। বিচার করেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। তাকওয়া হলো নিরপেক্ষতা, ধর্মতান্ত্রিকতা এবং আল্লাহর প্রতি সচেতনতা। যদি আপনি আল-কুরআন এবং যেভাবে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিদায় হজের সময় বলেছিলেন যে, আজ থেকে সমস্ত ভেদাভেদ শেষ হয়ে গেল– এ কথার সাথে একমত হন। তিনি বলেন, অনারবদের কাছে কোনো আরবরা শ্রেষ্ঠ নয়। আরবদের কাছে কোনো অনারব শ্রেষ্ঠ নয়। শ্বেতাঙ্গদের কাছে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে কোনো শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। একমাত্র উত্তম চরিত্র ছাড়া। তাই যদি আপনি কুরআনের দৃষ্টি এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর সাথে একমত হন, তাহলে আপনি ম্যান্ডেলাকে সন্ত্রাসী না বলে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করবেন, যে তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে কোনো স্তরে ভাগ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই এর যথাযথ কারণ দেখাতে হবে।

যদি কোনো মুসলমান মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে এবং আপনি একজন অমুসলিম হয়ে যদি সেই মূর্তি ভেঙ্গে দেন, আর তাতে যদি পুরো মুসলিম বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করবো। কারণ, মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইসলামে আলোচিত ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো 'জিহাদ'। জিহাদের অর্থ সম্বন্ধে কেবল অমুসলমানদের মাঝেই নয়, এমনকি মুসলমানদের মাঝেও ভুল ধারণা আছে। বেশির ভাগ মানুষই, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক, তারা মনে করে যে, কোনো মুসলমান যুদ্ধ করুক যে কোনো যুদ্ধ যে কোনো কারণেই করুক না কেন সেটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে, দেশের ব্যাপারে হতে পারে, ভাষাগত ব্যাপারে হতে পারে, যে কোনো কারণেই মুসলমানরা যুদ্ধ করলেই সেটা হলো জিহাদ।

অমুসলমানরা এমনকি মুসলমানরাও একটি বড় ভুল করে যে, কোনো মুসলমান যুদ্ধ করলেই তাকে জিহাদ নাম দেয়। এই 'জিহাদ' শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ

'জাহদাহ' থেকে। যার মানে হলো চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা, উদ্যমী হওয়া। ইসলামিক অভিধান অনুযায়ী জিহাদ অর্থ কারো অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করা। জিহাদের অর্থ হলো চেষ্টা করা। সমাজের উন্নতি করা। এর মানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করাকেও বুঝায়। এর অর্থ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। জিহাদ যে মূল শব্দ 'জাহদাহ' থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ছাত্র চেষ্টা করে পরীক্ষায় পাস করার জন্য তাকে আরবিতে বলে সে 'জিহাদ' করছে। আমরা বলি সে 'চেষ্টা' করেছে। সে পরীক্ষায় পাসের জন্য পরিশ্রম করেছে। যদি কোনো চাকুরিজীবী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তার মনিবকে খুশি করার জন্য সে ভালো কাজ দিয়েই করুক আর খারাপ কাজ দিয়েই করুক, সেটাই হলো জিহাদ।

একজন চাকরিজীবী তার সর্বশক্তি দিয়ে মনিবকে খুশী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা। কোনো রাজনীতিবিদ যদি ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেটা ভালোভাবে হোক আর খারাপভাবেই হোক, সেটাকেই আরবিতে বলা হচ্ছে 'জিহাদ'। জিহাদ সম্বন্ধে আরো একটি ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে আছে। যে কোনো মানুষই ভাবে, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক 'জিহাদ' কেবল মুসলমানরাই করে থাকে। মূলত আল-কুরআনের বাণীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মুসলমানরাও জিহাদ করে থাকে। পবিত্র কুরআনে সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ـ

অর্থ : আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছি, ঠিক যেভাবে তাদের মা অনেক যন্ত্রণা পেয়ে জন্ম দিয়েছেন এবং তার দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে ২ বছর। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

এরপর সূরা লুকমানের ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ـ

অর্থ : যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সাথে কাউকে শরিক করতে বলে এমন সব ব্যাপারে যে ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর তাদের সাথে পৃথিবীতে সদ্ব্যবহার করবে।

আল-কুরআনে আছে, যদি পিতা-মাতা তোমাদের চাপ দেয়, চেষ্টা করে, জিহাদ করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদাতে শরীক করানোর জন্যে, তাহলে তাদের অমান্য করো।

কুরআন বলছে, অমুসলিমরাও জিহাদ করে। একই কথা বলা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৮নং আয়াতে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আর তারা যদি অজ্ঞভাবে তোমাকে আমার সাথে শরীক করতে বলে তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।

তাহলে আমরা আল-কুরআন থেকে জানতে পারলাম, শুধু মুসলিমরাই নয়, এমনকি অমুসলিমরাও জিহাদ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ـ

অর্থ : যারা ঈমান আনয়ন করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

এখানে বলা হচ্ছে যে, শয়তানও জিহাদ করে। তাহলে আরবি শব্দ 'জিহাদ' এর অর্থ হলো চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা। উপযুক্ত কারণে বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। আর খারাপ লোকেরা সংগ্রাম করে শয়তানের পথে। তাকে বলা হয় 'জিহাদ ফি সাবিলিস শয়তান'। তাহলে জিহাদ দুই প্রকার। ভাল জিহাদ আর মন্দ জিহাদ। অর্থাৎ, সংগ্রাম করা ভালোর জন্যে, সংগ্রাম করা খারাপ কিছুর জন্যে। তবে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি তেমন কিছু বলা না হয়, তখন ধরে নেয়া হয় যে, এ জিহাদ ভালো কিছুর জন্যে। এটা 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। এ জিহাদ আল্লাহ তাআলার পথে। আল্লাহ যদি বিশেষভাবে কিছু না বলেন তাহলে এটা ধরে নেয়া হয় যে, যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করা হবে, এটার অর্থ 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'।

আরো একটা ভুল ধারণা আছে যে, বেশির ভাগ মানুষ, মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, তারা মনে করে যে, জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। সত্যি বলতে, যদি

আপনি আল-কুরআন পড়েন, তাহলে দেখবেন, পবিত্র কুরআনের কোনো জায়গায়ও 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করা হয় নি। একটি সহীহ হাদীসেও পাবেন না যেখানে এ কথাটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন। আরবি অনুবাদ করলে Holy War (হোলিওয়ার) শব্দটির ইংরেজি থেকে যেটা দাঁড়ায়, সেটা 'হারবুম মুকাদ্দাসা' যার অর্থ পবিত্র যুদ্ধ। এ শব্দটা আল-কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ওরিয়েন্টালিস্টরা অর্থাৎ পশ্চিমারা। যখন থেকে তারা ইসলামের ওপর বই লিখতে শুরু করেছিল।

আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও জিহাদের অনুবাদ করেন পবিত্র যুদ্ধ। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ একজন ভুল করে ইসলামের কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দেয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও ইংরেজিতে তা অনুবাদ করেন। আর তারা মনে করেন 'জিহাদ' শব্দটার সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজি হলো 'হোলিওয়ার'– যেটা সম্পূর্ণ ভুল। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে 'কিতাল' শব্দটি যার অর্থ যুদ্ধ, যার অর্থ হত্যা করা। এখানেও যুদ্ধ দুই প্রকার। হত্যা করাও দুই প্রকার। ভালো কিছুর জন্য হত্যা করা, আর খারাপ কিছুর জন্য হত্যা করা। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۔

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

তাহলে বিশ্বাসীরা যুদ্ধ করবে শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তার অর্থ খারাপ লোকেরা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। আর ভালো লোকেরা যুদ্ধ করে মহান স্রষ্টার পথে। তাহলে জিহাদের অর্থ কোনোভাবেই পবিত্র নয়।

আর কিতালের অর্থ যুদ্ধ করা। 'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থ যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে। আর 'কিতাল ফি সাবিলিস, শয়তান' অর্থ– যুদ্ধ করা শয়তানের পথে। জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আল-কুরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বহু নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা হাজ্জের ৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۔

অর্থ : আর তোমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো, যেভাবে তা করা উচিত।

পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার ২০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করেছে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার আর তারাই সফলকাম।

এর অর্থ হলো– এখানে বলা হচ্ছে যে, সেসব লোক যারা হিজরত করে, আর সংগ্রাম করে, জিহাদ করে, চেষ্টা করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে, ভালো কাজ করে, যাবতীয় সম্পদ দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে, এ লোকগুলো পরবর্তী জীবনে সম্মান পাবে এবং তারা জান্নাতে যাবে।

একই কথা মহানবী ﷺ -এর হাদীসে উল্লেখ আছে। সহীহ্ বুখারীর চতুর্থ খণ্ডে ৪৬ নং হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন যে, একজন 'মুজাহিদ' যে চেষ্টা করে আল্লাহ্ তা'আলার পথে, আর আল্লাহ্ নিজেই জানেন কোন্ মানুষটা তাঁর পথে জিহাদ করেছে আন্তরিকতার সাথে। যেমন, একজন মানুষ নিয়মিত রোযা রাখেন আর নামায পড়েন। আর যদি কোনো ব্যক্তি, যে একজন মুজাহিদ, আল্লাহর পথে চেষ্টা করেন, যদি তিনি নিহত হন, তিনি জান্নাতে যাবেন। আর যদি তিনি ফিরে আসেন, তিনি আসবেন গনীমতের মালসহ্ বড় পুরস্কার নিয়ে।

'জিহাদ' শব্দটা পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সূরা আনকাবুতের ৬ নং আয়াতে বলেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আর যে ব্যক্তি জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর কারো নিকট মুখাপেক্ষী নন।

তার মানে তুমি যদি চেষ্টা করো আল্লাহ্ তা'আলার পথে, তাহলে তুমি নিজের জন্যেই চেষ্টা করছো। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কোনো অভাব নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পথে, সেটা আপনার নিজের জন্যই ভালো। এটা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ভালোর জন্য নয়। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি স্বনির্ভর। তাঁর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন, এখানে বলা হচ্ছে সেটা আপনার ভালোর জন্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ
اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط

অর্থ : হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, তোমার পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসায় যার ব্যাপারে তোমরা মন্দার আশঙ্কা করো এবং এমন বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো– এসব যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা হতে অধিকতর ভালোবাসার বস্তু হয় তাহলে আল্লাহর শাস্তি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমার কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তোমার বাবা, সন্তান, ভাই, তোমার স্বামী বা স্ত্রী, তোমার আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ তুমি জমিয়েছ, যে ব্যবসা দিয়ে তুমি রোজগার করো, যে ঘরে তুমি বাস করো, তোমার কাছে আর কী গুরুত্বপূর্ণ?' আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'তুমি যদি এই আটটি জিনিসকে বেশি ভালোবাস আল্লাহর থেকে, তাঁর প্রেরিত নবী থেকে এবং আল্লাহ্ তাআলার পথে জিহাদ করা থেকে তাহলে অচিরেই তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি বর্ষিত হবে। আর আল্লাহ্ পাপাচারদের পছন্দ করেন না।'

'জিহাদ' শব্দটা এখানে আবার এসেছে। বলা হচ্ছে, 'যদি তুমি এই আটটি জিনিসকে বেশি ভালোবাসো সর্বশক্তিমান আল্লাহর থেকে, আল্লাহর প্রেরিত নবী থেকে। আর জিহাদ না করো, যদি সংগ্রাম না করো আল্লাহ্ তাআলার পথে, তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন, অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করেন এবং আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না।'

হাদীসেও এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন। সহীহ্ বুখারী : চতুর্থ খণ্ড; হাদীস-২৭৮৪-এ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হযরত আয়েশা (রা) [তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রী.....] তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কি জিহাদে যাওয়া উচিত না? মহানবী ﷺ বললেন, তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো একটি নির্ভুল হজ্জ।

সহীহ্ বুখারীর ৫৭৯২ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে, একজন লোক মহানবী ﷺ-এর কাছে আসলো এবং বললো যে, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত? আর এখানে জিহাদ, সংগ্রাম করা, বলতে বোঝানো হচ্ছে খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তো লোকটা জিজ্ঞাসা করলো, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত, খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে? তখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার কি

বাবা-মা আছেন? লোকটি বলল, আছে। মহানবী বললেন, তোমার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো তোমার বাবা-মায়ের সেবা করা। অন্য আরেকটি জায়গায়, যেটার উল্লেখ আছে সুনানে নাসাঈতে, হাদীস নং ৪২০৯ এক লোক মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ? মহানবী ﷺ বললেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে সেই জিহাদ, সব সময় সত্য কথা বলতে হবে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বদলাচ্ছে। কোনো সময় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো সঠিক নিয়মে হজ্জ করা। মানে সঠিক নিয়মে তীর্থস্থান ভ্রমণ করা। আরেক জায়গায় মহানবী ﷺ বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো বাবা-মায়ের সেবা করা। আরেক জায়গায় মহানবী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ, শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা হলো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা। প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, এটার উল্লেখ আছে সহীহ্ ইবনে হাবান-এ, মহানবী বলেছেন, 'একজন মুজাহিদ যে চেষ্টা করে........ একজন মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে চেষ্টা করে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে....... আল্লাহ তা'আলার কারণে। আর একজন মুজাহিদ সে যিনি দেশত্যাগ করে, হিজরত করে, মন্দ হতে ভালোর দিকে হিজরত করে। এখানে আপনি পাবেন যে, 'জিহাদ' শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ এক এক রকম হয়েছে। তাহলে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে আপনাকে পড়তে হবে প্রকৃত ইসলামের ধর্মগ্রন্থগুলো অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসে মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীগুলো।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

এখানে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, তুমি বিশ্বাস করো এবং অনুসরণ কর না শয়তানের দেখানো পথ। অনেক জায়গায় আল-কুরআন বলছে শয়তানকে অনুসরণ করো না। কিন্তু এখানে আল্লাহ বলেছেন অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ। এখানে কি শয়তান আর শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? কেন আল্লাহ তা'আলা শব্দগুলো বদলালেন? এটার কারণ হলো, উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো যুবতী মহিলা একজন যুবকের কাছে আসে এবং তাকে বলে যে, চলো রাতে এক সাথে থাকি। যেহেতু লোকটার বিশ্বাস আছে তাই সে বলবে, না, কখনো না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা গুনাহ। সে এটা করবে না।

কিন্তু অন্য ব্যক্তি যার ঈমান নেই, যদি কোন যুবতীর ফোন আসে সে বলবে একজন যুবতীর সাথে কথা বললে কোনো ক্ষতি নেই। তাই সে বার বার ফোনে কথা বললো। কিছুদিন পর মেয়েটি বললো, চলো বাইরে এক সাথে চা খাই। আর কিছুদিন পর সে চা খেতে গেল। তখন সে ম্যাকডোনাল্ডস-এর মতো কোনো হোটেলে যেতে পারে, তারা ম্যাকডোনাল্ডসে গেল। কিছুদিন পর তারা ডিনার করার জন্য কোনো এক রেস্টুরেন্টে যেতে পারে এবং আর কিছুদিন পর তারা এক সঙ্গে রাত কাটাতে পারে কোনো একটা হোটেলে। এটা হলো 'খুতওয়াতিশ শয়তান' বা শয়তানের দেখানো পথ। যদি শয়তান ঈমানদার ব্যক্তির সামনে আসে সে, সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে চিনতে পারবে এবং তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে আকর্ষণ আছে।

শুধু একটা মেয়ের সাথে কথা বললে কি সমস্যা হয়? শুধু একটু চা খেলে কি সমস্যা? কোনো সমস্যা নেই, শুধু ম্যাকডোনাল্ডস-এ বার্গার খাওয়া কোনো সমস্যা নয়। শুধু একটু ডিনার করা, শুধু একরাত ঘুমানো কোনো সমস্যা নেই। এটাই শয়তানের পথ। তাই আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন, তিনি তোমাদের পথ নির্দেশ দিয়েছেন ও তোমরা বিশ্বাস করো, ইসলামের জগতে প্রবেশ কর সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে এবং অনুসরণ করো না খুতওয়াতিশ শয়তান তথা শয়তানের দেখানো পথ। কারণ সে তোমার জন্য একটি ঘোষিত শত্রু। একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো দাওয়াত। ইসলামের সত্য বাণী পৌঁছে দেয়া। সত্যকে পৌঁছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ আল-কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

অর্থ : তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সম্মান দিয়েছেন এবং বলেছেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোনো সম্মানই দায়িত্ব ছাড়া আসে না। আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি উৎসাহিত করো ভালো কাজে, নিষেধ করো খারাপ কাজ থেকে। আর তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো। যে কারণে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, সেটা হলো আমরা মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করি এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করি। যদি ভালো কাজে উৎসাহিত না করেন এবং খারাপ কাজে নিষেধ না করেন, তাহলে আপনি মুসলমান হওয়ার যোগ্য নন। যারা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ সম্মান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং খারাপ কাজে নিষেধ করার কারণে। আর আমি শুরু করেছিলাম পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : আর হে নবী ﷺ! বলুন, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

এটা প্রত্যেক মানুষের উচিত হবে যে, সত্যটা পৌঁছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোনো মানুষের জান্নাত পেতে হলে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা আসরের ১ থেকে ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

অর্থ : সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করেছে।

কেবল বিশ্বাস আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। বিশ্বাসের পাশাপাশি আপনাকে ভালো কাজ করতে হবে। মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পথে আনতে হবে। যদি এর কোনো একটি শর্ত পূরণ না হয়, সাধারণ অবস্থায় আল-কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না। আজকে আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, হোক সেটা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজ, কিংবা ম্যাগাজিন, আপনি দেখবেন যে, ইসলামকে তোপের মুখে রাখা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেটেও ইসলাম সম্পর্কে বহু মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কনসাল জেনারেল রিচার্ড হেইনসের সাথে একমত, যিনি চেন্নাইতে বলেছিলেন যে, আমেরিকান জাতি কখনোই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আমি তার সাথে একমত যে, আমেরিকার সমস্ত লোকজন ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আর একই কথা আমি ভারতীয় ভাইদের বলছি যে, হিন্দুরা সবাই ইসলামের বিপক্ষে নয়। আমাদের অনেক হিন্দু বন্ধু আছে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এটা হতে পারে ছোট একটা দল যারা ইন্ডিয়ানদের জন্য ইসলামের নিন্দা করে। এটা হতে পারে ছোট একটি দল যারা ইউরোপীয়ানদের লাভের জন্য চেষ্টা করে ইসলামের নিন্দা করতে। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে এটা করে। কারণ কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়।

দুই ধর্মের মানুষকে আলাদা করে রাখতে পারলে সহজে ভোট ব্যাংক কব্জা করা যায়। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কিছু মানুষ। আর এমনি

পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান মনোযোগটা নিয়ে যান অন্য দিকে। ফলে ইসলামকে তোপের মুখে রেখে জন্ম হয় আরেকটি ঘটনার। তাই আমি মেনে নিচ্ছি যে, সব মিলিয়ে আমেরিকান জাতি ইসলামের বিপক্ষে নয়। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ার অমুসলিমরাও ইসলামের বিপক্ষে নয়। বিপক্ষে কেবল হাতে গোনা কয়েকজন। আর এ লোকগুলোই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৭৯ সালের ১৬ই এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল এসেছিল। যেখানে ছিল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। টাইম ম্যাগাজিনের এ আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি যদি হিসাব করেন তাহলে দেখবেন, প্রত্যেক দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আর মিডিয়াকে আমি দোষ দিব এবং দোষ দিব রাজনীতিবিদদের। আমার মতে এ সমস্যার জন্য দায়ী হলো মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদরা। আমার কথায় কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। এটা কেবল আমার মতামত।

আপনি যদি মিডিয়াকে ভালো করে দেখেন, আমি জানি এখানে অনেক সাংবাদিক আছেন। সকালেও আমি বলেছিলাম যে, অধিকাংশ সাংবাদিকই আছেন যারা সত্যবাদী আর তারা বেশ ভালো। বিপক্ষে রয়েছে অর্ধেকেরও বেশি। এর মানে কিন্তু সবাই জানে। আর আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন যে, আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে মিডিয়া। যেমন ধরুন, যদি কোনো মুসলমান মহিলা হিজাব পরেন, তাকে টার্গেট করা হবে। একই সাথে গির্জার নানকদের দেখেন তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত বাদে পুরো শরীর ঢাকা। মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোনো মুসলমান দাঁড়ি রাখে তার মানে হচ্ছে সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরাও দাঁড়ি রাখে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ি পরে, তাতেও সমস্যা নেই। আমি দশ বছর আগে যখন প্রথমবার কানাডায় গেলাম, সেখানে দেখি একজন শিখ কোর্টে মামলা করেছে। সে ছিল কানাডিয়ান, আর সে কেস করছে এ কারণে যে, কানাডিয়ান আর্মিতে পাগড়ি খুলবে না বলে এবং সে মামলায় জিতেছিল। আর এখানে দেখি যদি কোনো মুসলমান দাঁড়ি রাখে মানুষ তখন অন্য কিছু ভাবে। আমি জানি না দাঁড়ি কি ক্ষতি করতে পারে। এটা একটা মাছিকেও কিছু করতে পারবে না। একটা টুপি কি ক্ষতি করতে পারে?

কেউ কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে, তাকে অ্যারেস্ট করুন, ভালো কথা। কেউ সন্দেহজনক কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করুন, ভালো কথা। কিন্তু চিন্তা করুন, দাঁড়ি একটা মাছিকেও কিছু করতে পারে না। যদি ভালো করে দেখেন, দেখবেন বেশিরভাগ ধর্মেই ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যীশুখ্রিস্ট, যিনি ইসলাম ধর্মে একজন নবী, আবার অনেক খ্রিস্টান তাঁকে মনে করে তাদের সৃষ্টিকর্তা, তাঁরও

দাঁড়ি ছিল। সাধু-সন্তুদেরও দাঁড়ি আছে। বেশিরভাগ ধর্মেই গুরুত্বপূর্ণ লোকদের, ধার্মিক লোকদের দাঁড়ি আছে। যদি ধর্মগুলো ভালো করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, ওপরের সারির লোকদের দাঁড়ি আছে। তাই দাঁড়ি থাকলে সমস্যা কী? আসলে কোনো সমস্যাই নেই।

এটা হচ্ছে মিডিয়ার প্রতারণা। এর মাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এর ফলে সবার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। আমি মুসলমানদেরও দোষ দিব এ কারণে যে, আমরা তাদের কাছে আসল সত্য কথাটা পৌঁছে দিতে পারছি না। একেবারেই পারছি না। এদিকে আল-কুরআনের বেশ কিছু আয়াত প্রসঙ্গ ছাড়াই উল্লেখ করা হচ্ছে। আর সমালোচকরা আল-কুরআনের একটা বিখ্যাত আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, আল-কুরআন বলছে, যদি কোনো অমুসলিমকে দেখো, তাকে মেরে ফেলো।

আপনারা জানেন, ভারতের একজন বিখ্যাত সমালোচক অরুণ শুরী একটা বই লিখেছেন, 'দ্যা ওয়ার্ল্ড অভ ফতোয়া'। তিনি তার বইতে আল-কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, সূরা তওবায় ৯ নম্বর পারার ৫ নম্বর আয়াতে আছে। তাঁর মতে কুরআন বলছে, যদি কোনো কাফেরের সাথে দেখা হয়, ব্রাকেটের ভেতর হিন্দু, তাকে মেরে ফেল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। তাহলে ভেবে দেখেন, যদি কোনো সাধারণ হিন্দু, একজন নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, ওহ্! কুরআন বলে, যদি কোন হিন্দুর সাথে দেখা হয় তাকে মেরে ফেল। তাহলে তখনই তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। লোকটা তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হচ্ছে হাতে গোনা কিছু লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাচ্ছে। কারণ তারাই 'দ্য ওয়ার্ল্ড অভ ফতোয়া'র মতো বইগুলো লিখছে।

তিনিও অন্য সমালোচকদের মতো আল-কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমে সূরা তাওবার ৯ নম্বর পারার ৫নং আয়াত। তারপর লাফ দিয়ে ৭ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবে যে, কেন এটা করা হয়েছে। কারণ ৬ নং আয়াতে, সব অভিযোগের উত্তর দেয়া আছে এখানে। শানে নুযূলসহ যদি আপনারা সূরা তাওবা পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, এর প্রথম দিকে বলা হচ্ছে মুসলমান আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যকার একটি শান্তি চুক্তির কথা। এ শান্তিচুক্তি মক্কার মুশরিকরা ইচ্ছে করেই ভেঙ্গে ছিল। আর তখন মহান আল্লাহ ৫ নং আয়াতে বললেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যখনই তোমার শত্রু .ক (কাফের মানে অবিশ্বাসী শত্রু) দেখতে পাবে, তাকে যুদ্ধের ময়দানে মেরে ফেল। তাই যদি কেউ প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেন, সেটা হাস্যকর হবে।

চিন্তা করুন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার সাথে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল, তখন যদি আমেরিকার আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকান সৈন্যদের বলে যে, সেখানেই আমার সেনারা, তোমরা ভয় পেয়ো না। যেখানেই কোনো ভিয়েতনামীকে দেখবে মেরে ফেলবে। এটা তারা বলেছে সাহস দেয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দেয় যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছে, কোনো ভিয়েতনামীকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলবে। তখন কথাগুলো হাস্যকর হবে। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন আর্মি জেনারেল এমন কথা বলতেই পারেন।

তাহলে একইভাবে আল্লাহ যদি বিশ্ববাসীদের আল-কুরআনের মাধ্যমে বলেন, যখনই শত্রুরা তোমাকে মারতে আসবে, তাদেরকে মেরে ফেলতে ভয় পেয়ো না। তাহলে সেখানে সমস্যা কোথায়? আর এরপরেই ৬ নম্বর আয়াত বলছে যে, যদি অবিশ্বাসীরা শান্তি চায়, তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও, যেন তারা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জানতে পারে। আল-কুরআন কিন্তু একথা বলছে না যে, শত্রু শান্তি চাইলে তাকে ছেড়ে দাও। আল-কুরআন বলছে, তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। আজকের দিনের সবচেয়ে মহৎ আর্মি জেনারেল, সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্য হয়তো বলবে, যদি শান্তি স্থাপন করতে চায়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কোনো আর্মি জেনারেল কি বলবে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও? কিন্তু আল-কুরআন একথাই বলছে।

যদি আপনারা শানে নুযুল পড়েন, তাহলে আল-কুরআনের আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। আর আপনারা যে কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়েন। আমি অনেক ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, শিখদের গ্রন্থ, জৈনদের গ্রন্থ সব পড়েছি। আর আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রায় সব ধর্মগ্রন্থেই কোনো না কোনো জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। বাইবেল পড়লে দেখবেন, প্রক্সোডালের গ্রন্থে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ২২ অধ্যায়. অনুচ্ছেদ ১৮ থেকে ২০ বলছে, হত্যা করো। এক্সোডাসের ৩২ নং অধ্যায় বলছে, হত্যা করো। নাম্বারস বলছে, হত্যা করো। নিউ টেস্টামেন্টে লূক-এর গসপেল, সেখানেও বলা হচ্ছে, 'হত্যা করো'। যীশু খ্রিস্টের ঐ গল্পটা হয়তো জানেন, তিনি যখন গেতসামেনির বাগানে গিয়ে সৈন্যদের বললেন যে, তোমাদের তরবারি বের করে দাঁড়াও। আর সৈন্যরা তখন তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থেই যুদ্ধকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আপনারা যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' পড়েন তাহলে দেখবেন ভগ্বদগীতার ২ নম্বর অধ্যায়ে আছে–আপনারা জানেন যে, অর্জুনের খুব মন খারাপ এ কারণে যে, তাকে তার নিকট আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন বলছে, কীভাবে এখানে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমার আত্মীয়দের হত্যা করবো? অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তারা। ভগবান কৃষ্ণ তাকে বললেন, সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর

যখন তুমি সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রু কে, সেটা বড় কথা নয়। হোক তারা তোমার আত্মীয়। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক ওপরে, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও।

একই কথা আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। আর কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্রয়াসী না করে। তোমরা ন্যায় বিচার করো। ন্যায় বিচার আল্লাহ্ ভীতির সবচেয়ে নিকটবর্তী।

'বিশ্বাসীরা সুবিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, সৃষ্টিকর্তার পক্ষে দাঁড়াও' এমনকি যদি তা তোমারও বিপক্ষে যায়। তোমার বাবা-মার বিপক্ষে যায়, ধনীর বিপক্ষে বা গরিবের বিপক্ষে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ রক্ষাকারী। যদি আপনারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন, প্রায় সব গ্রন্থেই কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো সময়ে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তার মানে এই না যে, আপনি এক্সোডাল থেকে উদ্ধৃতি দেবেন। অথবা ভগ্বদগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন যে, এটা সবার জানা। ভগ্বদগীতা বলে তোমার আত্মীয়দের মেরে ফেলো। এটা হলো প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। যদি ধর্মগুলো ভালোভাবে বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে ধর্মগ্রন্থগুলো ভালভাবে পড়তে হবে। ধর্মগ্রন্থগুলো ভালভাবে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, সেখানে কী লেখা আছে। আর এ ধর্মগ্রন্থগুলোই হলো এসব ধর্মের আসল উৎস। আপনারা জানেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল মায়িদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا .

অর্থ : এভাবে যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য কর্মতৎপরতা চালায় সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করে।

কুরআন বলছে, যদি কোনো মানুষ হোক মুসলিম বা অমুসলিম, কাউকে হত্যা করে, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোনো অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করলো। এখানে আরো বলা হচ্ছে, আর যদি কেউ কোনো মানুষকে বাঁচালো তাহলে সে পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করলো।

আর যখন কিতালের কথা আসে, (আল্লাহ তা'আলার পক্ষে যুদ্ধ করার নামই হলো কিতাল) সেখানেও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আল-কুরআনে এবং প্রিয়নবী মোহাম্মদ ﷺ এর হাদীসেও বলা হচ্ছে, যখন কোনো উপায় থাকে না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেই হবে, সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারার ১৯০ নং আয়াতে বলেছেন–

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

অর্থ : আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে লড়াইয়ে রত আছে এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

এছাড়াও আল কুরআনের সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : আর লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়ে সমগ্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে অত্যাচারী ব্যতীত অন্য কারো ওপর সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে বার বার নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন আর উপায় থাকে না, এ নিয়ম মেনেই তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মহিলাদের ক্ষতি করব না, আমরা শিশুদের ক্ষতি করব না, বাড়ির ভেতর বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করবো না, আমরা মন্দির ভাঙচুর করবো না, গাছপালা পোড়াবো না, গাছপালা কেটে ফেলবো না, শস্য ক্ষেত পোড়াবো না, পশুপাখি হত্যা করবো না, এমন আরো অনেক নিয়ম মানতে হবে। একটা বইয়ের কথা বলি যেটার লেখক রামকৃষ্ণ রাও। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জীবনীর ওপরে লিখেছেন যে, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় মোট ২২ বছরে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, তাতে সর্বমোট এক হাজার আঠারো জন মানুষ খুন হয়েছে।

আপনারা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরিসংখ্যান জানেন। সে যুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল? সে যুদ্ধে মারা গিয়েছিল ২ কোটি মানুষ। ১ কোটি সৈন্য আর ১ কোটি সাধারণ মানুষ। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ৩ কোটি মানুষ। আর আহত হয়েছিলেন সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। এগুলোর সাথে তুলনা করুন, আপনারা যদি পেছনের দিকে তাকান, তাহলে আল-কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য

বুঝতে পারবেন। একটা খুবই সাধারণ অভিযোগ করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে যেটা একেবারে ভুল ধারণা। আর সেটা হলো যে, ইসলামের প্রসার ঘটেছে তরবারির মাধ্যমে। 'ইসলাম' শব্দটা এসেছে 'সালাম' থেকে যার অর্থ শান্তি। যার অর্থ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ করা। যখন কেউ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ করে শান্তির জন্য তখন সে মুসলমান।

চিন্তা করুন, যদি আপনারা অনুধাবন করেন যে, ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছে তরবারির মাধ্যমে? তার মানে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে। কিন্তু কোনো উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ আছে। যখন কোনো সাধারণ মানুষ, কোনো নাগরিক বা অন্য কেউ সেই দেশের কোনো আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সে দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে, সঙ্গে অস্ত্রও রাখে।

এদিকে ইসলাম কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলে, প্রধানত শান্তির কথা বলে। সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি চায় না। তারা চায় না সবাই শান্তিতে থাকুক। এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণাটার উত্তর বেশ ভালভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডিলেসি ওলেরি। তিনি তাঁর বই 'ইসলাম অ্যাট দ্যা ক্রসেড'-এর ৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে, মুসলমানদের তরবারি হাতে নিয়ে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না, যে মিথ্যাটা বার বার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, (মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিনি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের সরিয়ে দিলো, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আযান দিতে পারতো না।

আমরা (মুসলমানরা) গত ১৪০০ বছর ধরে আরব বিশ্বে রাজত্ব করেছি। কিছু সময় ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে। কিছু সময় ফরাসিরাও। এ সময়টা বাদে পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব বিশ্বে রাজত্ব করেছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক কপটিক খ্রিস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রিস্টান। আরবের এ দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায়নি। মুসলমানরা প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতো। আজকে এক হাজার বছর পরেও ভারতে ৮০% লোক মুসলমান না। এ ৮০% অমুসলিম সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করেনি। কোনো মুসলমান আর্মি কি মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও

বেশি মুসলমান। কোনো মুসলমান আর্মি কি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোনো মুসলমান আর্মি কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটা নতুন আইডিয়া মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। উনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন। একই কথা আল-কুরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

অর্থ : হে নবী ﷺ আপনি তাদেরকে আপনার প্রভুর পথে ডাকুন হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।

প্লেইনট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের অ্যালম্যানাক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৩৪ থেকে ৮৪ সালের মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম, সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি ১৯৩৪ থেকে '৮৪ সাল পর্যন্ত কোন্ যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমি আবার প্রশ্ন করছি যে, কোন্ মুসলমান আমেরিকাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমি প্রশ্ন করছি যে, কোন্ মুসলমান ইউরোপকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইউরোপেও কথা বলার স্বাধীনতা আছে।

ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলিম মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কীভাবে যারা মুসলমান হচ্ছে, তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান আছে। আমেরিকার একটা রিসার্চ কোম্পানি যার অফিস ওয়াশিংটনে— এরা বলেছে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০ হাজার লোক মুসলমান হয়েছে। ৯ই সেপ্টেম্বরে আমি নিউইয়র্কে ছিলাম, দুই দিন আগেই সেখানে চলে যাই। আমি তখন ছিলাম ইংল্যান্ডে আর ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মাত্র ৫-৬ মাসের মধ্যেই আমাকে তিন তিন বার সন্ত্রাসবাদের ওপর কথা বলার জন্য ডাকা হয়। এটা তো ভালোই।

তবে ঐ সন্ত্রাসী কাজটা খারাপ ছিল, সালমান রুশদী আমাদের নবীর বিরুদ্ধে লিখেছে। সেটা খারাপ। কিন্তু লোকে জানতে চাইল সালমান রুশদী কী লিখেছে?

তারপর সত্যটা জানার জন্য আল-কুরআন পড়লো। আর সত্য জানার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। আজকের দিনে আমেরিকায়ও এ পরিসংখ্যান বাড়ছে। আমেরিকারই একটা প্রধান খবরের কাগজ 'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস' বলছে এখন আমেরিকানরা জানতে চায় যে, মুসলমানদের কোন বাইবেল পাওয়া যায় কি-না। তারা জানেও না যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। তারা মুসলমানদের বাইবেল পড়তে চায়। ভালোই তো। আর যখনই তারা সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআনের ১৭তম সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۔

অর্থ : আর হে নবী ﷺ! আপনি বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। যেটা মানুষের মন জয় করে। আর আল্লাহ তা'আলা মহান স্রষ্টা। তিনি আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তিন তিনবার বলেছেন– সূরা তওবা : আয়াত ৩৩, সূরা সাফ : আয়াত-৯, সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৮-এ বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি তাকে (সত্য দীনকে) সব জীবনব্যবস্থার ওপরে-বিজয়ী করতে পারেন।

আমি কথা শেষ করার আগে ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি বলেছেন, 'লোকেরা দুশ্চিন্তা করে যে, কোনো একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের কাছে চলে যাবে। তারা বুঝতে পারে না যে, যেদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনই ইসলামের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।'

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা এখন বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। তবে একবারে একটি প্রশ্ন করবেন। আমরা প্রথম প্রশ্ন শুরু করছি।

প্রশ্ন ১. স্যার, আমার নাম ওয়াসিগরেন। আমি একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক। আমরা জানতাম যে, ক্রুসেডাররা যে ক্রুসেডে গিয়েছিল সেগুলো ছিল পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, ক্রুসেড কিভাবে নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল। এভাবে কি বলা যায় না যে, এ ক্রুসেড থেকেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের শুরু? সত্য কথা হলো তারা সন্ত্রাস চালিয়েছে, আর এখন তারাই মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে মানুষের সামনে এভাবে তুলে ধরে কেন? ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি বেশ ভালো প্রশ্নই করেছেন। উনি একজন খ্রিস্টান, উনি স্বীকার করলেন আর আমিও আপনাদের বলছি। মুসলমানেরা এ পবিত্র যুদ্ধকে বলেছে 'জিহাদ'। এক এক জায়গায় এক এক নাম। আর ক্রুসেড যখন পবিত্র যুদ্ধ তখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এটা খুব পবিত্র। আর তিনি একজন সাংবাদিক, তারপরও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করলেন। এ ক্রুসেড নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আগে কিছু বলিনি। কারণ আমি এখানে ইসলামের ওপর কথা বলছি। আমি এখানে অন্য ধর্মের কথা বলছি না। অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না। সমালোচনা করতে চাইও না। প্রত্যেক ধর্মই শান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, তাই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন যে, ক্রুসেড মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সন্ত্রাস তারাই শুরু করেছে। আর এখন তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে।

আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন, পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ হারে বাড়ছে। মুসলমানেরা যে সবাই ভালো, সে কথা বলছি না। সব ধর্মেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। তবে সব মিলিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে, মানুষকে তরবারির মুখে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনোদিন না, কখনো না। বরঞ্চ, মুসলমান হওয়ার কারণে অনেক মানুষকে হেনস্তা, অপদস্ত করা হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান আপনি পাবেন, যদি আপনি বাইবেল পড়েন।

বাইবেলে দেখবেন, যীশু খ্রিস্ট বা ঈসা মসীহ্ বলেছেন– (ম্যাথিউ এর গসপেলে। অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১-এ।)

'যদি কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পড় দেয়, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ তার সাথে এক মাইল থাকতে বলে, তুমি দুই মাইল তার সাথে থাকো। যদি কেউ তোমার জামাটা চায়, তাকে তোমার আলখাল্লাটা দিয়ে দাও।'

তাহলে যীশু খ্রিস্ট যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একজন প্রেরিত নবী, তিনি আমাদের শান্তি কি তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।' আপনি যদি ভালো করে দেখেন, যদি ভালো করে বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখবেন কোথাও লেখা নেই যে, যীশু খ্রিস্ট বা ঈসা মসীহ্ মুসলমানদের অপদস্ত করতে বলেছেন। আর সে জন্য আমি সবাইকে বলছি, যে ধর্ম আপনার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সেই ধর্মে ফিরে যান। যেই ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে পবিত্র, সেটা ভালো করে পড়েন। কুরআনে বলা হচ্ছে, (সূরা আলে ইমরান : পারা-৩, আয়াত নং ৬৪-তে)

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا .

অর্থ : বলো : হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না।।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২. আমার নাম সিলে রাজা। আমি একজন অমুসলিম। আমার ভাই সাইফুল্লাহ্, দেখতেই পাচ্ছেন যে, স্টেজের ওপরে বসে আছে, সে মুসলমান হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর এজন্য বাবা-মায়ের সাথে ওর বেশ সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার প্রশ্ন না, আসলে আমি এখানে অন্য ধর্মের মানুষ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি একটা কথা বলতে চাই যে, অমুসলিমরাও যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার ভেতরে এবং আলোচনার বাইরেও। এটা একটা সুযোগ। আর সুযোগ সব সময় আসে না। আপনি এটার সদ্ব্যবহার করেন। আমি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি। আপনি যদি অমুসলিমও হন, আমি সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। আলোচনার ভেতরে এবং বাইরে যে কোনো ধর্মের ব্যাপারে। এটা আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ ভাই, প্রশ্নটা বলেন।

প্রশ্ন ৩. হ্যাঁ, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে এখন যা পরিস্থিতি আর ১১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা বিস্ফোরণ হলো সে পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আসলে আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। আশেপাশের সবাই এখন ওসামা বিন লাদেন আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। সবাই বলছে, ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন। আমার ভাইয়ের মতামত হলো যে, ইসলাম এক জিনিস, আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস। আমি আসলে একটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে স্রষ্টায় বিশ্বাসী একজন লোক হিসেবে, আপনার কি মনে হয়, মুসলমানরা সবাই বলতে পারবে যে, ইসলাম এক জিনিস আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো, আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে। আমার বন্ধু শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার প্রশ্ন হলো, স্রষ্টা কেন মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। কুরআনের কোনো আয়াতে বা নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর হাদীসে কি এ ব্যাপারে কিছু বলা আছে যে, কি কারণে স্রষ্টা মানুষকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রশ্ন এটাই। আর আমার ধারণা, এর পরে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাব না। তাই ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার এবং ড. ফাতিমা মুসিফার আর ড. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এ প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্ন মূলত দুটি। প্রথম প্রশ্নটা ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, কেন মহান স্রষ্টা মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। প্রথম প্রশ্নটা হলো, ওসামা বিন লাদেন কেন ইসলামের নেতৃত্ব দেবে? ইসলাম এক কথা বলে আর লাদেন আরেক কথা বলে, আর আমি ওসামা বিন লাদেনকে কিভাবে দেখি? ভাই, আমি ওসামা বিন লাদেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো পরিচয় নেই। তার সাথে আমার কখনো দেখাও হয় নি।

এ প্রশ্নটা কয়েক মাস আগে আমাকে অস্ট্রেলিয়াতেও করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে করেন?' আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনকে চিনি না। তবে আমরা প্রত্যেক দিন যে খবরগুলো বি.বি.সি, সি.এন.এন ইত্যাদিতে দেখছি, আর যদি খবরগুলো সত্য বলে মেনে নেই, তাহলে তাকে সন্ত্রাসী না মেনে উপায় নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ـ

অর্থ : যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি এমন কোনো সংবাদ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়– যাতে তোমরা অজ্ঞভাবে কোনো জাতির ওপর ঝাপিয়ে পড়বে অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কখনো তার সাথে দেখাও হয় নি। খবরগুলোর সত্যতা যাচাই না করে বলতে পারছি না, সে আসলেই সন্ত্রাসী কি-না। তবে একটা কথা বলতে পারি, তাঁকে সি. এন. এন-এ সবসময় বলা হচ্ছে, এক নম্বর সন্দেহভাজন, প্রমাণ নেই। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেও বুঝবে, যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলো কোনো প্রমাণই না। অপরাধের প্রমাণ কোথায়? আমি ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বলছি না। উনি আমার বন্ধু না। আমি তাকে চিনি না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভালো। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করাটা কি যৌক্তিক? পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাতের ১১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! কোনো জাতি যেন অপর জাতিকে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে যাকে উপহাস করা হয়েছে সে তাদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো মহিলাও যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, কারণ হতে পারে উপহাসকৃতা উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের নিজেদের বড় মনে করো না এবং অপরের উপাধি নিয়ে উপহাস করো না। ঈমান গ্রহণের পর পাপাচারমূলক নামে ডাকা কতই না মন্দ কাজ। আর যারা এসব থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তারাই অত্যাচারী।

পার্থে যিনি আমেরিকার ভাইস কনসাল জেনারেল, এ একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী মনে করি কি-না? আর আসল সন্ত্রাসী কে? আমার উত্তরটা পরের দিন খবরের কাগজের হেডিং-এ এসেছিল। আমি চিন্তা

করছি সে একই উত্তরটা দেব কি-না। সেই ভাইস কনসাল জেনারেলকে আমি বলেছিলাম, বি.বি.সি আর সি.এন.এন-এর রিপোর্ট থেকে যতদূর জানি, তাতে কোনোভাবেই তাকে সন্ত্রাসী বলা যায় না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভাল। আবার এ-ও বলছি না যে, সে খারাপ। তা না হলে আল কায়েদার একজন সন্ত্রাসী পাওয়া গেছে বলে হয়তো কালই আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাবেন। তাই আমি তার পক্ষেও বলছি না, বিপক্ষেও কিছু বলছি না। যেহেতু আমি জানি না তাই প্রমাণ ছাড়া শুধু সন্দেহের বশে কাউকে আক্রমণ করা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি শুধু সন্দেহের বশে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশকে আক্রমণ করলো।

১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে শুধু আমেরিকাতেই কয়েকশ মত রয়েছে। যদি আপনি ইন্টারনেট দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে আমেরিকান সাংবাদিক, ঐতিহাসিকরাই বলছে যে, ওসামা বিন লাদেন এটি করেনি। একটু চিন্তা করেন, একজন মানুষ কোত্থেকে এতো প্রযুক্তি পাবে? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ, এফ. বি. আই-এর বাজেট কোটি কোটি ডলার। আমি একথা বলছি না যে, তারা যা বলছে তা ভুল, অথবা তারা যা বলছে তা ঠিক। আমি শুধু একটি তথ্য আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দেশ এবং ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেছি যে, কিছু লোক বলছে জর্জ বুশ নিজেই এটি করেছে। এখন আপনি যদি শুধু সন্দেহের বশে বলেন যে, বুশই আসল অপরাধী, ওকে আমার কাছে তুলে দাও, না হলে আমি আমেরিকায় বোমা মারবো। তাহলে আপনাকে পাগল বলা হবে। আমরা সি, এন.এন আর বি. বি. সি. থেকে যতটুকু জানি, তা হলো এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আপনারা জানেন, কিছু রাজনীতিবিদ তাদের সুবিধার জন্য ঘটনার মোড় ঘোরায়। আমেরিকানরাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলছে যুদ্ধটা হয়েছে তেলের জন্য, এটার জন্য, ওটার জন্য, আরো কত কি। আমি বলছিনা যে, তাদের কথা ঠিক বা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, এ কাজটি ওসামা বিন লাদেন করেছে। কিন্তু শুধু একজন লোকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই নয়। খবরের হেড লাইন ছিল যে, আমি বলেছিলাম পৃথবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু ভাইস কনসাল জেনারেলের পার্থের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। প্রশ্নকর্তাকে বলছি, ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী বলা যায় না। ইসলামে বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর সেটা যদি তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আরো বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ তথ্য পায় তাহলে সেটা কাউকে বলার আগে তা সত্য কি-না যাচাই করতে হবে। শুধু মিথ্যা খবরের কারণেই ভুল বুঝাবুঝি আর যুদ্ধ হচ্ছে। আর বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হল সাদ্দাম

হোসেন। আসলে তাদের ইস্যু তৈরি করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। তাদের সুবিধার জন্য সব কিছু মিথ্যা দিয়ে সাজাচ্ছে। আপনি যদি লাদেনকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। অনুমান দিয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাহলে বলা যায়, এখন থেকে আমেরিকার পুলিশের ড্রেস ঐ পাসপোর্টের মালমসলা দিয়ে বানানো হোক। তাহলে তাদের কিছু হবে না। চিন্তা করুন, এত বড় বিস্ফোরণ হলো, যেখানে তাপমাত্রা ছিল হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। সেখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হলো অথচ সেই জায়গায় তারা একটা পাসপোর্ট খুঁজে পেল। এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা যারা মুসলমান, যদি কোনো মুসলিম বা অমুসলিমকে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত করি, তাহলে তাকে অপরাধী বলার আগে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আমরা প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করি, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি। **কেন? কি কারণে আল্লাহ কিছু মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠান।** ভাই, এর কারণটা পবিত্র কুরআনে সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী।

এখন এ প্রশ্নে আসি যে, কেন কিছু মানুষ পঙ্গু হয়, কেউ গরিব আবার কেউ জন্মগত অসুখ (ত্রুটি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ প্রশ্নটি হিন্দু দার্শনিকদেরও সমস্যায় ফেলে। আর এ কারণে হিন্দু দার্শনিকরা একটি দর্শনের কথা বলেছে। তারা বলেন, এটি হলো "সংস্কার" জন্ম বা পুনর্জন্মের চক্র। আমি বেদসহ সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা। 'পুনঃ' মানে পরবর্তী 'জন্ম' অর্থাৎ পরবর্তী জীবন। এমনকি কুরআনেও মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলা হচ্ছে। তবে সেটা বেদের মতো না। জন্ম, তারপর মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু এমন কোন চক্র আসলে নেই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম দর্শনের একটি প্রধান ভিত্তি হলো 'কর্ম' যা ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম নির্ভর করে ধর্মের ওপর। এর একটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আছে।

আর এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু দার্শনিকরা মনে করেন যে, সম্ভবত আগের জীবনে এ লোকগুলো কোনো অন্যায় করেছিল। তাই এ জন্মে তারা পঙ্গু হয়েছে। যদিও এ কথা বেদের কোনো অনুচ্ছেদে নেই। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বেদে এ সম্পর্কে আপনি কিছুই পাবেন না। সেখানে আপনি পাবেন শুধু পুনর্জন্ম, যার অর্থ

পরবর্তী জীবন। খ্রিস্টানরা এটি বিশ্বাস করে। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু কেন কিছু মানুষ কঠিন অসুখ নিয়ে জন্মায়, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। হিন্দু দার্শনিকরা যুক্তি দেখায় যে, মানুষ মারা যায়, তারপর রূপ পরিবর্তন করে। যদি আপনি আগের জন্মে খারাপ কাজ করেন, তাহলে এ জন্মে আপনি পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন। আর যদি কোনো মানুষ ভালো করে থাকে, পরের জন্মে সে উঁচু জাতে জন্মায়। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী হলো মানুষ। এ জন্মে আপনি খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরের প্রাণী হয়ে জন্মাবেন। হতে পারে বিড়াল, কুকুর অথবা অন্য কোনো প্রাণী। আমি একটি প্রশ্ন করি, পৃথিবীতে এখন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। আর এখনকার দিনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। যদি ধরে নেই, খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরে জন্ম হয়, তাহলে তো পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে যেত।

তারপরও কথা থাকে, কেন কিছু লোক পঙ্গু হয়ে জন্মায়, কেউ গরিব আবার কারো জন্মগত ত্রুটি থাকে। এর উত্তর দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনের সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ -

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীতে আপনার জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আপনাকে দেয়া পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আপনার বিচার হবে। আর মহান স্রষ্টা এক এক জনকে এক একভাবে বিচার করেন। বাস্তবে প্রত্যেক বছর প্রশ্নপত্র বদল হয়। যদি প্রশ্ন না বদলায় তাহলে পরীক্ষাটা কোথায়? প্রশ্ন প্রতি বছর বদলাবেই।

একইভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কিছু মানুষকে তিনি সম্পদ দেন। আর যদি কাউকে তিনি সম্পদ দেন, ইসলামিক শরিয়া বলে, আপনার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করে দিতে হবে। যেটাকে বলা হয় যাকাত। গরিব লোককে কোনো যাকাত দিতে হবে না। সে যাকাতের ১০০% পাবে। আর ধনী লোকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে। যীশু খ্রিস্ট বলেছেন– 'ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।'

আর মহানবী মোহাম্মদ ﷺ বলেছেন, 'ধনী লোকের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন।'

যদি ভালো করে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, মহান স্রষ্টা আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়েই আপনার বিচার হবে। যদি তিনি আপনাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, আপনাকে যাকাত দিতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে

তবে যাকাত দিতে হবে না। কেন কিছু মানুষকে আল্লাহ পঙ্গু করে বানায়? এ ছোট শিশুর অপরাধ কি? সে কি অন্যায় করেছে?

আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। ইসলাম আমাদের বলে যে, প্রত্যেকটি শিশুই মানুষ। প্রত্যেক শিশুই নিরপরাধ আর নিষ্পাপ। হতে পারে এটি বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তোমার সম্পত্তি, সন্তান আর স্ত্রী হলো তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। হয়তো আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করছেন। হতে পারে বাবা-মা খুব ধার্মিক। এখন স্রষ্টা তাদের সন্তানকে পঙ্গু করে আরো কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। স্রষ্টা হয়তো দেখতে চাচ্ছেন, এখনো কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো? আর পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও ততো বড়। যেমন ধরুন, যখনই আপনি এম. বি. বি. এস পাস করবেন, আপনার নামের আগে ডাক্তার লেখা হবে। পরীক্ষাটা কঠিন; কিন্তু যখনই আপনি পাস করবেন, আপনি একজন ডাক্তার। সম্মান অনেক বেশি। পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। আর আল্লাহ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মেছে, তার মানে এ নয় যে, সে আগের জন্মে কোনো অন্যায় করেছে। সে নিষ্পাপ। তার এ পঙ্গুত্ব হয়তো তার বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। হতে পারে এটা তার নিজের জন্যই পরীক্ষা।

আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে এখনো স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে কি-না। আর এজন্য আল্লাহ কিছু মানুষকে গরিব ঘরে পাঠান আবার কিছু মানুষকে করেন ধনী। কিছু মানুষ ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। আর কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মায়। আর আল্লাহ বিচার করেন পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। চিন্তা করেন, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু লোক যদি পঙ্গু থাকে তারা ৫০ মিনিট আগে থেকে দৌড় শুরু করে। কারণ, হয়তো তার পায়ে সমস্যা আছে, আর এ কারণে সে শুরু করে ৫০ মিনিট আগে থেকে। যদি আল্লাহ কোনো মানুষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেয়, তাহলে তিনি সেভাবেই বিচার করবেন। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়, তাহলে শিক্ষক সহজভাবে খাতা দেখেন। আর যদি প্রশ্ন সহজ হয়, তাহলে শিক্ষক কঠিনভাবে খাতা দেখেন। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ভাষায় ও আলাদা আলাদা পরিবেশে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যে পরিবেশ দিয়েছেন, যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেভাবেই তার বিচার করবেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৪. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যে বইগুলো লেখা হয়েছে, তা নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই বিশ্বাস করে যে, আমাদের ধর্ম ভুল, আমাদের কুরআন ভুল, আমাদের নবীরা ভুল। আর এটি যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে অনেক খ্রিস্টান আছে যারা বাইবেল বিশ্বাস করে। বাইবেল যে

নবীদের কথা বলছে, কুরআনও তাদের কথা বলছে। যীশু খ্রিস্ট, মূসা (আ) আমাদেরও নবী। তাহলে সন্ত্রাসী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয় কেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা ভালো। যখন কুরআন আর বাইবেলে এতো মিল, তখন মুসলমানদের এতো অপদস্থ করা হয় কেন? আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এ 'মৌলবাদী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল খ্রিস্টানকে বুঝাতে। প্রায় একশো বছর আগে, চার্চের বিরোধিতা করে এমন একদল খ্রিস্টানকে বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম খ্রিস্টানদের বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখন দাবার ছক পাল্টে গেছে। তারা টেবিলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তারা এখন মুসলমানদের মৌলবাদী বলে। ব্যাপারটা এরকম কেন? আমাদের সাদৃশ্যের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। বোন আমি সেখানে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যের কথা বলেছি। সাদৃশ্য আছে কুরআন ও বাইবেলেও। তাহলে আসুন, আমরা সবাই অন্ততপক্ষে সাদৃশ্যগুলো মেনে চলি। পার্থক্যগুলো পরে আলোচনা করা যাবে। তাহলে ওরা কেন এমনটা করছে? কারণটা সহজ। আমি আগেও বলেছি যে, পৃথিবীতে এখন ইসলামের অনুসারী বাড়ছে সর্বোচ্চ গতিতে। ঐ লোকগুলো হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, ইসলামের যেভাবে বিস্তৃতি ঘটছে, তাতে করে ওরা এখন যা করছে সে কাজগুলো তাদেরকে বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন ৫. (মহিলা) ঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম ওয়াসেপ জাগরা। আমি একজন আইনের ছাত্রী। প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সন্ত্রাস ও ইসলামের ওপর এ তথ্যবহুল বক্তৃতা দেয়ার জন্যে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সম্পর্কে যেগুলো আসলে ইসলামিক আর তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করে সেগুলো সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আপনিই বলেছেন যে, ইসলাম নির্দেশ দেয় যে নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের ক্ষতি করা বা হত্যা করা যাবে না। কিন্তু অনেক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে যেখানে নারী ও শিশুরা মারা গেছে। আপনি এদের সম্পর্কে কি বলবেন? আপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ার কারণ কি? ইসলাম যখন বলে নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না; তখন অনেক বোমা বিস্ফোরণে নারী ও শিশু হত্যার কারণটা কি? এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। কোনো কট্টর সন্ত্রাসীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার কখনো সাক্ষাত হয় নি। তবে আমি কারণটা যুক্তি দিয়ে

বলতে পারি। প্রথমত, কিছু মানুষ হয়তো আসলেই নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। তারা হয়তো কুরআনের নির্দেশ মানছে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এদের মধ্যে মানব ইতিহাসে এক নম্বর সন্ত্রাসী হলো হিটলার। সে ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল। এজন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করতে পারি? হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল বলে খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করা যাবে না। আপনি যদি পৃথিবীর সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর হত্যাকাণ্ডগুলো দেখেন, তাহলে আমার মনে হয় না সব মিলিয়ে ষাট লক্ষ হবে। একজন মানুষ একাই ষাট লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল– আবার দেখেন, মুসোলিনী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তার অর্থ-এ নয় যে, আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দায়ী করবো। যারা সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে তারা নিজেদের মুসলমান বলতে পারে আর এটা ভুলও হতে পারে।

দুই নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে যে, ঐ লোকগুলোকে অপদস্থ করা হয়েছে। লোকগুলো হয়রানির শিকার হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন এখন কোনো ইন্ডিয়ান দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে? কিন্তু একশো বছর আগে অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন ভাই জাকির, কেন একশো বছর আগে অনেক ইন্ডিয়ান তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো? কারণটা সহজ। তখন ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া শাসন করতো–এ কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো।

আজকে ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না। সেজন্যে হতে পারে এ মুসলমানরা যারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। হতে পারে তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। যেমন প্যালেস্টাইন। আপনি যদি ইতিহাস ঘাটেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসে নি, তখন তাদের যা ছিল তা নিয়েই মোকাবেলা করেছে। যেমন ধরুন, বাইবেলের সেই ঘটনাটা যেটা ডেভিড আর গোলাইয়াথ (দাউদ আর জালুত) মধ্যে একটা পাথর নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।

তাই দোষটা কাদের দেয়া যায়? দোষটা আসলে আমাদেরই। কারণ আমরা এ সমস্যার মূল কারণটা খুঁজছি না। যদি কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন থাকে, তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কি কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধু এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আপনি একজনকে হত্যা করলে দশজন আসবে। তাই আমাদের পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কি? কোন্ কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এর মূল কারণ।

উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করলো এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনিরা বলেছিল, 'আহলান ওয়া সাহলান।'

তোমরা আমাদের জ্ঞাতি ভাই। আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোনো অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বললেন, 'সন্ত্রাসী'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসী? শুধু মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর এখন আমিই কি-না সন্ত্রাসী।

কাকে দোষ দেব? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সমস্যাটা কোথায়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি আপনি মূল কারণটা দেখেন তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে কেন সে আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? আপনারা যদি কোনো মনোবিজ্ঞানীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, কেন তারা এগুলো করছে? সে ক্ষেত্রে আপনি অনেক সময়ই দেখবেন যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ আছে।

আর কারণটা হচ্ছে, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসী। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। এ ব্যাপারে আমি একমত। আমি মনে করি এদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। হতে পারে তারা মুসলমান, হতে পারে তারা হিন্দু, হতে পারে তারা খ্রিস্টান। যখন মানুষ আর তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তখন তার একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তখন সে বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে একথা বলতে পারি যে, মানুষের স্বভাব হলো অত্যাচারিত হলে তার শোধ নেয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙ্গুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন আমাদের এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই আমাদের মূল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং সব মানুষ এক জাতি হিসেবে একসাথে বসবাস করতে পারবে।

প্রশ্ন ৬. আমার নাম রবিঠাকুর। আমি একজন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই আমি ইন্ডিয়ান ভাইদের অনুরোধ করছি যে, সবসময় ১১ সেপ্টেম্বরকেই সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করবেন না। কারণ, ইন্ডিয়াতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীরে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। দুই হাজার মুসলমান ভাই মারা গেছে গুজরাটে। তাই এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে যাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। শুধু ইন্ডিয়াতেই যেমন ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করতে পারি। সেদিন কিছু লোক আখকসাধামের মন্দিরে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। এটাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি মি. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রশ্নটা হলো– আপনি বলেছেন যে, শুধু একজন লোকের কারণে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায় না। এখন আমি আপনাকে একটা কাল্পনিক ঘটনা বলি। ধরুন, আমি কোনো আরব দেশে গেলাম। সেখানে লক্ষ-কোটি মানুষ মেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়ায় চলে আসলাম। তারপর সেই দেশটা প্রমাণ দেখালো ইন্ডিয়ার সরকারকে, যে এ লোকটা আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার সরকার বলছে তোমরা যে প্রমাণ দেখিয়েছো তা অকাট্য নয়। আর সেই প্রমাণের ব্যাপারে অন্য দেশগুলো সবাই একমত। এখন ধরুন সেই দেশটা বারবার বলার পরও আমাকে দেয়া হচ্ছে না। তখন সেই দেশটা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে?

আর একটু বলে আমি শেষ করতে চাই যে, এ দেশটার ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ছিনতাই করা বিমান তাদের দেশে এসেছে এবং তারা ছিনতাইকারীদের উৎসাহ দিয়েছে এ ব্যাপারে। তারা সন্ত্রাসীদের সেই দেশ থেকে ছিনতাই করা বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। যদি এ হয় দেশটার অবস্থা তাহলে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে সেই অভিযোগকারী দেশটি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং তুলনাটাও চমৎকার। তিনি নিজেই ১১ সেপ্টেম্বরের তুলনাটা সুন্দর দিয়েছেন। তিনি একজন ইন্ডিয়ান, আরব দেশে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ইন্ডিয়াতে ফিরে আসলেন। আর সেই আরব দেশটি ইন্ডিয়াকে এ ব্যাপারে প্রমাণ দেখালো। কিন্তু ইন্ডিয়ান সরকার সেটা মেনে নিল না।

মোল্লা ওমর কিন্তু আমার বন্ধু না। তিনি আমেরিকাকে বলেছিলেন– আমাকে প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ দেখাতে পারে নি। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি ব্লেয়ারকে। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে মোশাররফকে। মোশাররফ বলেছেন যে,

আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর আপনি আফগানিস্তান সরকারকে বলছেন যে, অপরাধীকে দিয়ে দাও। আফগানিস্তান সরকার বলছে, কিছু একটা প্রমাণ দেখান। তারা প্রমাণ দেখাতে পারে নি আফগানিস্তান সরকারকে। তারা প্রমাণ দেখায় টনি ব্লেয়ারকে। এটা অযৌক্তিক। তাহলে কি তাদের প্রমাণে সন্দেহ ছিল? এমনকি এখনো ওসামা বিন লাদেন হলো প্রধান সন্দেহভাজন। এটা শুধুই অনুমান। প্রমাণ হতে হবে অকাট্য। আর যদি তারা অকাট্য প্রমাণ দিত যে, ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে, তাহলে অবশ্যই আফগানিস্তান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে দিয়ে দিত। আপনি কোনো আরব দেশের যদি ক্ষতি করেন আর সেই আরব দেশ যদি প্রমাণ দেখায় এবং ইন্ডিয়ান সরকার এতে আপত্তি জানায়, তখন আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মামলাটা কোথায়? আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা আছে। যদি দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় নীতি থাকে, তাহলে অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ইন্ডিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা আছে।

যদি কোনো অপরাধী কোনো অপরাধ করে ইংল্যান্ডে যায়, তারা ঐ অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হলো নাদিম। আপনারা সেই সঙ্গীত পরিচালক নাদিমকে হয়তো চেনেন। ইন্ডিয়ার সরকার বললো যে, গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সে যুক্ত ছিল। তাই যখন ইন্ডিয়ার সরকার প্রমাণ দিল ইংল্যান্ডের সরকারের কাছে, ইংল্যান্ডের আদালতে। তখন ইংল্যান্ডের আদালত বললো যে, আপনাদের প্রমাণ একেবারে অর্থহীন। তারা ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। আর ইন্ডিয়ার সরকার নাদিমের উকিলের খরচ দিতে বাধ্য হলো। ইন্ডিয়ার সরকার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তারা একমত হয় নি। তারা বলেছে, আপনাদের প্রমাণ অকাট্য নয়। এ ঘটনার পর ইন্ডিয়া কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? কেন ইন্ডিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নি? ইন্ডিয়া সরকার তো নিজেদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে আমেরিকা আফগানিস্তানকে কোনো প্রমাণ দেয় নি। তাই যদি এখনো আপনি সৌদি আরব বা কোনো আরব দেশে যান এবং সেখানে ক্ষয়-ক্ষতি করেন এবং সৌদি সরকার এ ব্যাপারে প্রমাণও দেয় যে আপনি আসলেই একজন অপরাধী এবং এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া সরকার একমত না হয়, তাহলে সৌদি সরকার কোটি কোটি ইন্ডিয়ানদের বোমা মেরে মেরে ফেলতে পারে না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না। হতে পারেন আপনিই অপরাধী, হতে পারেন আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন। তাদের যদি শক্তি বা ক্ষমতা থাকে তারা এসে আপনাকে ধরতে পারে। তারা লোকদের বোমা মারতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না। একই ঘটনা দেখেন কাশ্মীরে, গুজরাটে, আখকসাধমে। আমি বলবো আগে যাই ঘটে

থাকুক না কেন ঐ দুই সন্ত্রাসী ভেতরে ঢুকেছিল? ইসলাম ধর্মে আপনি মন্দির ধ্বংস করতে পারেন না। আপনি ধর্মীয় লোকদের হত্যা করতে পারেন না।

কেউ যদি কোনো উপাসনালয়ে বা গীর্জায় গিয়ে নিরীহ লোকদের হত্যা করে সেটা কুরআনের বিধানের বিরুদ্ধ করা হবে। তাই আমরা এর নিন্দা জানাবো। যে দু জন লোক এ ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের কাছে একটি চিঠি ছিল। সেখানে লেখা ছিল তারা তাহরীফ কিসাস থেকে এসেছে। 'কিসাস' আরবি শব্দ। যার অর্থ হতে পারে প্রতিশোধ। আর সেখানে বলা হয়েছে যে, হতে পারে তাদের পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তাদের পরিবারকে হত্যা করাও হয়, তবুও তাদের ঐ ৪৪ জনকে হত্যা করার অধিকার নেই। কারণটা হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু কাজটা ছিল ভুল। যদি তারা জানতো যে, কে তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে? আর তারা সেই লোকদের কাছে যেয়ে প্রতিশোধ নিত তাহলে ঠিক ছিল। কিন্তু তাই বলে চুয়াল্লিশ জন নিরীহ লোককে হত্যা করতে পারে না। যদিও আসল অপরাধী কে এ বিষয়ে জানা যায় না। আমি আগেও বলেছিলাম, পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢبِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط

অর্থ : এ জন্যই আমি বনী ইসরাঈলদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো লোককে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করলো।

শুধু যদি আপনি জেনে থাকেন কেউ কোনো অন্যায় করেছে বা কাউকে হত্যা করেছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তা না হলে আপনি কাউকে হত্যা করতে পারবেন না। ইসলাম এ বিষয়ে নিন্দা করে। ইসলামে বলা হয়েছে, এটা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৭. আস্‌সালামু আলাইকুম, একজন মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নটা করতে চাই। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, কোন পক্ষে যাব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, কোন্‌টা সঠিক আর কোন্‌টা ভুল। যাবতীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের কাজকর্ম দিয়েই কোনো ধর্মকে বিচার করা যায় এটা আজ প্রমাণিত। এ যুক্তিটা ধরে নিয়ে কিভাবে আমি মনস্থির করবো বা কিভাবে আমার বিশ্বাসকে ঠিক রাখবো? আমার সাথীদের সাথে বেশ কিছু ব্যাপারে মতের অমিল হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে

আপনি সাদ্দাম হোসেনকে বা পারস্যের মুজাহিদদের অনুভূতিকে অথবা প্যালেস্টাইনি আত্মঘাতী যোদ্ধার মৃত্যুকে সমর্থন করেন কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনা নিয়ে। তিনি জানেন না কোন্‌টা তার জন্য ঠিক। কার সাথে তিনি একমত হবেন এবং কার সাথে হবেন না। তার এখন কি করা উচিত? তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি প্যালেস্টাইনের মুজাহিদদের বা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করি কি-না ইত্যাদি। বোন, আমি আগেও বলেছি যে, এগুলো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি। সবকিছুর একটা লুকানো কারণ থাকে। এ ব্যাপারটা ভুল না ঠিক তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি যার কারণে আমার মনে হয় এটার কারণ হাতে গোনা কিছু লোক। আর রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কারণেই কাউকে বানানো হচ্ছে কোরবানির গরু। আর এটাই কারণ যে, তারা দেখতে চায় যে কাজ হচ্ছে।

কেউ মুসলমান হিসেবে যদি আমাকে প্রশ্ন করে তাহলে আমি শুধু তাদেরকে সত্যটা অনুসরণ করতে বলবো। যদি কেউ তাদের ক্ষতি করে থাকে, যদি কেউ তাদের হত্যা করে থাকে, অত্যাচার করে এক্ষেত্রে যদি তারা মোকাবেলা করে তাহলে ঠিক আছে। তা না হলে তারা পারবে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন বা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আমি বলবো, আমি পুরো ঘটনা জানি না। তাই আমি ফতোয়া দিতে পারি না। আমি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ আমি তাদের সাক্ষাৎকার নেই নি। আমি মতামত দিতে চাইলে আগে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। তাই আমি বলি আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ আমাকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন না যে, ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী কি-না। আমি বলবো সে যদি ভুল কিছু করে থাকে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে সে ভুল করেছে। আর যদি সে নিয়মনীতি না লঙ্ঘন করে তাহলে ঠিক আছে। এটার ওপর ভিত্তি করে আমি পরীক্ষায় পাস করবো না।

আমাকে ধর্মগ্রন্থ কুরআন পড়তে হবে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা যারা বিভিন্ন জায়গায় যায়, কিংবা আফগানিস্তানে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয় ইত্যাদি। এগুলো আমরা খবরের কাগজেও দেখি। আপনাকে আমাকে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন না যে, সাদ্দাম হোসেন একজন সন্ত্রাসী ছিল কি-না? আমরা বলতে পারি এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা তাদের সমর্থনও করি না। তাদের নিন্দাও করি না। যদি একজন লোকের বিরুদ্ধে বা কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থাকে যে, সে যেটা করেছে তা কুরআনের বিপক্ষে। তাহলে আমরা তাকে নিন্দা করবো। কিন্তু যদি কোনো প্রমাণ না থাকে বা আংশিক প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কুরআন এটাই বলে। আর এ

ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হবে না, বোন। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে সেটাই হবে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি।

বিশ্বাস আনার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো কুরআন পড়া। আপনি কুরআনে কোনো খুঁত বা পরস্পর বিরোধী কিছু পাবেন না। যদি কেউ আরবি ভাষা বুঝতে না পারে, তাহলে তাকে কুরআনের অনুবাদ পড়তে হবে। তাই বোন, আপনি যদি কুরআনের নির্দেশগুলো পড়েন যে কিভাবে জীবন ধারণ করতে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার বিশ্বাস মজবুত হবে। আর বিশ্বাস করেন, কুরআনের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে আপনি মোটেও লজ্জাবোধ করবেন না। যদি আপনার বুদ্ধি আর যুক্তি থাকে তাহলে বুঝবেন, কেন এ নীতিগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনি জানেন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সেসব জায়গায় আমি কথা বলি এ টুপি পরে আবার আমার দাঁড়িও আছে। আমি অনেক পশ্চিমা দেশে গিয়েছি কখনো কোনো সমস্যায় পড়ি নি। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোনো সমস্যা হয় নি। সত্যি বলতে মনে ভয় পাব কেন? আর যদি আপনার যুক্তি-বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি গর্ববোধ করবেন। এমনকি আমার মতো আপনি নিজেকেও বলবেন, মৌলবাদী।

প্রশ্ন ৮. আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আব্দুল্লাহ। স্যার আমি ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি বলেছেন যে, সেখানে সন্দেহজনক কিছু ছিল বলে তারা প্রমাণটা দেয়নি। আমি প্রমাণটা পেয়েছি ইন্টারনেটে। একটা সাইট ছিল আই.এন.আই.এস. ডটকম বা আই.এন.আই.এন ডট নেট। এটা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সেখানে দুটো ছবি পাশাপাশি দেখেছিলাম। একটাতে এক অভিনেতার ছবি যে একটা ফিল্মে ওসামা বিন লাদেন সেজেছিল সবাই দেখেছে সেটা। আর অন্যটা ওসামা বিন লাদেন। আর শিরোনাম ছিল একজন, একজন বোকাও দুচোখ দিয়ে সহজেই চিনে বলতে পারবে যে, এ দুজন লোক এক নয়। এটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমেরিকা দিয়েছিল। আরেকটা ব্যাপার হল যে, আমি চাকুরি করি এইচ.এল-এ। আমাদেরকে একটা হ্যান্ডবুক দেয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব আর কর্তব্য লেখা আছে (কি করবো আর কি করবো না)। হ্যান্ডবুকটার প্রথম পৃষ্ঠার ওপর ভগবতগীতার শ্লোকের একটা অংশ লেখা আছে। আমি পুরো শ্লোকটা বলছি যে, 'ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য, গ্লানি ভুবতি ভারতা, আব্যুস্থানা নামা ধর্মস্য, যব আত্মানাম সদাবিহম, পরিত্রনায় সাধুনাম, বিনাশায় চতুষ্কতা, ধর্ম সংস্থাপনার সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।'

তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে,'পরিত্রনায় সাধুনাম বিনাশয় চতুষ্কতা।' আমি আপনি সত্য অথবা ভালকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে

খারাপকে দূর করতে হবে। অন্য কোনো উপায় নেই। তারপর আমি শেষের দিকের শ্লোকটা বলছি সেটা হলো– 'ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।' এর অর্থ হলো– ঈশ্বর বলছেন যে, আমি সব যুগেই পৃথিবীতে আসি। এটা হলো আমাদের হিন্দু ভাইদের বিশ্বাস। আমি মি. জাকির ভাইকে এটার ব্যাখ্যা করতে বলবো। আমাদের এই যে বিশ্বাসগুলো আছে এগুলো ঠিক না ভুল? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আবার অনুরোধ করছি দর্শকদের এবং ভলান্টিয়ারদের যাতে অমুসলিমদের থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। যাতে তাদের ভুল ধারণাগুলো ভাঙ্গাতে পারি। আর তারপর মুসলমানদের কাছে আসবো। তারা অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকছেন। আমি চাইবো অমুসলিমরা বেশি করে প্রশ্ন করুন। আপনারা প্রত্যেকদিন ইসলামের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ পান না। ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন তার আগে একটা মন্তব্য করেছেন। তিনি ইন্টারনেটে দেখেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন আসলে নকল। আবার এ প্রমাণটাতেও সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে। তাই আমি একপক্ষ নিয়ে বলছি না যে, আপনি যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটা সঠিক। এ প্রমাণটাও আমেরিকার কোনো শত্রুর বানানো হতে পারে। তাই আমি এ প্রমাণটাও বিশ্বাস করি না। তাই আপনাকে হতে হবে নিরপেক্ষ। আমি পক্ষপাত করে বলতে পারি না যে, হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলেছেন। যেমন ঘটেছিল তেহেলকাতে যা আপনি হয়তো জানেন। তেহেলকার সেই অডিও ক্যাসেট আর ভিডিও ক্যাসেটের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এ সব কিছু তো মনোযোগ আকর্ষণের ফন্দি।

আমি একজন মিডিয়ার লোক তাই আমি জানি আমরা যদি চাই খুব সহজে সত্য বদলাতে পারি। মিডিয়াতে কোনো কিছু বদলে দেয়া খুবই সহজ। আপনি যে কথা মোটেও বলেননি আমি সেটাই দেখাতে পারি। এটা খুবই সোজা। মিডিয়ার কথা বাদ দেই। আবারও বলছি, আমি জানি না এটা ভুল না ঠিক। যেহেতু কোথাও কোনো প্রমাণ নেই। আপনার প্রশ্নটাতে আসি। ভাই যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, 'যখনই অধর্ম হয়, যখনই অসত্য আসে, মিথ্যা আসে, যখনই পৃথিবীতে অরাজকতা আসে, তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তিনি আসেন এবং মানুষের রূপ অবতার গ্রহণ করেন। আর তিনি পৃথিবীর অরাজকতা, বিপদ, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে আসেন।'

প্রশ্ন ৯. শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম রাজকুমার। আমি এম. বি. বি. এস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমার প্রশ্নটা হলো ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কেন সবসময় ইন্ডিয়ান সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? কেন ইন্ডিয়ার মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মুসলমানরা সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে। ভাই আমি কমন সিভিল কোর্টের পক্ষে। কিন্তু সেই সিভিল কোর্টকে হতে হবে সবচেয়ে সেরা যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় (যেখানে হাতে হাতে বিচার পাওয়া যায়)। আমি এটার পক্ষে। এমনকি ইন্ডিয়ার সমস্ত মুসলমান এর বিরোধিতা করলেও আমি ডা. জাকির নায়েক এটার পক্ষে তর্ক করতে রাজি আছি। আমি যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজি আছি যে, কোন্ নিয়মটা সেরা? যে আইনটা সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সেটাই প্রয়োগ করেন। আমি এখানে বলবো যে, ইন্ডিয়াতে কমন সিভিল কোর্ট থাকুক এমনকি কমন ক্রিমিনাল কোর্টও। কিন্তু আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে, কোন্ আইনটা সেরা। যেমন, একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? আমি উত্তর দিয়েছিলাম। মানুষ সেটার প্রশংসাও করেছিল। আপনি এ উত্তরের সাথে একমত হলে আপনাকে কমন সিভিল কোর্টে লিখতে হবে যে, একজন পুরুষ একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। আমরা জানি পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। এর জন্য কোনো সমাধান নেই। কোনো ধর্মই এর সমাধান দেয় নি। যদিও কোনো ধর্মই বলে না যে মাত্র একটাই বিয়ে করেন। শুধু ইসলাম ছাড়া।

আর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম হিজাবের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নিয়ে। আমি উপমা দিয়েছিলাম যে, যে শাস্তিটা সর্বোচ্চ তার ফলাফলও সবচেয়ে ভালো। যেমন, ইসলাম বলে মহিলাদের হিজাব পরা উচিত। কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে দেখলে তার দৃষ্টি নিচু করবে। আর তারপরেও যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করে, সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, যেটা হলো মৃত্যুদণ্ড। আর আমি আমেরিকার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলাম যে, এফ. বি. আই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে প্রত্যেক দিনে ১,৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে গত দুই ঘণ্টা ধরে আছি। এ সময়ের মধ্যে ২০০ শত এরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমি বলছি যে, যদি আপনারা ইসলামী শরিয়া প্রয়োগ করেন যে, যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকাবে, সে তার দৃষ্টি নিচু করবে। প্রত্যেক মহিলা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধু মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমি একটা প্রশ্ন করছি যে তাতে কি ধর্ষণের হার বাড়বে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? অবশ্যই কমে যাবে। এটাই হলো বাস্তব আইন।

আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যে, বিবিসিতে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বলা হচ্ছিল– নাইজেরিয়া সম্পর্কে যারা ইসলামী শরিয়া মোতাবেক ধর্ষণের

শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেছিল। আর তখনি ধর্ষণের ঘটনা সেখানে কমে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভাল তার প্রশংসা করা উচিত। আমি এলকে আদভানিকে অভিনন্দন জানাই। আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডই হবে একজন ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। তিনি ইসলামের কাছাকাছি এসেছেন। হয়তো এর পরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন যে, সব মহিলাদের হিজাব পরা উচিত।

প্রশ্ন ১০. আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম ইয়াশার ফাহামী। আমি এসেছি ইরান থেকে। আপনি নিশ্চয়ই সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস পড়েছেন। একজন মুসলমান হিসেবে কেউই বইটা পছন্দ করবে না। আপনি কি মনে করেন, ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করেন সেটা সঠিক ছিল?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন, সালমান রুশদী সম্পর্কে ইমাম খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা সঠিক ছিল কি-না? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এক বছর পর কেন ইমাম খোমেনি ফতোয়া জারি করলেন? যে দেশ সবার আগে সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিষিদ্ধ করেছিল সেটা হলো ইন্ডিয়া। আমি রাজিব গান্ধীকে এ কাজটা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেন ইমাম খোমেনি সালমান রুশদীকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করলেন এক বছর পরে? কারণ, তাকে নিয়ে কোনো খবর তৈরি হচ্ছিল না। এসবই রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের খেলা। আপনি যদি ফতোয়া দিতে চান, আপনি সেটা দেবেন। বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমালোচিত হয়েছে। অনেক দেশ এটা নিষিদ্ধ করেছে। আর তিনি ফতোয়া দিলেন সেটা পরের কথা। এসবই রাজনীতির খেলা কিন্তু রাজিব গান্ধী যা করেছিলেন হয়তো তিনি এটা জানতেন না। আমি আগেও স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে কথা বলেছি। যদিও বইটা ইন্ডিয়াতে নিষিদ্ধ, আমি বইটা পড়েছি।

আপনারা জানেন সালমান রুশদী বলেছে যে, সে আগে মুসলমান ছিল। সে কাউকেই বাদ দেয়নি। তার বইতে সে রাণী এলিজাবেথকে ছোট করেছে (গালাগালি দিয়েছে)। আর সেই একই ব্রিটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের জন্য এক আমেরিকান লেখকের বই নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি (চার অক্ষরের একটি শব্দের জন্য) ফাদার, আংকল, কাজিন, কিং সবার প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কূটনীতিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। আর এ সালমান রুশদী শব্দটাকে আরো ভয়াবহ করলো। সে তার সাথে আইএনজি যোগ করল। তারপরও বইটা খুব জনপ্রিয় হলো। তাহলে একজন আমেরিকান লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হলো মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেয়ার জন্য। অন্য আরেকজন লোক

সেটাকে আরো ভয়াবহ করলো। অথচ সে পুরস্কার পেল। কিন্তু কেন সে পুরস্কার পেল? কারণ সে ইসলামের নিন্দা করেছে। এতে তারা খুব খুশি। আর আপনি কি জানেন, সে বাদ দেয়নি রাম আর সীতাকেও। আপনারা জানেন এদেরকে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান শ্রদ্ধা করে। সে তাদেরকেও ছোট করেছে (অপমান করেছে)। আমি শব্দটা আর বলতে চাই না। সে তাদেরকেও ছোট করেছে, তাদেরকেও ছাড়ে নি। আর অনেক লোকই সেটা সমর্থন করে। পরে রাজিব গান্ধী বইটি পড়ে বুঝতে পারেন যে, এখানে কাউকেই বাদ দেয়া হয় নি। সে সবসময় নিন্দা করে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে বলেছেন–

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ط

অর্থ : যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে– তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পা সমূহকে কর্তন করা হবে অথবা দেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে।

আর এ আইন শুধু কুরআনে নয় বাইবেলেও আছে। আপনি যদি 'বুক অবলেভিটিকাস' পড়েন তাহলে সেখানে দেখবেন যে, 'কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর।' এমনকি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকও তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাহলে এ আইন সব ধর্ম গ্রন্থেই আছে। বেশির ভাগ ধর্মেই ঈশ্বরের নিন্দা করা সেটা হতে পারে খ্রিস্টান ধর্মে, হতে পারে ইসলাম ধর্মে, হতে পারে ইহুদি ধর্মে— জঘন্য অপরাধ। স্রষ্টার বিরোধিতা যদি সেটা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয়, যদি অন্য দেশের সীমানার মধ্যে হয়, তাহলে আমরা ফতোয়া দিতে পারি না যে, তাঁকে হত্যা করা হবে। যদি সেই দেশে ইসলামী আইন থাকে, তাহলে কেউ স্রষ্টার বিরোধিতা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং কিছু নিয়ম-কানুন আছে।

কিন্তু রাজনীতিবিদরা হোক সে মুসলিম রাজনীতিবিদ অথবা কোনো অমুসলিম রাজনীতিবিদ, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য আপস করছে। আমি দুঃখিত আমি কোনো রাজনীতিবিদকে ছোট করতে চাই না, আঘাত করতে চাই না। সবাই না হলেও আমি বলবো বেশির ভাগ রাজনীতিকই এটা করছে। আর ঠিক এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম আর রাজনীতি দুটো আলাদা জিনিস। কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা খ্যাতি অর্জন করে।

আমাদের বুঝা উচিত, খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা আমার মতে রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কৌশল। কিন্তু রাজিব গান্ধী বইটি নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছিলেন। তিনিই প্রথম বইটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হচ্ছে। আমি জানিনা এ নিষেধাজ্ঞা ওঠে গেছে কি-না। তবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে বলা আছে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইসলাম ধর্মে হত্যা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত চারটা পথ রয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মে একটাই পথ। ইসলাম ধর্মে চারটা পথ আছে। যে কোন একটা বেছে নেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১১. শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমি টিয়া অনুরাগী, আইনের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার ধারণা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যায়। যদি মানুষকে সহিষ্ণুতা (সহনশীলতা) শেখানো যায়, নিদেনপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কমানো যায়। ইসলাম কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোনো শিক্ষা বা উপদেশ দেয়? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে যে মানুষগুলোর ওপর ইসলাম ধর্মের এ দায়িত্বগুলো রয়েছে। [আমি আসলে শব্দগুলোর (নামগুলোর) সাথে পরিচিত না। যেমন হিন্দু ধর্মে গুরুরা আছেন] যারা ইসলাম সম্পর্কে উপদেশ/শিক্ষা দেন অন্য মুসলমানদের তারা কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সহনশীলতার মাধ্যমে সন্ত্রাস কমানো যায়। আর ইসলাম সহনশীলতার শিক্ষা দেয় কি-না। বোন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, যে কোনো মানুষের জন্য জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে হলে অনেক শর্তের মধ্যে একটি হলো সহনশীলতা। পবিত্র কুরআনে সূরা আল-আসরের ১ থেকে ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু তারা ব্যতীত যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়।'

মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়ার নাম হল দাওয়া। সহনশীলতা হলো জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আপনি যদি সহনশীল না হন তাহলে সূরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। শুধু সহনশীল হলেই চলবে না, অন্য মানুষকে সহনশীলতার পথে আনতে হবে। তবে 'সহনশীলতা' শব্দটার অনেক রকম অর্থ করা যায়। আর বিশেষজ্ঞরাও বলবে যে, সহনশীলতার একটা সীমা আছে। সহনশীলতা বলতে আপনি কি বুঝেন? কেউ যদি আপনার সাথে অন্যায় কিছু করে আপনি প্রতিশোধ নিলেন না, খুব ভাল। কিন্তু কত দিন করবেন? তাই সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। আর ইসলাম ধর্মে জালিম সেই লোক যার কাজ হলো যুলুম করা। অর্থাৎ, আপনি বলতে পারেন, যে লোক সবার ক্ষতি করে সেই যালিম। যুলুম দুই প্রকারের রয়েছে। একজন ক্ষতি করে অন্য মানুষের আর আরেকজন ক্ষতি করে নিজের। এ দু'প্রকারের লোককেই

যালিম বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যেটা সহীহ মুসলিম হাদীসে উল্লেখ আছে যে, 'যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তাহলে সেটা হাত দিয়ে বন্ধ করো। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পার তাহলে তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ করো। তোমার জিহ্বা দিয়ে বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা করো। আর যদি তুমি এটা করো তাহলে তুমি একেবারে নিচের স্তরের বিশ্বাসী।'

তাই আমাদের কি করতে হবে? আমাদের সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা আল বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ـ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

তবে সবর– এরও একটা সীমা আছে। সহনশীলতার একটা সীমা আছে। যদি আপনি দেখেন একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আপনি ঐ মহিলাকে বলতে পারবেন না সহ্য করেন, সমস্যা নেই। যদি স্রষ্টা আমাকে শক্তি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করবো। যদি না পারি তাহলে বলবো আরে ভাই, দয়া করে ধর্ষণ করবেন না। মুম্বাইতে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, একটা ১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে চলন্ত ট্রেনে একজন মাতাল ধর্ষণ করেছে। সেখানে পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন একটু আপত্তি তুলেছিল আর সবাই তাকে বাধা দিয়েছিল। পাঁচজন মানুষ ইচ্ছে করলে একজন মাতালকে ঠেকাতে পারতো। মাতালটা একটা পাঁড় মারলো আর তারা কিছুই করলো না। মানবতার আজ হয়েছেটা কি? মানুষ আজ কোথায় গিয়েছে? পাঁচজন সামর্থ লোক একজন মাতালকে ঠেকাতে পারলো না যে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, একটা চলন্ত ট্রেনে। এটাকে কি আপনি সহনশীলতা বলবেন? আমি বলবো, কাপুরুষতা। সেজন্য আমি বলছি, যদি এ পাঁচজন লোক সন্ত্রাসী হতো, সন্ত্রাসী মানে যারা অসামাজিকভাবে মনে ভয় জাগায়, তাহলে ঐ মাতালটা একাজ করার সাহস পেত না। তাহলে বোন আমরা মানুষকে উৎসাহ জোগাতে চেষ্টা করবো যাতে মানুষ আরো সহনশীল হয়, একই সাথে তারা যেন কাপুরুষ না হয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অসামাজিক যা কিছু আছে তা যেন কমে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একসাথে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ লোকগুলো অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১২. হ্যালো, আমার নাম দীপক। আমি একজন চার্টার্ড একাউনট্যান্ট। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হলো তালিবান সরকার বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্য একটা ফতোয়া জারি করেছিল। বলা

হয়েছিল সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাই এটা আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না। এটা কি আসলেই শয়তানের দেখানো সে পথ যে ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল সুরাটে যখন আমি সেখানে বক্তৃতা করছিলাম। ঘটনাটি ঘটার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। তখন এটা বেশ গরম খবর। তালেবানরা সেই সময়ে বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছিল। ভাই, আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে কি-না ইত্যাদি। এ একই প্রশ্ন আমাকে একজন অমুসলিম জিজ্ঞেস করেছিল সুরাটে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, কাজটা ঠিক না ভুল? তখন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী খবর শোনা গিয়েছিল যে, আসলেই তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে কি-না। আর তাই তখন আমি বলেছিলাম ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে কি-না আমি তা জানি না। কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা সত্য ঘটনা যে ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কাজটা ঠিক না ভুল সে বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, যদি তারা বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংস করে থাকে তাহলে তারা আসলে বৌদ্ধদের উপকারই করেছে।

আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ওপরে একজন ছাত্র।

আমি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। আমি 'ধাম্মাপাট' ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি। এ ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কোথাও নেই যে, যেখানে বুদ্ধ বলেছেন আমার মূর্তি তৈরি করো। বুদ্ধ কখনোই বলেন নি যে, বৌদ্ধরা মূর্তি পূজা করবে। আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, এ প্রথা চালু হয়েছে অনেক পরে। ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে তারা যেটা করেছিল তা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল। কারণ, কোনো বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই লেখা নেই যে তারা বুদ্ধের মূর্তি বানাবে।

এবার প্রশ্নটাতে আসি। বাঙ্গালোরে একজন সাংবাদিকও আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। ইসলাম মনে করে যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ। অন্য ধর্মেও বলে; আর খ্রিস্টান ধর্মেও একই কথা বলে। যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানে বলা হয়েছে বুক অভ ডিউটারোনোমিতে ৫নং অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ নং অনুচ্ছেদে। এছাড়াও বুক অভ এক্সোডাসে ২০ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে–

'আমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না, আমার উপাসনা করতে কোন প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) তৈরি করো না। আমার কোনো রূপক তৈরি করো না। উপরে স্বর্গ, নিচে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নিচের সমুদ্র থেকে। তাদের সামনে নতজানু হয়ো না। তাদের সেবা করো না, কারণ আমি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।'

তাই খ্রিস্টান ধর্মানুসারেও ইহুদি ধর্ম মতেও মূর্তি তৈরি করে তাকে ঈশ্বর বলা একেবারে নিষিদ্ধ। একইভাবে এটা ইসলামেও নিষিদ্ধ। তো আমি যখন উত্তরে বললাম যে, তারা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল, তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই তালেবানরা কি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের কষ্ট দেয় নি? আমি বলেছিলাম– হ্যাঁ। তাহলে ইসলাম কি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয়ার অনুমতি দেয়? আমি সেই সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম যে, যদি বেশ কিছু ড্রাগস, কোকেন, ব্রাউনসুগার যার দাম ১০ কোটি টাকা এগুলো পাচার করার সময় ইন্ডিয়ার সরকার ধরে ফেলে তাহলে কি করা হবে? সেই সাংবাদিক বললেন যে, ইন্ডিয়ার সরকার ঐ ড্রাগস পুড়িয়ে ফেলবে।

আমি বললাম, বেশ। তারপর বললাম, আপনি কি জানেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে ড্রাগই ঈশ্বর। তাহলে আপনি কি ইন্ডিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন যে, তারা মাদকাসক্তদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে? কারণ, ইন্ডিয়া সরকার মনে করে যে, ড্রাগস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তারা যা করছে সেটা ঠিক যদিও ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কষ্ট দিচ্ছে। আপনি সেখানে যেয়ে ইন্ডিয়ার সরকারকে বলতে পারেন না যে, আপনারা যা করছেন তা মাদকাসক্তদের কষ্ট দিচ্ছে। তাই একইভাবে আফগানিস্তানের মূর্তিগুলো তাদের সম্পত্তি। এগুলো পছন্দ হলে তারা রাখবে আর পছন্দ না হলে ধ্বংস করবে। এতে আমরা আপত্তি জানানোর কে? তবে যদি তারা অন্য কোনো দেশে গিয়ে এটা করতো, তাহলে আপত্তি জানাতে পারতেন।

এছাড়াও লোকজন বলাবলি করে যে, ইন্ডিয়ার সরকার খুবই সহনশীল। আপনি জানেন কি মুম্বাইতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে মহাবীরের একটা বড় মূর্তি ছিল। মূর্তির পেছনেই ছিল হোটেল জাল। আর মূর্তিটা নগ্ন ছিল। তারপর লোকজন আপত্তি জানালো। এরপর মূর্তিটার সামনে একটা দেয়াল তুলে দেয়া হলো। কয়েক মাস পরে তারা মূর্তিটা সরিয়ে ফেললো। এ একই লোকগুলো মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানালো আবার এ লোকগুলোই আফগানিস্তানকে নিন্দা জানাচ্ছে। কেন এ লোকগুলো রাস্তার ওপরের মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানালো? আপনি কি জানেন যে, এ ইন্ডিয়াতে জৈন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আফগানিস্তানের বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি? তাই যখন মুম্বাই সরকার সেই মূর্তিটা সরিয়ে ফেললো যাকে জৈনরা ঈশ্বর মনে করে, 'তীর্থঙ্কর' মনে করে, তখন কেউ আপত্তি তোলে নি। আর যখন আফগানিস্তানের সরকার এটা করছে। তখন আপত্তি জানাচ্ছেন। এ দুমুখো নীতি কেন?

দুমুখো নীতি নয় — আমাদের যুক্তিবান মানুষ হিসেবে একমুখী নীতি অবলম্বন করা উচিত। একেকবার এক এক রূপ ধারণ করাটা ভাল না। আমি যেটা মনে করি

এটা তাদের সম্পত্তি। ধরুন একজন অমুসলিম একটা বাড়ি কিনলো। ধরুন সেই ঘরের মধ্যে একটা কা'বা শরীফ খোদাই করা আছে। যদি সেই অমুসলিম কা'বা শরীফ অপছন্দ করে সেটা ঢেকে ফেলে কে আপত্তি জানাবে? আর যদি কোনো মুসলমান মহানবী ﷺ-এর মূর্তি তৈরি করে আর সে মূর্তিটা যদি আপনি ধ্বংস করেন তাহলে পুরো মুসলিম বিশ্ব যদি আপনার বিপক্ষে থাকে আমি ডা. জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন দেব। কারণ, মহানবী ﷺ এর মূর্তি তৈরি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন ১৩. জনাব ডা. জাকির নায়েক। ইসলাম কি অন্য ধর্ম বা ধর্মীয় দেবতাদের অপমান বা ছোট করতে বলে? আমি এ প্রশ্নটা যে কারণে করছি সেটা হলো যখন একজন মুসলমান ইন্ডিয়ান চিত্রশিল্পী হিন্দু দেবী স্বরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছেন। তখন অনেকে প্রশংসা করেছিল এ বলে যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। আর যখন সালমান রুশদী ইসলাম সম্পর্কে বই লিখলো, তখন রাজীব গান্ধী নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা প্রায় প্রত্যেক ইন্ডিয়ানই সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখন হুসেন হিন্দু দেবীকে নগ্নভাবে আঁকলো তখন ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলো বলেছিল যে, এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি যা খুশি আঁকতে পারেন। ইসলাম অন্য ধর্মের দেবতাদের অপমান, ছোট করা সম্পর্কে কি বলে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে মুসলমান শিল্পীর কথা বলেছেন তিনি এম.এফ. হুসেন। এম.এফ. হুসেন মুম্বাইয়ে থাকেন। আমিও একই শহর থেকে এসেছি। তিনি দেবী স্বরস্বতীর কিছু নগ্ন ছবি এঁকেছেন আর অনেক সাংবাদিকও তাকে সমর্থন করেছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রথম কথা হলো, কোনো মহিলার নগ্ন ছবি আঁকা সেটা দেবতা/দেবী হোক বা না হোক ইসলামে সেটা হারাম। হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম এটা অনৈতিক, অমানবিক। কেন আপনি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন? কেন আপনি পিছিয়ে যাবেন? দেখেন পশ্চিমা কালচারে কি হচ্ছে? তারা আমাদের মা-বোনদের বিক্রি করছে। একটা বিখ্যাত বিএমডব্লিউ-র অ্যাডের কথা শুনেছিলাম। বিএমডব্লিউ গাড়ির নাম শুনেছেন? এটা অনেকটা বড়লোকদের ও ধনী লোকদের জন্য মার্সিডিজ গাড়ির মতো। খুব দামি একটা গাড়ি। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি শুনেছিলাম সেই বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে ওপরে লেখা আছে, 'তাকে পরীক্ষামূলক চালানো শুরু করো এখনই।' কাকে? গাড়ি না মেয়েটা। মেয়েটার ঐ গাড়ির সামনে কি প্রয়োজন? এসব কিছুই ঐ মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মেয়েদের

অপমান করা। এম.এফ. হুসেন যা করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল প্রশ্নটাতে আসি। আপনি কি অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের সমালোচনা করতে পারবেন? আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যেসব উপাস্যদের তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ, তাহলে অজ্ঞতার কারণে শত্রুতামূলকভাবে তারা আল্লাহকে গালি দিবে।

কুরআন বলছে, 'নিন্দা করো না ঐ দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহর ছাড়া বরঞ্চ তারাই না জেনে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'য়ালার নিন্দা করে।' তাই ইসলাম ধর্মে কোনো ধর্মের দেবতাকে নিন্দা করা যদিও আপনি তাকে না মানেন– সেটা নিষিদ্ধ। আর ঠিক একথাই বলা হচ্ছে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে। এম.এফ. হুসেন একজন দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

প্রশ্ন ১৪. কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী?

উত্তর ঃ মুসলমানদেরকে প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে, যখনি সমকালীন বিশ্ব বা ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানগণ অব্যবহিত কাল থেকেই সব ধরনের মিডিয়া থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা প্রায়শই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে মার্কিন মিডিয়া কর্তৃক 'একলাহোমায়' বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম বিরোধী অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমেরিকান সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলো যে, এটি 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র।' পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসল অপরাধী হলো এক মার্কিন সেনা সদস্য।

চলুন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

১. শাব্দিক অর্থে মৌলবাদী

শাব্দিক অর্থে একজন মৌলবাদী হল এমন একজন ব্যক্তি যে তার ধারণকৃত তত্ত্ব বা মতবাদকে অনুসরণ করে, তার ওপর অনুগত থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে তা পালন করার চেষ্টা করে। একজন ব্যক্তি ডাক্তার হতে চাইলে তার উচিত মেডিসিন তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ জানা, অনুসরণ করা এবং তার চর্চা করা। তখনই সে মেডিসিন তত্ত্বে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রে ভালো হতে চাইলে তার উচিত গণিতশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ ভালোভাবে জানা, তার অনুশীলন করা এবং ব্যাপকভাবে তার চর্চা করা। তবেই সে গণিতশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে পারবে।

একজন ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চাইলে তারও উচিত বিজ্ঞানের মৌলসমূহ জানা, তার পথ অনুসরণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার অনুশীলন করা। কেবল তখনি সে বিজ্ঞান শাখায় মৌলবাদী হতে পারবে।

২. সব মৌলবাদী এক নয়

একজন ব্যক্তি একই ব্রাশ নিয়ে যেমন সব রং একত্রে আঁকতে পারে না, তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি সব মৌলবাদীকে একই শ্রেণীতে ফেলতে পারে না, হয় তা ভাল ক্ষেত্রে হোক বা মন্দ ক্ষেত্রে হোক।

একজন মৌলবাদীকে এরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কোন ক্ষেত্রে সে পারদর্শী তার ওপর ভিত্তি করে। একজন ডাকাত বা চোর মৌলবাদী সমাজের জন্য ক্ষতির

কারণ এবং সে সমাজে কারো কাম্য নয়। অন্যদিকে, একজন ডাক্তার মৌলবাদী সমাজের জন্য উপকারী এবং সে সমাজে সম্মানিত।

৩. মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে আমি গর্বিত

আল্লাহর দয়ায় আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী, যে ইসলামকে ভালো জানে, অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। একজন সত্যিকারের মুসলমান মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ, আমি জানি যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের নীতিসমূহের মধ্যে এমন ১টি নীতিও নেই যা মানুষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধি-বিধানসমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভুল মনে করে। আর এ ধারণা পোষণ করে তারাই যারা সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না।

যদি কোনো ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধি বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

৪. আভিধানিক অর্থে মৌলবাদী

Webster ডিকশনারীর মতে, মৌলবাদ ছিল আমেরিকান প্রোটেস্টাইন খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দির প্রথমে আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। এটি হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সংস্কার করে যুগোপযুগী করার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এ সংস্কার ঐ সমস্ত খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে, যারা বিশ্বাস করতো বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নির্ভুল এবং স্রষ্টার পক্ষ হতে আগত এবং যুগোপযুগী। সুতরাং 'মৌলবাদী' শব্দটি এমন একটি শব্দ যা প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এক শ্রেণীর খ্রিস্টানদের বেলায় যারা বিশ্বাস করতো যে, বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে স্রষ্টার বাণী যাতে কোনো ধরনের ভুল নেই।

Oxford ডিকশনারীর মতে 'মৌলবাদ' হলো– প্রাচীন কোনো মতবাদ বা ধর্মের কঠোর অনুশীলন বিশেষত ইসলাম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আজ এমন এক সময় যখন 'মৌলবাদী' বলতে বুঝানো হয় কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে এবং ধারণা করা হয় সে একজন সন্ত্রাসী।

৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী হতে হবে

প্রত্যেক মুসলমানকেই একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী এমন ব্যক্তি যে মানুষের মাঝে অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সে সমাজে ভীতি ছড়ায়।

কিন্তু যখনি একজন ডাকাত পুলিশকে দেখে তখনি সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসীস্বরূপ। একই রকমভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীস্বরূপ হতে হবে। এ রকম অসামাজিক লোক যেমন, চোর ডাকাত, ছিনতাইকারী, ধর্ষক ইত্যাদি মানুষ যেন একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে যেন মুসলিমকে ভয় পায়। এটি সত্য যে, সন্ত্রাসী শব্দটি সাধারণত ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাসী করে। তবে একজন সত্যিকারে মুসলমানকে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী অমানুষদের জন্য সন্ত্রাসীর ভূমিকা নিতে হবে। অবশ্যই নির্দোষ মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানকে সাধারণ মানুষের জন্য শান্তির ধারক-বাহক হওয়া উচিত।

৬. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়ার আগে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যারা স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলন করেছে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করেছে; অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাদেরকে সে একই কাজের জন্য 'দেশ প্রেমিক' বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুতরাং দেখা গেল একই কাজের জন্য একই ধরনের মানুষকে দুটি ভিন্ন গ্রুপ ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। এক শ্রেণী বলেছে 'সন্ত্রাসবাদ' অন্য শ্রেণী বলেছে 'দেশ প্রেম'।

ঐ সব লোক যারা বিশ্বাস করে ভারতের ওপর ব্রিটিশদের শাসন করার অধিকার রয়েছে তারা বললো এটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করে ভারতবর্ষ শাসন করার কোন্ অধিকার ব্রিটিশদের নেই তারা তাদের কার্যকলাপকে মুক্তিযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদেরকে দেশ প্রেমিক হিসেবে বরণ করেছে। সুতরাং একজন মানুষের বিচার হওয়ার পূর্বে তার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শুনানি হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তি শোনা, অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের ঐ ঘটনার পিছনে কি অভিপ্রায় ছিল তা বিবেচনায় নেয়া উচিত। তবেই কেবল সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব।

৭. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মূলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তা আরো সুদৃঢ় করতে।

এভাবে প্রত্যেক মুসলিমকেই মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ইসলামের অর্থ শান্তির ধর্মের আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তাকে সন্ত্রাসী হতে হবে কেবল সমাজের আগাছাদের জন্য শুধু সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

প্রশ্ন ১৫. ইসলামকে কেন শান্তির ধর্ম বলা হয়, যেখানে এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে তরবারীর মাধ্যমে?

উত্তর ঃ কিছু সংখ্যক অমুসলিমের কাছে এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যে, কোটি কোটি মুসলমান ইসলামের অনুসারী হতো না যদি ইসলাম শক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত না হতো।

নিচের বিষয়গুলো এ ধারণা স্বচ্ছ করবে বলে আশা রাখি।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি

'ইসলাম' শব্দটির মূল বা উৎপত্তিগত শব্দ হলো 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। এর অন্য অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ, নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম এবং এ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

২. মাঝে মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে শক্তি ব্যবহার করতে হয়

এ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাজ কর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আসে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই ধংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে তাদের নিবৃত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ইসলাম মাঝে মাঝে শক্তি ব্যবহার করেছে এ কারণে যাতে দেশে সমাজ বিরোধী ও অপরাধীরা শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজে শান্তি বিস্তৃত করে। একই সাথে ইসলাম তার অনুসারীদের এও আদেশ দিয়েছে, যে এ শান্তি-শৃঙ্খলার বিনষ্ট করবে তাকে নিবৃত করতে তার ওপর শক্তি প্রয়োগ কর। অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য ও শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থীদের বিরুদ্ধে কখনো তাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি ব্যবহারের বিধান রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ডিল্যাসি ওলেবী

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে এ ভুল ধারণার সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডিল্যাসি ওলেবী তার বিখ্যাত বইতে (Islam At the Cross

Road) পৃষ্ঠা ৮-এ। তিনি বলেছেন 'মুসলমানগণ তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।' এটি একটি বাস্তবতা বিবর্জিত উদ্ভট পৌরাণিক গল্প যা ঐতিহাসিকগণ বার বার উল্লেখ করেছেন।

৪. মুসলমানগণ ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছেন

মুসলমানগণ প্রায় আটশত বছর স্পেন শাসন করেছেন। স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই শক্তি ব্যবহার করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডররা স্পেনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। এমনকি সেখানে এমন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না যে উচ্চস্বরে আযান দিতে পারে।

৫. আরব বিশ্বে ১৪ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান

মুসলমানগণ প্রায় ১৪শত বছর যাবত আরববিশ্ব শাসন করে আসছে। মাঝখানে কিছুদিন ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চও শাসন করেছে। তদুপরি মুসলমানরা ১৪০০ বছর শাসন করছে। কিন্তু এখনো সেখানে প্রায় ১৪-১৫ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান রয়েছে যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম পালন করে আসছে। যদি মুসলমানরা শক্তি ব্যবহার করতো তবে কি সেখানে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকতো?

৬. ভারতের শতকরা ৮০%-এর বেশি ভারতীয় অমুসলিম

মুসলমানগণ প্রায় ১০০০ বছর যাবত ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইতো তবে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে ভারতের ৮০%-এর বেশি মানুষ অমুসলিম। এ সমস্ত মানুষ আজ প্রত্যক্ষদর্শী যে, ইসলাম মোটেই তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি।

৭. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মুসলমান। এখন প্রশ্ন জাগে কবে, কোন্ সৈন্য ঐ দেশ দুটিতে অস্ত্রের দাপটে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল

ইসলাম-পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এখন কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে যদি ইসলাম শক্তির দাপটে বিস্তার লাভ করে থাকে তবে কোন্ মুসলিম সৈন্যদের দ্বারা এ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছে?

৯. থমাস কার্লাইল

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তার বই 'হিরো এন্ড হিরো'স ওরমীপ-এ ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে ভুল ধারণার অবতারণা করেছেন– এটি তরবারি বটে, কিন্তু আপনি কোথা থেকে তরবারি পাবেন। প্রত্যেকটি নতুন ধর্ম বা মত প্রচারের প্রারম্ভকালে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ মতটি কেবল একজন ব্যক্তির মাথাতেই থাকে। এবং এটি তার মাঝেই বসবাস করে। সারা পৃথিবীতে সেই কেবল এটি বিশ্বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের বিপক্ষে তার অবস্থান থাকে। আর এ বিশ্বাস (ধর্মমত)-টিই হলো তার তরবারি যা সে ধারণ করে, এবং এর সাহায্যে সে তার ব্যাপক প্রচার চালাতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আদর্শের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এটি এমন এক অস্ত্র যে নিজেই তার প্রচার কার্য চালাতে পারে।

১০. ধর্ম গ্রহণে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

কোনো অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে? যদিও তাদের হাতে অস্ত্র থাকতো তথাপি ইসলাম বিস্তারের কাজে তারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতো না। কারণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে–

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ -

অর্থ : ইসলামে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।

'আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।'

১১. মেধার অস্ত্র

ইসলাম ধর্ম মেধার অস্ত্র। যে অস্ত্র মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ -

অর্থ : তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক প্রজ্ঞা সহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক কর অতি উত্তম পন্থায়।

১২. ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে

বিশ্বে বহুল প্রচলিত ইয়ার বুক 'আল মানাক' ১৯৮৪ সালের সংখ্যা পরিসংখ্যান দিয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ এই ৫০ বছরে ধর্ম, বিস্তারের শতকরা প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। এ অনুচ্ছেদটি "The Plain Truth" ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল।

এ পরিসংখ্যানের শীর্ষে ছিল ইসলাম ধর্মের নাম। যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪৫% এবং খ্রিস্টান ধর্মের ছিল ৪৭%।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ সময়ে মুসলমানেরা এমন কোন্ যুদ্ধে উন্মত্ত হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

১৩. ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে দ্রুত বর্ধনশীল

বর্তমানে আমেরিকাতে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। ইউরোপের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম ১ নম্বরে। পাশ্চাত্যে কোন অস্ত্রের জোরে ইসলাম এতো বিরাট সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে?

১৪. ড. যোশেফ এডাম পিয়ারসন

ড. যোশেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন, ঐ সমস্ত মানুষ যারা এ ভেবে উদ্বিগ্ন যে, একদিন পরমাণু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামিক বোমা ইতোমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আর এটা সেদিনই হয়েছে যেদিন হযরত মোহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন।

কুরআন কি আল্লাহর বাণী?
IS THE QURAN GOD'S WORD

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,
ইসলামি শিক্ষা বিভাগ
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

সম্পাদনায়

মাওঃ মুঃ হাবীবুল্লাহ সিদ্দীকী
বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ইসলামের কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়ার সময় দা'য়ীগণ (প্রচারকগণ) যাদেরকে দাওয়াত দান করেন তাঁদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট নানা রকমের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ পথে প্রধান বাধা যেটা আসে, তা হলো ইসলাম এবং এর সব বিষয় সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে পূর্ব থেকে বদ্ধমূল ভুল ধারণা। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা দূরীভুত করার ক্ষেত্রে কীভাবে তাদের (বিরোধিদের) সঙ্গে আচরণ এবং কর্ম সম্পাদন করবেন তা দা'য়ীর (প্রচারকের) জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে।

অপরপক্ষে, অমুসলিম ও নকল কপট মুসলিম পণ্ডিতদের ইসলাম সম্পর্কে অপব্যাখ্যা। ইসলামের কল্যাণ সম্পর্কে অমুসলিমদের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ খুব কমই হয়। এ ধরনের পণ্ডিতরা খ্যাতি অর্জনের জন্য এ স্বর্গীয় ধর্মের ব্যাপারে এখন বিদ্বেষপূর্ণ লেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তাদের কেউ কেউ ব্যঙ্গ কবিতা (ইত্যাদি) দ্বারা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুলতি ছুঁড়তে ব্যস্ত।

যা-হোক, এটা মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দয়া যে, ডা. জাকির নায়েকের মতো কতিপয় দ্বীনের দা'য়ী নিজস্ব উদ্যোগে অমুসলিমদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবার এবং এ স্বর্গীয় বিশ্বাস সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার কাজ হাতে নিয়েছেন। তিনি এটা শুধু কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েই করছেন না বরং তিনি বাস্তব যুক্তি, বিজ্ঞান এবং যা দিয়ে তারা বুঝতে পারেন, সে পন্থা অবলম্বন করেই তিনি তা করেন।

যে বইটি আপনার হাতে তা এ বিষয়ে যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহর অবতারিত? নাকি কোনো ব্যক্তির লিখিত। আল্লাহতে বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসের মূল এবং একত্ববাদ হলো (ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের) প্রথম স্তম্ভ। এ কুরআনের সাথে জনগণের পরিচয় করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর অবতারিত এবং এ স্বর্গীয় কিতাবখানি সব মানবতার প্রতি একটি পূর্ণাঙ্গ গাইড বুক।

অগণিত লোক পাওয়া যাবে, যারা ইসলামের বিরোধিতা করার কাজে সক্রিয়, এ উদ্দেশ্যে তারা এ সত্যটিকে অস্বীকার করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে যে, কুরআন আল্লাহর অবতারিত।

কেউ বলে, এ কিতাব কারোর দ্বারা রচিত, অন্যরা এ কিতাব হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর হাতে তৈরি বলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং এ ধরনের লোকদের নিকট কুরআনের কল্যাণ পেশ করা হলে তারা সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করে 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী? যদি তাই হয়, আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন?'

এ ধরনের গুরুতর বিষয় মনে রেখে 'কুরআন' কি আল্লাহর বাণী? বিষয়টি আলোচনা ও অমুসলিমদের ভুল ধারণা দূরীকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়, এভাবে এ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে মুম্বাইর 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (IRF) এক প্রোগ্রামের আয়োজন করে।

IRF-এর সভাপতি ডা. জাকির নায়েক এ বিষয়টির ওপর শাস্ত্রের উদ্ধৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এবং গ্রহণযোগ্য যুক্তি দিয়ে আলোচনা এবং জ্ঞান লিপ্সু শ্রোতামণ্ডলির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

ডা. জাকিরের উল্লিখিত বিষয়ের ওপর ভাষণ এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব অবিশ্বাসীদের বুঝবার জন্য যথেষ্ট যে, আল-কুরআন নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওপর অবতারিত, যিনি সমগ্র মানবতার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। যা-হোক, বাস্তবতা থেকেই যায় যে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন। কিন্তু দা'য়ী হিসেবে সব মুসলিমের ওপর তাদের স্তরে সে যেভাবে পারে, ইসলামের দিকে আহ্বান করা ফরয।

ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতা যা এখন বই আকারে দেয়া হলো, একে অবিশ্বাসীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ গাইড হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যারা অন্তত ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এবং কুরআন যে আল্লাহর অবতারিত এ বিষয়ে জানতে পারবে। এভাবে তারা ঐ সত্যটিও বুঝতে পারবে (যদি তারা ইসলাম এবং কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে থাকে) যে, তারা একদিন ইসলাম এবং ইসলামের মধ্যে যা আছে, তা সম্পর্কে ইসলাম বিরোধিদের ষড়যন্ত্রের শিকার ছিলেন।

কুরআন কি আল্লাহর বাণী?

ডা. জাকির নায়েকের 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এ বিষয়ে আলোচনা শুরুর পূর্বে ভাই আশরাফ মুহাম্মদী, ইসলামী অভিভাষণ 'আস্সালামু আলাইকুম' আপনার প্রতি শান্তি বলে অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করেন, এবং ঐ সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপর প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ডা. মুহাম্মদ নায়েক ঐ দিনের সম্মানিত প্রধান অতিথি মি. রফিক দাদাকে অভিনন্দিত করেন, যিনি সাংবিধানিক আইনের প্রখ্যাত অথরিটি এবং ভারতের একজন সিনিয়র এ্যাডভোকেট। অতঃপর যে সব বিশেষ অতিথি দেশের বিভিন্ন শহর ও বিদেশ

থেকে এসেছেন, তাঁদেরকে অভিনন্দন জানান। তিনি ইসলামী অভিভাষণের মাধ্যমে অডিটোরিয়ামে আগত ভাই-বোনদেরও অভিনন্দন জানান।

ঐ দিনের IRF কর্তৃক আয়োজিত প্রোগ্রামের উদ্যোক্তা ও আয়োজক হিসেবে এবং ঐ দিনে প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন। তিনি IRF-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এটি মুম্বাইর একটি নিবন্ধনকৃত পাবলিক ট্রাস্ট, যা ১৯৯১ সালে বেশিরভাগ স্ববিবেচিত ইসলামের কল্যাণ প্রচার এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে অমুসলিমদের পূর্বকৃত ভুল ধারণা দূরীকরণের নিমিত্তে গঠন করা হয়।

বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ডা. মুহাম্মদী বলেন, আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন, 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এ বিষয়ের ওপর আলোচনার প্রয়োজন কী? আপনারা জানেন, সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনরুদয় ঘটছে। মুসলমানদের প্রধান সাংবিধানিক গাইড আল-কুরআন, যে কিতাব মুসলিমদের একীভূতকরণ ও আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যম। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত এবং পশ্চিমাদের ক্ষতিকর ভুল উদ্ধৃতি, অর্ধসত্যের ওপর ভিত্তি করে সমালোচনা, মূল বিষয়ের বাইরে ও অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা অভিযোগ, যা ভুল তথ্য ও পক্ষপাত দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা কুরআনের ওপর ক্ষতিকর আক্রমণ চলছে।

অতএব, IRF চিন্তা করেছে আজকের সাধারণ আলোচনা যথেষ্ট উপযুক্ত হবে 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এ বিষয়ের ওপর ডা. জাকির নায়েকের আলোচনা। আমাদের লক্ষ্য হলো বিষয়ের ওপর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং একই সাথে জনসাধারণের প্রশ্নপর্ব খোলা রাখা। সবশেষে আমরা শ্রোতামণ্ডলিকে মিথ্যা থেকে সত্য বের করে আনার বিচারের ভার অর্পণ করলাম।

আমাদের এ প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি জনাব রফিক দাদা সাংবিধানিক আইনের প্রথিতযশা অথরিটি এবং ভারতের একজন প্রথম কাতারের সিনিয়র অ্যাডভোকেট। ১৯৬৬ সালে তিনি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে L L M পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৭ সালে সিনিয়র অ্যাডভোকেট পরিচয় লাভ করেন। তিনি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কেসগুলো নিয়মিত দেখাশোনা করেন। সমসাময়িক মানবীয় বিষয়ও মোটিভেশনের ওপর সচল জ্ঞানাধিকারের ভিত্তিতে জনাব দাদা মুম্বাই বার এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে ভারত সরকার তাঁকে এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল নিয়োগ করে সম্মানিত করেন। আমি শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলির সামনে জনাব রফিক দাদাকে উপস্থিত করতে পারি।

প্রধান অতিথির পরিচয়কে ঘিরে এবং আজকের বিষয় নির্বাচনের কারণ ব্যাখ্যা করে আলোচনার পর ডা. মুহাম্মদ রফিক দাদাকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করা হলো। সুতরাং মি. দাদা তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিম্নরূপে তুলে ধরেন :

আস্‌সালামু আলাইকুম ডা. মুহাম্মদ নায়েক, আজকের বক্তা ডা. জাকির নায়েক, বিশিষ্ট শ্রোতামণ্ডলি, ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আমি আপনাদের সামনে সার্বিক বিনয় নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছি। কারণ, সব বড় বড় জ্ঞানীর তুলনায় আমি খুবই নগণ্য। নগণ্য হিসেবে আপনাদের এখানে এক জেলের ছোট ঘটনাটি মনে করিয়ে দিতে চাই। যে খুব ভোরে সূর্য উদয়ের পূর্বে মাছ ধরতে গিয়েছিল। পানিতে জাল নিক্ষেপ করে সে খুব ভারী একটা জিনিস পেল এবং এটা অন্ধকারে পরীক্ষা করে সে বুঝতে পারল পাথরের অনেক ছোট্ট খণ্ড। সুতরাং সে তার বিশ্বাসের শোকতাপে একটার পর একটা পাথর পানিতে ফেলতে থাকলো। কিন্তু যখন সে তার সর্বশেষ কয়েকটি পাথর ছুঁড়তে বাকি রেখেছে, তখন সূর্য উদয় হলো পূর্ণভাবে এবং হঠাৎই সে দেখতে পেল, যা সে পাথর মনে করে পানিতে ফেলছিল সেগুলো পাথর ছিল না বরং মূল্যবান মুক্তা ছিল। অতএব অন্ধকারে সে অজ্ঞতাবশত মুক্তাগুলোকেই পাথর মনে করে নিক্ষেপ করছিল এবং একমাত্র আলোর কারণেই সে বাস্তবতা দেখতে পেল এবং তার বিশ্বাসের জন্য আফসোস করলো, অন্ধকারের জন্যই তার পূর্ববর্তী সময়টা বৃথা গেল এবং মূল্যবান কিছু হারালো (এটা ছিল অজ্ঞতার অন্ধকার)।

মুসলিম বিশ্ব জ্ঞাত আছে যে, বিশ্বের আলো ১৪০০ বছর পূর্বে জ্বলে উঠেছিল যখন বিশ্বে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। এটা প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাসের আবশ্যকীয় অঙ্গ যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, এটা বিশ্বাসের বিষয়। এটাও মুসলমানদের বিশ্বাস যে, পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং এ গ্রন্থের মধ্যে এটাও আছে যে, একে আল্লাহ রক্ষা করবেন। বস্তুত এটা পবিত্র কুরআনেরই মোজেযা যে, ঠিক নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময় থেকে শত শত এবং হাজার হাজার লোক এবং বর্তমানে লক্ষ বা কোটি কোটিও হতে পারে একে হেফজ (মুখস্থ) করেছে, যাতে এটি শুধু সুন্দর হরফে কাগজেই লেখা থাকবে না বরং মানুষের হৃদয় মন্দিরে সংরক্ষিত থাকবে; যাতে কোনোদিন এটি মুছে যেতে না পারে। এটি সবসময়ই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য খাঁটি অবস্থায়ই থাকবে।

আমার জন্য এটা খুবই আনন্দ ও গর্বের বিষয়, আর আমি বিনয়ের সাথেই বলছি যে, আপনারা আমাকে আপনাদের সামনে দাঁড়াবার উপযুক্ত মনে করেছেন। আমি বলি যে, এসব বিষয় মোকাবিলা করা ও কথা বলা আমাদের জন্য প্রয়োজন, কারণ আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যাকে বিজ্ঞানীরা, ক্যালকুলেটর ও বস্তুবাদের যুগ বলে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানকে ধর্মের কলঙ্কের জন্য ব্যবহার করা

হয়েছে, অতএব, কুরআনের কিছু আয়াতেরও পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত, যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যে তা খুঁজে পায়।

ফ্রান্স একাডেমি অব সাইন্স-এর মরিস বুকাইলি ১৯৭৮ সালের ১৪ জুন লন্ডনের একটা বড় সমাবেশে বক্তৃতা দেন। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'পবিত্র কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান'। তিনি কুরআনের বহু আয়াত উল্লেখ করেন এবং অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে প্রতিষ্ঠা করেন যে, কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছিল, বর্তমানে বিজ্ঞানের দ্বারা তাই আবিষ্কৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনে এ সত্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাত, সূর্য এবং চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই নিজস্ব গতিতে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। এটা ঐ সময়ে নাযিল হয়, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ কিংবা পুরো পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করতো যে, পৃথিবী সমান এবং এর বিপরীত কেউ বলার সাহস করতো না, বললে হত্যা, ফাঁসি অথবা পাথর মারা হতো, এজন্য যে, সে পাগল।

যে বিখ্যাত বিষয়ের ওপর আলোচনা চলবে তা অনুধাবন করা কঠিন হলেও আমাদের মাঝে খুবই উচ্চ মানের বক্তা ডা. জাকির নায়েক রয়েছেন। বেশিরভাগ লোক তাঁর বক্তব্য ও তাঁর জ্ঞানের সাথে পরিচিত। ডা. জাকির নায়েককে আপনারা সবাই জানেন, তাঁর ৩০ বছরের স্বল্প পরিসর জীবনে বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ওপর অগণিত বক্তৃতা পেশ করেছেন। তিনি এদেশে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে শত শত সভায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের বহুস্থানে, বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন।

বস্তুত সাম্প্রতিক সময়ের বড় চিন্তাবিদ আহমেদ দীদাত বড় আনন্দের সাথে ডা. জাকির নায়েককে দীদাত প্লাস বলেন। সুতরাং আমাদের সামনে রয়েছেন দীদাত প্লাস এবং এই বড় বিষয়টি আমি সর্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা শক্তি পাই, আমরা বিনয় লাভ করি, যেন আল্লাহ তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ আমাদের ওপর দান করেন। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

মি. রফিকের আলোচনার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ডা. মুহাম্মদ শ্রোতামণ্ডলিকে সুবিধাজনকভাবে সবার সাথে মিল হয়ে বসতে বলেন। অতঃপর তিনি ডা. জাকির নায়েককে নির্বাচিত বিষয় 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?' এর ওপর আলোচনা রাখার আহ্বান জানান।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর আলোচনা এভাবে শুরু করেন, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।'

মুহতারাম সম্মানিত মেহমান মি. রফিক দাদা, যিনি প্রধান অতিথি, বিজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দ, মুহতারাম বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং এই মহতি সভার আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা। আমি আপনাদের সকলকে ইসলামী অভিভাষণে সম্ভাষণ করছি– 'আসসালামু

আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" আপনাদের সবার প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান্তি, করুণা ও দয়া বর্ষিত হোক, আজকের আলোচনার বিষয় 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী?'

ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভুল ধারণা

অনেক লোকের ভুল ধারণা রয়েছে যে নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ হলেন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা। বাস্তবিক পক্ষে মানুষ যখন এ পৃথিবীতে পদচারণা শুরু করে, তখন থেকেই এখানে ইসলামের অস্তিত্ব শুরু। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ দুনিয়ায় অনেক অহী ও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন সঠিক পথপ্রদর্শক হিসেবে। পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূল শুধু তাঁর জনগণ ও জাতির জন্য এবং তার আনীত বাণী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল। ঐ কারণে তাঁরা যে মোযেজাগুলো প্রদর্শন করেছেন, যেমন সাগরকে বিভক্তিকরণ, মৃতকে জীবিত করা এগুলো ঐ সময়ের জন্য, যা আমাদের পক্ষে আজ আর পরীক্ষা বা সত্যায়ন করা সম্ভব নয়।

নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ পূর্ণ মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন

নবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল এবং তাঁর বাণী চিরস্থায়ী। আল কুরআনের ২১ নং সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত (আশীর্বাদ)স্বরূপই প্রেরণ করেছি।

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল এবং তাঁর বাণী ছিল চিরস্থায়ী সে কারণেই তাঁকে আল্লাহ প্রদত্ত মোযেজাও চিরস্থায়ী এবং আমাদের দ্বারা পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে। যদিও নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ অনেক মুজিযা প্রদর্শন করেছেন, যেগুলো হাদীস শরীফে উল্লেখ পাওয়া যায়, তবুও তিনি এর ওপর জোর দেন নি। যাঁরা মুসলমান তাঁরা এ সব মুজিযায় এক বাক্যে বিশ্বাস করেন।

পবিত্র আল-কুরআন হলো চূড়ান্ত মুজিযা

এটা আমাদের গর্ব যে, পবিত্র কুরআন হলো সেই চূড়ান্ত মুজিযা – যা মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রদান করেছেন। আল-কুরআন সর্ব সময়ের জন্য মুজিযা। এটি নিজেই ১৪০০ বছর পূর্বে মুজিযা হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছে। এটা পুনরায় আজ এবং চিরদিনের জন্য নিশ্চিত করা যায়। সংক্ষেপে, এটা হলো মুজিযার মুজিযা। সম্ভবত একটা বিষয় মুসলিম অমুসলিম সবার নিকট সাধারণ যে,

প্রথমবার আরবের মক্কা নগরীতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নামে এক ব্যক্তি যিনি আল-কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন।

কুরআনের উৎস বিবেচনায় মূলত তিন প্রকারের অনুমান বিদ্যমান। তাহলো :

১. এর লেখক হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তা সচেতনভাবে, অর্ধসচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে (যাই হোক না কেন?)

২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ অন্য কোনো মানবীয় উৎস থেকে, অথবা অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্র থেকে একে লাভ করেছেন।

৩. এর কোনো মানব লেখক নেই, বরং এটি আক্ষরিক অর্থেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী।

আসুন আজ আমরা এ তিনটি অনুমানের পরীক্ষা করি–

হযরত মুহাম্মদ ﷺ সচেতন, অর্ধসচেতন অথবা অচেতনভাবে নিজেই এর লেখক বা রচয়িতা। এটা খুবই অস্বাভাবিক, কোনো ব্যক্তির ঐশী বিষয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা যখন সে কোনো বড় কাজের দায়িত্ব অস্বীকার করে। এটা আক্ষরিক বা বৈজ্ঞানিক যে কোনো দিক দিয়েই হোক না কেন। কিন্তু এটাই বাস্তব যে, প্রাচ্যবিদেরা কুরআনের মূলেই এ সন্দেহ পোষণ করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেই কুরআনের লেখক ছিলেন।

নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সবসময় বলেছেন যে, আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ

নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কখনোই দাবি করেন নি যে, তিনি পবিত্র কুরআনের রচয়িতা ছিলেন। বস্তুত তিনি সবসময় বলতেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বা অবতীর্ণ। অন্য চিন্তা করা অযৌক্তিক এবং এর অর্থ তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। আল্লাহ না খাস্তা ইতিহাস আমাদের বলে, নবুওয়াত লাভের ৪০ বছর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো মিথ্যা বলেছেন এমন প্রমাণ নেই এবং সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে একজন সৎ, মহৎ, চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তারা তাঁকে 'আল-আমীন' বা 'বিশ্বাসী' উপাধি দিয়েছিল। এ উপাধি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষেই তাঁকে দিয়েছিল। খোদা না করুক, যারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাঁরা নবুওয়াত লাভের পরেই বলেছিল, অথচ তারা তাদের মূল্যবান জিনিসগুলো নিরাপত্তার জন্য তাঁর নিকটই জমা রাখতো। তারপর কেন একজন সৎ ব্যক্তি মিথ্যা বলবেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তিনি একজন নবী? ....

আসুন! আমরা প্রাচ্যবিদদের দাবি পরীক্ষা করি। কেউ কেউ বলেন, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কুরআনের দাবি করেছিলেন এবং আরো বলেন যে, তিনি নবী হয়েছিলেন দুনিয়াবী স্বার্থে। আমি একমত যে, অনেক লোক দুনিয়াবী স্বার্থে নবী,

সাধক বা প্রচারক হিসেবে মিথ্যা দাবি করে। তাছাড়া তারা সম্পদও অর্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপনও করে। সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে ভারতে এর অনেক প্রমাণ আছে।

মহানবী ﷺ নবুওয়াত লাভের পূর্বে অর্থনৈতিকভাবে অনেক সচ্ছল ছিলেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা) নাম্নী একজন ব্যবসায়ী ধনাঢ্য মহিলাকে ২৫ বছর বয়সে নুবওয়াতের ১৫ বছর পূর্বে বিয়ে করেছিলেন। নবুওয়াত দাবি করার পূর্বে তাঁর জীবন ছিল অনার্ষণীয়। (অথচ নবুওয়াত লাভের পর) ইমাম নববী (র)-এর হাদীসের সংগ্রহ অনুযায়ী, 'রিয়াদুস সালেহীন' এর হাদীস নং ৪৯২ প্রিয়নবী ﷺ-এর বিবি হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন এমনও অনেক সময় হতো যে, এক মাস দুই মাস নবী করীম ﷺ-এর ঘরে চুলাই জ্বলে নি; কেননা তাদের রান্না করার মতো খাবার উপকরণ ছিল না। তাঁরা পানি এবং খেজুর খেয়ে জীবন-যাপন করতেন সাথে মদিনাবাসীদের দেয়া ছাগলের দুধসহ। এটা শুধু অস্থায়ী চিত্রই ছিল না, এটা মূলত নবী করীম ﷺ-এর জীবন-যাপন পদ্ধতি। রিয়াদুস সালেহীনের ৪৬৫ ও ৪৬৬ নং হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, হযরত বিলাল (রা) বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ যখনই কোনো হাদিয়া পেতেন, তিনি তা দরিদ্র ও অভাবীদের বিলিয়ে দিতেন এবং কখনোই নিজের জন্য রেখে দিতেন না। তবে কেন আপনি সন্দেহ করবেন যে, নবী করীম ﷺ বস্তুগত লাভের জন্য (নাউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যা বলেছেন। এখানে কুরআনের আয়াতও রয়েছে, যা একে অস্বীকার করে। ২ নং সূরা, বাকারার ৭৯ নং আয়াতে আপনারা দেখুন–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থ : সেসব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নিজেরা নিজেদের হাতে কিছু বিধি লিখে নেয়, (তারপর) বলে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ (শরিআতের) বিধান। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তা দিয়ে (দুনিয়ার) সামান্য কিছু স্বার্থ তারা কিনে নিতে পারে। অথচ তাদের হাতের এ কামাই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে, যা কিছু (পার্থিব স্বার্থ আজ) তারা হাসিল করেছে, তাও তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।

এ আয়াত সে সব লোকদের ধ্বংস কামনা করেছে, যারা নিজের হাতে কিতাব লিখে বলে এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব অথবা যারা আল্লাহর কালামকে নিজের স্বার্থে বিকৃত করে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ যদি নিজ হাতে কিতাব রচনা করে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করতেন তাহলে তাঁর জীবনের যে কোনো পর্যায়ে তা আল্লাহ অনাবৃত করে দিতেন। অতঃপর তাঁকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক বলা হতো এবং তিনি নিজের কিতাবে নিজেকে অভিশাপ দিতেন।

অনেকে বলে যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ কুরআনকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন? এবং নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করেছিলেন– মর্যাদা, ক্ষমতা, গৌরব এবং নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতা, মর্যাদা এবং নেতৃত্ব মর্যাদা চায় তাদের গুণাবলি কী রকম? সে দামি পোশাক পরে, সে খুবই ভালো খাবার খায়, সে ম্যানসন বা সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করে, তার দেহরক্ষী থাকে ইত্যাদি।

নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সরলতা ও নম্রতার বিস্ময়কর আদর্শ

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজের ছাগলের দুগ্ধ নিজে দোহন করতেন। নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। অনেক সময় গৃহস্থালীর কাজ-কর্মও করতেন। তিনি বিনয় ও সরলতার বিস্ময়কর আদর্শ প্রতীক ছিলেন। তিনি মেঝেতে বসতেন, দেহরক্ষী ছাড়াই বাজারে যেতেন। এমনকি দরিদ্র জনগণ মাঝে মাঝে তাঁকে দাওয়াত দিত এবং তিনি তাদের সঙ্গে আহার করতেন এবং যা-ই দেয়া হতো, তা-ই তিনি কতৃজ্ঞতাভরে আহার করতেন। এ গুণের কথাই ৯ নং সূরা, আত তাওবা'র ৬১ নং আয়াতে আমরা উল্লেখ পাই– 'ওহে। তিনি সকলের কথা শোনেন, যে ধরনের ব্যক্তিই তাকে ডাকেন, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।'

একবার উতবা নামে পৌত্তলিক আরবের এক প্রতিনিধি নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বলল, '... যদি তুমি নবুওয়াতের দাবি ত্যাগ করো তাহলে আমরা তোমাকে আরবের নেতা বানাবো এবং রাজমুকুট পরাবো। আমরা একটা জিনিসই চাই, তাহলো তুমি 'এক আল্লাহ' এ কথা ত্যাগ করো।' রাসূল ﷺ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পবিত্র কুরআনের ৪১নং সূরা হামীম আস সাজদা অবতীর্ণ হওয়ার পর অনেকবার চেষ্টা করা হয়, বিশেষ করে একবার রাসূলের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে প্রস্তাব দেয় যে, যদি তিনি তাঁর রেসালাত প্রচার বন্ধ করেন তাহলে তাঁকে আরবের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত করে দেবেন। নবী করীম ﷺ বলেন '.... হে আমার চাচা! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তাহলেও আমি মৃত্যু পর্যন্ত আমার প্রচার ত্যাগ করবো না।' কেন একজন এ ধরনের যাতনা ভোগ ও ত্যাগের জীবন-যাপন করবেন, যেখানে তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে বিজয়ী হতে পারতেন এবং বিজয়ের সব মূহূর্তে তিনি এতোই বিনয়ী ও মহত্ত্ব ছিলেন যে, তিনি সব সময় বলতেন, এটা আল্লাহর সাহায্য এবং আমার বুদ্ধির জোরে হয় নি।'

কিছু প্রাচ্যবিদ নতুন এক তত্ত্ব নিয়ে হাজির হলেন, তাঁরা বললেন, নবী করীম ﷺ মাইথমেনিয়া রোগাক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহ না করুন। মাইথমেনিয়া হলো মানসিক বৈকল্য, যার দ্বারা মানুষ মিথ্যা বলে এবং ঐ মিথ্যাকে বিশ্বাসও করে। সুতরাং তারা বলছে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মিথ্যা বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ) এবং তাঁর ওপর বিশ্বাসও করেছেন– যদি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (সাইকিয়্যাট্রিক) মাইথমেনিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করে তাহলে তাকে বাস্তবতা দিয়ে হতবুদ্ধি করে। কারণ এরা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারে না। ধরুন, একজন দাবি করলো, সে ইংল্যান্ডের রাজা, মনোরোগ চিকিৎসক তাকে বলবেন না যে, সে বিকৃত মস্তিষ্ক, সে পাগল। তিনি তাকে বলবেন, ঠিক আছে যদি তুমি রাজা হয়ে থাক তাহলে কোথায় তোমার রাণী? সে বলবে, সে আমার শ্বাশুড়ির প্রাসাদে গিয়েছে। তোমার মন্ত্রী কোথায়? সে বলবে সে মারা গেছে। দেহরক্ষীরা কোথায়? যখন সে বাস্তবতা মোকাবিলা করতে পারবে না, সর্বশেষে রোগী বলবে, আমি ইংল্যান্ডের রাজা নই। কুরআন এরূপই করে।

আল-কুরআন লোকদের বাস্তবতা ও প্রশ্নের মাধ্যমে হতবুদ্ধি করে দেয়

আল-কুরআন লোকদের বাস্তবতা ও প্রশ্নের মাধ্যমে হতবাক করে দেয়। বাস্তবিক পক্ষে নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মাইথমেনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন না বরং ঐ সব লোকই মাইথমেনিয়ায় আক্রান্ত, যারা বলে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মিথ্যা বলে তা বিশ্বাস করতেন। আল-কুরআন এ ধরনের লোকদের বাস্তবতা ও প্রশ্নের মাধ্যমে হতবুদ্ধি করে চিকিৎসা করে। যদি তুমি সন্দেহ করো, যদি তুমি মনে কর কুরআন মিথ্যা রচনা, তাহলে এরূপ করো। যদি তুমি মনে করো যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, এ ব্যাপারে যাই বল? এটা বিভিন্ন প্রশ্ন পেশ করে, যেটা আল্লাহ চাইলে অনেক আলোচনার দাবি রাখে।

কিছু লোক এ থিওরি নিয়ে এসেছে, যাকে বলে ধর্মীয় মোহ থিওরি বা অর্ধচেতন থিওরি। তাদের মতে, নবী করীম ﷺ (নাউযুবিল্লাহ), তিনি মানসিকভাবে অর্ধচেতন হতেন এবং কুরআন রচনা করেছেন অজ্ঞাতসারে। তাদের কেউ কেউ বলে, তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলেন। আল্লাহ না করুন। আসুন আমরা তাদের দাবিগুলো বিশ্লেষণ করি।

যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মনোরোগে ভোগে বা বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তাহলে সে বুঝতে অক্ষম হবে যে, কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন একবারে নাযিল হয় নি। এটি ২৩ বছর ধরে অংশ অংশ করে স্তরে স্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের দাবি অনুযায়ী যদি কুরআন কোনো অর্ধচেতন বা বিকৃত মস্তিষ্ক মন থেকে আসতো তাহলে এতো ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো না। একজন লোকের দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত নবুওয়াতি মিথ্যা দাবির ওপর থাকতে পারে না, যেখানে তিনি এ দীর্ঘ সময় অর্ধচেতন থাকবেন।

আল-কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা একে মিথ্যা প্রমাণিত করে। আল-কুরআন এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দেয় যেগুলো ঐ সময়ের কেউ জানতো না। কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যেগুলো সংঘটিত হয়েছে। বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, যেগুলো সে সময় পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে নিশ্চিত হয়ে গেছে। এ ধরনের বাস্তবতা কোনো অর্ধচেতন অথবা বিকৃত মন থেকে বের হয়ে আসা অসম্ভব। ৭ নং সূরা, আল আরাফে ১৮৪ নং আয়াতে মহান রব সত্যায়ন করছেন–

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ -

অর্থ : তারা কি চিন্তা করে দেখে না যে, তাদের সাথী (মুহাম্মাদ) পাগল নয় বরং তিনি হচ্ছেন একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী সৎ পথ প্রদর্শক মাত্র।

৬৮ নং সূরা আল-ক্বালাম-এর ২ নং আয়াতে পুনরাবৃত্তি করে বলা হচ্ছে–

وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ -

অর্থ : আপনার প্রভুর অশেষ দয়ায় আপনি তো পাগল নন।

৮১ নং সূরা তাকভীর-এর ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ -

অর্থ : তোমাদের সাথী পাগল নন।

সুতরাং কেন একজন মিথ্যা বলবেন, তাদের আনীত সব তত্ত্ব আলোচনায় আনা সম্ভব নয়। যদি কারো নিকট নতুন কোনো থিওরি থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ চাইলে আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে আসার পর্যায়ে আমি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় অনুমান হলো নবী মুহাম্মাদ ﷺ এটি অন্য ধর্মশাস্ত্র থেকে নকল করেছেন অথবা মানব উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাই এ থিওরিকে ভুল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আমাদের প্রিয়নবী ﷺ একাডেমিক নিরক্ষর ছিলেন এবং আল-কুরআন ২৯ নং সূরা, আনকাবুত-এর ৪৮ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ -

অর্থ : হে নবী! আপনি তো এ কিতাব নাযিল হওয়ার আগে কোনো বই পুস্তক পাঠ করেন নি; আপনি আপনার ডান হাত দিয়ে কোনো কিছু লিখেন নি (যাতে) মিথ্যাবাদীরা সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ঐ পর্যায়ে হয়তো বাজে বক্তারা সন্দেহ করতে পারতো, আল্লাহ মালুম যে, জনগণ কুরআনের উৎস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, এ কারণে তাঁর স্বর্গীয় প্রজ্ঞায় তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত রাসূল হিসেবে উম্মী, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে বাছাই করেছিলেন। অন্যথায়, ফালতু বক্তারা, বাজারের ক্যানভাসারেরা অবশ্যই কিছু বলতো, যদি নবী করীম ﷺ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত হতেন, সমালোচক নিন্দুকদের কথায় কিছু ওজর থাকতো যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এটি অন্য স্থান হতে সংগ্রহ করে এখানে নতুনভাবে তৈরি ও সংযোজন করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। এ অভিযোগও প্রত্যাখ্যাত।

আল-কুরআন পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে অবতারিত

মাছিকে ফাঁকি দেয়া খুবই কঠিন কাজ। তাই ক্বারী আশরাফ মুহাম্মদ কুরআনের এ আয়াতগুলো ৩২ নং সূরা আস সাজদার ১ - ৩ আয়াত উল্লেখ করেন :

الٓمّٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ج بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : আলিফ লাম-মীম। সৃষ্টিকূলের মালিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এ কিতাবের অবতরণ, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা কি একথা বলতে চায় যে, এ কিতাব সে ব্যক্তি রচনা করে নিয়েছে না বরং এ হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (নাযিল করা) একটি সত্য (কিতাব), যাতে এর দ্বারা তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান করতে পারো, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি।

আল-কুরআন অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্রের মতো নয়, যাতে মানব রচিত গল্পের বই-এর মতো বর্ণনাধারা সংযুক্ত। গল্পের বই কিভাবে শুরু হয়? এভাবে 'কোনো এক সময়ে ।'

শেয়াল এবং আঙুর, নেকড়ে এবং খরগোশ। একইভাবে যদি আপনি অন্য ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন, শুরুতে বলবেন, একজন খোদা ছিলেন, তিনি স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। শুরুতে ঐ শব্দ ছিল। হয়তো এখন বলা হতো, যা এসেছিল যেন ঘটেছিল এমন। কুরআনের এরূপ মানবীয় বর্ণনা নেই যেমন শুরুতে এরূপ ছিল। যদি আপনি অন্য ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখবেন, মানবীয় বর্ণনার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, তার পরিবার, তার সন্তানদের এভাবে চলতে থাকে, অধ্যায়-১, অধ্যায়-২, ধারাবাহিকভাবে। আল-কুরআনও

মানুষ এবং তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু গল্পের বই-এর ধারাবাহিকতায় নয়।

আল-কুরআন মানব রচিত এবং প্রতারণা– মানুষ তা প্রমাণ করতে সক্ষম নয়

আল-কুরআনের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। এটা একক কিতাব। লোকেরা প্রমাণ করতে পারে না যে, আল-কুরআন মানবের হাতে রচিত। তারা বলে আল-কুরআন হলো চাতুর্যপূর্ণ ও প্রতারণা। যদিও তারা আল-কুরআনের কোনো একটি স্থানে প্রতারণার একটি স্থানও পায় নি, তারা এমন জিনিসে বিশ্বাস করে, যে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ বা কারণ নেই। তারা বোকা বনে যায় কিন্তু এর ওপরই লেগে থাকে। উদহারণস্বরূপ, একটি লোক আমার শত্রু অথচ এর পক্ষে না আছে প্রমাণ, না আছে কারণ। কিন্তু যখন লোকটি আমার সামনে আসে, আমার মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমি তার সাথে শত্রুর মতো ব্যবহার করি। এর প্রতিক্রিয়ায় সেও আমার সাথে শত্রুর মতো ব্যবহার করে, এতে আমি সন্তুষ্ট হই যে, আমি সঠিক ছিলাম। এ লোক আমার শত্রু, কারণ সে আমার শত্রুর মতো ব্যবহার করেছে। যদি আমার পূর্ববর্তী ভুল বিশ্বাস না হতো তাহলে সে কখনো আমার সাথে শত্রুর মতো ব্যবহার করতো না। সুতরাং কিছু লোক কোনো প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই কিছু জিনিসে বিশ্বাস করে এবং নিজেকে বোকা বানায় এবং তার ওপরেই টিকে থাকে।

আল-কুরআন বলে যে, অহী যুক্তির সাথে সমানভাবে চলে। কিছু লোক বলে ধর্মশাস্ত্র যুক্তির উর্ধ্বে। সেগুলো যদি যুক্তির উর্ধ্বে হয়, তাহলে কীভাবে বুঝা যাবে কোনো পবিত্র শাস্ত্র সত্য আর কোন্‌গুলো মিথ্যা? আল-কুরআন বাস্তবে যুক্তি এবং একইভাবে আলোচনাকে উৎসাহিত করে। অনেক মুসলমান অনুধাবন করে যে, আপনাদের ধর্মীয় আলোচনা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনাদের ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। ১৬ নং সূরা আন নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

অর্থ : আপনার প্রভুর পথে মানুষকে হিকমত ও উত্তম যুক্তি দিয়ে ডাকুন, আর বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়।

এভাবে কুরআন আলোচনা ও যুক্তিকে উৎসাহিত করে। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আররি শব্দ । قَالُوْا 'তারা বলে' আল-কুরআনে ৩৩২ বার এবং قُلْ 'বল'-ও ৩৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, আল-কুরআন আলোচনাকে উৎসাহিত করে।

'বিকল্প নিঃশেষ কর' নামে পরিচিত একটা থিওরি আছে। কুরআন বলে, এই কিতাব, আল-কুরআন অবতারিত। তা যদি না হয়, তাহলে কী হবে? আপনাকে অন্য বিকল্প দাঁড় করাতে হবে। কেউ বলতে পারে যে এটি মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতের তৈরি। কিন্তু এটা ভুল প্রমাণিত হলো। কেউ বলতে পারে তিনি পার্থিব স্বার্থে মিথ্যে বলেছিলেন। তাও ভুল প্রমাণিত হলো। নাউযুবিল্লাহ। তারা যে দাবিই করুক, নিয়ে আসুক এবং পরীক্ষার জন্য দাঁড় করাক; তা কাগজ-কালি, যেখানেই এটা নিশ্চিত হতে হবে এটাকে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কুরআন বলে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, যদি তা না হয় তাহলে কোত্থেকে?

৪৫ নং সূরা জাছিয়া, আয়াত নং ১ ও ২-এ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

حٰمٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ

অর্থ : হামী-ম! পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ কিতাবের অবতরণ।

আল-কুরআনের বহু স্থানেই বলা হয়েছে যে, এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। নিম্নে সূরা এবং আয়াতের তালিকা দেয়া হলো–

৬ নং সূরা আল-আনআম, আয়াত নং- ১৯

৬ নং সূরা আল-আনআম, আয়াত নং- ৯২

১২ নং সূরা ইউসুফ, আয়াত নং- ১ ও ২

২০ নং সূরা ত্বাহা, আয়াত নং- ২০

২০ নং সূরা ত্বাহা, আয়াত নং- ১১৩

২৭ নং সূরা নাহল, আয়াত নং- ৬

৩২ নং সূরা আসসাজদা, আয়াত নং- ১ ও ৩

৩৬ নং সূরা ইয়াসীন, আয়াত নং- ১ ও ৩

৩৯ নং সূরা আযজুমাআ, আয়াত নং- ১

৪৫ নং সূরা আল জাছিয়া, আয়াত নং- ২

৫৫ নং সূরা আর-রহমান, আয়াত নং- ১ ও ২

৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়াহ্, আয়াত নং- ৭৭ ও ৮০

৭৬ নং সূরা আল ইনসান, আয়াত নং- ২৩।

বিভিন্ন স্থানে আল-কুরআন বলে, 'এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব, যদি তা না হয় তাহলে কী?'

বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকম থিওরি পেশ করার পদ্ধতি রয়েছে। যদি কারো নতুন কোনো থিওরি থাকে, তারা বলে আমাদের শোনার সময় নেই এবং ঐ

ব্যাপারে তাদের যুক্তি আছে। তারা বলে, যদি তোমার নতুন থিওরি থাকে তাহলে যদি তোমার থিওরি ভুল প্রমাণ বা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আমার নিকট এনো না। আমার নষ্ট করার মতো সময় নেই। একে বলে 'মিথ্যা প্রতিপন্ন' করার পরীক্ষা। একই কারণে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন শতাব্দীর শুরুতে একটি নতুন থিওরি দিলেন যে, মহাবিশ্ব ঐরূপ কাজ করে। এ জন্য তিনি তিনটা মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষাও প্রদান করে বলেন, যদি আপনি মনে করেন আমার থিওরি ভুল তাহলে এ তিনটি জিনিস করে দেখান, তাহলে আমার থিওরি ভুল প্রমাণিত হবে। বৈজ্ঞানিকরা এর ওপর ৬ বছর গবেষণা করার পর বলে, হ্যাঁ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের থিওরি সঠিক। ঐটা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বরং তিনি শোনাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আল-কুরআনের বহু 'মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা' রয়েছে। ভবিষ্যতে যখন আপনি কারো সঙ্গে আলোচনায় যাবেন, আপনি তাকে প্রশ্ন করবেন তার ধর্ম মিথ্যা প্রমাণের কোনো পন্থা আছে কি না? বিশ্বাস করুন! আমার সাথে এ পর্যন্ত এমন একজনেরও সাক্ষাত মেলে নি যে বলেছে, আমার ধর্ম মিথ্যা প্রমাণের কোনো পথ আছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা রয়েছে। কিছু শুধু অতীতের জন্য ছিল, কিছু সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। আসুন আপনাকে কিছু উদাহরণ দিয়ে দিই। আবু লাহাব নামে রাসূল ﷺ -এর একজন চাচা ছিলেন। যিনি ছিলেন রাসূলের ঘোর বিরোধী। যখনই নবী করীম ﷺ কোনো আগন্তুকের সাথে কথা বলতেন, সে পিছু নিত এবং রাসূল ﷺ তাকে ছেড়ে যাবার সাথে সাথে সে তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতো মুহাম্মদ ﷺ তোমাকে কী বললো? সে কী বলেছে এটা দিন, এটা রাত, এটা সাদা, এটা কালো? সে নবী করীম ﷺ যা বলেছেন, তার ঠিক বিপরীত বলত। আল-কুরআনে ১১১ নং একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাই রয়েছে যার নাম লাহাব। এটা নাযিল হলো। যাতে বলা হয়েছে, 'আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী জাহান্নামে ধ্বংস হবে।' এবং এখানে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে, এরা কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না। এ সূরা আবু লাহাবের মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে নাযিল হয়।

ঐ দীর্ঘ সময়ে আবু লাহাবের অনেক বন্ধু যারা ইসলামের ঘোরশত্রু ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সে কবুল করে নি। যেহেতু সে সবসময় নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলত, সে একটা জিনিস করতে পারত, সে বলতে পারত, কুরআন মিথ্যা এবং আমি মুসলমান। সে একজন মুসলিমের মতো করতে পারে নি। সে শুধু বলতে পারত আমি মুসলিম এবং কুরআন ভুল প্রমাণিত। তার জন্য কুরআনকে ভুল প্রমাণ করা খুবই সহজ ছিল। সে যেহেতু পূর্বেও মিথ্যা বলেছে, সে আরেকটি অতিরিক্ত মিথ্যাও বলতে পারত। নবী করীম ﷺ যেন তাঁকে বলছেন, তুমি চিন্তা করো আমি তোমার শত্রু। আসো, এটা বল আমি মুসলিম, তাহলে আমি মিথ্যা প্রমাণিত হব। এটা একেবারেই তার জন্য সহজ ছিল। সে

এটা বলে নি, এটাই প্রমাণিত হলো যে, কোনো মানবই তার কিতাবের ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা দেবে না। কারণ এটা আল্লাহর অহী।

এ ধরনের আরেকটি দৃষ্টান্ত ২ নং সূরা বাকারার ৯৪ ও ৯৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : তাদেরকে বল, যদি সত্যি সত্যিই তোমরা মনে করো আখিরাতের আল্লাহর ঘর শুধুই তোমাদের জন্য, অন্য লোকদের জন্য নয়, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত। যদি এ ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। কখনোই তারা তা (মৃত্যু) কামনা করবে না, কারণতারা স্বহস্তে যা কিছু উপার্জন করেছে তার স্বাভাবিক দাবী হইত। আল্লাহ ঐসব জালিমদের সম্পর্কে অবগত।

এ আয়াতগুলো, ইহুদিরা যখন বলেছিল আখিরাতের ঘর অর্থাৎ জান্নাত একমাত্র তাদের জন্য, তখন ইহুদি ও মুসলমানদের সামনাসামনি বিতর্কের সময় অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এ আয়াত একথা বলার জন্য অবতীর্ণ হয় যে, যদি তোমরা মনে করো জান্নাত শুধু তোমাদের জন্যই তাহলে তোমরা মৃত্যুকে ডাক, মৃত্যু কামনা করো। তখন একজন ইহুদি ঐ সময়ে বের হয়ে যদি বলতো আমি মৃত্যু কামনা করি, আমি মরতে চাই। সে করতো না। শুধু বলতো আমি মরতে চাই। কুরআনকে ভুল প্রমাণের জন্য শুধু বলতো আমি মরতে চাই। কুরআনকে ভুল প্রমাণ করা সহজ ছিল। কিন্তু কোনো ইহুদি এগিয়ে এসে বলে নাই আমি মরতে চাই। এটা হলো 'মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা'।

কিন্তু আপনি আমাকে বলতে পারেন এ সব পরীক্ষা তো অতীতের। এখন আমরা কীভাবে কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে পারি? যদি আপনি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চান, কুরআনের পরীক্ষা আছে। 'মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা' এগুলো সব সময়ের জন্য। ঐ সময়ের জন্য, আজকের জন্য এবং চিরকালের জন্য। কুরআন বলে, অনেক লোক দাবি করে যে কুরআন মিথ্যা ছিল ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত নং ৮৮-এ আল্লাহ বলছেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ : তাদের বলো, যদি মানুষ ও জিন মিলে কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করতে চায়, তাহলে তারা তা পারবে না, যদি এ ব্যাপারে তারা একে-অপরের সাহায্যকারীও হয়। এটা তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৮)

আল-কুরআনকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম আরবি সাহিত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। আল-কুরআনের আরবি ভাষা খুবই স্বচ্ছ, অর্থবহ, বোধগম্য, দ্ব্যর্থহীন ও অলৌকিক। এটি কাউকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয় না। এমনকি এর কাব্য অন্য কবিতা ও সাহিত্যের মতো নয়, এটা অহীর সর্বোচ্চ কাব্যিক ও ছান্দিক। কুরআনের একই আয়াত একজন সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে বুঝাতে সক্ষম। একই চ্যালেঞ্জ ৫২ নং সূরা আত-তুরের ৩৪ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে–

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۔

অর্থ : তাদের একথার ব্যাপারে যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারাও এর মতো একটা বাণী রচনা করে নিয়ে আসুক।

এরপর এ চ্যালেঞ্জকে আরো হালকা করে পেশ করা হয়েছে ১১ নং সূরা হুদ-এর ১৩ নং আয়াতে–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ط قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔

অর্থ : তারা কি বলে, মুহাম্মাদ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়ে এসেছে? আপনি বলুন! তোমরা স্বরচিত মাত্র দশটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো, আর আল্লাহ ছাড়া যারা আছে তাদের সাহায্যের জন্য ডেকে নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

এ দশ সূরাও তারা রচনা করতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ এ পরীক্ষা আরো সহজ করে ১০ নং সূরা ইউনুসের ৩৮ নং আয়াতে বলছেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۔

অর্থ : তারা কি বলে ইনি [মুহাম্মাদ ﷺ] এটি রচনা করে নিয়ে এসেছেন। আপনি বলুন, তোমরা এমন একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া আর যে সাহায্যকারী পাও তাকে ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

এরপর সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা দিয়েছেন। সবচেয়ে সহজতম মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষা ২ নং সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : আমার বান্দার প্রতি আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তার সত্যতার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে যাও– সেই (একটি) সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, তাদেরকেও ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা না পার, প্রকৃত পক্ষে তোমরা কখনও পারবে না সুতরাং সেই অগ্নিকে ভয় কর যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর– যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত।

প্রথমত, আল-কুরআন-এর মতো আবৃত্তি পেশ করার চ্যালেঞ্জ দেয়। আল্লাহ আরেকটু সাধারণ করে আল-কুরআনের ১০টি সূরার সমান রচনা করতে বলেন। এরপর একটি সূরা। এখানে বলছে একটি সূরার অনুরূপ مِنْ مِّثْلِهٖ (মিম মিছলিহি) অন্যস্থানে আল কুরআন বলেছে مِثْلِهٖ। এখানে مِنْ مِّثْلِهٖ বলে প্রায় অনুরূপ বুঝানো হয়েছে এবং আরবের অ-মুসলিমরা এটা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন যখন নাযিল হয়, তখন আরবি সাহিত্য সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করছিল। অনেক পৌত্তলিক আরব চেষ্টা করেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের কিছু কাজ ঐতিহাসিক গ্রন্থে এখনো বিদ্যমান, যেটা তাদেরকে হাস্যস্পদ করে রেখেছে। যদিও এ চ্যালেঞ্জ ১৪০০ বছর পূর্বের, তবুও এটা এখনো বহাল আছে।

আজ ১৪ মিলিয়নের বেশি কপটিক খ্রিস্টান রয়েছে, যারা জন্মসূত্রে আরবে বাস করে। আরবি তাদের মাতৃভাষা। এ পরীক্ষা তাদের জন্যেও। এখনো যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায়, তাহলে একটি জিনিসই তাদের করতে হবে তাহলো একটা সূরার মতো একটা অংশ রচনা করা। আর যদি আপনি নির্দিষ্ট সূরা বিশ্লেষণ করেন, নির্দিষ্ট অধ্যায় যাতে মাত্র কয়েকটি শব্দ রয়েছে। তারপরে এ কাজ করতে কেউ সক্ষম হয় নি এবং হবেও না ইনশা আল্লাহ। আপনি আমাকে বলবেন, আরবি আমার মাতৃভাষা নয়। সুতরাং এ পরীক্ষার আমি উপযুক্ত নই। সবার সদয় অবগতির জন্য বলছি আল-কুরআনে অনারবিদের জন্যও পরীক্ষা রয়েছে। ঐ সব লোক, যারা আরবি জানে না, যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায়, তারাও তাদের পর্যায়ে চেষ্টা করতে পারে। আমি পবিত্র কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম। বলা হচ্ছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ـ

অর্থ : এরা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ কিতাব যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসতো, তাহলে তারা অবশ্যই এর মধ্যে অনেক গরমিল পেতো।

আল-কুরআন বলেছে যদি তুমি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাও তাহলে শুধু একটা বৈপরীত্য, একটা গরমিল বের কর। এটাও সহজ। আমি জানি শত শত লোক কুরআনের ভুল এবং বৈপরীত্য ধরার চেষ্টা করেছে। বিশ্বাস করুন, তাদের ১০০% হয়তো মূল কিতাবের বাইরের, যেমন তারা ভুল উদ্ধৃতি বা ভুল অনুবাদ দিয়েছে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মাত্র। এখনো কোনো ব্যক্তি আল-কুরআনে একটা বৈপরীত্য বা ভুল বের করতে পারে নি।

কেউ-ই কুরআনের কোনো ত্রুটি খুঁজে বের করে দেখাতে পারবে না।

মনে করুন একজন মাওলানা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানে নয়। আমি এমন অনেক মাওলানাদের চিনি, যারা ইসলাম এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয় সম্পর্কে ভালো জানেন। ধরুন, অন্য একজন মাওলানা যিনি ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ভালো জানেন কিন্তু বিজ্ঞানে ভালো দখল নেই। আপনি তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন, কুরআনে একটি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। তিনি কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভুলের বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারলেন না। এতে বুঝা যায় না যে, কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। ২৫ নং সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ـ

অর্থ : দয়াময় রহমান সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস কর, যে ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অবগত।

যদি আপনি আল-কুরআন সম্পর্কে জানতে চান এবং এতে যদি বৈজ্ঞানিক বিষয় থাকে, তাহলে একজন বিজ্ঞানী-ই পরিষ্কার করতে পারবেন কুরআনের সেই ব্যাখ্যা। একইভাবে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কেউ কুরআনের ব্যাকরণগত ভুল যদি কেউ বের করে। আমি আরবিতে দক্ষ নই। আমি একজন মাত্র শিক্ষার্থী এবং আমি আরবির ভুল শোধরাতে পারি না।

আমি এ বিজ্ঞানের বিষয়টা পরিষ্কার করতে পারবো, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমি আরবির ভুল পরিষ্কার করতে পারবো না। কেউ-ই আল-কুরআনের ভুল ধরতে

তারা পারে নি এবং ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা, কুরআনে কোনো ভুল-ক্রটি নেই।

এ যৌক্তিক বিশ্লেষণের পর কোনো লোক যে আল্লাহতে বিশ্বাসী, সে বলতে পারে না যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে নি। যদি কোনো ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস না করে, সে অন্যরকম বলবে। কিন্তু একজন অমুসলিম যে আল্লাহ-য় বিশ্বাস করে, এসব প্রমাণ পাওয়ার পর, সে বলতে পারে না যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়।

এখন একমাত্র তৃতীয় মৌলিক অনুমানই বাকি থাকলো যে, এর মূল স্বর্গীয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাদের জন্য বলছি, যারা খোদায় বিশ্বাস করে না, নাস্তিক। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি সে সব নাস্তিকদের, যারা এখানে উপস্থিত আছেন। আমার বিশেষ অভিনন্দন নাস্তিকদের জন্য, কারণ তারা নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে। তারা তাদের যুক্তির শক্তিকে ব্যবহার করে। খোদায় বিশ্বাসী অধিকাংশ লোকই অন্ধ বিশ্বাসী। সে খ্রিস্টান কারণ তার পিতা একজন খ্রিস্টান, সে একজন হিন্দু, কারণ তার পিতা একজন হিন্দু, কিছু মুসলমানরা এজন্য মুসলমান, যেহেতু তাদের পিতা-মাতা মুসলমান। তারা অন্ধ বিশ্বাসী।

নাস্তিকরা অন্তত বলে 'লা ইলাহা '– কোনো খোদা নেই

যদিও একজন নাস্তিকের ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল। অথবা ধর্মীয় পরিবার, তথাপি সে চিন্তা করলো যে তার চারপাশের লোকজন কীভাবে এমন খোদার ইবাদাত বা পূজা করে, যার গুণাবলী একজন মানুষের মতোই, এটা কী করে সম্ভব? তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করে আমি কীভাবে এরূপ খোদার পূজা করবো? সুতরাং সে বলে কোনো খোদা নেই। সে খোদায়িত্বের ধারণা বাতিল করে দেয়। কিছু মুসলমান আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, জাকির সাহেব, আপনি কীভাবে একজন নাস্তিককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন? আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এজন্য যে, সে কালিমা শাহাদাতের প্রথম অংশ ইসলামে প্রবেশের প্রথম অংশ লা-ইলাহা 'নেই কোন মাবুদ' এটুকু পড়েছে। এখন শুধু বাকি থাকল 'ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া'। যে অংশ আমরা পূরণ করবো ইনশা-আল্লাহ। সে শাহাদাত-এর প্রথম অংশ 'নেই কোনো খোদা'কে মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ সে এমন খোদাকে মানে না, যার মধ্যে মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো তার নিকট সত্যিকার খোদা আল্লাহর (অস্তিত্বের) প্রমাণ পেশ করা।

যে মুহূর্তে একজন নাস্তিক বলে যে, আমি কোনো খোদায় বিশ্বাস করি না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো 'আল্লাহ' এর সংজ্ঞা কী? আপনি গড দ্বারা কী বুঝাতে চান এবং তাকে উত্তর দিতে হবে। আপানারা কি জানেন? ধরুন আমি বললাম, এটা একটা কলম। আপনি বললেন, এটা কলম নয়, আপনাকে 'না' বলার জন্য জানতে

হবে কলম কী জিনিস। কলমের অর্থ কী? আপনাকে কলমের সংজ্ঞা জানতে হবে। আপনি নাও জানতে পারেন এটা কী? কিন্তু আমি যদি বলি এটা কলম আর আপনি যদি বলেন কলম নয়, তাহলে কমপক্ষে আপনাকে কলমের অর্থ জানতে হবে। একই পন্থায় যদি কোনো নাস্তিক বলে 'কোনো খোদা নেই' তাকে জানতে হবে 'খোদা' মানে কী? এবং নাস্তিকেরা আমাকে বলবে দেখুন। আমার চারপাশের লোকেরা পূজা করে এবং তারা যে খোদার উপাসনা করে, তা তাদের হাতের তৈরি। তাদের মানবিক বৈশিষ্ট্য আছে। অতএব, আমি এ ধরনের খোদায় বিশ্বাস করি না। কেননা, খোদার যে ধারণা এ লোকদের আছে তা ভুল ধারণা। যেহেতু আপনি ভুল ধারণা বাতিল করেছেন, আমি মুসলমান হিসেবেও খোদার ভুল ধারণা বাতিল করছি 'লা ইলাহা'। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তার সাথে একমত, সে মুহূর্তে আমি তাকে আল্লাহর সম্পর্কে সত্য ধারণা দান করবো।

আমাদেরই কর্তব্য খোদার সঠিক ধারণা ঠিক করে দেয়া

ধরুন, একজন অমুসলিম বিশ্বাস করে যে, ইসলাম মূলহীন ধর্ম। এটা একটা নির্দয় ধর্ম, যা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত, এটা এমন একটা ধর্ম, যা নারীদের অধিকার দেয় নি। এটা এমন একটা ধর্ম যা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। একথা বলে যদি সে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমিও বলব, আমিও এ ধরনের মূলহীন ও কঠোর ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করি, যা নারীদের অধিকার দেয় না, যা অবৈজ্ঞানিক। একই সময়ে আমার দায়িত্ব হলো তাকে ইসলাম ধর্মের ধারণা সংশোধন করে দেয়া, তাকে বলতে হবে ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা দয়াপূর্ণ, সন্ত্রাসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটি নারীদের সমঅধিকার প্রদান করে। এটি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক তো নয়ই বরং সহযোগিতাপূর্ণ। এরপর আল্লাহ চাইলে এ অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। আমাদের দায়িত্ব হলো ধারণা ঠিক করে দেয়া। একইভাবে আমাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাটাও মস্তিষ্কে সঠিকভাবে প্রদান করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনের ১১২ নং সূরা ইখলাছ থেকে আপনাকে দিতে চাই। মহান রব বলেন–

اَللّٰهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও চিরঞ্জীব।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ-তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে জন্ম গ্রহণও করেন নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

ব্যাখ্যা

প্রথম অংশ

তার কোন শুরু ও শেষ নেই। তিনি সেই সত্তা, যিনি অন্যদের সাহায্য করেন, তাঁর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় অংশ

পৃথিবীতে তার সাথে তুলনা করার মতো কিছু নেই। যখনই আপনারা আল্লাহকে কারোর সঙ্গে তুলনা করবেন, তিনি আল্লাহ নন। যদি আপনি বা কেউ সর্বশক্তিমান কোনো গডকে আল্লাহ বলতে বলেন, তার মধ্যে এ চারটি লাইনের সংজ্ঞা আছে, আমাদের মুসলমানদের তাঁকে সর্বশক্তিমান হিসেবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না।

যদি রজনীশ খোদা হতেন তাহলে তিনি তার অ্যাজমা ও ডায়াবেটিস নিরাময় করতে পারতেন

তাকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করতে কি... আপনাদের দাবিদার কারা, দাবিদারদের এক এক করে নিয়ে আসুন। কেউ বলতে পারে 'ভগবান রজনীশ অশো হলেন সর্বশক্তিমান খোদা।' আসুন আমরা তাকে পরীক্ষায় ফেলি। প্রথম কায়দা হলো : বলুন আল্লাহ এক ও একক। কিন্তু রজনীশের মতো আমাদের অনেক লোক বিদ্যমান। আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা প্রচুর। এরপরও রনজীশের অনুসারীরা বলবে না, রজনীশ একক, সে এক। তাকে প্রথম পরীক্ষায় পাশ করতে দিন (ধরে নিন সে পাশ করল)। দ্বিতীয় পরীক্ষা হলো : "আল্লাহ হলেন নিরঙ্কুশ ও চিরস্থায়ী।" তার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিনি অন্য লোকদের সাহায্য করেন। আমরা রজনীশকে ভালোই চিনি। তিনি অ্যাজমা ও ডায়বেটিসের মতো রোগে ভুগছিলেন। তিনি নিজের রোগের নিরাময় করতে পারেন নি। তিনি কীভাবে আপনার আমার রোগের নিরাময় করবেন?

রজনীশ যদি খোদা হতেন তাহলে তিনি বন্দি হতেন না, তাকে বিষ প্রয়োগ করা যেত না

যখন রজনীশ আমেরিকা গিয়েছিলেন, তখন তিনি আমেরিকা সরকার কর্তৃক বন্দি হন। চিন্তা করুন! খোদা বন্দি হলেন। তিনি নিজকে মুক্ত করতে পারলেন না, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়লে তিনি আমাকে আপনাকে কীভাবে মুক্ত করবেন? এরপর তিনি বিবৃতি দিলেন, তারা তাকে বিষ প্রয়োগ করেছেন, ধীর গতির বিষ।

চিন্তা করুন! খোদা কি বন্দি হতে পারেন। তাকে পরীক্ষা করুন। গ্রিসের আর্চ বিশপ বলেছিলেন, যদি আপনারা খোদায়ী দাবিদার রজনীশকে বহিষ্কার না করেন,

তাহলে আমরা তার এবং তার শিষ্যদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করব। ফলে রাষ্ট্রপতি তাকে গ্রিস থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি কি তাহলে নিরঙ্কুশ ও চিরস্থায়ী?

তৃতীয় পরীক্ষা

তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্ম গ্রহণও করেন নি। আমি জানি না রজনীশের কত জন সন্তান ছিল, কিন্তু আমি জানি তার একজন মাতা এবং একজন পিতা ছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আপনি যখন তার সেন্টার পুনে যাবেন, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ভগবান রজনীশ কখনো জন্মলাভ করেন নি, কখনো মারা যান নি; বরং ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত পৃথিবী দর্শন করেছিলেন। তারা উল্লেখ করে নি যে, তিনি একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী দর্শন করার অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না। তাকে ভিসা দেয়া হয় নি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাকে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। বুঝুন! ভগবান পৃথিবী দর্শন করছেন; কিন্তু একবিংশ শতাব্দী দর্শন করতে সক্ষম ছিলেন না। এ খোদায় কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

আল্লাহ অতুলনীয়

সর্বশেষ পরীক্ষা হলো, 'এ পৃথিবীতে তার সমকক্ষ কেউ নেই।' তার সাথে তুলনীয় কিছুই নেই। যখন আপনি খোদা কী? এ চিন্তা করবেন, তখন খোদা নয় এমন একটা ফিগার আপনি মনে আঁকবেন। আমরা ভালোই জানি যে, রজনীশের বড় চুল, বড় লম্বা দাড়ি, যার রং ছিল সাদা। গাউন পরতেন। যখনই আপনি চিন্তা করবেন এবং খোদার ছবি মনে আঁকতে পারবেন, তিনি খোদা নন। যদি আপনি ধরে নিয়ে বলেন, সর্বশক্তিমান খোদা বলিউড অভিনেতা আরনল্ড সুয়ার্জনেগার-এর চেয়ে এক হাজার গুণ শক্তিশালী। আপনি কি জানেন আরনল্ড সুয়ার্জনেগার কে? তিনি মিস্টার ইউনিভার্স হিসেবে উপাধি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি, যদি আপনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান খোদা আরনল্ড সুয়ার্জনেগার অথবা দারা সিং কিংবা কিংকং-এর চেয়ে এক হাজার গুণ শক্তিশালী, তাহলে তিনি খোদা নন। যে মুহূর্তে আপনি তাকে কারোর সঙ্গে তুলনা করবেন, তা এক হাজার গুণ, এক মিলিয়ন গুণ অথবা দশ মিলিয়ন গুণ, যখনই আপনি তাকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন তাহলে তিনি খোদা নন। পৃথিবীতে তার সমকক্ষ (বা তুলনীয়) কিছুই নেই।

আমি বিশিষ্ট এবং বিদ্বান শ্রোতৃমণ্ডলিকে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছেড়ে দিব যে, কোন্ ধরনের আল্লাহর ইবাদত তারা করবেন। তাদের খোদাকে কুরআনে বর্ণিত চার পরীক্ষা নিন। যদি এ পুজনীয় খোদা এ চার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আমাদের মুসলমানদেরও এতে আপত্তি নেই যে, আমরা তাঁকে সর্বশক্তিমান খোদা

হিসেবে গ্রহণ করবো। অন্যথায় আপনার সিদ্ধান্ত আপনি নিন। এ পরীক্ষাগুলোর পরে কিছু নাস্তিক হয়তো এ ধরনের খোদায় বিশ্বাস করতে পারেন।

কিন্তু অধিকাংশ নাস্তিক এতে একমত হবে না। তারা বলবে আমরা এ ধরনের সংজ্ঞায় বিশ্বাস করি না, বরং আমরা অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি। আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। আমি একমত যে, আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সুতরাং আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগাই। আসুন, আমরা একে কুরআনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। নাস্তিকেরা বলে বিশ্ব এখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির। সুতরাং আমরা এ ধরনের প্রভুকে বিশ্বাস করি না, খোদার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে প্রমাণ করুন। তারপরই আমরা এতে বিশ্বাস করবো।

প্রথমেই আমি এ ধরনের নাস্তিক অথবা খোদায় অবিশ্বাসী কোনো শিক্ষিত লোককে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি শুধু বিজ্ঞানেই বিশ্বাসী। আপনি কি আমাকে ঐ প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন, যিনি অজানা বস্তুর গঠন সম্পর্কে বলতে সক্ষম? এখানে একটি বস্তু আছে, অজানা বস্তু এবং একটা অজ্ঞাত মেশিন, যে মেশিন সম্পর্কে এ পৃথিবীর কেউ শোনেনি, দেখেও নি। এখন এ মেশিন ঐ নাস্তিকের সামনে অথবা ঐ শিক্ষিত লোকের সামনে যিনি এ অপরিচিত বস্তুর গঠন সম্পর্কে বলতে সক্ষম তার সামনে আনা হলো। আমি এ প্রশ্ন শত শত নাস্তিককে জিজ্ঞেস করেছি। সামান্য একটু চিন্তা করার পর সে উত্তর দেয় হতে পারে যে স্রষ্টা, যিনি বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন, কেউ বলতে পারে আবিষ্কারক। কেউ ম্যানুফ্যাকচারার অথবা উৎপাদনকারীও বলতে পারে। বিশ্বাস করুন তারা যাই বলুক, তা প্রায় একই।

আল কুরআনের বহু স্থানে পানিচক্র সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে

আল কুরআন বহুস্থানে পানিচক্র সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে, যা আবিষ্কৃত হয় ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে বার্নার্ড প্যালামি কর্তৃক। মাত্র এই ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান সামঞ্জস্যশীল পানিচক্র আবিষ্কৃত হয়। কুরআনে কে ১৪০০ বছর পূর্বে এটা উল্লেখ করেছেন?

নাস্তিক আপনাকে বলবে ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে 'ভাঁজ' পড়াজনিত একটা ঘটনা পরিচিত আছে। যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি, এ পৃথিবীর আবরণ খুবই পাতলা। এ সব পর্বতশ্রেণী 'ভাঁজ' ঘটিত ঘটনায় পৃথিবীকে কম্পন থেকে রক্ষা করে। এটি পৃথিবীকে স্থির রাখে। আমি তাকে বললাম কুরআন এটি ৭৮ নং সূরা নাবা'য় ৬ ও ৭ নং আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি ভূমিকে বিছানার মতো ও পাহাড়সমূহকে পেরেকের মতো গেঁড়ে রাখি নি?

আল-কুরআন বলছে যে, পাহাড়গুলোকে পেরেকের মতো গঠন করা হয়েছে। এটা হলো সেই বর্ণনা, যা আজকের বিজ্ঞানীরা কীলকের মতো করে দিচ্ছেন। পর্বতগুলো হলো মূল পেরেক। আল-কুরআন ২১ নং সূরা আম্বিয়ায় আরো তথ্য প্রদান করছে। আয়াত নং-৩১-এ বলা হয়েছে–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ـ

অর্থ : আমি জমিনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহকে গেড়ে রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে না পারে।

নাস্তিক আমাদের আরো বলবে যে, এমনকি লবণাক্ত পানি ও মিঠা পানি যদিও পরস্পর মিলিত হয় তবুও মিশ্রিত হবে না। সেগুলো পৃথক থাকবে। আমি তাকে আল-কুরআনের ২৫ নং সূরা ফুরকানের ৫৩ নং আয়াতের দিকনির্দেশনা দিলাম, যাতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ

অর্থ : তিনি আল্লাহ যিনি দুই প্রকারের পানির স্রোতধারা তৈরি করেছেন। একটি ধারা মিষ্ট সুপেয় অপরটি লবণাক্ত ক্ষার এবং উভয়ের মাঝে তিনি (আল্লাহ) একটি সীমারেখা দিয়ে দিয়েছেন, যা অনতিক্রম্য।

একই ধরনের সংবাদ দেয়া হয়েছে ৫৫ নং সূরা আর রাহমানের ১৯ ও ২০নং আয়াতে–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থ : তিনি দুটি স্রোতধারাকে প্রবাহিত করেছেন, যার মাঝে হলো একটি অন্তরাল, যার বাধা অনতিক্রম্য।

এখন বিজ্ঞান বলছে যে, লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি মিশ্রিত হয় না। এ দুয়ের মাঝে আছে একটি বাধা। সে আমাকে বলতে পারে যে, কিছু আরব হয়তো পানির নিচে গিয়ে বাধা দেখে এসেছে এবং এরূপ কুরআনে উল্লেখ করেছে। তারা এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এ বাধাটি অদৃশ্য। আল-কুরআনে بَرْزَخٌ (বারযাখ) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ অদৃশ্য বাধা। এবং এ ধরনের ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে বেশিরভাগ দেখা যায়। কেপ টাউন হলো দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণের

অগ্রভাগ। এটা মিসরেও দেখা যায়, যখন ভূমধ্যসাগরের মধ্যে নীল নদ প্রবাহিত হয়। যে উত্তরই তারা দেয়, আমি গ্রহণ করে নিই, আমি শুধু মনে রাখি। এটা প্রায় একই হবে।

পরবর্তী ব্যক্তি, ঐ ব্যক্তি হতে পারে, যাকে স্রষ্টা বলেছেন, হতে পারে কেউ গবেষণা করেছে। কিন্তু ব্যক্তি স্রষ্টা, ম্যানুফ্যাকচারার, আবিষ্কারক অথবা উৎপাদক হতে পারে। আমি নাস্তিককে জিজ্ঞেস করি যে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, এ পৃথিবী কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করল? সে আমাকে বলে প্রাথমিকভাবে পূর্ণ বিশ্ব ছিল ঘোলাটে আচ্ছাদন এরপর 'বিগব্যাং' হলো দ্বিতীয় বিভক্তি, যার দ্বারা গ্যালাক্সী বা ছায়াপথ জন্ম লাভ করল এবং এটি গ্রহ নক্ষত্র তৈরি করল যাতে আমরা বাস করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, এ সকল কল্প কাহিনী কোত্থেকে পেলে? সে বলে, না। এগুলো কল্প কাহিনী নয়, এগুলো প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং আমরা এর প্রমাণও পেয়েছি। আমি বলব কোথায় শিখেছ? এ সকল কল্প কাহিনী কখন শিখেছ? সে বলে, না। এগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য। সেগুলো কল্প কাহিনী নয়। আমরা এগুলো গতকাল শিখেছি। বিজ্ঞানের গতকাল মানে ৫০ বছর আগে অথবা ১০০ বছর আগে।

আল-কুরআন 'বিগ ব্যাং' সম্পর্কে ১৪০০ বছর আগে বলেছে

১৯৭৩ সালে এক দম্পতি 'বিগ ব্যাং' থিওরি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সুতরাং বলি ঠিক আছে, তুমি বলছ এটা বাস্তব, আমি এটাকে গ্রহণ করলাম। কিন্তু কুরআনে যে বিষয়ে ১৪০০ বছর পূর্বে বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে তুমি কী বলবে? যেটা ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ -

অর্থ : এরা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি, আমি পানি থেকেই সব কিছুকে প্রাণবন্ত করেছি, তারপরও কি তারা ঈমান আনবে না?

আমার কুরআন যা ১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে, যা সাক্ষ্য দেয় যে এটি ১৪০০ বছর পূর্বে বর্তমান ছিল, কীভাবে আমার কুরআন তোমার 'বিগ ব্যাং' থিওরি সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বে কথা বলল? সংক্ষেপে, আপনি বলেন এটা গতকাল আবিষ্কার হয়েছে, ৫০ বছর পূর্বে অথবা ১০০ বছর পূর্বে। কে কুরআনে এটা উল্লেখ করেছিল?

নাস্তিক বলল, হয়তো কেউ ধারণা করে থাকতে পারে। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ না দিয়ে অগ্রসর হই।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তার আকার কী? সে বলে, পূর্বে মানুষ মনে করতো পৃথিবী চ্যাপ্টা (সমতল) ছিল, মানুষ শেষ পর্যন্ত ভ্রমণের ঝুঁকি নেয় নি, যাতে সে পড়ে না যায়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে, এটা দেখানোর যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়। এটা গোলাকার। তুমি কখন শিখলে? গতকাল। ১০০ বছর পূর্বে, বিজ্ঞানে ২০০ বছর পূর্বে এবং তার যদি ভালো জ্ঞান থাকে তাহলে বলবে পৃথিবী গোলাকার-এ বিষয়ে যিনি প্রথমে প্রমাণ করে ১৫৯৭ সালে দেখিয়েছেন তিনি হলেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক। আমি তাকে হতবুদ্ধি করার জন্য এক প্রশ্ন করি। ৩১ নং সূরা লুকমানের ২৯ নং আয়াতটি বিশ্লেষণ করুন। আল্লাহ বলেন–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ـ

অর্থ : আপনি কি চিন্তা করে দেখেন নি, আল্লাহ তাআলা কীভাবে রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান, আবার দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করান।

আরবিতে يُولِجُ শব্দ রয়েছে। যার অর্থ ধীরে এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। রাত ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে দিনে পরিবর্তিত হয়, এবং দিন ধীরে ধীরে আর পর্যায়ক্রমে রাতে পরিণত হয়। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। যদি পৃথিবী গোলাকার হয় তাহলেই শুধু এ ধরনের ধীর পরিবর্তন সম্ভব।

একই ধরনের সংবাদ ৩৯ নং সূরা যুমারের ৫ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে–

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ـ

অর্থ : তিনি রাতকে দিনের ওপর লেপ্টে দেন, আবার দিনকে রাতের সাথে লেপ্টে দেন।

লেপ্টে দেয়া এবং পেঁচানো যেমন মাথায় পাগড়ি পেঁচানো, এধরনের পরিবর্তন শুধু এ সময় সম্ভব, যখন পৃথিবী গোলাকার হবে। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে এটা সম্ভব নয়। আপনি বলছেন, এটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে? আপনি কি হিসাব করতে পারেন কে এটি কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন? হতে পারে এটা একটা ভালো অনুমান, এটা বন্য অনুমান, কিন্তু এটা অনুমান। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করি না, এগিয়ে যাই।

কুরআন উল্লেখ করে যে, চাঁদের আলো প্রতিবিম্ব (নিজস্ব নয়)

আমরা চন্দ্র থেকে যে আলো পাই তা কোত্থেকে আসে? (এ প্রশ্নের উত্তরে) সে আমাকে বলে যে, পূর্বে লোকেরা মনে করতো চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তারা জানতে পেরেছে যে, চাঁদের আলো তার নিজের

আলো নয় বরং এটা সূর্যের প্রতিবিম্বের আলো। আমি তাকে প্রশ্ন করি যে, ২৫ নং সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ : বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আসমানে অসংখ্য বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ বা কক্ষপথ) তৈরি করেছেন। আর আসমানে স্থাপন করেছেন উজ্জ্বল আলোক পিণ্ড (সূর্যকে) এবং প্রতিবিম্বিত আলোর অধিকারী চাঁদকে স্থাপন করেছেন।

চাঁদের আরবি শব্দ হলো قَمَرًا (কামার) এবং এখানে আলো বলতে مُّنِيْرًا (মুনীর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'মুনীর' হলো ধার করা আলো, نُوْرٌ (নূর) হলো আলোর প্রতিবিম্ব। কুরআন বলছে যে, চাঁদের আলো হলো প্রতিবিম্বিত আলো। যদি আপনি দাবি করেন এটা আজ আবিষ্কৃত, তাহলে ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআনে এটি উল্লেখ করা হলো কীভাবে? সে কিছু সময়ের জন্য থেমে যাবে। সে তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিবে না। এরপর সে হয়তো বলতে পারে, এটা অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি। আলোচনার খাতিরে আমি তার সাথে তর্ক করি না। আমি বলি, যদি তুমি একে অনুমান বলো, তাহলে আমি তর্ক করবো না।

আসুন আমরা অগ্রসর হই। আমি তাকে বলি, আমি ১৯৮২ সালে দশম মান (এস. এস. সি) পাস করি। আমি পড়েছি যে, সূর্য স্থির। এটা আবর্তিত হয়, কিন্তু একই স্থানে থাকে নিজ কক্ষ পথে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কুরআনও কি একথা বলে? আমি বলি না। এটা আমি স্কুলে শিখেছি, সত্য নয় কি? সে বলে না। আজ বিজ্ঞান অগ্রসর। সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি যে, সূর্য আবর্তিতও হয় আবার চলেও। এটা স্থায়ী নয়। এটা তার কক্ষ পথে ঘুরছে, যদি আপনার যন্ত্র থাকে তাহলে আপনি সূর্যকে টেবিলের ওপর ধরতে পারবেন।

সূর্যের কালো দাগ রয়েছে এবং এক চক্র পূরণ করতে এ কালো দাগের কারণে ২৫ দিন লাগে। কুরআন কি বলেছে এটি একস্থানে থাকে? সে হাসতে শুরু করলো। আমি বললাম, না। আল-কুরআনের ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা, যিনি রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

তুমি আমাকে বলো, যে বৈজ্ঞানিক সত্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলো তা কে কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন? সে নীরব থাকে, দীর্ঘ বিরতির পর সে উত্তর দেয় যে,

আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রসর ছিল। সুতরাং হয়তো কোনো আরব তোমার রাসূলকে এ সম্পর্কে বলেছিল, তাই তিনি কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

আমি একমত যে আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তার দিনগুলো খুবই পুরনো। আরবেরা জ্যোতির্বিদ্যায় অগ্রসর হবার বহু শতাব্দী পূর্বেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব কুরআন থেকেই আরবরা জ্যোতির্বিদ্যা লাভ করেছিল। এটা একই সময়ে আদান-প্রদান হয় নি। এভাবে কুরআন অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ করেছে।

আল-কুরআনে ভূগোল ও পানিচক্র

কুরআন ভূগোল এবং পানিচক্রের উল্লেখ করেছে ৩৯ নং সূরা যুমার ২১ নং আয়াতে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ـ

অর্থ : তুমি কি দেখ নি নিশ্চয় মহান আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? অতঃপর এটি তাঁর উৎস মাটিতে নেমে আসে এবং এর দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন।

আল-কুরআন পানিচক্র সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিতই বর্ণনা করেছে। এটা অন্য আয়াতে কারীমাগুলোতে বলা হয়েছে, পানি মহাসাগর থেকে উঠে আসে এবং মেঘে পরিণত হয়। এটা মেঘমালায় ঘনীভূত হয়, বজ্রপাত এবং বৃষ্টিপাত হয়। এটা কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। যেমন :

২৩ নং সূরা মুমিনূন-এর ১৮ নং আয়াত,

৩০ নং সূরা রূম-এর ২৪ নং আয়াত,

২৪ নং সূরা নূর-এর ৪৩ নং আয়াত,

৩০ নং সূরা রূম-এর ৪৮ নং আয়াত,

এর সর্বোত্তম উদাহরণ হলো উপসাগরীয় স্রোত যা হাজার মাইল পর্যন্ত প্রবাহিত। উভয় প্রকারের পানি বর্তমান কিন্তু তারা মিশ্রিত হয় না।

আল-কুরআন ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে ঘোষণা করেছে–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ : আমি জীবন্ত সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি (এরপরও কি) তারা ঈমান আনবে না?

চিন্তা করুন! আরবের মরুভূমিতে যেখানে পানির প্রচণ্ড অভাব, কে চিন্তা করতে পারে যে, প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস পানির তৈরি। যদি তারা অনুমান করে থাকে তাহলে তারা পানি ছাড়া অন্য কিছুর কথাই চিন্তা করবে। এবং আজ বিজ্ঞান আমাদের সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে, যা সেল (কোষ) গঠনের মূল উপাদান সম্পর্কে বলছে এর ৮০% ভাগ পানি, যেখানে জীবন্ত প্রাণীর ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি। কে এই বাস্তব সত্যটি কুরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে উল্লেখ করেছেন?

নাস্তিকটি নীরব থাকবে। সে আপনাকে কোনো উত্তর দেবে না। 'সম্ভাব্যতা' নামে একটি থিওরি আছে, সেটা হলো দুটি সম্ভাবনাকে ধরে নেয়া। সে দুটি সম্ভাবনার একটি সঠিক এবং অন্যটি ভুল। আপনি যদি আন্দাজে অনুমান করেন তাহলে দুটির মধ্যে একটি উত্তর ঠিক। এটি হলো ৫০%। যদি আমি এ কারণে টস দেই, উদাহরণস্বরূপ, তাহলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সুযোগ আছে দুয়ের মধ্যে এক। এটি ৫০%। দ্বিতীয় বার যদি এ জন্য টস করি তাতেও দুয়ের মধ্যে এক। অর্থাৎ ৫০%। কিন্তু উভয় টসে আসার সঠিক হবার সুযোগ আছে–

প্রথম এবং দ্বিতীয় মিলে দুয়ের মধ্যে একবার, আর তাহলে চার ভাগের এক ভাগ অথবা ৫০% এর ৫০% অর্থাৎ ২৫%। আমি যদি একটা ছক্কা নিক্ষেপ করি, যার ছয়টি তল আছে......১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ আন্দাজে অনুমান করলে আমার সঠিক হবার সুযোগ আছে, ছয় ভাগের এক ভাগ। আমি সকল তিন বারের একবার ভাগে পাব প্রথম টস, দ্বিতীয় টস, তৃতীয় নিক্ষেপে আমি সঠিক হব প্রত্যেক তিন বারে ১/২ × ১/২ × ১/৬ মোট হবে ২৪-এর ১ বার।

আসুন, আমরা 'সম্ভাব্যতা' থিওরি কুরআনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। ধরুন! আমরা তর্কের খাতিরে সম্ভাব্যতার সাথে একমত হলাম, এক ব্যক্তি কুরআনে উল্লেখিত সব পেল, এভাবে যে কেউ অনুমান করেছে। আসুন, আমরা কুরআনের ক্ষেত্রে 'সম্ভাব্যতা' থিওরি প্রয়োগ করি। যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবী গোলাকার। একজন পৃথিবীর কী কী আকার অনুমান করতে পারে? কেউ বলবে এটা চ্যাপ্টা, কেউ বলবে এটা ত্রিকোণাকৃতির, কেউ বলবে এটা চতুর্ভুজাকৃতির, কেউ বলবে পঞ্চ কোণাকৃতির, কেউ বলবে ষড়ভুজাকার, কেউ বলবে সপ্তভুজাকার, কেউ বলতে পারে অষ্টভুজাকার, কেউ বলতে পারে গোলাকার।

আমরা ধরে নিই আপনি পৃথিবীর ৩০ প্রকারের আকৃতির চিন্তা করতে পারেন। যদি কেউ আন্দাজে অনুমান করে তাহলে তার সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ ভাগের একভাগ। চাঁদের আলো নিজস্ব না প্রতিবিম্ব। যে কেউ আন্দাজে অনুমান করলে তার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা দুয়ের মধ্যে ১ ভাগ। উভয় বিষয় মিলে অনুমান করলে তার সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১/২ × ১/৩০ = ৬০ ভাগের একভাগ।

আরবের মরুভূমিতে একজন মানুষ কীসের তৈরি? বা জীবন্তপ্রাণী কীসের তৈরি এ ব্যাপারে একজন মানুষ কী চিন্তা করতে পারে? মরুভূমির একজন চিন্তা করতে পারে যে এটি বালুর তৈরি, এটা কাঠের তৈরি হতে পারে, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, দস্তা, তেল, পানি, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন। আপনি কমপক্ষে দশ হাজার অনুমান করতে পারবেন এবং আরবের মরুভূমিতে একটা লোক পানির কথা সর্বশেষে চিন্তা করতে পারে।

আল-কুরআন বলে, প্রত্যেকটি জীবন্ত জিনিস পানির তৈরি

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

অর্থ : আমরা প্রাণবন্ত সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।

২৪ নং সূরা নূরের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

২৫ নং সূরা ফুরকানের ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ـ

অর্থ : তিনিই মহান সত্তা, যিনি পানি থেকে মানব সৃষ্টি করেছেন।

যদি আপনি আন্দাজে অনুমান করেন, যে সুযোগ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা হলো দশ হাজার ভাগের একভাগ। একজন তিনটি অনুমান করতে পারে, এ তিনটি যদি সঠিক হয়, পৃথিবী গোলাকার, চাঁদের আলো হলো প্রতিবিম্ব, এবং প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু পানির তৈরি। ১/৩০×১/২০×১/১০০০০=১/৬০০০০০০ অর্থাৎ .০০০১৭%

এক হাজারের ওপরে কুরআনের আয়াত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পূর্ণ

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি, আমি এটা আপনাদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি যে, যদি আপনি সম্ভাব্যতা'র থিওরি কুরআনের ওপর ছেড়ে দেন। তা হাজার হাজার বাস্তবতার উল্লেখ করে, যেটা তখনকার সময়ে অজ্ঞাত ছিল। যদি কোনো ব্যক্তি অনুমান করে, যে ১০০ চান্সই সঠিক হবে, কোথাও কোথাও সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি এবং সম্ভাবনার থিওরিতে এটা শূন্য হবে। কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারে ডা. জাকির, আপনি কি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কুরআন প্রমাণের জন্য ব্যবহার করছেন? আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কুরআন বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ নয়। 'বি-জ্ঞা-ন'

এটা 'নি-দ-র্শ-ন'-এর কিতাব। যেমন কুরআনে ৬,০০০ নিদর্শন আছে। আয়াত যার সংখ্যা ৬,০০০। যার মধ্যে এক হাজারের বেশি আয়াতে রয়েছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

আমি কুরআনের নিত্যতা পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছি না বরং আমাদের একটি পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন। পরিমাপক কিছুর প্রয়োজন এবং আমাদের মুসলিমদের পরিপূর্ণ পরিমাপক যন্ত্র হলো আল-কুরআন। আল-কুরআন হলো আল-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী)। এটি সত্যকে মিথ্যা থেকে পার্থক্যকারী মাপকাঠি। কিন্তু ঐ নাস্তিকের নিকট এবং যে শিক্ষিত লোক খোদায় বিশ্বাস করে না, তার নিকট বিজ্ঞানই মহাসত্য। এটা তার নিকট মাপকাঠি। সুতরাং আমি তাঁর মাপকাঠি ব্যবহার করছি কুরআন যা-ই বলেছে, সে আলোকে মাত্র।

অনেক সময় বিজ্ঞান U-টার্ন নেয়

আমরা ভালোই জানি যে, অনেক সময় বিজ্ঞান U-টার্ন নেয়। অতএব, আমি শুধু বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছি। যার সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছি। আমি তত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলি নি। যা অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি। আমি তার মাপকাঠি ব্যবহার করছি শুধু এটা বলার জন্য যে, যেটা তোমার মাপকাঠি সম্প্রতি যেটা বলেছে ১০০ বছর পূর্বে কুরআনে তা উল্লেখ করাই ছিল (১৪০০ বছর পূর্বে) এর পর চূড়ান্তভাবে আমরা যৌথ সম্মতিতে এলাম যে, কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কুরআন বহু বৈজ্ঞানিক সত্য উল্লেখ করেছে–

২০ নং সূরা ত্বহা-এর ৫৩ নং আয়াতে আমরা দেখি যে

فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ط

অর্থ : তারপর তা (বৃষ্টির পানি) দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনি। – যেটা আপনারা সম্প্রতি আবিষ্কার করলেন।

১৩ নং সূরা রা'দের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ـ

অর্থ : প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।

প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে এটা ৬ নং সূরা আনআমের ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ পাই–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط

অর্থ : জমিনের বুকে বিচরণশীল প্রাণী ও দু ডানাকে প্রসারিত করে আকাশে উড্ডয়নশীল পাখিরা তোমাদের মতোই একই জাতিভুক্ত। বিজ্ঞান যা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

১৬ নং সূরা নাহল-এর ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 'এটা হলো নারী মৌমাছি, যে বাইরে যায় এবং মধু সংগ্রহ করে।' এটা পুরুষ মৌমাছি নয় যা বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

এ মৌমাছিগুলো নতুন বাগানের রাস্তা দেখিয়ে দেয়, যা তারা ডানার ঝাপটানির দ্বারা পায়। এটা কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায় যা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি।

২৯ নং সূরা আনকাবুত-এর ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتَ ـ

অর্থ : আর দুনিয়ার সবচেয়ে ভঙ্গুর ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর।

মাকড়সার জালের দৈহিক প্রকৃতি বর্ণনা ছাড়াও এটি পারিবারিক সম্পর্কও বর্ণনা করছে, যাতে অনেক সময় নারী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করে। আল-কুরআনের ২৭ নং সূরা নামল-এর ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

"পিপীলিকারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে।"

আপনি ভাবতে পারেন এটা একটা আজগুবী গল্পের বই। কি! পিপীলিকারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, পোকা-মাকড় অথবা প্রাণীদের মানবজাতির জীবন পদ্ধতির সাথে গভীর মিল রয়েছে। পিপীলিকাও কি? এরা মৃত দেহ কবর দেয়, এদের উচ্চতর যোগাযোগ পদ্ধতি রয়েছে, এদের বাজার পর্যন্ত রয়েছে।

আল-কুরআন ওষুধ, শরীরতত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কেও বলে

আল-কুরআন ওষুধ সম্পর্কেও কথা বলে।

যেমন : ১৬ নং সূরা নাহলের ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন—

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط

অর্থ : মৌমাছির পেট থেকে মধু নির্গত হয় এবং মধুতে মানবজাতির নিরাময় রয়েছে।

আমরা এটি আজ আবিষ্কার করেছি। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলছে মধুর মধ্যে এন্টিসেপটিক সম্পদ রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের আহত স্থানে প্রলেপ দেয়ার জন্য এটি ব্যবহার করতো, যেটা টিস্যুতে খুব কম দাগ থাকতো। এটা নির্দিষ্ট কিছু এলার্জির চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। আল কুরআন দেহ-বিজ্ঞান সম্পর্কেও বলে। এটি ২৩ নং সূরা মুমিনূনের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালন ও দুগ্ধ উৎপাদন-এর বর্ণনা দেয়। রক্ত পরিসঞ্চালন

সম্পর্কে আল কুরআন বলার ৬০০ বছর পর ইবনে নাফীজ এটি আবিষ্কার করেন এবং কুরআন নাযিলের ১,০০০ বছর পরে উইলিয়াম হার্ভে একে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত করেন।

আল-কুরআন জন্মতত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলে। আল-কুরআনে নাযিলকৃত ১ম আয়াতগুলো যা ছিল ৯৬ নং সূরা আলাক। এতে আল্লাহ বলেন–

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থ : পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে।

عَلَقٍ অর্থ আঁঠাল, জোঁকের মতো। এটা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ভ্রূণতত্ত্বীয় ডাটা যেগুলো, কুরআনে প্রদত্ত হয়েছে সেগুলো প্রফেসর কেইথ মূর-এর নিকট নেয়া হয়েছিল, যিনি এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তিনি কানাডার টরেন্টোতে বাস করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআন যা বলে, তা কি সত্য? কিছু আরবীয় কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে– যদি তোমরা না জানো তাহলে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো। সুতরাং তারা প্রফেসর কেইথ মূরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি সত্য? তিনি বললেন যে, কুরআনের অধিকাংশ বিষয় ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বশেষ আবিষ্কারের সাথে ১০০ ভাগ মিল, কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, যে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করতে পারছি না। কারণ, আমি নিজেই এ সম্পর্কে জানি না এবং এ ধরনের একটি আয়াত এই যে, আমরা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি এমন জিনিস হতে, যা আঁঠাল জোঁকের মতো বস্তু।

তিনি গেলেন এবং জোঁক-এর ফটোগ্রাফ নিলেন এবং তার গবেষণাগারে খুবই শক্তিশালী একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ভ্রূণ-এর প্রাথমিক ধাপগুলা পরীক্ষা করলেন– এটি ফটোগ্রাফের সাথে হুবহু মিলে গেল। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, কুরআন যা-ই উল্লেখ করেছে এটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক এবং কুরআন থেকে তিনি নতুন যে ডাটা পেলেন, তা তিনি তার বইতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এ বই এর নাম "The Developing Human" (মানব উৎকর্ষ)। তিনি তৃতীয় সংস্করণ বের করেন এবং এর জন্য ঐ বছরের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত লিখিত বইয়ের জন্য সর্বোত্তম বই লেখার পুরস্কারটিও লাভ করেন। তিনি আরো বলেন যে, ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে আল-কুরআন যা উল্লেখ করে, তা আমাদের দ্বারা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলো মাত্র। এটা হলো চিকিৎসার অন্যতম শেষ শাখা। এটা কোনো মানুষের লেখা হতে পারে না। এটার মূল অবশ্যই স্বর্গীয় (আল্লাহ প্রদত্ত)।

আল-কুরআনের ৮৬ নং সূরা তারিকের ৫ থেকে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ـ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ـ

অর্থ : "মানুষ যেন দেখে কোন জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা মেরুদণ্ড ও পাঁজর থেকে বের হয়ে আসে।

আজ আমরা জানি যে, যৌনাঙ্গগুলো, নারী-পুরুষের জ্রূণের বয়সব্যাপী যেখানে কিডনি স্থাপিত, সেখান থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মেরুদণ্ড এবং একাদশ ও দ্বাদশ পাঁজরের মধ্যখান থেকে।

আল-কুরআনের ৫৩ নং সূরা নজমের ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াত, ৭৫ নং সূরা কিয়ামাহ'র ৩৭ থেকে ৩৯ নং আয়াতে – পুরুষই শিশুর নারী-পুরুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য দায়ী। যা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করলাম। আল-কুরআন বলে ভ্রূণ আবৃত হয়, ভ্রূণ আবৃত হয় তিনটি অন্ধকার স্তরে, যা আজ নিশ্চিত হওয়া গেল, যেখানে কুরআন ভ্রূণ-এর স্তরগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

২৩ নং সূরা মুমিনূন-এর ১২ থেকে ১৪ নং আয়াতে এবং ২২ নং সূরা হাজ্জ-এর ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে। এমন কিছু থেকে, যা লেগে থাকে, জোঁকের মতো বস্তু। এরপর তাকে مضغة (মুদগাহ্)-তে পরিণত করেন, চর্বিত বস্তুর মতো। এরপর عظاما (ইজামান) হাড়ে পরিণত করেন, এরপর তাকে আবৃত করেন لحما (লাহমান) গোশ্ত দ্বারা, পেশী দ্বারা। আল-কুরআন ভ্রূণের বেড়ে ওঠার স্তরগুলোকে সবিস্তারে আলোচনা করে। ৩২ নং সূরা সাজদাহ্ আয়াত নং- ৯, ৭৬ নং সূরা ইনসান আয়াত নং ২–এ

'যে ..... ইনি আল্লাহ, যিনি তোমাকে শোনা ও দেখার যোগ্যতা দান করেছেন।'

আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের বলছে শোনার যোগ্যতা আগে আসে। এটা গর্ভবতী হবার পঞ্চম মাসে পূর্ণরূপে উন্নত হয়। অতঃপর গর্ভবতী হবার ৭ম মাসে চক্ষু চিরে বের হয়। আল-কুরআন ৭৫ নং সূরা কিয়ামাহ'র ৩ ও ৪ নং আয়াতে জবাব দেন, যখন প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ কীভাবে বিচারের দিনে হাড়গুলো একত্রিত করবেন? আল্লাহ উত্তর দেন আমরা শুধু হাড়গুলোই একত্রিত করতে সক্ষম নই বরং আমরা তোমাদের আঙ্গুলের ছাপগুলোও একত্র করতে সক্ষম হবো। আল-কুরআন বলেছে, আল্লাহ আঙ্গুলের ছাপ একত্র করতে সক্ষম, এর অর্থ কী?

আল-কুরআন আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতি সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বেই আলোচনা করেছিল

১৮০০ সালে স্যার গোল্ট আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতির বর্ণনা দেন, যা আমরা আজ মানুষ সনাক্ত করতে ব্যবহার করি। বিশেষ করে দুষ্কৃতিকারী বা অপরাধীদের চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। কোনো দুটি আঙ্গুলের ছাপ, এমনকি দশ লক্ষ লোকের ভেতরও সমরূপ হবে না। আল-কুরআন আঙ্গুলের ছাপ পদ্ধতি সম্পর্কে ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছে। এখানে বিজ্ঞানের বহু উদাহরণ রয়েছে। আপনারা যদি বেশি বিস্তারিত আল-কুরআনে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে জানতে চান, আপনারা 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান : সাংঘর্ষিক না আপসকামী' ভিত্তিক ক্যাসেটটি সংগ্রহ করতে পারেন, যেটা বিক্রির জন্য ফয়েরে মজুদ আছে।

আমি আপনাদের সামনে আরেকটি বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরতে চাই তাহলো, থাইল্যান্ডে প্রফেসর থাগাদা শাউন নামে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি ব্যথা গ্রহিতার ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা করেছেন। পূর্বে বিজ্ঞান চিন্তা করতো যে, মস্তিষ্কই ব্যথার (অনুভবের) জন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমানে আমরা আবিষ্কার করেছি যে, ব্যথা গ্রহিতা চামড়ায়ই রয়েছে যেটা ব্যথা অনুভবের জন্য দায়ী।

৪র্থ নং সূরা নিসা'র ৫৬ নং আয়াতে কুরআন উল্লেখ করেছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط

অর্থ : যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, আমরা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবো এবং যখনই চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সাথে সাথে আমরা নতুন চামড়া গজিয়ে দেব, যাতে তারা যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে।

পরোক্ষভাবে কুরআন এখানে বলছে, যে চামড়ায় এমন জিনিস আছে, যা ব্যথার জন্য দায়ী। এটা ব্যথা গ্রহণকারী সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছে।

প্রথমে অধ্যাপক থাগাদা শাউন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যাচাই করার পরক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন এ বই (আল-কুরআন) ব্যথাগ্রাহী সম্পর্কে বলছে ১৪০০ বছর আগে। তিনি কায়রোর একটি মেডিকেল কনফারেন্সে ইসলাম গ্রহণ করেন। বলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।'

এরপর আপনি নাস্তিকের ওপর প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিন, কে এসব বৈজ্ঞানিক সত্য আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। একটা উত্তরই সে আপনাকে দিতে পারে, একই,

যা সে ইতিপূর্বে আপনাকে দিয়েছে। কে সেই ব্যক্তি যে অজানা বস্তুর গঠন বলতে পারে? ইনিই স্রষ্টা, ইনিই আবিষ্কারক, ইনিই তৈরি কারক, ইনিই উৎপাদক। একইভাবে যে ব্যক্তি এসব কথা কুরআনে বলতে পারেন, তিনিই তৈরি কারক, উৎপাদক এবং যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা। এরপর পরিচয় যাকে আমরা ইংরেজিতে 'গড' বলি, অধিকতর সঠিক তাঁকেই আরবীতে 'আল্লাহ' বলা হয়।

ফ্রান্সিস বেকন ঠিকই বলেছেন যে, বিজ্ঞানে অল্প জ্ঞান তোমাদের নাস্তিক বানায় কিন্তু বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান তোমাকে সর্বশক্তিমান খোদায় বিশ্বাসী বানায়। আশ্চর্যের বিষয় নয়, আজ বিজ্ঞানীরা 'লা ইলাহা গড'-এর ত্যাগকারীর মডেল এবং সেগুলো ইল্লাল্লাহ-এর গড নয়।

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে যে দ্বিতীয় আয়াত উদ্ধৃত করেছিলাম তার অর্থ বলার মাধ্যমে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

৪১ নং সূরা হামীম আস-সাজদা-এর ৫৩ নং আয়াত। যাতে বলা হয়েছে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ -

অর্থ : অচিরেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ দিগন্ত বলয়ে প্রদর্শন করবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও তো (আমি দেখিয়ে দিব) যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই (কুরআনই) সত্য।

ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতার পরিসমাপ্তির পর, প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ডা. মুহাম্মাদ তাঁকে তাঁর বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রোতামণ্ডলিকেও ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি শ্রোতামণ্ডলিকে প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেটা হলো এ পর্বের দ্বিতীয় অংশ। এরপর ডা. জাকির আহ্বান করেন যেন শ্রোতামণ্ডলি প্রশ্ন করতে পারেন এবং ডা. জাকির তার উত্তর দিতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. আমি মিসেস সারলা রামচন্দর। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কেন মুসলিমরা খোদাকে 'আল্লাহ' বলে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন যে প্রশ্নটি রেখেছেন তাহলে 'কেন মুসলমানরা খোদাকে আল্লাহ বলে?' আমার বক্তব্যে আমি আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর পরিচয় সূরা ইখলাসের আলোকে তুলে ধরছি। ১১২ নং সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে–

'বলুন, তিনিই আল্লাহ এক এবং একক, আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো দ্বারা জন্মগ্রহণও করেন নি। এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থ : বলুন, আল্লাহ নামে আহ্বান কর, কিংবা রহমান বলে, তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন, তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে।

আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে এ সংবাদ নিম্নোক্ত বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে–

৭ নং সূরা আরাফ-এর ১৮০ নং আয়াত,

৫৯ নং সূরা হাশর-এর ২৪ নং আয়াত এবং

২০ নং সূরা ত্বাহা-এর ৮ নং আয়াতে।

'আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছে।' কিন্তু এসব নাম যেন কোনোরূপ মনের উপর ছবি না আনে। তবে নাম হতে হবে সুন্দর।

গড্‌কে 'আল্লাহ' বলার কারণ

মুসলমানরা 'খোদা' বলার পরিবর্তে 'আল্লাহ' বলে। 'গড্' ইংরেজি শব্দ, খাঁটি আরবি শব্দ আল্লাহ। ইংরেজি 'গড্' শব্দের নিম্নরূপ রূপান্তর ঘটতে পারে। যেমন:

যদি God এর সাথে s যোগ করেন তাহলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে। আপনি আল্লাহর সাথে s যোগ করতে পারেন না। 'আল্লাহ' বহুবচন বলতে কিছু নেই। আল্লাহ, যেমন আল-কুরআনে আছে 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক এবং একক।' যদি আপনি dess যোগ করেন তাহলে Godess অর্থাৎ নারী God হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গ নেই। আপনি যদি God বড় হাতের G দিয়ে লেখেন তাহলে এটা হবে সত্যিকার God. যদি ছোট হাতের g দিয়ে god লিখেন তাহলে এর অর্থ হবে নকল খোদা।

ইসলামে আমাদের একজনই সত্য আল্লাহ। আমাদের কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। যদি আপনি god-এর সাথে father যোগ করেন তাহলে হবে godfather. সে আমার গডফাদার। আপনি আল্লাহর সঙ্গে 'আব্বা' কিংবা 'ফাদার' যোগ করতে পারবেন না। 'আল্লাহ আব্বা' কিংবা 'আল্লাহ ফাদার' বলে ইসলামে কিছু নেই। যদি আপনি god-এর সাথে mather যোগ করেন তাহলে হবে godmothar। আপনি আল্লাহর সাথে 'মাদার' বা 'আম্মি আল্লাহ' বলতে পারেন না। ইসলামে 'আম্মি আল্লাহ' বলতে কিছু নেই। যদি আপনি গড-এর পূর্বে 'টিন' লাগান তাহলে হবে 'টিনগড' বাতিল গড। ইসলামে 'টিন আল্লাহ' বলতে কিছু নেই। আল্লাহ খাঁটি এবং একক। আপনি তাঁকে যে কোনো নামে ডাকতে পারেন, তবে অবশ্যই তা হতে হবে সুন্দর নাম। আমি আশা করি উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ২. আস্সালামু আলাইকুম। আমার নাম কাসিম দবীর। আমার প্রশ্ন হলো অ্যারুন শৌরী বলে যে, আল-কুরআনের ৪ নং সূরার আয়াত নং ১১ ও ১২ এতে উল্লেখিত, যদি আপনি উত্তরাধিকারীদের প্রতি প্রদত্ত অংশগুলো যোগ করেন তাহলে যোগফল ১ এর অধিক হয়। অতএব এ্যারুন শৌরী দাবী করে যে, কুরআনের রচয়িতার গণিতের জ্ঞান নেই, অনুগ্রহ করে পরিষ্কার করুন।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাইটি একটা প্রশ্ন করেছেন যে, অ্যারুন শৌরী আল-কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতের --- উত্তরাধিকারীদের অংশগুলো একত্র করলে অংশগুলো ১-এর অধিক হয়; অতএব তাঁর দাবী হলো কুরআনের রচয়িতা গণিত জানেন না।

আমি আমার বক্তব্যে আপনাদের বলেছি, হাজার হাজার লোক যারা কুরআনের ভুল-এর দিকে ইঙ্গিত করেছে; কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তাদের সবগুলোই অসত্য। তাদের একজনও সত্য বলে নি।' কুরআন উত্তরাধিকারের বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছে।

২ নং সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত

২ নং সূরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত

৪ নং সূরা নিসার ৯ নং আয়াত

৪ নং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াত

৫ নং সূরা মায়িদার ১০৫ নং আয়াত

এটি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে, তবে অংশগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ৪ নং সূরা নিসার আয়াত নং ১১ ও ১২, একই সূরা আয়াত নং ১৭৬।

অ্যারুন শৌরীর উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদ যেটা ৪ নং সূরার নিসার আয়াত নং ১১ ও ১২ এতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকারের অংশ সম্পর্কে

পুরুষ-নারীর দ্বিগুণ পাবে। কেবল একজন কন্যা দুই হয়ে অর্ধেক দুই এর অধিক কন্যা হয় তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ, যদি কন্যা মাত্র একজন হয় তাহলে অর্ধেক। যদি পিতামাতা দু'জন থাকে তাহলে প্রত্যেকে ছয় এর একাংশ পাবে, যদি তাদের সন্তান থাকে, যদি সন্তান না থাকে তাদের মা পাবে তিন ভাগের একভাগ। অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

'তোমার স্ত্রী যা ছেড়ে রেখে গেছে- সন্তান থাকলে তার চারভাগের এক ভাগ এবং সন্তান না থাকলে অর্ধেক তোমরা পাবে। অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা যা ছেড়ে রেখে যাও সন্তান না থাকলে তাঁর চার ভাগের একভাগ এবং সন্তান থাকলে পাবে আট ভাগের একভাগ তোমাদের স্ত্রীগণ।'

এটা কিছু দ্বিধান্বিত বিষয় তবে আপনারা দ্বিধান্বিত হবেন না। আপনি বাড়ি গিয়ে দেখতে পারেন। সংক্ষেপে সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে প্রথম যে অংশের কথা বলা হয়েছে, তা সন্তানদের, অতঃপর পিতা-মাতার। পরবর্তীতে ১২ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর অংশ। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলাম বিস্তারিত বর্ণনা করে। আল-কুরআন মূল নির্দেশনা দান করে। আপনি বিস্তারিত পেতে হলে হাদীস দেখেন। একজন মানুষ তাঁর পূর্ণ জীবন শুধু ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানের গবেষণায় কাটাতে পারে। অ্যারুন শৌরী মাত্র দু'টি আয়াত-এর উদ্ধৃতি দিয়েই এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রত্যাশা করে। এটা কিছুটা ঐ রকম, যে ব্যক্তি সরল অংকের সমাধান করতে চায় অথচ সে তার কোনো রুলই জানে না। যেমন BODMAS; BODMAS-এর নিয়ম অনুযায়ী B-O-D-M-A-S অর্থাৎ অংকের যে চিহ্নটি আসে, সেগুলো প্রথমে বা পরে যখনই আসুক প্রথম আপনাকে এর এর কাজ (ব্র্যাকেট off) করতে হবে। এরপর ভাগ (Division = D) ও গুণ (M = Multuplication) এরপর যোগ (Aaddition) ও বিয়োগ (S = Subtraction)। যদি আমরা এ সূত্র না জানি এবং প্রথমে বিয়োগ করে তারপর গুণ করে, তারপর যোগ করে এর -এর কাজ করি তাহলে অবশ্যই উত্তর ভুল বের হবে। একইভাবে অ্যারুন শৌরী নিজেই গণিত জানেন না, কারণ, ইসলামী উত্তরাধিকারের বিধান অনুযায়ী মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রথমেই স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-মাতার অংশ দিতে হবে। এরপর যা থাকবে তা সন্তানদের মধ্যে ভাগ হবে। যদি আপনি এ নিয়ম অনুসরণ করেন তা হলে যোগফল কখনোই ১ এর অধিক হবে না। আশা করি উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

(উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, আঃ করিম স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতা রেখে মারা গেলেন। তার সম্পদের ১/৬ পিতা, ১/৬ মাতা, স্ত্রী ১/৮ মোট (১/৬ + ১/৬ + ১/৮) ১১/২৪ অংশ দেবার পর যা থাকবে অর্থাৎ ১৩/২৪ সন্তানদের মধ্যে ১ ঃ ২ অনুপাতে ভাগ করে দিতে হবে। – অনুবাদক।)

প্রশ্ন ৩. আমার নাম ফৌজিয়া সাঈদ। আমি BMC-তে পরিদর্শক হিসেবে কাজ করি। আমি খ্রিস্টান ছিলাম এবং ১৯৮০ সালে ইসলাম গ্রহণ করি। আমি কিভাবে আমার মাতা-পিতাকে, যারা এখনো খ্রিস্টান, বুঝাই মুহাম্মাদ ﷺ বাইবেল থেকে কুরআন নকল করেন নি।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ যে বোন প্রশ্নটি করেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। আমি তাঁকে একবার নয় তিনবার অভিনন্দন জানাই। নাস্তিকদের একবার অভিনন্দন আর তাঁকে তিনবার। কারণ তিনি 'লা-ইলাহা' বলার পর 'ইল্লাল্লাহ' বলেছেন অতঃপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-ও বলেছেন। অর্থাৎ কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ ছাড়া, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

প্রশ্নটা হলো যে, কিভাবে তিনি প্রমাণ করবেন, কিভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়দের বুঝাবেন যে, কুরআন বাইরে থেকে নকল কিংবা চুরি করে নিজের বলে চালানো হয় নি। আমি আপনাকে যেরূপ একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা বলেছি যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিরক্ষর ছিলেন, এটা প্রমাণের জন্য এই যথেষ্ট। আল-কুরআনের ৭ নং সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে বলে-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

অর্থ : যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে। যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়।

এবং আজও যদি আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন। ইসাইয়াহ গ্রন্থের অধ্যায় ২৯, শ্লোক নং ১২-তে উল্লেখ আছে ঃ 'একজন নবীকে যিনি শিক্ষিত নয়, তাকে একটি কিতাব দেয়া হবে।'

কুরআন বলছে, তাদের শাস্ত্রে, যদি আপনি বাইবেল খোলেন এটা তাদের ইসাইয়া হতে অধ্যায়- ২৯, শ্লোক- ১২-তে রয়েছে। ঐ সব প্রাচ্যবিদ, যারা বলে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কুরআনকে বাইবেল থেকে নকল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ) তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যখন বর্তমান ছিলেন তখন বাইবেলের কোনো আরবি অনুবাদ ছিল না। প্রথম ওল্ড টেস্টামেন্ট আরবিতে যেটা আমাদের নিকট আছে তা আর সাদিয়াস গাওন কর্তৃক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অনূদিত। সেটা সাধারণ বিষয়, নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের ২০০ বছরেরও পরে এবং আরবিতে সবার আগে যে নিউ টেস্টামেন্ট আমাদের হাতে যেটা আছে, তা প্রকাশিত হয় ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের প্রায় হাজার খানিক বছর পরে।

আমি এ ব্যাপারে একমত হতে পারি যে, বাইবেল এবং কুরআনের মধ্যে কিছু মিল আছে। এতে একথা বুঝায় না যে, পরেরটা পূর্বেরটা থেকে নকল করা হয়েছে। এটা এ অর্থ দেয় যে, উভয়েরই তৃতীয় উৎস আছে। আল্লাহর নাযিলকৃত সব সংবাদেই আল্লাহকে বিশ্বাসের কথা আছে। তাঁদের একই সংবাদ আছে। পরবর্তী সকল নাযিলকৃত কিতাবেরই সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল। যেমন আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো তাদের মূল গঠনের ওপর নেই। সেগুলোতে অন্যায় সংযোজন (তাহরীফ) ঘটেছে। সেগুলোতে অনেক মানব সংযোজিত মিথ্যা কাহিনী সংযুক্ত রয়েছে। তারপরেও সেগুলোতে আবশ্যকীয়ভাবে কিছু বিষয়ের মিল রয়েছে। শুধু মিলগুলোর কারণে বলা ভুল হচ্ছে যে, এগুলো নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বাইবেল থেকে নকল করেছেন। এক্ষেত্রে এটাও অর্থ দেয় যে, যীশু (নাউযুবিল্লাহ) নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছেন, কেননা নিউ এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। উভয় গ্রন্থই একই উৎস (আল্লাহর) থেকে এসেছে।

ধরুন কেউ পরীক্ষায় নকল করলো, আমি উত্তর পত্রে লিখবো না, আমি আমার প্রতিবেশীর থেকে নকল করলাম। আমি লিখব না, আমি x y z থেকে নকল করেছি। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, ঈসা (আ), মূসা (আ) এবং সব নবীই আল্লাহ প্রেরিত। এটা তাঁদের সঠিক সম্মান ও মর্যাদা দান করে। তিনি যদি নকল করতেন তাহলে তিনি বলতেন না যে, ঈসা (আ), মূসা (আ) আল্লাহর নবী ছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি নকল করেন নি; শুধু ঐতিহাসিক বিষয়াবলীর ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বলা কঠিন– কোন্‌টা সঠিক, বাইবেল না কুরআন।

যাহোক, আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে পারি। এর উপরিভাগে যদি আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দেখবেন অনেক ঘটনা এবং দিক আছে যেগুলো কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি বাইবেলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আপনি যদি উপরিভাগে তাকান, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন অনেক ঘটনা এবং বিষয় কুরআনে যেমন উল্লেখ আছে বাইবেলেও তেমনি আছে। আপনি এক রকমই দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে আকাশ পাতাল পার্থক্য পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলে উল্লেখ আছে, জেনেসিস প্রথম অধ্যায়, বিশ্ব স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি ৬ দিনে সৃষ্টি হয়েছে এবং দিনের বর্ণনা করা হয়েছে ২৪ ঘণ্টা সময়। আল-কুরআনও বিভিন্ন স্থানে যেমন ঃ

৭নং সূরা আল আরাফের ৫৪ নং আয়াত ১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত এবং পৃথিবী ৬ আইয়্যামে সৃষ্টি করেছি।' আরবি শব্দ ايام। শব্দটি يَوْمٌ শব্দের বহুবচন যার অর্থ দিন। يوم অর্থ দিন। এর অর্থ অনেক অনেক

দীর্ঘ সময় এমন কি যুগও বুঝায়। অতএব এখানে আল-কুরআন যখন বলবে জান্নাত এবং পৃথিবী ছয় যুগ ধরে অর্থাৎ অনেক অনেক দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এ বর্ণনায় বিজ্ঞানীদের কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু পৃথিবী মাত্র ২৪ ঘণ্টার ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে এটা অবৈজ্ঞানিক।

বাইবেলে ১ নং 'জেনেসিস অধ্যায়ের ৩ ও ৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে; প্রথম দিনে দিন এবং রাতের সৃষ্টি হয় এবং বিজ্ঞান আমাদের বলছে মহাবিশ্বের আলো সৃষ্টি হয়েছে নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়ায় এবং বাইবেলে জেনেসিস ১ম অধ্যায়-এর শ্লোক নং ১৪ ও ১৯-এ বলা হয়েছে যে, সূর্য চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল, কিভাবে এটা সম্ভব যে, ফলাফল যেটা হলো 'আলো' সূর্যের চারদিন পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে? অযৌক্তিক, এটা অবৈজ্ঞানিক, পৃথিবী যা দিন রাতের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন, তা সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে। আল-কুরআনও আলো এবং সৃষ্টি সম্পর্কে বলে তবে এটা অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতা প্রদান করে না। আপনারা কি মনে করেন যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এটা বাইবেল থেকে নকল করে সংশোধন করে ঘটনাক্রমগুলো সাজিয়ে নিয়েছিলেন? কেউই এগুলো ১৪০০ বছর পূর্বে জানতেন না।

বাইবেলের জেনেসিস ১ম অধ্যায়ের ৯ থেকে ১৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি করা হয়, ১৪ থেকে ১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সূর্য এবং চন্দ্র চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলছে যে, পৃথিবী এবং চন্দ্র মূল নক্ষত্রের অর্থাৎ সূর্যের অংশ। এটা অসম্ভব যে, পৃথিবী সূর্যের আগে সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবৈজ্ঞানিক। বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায় নং-১ শ্লোক নং-১১ এবং ১৩-তে সবজির রাজত্ব, বীজ, বীজ বহনকারী, চারাগাছ, লতা, গাছ-পালা তৈরি হয়েছিল তৃতীয় দিনে এবং ১৪ থেকে ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিনে। কিভাবে সবজির মূল সূর্য ছাড়াই অস্তিত্বে আসলো?

বাইবেলে জেনেসিস ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং ১৬-তে বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান খোদা দু'টি বড় আলো সৃষ্টি করেছেন, সূর্য যেটা বড় আলো দিনকে পরিচালনা করার জন্য এবং চন্দ্র অপেক্ষাকৃত কম আলো, রাতকে পরিচালনা করার জন্য। বাইবেল বলে সূর্য এবং চন্দ্রের নিজস্ব আলো আছে। আমি পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, আল কুরআনের ২৫ নং সূরা ফুরকান-এর ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে চন্দ্রের আলো প্রতিবিম্বিত আলো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সব বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে নকল এবং সংগ্রহ করেছেন। এটা সম্ভব নয়।

যদি আপনি বাইবেল এবং কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পাবেন। বাইবেলে আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা উল্লেখ আছে। প্রথম মানব যিনি এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিলেন তিনি হলেন আদম

(আ) এবং বাইবেলে তার আনুমানিক তারিখ দিয়েছে ৫৮০০ বছর আগে। আজ প্রত্নবিদ্যা ও নৃবিদ্যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞান বলছে যে, প্রথম মানব দশ হাজার বছর আগে ছিলেন। আল-কুরআনও আদম (আ) সম্পর্কে আলোচনা করে যে, তিনি প্রথম মানব ছিলেন; কিন্তু অবৈজ্ঞানিক কোনো তারিখ ঘোষণা করে নি।

বাইবেলে নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে যে, সেখানে যে প্লাবন হয়েছিল, তা ছিল পৃথিবীব্যাপী প্লাবন। জেনেসিস ৬, ৭ ও ৮ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ সেখানে হয়েছিল এক বিশ্বব্যাপী প্লাবন, যাতে পৃথিবীতে বসবাসকারী সব প্রাণী ডুবে যায় এবং মারা যায় শুধু এ সব ছাড়া যারা নূহ (আ)-এর কিস্তিতে ছিলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আনুমানিক তারিখ হলো একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দী। আজ প্রত্নতত্ত্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিসরের ১১তম রাজবংশ এবং ব্যাবিলনের ২য় রাজবংশ, খ্রিস্টপূর্ব একবিংশ শতাব্দীতে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই চলছিল। অর্থাৎ এ ধরনের প্লাবন সেখানে হয় নি।

আল-কুরআনেও নূহ (আ)-ও বন্যা সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু কোনো তারিখ দেয় না এবং আল-কুরআন যে প্লাবনের কথা বলে তা ছিল স্থানীয় প্লাবন, এটি বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্তির কথা বলে না এবং এ প্লাবন ছিল নূহ (আ)-এর লোকদের মধ্যে এবং এর ওপরে বিজ্ঞানীদের কোনো আপত্তি নেই।(১)

সুতরাং আপনি নিজেই বের করে নিতে পারেন যে, আল-কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয়েছে কিনা?

ডা. মুহাম্মাদ ডা. জাকিরকে এবং শ্রোতামণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রোতাদেরকে শুধু বিষয়-এর সাথে (কুরআন কি আল্লাহর বাণী?) সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করার অনুরোধ করেন। যেহেতু কেউ একজন আলোচিত বিষয়ের বাইরে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি শ্রোতাদেরকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করারও অনুরোধ করেন, যেহেতু তখন সেশন ইংরেজিতে চলছিল। তাই একজন হিন্দিতে প্রশ্ন করেছিল যদিও ডা. নায়েক ইংরেজি এবং হিন্দিতেও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন। প্রোগ্রাম বা সেশন ইংরেজিতে চলছিল বলেই ইংরেজিতে প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। একজন বয়স্ক লোক হিন্দিতে প্রশ্ন করলেও ডা. জাকির বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন।

ডা. জাকির নায়েক : ভাই প্রশ্ন আরোপ করার পূর্বেই বলেছেন, সব হিন্দু ভগবান রনজীশকে বিশ্বাস করেন না। এখানে ভিডিও রেকর্ডগুলো রয়েছে, আপনি সেগুলো

[১. এ প্লাবনের বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত এ ধারণা সৃষ্টি হবার যুক্তিসঙ্গত একটা কারণ হলো, তখন মানব বসতি সীমিত এলাকায় ছিল এবং প্লাবনের পর নূহ (আ)-এর চার সন্তান পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং তাদের বংশধরদের মাঝে এ প্লাবনের কাহিনী ছড়িয়ে যেতে থাকে বংশধারার সাথে সাথে।]

দেখতে পারেন, আমি বলেছি কিছু লোক ভগবান রনজীশকে বিশ্বাস করে। সুতরাং আপনার এবং আমার মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলি নি যে সব হিন্দু তাকে বিশ্বাস করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমি জানি, এমনকি আমি শাস্ত্রও পড়েছি। দাদা একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, আমি কি একমত যে আল-কুরআন বলে, খোদা অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং অনেক কিতাবও নাযিল করেছেন। আমি কি বেদে বিশ্বাস করি? আমি কি বেদ শাস্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমি অন্যান্য নবীকে বিশ্বাস করি কি-না? সে হলো মূল প্রশ্ন আমি তাঁর সঙ্গে একমত। আল-কুরআন বিভিন্ন স্থানে বলে ৩৫ নং সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে বলেন,

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ ـ

অর্থ : এমন কোনো জাতি ছিল না, যাদের নিকট নবী আসেনি।

১৩ নং সূরা রাদ-এর ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ

অর্থ : আপনি একজন ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই পথ প্রদর্শক রয়েছে।

আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন কি না? অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ প্রেরিত কি? আল-কুরআনে মাত্র ২৫ (অথবা ২৬ জন) নবীর নাম উল্লেখ করেছে। আদম, ইবরাহীম, মূসা, ইসমাঈল, ঈসা (আ), মুহাম্মদ ﷺ কিন্তু হাদীস অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও বেশি নবী পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। আমরা ২৫ জনের নাম জানি। বাকিরা নবী হতেও পারেন, নাও হতে পারেন, আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারি না।

আপনার প্রশ্ন অনুপাতে আপনি কি বেদকে আল্লাহর বাণী মনে করেন, আসুন আমরা দেখি কুরআন এবং বেদের মধ্যে কোনো বিষয়ের মিল আছে কি না? হ্যাঁ আছে, বিষয়টা যদি আল্লাহর বিষয়ে হয়। কুরআনও এ সম্পর্কে বলে বেদও এ সম্পর্কে বলে। যদি আপনি বেদ পড়েন, দেখবেন।

যযুরবেদ অধ্যায় ৩ শ্লোক-৩২। 'তুমি কোনো প্রতিমূর্তি ঐ খোদার ব্যাপারে করতে পারবে না।'

যযুরবেদ অধ্যায় ৩৩, শ্লোক নং ০৩ 'খোদা হলো নিরাকার ও সন্দেহহীন।' একই যযুরবেদ অধ্যায়-৪০, শ্লোক নং ০৮ বলে, খোদার কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো দেহ নেই।

একই যযুরবেদ অধ্যায়-৪০, শ্লোক নং-৯ বলে যে 'ঐ সব লোক যারা অসৃষ্ট জিনিসের পূজা করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত।' আরো বলা হয়েছে ঐ খোদা সম্পর্কে, 'খোদা মাত্র একজন, কোনো দ্বিতীয় নেই, সামান্যতেও নেই।' এটি ঋগ্বেদে ৬ নং ভলিউম-০৮, অধ্যায়-১, শ্লোক নং-০১-এ বলা হয়েছে– 'সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই।' ঋগ্বেদে ভলিউম-৬, অধ্যায়-৪৫, শ্লোক নং-১৬-এ বলা হয়েছে ঃ 'খোদা একজনই, তাঁর পূজা করো।' আমরা এতে বিশ্বাস করি। বেদের এ সব অংশে বিশ্বাস করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। যেগুলো আল্লাহর বাণী হতে পারে এবং কুরআন হলো ভুল– নির্ভুল নিরূপণের মাপকাঠি। কারণ, এটিই সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ চূড়ান্ত নাযিলকৃত কিতাব।

আমরা মুসলমানরা, আমাদের কোনোই আপত্তি নেই এ সব বাণীকে আল্লাহর বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে। যেখানে অন্য জিনিস হতে পারে, যেরূপ আমরা বলছি, সেখানে অন্যায় সংযোজন হতে পারে, যা সম্পর্কে আমি বলতে পারি, তবে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। এখানে অন্যায় সংযোজন হতে পারে। যেখানে মানব কর্তৃক সংযোজন হয়ে থাকতে পারে, সেগুলোকে আমরা খোদার বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। বাইবেলে যেমন অবৈজ্ঞানিক ঘটনা আছে, বেদেও সেরকম আছে। আমি তা আলোচনা করতে চাই না। তবে আমাদের এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই যে, মূল বেদ হয়তো আল্লাহর বাণীও হতে পারে।

ধরুন, ইঞ্জিল– আল-কুরআন বলে যে, ইঞ্জিল হলো ওহী, যা ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছিল। এটা হলো সেই ওহী, যা যীশু-কে প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং ইঞ্জিল আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। নবীদের ব্যাপারে? অনেক নবী ছিলেন। রাম ও কৃষ্ণের নবী হওয়ার ব্যাপারে, আমরা বলতে পারি হতে পারে, তবে আমরা নিশ্চিত নই। কিছু মুসলমান আছেন, তাঁরা বলেন, 'রাম আলাইহিস সালাম'। এটা ভুল। দেখুন, তারা তাদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। আমি হিন্দুদের পিঠ চাপড়ানোর পক্ষে নই। সুতরাং সে আমার পিঠ চুলকাচ্ছে। আমি যা বলছি তাহলো তারা হতে পারেন, যদিও তারা হয়ে থাকেন, রাম যদি আল্লাহর নবী হয়েও থাকেন, বেদ যদি আল্লাহর শাস্ত্রও হয়ে থাকে, যেমন আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেগুলো ছিল ঐ সময়ের লোকদের জন্য এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব আর নেই।

আল-কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বাণী, এমনকি ইঞ্জিল, বাইবেল অথবা বেদ যদিও আল্লাহর বাণী ছিল, সেগুলো ছিল তখনকার জন্য আজ আর এগুলো চলবে না। আল-কুরআন হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত বাণী এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। আমাদেরকে কুরআন এবং নবী ﷺ-এর অনুসরণ করতে হবে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৪. আমার নাম মেহনাজ সাঈদ এবং আমি একজন ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন একটি প্রশ্ন করেছেন যে, কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন। এটা এমন একটা প্রশ্ন সাধারণত নাস্তিক বা যুক্তিবাদীরা এ ধরণের প্রশ্ন করে থাকে। এটা আমাকে একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিল যে, আমার এক বন্ধু যে ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ, মুম্বাই-এর এক যুক্তিবাদী গ্রুপের সাথে আলোচনায় গেলেন, তারা নাস্তিক গ্রুপ এবং সে তাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। সে এভাবে শুরু করেছিল যে, এটি একটি কাপড়, কে একে তৈরী করেছে? এটা কোত্থেকে আসলো? তারা বললো একজন তাঁতী এটা তৈরী করেছে। ভালো, এর একজন স্রষ্টা আছে। হ্যাঁ এটি একটি বই, এটা কোত্থেকে আসলো? কলমটি কোত্থেকে আসলো? এরকম যে তাদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলো যে, প্রত্যেক জিনিসেরই স্রষ্টা আছে। গাড়ি ফ্যাক্টরিতে তৈরি, ফ্যাক্টরি কে তৈরি করলো? হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারকে কে তৈরি করলো? সে চেষ্টা ও প্রমাণ করতে থাকলো যে, প্রত্যেক জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে। অতঃপর সে প্রশ্ন করল সূর্য কে তৈরি করেছে? চাঁদ কে সৃষ্টি করেছে? এবং প্রশ্ন করার সময় সে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি একমত যে জিনিসের একজন স্রষ্টা আছে? যুক্তিবাদীরা হোচট খেয়ে বললো, আমরা একটা শর্তে এটা মেনে নিতে রাজি আছি যে, আপনি আপনার বর্ণনা পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং আপনার বর্ণনা থেকে পিছু হটতে পারবেন না।

আমার বন্ধু খুবই সুখী ছিল, আমি সফল হয়ে গেছি নাস্তিকদের বুঝাতে এবং সে পরবর্তী প্রশ্ন করে যাচ্ছিল কে সূর্য সৃষ্টি করেছে? কে চাঁদ সৃষ্টি করেছে? প্রত্যেক জিনিসের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আপনাদেরকে চূড়ান্ত স্রষ্টার নাম বলতে হবে। আমি আমার মায়ের থেকে এসেছি, আমার মা তাঁর মায়ের থেকে, চূড়ান্তভাবে কে প্রথম স্রষ্টা? সে তাদেরকে উত্তর দিয়ে সাহায্য করলো। প্রথম স্রষ্টা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সে এ চিন্তা করলো যে, সে আলোচনায় বিজয় লাভ করেছে। নাস্তিক একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, আমরা একটা শর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিশ্বাস করবো, আপনি আমাদেরকে বলুন খোদাকেকে সৃষ্টি করেছেন? আমার বন্ধু এতে তার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পান। তিনি উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বোবা হয়ে গেলেন। তিনি সারারাত ঘুমোতে পারলেন না।

পরের দিন তিনি আমার নিকট আসলেন এবং পূর্ণ ঘটনা আমাকে খুলে বললেন, এবং আমি বুঝতে পারলাম, তিনি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যে পদ্ধতি অনেক পণ্ডিত অবলম্বন করে থাকেন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য। এ সব পণ্ডিত যুক্তির খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ত্যাগ করেন, যা হলো সবিশ্লেষণ। যদি আপনি আমার কথাকে বিশ্লেষণ করেন, আমার বক্তব্যে কখনো আমি বলি না যে, সবকিছুর

একজন স্রষ্টা আছে। কখনো আমি তা বলি নি। যদি তা বলি তাহলে আমি ফাঁদে পড়বো। বাস্তবে আমি এমন এক ব্যক্তি, যে নাস্তিককে জিজ্ঞেস করতো এবং নাস্তিককে উত্তর দিতে হতো যে, প্রথম যে সত্তা সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানেন তিনিই স্রষ্টা বা ম্যানুফ্যাকচারার। আমি এরূপ বলতাম না সে এটিই বলতো, এরূপ কেউ যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করে, ভাই জাকির সেই ব্যক্তি কে, যিনি অজ্ঞাত জিনিসের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত? আমি তাকে বলতাম, প্রত্যেক জিনিস যার শুরু আছে, প্রত্যেক জিনিস যা সৃষ্ট, প্রথম সত্তা যিনি এ ধরনের জিনিসের সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে সক্ষম হবেন, তিনিই স্রষ্টা। আমি আমার যুক্তি ব্যবহার করছি। আমি পুনরায় ফাঁদে পড়তে চাই না। আমি যদি বলি যে, উত্তর হবে প্রথম ব্যক্তিই হবেন ঐ সত্তা, যিনি সৃষ্ট যে কোন জিনিসের গঠন বলতে পারবেন, যার থেকে শুরু তিনিই স্রষ্টা, আপনি একই যুক্তি পেশ করে প্রমাণ করতে পারবেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। চূড়ান্ত উত্তর হবে, যেহেতু বিজ্ঞান বলছে যে, সূর্যের শুরু আছে, চন্দ্রের শুরু আছে, মহাবিশ্বের শুরু আছে কে এর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানে? স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এটা কিছুটা আমার বন্ধুর প্রশ্নের অনুরূপ। সে বললো যে, আমার ভাই টম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে একটি সন্তানও প্রসব করেছিল। আপনি কি বলতে পারেন সন্তানটি ছেলে ছিল না মেয়ে? ডাক্তার হিসেবে আমি জানি পুরুষ কখনো অন্তঃসত্ত্বা হয় না এবং সন্তান প্রসব করতে পারে না। পুরুষের কোয়ালিটি এরকমই যে, সে অন্তঃসত্ত্বা হয় না এবং সন্তান প্রসব করতে পারে না। এটা একটা জগাখিচুড়ি প্রশ্ন। একইভাবে আল্লাহর পরিচয় যে, তিনি কারো দ্বারা সৃষ্ট নন। তার শুরু নেই। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন। এটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন, যেমন আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তার ভাই টম সন্তান প্রসব করেছিল, তার সন্তান ছেলে শিশু ছিল, না কন্যা শিশু। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ৫. আমার নাম মুহাম্মদ আশরাফ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হলো অনেক প্রাচ্যবিদ দাবি করে বরং অভিযোগ করে যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আরবের লোকদের নৈতিক সংস্কারের জন্য কুরআন রচনা করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছিলেন। এটি কি ঠিক?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন এবং আমিও তার সঙ্গে একমত যে, কিছু প্রাচ্যবিদ বলেছেন যে, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ মিথ্যা বলেছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) যে, কুরআন আল্লাহর বাণী যাতে তিনি আরবদের সংশোধন করতে পারেন। আমি আরো একমত যে, কুরআনের বাণী এবং নবী

মুহাম্মাদ ﷺ এর উদ্দেশ্য শুধু আরবদের সংশোধনই নয় বরং সারা পৃথিবীর নৈতিক সংশোধন। আপনি বলেন তা হলে আসুন আমরা এ দাবিকে বিশ্লেষণ করে দেখি। যদি তাঁর উদ্দেশ্যই থাকে আরবের সংস্কার তাহলে তিনি কেনই বা অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করবেন একটা নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য? ধরুন আপনি একটি নৈতিক নিরাপত্তা চান অথচ আপনি নিজেই মিথ্যা দিয়ে শুরু করলেন। এটা শুধু এ সব লোকদের দ্বারাই করা সম্ভব, যারা যশ এবং অর্থের লোভে এটা করে। তারা প্রকাশ্যে বলতে পারে তারা নৈতিক সংশোধন চায়; কিন্তু অপ্রকাশ্যে তারা অর্থই চায়। আর আমি এটা প্রমাণ করেছি যে, নবী করীম ﷺ অর্থের জন্য এটা করেন নি। সত্য যদি চূড়ান্ত ফল হয় তাহলে মাধ্যমও সত্যই হতে হবে। এটি আল-কুরআনের ৬ নং সূরা আনআমের ৯৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ط

অর্থ : সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে নানাবিধ মিথ্যা কথা রচনা করে বেড়ায় অথবা বলে যে, আমার ওপর ওহী নাযিল করা হয়েছে, (যদিও) তার প্রতি কিছুই নাযিল করা হয় নি। আর যে বলে আমি অচিরেই আল্লাহ তাআলার নাযিলকরা গ্রন্থের মতো কিছু নাযিল করে দেখাব।

যদি নবী করীম ﷺ সত্যিই মিথ্যা বলতেন তাহলে তিনি তাঁর গ্রন্থে একথা কখনো লিখতেন না যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে জালিম এবং আয়াতটি একটা শাস্তির বর্ণনা দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

একথা ৬৯ নং সূরা আল-হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ـ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ـ

অর্থ : রাসূল যদি এ কিতাবটি নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিত, আমি শক্ত হাতে তার ডান হাতটি ধরে ফেলতাম, অতঃপর আমি তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। আর যে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারতো না।

এমনকি রাসূলকেও ক্ষমা করা হতো না। কোনো নবীর মিথ্যা ধরা হতো এমনকি নবী মুহাম্মাদ ﷺ এরও (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি কখনো এটা করতেন না। এমনকি যদি নবী করীম ﷺ মিথ্যা আবিষ্কার করেন, আল কুরআন বলে ঃ আমরা তার

কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম। এমন অনেক চান্স ছিল যে, নবী করীম ﷺ যদি মিথ্যা বলতেন তাহলে তাঁর জীবনের কোনো এক সময়ে আল্লাহ নিশ্চিতই তা প্রকাশ করে দিতেন এবং অবশ্যই কোনো এক সময়ে লোকেরা তাকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাতো।

একই রকম শাস্তির কথা ৪২ নং সূরা শুয়ারা-এর ৪২ নং আয়াতে এরকম ১৬ নং সূরা নাহল-এর ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়াও আরো বহু উদাহরণ আছে, যেখানে রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি নৈতিক সংশোধনের জন্য রাসূল ﷺ নিজে কুরআন রচনা করে থাকতেন তাহলে তিনি এমন বিষয় এতে উল্লেখ করতেন না, যাতে রাসূল-এর কাজ আল্লাহর পছন্দ নয় এমন কথা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের আয়াত রয়েছে ৮০ নং সূরা আবাসার ১ পর্যায়ে।

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى ۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى ۔ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۔

অর্থ : তিনি (নবী)– ভ্রূকুঞ্চিত করলেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি হাযির হয়েছিল, তুমি কি জানতে হয়তো সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিত, কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো তা তার জন্য হয়তো উপকারীও হতে পারতো।

এ সূরা তখন নাযিল হয় যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) নামে একজন অন্ধ সাহাবী রাসূল ﷺ-এর কাছে আসেন। এতে রাসূল ﷺ -এর আলোচনার বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি পৌত্তলিক আরব নেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেহেতু তিনি আরব নেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি যদি নবী ছাড়া অন্য কেউ হতেন, সাধক, সন্ন্যাসী বা কেউ তাহলেও কেউ আপত্তি করতো না। কিন্তু যেহেতু তিনি নবী যাঁর চরিত্র ছিল সুমহান, সুউচ্চ, যাঁর হৃদয় সব সময় অভাবী দরিদ্রদের জন্য কাঁদে। তাঁর জন্য ওহী নাযিল হলো এবং যখনই রাসূল তাঁর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি তাঁকে এ কথা বলে ধন্যবাদ জানাতেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।'

আল-কুরআনে এ ধরনের বহু পুনঃপ্রমাণ দান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ–

৬৬ নং সূরা তাহরীম আয়াত নং-০১

১৬ নং সূরা নাহল আয়াত নং-১২৬

৮ নং সূরা আনফাল আয়াত নং-৮৪

যদি নবী করীম ﷺ নৈতিক সংশোধনের জন্য কুরআন রচনা করতেন তাহলে তিনি কুরআনে এগুলো ঢুকাতেন না। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ৬. আস্‌সালামু আলাইকুম ভাই, আমি একজন মেডিকেলের ছাত্রী। আপনার বক্তৃতায় আপনি বহু বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি তুলে ধরেছেন। কুরআনে কি গণিতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বাস্তব ঘটনা আছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্নকারী বোনটি বলছেন যে, আমি বহু বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তুলে ধরেছি, এবং প্রশ্ন করেছেন কুরআনে কি গাণিতিক বিষয় উল্লেখ আছে? বা কুরআনে কি গণিতের ওপরে কথা বলেছে?

হ্যাঁ, কুরআনে গণিতের বিষয়ে অনেক জিনিস আছে। গণিতের এরূপ একটি বিধান, পুরো গণিত এরিস্টোটল-এর বিধানের ওপর ভিত্তি করে চলে 'মধ্যপদলোপী' বিধান। এতে বলা হয়েছে প্রত্যেক প্রস্তাবনা, যা প্রত্যেক বর্ণনা সত্য বা মিথ্যা হবে। এবং বছরের পর বছর সকলে এ বিধান অনুসরণ করলো। শত বছর আগে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসলো যে, যদি প্রত্যেক বিবৃতি প্রত্যেক প্রস্তাবনা সত্য বা মিথ্যা হয় এটাও একটা বর্ণনা এবং এটাও মিথ্যা হতে পারে। যদি এটা মিথ্যা হয় তাহলে কি হবে? পূর্ণ গণিতই অচল হয়ে যাচ্ছিল। সকল গণিতবিদরা একত্রিত হলেন এবং নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন, নতুন থিওরী বললেন, যখনই কেউ কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, তখন যে কোন একটি অর্থে ব্যবহৃত হবে। যখন কোনো শব্দ ব্যবহার করবে, তখন অর্থ সম্পর্কেই বলবে শব্দ সম্পর্কে নয়। কিন্তু যখন শব্দ উল্লেখ করবে, অর্থ নয়।

আসুন আপনাদের একটা উদাহরণ দিই। যদি আমি বলি আকবর ছোট। অর্থানুযায়ী এটা সঠিক। সে ছোট বালক। আকবর ছোট কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবি ভাষা জানে সে আপত্তি জানাতে পারে। আকবর ছোট নয়। আকবর অর্থ মহান, বিরাট। এখানে আমি শব্দটি উল্লেখ করেছিলাম, অর্থ নয়। আমাকে আরেকটি উদাহরণ দিতে দিন। ধরুন যদি আমি বলি 3 সব সময় 4-এর আগে আসে, কারো কোনো আপত্তি নেই কারণ 3 সংখ্যাটি 4-এর আগেই আসে। কিন্তু কোন সংশয়বাদী বলতে পারে 3 আসে এর পরে ডিকশনারীতে। কারণ 3 (Three) এর T- ডিকশনারীতে 4 (Four) F-এর পরে আসে। এখানে আমি যখন বলেছি 3, 4 এর পূর্বে আসে, আমি অর্থের দিকেই বলেছি। আমি শব্দের দিকে বলি নি। তার্কিক যে, আপত্তি তুলেছিল, সে শব্দের দিকে বলেছে, অর্থের দিকে নয়।

সুতরাং যখন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। শাব্দিক অথবা অর্থের দিকে। আমার বক্তব্যে আমি 8 নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছি–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔

অর্থ : তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেতো।

অর্থানুযায়ী এটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কেউ এর মধ্যে কোনো একটি বৈপরীত্য পাবে না। সুতরাং কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। কিন্তু তার্কিক বলবে যে, সে কুরআনে বৈপরীত্য পেয়েছে। আমি বলি, কোথায়? সে ৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে এ বৈপরীত্য পেলো। যেখানে اختلاف। শব্দ রয়েছে সুতরাং কুরআন ভুল প্রমাণিত। কুরআনে اختلاف। শব্দ রয়েছে, লেখক নিজেই ভুল স্বীকার করছে। আমি বলি অপেক্ষা করুন, পূর্ণ আয়াতটি পড়ুন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۔

এবং اختلافا كثيرا। اختلاف ۔ অর্থাৎ বৈপরীত্য শব্দটি আল-কুরআনে একবার এসেছে। সুতরাং আক্ষরিক দিক দিয়ে কুরআন নিজেও ভুল স্বীকার করেনি। এটা নিরাপদ।

اختلاف। শব্দটি একবার উল্লেখ আছে এবং কুরআন বলে اختلافا كثيرا। অনেক বৈপরীত্য। সেগুলো নিরাপদ। অন্য তার্কিক এগিয়ে এসে বলে, আমি একমত اختلاف। শব্দ মাত্র একবার এসেছে, কিন্তু কুরআন বলে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔

অর্থাৎ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا।- অনেক বৈপরীত্য শব্দটি সেখানে আছে। সুতরাং কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে নি। আমি জানি এটা বুঝতে কিছুটা হলেও কঠিন কিন্তু আমি আপনাকে পরবর্তীতে আরো সহজ উদাহরণ দিব। একের বিপরীত অন্যটি مفهوم مخالف - বিপরীত অর্থ সব সময় সঠিক হয় না।

আল-কুরআন বলে, যদি কুরআন না হতো .... তারা কি কুরআনকে যত্ন সহকারে বিবেচনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসতো, তাহলে অনেক বৈপরীত্য পেতে।

কুরআন একথা বলে নি যে, যদি এতে অনেক বৈপরীত্য থাকে তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। যদি কুরআন উল্লেখ করতো যে, যদি সেখানে অনেক বৈপরীত্য থাকতো এ কিতাব আল্লাহর নয়। অতএব, তখন কুরআন ভুল প্রমাণিত হতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শব্দাবলী বাছাই করেছেন। কেননা, বিপরীত অর্থ সব সময় সঠিক হয় না।

আমাকে একটি উদাহরণ দিতে দিন। মনে করুন, আমি যদি বলি মুম্বাইর অধিবাসী অথবা মুম্বইয়ীরা সবাই ভারতীয়, এটা একটা সত্য বর্ণনা। কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনা সত্য হওয়া জরুরী নয়। সব ভারতীয় মুম্বাইতে বাস করে না। মুম্বাইর কেউ কেউ বাস করে। এভাবে নিয়ম বলছে ঃ ভাইস ভার্যা সব সময় সত্য হয় না। সুতরাং কুরআন যখন বলে ঃ

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا -

সুতরাং যদি যেখানে বৈপরীত্য হয়, যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাও হতে পারে। কুরআন নিজে নিজের ভুল ধরে নি।

আসুন আপনাদেরকে আরো সহজ উদাহরণ দিই। এটি ২৩ নং সূরা মুমিনূন-এর ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'সত্যিকার বিশ্বাসীরা নামাযে বিনয়ী হয়।' কেউ আমাকে বলবে, আমি একজন মুসলমানকে চিনি, যে পাঁচ বার নামায আদায় করে; কিন্তু সে চুরি করে, সে প্রতারণা করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপরাধী থাকে। দেখুন কুরআন ভুল। কুরআন বলছে সত্য বিশ্বাসীরা নামাযে বিনয়ী হয়। আমি বলতে চাই, অপেক্ষা করুন! কুরআনের বাণী শুনুন। কুরআন বলে সত্যিকার বিশ্বাসীরা নামাযে বিনয়ী হয়। একথা বলে না যে, যারা নামাযে বিনয়ী, তারা সত্যিকার মুমিন। কুরআন যদি বলতো যারা নামাযে বিনয়ী, তারা সত্যিকার বিশ্বাসী, তাহলে হয়তো কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণিত করা যেত। সুতরাং আল্লাহ্ হলেন বড় গণিত বিশেষজ্ঞ। তিনি জানতেন যে, কিছু সন্দেহবাদী আছে, যারা কুরআনের ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করবে। এজন্যই তিনি শব্দাবলী বাছাই করেছেন।

আমি আরো একটি উদাহরণ দিতে চাই। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসা এর দৃষ্টান্ত আদম (আ)-এর মতো। তাঁকে তিনি মাটি থেকে তৈরি করে বললেন হয়ে যাও, তো হয়ে গেলেন।

অর্থানুযায়ী আমাদের কোনো আপত্তি নেই। উভয় যীশু খ্রিস্ট এবং আদম (আ) মাটি থেকে তৈরি হয়েছিলেন। অর্থানুযায়ী এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার কিন্তু আপনারা যদি কুরআনে ঈসা (আ) অর্থাৎ যীশু শব্দ গণনা করেন, তাহলে ২৫ বার পাবেন। হযরত আদম (আ)-এরও উল্লেখ আছে ২৫ বার। এভাবে অর্থ একই হওয়ার সাথে সাথে, উল্লেখও হয়েছে ২৫ বার করে।

এরূপ আরো উদাহরণ ৭ নং সূরা আরাফের ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج

অর্থ : তার উদাহরণ কুকুরের মতো, তার ওপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। এটা হলো ঐ কওমের উদাহরণ, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

আরবি বর্ণনা اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا উল্লেখ করা হয়েছে পাঁচ বার এবং আরবি শব্দ كَلْبِ (কুকুর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ বার। অর্থের সাথে সাথে উল্লেখও একইরূপ করা হয়েছে।

৩৫ নং সূরা ফাতির-এর ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ـ

অর্থ : অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে না।

আল-কুরআনে ظُلُمٰتُ (অন্ধকার) উল্লেখ আছে ২৩ বার এবং نُوْرُ (আলো) উল্লেখ আছে ২৪ বার। অতএব অর্থ সঠিক হওয়ার সাথে সাথে উল্লেখও অন্ধকারের সাথে আলোর মিল নেই। ২৩ ও ২৪ বার। ২৩ সংখ্যাটি ২৪-এর মতো নয়। যেখানেই কুরআন বলছে এটা এটার মতো সেখানে দুটোর উল্লেখও একই। (কি আশ্চর্য ব্যাপার!) যেখানে বলছে এটা এটার মতো নয়, উল্লেখ করার সংখ্যা হিসেবেও একটি আরেকটির মতো নয়। এটা শুধু কুরআনের পক্ষেই এতো সুন্দর উদ্ধৃতি করা সম্ভব, কুরআন তো নয়ই কুরআনের মতো কোনো গ্রন্থ রচনা করা কম্পিউটার দ্বারাও সম্ভব নয়। আপনাকে ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতের যে উদাহরণ দিলাম–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

অর্থ : নিশ্চয়ই ঈসা (আ)-এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আ)-এর মতো, তাঁকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বললেন হও, তারপর হয়ে গেল।

আল্লাহ আপনাকে খাদ্য দিয়ে পরীক্ষা করেন না কিন্তু কিছু লোককে খাদ্য দিয়েও পরীক্ষা করেন, কিছু লোককে স্বাস্থ্য দিয়ে, কিছু লোককে দাম্পত্য জীবনে এবং এরূপ বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা করা হয়। যখন আপনি একটা পরীক্ষা দিবেন, আপনি বলতে পারেন না যে, পরীক্ষককে সকলের নিকট থেকে একই পরীক্ষা নিতে হবে।

কিন্তু পরীক্ষা যাই নেয়া হোক, বিচার ন্যায় হতে হবে। আল-কুরআন বলে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি বিচার দিনের মালিক বা মনিব। আমি তোমাদের যে পরীক্ষাই দেই না কেন, বিচার সে অনুযায়ীই হবে। ধরুন, আপনি একজন খোঁড়া লোকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছেন। আপনাকে প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য আনতে হবে। সুতরাং আপনি তাকে ১০০ মিটার ড্যাশ দিবেন, আপনি তাকে ৫০ মিটার সামনে দিবেন এবং যার দুটি পা আছে তাকে শুরু থেকেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে, যাতে উভয়ের একই সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে, আপনাকে তিনি বিচার করবেন। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ৭. আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি কাশ্মিরা নাজদা এবং আমি ধর্মান্তরিত মুসলমান। আমি M.A ফাইনাল-এর ছাত্রী। আমার প্রশ্ন আপনার বক্তৃতার প্রথম অংশের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি বলেছেন, আল-কুরআনে কোনো বৈপরীত্য নেই, কিন্তু কুরআনের একটি আয়াত আছে, যার নম্বর আমি এ মুহূর্তে বলতে পারবো না, কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, তিনি কিছু লোকের হৃদয়ে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন, এজন্য তারা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি মন এবং মস্তিষ্ক চিন্তা করে (অন্তর নয়)। আমরা কি এটা পরিষ্কার করতে পারি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন একটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি তাকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনবার অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ কুরআনের কোনো কোনো স্থানে, আমিও তাঁর সাথে একমত যে, আল্লাহ অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন যাতে লোকেরা সত্যের নিকটে আসতে না পারেন, তাদের সীল মেরে দেয়া হয়েছে।

তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, আজ বিজ্ঞান অনেক অগ্রসর এবং আমরা জানি চিন্তার জন্য প্রধান অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক, অন্তর নয়। পূর্বে মানুষ মনে করতো এটা অন্তর ছিল। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে কুরআনে কোনো ভুল নেই। আপনি যদি উপলব্ধি করেন, আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি কুরআনের আয়াত কোটেশন হিসেবে ২০ নং সূরা ত্বা-হার ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াত পড়েছি যাতে বলা হয়েছে–

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ـ وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ ـ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ـ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ـ

অর্থ : হে আমার রব! আমার বুককে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

এখানে صَدْرِیْ অর্থ হৃদয় দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কেন আল্লাহ আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করবেন, আরবি صدر (ছদর) শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা হলো অন্তর, আরেকটি হলো কেন্দ্র। যদি আপনি করাচি যান আপনি পাবেন, ছদর এরূপ এরূপ, কেন্দ্র এরূপ এরূপ। সুতরাং আরবি صدر (ছদর) অন্তরের অর্থ ছাড়াও কেন্দ্র অর্থও দেয়। এখানে কুরআন বলেছে যে, আমরা তোমাদের কেন্দ্র, মস্তিষ্ককে সীল মেরে দিয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করি! হে প্রভু! আমার জ্ঞানের কেন্দ্রকে বৃদ্ধি করে দাও, আমার এবং শ্রোতাদের মাঝে বুঝের বাধা দূর করে দাও। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ৮. আস্‌সালামু আলাইকুম আমার নাম খালিদ। এটা কি বৈপরীত্য নয় যে, কুরআন এক স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা এবং অন্যস্থানে তাকে জিন বলেছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কুরআনে কি এটা বৈপরীত্য নয় যে, বিভিন্ন স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা এবং এক স্থানে তাকে জিন বলা হয়েছে। আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ইবলিস এবং আদমের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। ২ নং সূরা বাকারায়, ৭ নং সূরা আরাফে, ১৫ নং সূরা হিজর, ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল, ১৮ নং সূরা কাহফ, ২০ নং সূরা ত্বাহা, ৩৮ নং সূরা সা'দ, এবং বিভিন্ন স্থানে/ আমি একমত যে কুরআন বলে–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ـ

অর্থ : আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা সিজদা করো, অতঃপর ইবলিস ছাড়া আর সবাই সিজদা করলো। (সূরা আল বাকারা ঃ ৩৪)

যদি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন সাত স্থানে ইবলিসকে ফেরেশতা বলা হয়েছে। একস্থানে ইবলিসকে জিন বলা হয়েছে। এটা কি বৈপরীত্য নয়? এটা হলো পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ, কিন্তু কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, আরবীতে তাগলীব নামে ব্যাকরণের পরিভাষা রয়েছে। যাতে অধিকাংশকে সম্বোধন করা হয়। যদিও কম অংশও অন্তর্ভুক্ত। আমি একটি উদাহরণ দিই। মনে করুন এক শ্রেণীতে ১০০ জনের মধ্যে একজন ছাত্রী এবং বাকি ৯৯ জন ছাত্র। আমি যদি আরবিতে বলি সকল ছাত্র দাঁড়াবে। এমনকি ছাত্রীটিও দাঁড়াবে, কারণ সে তো তাগলীব-এর নিয়ম জানে। (আরবিতে আরেকটি মূলনীতি আছে للاكثر حكم الكل। (Majority must be granted) অধিকাংশ সকলের বিধান বহন করে। অনুবাদক) কিন্তু যদি আমি ইংরেজিতে বলি সব বালক দাঁড়াও তাহলে শুধু ৯৯ জন বালকই দাঁড়াবে, বালিকাটি দাঁড়াবে না।

সুতরাং, কুরআন আরবিতে নাযিল হয়েছিল। যখন বলছে আমরা ফেরেশতাদের বললাম সিজদা করো, সব সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া।

এটা বলছে এখানে বেশির ভাগ ছিল ফেরেশতা। ইবলিস ফেরেশতা হতে পারে নাও হতে পারে। ১৮ নং সূরা কাহাফের ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে ছিল জিন, অন্যস্থানগুলোতে যা বলা হয়েছে, তাতে সে হয়তো ফেরেশতা ছিল। এখানে কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ, আপনাকে আরবি কায়েদা 'তাগলীব'-এর প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়, ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছে নেই। আল্লাহ যা বলেন, সাথে সাথে মান্য করেন। জিনদের ইচ্ছের স্বাধীনতা রয়েছে এটাও একটা প্রমাণ যে, ইবলিস জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৯. আস্‌সালামু আলাইকুম। এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, খোদা হলেন অতিপ্রাকৃত এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন। আমার একজন অমুসলিম বন্ধু আছে তাঁর প্রশ্ন হলো– খোদা কেন মানুষের আকার ধারণ করতে পারেন না। আপনি কি ব্যাখ্যা করে বলবেন, প্লিজ।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোনটি প্রশ্ন রাখলেন যে, খোদা হলেন অতি প্রাকৃত। তিনি সবকিছু করতে পারেন এবং তার বন্ধু একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কেন সর্বশক্তিমান খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? যে সব লোক খোদায় বিশ্বাস করে, তারা বলে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত এখানকার বাইরেও যারা খোদায় বিশ্বাস করে, তারাও এ বিশ্বাস করে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত।

আমি জানতে চাই, কোন্ ব্যক্তি এখানকার বাইরে যে খোদায় বিশ্বাস করে আবার খোদাকে অতিপ্রাকৃত বলে না। প্রত্যেকে, প্রত্যেকে যে খোদায় বিশ্বাস করে, এ বিশ্বাসও করে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত অর্থ প্রকৃতির ওপরে হলো খোদা। যদি বাস্তবতা কুরআন অনুযায়ী চলে যে, খোদা অতিপ্রাকৃত নন। আল

কুরআনে দেয়া আল্লাহর ধারণা অনুযায়ী খোদা প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, এটা কখনও হবে না যে, প্রকৃতি এটি বলেছে এবং খোদা বলেছেন তার বিপরীত। খোদা প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, খোদা আপনার ফিতরাত সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভেতরে প্রকৃতি নিহিত।

আর কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহর অবদানগুলোর একটি হলো 'ফাতির' যা হলো আল-কুরআনের ৩৫তম সূরাটির নাম। فاطر (ফাতির) শব্দটি فطرة (ফিতরাত) শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ নিহিত প্রকৃতি فاطر (ফাতির) অর্থ স্রষ্টা, সৃষ্টির মূল কারক; যিনি বস্তুর প্রাথমিক পরিমাপক যন্ত্রের স্রষ্টা, যার সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি যোগ হয়। অতএব, রমজানে আমরা যখন রোযা ভাঙ্গি, তাকে ইফতার বলে। ইফতার অর্থ ভাঙ্গা। একইভাবে فاطر (ফাতির) শব্দের অর্থ স্রষ্টা, যার অর্থ আকৃতি প্রদানকারী, গঠনকারী এবং ফেড়ে বেরো করে আনেন যিনি। আল-কুরআন লোকদের বলে, তুমি কি ঐগুলো সম্পর্কে চিন্তা কর না? সূর্যের দিকে তাকাও, চন্দ্রের দিকে তাকাও, তারা প্রকৃতির বিধান মেনে চলছে। তারা কখনো তাদের বিধান পরিবর্তন করে না। তারা সবাই স্বাভাবিক।

একইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কিছু সমাধান করেন। – অনুবাদক)

৩৩ নং সূরা আহযাবের ৬২ নং আয়াতে আছে– وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً

অর্থ : তুমি আল্লাহর প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন কখনও পাবে না।

৩০ নং সূরা রূম-এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ط وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : অতএব হে নবী, আপনি আপনার চেহারা সঠিক দ্বীনের ওপর নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ তাআলার প্রকৃতির ওপর, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই। এ হচ্ছে সঠিক দ্বীন কিন্তু তাদের বেশিরভাগ তা উপলব্ধি করে না।

আজ বিজ্ঞান আমাদের কেয়ান্টাম সম্পর্কে বলে। আধুনিক বিজ্ঞান আরো বলে, পর্যবেক্ষক ছাড়া, আপনি কিছু পেতে পারেন না। পর্যবেক্ষক ছাড়া মহাবিশ্ব নিরর্থক। বিজ্ঞানীরা একটা প্রশ্ন রেখেছেন, প্রথম পর্যবেক্ষক কে ছিলেন? আল্লাহর আরেক অবদান হলো 'আর রাশীদ' সাক্ষী। কুরআন বলে আল্লাহই প্রথম সত্তা, যিনি প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং আল্লাহ অতিপ্রাকৃত নন। তিনি প্রাকৃতিক।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ভিত্তি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে খোদা সবকিছু করতে পারেন। যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী তাদের অধিকাংশের প্রতি আমি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেই; যাতে তারা আল্লাহকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ কি যে কোনো জিনিস এবং সব জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন? তাদের অধিকাংশই বলবে হ্যাঁ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হলো, তিনি কি এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি ধ্বংস করতে পারেন না? এবং তারা ফাঁদে পড়ে যান। যদি তারা বলেন হ্যাঁ, যে খোদা এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন, যা তিনি ধ্বংস করতে পারেন না, তাহলে তারা তাদের দ্বিতীয় বিবৃতির বিপক্ষে চলে যান যে, খোদা সবকিছু ধ্বংস করতে পারেন।

যদি তারা বলেন .... না, খোদা এমন জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন না, যা তিনি ধ্বংস করতো পারেন না। এর অর্থ তারা তাদের প্রথম বিবৃতির বিপক্ষে চলে যাচ্ছেন। যার অর্থ খোদা সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন। পুনরায় তারা তাদের যুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন না, তারা ফাঁদে পড়ে গেলেন। একইভাবে খোদা একজন লম্বা-খাট লোক তৈরি করতে পারেন না। হ্যাঁ তিনি লম্বা লোককে খাট বানাতে পারেন; কিন্তু তিনি তো আর লম্বা থাকলেন না। তিনি একজন খাট লোককে লম্বা বানাতে পারেন, তাতে তো তিনি খাট থাকলেন না। কিন্তু আপনারা লম্বা-খাটো লোক পাবেন না। আপনি মাঝারি মানুষ পাবেন, যিনি লম্বাও নন খাটোও নন। কিন্তু খোদা এমন কোনো মানুষ তৈরি করতে পারেন না (করেন না), যিনি একই সময়ে লম্বা এবং খাট।

একইভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ একজন চিকন মোটা লোক তৈরি করতে পারেন না। হাজার হাজার জিনিস আছে আমি তালিকা দিতে পারি যা সর্বশক্তিমান খোদা করতে পারেন না (করেন না)। খোদা মিথ্যা বলতে পারেন না। যে, মুহূর্তে তিনি মিথ্যা বলবেন সে মুহূর্তে তিনি খোদা হওয়ার ক্ষমতা হারাবেন। খোদা অবিচারী হতে পারেন না। যে মুহূর্তে তিনি অবিচারী হবেন, খোদা হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। তিনি নিষ্ঠুর হতে পারেন না, তিনি ভুলে যেতে পারেন না। আপনি এক হাজার জিনিসের তালিকা করতে পারবেন। তিনি তার রাজত্বের বাইরে আমাকে নিক্ষেপ করতে পারেন না। সারা পৃথিবী, সারা মহাবিশ্ব তাঁরই। তিনি আমাকে হত্যা করতে পারেন, তিনি আমাকে মুছে ফেলতে পারেন। আমাকে শেষ করে দিতে পারেন কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর রাজত্বের বাইরে ফেলতে পারেন না। সবকিছু তার। কোথায় তিনি আমাকে নিক্ষেপ করবেন?

কুরআনের কোথাও আল্লাহ্ বলেন নি যে, তিনি সবকিছু করতে পারেন। বাস্তবে আল-কুরআন বলে إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। এটি বলে না যে, খোদা সবকিছু করতে পারেন। দেখুন :

২ নং সূরা বাকারা আয়াত নং ১০৬

২ নং সূরা বাকারা আয়াত নং ১০৮

৩ নং সূরা আলে ইমরান আয়াত নং-২৯

১৬ নং সূরা নাহল আয়াত নং-৭৭

৩৫ নং সূরা ফাতির আয়াত নং-১

বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

'আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ৮৫ নং সূরা বুরূজের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ 'তিনি যা ইচ্ছে করেন, তাই করেন।'

দেখুন তিনি যা ইচ্ছে করেন, তিনি করতে পারেন; কিন্তু খোদা শুধু খোদায়ীত্বের কাজগুলোই করেন। তিনি অ-খোদার কাজ করেন না।

আপনার প্রধান প্রশ্নানুপাতে কেন খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? যেটা একজন অমুসলিম রেখেছেন। যে দর্শনে খোদা আকার ধারণ করে তাকে 'এ্যান্থ্রোপোমোরফিজম' বলে। সর্বশক্তিমান খোদা আকার ধারণ করেন এবং তাদের একটা সুন্দর যুক্তি আছে, যেহেতু সর্বশক্তিমান খোদাকে বলতে হয়, জানতে হয়, লোকদের শিক্ষা দিতে হয়, যখন কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে কেমন অনুভব করে, তাকে মানব আকৃতি গ্রহণ করতে হয়, মানুষকে বলার জন্য কেমন অনুভব করে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তা বলার জন্য। যখনই তুমি সুখী, তখন তুমি কেমন অনুভব করো। যখন তুমি দুঃখিত, তখন তুমি কেমন অনুভব করবো। মানুষের করণীয় এবং বর্জনীয় নির্ধারণ করার জন্যও মানবাকৃতি গ্রহণ করতে হয়। সর্বশক্তিমান খোদা যে মানবাকৃতি ধারণ করেন তাকে 'এ্যানথ্রোপোমোরফিজম' বলে। কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, এ যুক্তি ধোপে টিকে না।

ধরুন! আমি একটি টেপ রেকর্ডারের আবিষ্কারক। আমি একটি টেলিভিশন আবিষ্কার করলাম। টেপ রেকর্ডারের ভাল-মন্দ জানার জন্য আমার টেপ রেকর্ডার হবার প্রয়োজন নেই। টেলিভিশনের ভাল-মন্দ জানার জন্য আমার টেলিভিশন হবার প্রয়োজন নেই। আমার একমাত্র কাজ হলো ক্যাসেট চালানোর ক্যাটালগ লিখা। ক্যাসেট ঢুকানো, চলার বোতাম টিপে দেয়া, ক্যাসেট চলতে শুরু করবে। স্টপ চাপ দিলে বন্ধ হবে। দ্রুত সামনে যাওয়ার বাটন টিপলে দ্রুত সামনে যাবে। আমাকে একটি ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে। একইভাবে মানবের ভাল-মন্দ জানার জন্য খোদার মানব হবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্যে থেকে একজন মানুষকে নির্দেশনা ও ক্যাটালগ দেবার জন্য বাছাই করেন। ক্যাটালগ কোন্‌টি? আল-কুরআন হলো মানব জাতির জন্য ক্যাটালগ, যার মধ্যে মানুষের করণীয় ও

বর্জনীয় রয়েছে, তাদের জন্য কি ভাল, কি মন্দ তা আল কুরআনে রয়েছে। তাঁর মানব হবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন? আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, খোদা কি মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না? হ্যাঁ তিনি পারেন, তবে যে মুহূর্তে তিনি মানবাকার ধারণ করবেন, সে মুহূর্তে তিনি খোদা হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। কারণ, খোদা অমর। মানব মরণশীল, আপনি একই সাথে মরণশীল আর অমর হতে পারেন না। এটা একই ব্যক্তির একই সাথে লম্বা-খাট হওয়ার মতো অবাস্তব। মানবের কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলী থাকবে, তাদের কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। যেমন তাদের খেতে হয়, ৬ নং সূরা আনআমের আয়াত নং-১৪ এ আছে–

قُلْ اَغَيْرَاللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ط

অর্থ : বলুন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমার রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করবো? যে আল্লাহ আসমান ও দুনিয়ার স্রষ্টা, যিনি সবাইকে খাওয়ান কিন্তু তিনি নিজে খান না।

মানবের খাবার প্রয়োজন। খোদার কি খাবার প্রয়োজন হয়? না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন আছে।

২ নং সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন : لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ 'তাকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শও করে না।'

খোদার ঘুমের কোনো প্রয়োজন নেই। মানবের ঘুমের প্রয়োজন, বিশ্রামের প্রয়োজন, খাবার প্রয়োজন, খোদা কিভাবে আসবেন একই সময়ে মরণশীল এবং অমর হবেন। এটি অযৌক্তিক।

যদি আপনি বলেন, খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন, মানুষের গুণাবলী গ্রহণ করেন, আপনি নাস্তিককে একটা চাবুক তুলে দিলেন আপনাকে প্রহার করার জন্য। খোদা অতি প্রকৃত নন, সবকিছু করতে পারেন, খোদা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন না, খোদা প্রাকৃতিক। খোদার সকল কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। তিনি তাঁর ইচ্ছেনুযায়ী সব কিছু করেন এবং তিনি মানব আকৃতি ধারণ করতে পারেন না।

প্রশ্ন ১০. আমার নাম অস্টিন ফিলিপস্। আমি একজন খ্রিস্টান। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এ মুহূর্তে আমার মনে যা আসছে, তা হলো ইসলাম যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে কথা বলে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যীশু খ্রিস্ট ছিলেন। ইসলাম যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস, হত্যা এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ আগমনের ওপর বিশ্বাস করে না। এটা (ইসলাম) বিশ্বাস করে যে, তিনি প্রভু কর্তৃক ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়েছিলেন। ইসলাম বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ উত্তোলিত হন নি। একজন মুসলিম বন্ধু আমাকে বললেন যে, ইসলাম বিশ্বাস করে যে, যীশু কুমারী

মাতার সন্তান এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা জন্ম লাভ করেন এবং স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক নিয়মে) নিয়মে জন্ম গ্রহণ করেন নি। এটা এখন প্রমাণিত যে, যীশু খ্রিস্ট যদিও খোদা নন, তবুও তিনি অন্তত মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে বড়। এখন আপনি কেন বিবেচনা করেন না যদি আপনি মুহাম্মাদের শিক্ষা পেয়ে থাকেন। কেন আপনি যীশুর শিক্ষাও দেন না, যা বাইবেলে রয়েছে।

ডা. মুহাম্মাদ ঃ আমি কি এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি যা হ্যারল্ড পোর্টারের পক্ষ থেকে। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেছেন যদি আপনি বলেন, খোদা একজন তাহলে যীশু খ্রিস্ট কিভাবে ছবিতে আসলেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং এ ধরনের প্রশ্ন প্রধানত মিশনারীদের দ্বারা উত্থাপিত হয়। খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা। আমি জানি না তিনি কি একজন এবং তিনি কি ২-৩ টা দৃষ্টান্ত দিতে পারতেন কিনা যে, ইসলাম যীশু সম্পর্কে কি বলে। তিনি বলেছেন যে, কুরআন বলে যীশু খ্রিস্টকে জীবন্ত তুলে নেয়া হয়েছিল। নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে নয়। যীশু খ্রিস্ট একজন কুমারীর জন্ম। মুহাম্মাদ ﷺ-এর পিতা-মাতা ছিলেন। কে বড়? মন উত্তর দেয়, কে বড়? যীশু? অতঃপর তিনি বলেন, এরকম আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, যীশু খ্রিস্টকে ২৫ বার এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নামে মাত্র ৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। বড় কে? তারা প্রশ্ন রাখে মুসলিম হিসেবে আমাদের মন চিন্তা করে। কে বড়? যীশু খ্রিস্ট সুতরাং তাকে যীশু সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে বলেন।

ভাই, ইসলাম হলো একমাত্র অখ্রিস্টান বিশ্বাসের নাম, যাতে যীশু সম্পর্কে বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে, যে কোনো ধরনের পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে জন্ম লাভ করেন, যা আধুনিক যুগের অনেক খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি খোদার অনুমতি নিয়ে মৃতকে জীবিত করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি আল্লাহর জাত, আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন।

আপনার প্রশ্নে আসছি, কুরআন উল্লেখ করে যে, যীশু খ্রিস্টকে জীবন্ত উঠানো হয়েছিল, তা এ দিকে ইঙ্গিত করে না যে, খোদার পরে কেউ আছে কিনা? যদি কেউ কাউকে বলি দেয়, যদি কাউকে কুরবানী দেয়, তাদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই কুরবানী দিতে হবে, তাদের মধ্যে যীশু খ্রিস্ট ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল-কুরআনের মতে তাকে কুরবানী করা হয় নি। আল-কুরআন বলে, وما قتلوه وما صلبوه 'তারা তাঁকে হত্যাও করে নি; শূলেও চড়ায় নি।'

আমরা একমত, আপনাদের বাইবেলের মতে, মিথ্যা রিডিং---- এর মতে বাইবেল আরো বলে! তাঁকে শূলে চড়ানো হয় নি ... যে ইহুদিকে শূলে চড়িয়েছিল

বেশিরভাগ লোক তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়েছে।

৪ নং সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ ـ

অর্থ : হে কিতাবধারিগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।

বাড়াবাড়ি কি? দুটি বাড়াবাড়ি। ইহুদিরা বলে, তিনি ছিলেন জারজ সন্তান, খ্রিস্টানরা বলে তিনি ছিলেন আল্লাহ। বাড়াবাড়ি। আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে কথা বলা উচিত ছিল না, সত্য কথা সত্যিই থাকে, খোদা একজনই। তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল কারণ সেখানে ভুল ধারণা ছিল। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি আমাদের নতুন কিছু শেখাবেন না।

৫ নং সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে আল-কুরআন বলে :

وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

অর্থ : আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।

আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, যীশু (আ) আগমন করবেন তবে তিনি আমাদের নতুন কিছু শিক্ষা দিবেন না, তিনি ভুল ধারণা দূর করার জন্য আসবেন। আল্লাহকে বলবেন, হে আল্লাহ বারী তাআলা! তুমি আমার সাক্ষী থাক যে, আমি তাদেরকে কখনো বলিনি যে, তোমরা আমার ইবাদাত করো। আমি তাদের কখনো বলিনি যে, তারা আমাকে খোদাজাত পুত্র বলবে। তিনি খ্রিস্টানদের (ভুল ধারণা অপনোদনের) জন্য আসবেন, মুসলমানদের জন্য আসবেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আসবেন।

আপনি বলেছেন যে, তিনি কুমারী মাতার সন্তান। মনে করুন, যদি কোনো ব্যক্তির পিতা না থাকে, যেহেতু তাঁর পিতা নেই এ কারণে যদি আপনি দাবি করেন যে, তিনি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ। আল-কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই ঈসা এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদম (আ) এর মতো, আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, হয়ে গেল।

'তাঁর পিতা ছিলেন না, আদম (আ)-এর পিতা-মাতা কেউই ছিলেন না। যদি কোনো ব্যক্তির পিতা না থাকার কারণে তাকে খোদা বলতে হয়, তাহলে আদম (আ) ছিলেন বড় আল্লাহ্। এটা আপনাদের বাইবেলে বলে, কুরআন এরকম বলে না। বাইবেল আরেকজন অতিমানব সম্পর্কে বলে 'কিং মালচিসিডেক' সম্পর্কে, যিনি আগমন করেন নি, অবতরণ করেন নি, যার কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি আদমের চেয়েও বড় তাকে নাম ধরে ২৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে মাত্র ৫ বার কেন? যীশু-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

(সে অভিযোগগুলোকে খণ্ডন করার জন্য বারবার তার প্রসঙ্গ এসেছে, এটাও আল-কুরআন আল্লাহর বাণী হবার আরেকটি প্রমাণ। আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ কিতাবে তাঁরই একজন নবীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। যদি এ কিতাব মুহাম্মদ ﷺ-এর রচিত গ্রন্থ হতো তাহলে, তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টাই বেশি করতেন। – অনুবাদক)

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না এবং কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল, তখন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং আমি যদি কোনো (উপস্থিত) ব্যক্তিকে সম্বোধন করি তাহলে আমাকে শুধু বলতে হয় তিনি হে নবী, হে রাসূল! সব সময় তাঁর নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। যদি আমার অনুপস্থিত কোনো বন্ধুকে সম্বোধন করি যে এখানে নেই, তাহলে তার নাম সর্বদা আমাকে নিতে হয়। যেমন জনাব X Y Z যেহেতু কুরআন নাযিলের সময় যীশু সেখানে ছিলেন না, তাঁর নাম নিতে হয়েছে। এভাবেই কুরআনে মূসা (আ)-এর নাম ১৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কি এ কথা বুঝায় তিনি নবী মুহাম্মাদ ﷺ, ঈসা (আ)-এ দুজনের চেয়ে বড়? না বরং তাঁরা দু'জনই অনুপস্থিত ছিলেন। যখনই তাদের কোনো দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে তাঁদের নাম নিতে হয়েছে। যিনি উপস্থিত তাঁর নাম এতবার নেবার প্রয়োজন হয় নি। আশা করি প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন ১১. আস্‌সালামু আলাইকুম, ভাই জাকির, আমার নাম ইসরাত আনসারী এবং আমি একজন বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট, বর্তমানে আমি ইসলামিক স্টাডিজ এম. এ করছি। আপনার প্রতি আমার প্রশ্ন হলো, কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মায়ের গর্ভের শিশুর পুত্র-কন্যা হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেউই অবগত নয়। যা হোক আধুনিক বিজ্ঞান কিছু পরীক্ষার ব্যাপারে এতোদূর অগ্রসর হয়েছে যে, যা দ্বারা মাতৃগর্ভের সন্তানের কন্যা-পুত্র হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। এটা কী বৈপরীত্য নয়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম, বোন! তিনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, কুরআন উল্লেখ করেছে যে, মাতৃগর্ভের শিশুর পুত্র-কন্যা হওয়ার

বিষয়টা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং আজ আমি তাঁর সাথে একমত যে, অনেক ডাক্তারি পরীক্ষা যেমন, এমিওনেটেনসিস, আলট্রাসনোগ্রামী, যা শিশুর পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং এটা কি ভুল নয়— কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভুল নয়?

বোন যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো ৩১ নং সূরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াত :

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার কাছে কেয়ামতের জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি জানেন মায়ের গর্ভে কি আছে, কোনো ব্যক্তি জানে না আগামীকাল সেকি অর্জন করবে, কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু অবগত।

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ এ পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জানে না। তার মূল প্রশ্ন হলো যে, কুরআন বলে, আল্লাহ ছাড়া কেউ মাতৃগর্ভের সন্তানের পুত্র-কন্যা হিসেবে পরিচয় জানে না, তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানা যাচ্ছে।

বোন! ভুল ধারণার কারণ হলো কিছু অনুবাদ, বিশেষ করে উর্দুতে যাতে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া মাতৃগর্ভের সন্তানের পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয় আর কেউ জানে না। আরবিতে পুত্র-কন্যা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ নেই। কুরআনে বলেছেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মাতৃগর্ভে কি আছে তা জানে না।' আল-কুরআন এখানে নারী-পুরুষের উল্লেখ করেনি। এটা শিশু কিরূপ হবে সেদিকে ইঙ্গিত করে। সে কি সৎ হবে? নাকি অসৎ হবে? সে সমাজের জন্য অভিশাপ হবে নাকি আশীর্বাদ? সে কী হবে? সে কি প্রকৌশলী হবে? নাকি ডাক্তার হবে? এবং বিশ্বাস করুন! আপনাদের সকল চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়েও বলতে পারবেন না যে, ঐ ব্যক্তি কি হবে? এটা ভুল অনুবাদ।

পরবর্তী প্রশ্ন আসার আগে, সেটা খুবই ভালো প্রশ্ন, তিনি বলেন যে, এটা ভাইকে বিরক্ত যেন না করে, আপনি যা বলতে চান আপনি মাইকের সামনে আসুন, ভাই এটা বেশি ভালো হয় যদি আপনি মাইকে এসে বলেন। আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই, যদিও তিনি একজন অমুসলিম, সমস্যা নেই। তিনি বলেছেন, হতে পারে আমি ভুল দিকে নিচ্ছি, যদি আরবি মূল ভাষার মধ্যে, আরবি পরিভাষার মধ্যে কঠিন কিছু থেকে থাকে। অমুসলিমদের লিখিত অনেক অভিধান আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লেন লেক্সিকন'। লেন লেক্সিকন দেখুন, অমুসলিমদের লিখিত,

তারা বলবে আল-কুরআনের মূল আরবি টেক্স-এ পুত্র-কন্যার কথা নেই। তারা পুত্র-কন্যার ব্যাপারে বলবে না।

আরেকটি বিষয়, সেটা হলো বিচার দিবস (কিয়ামত) সম্পর্কে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ ধরনের ঘটনা ১৯৯২ সালে ভারতে সংঘটিত হয়। একটা কোরিয়ান চার্চ ছিল, যারা ঘোষণা করলো পৃথিবী ১৯৯২ সালের নভেম্বরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ চার্চের ঘোষণা অনুযায়ী সব লোক সেখানে আসলো, কিন্তু ঐরূপ কিছুই ঘটলো না। আমরা এখনো জীবিতই আছি এবং লোকজন অর্থ নিয়ে দৌড়ালো। পৃথিবী কখন শেষ হবে তা কেউই জানে না।

বৃষ্টি সম্পর্কে, কিছু লোক বলে যে, এটি বিজ্ঞানের দ্বারা উন্নতি লাভ করেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন্দ্রের মাধ্যমে আপনি বলতে পারেন কোথায় এবং কখন বৃষ্টি হচ্ছে। আপনারা জানেন বৃষ্টির পূর্বাভাস কতখানি সঠিক, কতখানি সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী, বিশেষ করে ভারতের। ঠিক আছে, কেউ আমেরিকার নাম নিতে পারে এবং একে সঠিক মনে করতে পারে। যুক্তির খাতিরে এ ব্যাপারে একমত হওয়া যায়। তাদেরকে ঝোলার জন্য রশি দিন। আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র মেঘ দেখে এবং বাতাসের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে তারা বলে থাকে কখন এবং কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে। এটা বড় কিছু নয়, বৃষ্টি তো মেঘের মধ্যেই আছে। এটা এ রকম, ধরুন এক লোক পরীক্ষা দিল, রেজাল্ট একমাস পরে হবে, শিক্ষক উত্তরপত্রগুলো তিন সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা করে জানলেন যে, অমুক প্রথম হচ্ছে ইনি ৯৩ নম্বর পেয়েছেন। এ কারণে যে তিনি পূর্বে জানতে পেরেছেন। এটা বড় কিছু নয়, যেহেতু তিনি উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করেছেন। নোটিশ বোর্ডে ঝোলাবার এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি জানতে পারলেন যে, কে প্রথম হলো, এটা বড় কিছু নয়।

বৃষ্টি মেঘের মধ্যেই আছে। বড় কিছু হতো যদি আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র সঠিকভাবে আজই বলতে পারতো ২০০ বছর পরে কোথায় কখন বৃষ্টি হবে মেঘ না দেখেই। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি কোনো আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র ২০০ বছর পরে কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি হবে তা যদি বলতে পারে। তারা কখনোই এটা করতে সক্ষম হবে না।

কোথায় কোন ব্যক্তি মারা যাবে। কোনো ব্যক্তি বলতে পারে, আমি আত্মহত্যা করবো আমি এখানে মারা যাবো? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এটা করতে ব্যর্থ হয়। বেশিরভাগই এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়। কত লোক আত্মহত্যা করতে চায়? খুবই কম সংখ্যক, একেবারে সামান্য সংখ্যক এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগী তারা বেশির ভাগই ব্যর্থ হয়। বিষ গ্রহণের পর অথবা অন্যদেরকে বলে এবং হাসপাতালে যায়। তারা যখন লাফ দেয় তারা দেখে নিরাপদ অবতরণ কোথায় হয়। এমনকি যদি আপনি

লাফ দেনও এবং আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করতে চান, তিনি আপনাকে রক্ষা করতে পারেন। যদি আপনি মারা যান তাও তাঁর অনুমতিতেই, তার অনুমতি ছাড়া নয়।

সর্বশেষ অংশের কথা, কেউই জানে না, সে কত অর্জন করবে। আপনি বলতে পারেন দেখুন ভাই জাকির আমি জানি যে, আমি মাসে ২ হাজার রূপী আয় করি, দেখুন কুরআনে ভুল আছে। আল কুরআন তাদের আয় সম্পর্কে এখানে বলে নি, অর্থের দিক দিয়ে বলে নি, এখানে تكسب বলা হয়েছে। আরবিতে تكسب শব্দটি ভালো-মন্দ কাজ অর্জনও বুঝায়। এটা শুধু বেতন অর্জনই বুঝায় না। এমনকি আপনি যদি দানও করেন তাতেও আপনি জানেন না কত ছওয়াব পাচ্ছেন। আপনি কখনো জানতে পারবেন না ভালো কাজ করে আপনি কত রহমত লাভ করলেন এবং খারাপ কাজ করে আপনি কত গুনাহ বা 'ঋণাত্মক পয়েন্ট' লাভ করলেন। প্রত্যেকটাই আল্লাহর সংরক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ১২. আপনি জানেন অ্যারন শৌরী ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল ও বই লিখেছে। আপনি কেন তাকে জনসম্মুখে বিতর্কে চ্যালেঞ্জ দেন না?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ইনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, আমি জানি অ্যারন শৌরী ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আর্টিকেল ও বই লিখেছে। কেন আমি তাকে জন সম্মুখে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দিই না।

আমি ঐ সব আর্টিকেল পড়েছি। বেশির ভাগ আর্টিকেলই মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত :

এক. অ্যারন শৌরী নারীদের সম্পর্কে বলছে, যারা তাদের সমঅধিকার পায় নি।

দুই. ইসলাম সম্পর্কে যে, এটা সন্ত্রাসী ধর্ম, নির্দয় ধর্ম এবং কিছু এখানে সেখানের পয়েন্ট, যেমন এক ভাই বললেন, খোদা গণিত জানেন না ইত্যাদি। আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি। বিশ্বাস করুন! তাদের সব, আমি যেমন উল্লেখ করেছি, মূলের বাইরে ভুল অনুবাদ এবং ভুল উদ্ধৃতি। ভাই ঠিকই বলেছেন আমি এটি পরিষ্কার করতে পারি এবং আমি তাই করছি।

প্রশ্নটি যা আসছে, তা হলো অ্যারন শৌরীকে আমি কেন জন সম্মুখে বিতর্কে ডাকছি না, যেহেতু সে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বই লিখেছে।

যদি আপনি তার সর্বশেষ বই "বিশ্ব ফাতওয়া বাস্তব শারিআ" পাঠ করেন, যেটা মুম্বাই থেকে এই সপ্তাহ খানেক আগে বের হয়েছে। এর কভারে সে কুরআনের ৪৮নং সূরা ফাতাহ-এর ২৯নং আয়াতের আরবি দ্বারা সুন্দর নাম দিয়েছে, যাতে বলা হয়েছে :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ـ

অর্থ : মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমানদার কাফিরদের সঙ্গে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

ফুলস্টপ, যদিও সেখানে কোনো ফুলস্টপ নেই, পুনরায় মূল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় মুসলমানগণ অবিশ্বাসীদের ওপর নির্দয়। সে উদ্ধৃতি দিচ্ছে, যদি আপনি মূল অংশটি পড়েন। ৪৮ নং সূরা আল-ফাতাহ্ আয়াত নং ২৫-এ বলা হয়েছে :

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط

অর্থ : তারাই তো কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে এবং বাধা দিয়েছে অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছুতে।

এ অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের হজ করা থেকে বাধার সৃষ্টি করেছিল। আমি জানতে চাই যদি কোনো ব্যক্তি কোনো খ্রিস্টানকে ভ্যাটিকান সিটিতে প্রবেশে বাধা দান করে তাহলে কি সে তাকে ভালোবাসতে পারবে? তাকে আলিঙ্গন করবে? এটাই স্বাভাবিক যে, তাকে ভালোবাসতে পারবে না। ধরুন একজন হিন্দু যদি তার তীর্থস্থান বেনারসে যাবার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তিনি এটা পছন্দ করবেন? না! একইভাবে যদি আপনি মূল আরবি পড়েন, এতে বলা হয়েছে যে, ঐ সব লোক, যারা আপনাকে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং আপনাকে পশু কুরবানী করা থেকে বাধা প্রদান করে, আপনি তাদের ব্যাপারে শক্ত হোন এবং বিশ্বাসীদের ভালোবাসেন।

আমি আপনাকে যে বইয়ের কথা বললাম তার ৫৭১ ও ৫৭২ পৃষ্ঠায় তার খুব প্রিয় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে, তার খুবই প্রিয় আয়াত ৯ নং সূরা তাওবাহ্র ৫নং আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে, নিষিদ্ধ চার মাস পরে অবিশ্বাসীদের ধরুন। ব্রাকেটের মধ্যে হিন্দুদের ধরুন, অবিশ্বাসীদের ধরুন, এবং তাদের হত্যা করুন, তবে যদি তারা যাকাত দেয়, নামায আদায় করে তাহলে তাদের ছেড়ে দিন। এদিকে নির্দেশ করে যে, যদি কোনো মুসলমান কোনো হিন্দুকে পায় তাহলে তাকে হত্যা কিংবা জবাই করবে। কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাকে ছেড়ে দাও। এরপর সে আরো উদ্ধৃতি দিচ্ছে। ৯ নং সূরা তাওবার ১ম আয়াত থেকে। মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল। এ চুক্তি মুশরিকদের দ্বারা ভঙ্গ হয়েছিল। এ কারণে আল্লাহ সাবধান করে দিচ্ছেন।

জিনিসগুলো সোজা রেখে দিন, চারমাসের জন্য অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিন। এতে বলা হয়েছে যুদ্ধকালীন যখন আপনি এ ধরনের অবিশ্বাসীদের পাবেন যারা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তাদেরকে ছিনিয়ে আনুন এবং হত্যা করুন। ধরুন, ভিয়েতনাম ও আমেরিকার মাঝে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন যে, যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাও হত্যা করো। যদি আমি সে কথা আজ উদ্ধৃত করি এবং বলি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'ভিয়েতনামীদের হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও।' এটাই সঠিক হবে যে সে হন্তা। আমি মূল উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মূলে, এটাই স্বাভাবিক যে সৈন্যের নেতা বা প্রেসিডেন্ট সর্বদা বলবে যে, যখনই শত্রু আসবে, যুদ্ধ করতে দ্বিধা করবেন না। এটাই নীতি। সুতরাং কুরআন যদি ঐরূপ বলে, তাতে দোষের কি আছে?

অত:পর ৫৭২ পৃষ্ঠায় আয়াত নং ০৫, সে লাফ দিয়ে আয়াত নং ৭, ৮-এ চলে গেছে। ৬ নং আয়াত বাদ দিয়েছে। আপনি কি জানেন, কেন? ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি এ ধরনের কোনো মুশরিক, অবিশ্বাসীরা নিরাপত্তা চায় তাহলে তাদের দিয়ে দাও, যাতে তারা আল্লাহর বাণী শুনতে পারে এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দান করো। আল-কুরআন বলে নি যে, তাদের নিরাপত্তা দিয়ে দাও, তাদের যেতে দিও না। আল কুরআন বলে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও এমনকি মুশরিকরা যদি ইসলাম গ্রহণ নাও করে। যদি তারা নিরাপত্তা চায় তাহলে তাদের যেতে দিও না বরং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোনো সৈন্য বাহিনীর জেনারেল বলে যে, যখন শত্রু চলে যেতে চায়, তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোন্ সৈন্য বাহিনী ঐরূপ? আমি জানতে চাই, সৈন্য বাহিনীর কোন্ জেনারেল আজ বলবে যে, যদি শত্রু শান্তি চায়, তাকে ছেড়ে দিও না, বরং তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। এটাই যা আল-কুরআন বলছে, মূল উদ্ধৃতি দিয়ে, তার পক্ষের বিষয় যে, মুসলমানরাই নির্দয়–মূলের বাইরে, সকল উদ্ধৃতি মূলের বাইরে।

একইভাবে এ আয়াতগুলো তাসলিমা নাসরিনের মতো লোকদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কেন আমি অ্যারন শৌরীর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হই না। আমি তাসলিমা নাসরীনের ব্যাপারে মুম্বাইতে সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে এক বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। যেটা ছিল প্রেস বিতর্ক, তাদের আয়োজনে। ঐ বিতর্কে যখন আমি তাদের বললাম, আমি বিতর্কটি ভিডিও রেকর্ড করবো, BUJ আমাকে অনুমতি দিল না। আপনারা জানেন বিষয়টা কি ছিল। বিষয় ছিল 'ধর্মীয় মৌলবাদীত্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায় কিনা?' মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বক্তব্য অথচ মুনাফিকেরা আমাকে টেপ রেকর্ড করতে দিবে না? কেন?

আমি তাদের অঙ্গীকার দিলাম, আমি আপনাদের ঐ ক্যাসেটের একটা অনইডিটেড কপি দেখার জন্য দিব। তারা আমাকে অনুমতি দিল না। অনেক চাপ দেবার পর তারা শেষে অনুমতি দিল। আপনারা জানেন কি ঘটেছিল। আল্লাহর রহমতে বাইরে সব লোক ইসলামকে বানানোর জন্য জাকিরকে বানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমার বুদ্ধির জোরে নয়, এটা ছিল তারই রহমতে বিতর্ক খুবই সফল হয়েছিল। এটা এতই সফল হয়েছিল যে, একটা পেপারও রিপোর্ট করে নি।

এ বিতর্কে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ছিলেন ফাদার প্রেইরা, হিন্দুদের পক্ষ থেকে ছিলেন ডা. বেদ ভাইয়াস, ইসলামি দিকে আমি ছিলাম, সেখানে মারাঠি ভাষায় 'লজ্জা' বই-এর অনুবাদক মিঃ অশোক সাহানী ছিল, বিষয় ছিল তাসলিমা নাসরিন। যদি এই ক্যাসেট না থাকতো তাহলে কে এগুলো জানতো? বর্তমানে লাখ লাখ লোক এগুলো দেখছেন; শুধু মুম্বাইতেই নয়, বরং সারা পৃথিবী জুড়ে। তার দ্বিতীয় বিষয় ছিল 'নারী' সম্পর্কে। সব উত্তর ক্যাসেটে দেয়া হয়েছে। যা পরিষ্কার করেছে এ্যারন শৌরীসহ এ ধরনের লোকদের ভুল ধারণাকে।

বিতর্ক সম্পর্কে আমার কথা হল– আমি জানতে চাই, বিতর্কের কি কোনো মূল্য আছে? তার বিতর্কে কোনো লাভ নেই, সে যদি চায় তাহলে বিতর্কে আসতে পারে। আমি স্বাগতম জানাই 'আহলান ওয়া সাহলান' বিজ্ঞ জনসম্মুখে। আমি জনসম্মুখে বিতর্ক করবো, চলমান ভিডিও রেকর্ডারের সামনে, বদ্ধ ঘরে নয়, আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

উপসংহার

ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক শ্রোতাবৃন্দের প্রদত্ত সর্বশেষ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ডা. মুহাম্মদ তাঁকে (ডা. জাকির নায়েককে) ধন্যবাদ দেন তার নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দানের জন্য। ডা. মুহাম্মদ বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও শ্রোতামণ্ডলীকে প্রোগ্রাম সফল করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সময়ের অভাবে প্রোগ্রাম শেষ করার কারণে তিনি দুঃখও প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন যদি প্রোগ্রাম আরো দীর্ঘ করা যেত তাহলে শ্রোতাদের আল-কুরআন সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদনে আরো সুযোগ হতো। যাহোক, তিনি প্রতি রোববারে এ ধরনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য স্বাগতম জানান।

সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?

IS TERRORISM THE MUSLIM MONOPOLY?

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

হাফেজ মোঃ সাইদুর রহমান
বি.এ. (অনার্স) আরবি সাহিত্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ সফিউল্লাহ সফি
বি.এস.এস (অর্নাস) অর্থনীতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?

মোহাম্মদ নায়েক ঃ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম। আল্লাহ আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আজকের এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম। আজকের অনুষ্ঠানের পরিচালনায় আছি আমি মোহাম্মদ জাকির নায়েক। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআনে হাকিম থেকে তিলাওয়াত করছেন ক্বারী রোহান গালিব।

ক্বারী রোহান গালিব :

مِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

(সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩২)

মোহাম্মদ নায়েক : এতোক্ষণ আপনারা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৩২ নং আয়াতের তিলাওয়াত শুনলেন। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

مِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط

অর্থ : যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করলো।

আমি সেসব মুসলিম অমুসলিম পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাকে এ অনুষ্ঠানে 'সন্ত্রাস ও মুসলমান' এ বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিচারক হসবেট সুরেশকে। তিনি ছিলেন মুম্বাই হাইকোর্টের একজন বিচারক এবং ১৯৯১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মানবাধিকার আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক, বিচারক হসবেট সুরেশ ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সাধারণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন আইন বিষয়ক পত্রিকা, সাময়িকী ও সংবাদপত্রে তার লেখা নিয়মিতই প্রকাশিত হয়। তার নতুন বই 'ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাজ হিউম্যান রাইটস' এক বাক্যে অসাধারণ। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক

ফোরামে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৯২-৯৩ সালে মুম্বাই-এর ওপর লেখা তার প্রতিবেদনের জন্য তিনি সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। যার শিরোনাম ছিল 'জনগণের বিচারক'। গুজরাটে মুসলমান গণহত্যার ওপর লেখা তার প্রতিবেদন 'ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি' (মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ) ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে আহমেদাবাদে প্রকাশিত হবার পর তিনি যথেষ্ট পরিমাণ প্রশংসা অর্জন করেছেন। তার প্রতিবেদনে উঠে আসে মুম্বাইয়ের দলিত, কেরালার ছাত্র, গুজরাটের খ্রিস্টান এবং এরূপ আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা বিষয়, যেগুলো সত্যিই দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো। আমি প্রধান অতিথিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

বিচারক হসবেট সুরেশ

বন্ধুরা! আমি শুরুতেই ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিচারক লর্ড টার্নিগের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি একবার একটা কথা বলেছিলেন, 'বিচারকরা অভিনেতাদের মতো অন্যকে খুশি করার জন্য, উকিলদের মতো মামলায় জেতার জন্য, ঐতিহাসিকদের মতো অতীতকে জানার জন্য কথা বলে না; বরং বিচারকরা কথা বলে রায় দেয়ার জন্য।' আমিও একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বটে। কিন্তু টায়ার্ড নই। অবশ্য আমি এখানে কোনো রায় দিব না শুধু কথা বলবো। আমি মানুষের বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই মানুষের অধিকার নিয়ে আগেও কথা বলেছি। যখনই কোনো অন্যায়, বিশৃঙ্খলা চোখে পড়েছে তখনই তার প্রতিবাদ করেছি, তার বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আমি সব সময় চেয়েছি বিচারকরা এসব বিষয়ে কথা বলুক। কারণ, তারা যদি এসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ না করে, তাহলে কে এর প্রতিবাদ করবে? আমাদের কাছে এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে, সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের সরকারই আরো বেশি সহিংসতার জন্ম দেয়। আর এভাবেই এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। এভাবে এ পদ্ধতিতে সন্ত্রাস দমন তথা এ জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

টাডা আইন

১৯৮৪ সালে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেটা করেছিল খালিস্থানিরা। সে সময় সন্ত্রাসী গ্রুপ খালিস্থানিদের বিরুদ্ধে ভারতে বিদ্রোহ চলছিল, তখন আমরা 'টাডা' নামক একটা আইন প্রণয়ন করি যেটা ছিল খুবই কঠোর। আপনারা জানেন যে, টাডার অনেক অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ হয়েছে। এ আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে আটক করা হয়েছে। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমার মনে পড়ে পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন প্রবীণ বিচারক অজিত সিং বেইন্স্ একটা জনসমাবেশে তৎকালীন সময়ে ভারতে চলমান অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি

বলেছিলেন, 'একদিন আমরা এ আইন থেকে মুক্তি পাব। উক্ত 'টাডা' আইনে দেশের সংহতি নিয়ে একটা বিষয় ছিল। সেটা হচ্ছে– দেশের সংহতি নষ্ট হয় এমন কোনো কথা, কোনো মন্তব্য কেউ করতে পারবে না এটা আইনত অপরাধ। তাই বিচারক অজিত সিং আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমরা এ আইন তথা এ অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাব।

তাকে আটক করা হলো এবং তাকে পরানো হলো হাতকড়া। আইনটা এমনই ছিল যে, একজন বিচারকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো হাইকোর্টে। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারকরা জামিন দিতে পারলো না। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন। সেখানেও জামিন বা মুক্তি না পেয়ে তিনি জেলখানার মধ্যে কাটালেন এক বছরেরও বেশি সময়। আর সবশেষে দেখা গেল এটা কোনো কেইস বা মামলা নয়। 'টাডা' আইনের ক্ষমতা বলে পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছিল। সবাই ছিল জেলখানায় কাউকে জামিন দেয়া হয় নি। এ আইনের আওতায় পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর সব নির্যাতন চালাতো। তারপর ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার 'টাডা' নামক এ জঘন্য আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করলো। তখন দেখা গেল হাজার হাজার মানুষের ওপর অত্যাচার অবিচার করা হয়েছে। বাহাত্তর হাজার বন্দিকে মুক্ত করে দেয়া হলো যাদের মামলা, বিচার কিছুই হলো না। শুধুই তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলখানার ভেতরে অত্যাচার সহ্য করেছে।

তাছাড়া এই জঘন্য 'টাডা' আইনে আমরা দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছি মাত্র এক দশমিক আট শতাংশ লোককে। কিন্তু তারপরেও এক সময় এটা বলবৎ ছিল। যার ফলে পুলিশ হয়ে গিয়েছিল স্বৈরাচারী। যা খুশি তাই করতে পারতো, কেউ কিছু বলতে পারতো না। রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ আইনকে ব্যবহার করতো। যেকোনো লোককে আটক করে জেলখানায় বন্দি করে রাখতে পারতো এবং কোনোভাবেই জামিন পাওয়া যেত না। অতঃপর ১৯৯৬ সালে 'টাডা' আইন বাতিল করা হলো কারণ, এর বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আমরা সবাই এর প্রতিবাদ করছি এটা একটা নিষ্ঠুর আইন। এ ধরনের কোনো আইন আমরা চাই না। এ ধরনের আইন দিয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না; বরং আরো বাড়বে।

পোটা আইন

এরপর ঘটলো ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই দুর্ঘটনা। নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঘটে গেল এক প্রলয়ঙ্করী ঘটনা। প্রেসিডেন্ট বুশ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং বললো, যারা আমাদের সাথে নেই তারা আমাদের শত্রু। তখন আমরা আমেরিকা তথা বুশের পক্ষ অবলম্বন করলাম এবং

'পোটা' আইন প্রণয়ন করলাম। এ আইনেও সে একই ঘটনা ঘটলো। পোটা বহুমুখী একটা আইন। এর আওতায় আপনি যে কাউকে আটক করতে পারেন। টাডা আইনের ন্যায় এখানেও অনেক মানুষের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। চাই সে সন্ত্রাসী হোক বা না হোক। এমনকি তারা অনেকেই জানে না তাদের অপরাধ কী? এ ধরনের আইন মানুষের মধ্যে শুধু আতঙ্কই বাড়ায়। এ কথাটা প্রাসঙ্গিক কারণ মানুষ এখন 'পোটা' নিয়ে কথা বলে এবং 'পোটা'র মতো আইন চায় না।

২০০৬ সালে মুম্বাইতে ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ এবং তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করেছে যে, কঠিন কোনো আইন ছাড়া সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। কিন্তু আমি বলি, কঠিন কোনো আইন দিয়ে সন্ত্রাস থামানো যায় না। এদেশ কেন? পৃথিবীর কোথাও এর নজির নেই। আমাদের দেশের (ভারত) এ 'পোটা' আইন নিয়ে (পার্লামেন্ট) সংসদেও বিতর্ক হচ্ছে। বিতর্কের এক পর্যায়ে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে আক্রমণ করা হলো। অবশেষে যখন এ আইনটা পাস করানো হলো, তখন কলকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কেন্দ্রে বোমা মারা হলো। এভাবে ২০০২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আকশারধাম মন্দিরে, ২০০২ সালের ২৪ নভেম্বর রঘুনাথ মন্দিরে, ২ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের ঘাট কুপায় বুলুন্দে, ২০০৩ সালের ২৫ আগস্ট 'গেট অভ ইন্ডিয়ায়' বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ আইন থাকা সত্ত্বেও একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেই চলছে। 'পোটা' আইন দিয়ে কোন্ লাভ হচ্ছে না।

২০০২ সালে তৎকালীন ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, সে বছর জম্মু ও কাশ্মীরে সব মিলিয়ে ৪ হাজার ৩৮টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে অনেক আর্মি, নিরাপত্তা রক্ষী এবং এই আইনটা বলবৎ ছিল। সে সময়েই সেখানে ১ হাজার ৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে যাদের মধ্যে ৫০৮ জন অন্য দেশের নাগরিক। কাশ্মীরে গত ১৭ বছরে এ পর্যন্ত মারা গিয়েছে ৮০ সহস্রাধিক মানুষ এবং হারিয়েও গেছে অনেকে। একই ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবে। সে সময় পাঞ্জাবে খালিস্থানিদের বিদ্রোহ চলছিল। হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে গেছে। কেউ জানেনা তাদের কী হয়েছে। এমন কি কয়েক বছর আগেও 'বিয়াস' নদীর তীরে অনেক লাশ, কঙ্কাল ও মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে।

আমি একবার একটা তদন্ত করতে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে ঘুরে লোকজনের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম সেখানের বেশির ভাগ বাড়িতে বয়স্ক লোকজন, শিশু বাচ্চারা আছে; কিন্তু কোনো তরুণ বা যুবক নেই। তাদের কী হয়েছে তাও কেউ বলতে পারে না। তারা শুধু এতোটুকু জানে যে, গভীর রাতে তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর তারা আর ফিরে আসে নি। এ ঘটনার ৮-১০ দিন পর বিভিন্ন জায়গায় তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এমনই ছিল সেই আইন, যেখানে সহিংসতা ছিল একটি অবিরাম প্রক্রিয়া এবং খুনের পরিবর্তে খুন সেখানে অহরহ ঘটতো। মনিপুর, ছত্রিশগড়, তেলেঙ্গানা এরকম আরো অনেক জায়গায় খুনোখুনি, হত্যাযজ্ঞ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বললেন– 'আমাদের একটা সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ প্রয়োজন'।

অনেকদিন আগে কাশ্মীরে আমরা একটা পরীক্ষা করেছিলাম। তাদেরকে জেলখানার ভেতর আটকে রেখেছিলাম বছরের পর বছর। এরপর পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল। সরকার তাদের মগজ ধোলাই করে বললো, তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের লোকদেরকে বুঝাও, এভাবে যুদ্ধ করতে নিষেধ করো এবং ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব বদলানোর ব্যাপারে সহায়তা করো।' তখন তারা বললো, 'আমরা ফিরে গেলেই আমাদেরকে মেরে ফেলা হবে।' তারপর আমাদের সরকার বললো, আমরা অস্ত্র দেব।' অবশেষে তারা অস্ত্র হাতে ফিরে গেল।

আমার মনে আছে, একবার নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবে 'ডেমোক্রেটিক রাইটস্ অর্গানাইজেশন' (গণতান্ত্রিক অধিকার সংস্থা) একটা প্রতিবেদন ছাপালো। সেখানে বলা হলো যে, পাঞ্জাবে ভোট নেয়া হচ্ছে বন্দুকের মুখে। সেখানে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ আরো অনেক মানুষ, দল, গোষ্ঠির কাছে ব্যাপক অস্ত্র রয়েছে। এক কথায় ভারতের মানুষ এখন বন্দুকের মুখে। সহিসংতার জবাব সহিংসতা দিয়েই দিচ্ছে। এভাবে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব?

ছত্তিশগড়ে অনেক মাওবাদী ও নকশালপন্থীরা আছে। তাদেরকে শেষ করার জন্য প্রায় ৫ হাজার আদিবাসী নিয়ে 'সালওয় জুলুম' নামে একটা বাহিনী তৈরি করা হলো। এর ফলাফলটা দাঁড়ালো আদিবাসীরা সব মারা গেল এবং নকশালপন্থীরা এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের একটু ভাবতে হবে, এখন পর্যন্ত এদেশে কোনো সন্ত্রাসীর প্রকাশ্যে বিচার হয়নি। শুধু হত্যা করা হয়েছে। যেমন মুম্বাইতে ১৯৯৩ সালে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। এর আসল অপরাধী কারা আমরা এখনো তা বের করতে পারি নি। এর পাশাপাশি অনেক লোকজন জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে বছরের পর বছর। কবে তাদের মামলার শুনানি হবে, বিচার হবে, এ ব্যাপারে তারা কিছুই বলতে পারে না। এটাই বাস্তবতা। এছাড়া 'আকশারধাম' মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছিল। এখানে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের মেরে ফেলা হলো। সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হলেও কাজটা আসলে কারা করেছিল তা আমরা জানি না। এ ধরনের কাজই আমরা করে যাচ্ছি। সহিংসতার জবাব দিতে গিয়ে আমরা আরো বেশি সহিংসতার সৃষ্টি করেছি। এভাবেই চলছে দেশের জীবনব্যবস্থা। এমনকি নাইন-ইলেভেনের (১১ সেপ্টেম্বর) পর বুশ সন্ত্রাসের অজুহাতে সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

আফগানিস্তানে হামলা

এ যুদ্ধ ছিল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে। বুশ আফগানিস্তানে বোমা হামলা করলো, অসংখ্য গরিব, অসহায়, নিরীহ নারী পুরুষকে হত্যা করলো কোন্ প্রক্রিয়ায় কেউ বলতে পারে না। ওসামা বিন লাদেন আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। ইরাককেও একই কায়দায় বুশ প্রশাসন কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ করে বসলো। ইরাকে তালেবান এবং ভয়ঙ্কর সব রাসায়নিক অস্ত্র আছে। আর শুধু মিথ্যা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই বুশ ইরাককে প্রতিপক্ষ করে বোমা হামলা ও যুদ্ধ শুরু করলো। অনেক নিরীহ মানুষ সেখানে মারা গেল। এ পর্যন্ত নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী আক্রমণে যত লোক মারা গেছে, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে যত লোক মারা গেছে তার বিশগুণ বেশি মানুষ মারা গেছে শুধু ইরাকে। এভাবেই মানুষ মারা যাচ্ছে। এখন আমরা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করবো কাকে? আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি.... বর্তমান বিশ্বে যদি কাউকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে সেটা হবে জর্জ ডব্লিউ বুশ। তিনি একটা অযৌক্তিক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন, সকল আইন লঙ্ঘন করলো, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনেরও তোয়াক্কা করা হয়নি।

হিন্দু, খ্রিস্টান মুসলমান, নির্বিশেষে আমাদের যে কেউ এ যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে পারে, সে অধিকার আমাদের আছে। কারণ শুধু নিন্দা ও প্রতিবাদ করলেই আমরাও সন্ত্রাসী হয়ে যাব না। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো– সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করা তথা বিশ্বের মাঝে সন্ত্রাসের পরিচিতি তুলে ধরা। আর কীভাবে আপনি সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেবেন? 'টাডা' 'পোটা' এ সমস্ত তথাকথিত আইনেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। শুধু সন্ত্রাসী কাজের সংজ্ঞা দেয়া আছে। আর এরকম কাজের কথা যথা– নরহত্যা, খুন, ডাকাতি, অস্ত্রবাজি, এসব ভারতের পেনাল কোডে আছে। কিছু সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত রয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ তার নিজের সুবিধা মতো এসব কাজকে সন্ত্রাসী কাজ বলে অবহিত করছে। যদি আপনারা সবাই মেনে নেন যে, ইচ্ছেকৃতভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করাই সন্ত্রাসী কাজ, যেটা বেশিরভাগ সংজ্ঞার মূল কথা। তাহলে আমি বলবো গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমার আঘাতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। ৬০ বছর পরেও এখনো অনেক মানুষ সেই বোমার ক্ষত নিয়ে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে। একইভাবে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী দেশ দুটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট বৃটেন। বুশ ও লস্করে-এ-তৈয়বা দু'জনেই হত্যায় বিশ্বাসী। খুনোখুনির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র তাদের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বাজার তৈরির চেষ্টা করছে। এদের দু জনই ক্ষমতার লোভী। তবে একজন অন্যজন

অপেক্ষা শক্তিশালী। এভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপই হয়ে পড়েছে আমেরিকান পলিসির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটা একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এর কোনো শেষ নেই। মানুষ যদি এ সন্ত্রাসে আতঙ্কিত হয়ে থাকে, তাহলে তারা খুশি, এখানেই তাদের সাফল্য ও সার্থকতা। আর এতে করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেটা হচ্ছে সেটা হলো, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার আস্তে আস্তে ভূলণ্ঠিত হচ্ছে। আমরা এখন ধীরে ধীরে একটা সিকিউর সোসাইটির দিকে ধাবিত হচ্ছি। এখানে আপনারা প্রবেশের সময় প্রত্যেককেই চেক করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে নিরাপত্তা তথা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা।

আর এভাবে আমরা নির্মাণ করছি একটা নিরাপদ সমাজ, নিরাপত্তাই যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য, স্বাধীনতা বা অধিকার নয়। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম 'অ্যাডভান্সড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম' চালু হয়েছে। অর্থাৎ মনে করেন আপনি লন্ডনে আছেন, ১৫ মিনিটের মাধ্যমে আপনার সব ইনফরমেশন মুম্বাইতে বা অন্য যে কোনো জায়গায় পাঠানো যাবে। আপনি যেখানে যাবেন পুলিশ সেখানেই আপনার পেছনে থাকবে এবং তারা যা খুশি তাই করতে পারবে। একবার আর্মস্টার্ডামে তারা কয়েকজন লোককে দেখলো। লোকগুলো ছিল একটা প্লেনের মধ্যে এবং তাদের চালচলন, ব্যবহার, কথা বার্তা, পোশাক-আশাক, চেহারা সবই ছিল সন্দেহজনক। তাদের দেখে মনে হচ্ছে আরব। মুখে লম্বা দাড়ি আর মহিলারা বোরকা পরা। তারা বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এ সবই যখন সন্দেহজনক তখন তাদের কাছে মনে হলো নিরাপত্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণে সর্বত্র গোয়েন্দাগিরি বাড়ছে। যার ফলে পুরো দেশ জুড়ে অন্যায় অবিচার বেড়ে চলছে। পত্রিকায় এসেছে যে 'অ্যানটপ হিলে' একটা লাশ পাওয়া গেছে। একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে যেখানে কেউ-ই ছিল না। কীভাবে জানি পুলিশ জানতে পেরেছিল লোকটা পাকিস্তানি এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তদুপরি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সমাজ মেনে নিল। কেউ-ই প্রতিবাদ করেনি। কেন মারা গেল কেউ জানে না। আর পুলিশও এ ধরনের আইন চায় যেখানে প্রমাণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং তারা যে কাউকে কোনো প্রকার অভিযোগ ছাড়া তদন্তের নামে থানায় আটক রাখতে পারে। কিছুদিন আগে আমি সংখ্যালঘু কমিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আইনটা এখানে কী? আপনাকে থানায় নেয়া হলে আপনি যদি প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জবানবন্দি নেয়া হবে। অন্যথায় সন্দেহভাজন হিসেবে কোনো রেকর্ডে আপনার নাম লেখা থাকবে। আপনার নাম তাহলে FIR-এ অর্থাৎ First Information Record-এ থাকবে অথবা অন্য কোনো তথ্য থাকবে। কিন্তু আপনাকে পুলিশ থানায় নিয়ে বলতে পারে না আপনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

আপনি আমাকে চেনেনই না তারপরে আমাকে আটকে রাখলেন, আমার ওপর নির্যাতন করলেন অথচ এ ব্যাপারে কোথাও কোনো এন্ট্রি রেকর্ড নেই। তারপর একদিন আমার সাথে আপনি জুড়ে দিলেন একজন অপরিচিত পাকিস্তানি লোককে। তারপর বললেন এরা দু জনই এক সাথে সন্ত্রাসী কাজ করে। এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম। তাই এখানে নিরাপত্তার নামে পুলিশ যা খুশি তাই করতে পারে। ক্রস ফায়ারে (এনকাউন্টারে) কেউ কেউ মারা যেতে পারে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এখানে কোনো তদন্ত হবে না। আপনার ওপর সব সময় নজরদারি করা সম্ভব। যেমন ধরেন, আপনার ব্যাংক একাউন্ট তথা ব্যাংকের সব লেন-দেন করতে হয় চেকের মাধ্যমে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে মুম্বাইতে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে যে, আপনি স্থাবর সমপ্তি বিক্রি করতে পারবেন না, বাসা ভাড়া দিতে পারবেন না। যদি বাসা ভাড়া দিতে চান তাহলে একজন পুলিশ অফিসারকে সবকিছু জানাতে হবে। এভাবে আমাদের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী এটা চলছে।

উল্লেখ্য যে, 'টাডা' আইনটা করা হয়েছিল যেটা ছিল নিষ্ঠুর ও অন্যায়, তথাপি নিরাপত্তার নামে এটা করা হয়েছিল। মেনকা গান্ধীর সেই ঘটনার পর কেউ এটার পক্ষে ছিল না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এটাকে সমর্থন করেছে। এবারও দোহাইটি ছিল নিরাপত্তা তথা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। তারপর আসলো 'পোটা আইন' এবং সৈন্য বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। এ আইন দিয়ে তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মণিপুর এলাকা ছারখার করে দিয়েছে। তারপরও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আমরা এটা সমর্থন করি। আমরা উদারতা, সামাজিক, ন্যায়বিচার সব কিছুই ভুলে গেছি। তাই আমাদের সবাইকে একথা মনে রাখা দরকার যে, এই বিশৃঙ্খলাকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। তাহলে এখানে সমাধানটা কী? অস্ত্র, সহিংসতা এখানে কোনো সমাধান নয়, কারণ সহিসংতার সমাধান কখনো সহিংসতা হতে পারে না। এখন আমাদের সমাজে এতো সহিংসতা, এতো সন্ত্রাস কেন হচ্ছে? এর পেছনে কারণটা কী? আর আমাদের সরকারকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে, না অস্ত্র দিয়ে, না এসব নিষ্ঠুর আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের সমাজে এখনো অনেক বেশি অন্যায় অবিচার হয়, ভারতের সব জায়গায় অন্যায় হচ্ছে, বড় লোক আর ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা, তারা যা খুশি তাই করে কিন্তু তাদের কিছুই হয় না।

আমেরিকা যে কোনো দেশকে দখল করতে পারে, আন্তর্জাতিকভাবে এর কোনো প্রতিকার নেই। ভারতের বড় লোক আর ক্ষমতাবানরা কিছুই ভ্রূক্ষেপ করে না, তারা যা চায় তাই পায়। কিন্তু গরিব অসহায়দের নিয়ে আমরা অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, নর্মদা বাঁধের কথাই ধরুন। তারা সবাই ঘরবাড়ি, জমি হারিয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এমনকি তাদের কিছুই

অবশিষ্ট রইল না। অবশেষে মুম্বাইতে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ বস্তিতে বসবাস শুরু করলো। আমাদের সরকার ঐ বস্তিগুলো ভাঙছে। অথচ আপনার বাসস্থানের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একজন মানুষ হিসেবেও এটা আপনার মৌলিক অধিকার। আসলে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের অধিকার ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে একথা বলা হয়েছে ২০ নং আর্টিকেলে। মর্যাদার সাথে প্রাসঙ্গিক সব কিছুই আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন। আমাদের পোশাক, বাসস্থান, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের শিক্ষা। কিন্তু আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করছি না যে, সরকার আসলেই কোনো কাজ বা কোনো দায়িত্ব পালন করছে না। বরং ধীরে ধীরে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ কী করবে? যদি আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়, যদি আপনি আদালতে ন্যায় বিচার না পান, আপনি কী করবেন?

অন্ধ্র প্রদেশে হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। বার বার তারা আদালতে আপিল করেছে। সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন, কিছুই করেনি। মানুষ এখন কী করবে? তাদের উপায় কী হবে? এগুলোই এখন প্রশ্ন, যার উত্তর নেই। মনে আছে একবার অরুন্ধতি রায় বলেছিলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যখন মানুষ ন্যায় বিচার পায় না, কোনো সাহায্য পায় না, সে সময় তারা এসব অত্যাচারকে অস্বীকার করতে চায়, রায়টের পরে একবার গুজরাটে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছোট ছোট শিশুদেরকে দেখেছি যাদের মা-বোনদের ধর্ষণের পর পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কেউ তাদের গাইড করেনি, লেখাপড়া শেখায়নি, কেউ তাদের মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য সহযোহিতা করেনি। আতঙ্কটা তখনো ছিল। তারা কি ন্যায় বিচার আশা করতে পারে? আমি অস্ত্রধারণের বিরুদ্ধে কথা বলছি। তবে সরকারের একটা দায়িত্ব আছে তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সরকার যদি ভুক্তভোগীদের সাহায্য না করে, তাহলে তারা নিজ থেকেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। এটাই আসল কথা। অরুন্ধতি রায় যেটা বলেছিলেন, যখন ভুক্তভোগী হতে চায় না তাদের বলা হয় 'সন্ত্রাসী'। আর এভাবেই আমরা বিভিন্ন অন্যায় অবিচারের শিকার হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। আমাদের সরকারের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তবে নিষ্ঠুর কোনো আইন দিয়ে নয়, কোনো একটা বিশেষ জাতির ওপর অত্যাচার চালিয়ে নয়, অবিচার করে নয়। বরং প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, জীবিকা এসব মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এসব অধিকার যদি নিশ্চিত করা হয়, আপনা থেকেই এ সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে, এটুকু বলেই আমি আমার কথা এখানে শেষ করবো। সকলকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : ধন্যবাদ বিচারক হস্‌বেট সুরেশ। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যে অন্যায়গুলো ঘটতে দেখি, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত মতামতের

জন্য। আপনি যেভাবে সত্যকে তুলে ধরলেন, সেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট উপকারে আসবে। এখন আমি আবার ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব দর্শক শ্রোতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের মূল আলোচনার পর থাকবে উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তরপর্ব। সেখানে আপনারা ডা. জাকির নায়েককে প্রাসঙ্গিক যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। পৃথিবীতে এখন সন্ত্রাস যে হারে বেড়ে গিয়েছে তাতে করে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ শান্তিকে ধর্ম আর রাজনীতিকে আলাদা করা কঠিন। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের কারণে পৃথিবীর মানুষ আজ মুসলমানদের ভয় পায়, ইসলামকে ভয় পায়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আমরা সবাই এ কথাই ভাবি সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি? আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েক যিনি একজন ডাক্তার এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বক্তা। তিনি গত ১০ বছরে পৃথিবী জুড়ে এক হাজারেরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন। বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি টিভি চ্যানেলে তার বক্তব্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আজকের আলোচ্য বিষয় 'সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি?' বা 'সন্ত্রাসবাদের জন্য কি শুধু মুসলমানরাই দায়ী' এখন বলবেন ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রদ্ধেয় বিচারক হস্‌বেট সুরেশ, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা এবং আমার একান্ত প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামি সম্ভাষণে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। আপনাদের ওপর দয়া, শান্তি, আর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো বিশ্বে সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি। প্রথমে আমরা বুঝার চেষ্টা করি 'সন্ত্রাস' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী? সন্ত্রাস শব্দটাকে কোনো সংজ্ঞা দেয়া খুবই কঠিন। এর অনেক সংজ্ঞা আছে যেগুলো পরস্পর বিরোধী। সংজ্ঞা জিনিসটা অনেকটা বায়বীয়, এটা বিভিন্ন সময় বদলায় আর বদলানোর কারণ ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হচ্ছে যে 'সন্ত্রাস' হলো কোনো হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করা বা কোনো সরকারকে কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা। এ 'সন্ত্রাস' শব্দটা প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল ১৭৯০-এর দশকে ফরাসি বিপ্লবের সময়। আর এ ১৭৯০-এর দশকে এডমন্ড বার্ক নামে বৃটিশ কূটনীতিক এই শব্দটা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সে সময়ে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন সরকারকে। ১৭৯৩ এবং ১৭৯৪ সালকে বলা হয়ে থাকে সন্ত্রাসের সময়কাল। ম্যাক্সিমিলিয়ান রোবস্‌পিয়ার ছিলেন এ সরকারের প্রধান। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন, গিলেটিনে চড়িয়েছিলেন। ইতিহাস বলে রোব্‌সপিয়ার তখন ৫

লক্ষাধিক মানুষকে আটক করে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। ২ লক্ষাধিক মানুষের হয়েছিল নির্বাসন। আরো ২ লক্ষাধিক মানুষ জেলখানায় অনাহারে অত্যাচারে মারা গেছে। তাহলে বুঝা গেল 'সন্ত্রাস' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদেরকে বুঝানোর জন্য। আজকে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বিশেষত পশ্চিমা মিডিয়ায় একটা বিবৃতি বার বার দেয়া হচ্ছে সেটা হলো– 'সব মুসলমানই সন্ত্রাসী না তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলমান'। এই বিবৃতির এ কথা এখন ভারতেও চলে এসেছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বাইতে বোমা বিস্ফোরণের পর। ভারতবর্ষে বিশেষ করে মুম্বাই-এর লোকজন এ কথাই বলছে বারবার। 'সব মুসলমান সন্ত্রাসী নয় তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলমান।'

সন্ত্রাসের ইতিহাস

আসুন! আমরা দেখার চেষ্টা করি ইতিহাস কী বলে? এই সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে কী তথ্য সংরক্ষিত আছে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এমন কোনো সন্ত্রাসী হামলা খুঁজে পাব না যেটা মুসলমানরা করেছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে সব হামলার কথা বলতে পারবো না; শুধু কয়েকটার কথা উল্লেখ করবো।

সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল অমুসলিমদের থেকে

আমরা জানি ১৮৮১ সালে রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্স বার্গের রাস্তায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি একটা বুলেট প্রুফ গাড়িতে করে ঘুরছিলেন। তখন এক বোমা বিস্ফোরণে ২১ জন নিরীহ পথচারী মারা গেল। এরপর আরেকটা বোমা ফুটলো এবং তিনিও মারা গেলেন। তাকে কোনো মুসলমান হত্যা করে নি, তাকে হত্যা করেছিল ইগনেসি। বুলবুস্ক থেকে আসা একজন লোক। যে ছিল নৈরাজ্যবাদী ও অমুসলিম। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের মিছিলের মধ্যে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল যেখানে ১২ জন নিরীহ মানুষ, ৭ জন পুলিশ এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা (নাম ডি জেন) মারা গিয়েছিল। এ কাজটা মুসলমানরা করেনি যারা করেছিল তারা নৈরাজ্যবাদী ৮ জন অমুসলিম। আর বিংশ শতাব্দীর হামলাগুলো লক্ষ করি ১৯০১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি তাকে 'লিওন' নামে এক নৈরাজ্যবাদী দুবার গুলি করে হত্যা করেছিল এবং সে ছিল অমুসলিম। ১৯১০ সালের ১ অক্টোবর লস এঞ্জেলসে টাইম নিউজ পেপার (বিল্ডিং) ভবনে একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখানে ২১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। এর জন্য যারা দায়ী তারা ছিল জেমস ও জোসেফ নামে দুই খ্রিস্টান।

১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আর্কডিউক ফ্রানজ, ফার্ডিন্যান্ড এবং তার স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এর জন্য যারা দায়ী ছিল তারা 'ইয়ং বসনিয়া' নামে একটি দল যাদের অধিকাংশ ছিল সার্বিয়ান অমুসলিম। ১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিল বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার 'সেইন্ট ন্যাডেলিয়া' চার্চে এখানে ১৫০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল, আহত হয়েছিল ৫০০ জনেরও বেশি। এটা ছিল বুলগেরিয়ার মাটিতে তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আক্রমণ।

আর এ কাজটা করেছিল বুলগেরিয়ার 'কমিউনিস্ট পার্টি'। ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর যুগোস্লাভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডারকে 'ভ্লাদা জার্জিফ' নামে এক অমুসলিম বন্দুকধারী হত্যা করে। প্রথম যে বিমানটি হাইজ্যাক করা হয় সেটা কোনো মুসলমান করেনি। কাজটা করেছিল 'ওরটিজ' নামে এক অমুসলিম ব্যক্তি। সে বিমানটি ছিনতাই করে কিউবাবায় নিয়ে যায় এবং সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখি ১৯৬৮ সালের ২৮ আগস্ট গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন অমুসলিম। ১৯৬৯ সালে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন জাপানি অমুসলিম। একই বছর ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করেছিল তাও একজন অমুসলিম। ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল হয়েছিল ওক্লাহোমা বোম্বিং। সেখানে বোমা ভর্তি একটা ট্রাফ ওক্লাহোমার ফেডারেল ভবনে আঘাত করে। মারা যায় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ, আহত হয় আরো কয়েকশো। প্রথম দিকে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল কাজটা করেছিল 'টিমোথি' ও 'টেরি' নামে ডানপন্থী দলের সমর্থক দুই খ্রিস্টান। এরা বোমার বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কিন্তু মিডিয়া মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই ৮ বছরের মধ্যে ২৫৯টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে শুধু ইহুদি সন্ত্রাসীরা। তাদের অনেক দল ছিল যেমন : ইরগুন, স্টার্নগ্যাং, হ্যাগানা ইত্যাদি।

সন্ত্রাসের হোতা হয়েও ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী নোবেল পুরস্কার পেল

১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মেনাফেম বেগেন-এর নেতৃত্বে ইরগুন কর্তৃক এ বিস্ফোরণটা ঘটে। যেখানে ৯১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। তার মধ্যে ২৮ জন বৃটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদি এবং অন্য আরো ৫ জন। এই ইরগুন গ্রুপ আরবদের ন্যায় পোশাক পরিধান করেছিল, যাতে লোকজন মনে করে আরবরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আর এটা ছিল বৃটিশ ম্যানডেটের বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আক্রমণ। সেই

সময়টাতে মেনাফেম বেগানকে বৃটিশ সরকার এক নম্বর সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করেছিল। কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী কয়েক বছর পর তিনিই হলেন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কিছুদিন পর তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। চিন্তা করুন, যে মানুষটা খুনি, যে মানুষটা খুন করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে সে-ই প্রধানমন্ত্রী হয় ইসরাঈলের, কিছুদিন পর নোবেল পুরস্কার পায় শান্তিতে। আর তখন ইরগুন, হ্যাগানা, স্টার্নগ্যাং এসব সন্ত্রাসী দলও তাদের নেতারা যেমন আইজ্যাক রবিন, মেনাফেম বেগান, এরিয়েল শ্যারন এরা সবাই পরবর্তীতে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা হয়েছিলেন এবং এরা সবাই যুদ্ধ করে ছিল ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য। যদি পৃথিবীর মানচিত্র দেখেন, ১৯৪৫ সালের আগে ইসরাঈল নামে কোনো দেশ ছিল না। এ ইহুদি দলগুলো, খোদ বৃটিশরা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে ডাকতো এরা একটা ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য লড়েছিল। পরে তারা শক্তি দিয়ে ইসরাঈল দখল করে প্যালেস্টাইনদের তাড়িয়ে দেয়। এখন এ লোকগুলোই প্যালেস্টাইনের লোকদেরকে বলছে..... (যাদের দাবিটা আরো বেশি জোরালো?) তাদের দেশ ফেরত চায়। এখন তাদেরকে সন্ত্রাসী বলছে এই ইসরাঈলীরাই।

নিজেদের আবাস ভূমিতে যাদেরকে স্থান দিয়েছিল, তারাই বলে সন্ত্রাসী

চিন্তা করুন, হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদি মেরে বের করে দিয়েছিলেন। তারা প্যালেস্টাইনে কেন যাবে? প্যালেস্টাইনিরাই তাদের জাতি ভাইদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা যদি দেশ চায় তাহলে তাদের জার্মানি অথবা ইউরোপ ফিরে যাওয়া উচিত। চিন্তা করুন যে প্যালেস্টাইনিরা তাদেরকে নিজ ভূমিতে স্বাগতম জানিয়ে ছিল তাদেরকেই তারা আজ সন্ত্রাসী বলছে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনার বাসায় একজন মেহমান এলো। অচেনা সে লোককে আপনি থাকতেও দিলেন। আর কিছুদিন পর সে আপনাকে বের করে দিল। তারপর আপনি দরজার সামনে দাড়িয়ে বলতে থাকলেন আমার ঘর ফেরত চাই। লোকে আপনাকে সন্ত্রাসী বললো, ঠিক এ ঘটনাই ঘটেছে। আজ ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে কী জন্য? তারা তাদের দেশটা ফেরত চায় এটাই তাদের অপরাধ? পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মানুষ নির্বিকারভাবে এ জঘন্য অন্যায় মেনে নিচ্ছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৬৮ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জার্মানিতে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে।

ইটালির 'রেগব্রিগেড' তারাও অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি ১৯৭৮ সালে তারা ইটালির প্রধানমন্ত্রী 'অ্যালডো মোর'-কে অপহরণ করে ৫৫ দিন পর তাকে হত্যা করে। জাপানেও এ রকম সন্ত্রাসী চক্র দল আছে। যেমন : দ্যা জাপানিজ রেড আর্মি, ওম শিন্‌রিফি ও বৌদ্ধ কান্ট প্রভৃতি। তারা একবার নার্ভ গ্যাস

দিয়ে টোকিও পাতাল রেলে হাজার হাজার মানুষকে মারতে চেয়েছিল; কিন্তু ভাগ্য ভাল, তারা খুব একটা সফল হতে পারে নি। সেখানে মারা গিয়েছিল মাত্র ১২ জন। তবে নার্ভ গ্যাসের কারণে ৫ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ এ ঘটনায় আহত হয়েছিল। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা কেউ মুসলিম নয়। তারা সবাই বৌদ্ধ। ইংল্যান্ডে ১০০ বছরেরও বেশি সময় আই. আর. এস (আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি) বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে খোদ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এরা সবাই ক্যাথলিক, তবে তাদেরকে ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না, যদিও তারা অনেক সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। শুধু ১৯৭২ সালেই ৩টা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যার প্রথমটাতে৭ জন, দ্বিতীয়টাতে ১১ জন এবং তৃতীয়টাতে মারা যায় ৯ জন।

১৯৭৪ সালে গিলফোর্ড বারে তারা আরো দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। যেখানে ৫ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে আর আহত হয়েছে ৪৪ জন। বার্মিংহাম বারে একই ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ১৮২ জন আহত হয়। ১৯৯৬ সালে তারা লন্ডনে বোমা ফাটায় যেখানে ২ জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এরপর তারা বোমা ফোটায় ম্যানচেস্টার শপিং সেন্টারে, যেখানে আহত হয় ২০৬ জন। ১৯৯৮ সালে ক্যামব্রিজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে একটা গাড়িতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের একটা বোমা ছিল, এ ঘটনায় আহত হয় ৩৫ জন। সেই একই বছর ৫০০ পাউন্ড ওজনের আরেকটি বোমা একটি গাড়িতে বিস্ফারিত হয়, যেখানে ২৯ জন নিহত ও ৩৩০ জন আহত হয়েছিল। আর এ রেকর্ড বি. বি. সি, সি. এন. এন, অ্যামনেস্টির মতো অমুসলিম মিডিয়া সূত্রে প্রাপ্ত। তবে অনেক সময় সংখ্যাটা কখনো বেশি কখনো কিছুটা কম হয়ে থাকে।

বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন একটা প্রতিবেদনে জানতে পারলাম মারা গেছে ২৯৬ জন। আবার অন্য এক তথ্যে ২৯৩ জন। তাই আমি বললাম ২৯০ জনের বেশি। ২০০১ সালে আই. আর এ বিবিসি-তে বোমা ফাটলো কিন্তু আই.আরকে কখনোই 'ক্যাথলিক সন্ত্রাসী' বলা হয় না। আজকে ইংল্যান্ড সরকার খুব বেশি ভয় পাচ্ছে মুসলমান সন্ত্রাসীদের। আমি ঠিক জানি না এ পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের ইতিহাসে কতগুলো বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে মুসলমানরাই এগুলো করেছে। এমনকি ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনের সেই বোমা বিস্ফোরণের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই তাসত্ত্বেও সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলমানরা এটা ঘটিয়েছে। সেখানে ৫০ জনের বেশি মারা গেছেন। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম মুসলমানরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তারপরেও এটা আই.আর.এ-এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কথা বিস্ফোরণের ধারে কাছেও না। তারা হাজার হাজার মানুষ মেরেছে। তারপরেও ইংল্যান্ড সরকার ভয় পায় মুসলমানদের। আইআরএ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে আছে; কিন্তু বুশের

উপদেশের কারণে টনি ব্লেয়ার মুসলমানদেরকেই বেশি ভয় পায়। ১০০ বছরের পুরাতন আই. আর. এ যেন কোনো সমস্যাই নয়।

'ইটিএ'-এর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি ফ্রান্স আর স্পেনে সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম 'ইটিএ'। তারা এ পর্যন্ত ৩৬টি আক্রমণ চালিয়েছে। আফ্রিকায়ও অনেক সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। তার মধ্যে একটা প্রধান কুখ্যাত দল হলো "লর্ডস্ সালভেশন আর্মি"। এটা একটা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন। তারা বাচ্চাদেরকেও সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আর শ্রীলংকার এলটিটিই-র কথা আপনারা শুনে থাকবেন। তামিল টাইগারস এরা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত, সবচেয়ে হিংস্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি। তাদের সদস্যরা আত্মঘাতী বোমার ব্যাপারেও যথেষ্ট দক্ষ। এমনকি তারা বাচ্চাদের (রেড ডেভিল)-কে কাজে লাগায়, প্রশিক্ষণ দেয়; আত্মঘাতী হামলা ঘটায়।

তামিল টাইগারদের সন্ত্রাসী কাণ্ড

সাধারণভাবে আমরা ফিলিস্তিনি ও ইরাকি আত্মঘাতী হামলাকারীর কথা শুনে থাকি। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যারা আত্মঘাতী হামলাকে জনপ্রিয় করেছে তারা হলো এলটিটিই বা তামিল টাইগারস। এরা হিন্দু কিন্তু ভারতের সাংবাদিকরা তাদেরকে হিন্দু সন্ত্রাসী বলে না; বলে এলটিটিই। ভারতে বেশির ভাগ সন্ত্রাসী আক্রমণের ক্ষেত্রে বলা হয় কাশ্মীরি বিদ্রোহের কথা। সেটা ঠিক বা বেঠিক তা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এর মধ্যে কতবার আমরা শুনতে পাই ... বিচারক সুরেশ নিজেই ভারতে ঘটে যাওয়া অনেক সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা বলেছেন। আমি ঠিক জানি না এ আক্রমণের কতগুলোর কথা আপনারা খবরে পড়েছেন, সুরেশের মতো মানুষ যারা এ অঙ্গনে আছে তারা জানে। কিন্তু জনসাধারণ এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। যখন কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা বলা হয়, বেশির ভাগ সময়ে লোকজন বলে মুসলমান সন্ত্রাসীদের কথা অথচ ভারতে প্রায় সব ধর্মের মানুষের সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। আমরা শিখ সন্ত্রাসীদের বিন্দ্রানওয়ালা গ্রুপের কথা জানি। ভারতের সরকার ১৯৮৪ সালের ৫ জুন পাঞ্জাবে শিখদের স্বর্ণ মন্দিরে আক্রমণ করে এবং দখল করে। সেখানে ১০০ জন মানুষ মারা যায়।

প্রতিশোধ হিসেবে কয়েক মাস পর ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে তার একজন নিরাপত্তা রক্ষী, যে ছিল শিখ। আপনি যদি অমুসলিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দক্ষিণ এশিয়া সন্ত্রাসবাদের ওয়েবসাইটে যান, সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণের তালিকা দেখতে পাবেন। সন্ত্রাসী আক্রমণে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বা অবদান খুবই কম। তবে মিডিয়া বা

গণমাধ্যম এটা যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। যেমন ঃ এটিটিএফ (অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স), এনএলএফটি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অভ ত্রিপুরা) প্রভৃতি এরা অনেক হিন্দু মেরেছে। ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর ৪৪ জন হিন্দু মারা যায় এবং অনেকে আহত হয় এদের আক্রমণে। আসামে আছে 'উলফা' এরা একাই ১৯৯০-২০০৬ পর্যন্ত গত ১৬ বছর সময়ের মধ্যে ইন্ডিয়ার মাটিতে ৭৫৯টি আক্রমণ চালিয়েছে। ৭৫৯টি নিশ্চিত সন্ত্রাসী আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজে শুধু কাশ্মীরিদের আক্রমণই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাকে প্রায়ই বলা হয় ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার জন্য। কাশ্মীর থেকে আমাকে বহুবার বলা হয়েছে, তবে যাব কিনা এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঠিক করলাম সেখানে যাব। অবশেষে সেখানে গেলাম এবং শ্রীনগরে একটা বক্তৃতা দিলাম। সেখানে লোকজন আমাকে জানালো যে, গত ১৪ বছরে সরকার এই প্রথম কোনো বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিল। কাশ্মীরের পোলো গ্রাউন্ডে আমার বক্তৃতা অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ এসেছিল অশান্ত অবস্থাতে। সরকার আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। আমিও ভাবলাম যে মেশিনগান হাতে এ লোকগুলো আমার সাথে কেন? আমি সেখানে গুলমার, পেহেলগা, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিলাম। আমার মনে হয়নি আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। এরপর আমি আসামে গেলাম বক্তৃতা দিতে। সেখানে বিমান বন্দরে নামার সাথে সাথেই দেখলাম চারপাশে নিরাপত্তা রক্ষী। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালাম, সেখানে নিরাপত্তা না থাকলে আমি এখানে আসতে পারতাম না।

আমি জানতাম না আসামে এতো সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। উলফাদের ট্রেনিং দেয়া হয় শুধু মুসলমানদেরকে মারার জন্য। তারা সবাই হিন্দু, মিডিয়ায় এদের নিয়ে কতবার রিপোর্ট হয়েছে। কিন্তু কতজন সেটা খেয়াল করে। কারণ সেটা প্রধান শিরোনাম ছিল না বরং ছোট খবর ছিল। এ দেশের অন্য একটি সন্ত্রাসী দল নকশালপন্থীদের ও মাওবাদীদের কথা আমরা জানি। মাওবাদিরা কমিউনিস্ট। আর ভারতে কমিউনিস্টদের যতগুলো আক্রমণ হয়েছে বেশিরভাগই করেছে মাওয়িটরা, শুধু নেপালেই গত সাত বছরে তারা ৯৯টি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে। আর ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে (ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী) প্রায় ১৫০টি জেলার মাওয়িটরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সন্ত্রাসী ঘটনার এক-তৃতীয়াংশ সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ পর্যন্ত যত মানুষ মেরেছে, যতগুলো আক্রমণ করেছে, কাশ্মীরের সাথে তুলনা করলে কোনো তুলনাই করা যাবে না। তারা ভারত সরকারের জন্য অনেক বড় হুমকি। তারপরও দেখি আমরা, সরকার অনেক বেশি চিন্তিত মুসলমান সন্ত্রাসীদের নিয়ে। এর কারণ হলো বুশ,

কয়েক দিন আগে ৯ সেপ্টেম্বর টাইমস অভ ইন্ডিয়ায় একটা খবরে এসেছে, ৮৭৫টি রকেট গোলা বারুদের একটা ভাণ্ডার যেগুলো মাওয়িটদের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, পুলিশ এগুলো আটক করে এবং বাজেয়াপ্ত করে। সেখানে ৩০টি রকেট লাঞ্চার ছিল।

এখন চিন্তা করুন এটা ভারতের ইতিহাসে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্রের চালান। যেটা সরকারের কাছে ধরা পড়েছে। চিন্তা করুন, ৮৭৫টি রকেট লাঞ্চার যা দিয়ে ইন্ডিয়ার আর্মির সাথেও যুদ্ধ করা যেতে পারে। এ ঘটনায় অন্ধ্র প্রদেশের ডিজিপি হতবাক হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এ রকেট লাঞ্চার দিয়ে তারা যে কোনো থানায় হামলা করতে পারে। কোনো ট্যাংককে ঘায়েল করতে পারে ৬০০ মিটার দূর থেকে। অর্ধ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে তারা ইন্ডিয়ান ট্যাংক বা থানায় হামলা করতে পারে। এতে আমাদের কিছুই করার থাকে না। এতো কিছুর পরেও মানুষ ভয় পায় কাদের? যাদের দাঁড়ি আছে, যারা টুপি পরে, যারা প্যান্ট গোড়ালির ওপর পরে। আসলে তারা রকেট লাঞ্চারের চেয়েও বিপদজনক? কেন? কেন এভাবে টার্গেট করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে? এর উত্তর হলো এ কাজটি করছে পশ্চিমা মিডিয়া। কারণ, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি ও কূটনীতিবিদরা। আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই বলা যায় যে, সন্ত্রাস কেবল মুসলমানদের সম্পত্তি নয় এবং এ সন্ত্রাসের ব্যাপারে মুসলমানদের তেমন বিশেষ কোনো ভূমিকা বা কৃতিত্ব নেই। ইসলামে এটার অনুমোদন দেয়া হয় নি। শুধু তাই নয় ইসলামে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে।

আমি ভিন্ন ধর্ম বিষয়ের একজন ছাত্র হিসেবে একথা বলতে পারবো না যে, সব ধর্মই বলে, আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করবেন না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থগুলো পড়লে যেটা পাবেন সেটা হলো নিরীহ মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়। আর এই সব ধর্মের লীডার বা প্রধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম বলছে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৩২ নং আয়াতে আছে, শুরুতেই যে আয়াতের তিলাওয়াত আপনারা শুনেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে– "যদি কেউ প্রাণের বিনিময় প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।" অর্থাৎ, মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক কোনো মানুষ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন পুরো পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলো। আমি অনেক ধর্মগ্রন্থের কথা জানি সেখানে বলা হয়েছে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়।

কুরআন বলছে, যদি কেউ অন্য কোনো মানুষকে হত্যা করে আর সেটা যদি হত্যাকাণ্ডের অপরাধ অথবা দুর্নীতি বা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে না হয় তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করলো। কুরআন এখানে এক ধাপ

এগিয়ে বলেছে কারণ আমি এমন কোনো ধর্মগ্রন্থের কথা জানি না যেখানে এ কথা বলা হয়েছে– 'নিরীহ মানুষকে হত্যা করা পুরো মানবজাতিকে হত্যার শামিল। কোনো মানুষের জীবন বাঁচানো সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচানো।' 'ইসলাম' শব্দটা আরবি শব্দ 'সালাম' থেকে যার অর্থ শান্তি। অথবা ইসলাম শব্দটি 'সিলম' থেকে নির্গত যার অর্থ– আত্মসমর্পণ করা। এক কথায় ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ দুটি। শান্তি ও আত্মসমর্পণ। সামগ্রিক অর্থে ইসলাম শব্দের অর্থ নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ তথা নিজকে আত্মসমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও নিরীহ মানুষ হত্যা করাকে তীব্র নিন্দা করে এবং জোরালো নিষেধ করে। ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার আক্রমণ, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণে ৫০ জন নিহত, নিউ ইয়র্ক টাওয়ারে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু, ১৯৯৩ সালে মুম্বাই-এর সিরিজ বোমা বিস্ফোণে ২৫০ জন-এর অধিক মানুষের প্রাণহানি, সম্প্রতি ২০০৬ সালের ১১ই জুলাই মুম্বাইতে ২০০ মানুষের প্রাণহানি এ সবই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। নিরীহ মানুষকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো যুক্তিই পাওয়া যাবে না। অনেক মুসলমান অনেক সময় এসব কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে, থেমে যায়। কিন্তু আমি থামবো না; বরং বলেই যাব। আমি অবশ্যই নিন্দা করবো আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, গুজরাটে যে সমস্ত মানুষ মারা গেল এই জঘন্য কাজে, আমরা এখানে এভাবেই থেমে যেতে পারি না। যদিও আমরা জানি কোনো ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করার অনুমোদন দেয় না। আজ আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? যেখানে অহরহ নিরীহ মানুষ মারা যায় এ ধরনের সব সন্ত্রাসের নিন্দা করা উচিত, চাই সেটা মুসলমানরা করুক বা অমুসলিমরা করুক। আমাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই যে, ১১ সেপ্টেম্বর অথবা ৭ জুলাই অথবা মুম্বাই ট্রেনে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এ কাজগুলো মুসলমানরাই করেছে। এটা শুধু একটা অনুমান। তবে সেখানে যাই হোক এবং যে কেউ এটা করুক না কেন এর নিন্দা করা উচিত। কারণ এসবই নিষিদ্ধ। কোনো ধর্মই এগুলোর অনুমোদন দেয় না।

সন্ত্রাস কোনো ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সন্ত্রাসীরা কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী কারণ সব ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। খ্রিস্টান সন্ত্রাসী আছে, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী আছে, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ এভাবে বিভিন্ন ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। তবে বেশির ভাগ ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করাকে সর্বদা নিন্দা করে। যদি আমরা জরিপ করে দেখি, কোন্ মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে, তারা কোন্ ধর্মের অনুসারী? এক নম্বর পৃথিবীর যে লোকটা সবচেয়ে বেশি নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে তিনি কে? তিনি হিটলার। গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে

মেরেছে, আর পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা গেছে প্রায় ৬ কোটি মানুষ। সে কি মুসলমান ছিল? না সে একজন খ্রিস্টান।

জোসেফ স্ট্যালিন ২ কোটি মানুষকে মেরেছিল এবং তার নির্দেশে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। এবার চায়নার দিকে দেখুন, মাওসেতুং চীনে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে। এদের কেউই মুসলমান নয় সবাই অমুসলিম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসোলীনি শুধু ইটালিতেই প্রায় ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। যার নামে ফরাসি বিপ্লবের নামকরণ করা হয়েছে সেই 'ম্যাক্সমিলিয়ান রোব্স্পিয়ার' তার অত্যাচারে ও নির্যাতনে মারা গেছে ২ লক্ষের বেশি মানুষ। আপনারা জানেন অশোক শুধু কলিঙ্গের একটা যুদ্ধেই হত্যা করেছিল এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। এখন প্রশ্ন হলো সেকি মুসলমান ছিল? না সে তো ছিল হিন্দু। আমাদের ধর্মেও বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। যেমন সাদ্দাম হোসেন, সে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল, কিন্তু শুধু ইরাকের ওপর আমেরিকা জাতিসংঘ ও জর্জ বুশের একটা নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু ইরাকেই একটি আঘাতে মারা গেছে ৫০ হাজার শিশু।

ইন্দোনেশিয়ায় জেনারেল সুহার্তো প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। তবে হিটলারের তুলনায় বা আঙ্কেল জো, জোসেফ স্ট্যালিন, ও মাওসেতুং-এর তুলনায় এটা কিছু না এবং এদের প্রত্যেকের কাছেই মুসলমানদের সব হত্যাকাণ্ড একেবারে নগণ্য। আমি একথা বলছি না যে, তারা সবাই তাদের ধর্ম মেনে চলতো। আসলে তারা কেউই ধার্মিক বা তাদের নিজ নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী ছিল না। যদি তাই হতো তাহলে তারা কখনোই এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারতো না। এরপরে আমরা দেখি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলমানদেরও টার্গেট করা হচ্ছে। তাদেরকে 'মৌলবাদী, চরমপন্থী', 'সন্ত্রাসী' ইত্যাদি বলা হচ্ছে। এই 'মৌলবাদী' শব্দটার অর্থ কী? মৌলবাদী শব্দটার অর্থ হলো 'যে মানুষ কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের মূলনীতি অনুসরণ করে।' উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ ভালো বিজ্ঞানী হতে চায় তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। যদি সে বিজ্ঞানের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না। যদি কেউ ভালো গণিতজ্ঞ হতে চায়, তাকে সে ক্ষেত্রে গণিতের মূলনীতি ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে। গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলবাদী না হওয়া পর্যন্ত সে ভালো গণিতজ্ঞ হতে পারে না।

আপনি ঢালাওভাবে বলতে পারেন না মৌলবাদীরা সবাই ভালো অথবা সবাই খারাপ। একটা মানুষ কোন্ ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপরই বলা উচিত। যদি কেউ মৌলবাদী ডাকাত হয়, যার কাজ হলো ডাকাতি করা। সে সমাজের জন্য খারাপ, পক্ষান্তরে কেউ যদি মৌলবাদী ডাক্তার হয় যে হাজারটা মানুষের জীবন

বাঁচাতে সাহায্য করে, সে সমাজের জন্য কল্যাণকর। তাই একটা মানুষ যে ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপর আপনি ভালো-খারাপ বলতে বা মূল্যায়ন করতে পারেন। আমি এখানে আমার কথা বলতে পারি আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান। যে জন্য আমি গর্বিত। কারণ আমি (সাধ্যমতো) ইসলাম ধর্মের সব মূলনীতিই মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটা নীতিও মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে না। তবে এমনটা হতে পারে যে, ইসলামের কিছু মূলনীতি অমুসলিমদের কাছে মানবতা বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি ইসলামের সেই মূলনীতিগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে একটা নিরপেক্ষ মানুষও পাবেন না, যে বলবে, ইসলামের মূলনীতিগুলো মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে।

মৌলবাদ কাকে বলে

এই 'মৌলবাদ' শব্দটা 'অক্সফোর্ড' অভিধানে পাবেন। এ শব্দটা প্রথম ব্যবহার হয়েছিল একদল খ্রিস্টানকে বুঝানোর জন্য। সেটা ছিল বিংশ শতাব্দীতে প্রথমদিকে আমেরিকায় যারা চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল। তাদেরকে বলা হয় 'প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান' বা 'প্রতিরোধকারী খ্রিস্টান'। তারা প্রথম দিকে চার্চে বিশ্বাস করতো যে, বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু পরে তারা আপত্তি জানিয়ে বললো, শুধু বাইবেলের কথাগুলোই ঈশ্বরের নয়; বরং প্রত্যেকটা শব্দই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। এটা একটা ভালো বা ইতিবাচক আন্দোলন। অন্যদিকে যদি কেউ প্রমাণ করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি তাহলে সেই আন্দোলনটা ভালো নয়। অক্সফোর্ড অভিধানে 'মৌলবাদ' শব্দটার অর্থ বলা হচ্ছে মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি, যে কোনো ধর্মের প্রাচীন শিক্ষা বা মতবাদকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে। তবে অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণে পরিবর্তন হয়েছে, নতুন সংস্করণ বলছে যে মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি যে কোনো ধর্মের প্রাচীন শিক্ষা বা মতবাদকে কঠোরভাবে মেনে চলে, বিশেষ করে ইসলাম। শেষোক্ত 'বিশেষ করে ইসলাম' এটা নতুন করে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

যখনই 'মুসলমান' শব্দটা শুনবেন আপনি ভাববেন সে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী। অনেক মুসলমানকেও বলতে শুনবেন, আমি মৌলবাদী বা চরমপন্থী না। কিন্তু আমি বলছি– আমি চরমপন্থী, অর্থাৎ আমি চরমভাবে সৎ, চরম ন্যায়পরায়ণ, চরম দয়ালু, চরম শান্তিকামী ও চরম ক্ষমাশীল। আমি জানি না এগুলোর মধ্যে অপরাধ কী? তবে তা মাঝে মধ্যে হলে চলবে না। যখন আপনার সুবিধা হবে তখন ন্যায়পরায়ণ হবেন আর সুবিধা না হলে বা না থাকলে হবেন না সেটা হতে পারে না।

আপনার চরম ন্যায়বান হতে হবে। আংশিক বা সাময়িক চরম ন্যায়বান হলে চলবে না। আমাদের ধর্মগ্রন্থ মহান আল্লাহর বাণী কুরআনও সেটাই বলে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমি পৃথিবীর সব মানুষকে প্রশ্ন করতে চাই কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন চরম সৎ হওয়া, চরম ন্যায়বান, চরম শান্তিকামী হওয়া অন্যায়। আমাদেরকে চরমপন্থীই হতে হবে। চরমপন্থী মুসলমান হতে হবে। সেটাই হবে সঠিক পথ। চরমপন্থী হলেই আমি একজন ভালো, সত্যিকার মুসলমান হতে পারব। আমি জানি এ শব্দটার এখন ভিন্ন অর্থ করা হচ্ছে। সংজ্ঞা সব সময়ই বদলাতে থাকে।

সুতরাং কুরআনকে আংশিকভাবে মানলে চলবে না, চরমভাবে ও পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ

অর্থ : তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।

আজকে মুসলমানদের বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সহজ সাধারণ সংজ্ঞা হলো যে লোক অন্যকে সন্ত্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন অপরাধী পুলিশকে দেখলে সন্ত্রস্ত বোধ করে তাহলে এ অপরাধীর জন্য পুলিশ হলো সন্ত্রাসী। এভাবে দেখলে আমি বলবো প্রত্যেক মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। যখনই কোনো অপরাধ, কোনো ধর্ষক, কোনো ডাকাত কোনো মুসলমানকে দেখলে সে সন্ত্রস্ত হবে। আর এ কথাই বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে সূরা আনফাল-এর ৬০ নং আয়াতে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ ـ

অর্থ : যারা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রু তাদেরকে সন্ত্রস্ত রাখার জন্য তোমরা সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের অস্ত্র ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ।

যারা মানবতার বিরুদ্ধে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলছে তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করো। আমি, জানি সাধারণ অর্থে 'সন্ত্রাস' শব্দটার অর্থ নিরীহ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা। কোনো মুসলমানেরই উচিত না নিরীহ মানুষকে হত্যা, ভীত-সন্ত্রস্ত করা। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। ৬০ বছর আগে ভারত যখন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো, তখন বৃটিশ সরকার তাদেরকে সন্ত্রাসী বলতো। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা তাদেরকে বলি মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। একই লোক একই কাজ– কিন্তু দুটি আলাদা বিশ্লেষণ। যদি আপনি বৃটিশ সরকারের সাথে একমত হন তাহলে আপনি এ লোকগুলোকে বলবেন সন্ত্রাসী। পক্ষান্তরে আপনি যদি সাধারণ ভারতীয়দের সাথে একমত হন যে, বৃটিশরা ভারতে ব্যবসা করার জন্য এসেছে

আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই। তাহলে আপনি এদেরকে বলবেন দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা। এ বৃটিশ সরকার তারা ভগবত সিং, চন্দ্রশেখর, আজাদ, সুভাষচন্দ্র বোসকে বলে সন্ত্রাসী। আমরা সেটা মানি না। শুধু বৃটিশ আমেরিকানরা বললেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ, তারা যুদ্ধ করেছিল সুবিচারের জন্য। তারা ছিল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, আপনি যদি কোনো মানুষকে কোনো বিশ্লেষণ দিতে চান, তাহলে আপনাকে আগে খুঁজে দেখতে হবে যে, কোন্ উদ্দেশ্যে সে এই কাজ করেছে? আপনাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তথা ১৮৭৫ সালে আমেরিকান বিপ্লবের সময় আমেরিকানরা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল।

আর যে লোকগুলো যুদ্ধ করছিল তাদেরকে বৃটিশ সরকার তখন বলতো সন্ত্রাসী। এ স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন (বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও জর্জ ওয়াশিংটন) বৃটিশ সরকার যাদেরকে এক নম্বর শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করতো। পরবর্তীতে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। উল্লেখ্য যে, একই মানুষ যিনি ছিলেন এক নম্বর সন্ত্রাসী পরে তিনিই হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর তিনিই হলেন জর্জ বুশসহ আমেরিকার সব প্রেসিডেন্টের গড ফাদার। চিন্তা করুন এই একই লোককে বৃটিশ সরকার এক সময় বলেছে সন্ত্রাসী। তারা এখন মিত্র বন্ধু। সময়ের সাথে, ইতিহাসের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে সব কিছু বদলায়। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, যে বা যারাই ক্ষমতায় বসে তারা যে কথাটা বলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়। আজকে আমেরিকাই পৃথিবীর প্রধান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সব পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম সব তাদেরই। তারা যদি কাউকে 'সন্ত্রাসী' বলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়, এটাই বাস্তবতা।

২০০১ সালের ডিসেম্বরে নাইন-ইলেভেনের ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। একটা বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইসলামের আলোকে জিহাদ এবং সন্ত্রাস'। সেখানে আমার কাছে প্রথমে যে প্রশ্নটা এসেছিল সেটা করেছিল আমেরিকার কনসাল জেনারেল পার্থে। তার প্রথম প্রশ্নটা ছিল ডা. নায়েক, আপনার কি মনে হয় ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী? আমি তাকে বললাম, লাদেনের ব্যাপারে আমি জানি না, কখনো দেখা হয়নি, কথা হয়নি, জিজ্ঞাসাবাদও করিনি। সে আমার বন্ধুও নয়, আমার শত্রুও নয়। শুধু বিবিসি, সিএনএন এর বিভিন্ন রিপোর্ট অথবা প্রতিবেদন শুনে আমি উত্তর দিতে পারবো না। যদি বিবিসি, সিএনএন শুনে এর উত্তর দিতে চান, তাহলে আপনাকে বলতেই হবে যে, সে একজন সন্ত্রাসী। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের ৬ নং আয়াতে আছে –

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا .

অর্থ : তোমাদের কাছে যদি কোনো পাপাচারী কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে সেটা যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাও।

আর সে জন্য লাদেনের কথা যদি বলতে হয়, আমি নিশ্চিতভাবে এটা বলতে পারবো না যে, সে একজন সন্ত্রাসী। বিবিসি, সিএনএন- থেকে আমরা জানি যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ইরাকে হাজার হাজার বেসামরিক নিরীহ মানুষের প্রাণহানী ঘটেছে। ধরে নিলাম নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ওসামা বিন লাদেনই করেছে, যেমনটি নিছক অনুমান ভিত্তি করে বলে থাকে। যখন আফগানিস্তানের সরকার প্রমাণ চাইলো জর্জ বুশ প্রমাণ দেখালেন টনি ব্লেয়ার, মোশাররফকে। ধরেন তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম লাদেনই এটা করেছে। কিন্তু এজন্য কি আপনি হাজার হাজার বেসামরিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারেন? সাধারণত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্দি বিনিময় প্রথা থাকে। যেমন ধরেন, একজন লোক একটা দেশে অপরাধ করে অন্য দেশে পালিয়ে গেল, তখন উক্ত আইনের আওতায় তাকে ফিরিয়ে আনা যায়। ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের বন্দি বিনিময় প্রথা চালু আছে। কয়েক বছর আগে সিনেমার একজন সংগীত পরিচালক নাদিম একটা হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত হলে নাদিম ইংল্যান্ডে পালিয়ে যায়। ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের বন্দি বিনিময় প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও যখন নাদিমকে চাওয়া হলো, তারা বললো 'আগে প্রমাণ করো সে অপরাধী।'

ভারত থেকে অনেক লোক, ভারতীয় পুলিশ, আইনজীবীরা সেখানে গেছে; কিন্তু প্রমাণ করতে পারে নি। আমরা জানি ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডিতে হাজার হাজার ভারতীয় মারা গিয়েছিল। আর ইউনিয়ন কার্বাইডের লোকেরা আমেরিকায় চলে গেছে। এখন ভারত সরকার কেন তাদের দাবি করে আমেরিকায় আক্রমণ করছে না? কারণটা কী? এটাতো প্রমাণিত যে, ইউনিয়ন কার্বাইডে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে।

আহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও আজীবন পঙ্গু হয়ে গেছে অনেকে। অনেকের পরিবার শেষ হয়ে গেছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, এখানো তো বন্দি বিনিময় প্রথা আছে। তারপরেও কিছুই হচ্ছে না। এখন আফগানিস্তান আমেরিকার মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা নেই। তারপরও মেনে নিলাম ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে। তার জন্য আপনি হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে তো মারতে পারেন না। সেখানে প্রায় ৩-৫ হাজার আফগানি মারা গেছে। তারপর রাসায়নিক অস্ত্র অনুসন্ধানের অজুহাতে ইরাকে গেল এবং আক্রমণও করলো, কিন্তু আক্রমণের পরেও সেখানে কিছুই পেল না। তারপরেও এখন ইরাক শাসন করছে তারাই। ইরাকের মানুষ এখন

অনেক কষ্টে আছে। সাদ্দামের সময়েও তারা কষ্টে ছিল কারণ সাদ্দাম ভালো মুসলিম ছিল না, সে ইসলাম মানতো না। তার পক্ষে বলছি না; কিন্তু ইরাকের মানুষ সেই সময়ের চেয়ে এখন আরো বেশি কষ্টে আছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হলো 'তেল'। এটা একটা 'ওপেন সিক্রেট' তা সর্বজনবিদিত গোপন বিষয়। তাই আমি আমেরিকার কনসাল জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে সেই সময়েই বলেছিলাম, 'আমার মতে পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ।' আমি প্রায়ই বিভিন্ন বক্তব্যে বলে থাকি। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে একবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম। এটা তখন পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয়েছিল যে, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি মৌলবাদী এবং বুশ এক নম্বর সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসবাদী আসলে কারা

আমি এমন কোনো বক্তার কথা জানি না, যে জনসমক্ষে জর্জ বুশকে এক নম্বর সন্ত্রাসী বলেছেন। আমার জানা মতে নেই, তবে থাকতেও পারে। আর আজকে এটা খুবই কমন, আমি নিজেই প্রায় একশত বিখ্যাত লোকের কথা বলতে পারবো। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিচারক হসবেট সুরেশও এমনই মনে করেন। আমি জানতাম না। আসলে তিনি ন্যায় বিচারক। আমি জানি না তিনি কবে কোথায় প্রথম একথা বলেছিলেন। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ।' বিখ্যাত গায়ক ও আমেরিকার সমাজকর্মী হ্যারি বল ফন্ট বলেছেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ।' ইংল্যান্ডের একজন এমপি জর্জ গ্যালওয়েও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার এই দুই জনের হাতে যতো পরিমাণ রক্ত আছে তার চেয়ে অনেক কম মানুষের রক্ত রয়েছে লন্ডনের বোমা বিস্ফোরণকারীদের হাতে।' তিনি আরো বলেছেন, 'কোনো আত্মঘাতী হামলাকারী যদি টনি ব্লেয়ারকে মেরে ফেলে এবং এতে যদি কোনো নিরীহ মানুষ মারা যায়, তাহলে এতে কোনো অপরাধ হবে না। ভারতের জ্যোতি বসু এই কয়েক মাস আগে জর্জ বুশ যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন, 'এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ।' সবাই বলছে ভারত সরকার কেন জর্জ বুশকে আমন্ত্রণ জানায়? কী জন্য? সন্ত্রাসের কৌশল শেখার জন্য? সম্প্রতি কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল, নোবেল বিজয়ী বেটি উইলিয়াম বলেছেন, 'বুশকে খুন করতে তার ভালোই লাগবে।' জর্জ বুশকে মারতে পারলে তিনি খুশি হবেন। এখানে আমার মত ভিন্ন।

মৃত্যুর কামনাই আদর্শ নয়, বরং হেদায়েত কামনাই আদর্শ

একবার লন্ডনে 'জিহাদ এবং সন্ত্রাস' বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলাম। বক্তব্য শেষে এক তরুণ বললো, 'আল্লাহু আকবর, আমি বুশের মৃত্যু চাই।' সেখানে অনেক

অমুসলিম শ্রোতাও ছিলেন। আমার এতোক্ষণের বক্তব্য সব ম্লান হয়ে গেল। সেই ছেলেকে বললাম, যদি আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ ﷺ-এর ইতিহাস দেখেন, তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করেছিলেন, তখন দু জন উমর ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু। নবীজি দোয়া করলেন তাদের দু জনের মধ্যে একজনকে কবুল করুন, যাতে তারা ইসলামকে সাহায্য করে। এর কিছুদিন পরেই উমর ইবনুল খাত্তাব মুসলমান হয়েছিলেন। আমি এভাবেই আল্লাহর কাছে দোআ করি যে, অন্ততপক্ষে আল্লাহ জর্জ বুশকে হেদায়েত করুন। অথবা যে কোনো একজনকে। চিন্তা করুন জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার ইসলামের ওপর কত অত্যাচার চালিয়েছে তারা যদি হেদায়েত পায় তাহলে কী হবে?

আল্লাহর পথে আহ্বান

আমি একজন দায়ী' বা আহ্বানকারী। এ কাজই আমি করে আসছি। ইসলামের ভালো জিনিসগুলো বুঝানোই আমার দায়িত্ব। ইসলামের ভালো জিনিসটা তাকে বুঝাতে পারবো না কেন? অনেকে আমাকে বলে, আপনি পৃথিবীর অনেক জায়গায় যান, আপনার কি সমস্যা হয় না?, আল্লাহর শুকরিয়া তাঁর অপার অনুগ্রহে আমি কখনোই সমস্যায় পড়ি নি। আমি জানি যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান তারা অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন, যদিও আমার মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে কোট এ পোশাকেও কোনো সমস্যা হয় না। আমার পোশাক পরিচ্ছদ এটা হচ্ছে আমার টার্গেট বা লক্ষ্য। আমি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে সময় কাটিয়েছি। নাইন-ইলেভেনের দু দিন আগেই নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলাম। সেখানে ২ সপ্তাহ ছিলাম। দুর্ঘটনাস্থলে থাকলে সম্ভবত আমাকে আটক করা হতো; কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে বেঁচে গিয়েছিলাম। এরপর গেলাম লন্ডনে। ২০০৩ সালে একটা অ্যাওয়ার্ড নিতে লস্ এঞ্জেল্সে গেলাম। আমি আগেই জানতাম আমাকে আমার পোশাক সম্পর্কে ইমিগ্রেশনে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তারা বললো, 'তুমি কেন এসেছো?' বললাম, পুরস্কার নিতে। কীসের জন্য পুরস্কার? 'তুমি কোনো দাতব্য সংস্থায় কাজ কর? কী পুরস্কার পাবে তুমি? বললাম, 'মানুষকে সেবা করার জন্য।'

জিহাদের আহ্বান কুরআনেই নয়, বাইবেলেও

যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'সত্য কথা বলো, আর সত্যই তোমাকে মুক্তি দেবে।' আমিও সত্য কথা বলি। এজন্য পুরস্কার পাচ্ছি। তারপর আমরা অনেক কথা-বার্তা বললাম, এরপর আমি কাস্টমসে গেলাম। আর ইচ্ছে করেই বললাম, আমি একটা ইসলামী সম্মেলনে এসেছি। ইসলামী সম্মেলন! এখনি চেক কর, তারা আমার ব্যাগ খুললো, প্রথমেই আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখলো 'সন্ত্রাস এবং জিহাদ'। আর

ক্যাসেটের কভারে একটা পিস্তল। তখন কাস্টমস অফিসার বললো, 'তুমি কি জিহাদে বিশ্বাস করো? বললাম 'হ্যাঁ' আমি জিহাদে বিশ্বাস করি, এমনকি যীশুখ্রিস্টও জিহাদে বিশ্বাস করতেন, চেষ্টা করা আর সংগ্রাম করায়। 'না, না, না তুমি কি যুদ্ধে বিশ্বাস করো?' আমি বললাম 'যদি বাইবেল পড়ুন তাহলে বাইবেলেও যুদ্ধের কথা পাবেন, বুক অব আম্বারসে পাবেন ৩১ নং অধ্যায়ের ১-১৯ অনুচ্ছেদে, বুক অব এক্সোডামের ২২ নং অধ্যায়ের ১৮-২০ অনুচ্ছেদে, বুক অব এক্সোডামের ৩২ নং অধ্যায়ের ২৭-২৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। যীশু তাঁর নিজের মুখেই বলেছেন, লুক অব গসপেল : অধ্যায় ২২, অনুচ্ছেদ-৩৬-এ 'তলোয়ার হাতে নাও এবং যুদ্ধে যাও।'

আর তখনই ৮-১০ জন কাস্টমস অফিসার সেখানে জড়ো হয়ে গেল। আর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, স্যার! আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? তখন আমি মোবাইলে আমার লোকজনদেরকে বললাম' চিন্তা করবেন না একটু আটকে গেছি, দাওয়াত দিচ্ছি। আশাকরি সমস্যা হবে না।' আল্লাহর ইচ্ছায় আমি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে অনেক সফর করেছি। আল্লাহর দয়ায় সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া কোনো সমস্যায় পড়িনি। আমি জানি আমার অনেক সহকর্মী যারা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়ে বেড়ান, তারা অনেক সমস্যায় পড়েছেন। তাদেরকে আটক করা হয়েছে, নির্বাসন দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অপার অনুগ্রহ আমি এখনো পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যায় পড়িনি। আমি একজন দায়ী বা আহ্বানকারী হিসেবে যখনই আমি দাওয়াতের সুযোগ পাব সে সুযোগটা গ্রহণ করবো। আমি দাওয়াতে ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিই এবং কুরআনের নিয়ম মেনে চলি।

পবিত্র কুরআনে সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

অর্থ ঃ হে নবী! বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা আসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান।

দাড়ি-টুপি মানেই কি সন্ত্রাসী?

তাহলে আমরা যদি একই কথায় আসি, আমাদের বেশির ভাগ সমস্যাই থাকবে না। আজকের এ আলোচনা অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল আরো একমাস আগে। সে সময় লন্ডনে ছিলাম, সেজন্য বিলম্ব হয়েছে। আমি ১০ আগস্ট যখন লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে পৌঁছলাম, তখনই আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ফোন আসলো। আপনি এখন কোথায়? বললাম কেন? বললো, আপনি এখনো বিমান বন্দরে কেন? কী হয়েছে? বললাম কিছুই হয়নি এখানে। আসলে তখন ২১ জন মুসলমানকে বোমা মারার অভিযোগে আটক করা হয়েছিল যাদের সবারই টুপি দাড়ি ছিল।

আল্লাহর দয়ায় আমি ভালোভাবেই পার পেয়ে গেলাম। কারণ আমার সাথে ক্যামেরাম্যান ক্রুরা ছিল সবাই মুসলমান। আমি সেখানে বার্মিংহামে বক্তব্য দিলাম এবং ব্যাপক সাড়া পেলাম। মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বাইরে গিয়ে শুটিং করতে হতো তাই পরের দিন একটা ইহুদি কবরস্থানে গিয়ে শুটিং, রেকর্ডিং করলাম। সেই ইহুদি কবরস্থানে আমরা ঘণ্টা খানেক থাকলাম। তারপর আমরা ওখানকার এক গির্জায় গিয়ে শুটিং করলাম, খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপরে বিকেলের দিকে আমরা হোটেলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম বার্মিংহামের পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত কোনো পথচারী অভিযোগ করেছিল। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে সাত আট জন সন্ত্রাসীকে, যাদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি। তারা জানে না এ লোকগুলো কারা? আমাদের গাড়ির নম্বর তারা জানে এবং এটাও জানে যে, আমাদের গাড়ির রং সবুজ।

তারা বিভিন্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে ফোন করে বের করার চেষ্টা করলো আমরা কোথায় আছি? তারপর তারা এই হোটেলটা খুঁজে বের করলো। তবে ভাগ্যক্রমে যখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, সেখানে এক লোক নাস্তা করছিল। তার সাথে পুলিশের কথা হলো, তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুসলাম রাজনীতিবিদ। তিনি সেই থানার প্রধানের সাথে এ কথা বললেন যে, আপনি এই সন্ত্রাসী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আপনি আসলে ভুল করছেন। আপনার খেয়াল আছে দুমাস আগে আপনাকে একটা ভিডিও ক্যাসেট দিয়েছিলাম? ডা. জাকির নায়েকের ভিডিও। পুলিশ প্রধান বললেন, হ্যাঁ। ইনি তো সে-ই লোক। সমস্যার সমাধান হলো। যে পথচারী অভিযোগ করেছিল সে হয়তো ভেবেছিল দাড়ি-টুপি মানেই বিপজ্জনক। সাবধানে থাকতে হবে। আবারও আল্লাহর সাহায্য যে, নিরাপদে ফিরে এসেছি অন্যথা আমাকে এখানে দেখতে পেতেন না। আমাদের মুসলমানদের উচিত ভয় না পেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে সত্য কথা বলা। পবিত্র কুরআনে সূরা নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর, যুক্তি দিয়ে ও উত্তম পন্থায়।

যখন কথা বলবেন প্রজ্ঞা দিয়ে কথা বলবেন। পুরো ব্যাপারটা দেখে আমরা এখন বুঝতে পারি যে, সন্ত্রাস তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। আমি যতটুকু বুঝি সন্ত্রাস এখন রাজনীতিবিদদের সম্পত্তি। তাই সে আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা ভারত যে জায়গারই হোক। আগে আমাদের বুঝতে হবে এ সন্ত্রাসের পেছনে কারণটা কী?

আমরা যদি সন্ত্রাস বন্ধ করতে চাই, তাহলে প্রথমে এর পেছনের কারণটা বের করতে হবে। আমি একজন ডাক্তার। আমরা লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করি না; আমরা রোগের কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তারপর জীবাণুটা মেরে ফেলি। এটাই চিকিৎসার নিয়ম।

সন্ত্রাসের ইতিকথা

সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা কী? বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হলো অন্যায়-অবিচার।' যখন একদল মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। আর এটাই হলো সন্ত্রাসের একমাত্র কারণ। যে কোনো দুর্ঘটনা চাই হোক সেটা নাইন-ইলেভেনের ঘটনা, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ, ১৯৯৩ সালে মুম্বাই-এর সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি। এ সবের পেছনে কলকাঠি নাড়াচ্ছে রাজনীতিবিদরা। যখন লন্ডনে ছিলাম, তখন ভাবছিলাম কেন এই ২১ জন মুসলিমকে আটক করা হয়েছে। সরকার বললো, তারা কয়েকমাস ধরে এদের ওপর নজর রাখছিল। কিন্তু কিছু লোকের সাথে কথা হয়েছে যারা এই লোকগুলোকে ভালোভাবে চিনতো। তারা বলেছে অসম্ভব কখনো এমন ছিল না। তখন লোকজন অপেক্ষা করছে কখন তারা এ খবরটা জানতে পারবে। সে সময় ইসরাঈল লেবাননে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে ইংল্যান্ডে এটা নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছিল। তখন মনোযোগটা ঘুরিয়ে দেয়া হলো। ২১ জন মুসলিম বিমানে বোমা মারতে যাচ্ছিল, তাদেরকে আটক করা হলো। অনেক বড় বড় খবর। তাই লোকজন লেবাননে হাজারো মানুষের প্রাণহানি। ভারতের কারগিলের ঘটনা সব ভুলে গেল। এসব হচ্ছে মনোযোগ সরানো রাজনীতি। হোক সেটা আমেরিকায়, হোক ইংল্যান্ড অথবা ভারতে। আসল কারণ রাজনীতিবিদরা। আমরা জানি এদেশে প্রায় ৬০ বছর আগে বৃটিশরা আমাদের শাসন করতো। তাদের প্রধান নীতি ছিল– 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' তথা ভাগ বা পৃথক করো এবং শাসন করো। ৬০ বছর আগে আমরা বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তারা চলে গেছে কিন্তু তাদের নীতি এখনো রয়ে গেছে।

ভোট ব্যাংক সৃষ্টির জন্যই রাজনীতিবিদরা সন্ত্রাস বাধায়

আর আমাদের ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও এই বিভাজনের রাজনীতি প্রয়োগ করছেন। আর এটা করছে ভোট ব্যাংকের জন্য। সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ভারতে। আমাদের এই বিখ্যাত দেশে প্রতিদিন না হলেও প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। আর এর বেশিরভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হলো রাজনীতিবিদরা। ভোট ব্যাংক, ক্ষমতার লড়াই, টাকার জন্য তারাই এসব কৃত্রিম দুর্ঘটনার সূত্রপাত করে। আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে, একজন দায়ী' হিসেবে বিভিন্ন ধর্মের অনেক মানুষের সাথে

আমার কথা, আলাপচারিতা হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে হিন্দু মুসলিম সবাই একসাথে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। আমাদের পারস্পরিক অমিলগুলো যা-ই থাক, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সাথে শত্রুতাভাবাপন্ন সম্পর্ক তৈরি করছে, যাতে করে তাদের ভোট ব্যাংকটা ঠিক থাকে। আর আপনারা দেখবেন যে, প্রায় সব দাঙ্গায় তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ রয়েছে। আমরা জানি কয়েক বছর আগে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ এবং রামের জন্মভূমি নিয়ে একটা রাজনৈতিক গুজব ছিল। আমার প্রশ্ন হলো আমরা হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে কতজন এই বাবরী মসজিদ আর রাম জন্মভূমির কথা জানতাম? রাজনীতিবিদরা এ গুজব ছড়ানোর আগে আমিও কখনো শুনি নি।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বাবরী মসজিদ

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরী মসজিদে জড়ো হওয়া অনেক হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা কেউ কখনো শুনেনি। যখন রাজনীতিবিদরা এই গুজবটা দেশের মধ্যে ছড়ালো, তখন মানুষও খবরটা জানলো। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিল যে, বাবরী মসজিদের কাছাকাছি কোনো লোক জড়ো হতে পারবে না। রাজনীতিবিদের একটা দল রাজনৈতিক একটা গুজব প্রচার করলো। ৬ ডিসেম্বর সেখানে লোকজন জড়ো হলো। সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা ভালো করেই জানে তাদের পেছনে সুপ্রিম কোর্ট আছে। তারা ইচ্ছে করলে খুব সহজেই লোকজনদের সরিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তারা ভাবলো যদি থামাই তাহলে তো ভোট পাব না। সুতরাং লোকজন এখানে জড়ো হতে থাক। তাই হলো। তাদের কথায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। কোনো প্রকার প্ররোচনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে ফেললো। এ খবরটা অনেক সরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছিল। বলুন তো- এই লাঠি আর ত্রিশূল দিয়ে কি মসজিদ ভাঙ্গা সম্ভব? তারা পরিকল্পিতভাবে মসজিদে বোমা ফাটিয়েছিল। সবাই বুঝতে পারবেন, এজন্য আপনাকে বোমা বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। সেখানে বোমা ফোটানো হয়েছিল বলেই মসজিদটা ধ্বংস হয়েছে। লাঠি আর ত্রিশূল দিয়ে তো আর মসজিদ ভাঙ্গা যায় না।

সম্ভবত জর্জ বুশ এ পদ্ধতি দেখেছিলেন। সেজন্যই তিনি নিজের দেশে এরকম অনুরূপ ঘটনা নাইন-ইলেভেন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার সময় এখন নেই-যেটাকে ইনসাইড অভ নাইন-ইলেভেন বা ১১ সেপ্টেম্বরের অভ্যন্তরিন কথা। অনেক আমেরিকানের ধারণা বুশ সম্ভবত এটা দেখেই ধারণাটা পেয়েছিলেন যার প্রতিফলন নিউইয়র্কে ঘটালেন। যাইহোক, এরপর ভারতে রায়ট শুরু হলো পুরো দেশ জুড়েই। যেটা ছিল দেশ বিভাজনের পর

সবচেয়ে বড় রায়ট। পুরো দেশ জুড়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে, যাদের অধিকাংশ মুসলমান। কাকে দোষ দেবেন? ভারতের সাধারণ মানুষকে? এখানে প্ররোচিত করেছে রাজনীতিবিদরাই। লড়ো, অন্য ধর্মের মানুষকে মেরে ফেলো। সাধারণ মানুষ প্ররোচিত হয়ে রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। আমরা জানি, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুম্বাইতে। দেশ বিভাগের সময় মুম্বাইতে যে রায়ট হয়েছিল সেটা ছিল মুম্বাই-এর ইতিহাসে ভয়ঙ্কর রায়ট। সেই সময়েও এতো লোক মারা যায় নি যত লোক ৯২-৯৩ সালের রায়ট-এ মারা গিয়েছিল। পুলিশ চাইলে এখানে খুব সহজেই এটাকে থামাতে পারতো। কিন্তু তারা এটা থামায়নি। বরং চুপচাপ দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিল। কিছু লোক ছিল ভালো যারা সামান্য চেষ্টা করছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ছিল নীরব দর্শক।

আমি এটা জানি যে, পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিবিদরা। তাই পুলিশ ভালো কিছু করতে চাইলে রাজনীতিবিদরা বাধ্য করে। দোষটাও আবার নেতাদের ওপরই পড়ে। পরবর্তীতে দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের শান্ত করার জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করলো এবং এখানে বসালো বিচারক শ্রীকৃষ্ণকে। এই কমিশনটাকে তখন বলা হতো শ্রীকৃষ্ণ কমিশন'। আর আমরা জানি বিচারক শ্রীকৃষ্ণ একজন খাঁটি ধর্মভীরু হিন্দু। একই সাথে তিনি একজন সৎ ও নির্ভীক বিচারক। আমাদের অতিথি বিচারক হসবেট সুরেশের মতো। তিনি যে রায় দিয়েছিলেন ভারত সরকার সেটা সহ্য করতে পারেনি। কয়েক বছর তথা দীর্ঘ সময়কাল ব্যাপী তিনি রায়ট পুরো কেসটাই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। রাজনীতিবিদদের সাথে কথা বললেন, পুলিশের সাথে ২৬টি থানায় গিয়ে বিভিন্ন রেকর্ড দেখলেন, থানার ছোট বড় পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে, ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে কথা বলে অনেক গবেষণার পর তিনি সেটা প্রকাশ করলেন। এই হলো সেই 'ড্যামিং ভার্ডিক্টবাই শ্রীকৃষ্ণ কমিশন'। তিনি এই বইতে লিখেছেন কীভাবে আমরা এ রায়টগুলো ঠেকাতে পারি। তবে সেটা করতে সময় লাগবে। আর এ সময়ের মধ্যে সরকার বললো যা হওয়ার হয়ে গেছে। তারা জানতো যে, যদি তারা এ প্রতিবেদন অনুযায়ী কাজ করে, তাহলে তারা তাদের ভোট ব্যাংকটা হারাবে। প্রথমেই সংখ্যালঘুদের শান্ত করার জন্য একটা কমিশন বানালো। আমি ঠিক বলতে পারবো না, কতগুলো কমিশন গঠন করা হয়েছিল আর কতগুলো কমিশনের কথামতই বা কাজ হয়েছে। বিচারক হসবেট সুরেশ হয়তো বলতে পারবেন।

আমরা ভারতের বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখবো। যদিও এই দেশের মধ্যে পুলিশ, রাজনীতিবিদ ও অন্য নাগরিকরা প্রতারণা করে। তারপরও আমরা আস্থা রাখবো। আমরা জানি যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশকে ছেড়ে দেয়া হবে; কিন্তু তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হলো সেটা কি আর ফেরানো যাবে, এর

প্রতিকার কি সম্ভব? তারপর কয়েক মাস পর আমরা জানতে পারলাম ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ একের পর এক মোট ১৩টি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল মুম্বাইতে। ২৫০ জনের বেশি নিরীহ মানুষ সেখানে মারা গেছে। ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ সেখানে আহত হয়েছে। সরকার বললো যে, সব পরিকল্পিত। বিচারক শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এটা পরিকল্পনা করে করা হয়নি। এটা ছিল মূলত প্রতিশোধ। ১৯৯২-৯৩ সালে মুম্বাই-এর সেই রায়ট-এ মারা যাওয়া দেড় সহস্রাধিক মুসলমানদের চাপা ক্ষোভের প্রতিশোধ এটা। পুলিশ কমিশনারসহ অন্য সকলেই একমত হলো এটা সেই ঘটনার প্রতিশোধ।

১৯৯২-৯৩-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুম্বাই-এর রাস্তায় মুসলমানদের হাঁটা, ট্রেনে চড়া, বাসে চড়া, অমুসলিম এলাকায় যাওয়া খুব কঠিন ছিল। তারা মাথা নিচু করে চুপচাপ চলাফেরা করতো। তারপর ১২ মার্চের সেই ঘটনার পর সবকিছু বদলে গেল। বেশির ভাগ মুসলমানই জানতো যে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। তারপরও যারা বোমা ফাটিয়েছে তাদের ওপর এদের সহানুভূতি তৈরি হলো। তারা এই ভেবে খুশি হলো যে, ইসলামে অন্যায়ের জবাব অন্যায় এটা ঠিক নয়, ইসলাম এই আক্রমণের নিন্দা করে। কারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। কারণ অন্য কেউ অন্যায় করেছে বলে নিরীহ নিরাপরাধ মানুষকে মারতে পারবেন না যদিও অন্য ধর্মের লোক হোক। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ।

মুসলমানদের মধ্যে যারাই এ কাজ করেছে, ২৫০ জনের বেশি নিরীহ মানুষকে মেরেছে ইসলাম তার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। আপনি অন্যায়ের জবাবে অন্যায় কাজ করে কখনো সুবিচার পাবেন না এবং এর কোনো যৌক্তিকতাও নেই। আমরা জানি যে, মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে ঠিক আছে। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখেছেন, যখন ২৫০-এর বেশি পরিবার জানতে পারবে যে, মুসলমানরাই তাদেরকে মেরেছে, তখন তারা কী ভাববে? তারা ভাববে এটা কোনো ধরনের ধর্ম। এই নিরীহ মানুষগুলোর অপরাধটা কী? কেউ যদি অপরাধ করে থাকে, আপনাকে অপমান করে থাকে, তাহলে তাকে চিহ্নিত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। শাস্তি দিন কোনো সমস্যা নেই। সব ধর্মই অনুমোদন করবে। পক্ষান্তরে প্রমাণ ছাড়া নিরাপরাধ মানুষকে যদি শাস্তি দেন, তাহলে সে সারা জীবন ইসলামের শত্রু হয়ে থাকবে। যদি ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে ধরে নিই, তাহলে কাকে দোষ দিব ? আমরা জানি 'নিরাময়ের চেয়ে প্রতিকার ভালো'।

রাজনীতিবীদ ও বিরোধীদলের নেতারা যদি সেই সময়টাতে বাবরী মসজিদ রামের জন্মভূমির গুজব না ছড়াতো, তাহলে ১৯৯৩ সালের এই বোমা বিস্ফোরণ কখনোই ঘটতো না। এছাড়া রাজনীতিবিদরা খুব সহজেই এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে পারতো। কারণ সুপ্রিম কোর্টের রায়, পুলিশ, মিলিটারি সবই তাদের সাথে

ছিল। কিন্তু তারা ভয় পেয়েছিল যদি তারা তাদের ভোট ব্যাংক হারায়। আর এজন্য তারা মসজিদ ধ্বংসে বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, এর জন্য দায়ী সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা। তৃতীয়ত, সাধারণ ভারতীয়রা যারা সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হয়েছিল। হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এজন্য তারাও তথা সাধারণ মানুষও দায়ী। চতুর্থত, পুলিশ। তার কারণ ইচ্ছে করলে এসব দুর্ঘটনা ঠেকাতে বা থামাতে পারতো। এটা তাদের জন্য ছিল খুব সহজ। বিশেষ করে সেই রায়ট থামানো খুব সোজা ছিল। কিন্তু সেটাও তারা করেনি। সন্ত্রাসী আক্রমণ থামানো কঠিন ছিল সেটি আমি পরে বলছি। অল্পসংখ্যক লোক এ অবস্থার মধ্যেও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করেছিল। তবে বেশির ভাগ পুলিশই নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এরা ভয় পেয়েছিল। কারণ তারা রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে গেলে তাদেরকে বদলি করা হয়।

পঞ্চমত, যাদের দোষ দেয়া যায়, তারা হলো যারা বোমাগুলো ফাটিয়েছে। ইসলাম এমন কথা বলে না যে, অন্যায় কাজ করে সুবিচার পাওয়া যায়। এই পাঁচটি দলের সবাই সমানভাবে দায়ী। যদি সন্ত্রাসী আক্রমণ বন্ধ করতে চান, তাহলে মূল কারণটা খুঁজে দেখুন। একটা বিশেষ গোত্রের ওপর অন্যায়-অবিচার বন্ধ করুন, সন্ত্রাসও বন্ধ হয়ে যাবে। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ২০ মার্চ পর্যন্ত গুজরাটে একটি হত্যাকাণ্ড চলেছিল। এ ঘটনায় আগে "সবরমতি এক্সপ্রেস" ট্রেনের একটা বগি পোড়ানো হয়েছিল গোধরা-তে। এর কিছুই গোপনীয় নয় এটা সর্বজনবিদিত গোপন তথ্য। বিভিন্ন রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রমাণ অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, বগিটার ভেতর থেকেই পোড়ান হয়েছিল এবং এটা ছিল পরিকল্পিত। মুসলমানদেরকে উস্কানী দিয়ে জড়ো করা হয়েছিল, কিন্তু তারা হত্যা করেনি, বলা হয় সেখানে ৫৯ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল যদিও এ সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। ধারণা করা হয়েছিল সেখানে কারা মারা গিয়েছিল তাদের অনেককেই জীবিত পাওয়া গেছে। তারপর তাদের বক্তব্যটাও বদলালো। বলা হলো, এটা ভেতর থেকেই করা হয়েছে, বাবরী মসজিদের ঘটনা, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা, গোধরার ঘটনা, সবই ভেতর থেকে।

এখানে যাদের দোষ দেয়া যায় তারা হলেন রাজনীতিবিদরা। তারপর এর পরের দিন থেকে শুরু হলো গুজরাটের নিরীহ মানুষ তথা মুসলমানদের ওপর রাষ্ট্র পরিচালিত একটি হত্যাকাণ্ড। সব কিছুই ছিল পরিকল্পিত। গুজরাটের নিরীহ জনগণকে প্ররোচিত করা হলো, টাকা দেয়া হলো। তারা হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করলো। গুজরাট কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৯৩ জন মুসলিম এবং ২৫৩ জন হিন্দু মারা গিয়েছিল। তবে অনেক মানবাধিকার সংস্থা বলছে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম। কোনো কোনো রিপোর্টে বলছে পাঁচ হাজারেরও বেশি নিরীহ মুসলিম মারা

গিয়েছিল। হাজার হাজার মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হাজারো মুসলমানকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে লুটপাট করে তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার দোকান-পাট, জীবিকার স্থান পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। গুজরাট দাঙ্গায় যতো লোক মারা গেছে, তার চেয়ে অনেক কম মানুষ মারা গেছে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায়। তারপরও জর্জ বুশের মতে গুজরাটের হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী না।

তবে যদি আমেরিকানদের ক্ষতি হয়, তাহলে সেটা একটা সমস্যা। আমরা জানি গুজরাটে হাজারটা প্রমাণ আছে। প্রমাণ দেখতে চান খবরের কাগজে, বুকলেটে যার নাম 'কমিউনালিজম কমব্যাট' এছাড়া, ভিডিও, ভিসিডি, ডিভিডি-তে গুজরাটের হত্যাকাণ্ড আর হত্যাকারীদের সব প্রমাণ। সব প্রমাণ আছে; কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। এমনকি দুঃখের বিষয় আমাদের বিচার ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে। আমার মতে তাদরে উপরও রাজনীতিবিদদের চাপ ছিল। আর তখন এ কারণেই ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট গুজরাটের হাইকোর্টের বিরুদ্ধে একটা মন্তব্য করেছিল যে, তারা পক্ষপাত দুষ্ট ছিল এবং এটা প্রমাণিতও হয়েছিল। এসবই ছিল রাজনীতিবিদদের চাপে। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। আর চিন্তা করে দেখলাম এর কয়েক মাস পরেই আক্শার ধাম মন্দির হত্যাকাণ্ড। দু জন লোককে ধরে মেরে ফেলা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মুসলমান। অভিযোগ করা হলো যে, এ দুজন শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মন্দিরের মধ্যে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। ইসলাম এটার সমর্থন করে না। তাদের হয়তো যুক্তি আছে যে, তাদের চোখের সামনে হাজার হাজার মানুষকে মারা হয়েছে, আমাদের চোখের সামনে মা-বোনদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে। আমরা জানি, যারা দায়ী তারা আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের আশেপাশেই থাকে, সবসময় দেখা হয়। কিন্তু যখন তাদের দেখি তখন অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। এসব ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যখন আইনের কাছে যায়, আইন কোনো সাহায্য করে না, তাই তারা আইনটা হাতে তুলে নেয়।

আমি তাদের কাজকে সমর্থন করছি না। ইসলাম আপনাকে আইন হাতে তুলে নিতে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে অনুমোদন বা সমর্থন দেয় না। শুধু তারাই সমর্থন করে, যারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা বলে, আমাদের মা-বোন ধর্ষিত হয়েছে, অপরাধী আমাদের সামনেই আছে। কেউ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই আইনটা হাতে তুলে নিয়েছি। যদি অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারেন, প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তাকে শাস্তি দেন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারেন না। ইসলাম কোনোভাবেই এটা সমর্থন করে না। কারণ অন্যায় কাজ করে আপনি কখনোই ভালো কিছু পেতে পারেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে ইসলামে এটা অন্যায় অনৈতিক। নিরীহ মানুষ হত্যা করার কথা

চিন্তাও করা যায় না। শ'খানেক মানুষ মারা গেল দুজন লোকের প্রতিশোধের কারণে। এদের আপনজনেরা এখন ইসলামের শত্রু হয়ে যাবে।

এরপর ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বাইতে ট্রেনের ভেতরে একেরপর এক ৭টি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে। এখানে ২০০ জনের বেশি নিহত হয় এবং ৮০০ জনের বেশি আহত হয়। এখানে পুলিশ আর কর্তৃপক্ষ বললো, এ ঘটনাও গুজরাটের সেই রায়েটের হাজার হাজার মুসলমান হত্যার বদলা নিতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তখন বললো যে, এই ঘটনার জন্য দায়ী হলো এল.ই.টি.লঘুর-এ তৈয়েবা। যদি একের পর এক ঘটনাগুলো দেখেন, একই ধারায় এগুলো ঘটছে। এটা কি বন্ধ করা যেত না? এটা খুব সহজ ছিল। এজন্য দায়ী কে? এক নম্বরে সেই রাজনীতিবিদরা যাদের পরিকল্পনায় 'গোধরা'-তে 'সবরমতি এক্সপ্রেস' ট্রেনের সেই বগিটা পোড়ানো হয়েছিল। এ জন্য তারাই দায়ী। দুই নম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই লোকগুলো যারা ইচ্ছে করলে এটা থামাতে পারতো; কিন্তু তারাও এক দলের পক্ষে সে জন্য তারা কিছুই করে নি। তিন নম্বরের গুজরাটের সাধারণ জনগণ যাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানো হয়েছিল এবং তারা এ পদে পা দিয়েছিল এজন্য তারাও দায়ী।

আমরা রেকর্ড থেকে জানতে পারি বেশিরভাগ জায়গায় হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে খোদ পুলিশের তত্ত্বাবধানেই। তদন্ত কমিশন বলছে এজন্য তারাও দায়ী। পাঁচ নম্বরে গুজরাটের বিচার বিভাগ কারণ তারা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ছয় নম্বরে যে লোকগুলো বোমা মেরে অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, ইসলাম এটা সমর্থন করে না তাই তারাও সমভাবে দায়ী। এ ছয় প্রকারের লোকজনই দায়ী। তবে যদি আমরা প্রথম দিনের অন্যায়গুলো ঠেকাতে পারতাম তাহলে এ সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হতো না। আমরা জানি গত এক মাসে অনেক মুসলমানকেই হয়রানি করা হয়েছে যেটা করেছে পুলিশ। এখানে পুলিশ বলছে এ ঘটনা মুসলমানরাই ঘটিয়েছে। এর পেছনে রয়েছে এল.ই.টি লস্কর-এ-তৈয়েবা। আমি বলি এ কথাটা যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাদের ধরে শাস্তি দেন, সমস্যা নেই। কিন্তু আপনারা নিরীহ মুসলমানদেরকে হয়রানি করতে পারেন না। কয়েকশো মানুষকে জড়ো করে আটক করা হয়েছে। তাদের আপনজনেরা কিছুই জানে না। চিন্তা করুন সেই হাজার হাজার আত্মীয়-স্বজনকে হয়রানি করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ২২৫ জনকে অফিসিয়ালভাবে আটক করা হয়েছে যাদের একজনও সরাসরিভাবে এই বোমা বিস্ফোরণে জড়িত নয়। এদের সবাই অন্য কোনো ঘটনার সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। যদি আপনি অপরাধীদেরকে ধরতে চান, যদি প্রমাণ থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু ঢালাওভাবে মুসলমানদের আটক করে আপনারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন? আমি জানি যে, ৩০০-এর বেশি নিরীহ মুসলমানকে 'মালওয়ানিতে' জড়ো করা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

বুদ্ধিমান যে কোনো লোকই বলতে পারে যে, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জনপ্রতি ৩-৪ জন পুলিশ লাগেই। একজন নোট করবে, একজন ভয় দেখাবে, একজন সবকিছু দেখবে। ঠিকমতো জেরা করার জন্য এক থেকে দুঘণ্টা সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞরা বলবেন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা তাই আমি বললাম কমপক্ষে দুঘণ্টা তো লাগবেই। তারা কতজনকে জেরা করতে পারবে? মালওয়ানি থানায় ততজন পুলিশ আছে বা থাকতে পারে? আর একজন কতজনকে জেরা করবে? দশটা, বিশটা, তিরিশটা সেখানে বেশি হলে ১০০ জন পুলিশ হবে এবং তারা ৩০০ জনের বেশি লোক জড়ো করলো। সারাদিন তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখলো। তাদের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছেড়ে দিল। পুলিশদের প্রতি আমার অনুরোধ, মুসলমানদের ওপর কিছুটা বিশ্বাস রাখুন। সম্প্রতি বোমা বিস্ফোরণটার পরে অমুসলিম কিছু লোক এই অনুষ্ঠানটা করেছিল। মুসলমানরাও সেখানে ছিল সন্ত্রাস বিষয়ে এ অনুষ্ঠানে তারা মুম্বাই থেকে দুজন প্রাক্তন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ করেছিল।

একজন প্রাক্তন খ্রিষ্টপুলিশ মঞ্চে আসলেন এবং সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য দোষারোপ করলেন পাকিস্তানের মাদরাসাগুলোকে। দ্বিতীয়জন দোষারোপ করলেন ভারতের মাদরাসা- গুলোকে। তারা বললেন, মাদরাসাগুলোতে থাকা উচিত কম্পিউটার, ইংরেজি। আমিও একমত কিন্তু যদি বলেন যে, ভারতের মাদরাসাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত আছে তাহলে এটা মিথ্যা বললেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শ্রোতাদের মধ্যে একজন আইনজীবী ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি পুলিশ কর্মকর্তাকে বললেন যে, আপনি আমাকে একটা প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে, ভারতের কোনো একটা মাদরাসা কোনো রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত আছে? তিনি বললেন, আমি জানি না, চিন্তা করুন একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা না জেনেই কেমন একটা মন্তব্য করে ফেললেন। এর মাধ্যমে কী বুঝানো হচ্ছে? হিন্দুরা তো এতে করে মাদরাসার বিপক্ষে যাবে। এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য যদি একজন পুলিশ অফিসার করেন সেটা কি তার জন্য শোভনীয়? কিন্তু আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে উক্ত পুলিশ অফিসারের নাম উল্লেখ করিনি।

আমি এমন কোনো মাদরাসার কথা জানি না যেটা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি হয়তো আপনি মানেন না। সেখানে নতুন পদ্ধতি তথা ইংরেজি, কম্পিউটার এগুলোর শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলে তো আপনি তাদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়াতে পারেন না। মাদরাসার লোকদের সাথে আমি কথা বলেছি যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে মাদরাসার উন্নতি প্রয়োজন। তারাও একমত। কিন্তু মাদরাসাগুলোকে সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত করা তো স্পষ্ট মিথ্যা। আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? এসবের মাধ্যমে আপনারা কী

বুঝাতে চাচ্ছেন। আমরা জানি কয়েকশো মুসলমানকে আটক করা হয়। আটকের পর পুলিশ বাসায় বাসায় তল্লাসী চালিয়ে তারা জিহাদের ওপর কিছু বই পেল। প্রমাণ! প্রমাণ! এই বইগুলোই প্রমাণ যে, সে বা তারা সন্ত্রাসী আক্রমণে জড়িত। মুম্বাই-এর মিডিয়া বলেছিল, মোহাম্মদী রোডের বুকস্টলগুলোতে এই একই বই কয়েক বছর ধরেই পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটাই কি অপরাধ? আর এটাই যদি অপরাধ হয় তাহলে বুক স্টলগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না কেন?

আমি এখানে বলতে চাই আপনারা কি জানেন যে কুরআনেও জিহাদের কথা বলা হয়েছে। আর প্রায় সব মুসলমানের বাড়িতে কুরআন শরীফ আছে। তাহলে কি আপনারা মুম্বাই-এর সব মুসলমানকে আটক করবেন? আপনারা কী বুঝাতে চাচ্ছেন? আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে চাই– আপনারা যদি মহাভারত পড়েন, তাহলে মহাভারতে কুরআনের চেয়ে অনেক বেশি খুনোখুনি রক্তপাতের কথা বলা হয়েছে, আপনি যদি তুলনা করেন মহাভারতে যে পরিমাণ রক্তপাতের কথা বলা আছে, সে তুলনায় কুরআনে রক্তপাতের বিষয় অনেক কম।

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা আসলে হলো অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ। অর্জুন বলছে কীভাবে আমার জাতি ভাইদের সাথে যুদ্ধ করবো। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বলতে লাগলো, আমি আমার ভাইদের না মেরে নিরস্ত্র অবস্থায় এখানেই মারা যাব এখনই। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললো, অর্জুন তুমি এতোটা পুরুষত্বহীন হলে কীভাবে? এটা আপনি পাবেন 'ভগবদগীতা'র প্রথম অধ্যায়ের ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে।

কৃষ্ণ আরো বললো, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। আমরা যদি ভগবদগীতা ও মহাভারতে উল্লিখিত যুদ্ধের পেছনের কারণগুলো দেখি, সব যুদ্ধেরই কারণ ছিল সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব। সব ছিল ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের, সত্যের সাথে অসত্যের যুদ্ধ। ভগবদগীতা আর মহাভারত বলছে, যদি তোমাকে যুদ্ধ করতে হয়, যুদ্ধ কর মিথ্যার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। হোক সে তোমার ভাই, হোক তোমার আপনজন। একই কথা কুরআনও বলছে। এখানে আমি একটা কথা বলবো যে, পুলিশ সদস্যদের উচিত হবে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের রীতি নীতিগুলো ভালোভাবে জানা। আমি নিজে যখনই সুযোগ পাই জানার চেষ্টা করি। গত কয়েক বছর আমি অনেক পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি, এমনকি কয়েক বছর আগে হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে একশতের বেশি আইপিএস, ডিআইজি, ডিজি, ন্যাশনাল একাডেমীর পরিচালকসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমার কথা শুনে হতবাক হলেন। তাই বিভিন্ন ধর্মের রীতি-নীতি সম্পর্কে আমাদের সবারই কিছু জানা উচিত।

আমি যদি এখানে এখন মহাভারত আর ভগবদগীতার শ্লোকগুলো পেছনের তথা প্রেক্ষাপট উল্লেখ ছাড়াই বলি, তাহলে এখানেই একটা রায়ট বেঁধে যাবে। তাই সকলের নিজের ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মগুলোও বুঝতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাহরাইন, সৌদি আরব, আরব-আমিরাত বিভিন্ন দেশের মিলিটারি ও পুলিশের সাথে আমার অনেক কথা হয়েছে। বিশেষ করে অমুসলিম পুলিশদের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। ইসলামের সাথে তাদের পরিচয় করাতে পারি। কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামকে চেনে। তাই আমি বলবো আমাদের একে অন্যকে বুঝতে হবে। আমাকে এর আগেও অনেক আইনজীবী বলেছেন যেটা বিচারক সুরেশ বললেন যে তাদের ওপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের অনেককে সাদা কাগজে এমন বিষয়ে সই করতে হয়েছে যে কথা জানে না।

আপনারা যদি জানেন কে অপরাধী এবং যদি এটা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্তদেরকে আলাদা করে অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে শাস্তি দিন। আমরা এটার বিপক্ষে না। তবে যদি আপনি দশজন সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে আটক করেন, তাহলে আপনি ঐ দশজন সন্ত্রাসীকে ধরতে পারেন বা না পারেন এটা নিশ্চিত আপনি আরো অনেককে সন্ত্রাসী বানালেন। একজন পুলিশ কর্মকর্তা একদিন বললেন, জাকির ভাই, আমি খুব খুশি হবো যদি আপনি হিন্দি ও উর্দুতে বক্তব্য রাখেন, তাহলে ভারতের সবাই শুনবে এবং বুঝতে পারবে। তখন আমি বলিনি এই কয়েক বছর হলো আমি বলা শুরু করেছি। সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের অনেকেই এটা বলেছে। আর তারা জানে যে, আল্লাহর অসীম দয়ায় আমার বক্তব্য শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ আসে।

আমি যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলাম অফিসিয়াল অতিথি হিসেবে মন্ত্রীদের সাথে আমার দেখা করতে হয়েছে। এমনকি তৎকালীন কাশ্মীর গভর্ণর সাকসেনা আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন এবং দাওয়াতও দিলেন। আমার একেবারেই সময় নেই, তারপরেও সময় বের করতে হবে। দুপুরের দাওয়াত ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সকালে গেলাম। এ গভর্ণর আর্মিতে ছিলেন। সম্ভবত কর্নেল মেজর বা এ জাতীয় কোনো পদে হবেন। আমরা দুজনে কাশ্মীরের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম, কয়েক বছর পর তিনি মহারাষ্ট্র রাজধানী মুম্বাইতে আসলেন। এবারও দেখা করতে চাইলেন। আমাকে গভর্ণরের বাসভবন 'রাজভবন'-এ ডেকে পাঠালেন। আমিও দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, ডা. জাকির, কাশ্মীরে আপনার বক্তব্যের যে প্রভাব, মানুষ যেভাবে আপনাকে মানে, আমরা চাই আপনি আবার আসেন আমাদের রেডিও টিভিতে অনুষ্ঠান করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম যে, আমার বক্তব্যে কী কাজ হবে? আমি জানি না কুরআন হাদীসে কোথাও এমন কোনো কথা আছে কিনা, যেখানে নিরীহ নিপরাধ মানুষকে

হত্যা করার সমর্থন দেয়া হয়েছে। আপনি কোনো নিরীহ মানুষকে মারতে পারেন না এমনকি যারা আপনাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার অবিচার করে সেই ধর্মের লোক হলেও। কিন্তু অনেক নিরীহ মুসলমানকে হয়রানির শিকার করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে এসব কিছুর পেছনে আছে লস্কর-এ-তৈয়বা। পুলিশ কখনো কখনো বলছে যে, স্থানীয় লোকজনও এটার জন্য দায়ী। জড়িত তা না হলে বোমা বিস্ফোরণগুলো হতোই না। চিন্তা করুন সবাই যদি লস্কর-এ-তৈয়বার সাথে জড়িত থাকে এবং হাজার হাজার মানুষকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন, অত্যাচার করেন সঙ্গে সঙ্গে নতুন রিক্রুট পাবেন। পুলিশ লস্কর-এ-তৈয়বাকে সাহায্য করেছে। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি চাইনা পুলিশ আমাকে ভুল বুঝুক। না হলে কালকেই আমাকে আটক করতে আসবে।

ধরুন, আমি মেনে নিলাম যে, আপনার অনুমানটাই ঠিক। লস্কর-এ-তৈয়বার সাথে জড়িত আর স্থানীয় লোকজনও জড়িত। আপনাদের উচিত হবে মুসলমানদের কিছুটা হলেও বিশ্বাস করা; কিন্তু এভাবে হাজার হাজার মুসলমানকে এক জায়গায় জড়ো করার অর্থ কী? আমরা জানি অপরাধীদের ধরা খুব কঠিন। বিশেষ করে এই বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে নিখুঁত নির্ভুলভাবে। পুলিশী ভাষ্য অনুযায়ী এর পেছনে দক্ষ লোক ছিল। আমরা আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি যে, অপরাধী চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আপনারা কিছু নিরীহ লোককে বেছে নিলেন। এই পদ্ধতিটা কি যৌক্তিক? এ পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় বক্তব্যে কাজ হবে? খুব বেশি হলে আমার কথাগুলো শুনবে ২-৩ পার্সেন্টি লোক। সর্বোচ্চ ৫% তার বেশি নয়।

আমাদেরকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এখানে মূল কারণটা কী? আর পুলিশের উচিত হবে মানুষের আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করা। যদি এই বিশ্বাসটা না থাকে, তাহলে কীভাবে তারা সন্ত্রাস ঠেকাবে। যদি আপনারা শ্রদ্ধা পেতে চান, অন্যকে সম্মান করুন। তবে অনেক পুলিশ কর্মকর্তাও আছেন, যারা মানুষ বিপদে পড়লে সাহায্য করছে। কিন্তু তাদের সাধারণ প্রকৃতি হলো ওহ আপনার দাড়ি আছে! আপনি প্যান্ট পরেছেন গোড়ালির উপরে, আপনার মাথায় টুপি, এভাবে বিব্রত করা, এরকম কোনো নিয়ম আছে কি যে, সন্ত্রাসীদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি থাকবে, প্যান্ট পরবে গোড়ালির ওপরে, আর এগুলো থাকলেই সে সন্ত্রাসী? তাহলে আমি তো এক নম্বর সন্ত্রাসী। এসবের মাধ্যমে আসলে আপনারা কী বুঝাতে চাচ্ছেন? ইসলাম ধর্মটাকে আপনাদের ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। একই কথা বলেছেন উইলিয়াম ড্যাল্‌রিম্‌পল আমেরিকার সরকারকে যে আপনারা ইসলামকে বুঝেন না, জর্জ বুশ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। এটি কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তিনি যদি কিছুই না জানেন, না বুঝেন তাহলে কিভাবে এটার সমাধান করবেন।

•

আর জুলিও রোবোরো-এর কথা অনুযায়ী যেটা ৯ সেপ্টেম্বরের হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তিনি সেখানে বলেছিলেন, যত বেশি নিরপরাধ লোককে আটক করা হচ্ছে, সফল হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক ততটাই কমে যাচ্ছে। যত বেশি নিরীহ লোককে আটক করবেন, আসল অপরাধীদের ধরতে পারার সম্ভাবনা ততটাই কমে যাবে। ২০০৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর মুম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার এ. এন. রায় একটা ভালো কাজ করেছিলেন। তিনি প্রায় শ'খানেক মুসলিম নেতাদের একটা চিঠি দিয়েছিলেন এ বলে যে, তদন্ত নিরপেক্ষভাবেই হচ্ছে, মুসলিমদের কোনো প্রকার হয়রানি করা হচ্ছে না। আমিও একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তিনি তার চিঠিতে আরো বলেছিলেন– আমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে, প্রশ্ন থাকে, তাহলে যেন আমরা তার সাথে বলি। সত্যিকারার্থে এটা ভালো পদক্ষেপ। তাই আমি আশা করি এই চিঠিগুলো যেন শুধু লোক দেখানো কথাই না হয়। নিরীহ মুসলিমদের যেন আসলেই হয়রানির শিকার হতে না হয়। আপনারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করতে চান, তাহলে চেষ্টা করুন। যাতে মুসলমানদের বিশ্বাসটা অর্জন করা যায়। আর তখনই একমাত্র আসল অপরাধীদের ধরতে পারবেন। আর আসল অপরাধীদের ধরতে পারেন। তারা যে-ই হোক অবশ্যই তাদের শাস্তি দেয়া উচিত।

আমরা জানি যে, বেশির ভাগ মুসলমানকে ধরা হচ্ছে। তারা যুক্তি দিয়েছিল যে, পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের ঘটনায় আটককৃতদের বেশির ভাগ হলো শিখ, আসামে বেশির ভাগ হিন্দু, তামিলনাড়ুতে বেশির ভাগ এল.টি.টি.ই তারাও হিন্দু, একইভাবে মুম্বাইতে মুসলমান। কারণ অনেকে মনে করেন যে, এখানে পাকিস্তান আর কাশ্মীর আছে তাই তাদের অধিকাংশ হবে মুসলিম। আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যদি পাঞ্জাবে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়, তাহলে পাঞ্জাবের বেশির ভাগ মানুষ শিখ তাই, শিখদের এখানে আটক করা হবে এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে সংখ্যাধিক্য বিচারে আসামে তামিলনাড়ুতে হিন্দুদের আটক করা হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুম্বাইতে বেশির ভাগ মানুষ কি মুসলমান? মুসলমানরাই এখানে সংখ্যালঘু। তাহলে কেন তাদেরকেই আটক করা হচ্ছে? যদি আপনাদের মনে হয় যে, কাজটা করেছে কাশ্মীরের বিদ্রোহীরা, যদি প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনি কী ভাবেন এল.টি.টি.ই মুম্বাইতে আসতে পারে না? আপনারা বলতে পারেন না যে, এই কাজটা অবশ্যই মুসলমানদের। আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলে আপনারা প্রমাণ ভিত্তিক বিচার করুন। অনর্থক নিরীহ মানুষদেরকে আর হয়রানি করবেন না।

কয়েক মাস আগে মহারাষ্ট্রের এ. টি. এস. এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬ জনের একটি হিন্দু উগ্রবাদী দলকে আটক করা হয়েছে। যারা তিনটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত। এর একটি ছিল পার্বনীর মসজিদ এবং অপর দুটি ছিল যথাক্রমে 'জালনা' ও 'পুনা' মসজিদ। আর কিছুদিন আগে ৬ এপ্রিল এক জায়গায় ভুলক্রমে

একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ভুলের কারণে তৈরির সময় বোমাটি ফেটে যায়। নিহত হয় ৪ জন এবং আহত হয় ১১ জন। তদন্ত করে দেখা গেলো তাদের অনেকেই সেই উগ্রবাদী হিন্দু দলের সদস্য। পুলিশ জানতে পারলো যে, তারা পরিকল্পিতভাবে শিখদের ছদ্মবেশে মসজিদে আক্রমণ করবে।

আর তখন মুসলমান ও শিখদের মধ্যে একটা গোলমাল চলছিল। একটা শিখ মেয়ে আর একটি মুসলিম ছেলে বিয়ে করা নিয়ে উত্তেজনা। তারা শিখদের ছদ্মবেশে এই কাজটা করে ফায়দা নিতে চেয়েছিল। এমন অনেক ঘটনার কথা আমরা জানি, যেখানে হিন্দুরা মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি নিয়ে, তাই বলতে পারেন এখানে মুসলমানরাই জড়িত, হতে পারে, আমি একেবারে না করছি না। এইতো মাত্র কয়েকদিন আগের শুক্রবারে ৮ সেপ্টেম্বর ৪টা বোমা ফুটেছিল 'মালেগাও'তে। একটা মসজিদের সামনে আর একটা কবরস্থানে, এখানে ৩৫ জন মুসলমান মারা গেছে, আহত হয়েছে ১০০ জনেরও বেশি মুসলমান। আবারও প্রধান সন্দেহভাজন এল. টি. টি. ই হতে পারে তবে প্রধান নয়। চিন্তা করুন আসলে এটা একটা খেলা তথা নামের খেলা। যদি আমেরিকায় যান সেখানে আল কায়দা আর এখানে এল. টি. টি. ই।

৬ সেপ্টেম্বর ডি.এন.এ পত্রিকায় একটি খবর এসেছিল, জোসেফ নামক জনৈক ভদ্রলোক বলেছেন যে, পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা বলেন, খুব বেশি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করলে সমস্যার সমাধান হয় না। আসল অপরাধীও কখনো ধরা পড়ে না। প্রকৃত সন্ত্রাসীদের শাস্তি হওয়াই উচিত। আমি এখানে একেবারেই কোনো সন্ত্রাসী কাজকে সমর্থন করছি না, তবে আপনাদের সর্বাগ্রে যে জিনিসটা করা উচিত, তা হলো নিখুঁত তদন্ত। এসবের আরেকটা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো রাজনীতিবিদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। এদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে। মিডিয়া সব সময় সাদাকে কালো, দিনকে রাত, নায়ককে ভিলেন আর ভিলেনকে নায়ক বানায়। আমার ভিডিও ক্যাসেটে এগুলোর অনেক উদাহরণ দিয়েছি। তবে ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, এখানের জনপ্রিয় মিডিয়াগুলো রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে আমরা দেখি মিডিয়া সত্য খবরটাই আমাদের জানাচ্ছে। হতে পারে সেটা গুজরাটের রায়ট '৯৩ সালে মুম্বাই-এর রায়ট অথবা আজকের নিরীহ মুসলিমদের হয়রানি।

এখন সব ধরনের মিডিয়া তথা সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি আমাদেরকে কোথায় কী ঘটছে তার সত্য খবরটাই জানিয়ে আসছে। আবার মাঝে মধ্যে এমন খবর প্রকাশ করে যা খুবই চাঞ্চল্যকর। তবে সামগ্রিকভাবে আমাদের মানতে হবে যে, আমাদের মিডিয়া এখনো সৎ। আমি অমুসলিম মিডিয়ার কথা বলছি, মুসলিম মিডিয়া নয়। আমি যদি ভারতের বিচার বিভাগ সম্পর্কে বলি, ভারতের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলিম ক্ষতিগ্রস্তরা ভারতের বিচার বিভাগের ওপর আস্থা

হারিয়েছে। সেখানে কিছু লোক আছে যারা বিচার বিভাগের কলঙ্ক। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা জানি বেশিরভাগ বিচারক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ। শুধু আশা করবো যেন এই মানুষগুলোকে রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ না করে। আমার জানা মতে বেশির ভাগ বিচারক রাজনীতিবিদদের কথায় তেমন একটা প্রভাবিত হন না। এই রাজনীতিবিদরা যদি ভারতের বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে, তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তবে এখনো আমরা বিচার বিভাগের ওপর আস্থা রাখি।

সন্ত্রাসের মূল কারণ হলো জুলম ও অবিচার

সবশেষে আমাদের বুঝতে হবে আমরা যেহেতু জানি যে সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হলো অবিচার, তথা একটা বিশেষ গোত্রের মানুষের ওপর অত্যাচার। এটা বন্ধ করতে হবে। কীভাবে বন্ধ করবো? আমি আগেও বলেছি, এক নম্বর রাজনীতিবিদের সৎ ও ন্যায়বান হতে হবে। ভোট ব্যাংক নিয়ে তাদের দৌড়াদৌড়ি করা ঠিক হবে না। তারা যদি সৎ ও ন্যায়বান হয়, হতে পারে তারা কোনো আসন পেল না; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এর মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধ হবে। দুই নম্বর পয়েন্ট ভারতের জনগণ। তাদের উচিত হবে না রাজনীতিবিদদের উস্কানীতে মেতে উঠা এবং মানুষ হত্যা করা। তিন নম্বর পয়েন্ট, পুলিশের ন্যায়বান হতে হবে। যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশকেই তাকে রক্ষার কাজে এগিয়ে যেতে হবে এবং কখনো রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুলে পরিণত হবে না।

আমি জানি এরূপ করলে তাদের হয়তো বদলি করা হবে। কিন্তু সবাই যদি সৎ হয়ে যায় তাহলে নতুন যে পুলিশ অফিসার আসবে সে-ও সৎ হবে। আর যখন সবাই সৎ ও ন্যায়বান হয়ে যাবে তখন রাজনীতিবিদরা কী করবে? আমি জানি অধিকাংশ পুলিশ কর্মকর্তা সৎ কিন্তু বিভিন্ন মহলের চাপে বদলির আশংকা বিভিন্নভাবে তারা হয়রানির শিকার হয়, তারা সবাই যদি একক সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা সবাই সৎ থাকবো। আমরা বদলির ভয় করবো না ইত্যাদি। তাহলে বেশির ভাগ সমস্যা অন্যায়-অবিচার বন্ধ হবে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া উচিত নয়। তারা অন্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারে না, যদিও নিরীহ মানুষগুলো সেই অত্যাচারী দল বা গোষ্ঠির সমগোত্রীয়।

এগুলো মেনে চললে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অন্যায়-অবিচার বন্ধ হবে এবং এটা আশা করা যায় যে, আগামি ২০২০ সালের মধ্যে ভারত সুপার পাওয়ার হবে যদি ভারতের হিন্দু-মুসলিম আমরা এক সাথে পাশাপাশি থেকে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী হয়ে যার যার ব্যক্তিসাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করতে পারি। আমাদের ভেতরে পার্থক্য থাকতে পারে, থাকবে এবং এ

পার্থক্য নিয়েই আমরা থাকবো, একবার মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন– 'যদি ভারতকে উন্নত করতে হয়, তাহলে ভারতের দরকার একজন স্বৈরশাসক। যিনি হযরত উমর (রা)-এর মত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।' তিনি একজন সৎ ও ন্যায়বান মানুষ ছিলেন। কেউ সুবিচারের জন্য আসলে তিনি এটা দেখতেন না যে, মুসলিম না অমুসলিম; বরং সুবিচার করে দিতেন। এজন্য তাকে বলা হতো আল-ফারুক (যে সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করে) আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেছিলাম–

সূরা বনি ইসরাঈলের ৮১নং আয়াত–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

অর্থ : (হে নবী) আপনি বলুন, সত্য আগত মিথ্যা পরাভূত। মিথ্যার পরাজয় নিশ্চিত।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে ডা. অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, 'যারা ভয় পায় যে, একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের হাতে চলে যাবে, তারা এটা বুঝতে পারে না যে, ইসলামিক বোমা অনেক অগেই পৃথিবীতে পড়েছে। এটা পড়েছে সেদিন যেদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন।'

প্রশ্নোত্তর

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এতোক্ষণ বক্তৃতা শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকেও আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন। প্রথমেই অনুরোধ করবো মহিলাদের মধ্য থেকে কাউকে প্রশ্ন করার জন্য।

প্রশ্ন ১. আমার নাম প্রীতি শেঠী। আমার প্রশ্ন হলো– আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন যে, ওসামা বিন লাদেনকে আমরা সন্ত্রাসী বলতে পারি না যেভাবে বি. বি. সি. এবং সি. এন. এন. খবর প্রচার করছে। কিন্তু এর পাশাপাশি এই চ্যানেলগুলো থেকেই আমরা এসব বিস্ফোরণের বিভিন্ন খবর, হতাহতের সংখ্যা জানতে পারছি। একই চ্যানেল থেকে, এই খবরটা কি আমরা বিশ্বাস করবো, নাকি করবো না?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। আমি বলছি বি. বি. সি. যে ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী বলছে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সেই বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা যেটা বলছে সেটা বিশ্বাস করবো কিনা? এজন্যই বলেছিলাম মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে, বি. বি. সি.-এর সব খবরই মিথ্যা বা ভুল। যেই খবরটাতে তারা একজন হিরোকে ভিলেন বানাচ্ছে সেখানে তাদের লাভটা কি, সেটা একটু ভাবতে হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি দেখবেন যেটা সরকারি চ্যানেলে হয়ে থাকে সেটা হলো– সেই দেশেই যদি বিস্ফোরণটা হয়ে থাকে, তাহলে নিহতের সংখ্যা সাধারণত কম বলা হয়। কারণ তারা দেখাতে চায় কম মানুষ মারা গেছে। যেমন পুলিশ কমিশনার আমাকে বললেন, ১৮৭ জন মারা গেছে। আর খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ১৯৭ জন। আমি জানি না আসলে কে ঠিক, বা আমি বলছি না কমিশনার এ. এন. রায় মিথ্যা বলছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, তবে যখন আমরা একটা খবর পাই প্রথমেই তার প্রমাণ দেখবো। ওসামা বিন লাদেনের এ খবরটা যখন দেখি এমনকি বি. বি. সি.-তেও বলা হচ্ছে প্রধান সন্দেহভাজন। আপনি যদি আমেরিকার বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে যান দেখতে পাবেন, তারা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর একটা তালিকা দিয়েছে। সন্ত্রাসী সংগঠন ৪৩টি। ৬০% হলো মুসলিম দল, বলতে পারেন সবচেয়ে জনপ্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠন কোন্‌টা? কোন্‌টা মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন? কোন্‌ মুসলিম সংগঠন সবচেয়ে জনপ্রিয়? আল-কায়দা। এই উত্তরের জন্য কোনো পুরস্কার পাবেন না। কারণ খুব সোজা উত্তর আল-কায়দা। আমেরিকার বিচার বিভাগের মতে এ আক্রমণের মধ্যে উলফা ৭৪৯টা, আল কায়দা ২৮টার মধ্যে ২৬টা আক্রমণের অভিযুক্ত আর বাকি ২টা আল-কায়দা দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তাদের ওয়েবসাইডে দেখতে পাবেন সেখানে একটি আক্রমণ ও আল-কায়দা বলে

প্রমাণিত হয়নি। আমি এখানে আল-কায়দাকে সমর্থন করছিনা। আপনারা জানেন 'ইয়োহাম রেডলী' যখন আফগানিস্তানে গেলেন, তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। তিনি ফিরে আসলে তাকে প্রশ্ন করা হলো– 'আল কায়দা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?' তিনি বললেন, 'আমার সন্দেহ আছে আল-কায়দা আসলেই আছে কিনা?' তাই বোন, আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনি যদি মিডিয়ার লোক হয়ে থাকেন অথবা মিডিয়ার কাজ করেন, তাহলে খবরটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা ঠিক? আর কোন্‌টা যাচাই-বাছাই করতে হবে? বি. বি. সি., সি. এন. এন. যদিও বলছে প্রধান সন্দেহভাজন। কিন্তু এমন ব্যবহার করছে যেন তারাই অপরাধী। আপনি কি আফগানিস্তানের হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলবেন সন্দেহের দায়ে? আমরা যখন খবর শুনি তখন আমাদের বুঝতে হবে কে খবরটাকে নিয়ন্ত্রণ করে? এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কি? তাহলেই আমরা সঠিক খবরের সত্যতা যাচাই করতে শিখবো।

প্রশ্ন ২. আমার নাম শামসুন্নাহার। আমি মারাঠি। মহানগর পেপারে কাজ করি। আপনার বক্তব্য শুনে প্রশংসার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয় ভারতে হিন্দু আর মুসলিম এক হওয়ার জন্য কিছু একটা করা দরকার। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে, ভারতের বিভিন্ন বস্তিতে যারা থাকে তারা গ্রাম থেকে মুম্বাই এসেছে রুটি-রুজির জন্য। এই বস্তিগুলোতে যে হিন্দু-মুসলিম আছে তারা একে অন্যকে অপছন্দ করে। আর এর পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আপনি কি বলেন? হিন্দু-মুসলিম কিভাবে এক সাথে থাকতে পারবে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তরে আমি বলবো আমার একটা ভিডিও বক্তব্য আছে হিন্দু-মুসলিমদের সাদৃশ্যগুলো নিয়ে। আমি মুম্বাই, চেন্নাই এবং ভারতের আরো বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়েছি, যেখানে হাজার হাজার মুসলিম অমুসলিম উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার হিন্দুও এসেছিলেন। তাদের অনেকেই আমাকে বলেছিল জাকির ভাই, আমাদের এই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারিনি সেগুলো এই চার ঘণ্টায় জানতে পারলাম। আমি এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মেনে চলি। যেটা সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আছে–

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ ـ

অর্থ : হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা একটি কথা বা বিষয়ের দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান আর তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবো না।

আমাদের বুঝতে হবে তবে আমার এটা কখনোই মনে হয় না যে, হিন্দু-মুসলিম একই জিনিস। ইসলাম ধর্ম আর খ্রিস্টান ধর্মও এক। এটা ঠিক নয়, হিন্দু কোনো পণ্ডিতকে মুসলমান হতে বললে, কোনো মুসলমানকে খ্রিস্টান হতে বললে বা কোনো খ্রিস্টান যাজককে হিন্দু হতে বললে কেউই রাজি হবেন না। সবাই না বলবেন, তাহলে এক জিনিস কোথায়? এগুলো মোটেও এক নয়, আমাদের কিছু পার্থক্য ও কিছু সাদৃশ্য আছে। আসুন আমরা সবাই আমাদের সাদৃশ্যগুলো মেনে নেই। আমাদের মাঝে পার্থক্য না হয় কিছু থাকলো। আমি যেটা বলি, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে হতে পারে সেটা, ভগবদগীতা, হতে পারে বেদ-উপনিষদ, বাইবেল, কুরআন, আসুন সাদৃশ্যগুলো দেখি। পার্থক্য নিয়ে পরে এক সময় আলোচনা করবো, তবে যে কথাগুলো একই আসুন সেগুলো আমরা সবাই মেনে চলি। আমার বক্তব্যে আমি অনেক সাদৃশ্যতার কথা বলেছি, এজন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। আমাদের সাথে অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না। কারণ মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। এমনকি অনেক মুসলমান প্রতিবাদ করেছে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে সাদৃশ্য? অসম্ভব, অনেক লোক সেখানে এসেছিল শুধু তর্ক করার জন্য। আমি নাকি আজেবাজে বকছি। কিন্তু তারা যখন বক্তৃতা শুনলো, তখন বিস্মিত হলো। যারা তর্ক করতে এসেছিল, তারাও কথাগুলো মেনে নিল। অনেক হিন্দুও সেখানে ছিল। বিষয়টা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং মেনে নিতে হবে।

আর প্রথম কথাটা হলো– 'আমরা উপাসনা করি একমাত্র আল্লাহর।' এটাই সবচেয়ে বড় মিল। এখানে আরো উদ্ধৃতি দেয়া যায়, বেদ, ভগবদগীতা, ছন্দোগিয়া উপনিষদের। ছন্দোগিয়া উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে– 'স্রষ্টা মাত্র একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।' এছাড়া শ্বেতাসত্র উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯ নং অনুচ্ছেদে আছে– 'তাঁর কোনো প্রভু নেই, তাঁর কোনো বাবা-মা নেই।'

এটা একটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি। তার মানে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো মা-বাবা নেই। তার কোনো মালিক নেই, এছাড়া এই গ্রন্থের ৪৯ অধ্যায়ে, ১৯নং অনুচ্ছেদে আছে– 'সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তার কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো প্রতিমা নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তার কোনো মূর্তি নেই, তার কোনো ছবি নেই। একই কথা বলছে যজুর্বেদ ৩২ নং অধ্যায়, ৩নং অনুচ্ছেদ-এ 'সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো প্রতিকৃতি নেই।'

তাহলে আপনি যদি বেদ পড়েন এবং ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করেন, দেখবেন সেখানে একটাই স্রষ্টা। কয়েকদিন আগে স্টার নিউজ চ্যানেলের একটা সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল, 'বন্দে মাতরম' শব্দটা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এটা কি মুসলিমরা বলতে পারবে? আমি এর উত্তরে

তাদেরকে বললাম, এটা মুসলমান বলবে কিনা এ ব্যাপারে পরে আসছি। আগে বলি হিন্দুধর্ম কি বলে। আমি বললাম বেদের পণ্ডিতরা এ কথা স্বীকার করবে যে, বেদে বলা আছে 'স্রষ্টার কোনো প্রতিমা নেই।' তাই আপনি যখন বলছেন, 'বন্দে মাতরম' অর্থাৎ এদেশ আমার মা। তাকে স্রষ্টা বলছেন এখানেও আমি সাধারণ লোকদের কথা বলছি না যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, তবে পণ্ডিত কাউকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি বলবেন যে, 'বন্দে মাতরম' আর বেদের কথা পরস্পর বিরোধী। কারণ 'বন্দে মাতরম' কম করে হলেও তিন জায়গায় বলছে, 'আমি তোমার সামনে নতজানু হই, আমি তোমাকে পূজা করি।' আপনারা দেখবেন আর্য সমাজ এবং অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত তাদের মতে, বেদের ভাষ্য অনুযায়ী মূর্তিপূজা করা নিষিদ্ধ। ভগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০নং অনুচ্ছেদে আছে- 'মূর্তি পূজা করা উচিত নয়।'

হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরা এখন সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। তবে বেদ কিন্তু বলছে একজন স্রষ্টার কথা। এছাড়াও বন্দে মাতরমে আমি তোমার সামনে নতজানু হয়ে পূজা করছি একটু আগে উপনিষদ থেকে যে উদ্ধৃতি দিলাম তার বিরুদ্ধে যারা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ১২টি লাইনে আমাদের আপত্তি আছে। তিনবার বলা হয়েছে, 'বন্দে মাতরম' যার অর্থ তোমার সামনে নতজানু হই। তিনবার বলা হয়েছে, 'এই দেশ আমার মা'। তিনবার বলা হয়েছে- আমি পায়ে চুমু দেব, আরো তিনবার বলা হয়েছে এদেশ স্বর্গীয়। দেশকে বলা হচ্ছে লক্ষ্মী, দুর্গা-এর সব কিছুই আপত্তিকর। আমরা মুসলিম দেশকে অনেক ভালোবাসি; কিন্তু সর্ব শক্তিমান ছাড়া কারো কাছেই নতজানু হব না। এমনকি আমাদের মা, যে মা আমাদেরকে ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন। আমরা মাকে ভালোভাসি, শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা মায়ের সামনে নতজানু হই না। আর যে মানুষটাকে আল্লাহ তা'আলার পরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমাদের সেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সামনেও আমরা নতজানু হই না। এই 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার আসলেই কোনো প্রয়োজন বা কার্যকারিতা নেই? আসলে এটা একটা প্রাকটিক্যাল গেম... রাজনীতিবিদরা যেটাকে ভোট ব্যাংকের জন্য ব্যবহার করছে বা কাজে লাগাচ্ছে। তারা তারিখটা নিয়েও খেলা করছে।

আপনারা জানেন ১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গানটা লিখেছিলেন আর সেটা ছাপা হয় ১৮৮২ সালে, তাহলে ১২৫ বছর এবং ৭ সেপ্টেম্বর কোত্থেকে আসে। এই ভুলটা করেছে রাজনীতিবিদরা, খেলাটা তাদেরই। এছাড়াও সৌদিতে যে অনেক মুসলমান আছে তারা তাদের দেশের কাছে নতজানু হয় না, পাকিস্তানের মুসলমান পাকিস্তানের কাছে নতজানু হয় না। কারণ এটা শির্ক। তাই যদি বলেন- ভারতের মুসলমানরা দেশপ্রেমিক না সে ক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই দেশকে অনেক উন্নত করেছেন। আমরাও এই দেশকে

অনেক অনেক ভালোবাসি, প্রয়োজনে সত্যের জন্য দেশের হয়ে জীবন দিতে রাজি আছি; কিন্তু আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নতজানু হবো না।

প্রশ্ন ৩. আমার নাম সাইফ। আমার প্রশ্ন হলো– মুসলমানরা কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে? আর এজন্যই কি সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হচ্ছে। দয়া করে আপনার মতামতটা জানাবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি যে সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর পেছনের মূল কারণ হলো অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা নয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের একটা অংশ নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে, তবে আসল কারণটা হলো অবিচার। কোনো সংখ্যালঘু বিশেষ গোত্রের মানুষের ওপর নির্যাতন। আপনি যদি গতকালের 'সানডে মিডডে' খবরটা পড়ে থাকেন তাহলে জানবেন যে, উইলিয়াম নামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নাইন-ইলেভেন নিয়ে লিখেছেন। তিনি সেখানে একটা উপদেশ দিয়েছেন যে, মূল কারণ হলো অবিচার ও অন্যায়। তিনি মুম্বাই-এর কর্তৃপক্ষের সাথে একমত যে, এটা হতে পারে কাশ্মীরের বিদ্রোহীরাই মুম্বাইতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন এর কারণটা কি? তার মত অনুযায়ী কাশ্মীর যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। তারা শান্তি প্রিয় মানুষ, তবে কেন তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তরটাও তিনি নিজেই দিয়েছেন যে, এর মূল কারণ হলো– কাশ্মীরে গণতন্ত্রের নামে চলছে প্রহসন, এখানে গণতন্ত্রের অপব্যবহার হচ্ছে।

সেজন্যই সাধারণ নিরীহ মানুষগুলো প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে লড়াই করছে। এটাও আমার মন্তব্য নয়, বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। একই অবস্থা ফিলিস্তিনে। সেখানে তারা যুদ্ধ করছে কারণ তাদের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাই অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে, প্রতিশোধ নিচ্ছে। সুতরাং সন্ত্রাসের মূল কারণ হলো কোনো দল বা গোত্রের ওপর অন্যায়, অবিচার, যারা তাদের বিপক্ষে তারা এটাকে সন্ত্রাস বলছে, উদাহরণস্বরূপ ভগত সিং দেশের জন্য লড়েছিলেন। বৃটিশ সরকার তাকে 'সন্ত্রাসী' বলেছিল আর আমরা তাকে বলি মুক্তিযোদ্ধা। তাই এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনি আপনার সুবিধামত কাউকে সন্ত্রাসী বলবেন, আর কাউকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলবেন, সন্ত্রাসের অনেক অর্থ আছে, অনেক সংজ্ঞা আছে, যেটা ভৌগোলিক অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয় এবং ইতিহাসের কারণেও বদলায়। তাই এখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে হবে তাহলে যথার্থ প্রতিকার সম্ভব।

প্রশ্ন ৪. ক্রিস্টফার লোবো নামে একজন ভদ্রলোক চিরকুটে একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন কিভাবে প্রমাণ করবেন যে, নাইন-ইলেভেন ঘটনা ভেতর থেকেই ঘটেছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতর থেকে হয়েছে এর স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে একটা খবর ছাপা

হয়েছিল যে, 'আমেরিকার ৭৫ জন প্রফেসর বিশ্বাস করেন যে, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল।' 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরে আরো বলা হয়েছে– আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন অধ্যাপক মন্তব্য করেন এই বিস্ফোরণটা ভেতরের কারো কাজ এবং হোয়াইট হাউজের কিছু রাজনীতিবিদদের পরিকল্পনাতেই টুইন-টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে। আর তাদের মতে, এর প্রধান কারণ হলো যুদ্ধ করে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এটা একটা ওপেন সিক্রেট (সর্বজন বিদিত গোপন বিষয়)। তাদের মধ্যে জোন নামে একজন অধ্যাপক বলেছেন– আমরা বিশ্বাস করি না যে ১৯ জন ছিনতাইকারী আর আফগানিস্তানের কিছু গুহাবাসী একাইএমন একটা পেশাদার কাজ করে বসবে। কোনোভাবেই এটা হতে পারে না, তাই আমরা কথা দিচ্ছি আসল সত্যটা অবশ্যই বের করবো এবং সকলকে সেটা জানাবো।

আমরা সরকারের বানানো কথায় বিশ্বাস করি না। তিনি আরো বলেছেন, আমরা অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে বলছি। আমরা জানি যে লোহার টুইন-টাওয়ারের লোহার ভীমগুলো ছিল খুব মজবুত। বিমান বিস্ফোরণের সময় যে তাপের সৃষ্টি হয় সেই তাপে ঐ মজবুত ভীমগুলো গলে যাওয়ার কথা নয়। এখানে সব কিছু পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে, সে জন্যই পুরা অবকাঠামো ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভিডিও আর বই বের হয়েছে। আমি নিজেই অনেক ভিডিও দেখেছি, তার মধ্যে একটি হলো অধ্যাপক স্টিভজোন্‌স্-এর ভিডিও। গতকালকের কাগজে ঠিক এর তিনদিন পর একটা খবর দেখলাম যে, অধ্যাপক স্টিভ জোন্‌সকে অসুস্থতার ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। চিন্তা করুন, এরূপ আরো অনেক ভিডিও আছে যেগুলো আপনারা দেখে থাকতে পারেন। এর মধ্যে একটার নাম 'লুজ চেঞ্জ নাইন ইলেভেন।' ২১ বছর বয়সের এক আমেরিকান তরুণ এই প্রামাণ্য চিত্রটি বানিয়েছে। এটা সি. এন. এন ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভিডিও চিত্র, কিছু সাক্ষাৎকারের সমন্বয়ে একটি ডকুমেন্ট। সেখানে তিনি বলেছেন– প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে বিমান দুটো যাত্রীবাহী বিমান হতেই পারে না। দেখে মনে হচ্ছে একটা সামরিক বিমান। তারপর বিমানটি যখন টাওয়ারের কাছাকাছি আসলো বিমানে ডানা থেকে গুলি বর্ষণ করা হচ্ছিল। এরপর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সেই কোম্পানির ম্যানেজারের সাথে তার কথা হয়েছে যারা টুইন-টাওয়ার বানিয়েছিল। সে বলেছে এটা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, টুইন-টাওয়ারটা এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, ঝড় টর্নেডোতে কিছুই হবে না। আর সামান্য একটা বিমানের আঘাতে এভাবে ধ্বংস হতে পারে না।

কারণ সেই বিস্ফোরণের সময় টুইন-টাওয়ারের তাপমাত্রা ছিল ১০০০° ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু এই তাপমাত্রা ২০০০° হলেও কিছু হওয়ার কথা ছিল না।

দশদিন পর সেই ম্যানেজার নতুন কথা বলতে শুরু করলো যে এটা সম্ভব। বিমানের বিস্ফোরণে লোহার ভীমের ক্ষতি হতে পারে।

আরেকজন অধ্যাপক এমন কথাই বলেছেন এবং পরে তিনি তার মত পাল্টান নি। তাই তার চাকুরি গিয়েছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নিউইয়র্কের চল্লিশ, ষাট, সত্তর তলা বিশিষ্ট অনেক ভবনে আগুন ধরেছে; কিন্তু কোনোটাই এভাবে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েনি। আমেরিকার ইতিহাসে টুইন-টাওয়ারই প্রথম ভবন যেটা এভাবে একেবারে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। ছবিতে আমরা দেখেছি, ভবন ভাঙ্গতে গেলে বোমা দিয়ে যেভাবে ভাঙ্গা হয় এটা ঠিক সেভাবেই ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ফায়ারম্যান যারা ছিল তারা বলেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল ওপর থেকে বোমার সুইচ টিপছে আর বোমা ফাটছে একের পর এক, তাহলে টুইন-টাওয়ার যেভাবে ভেঙ্গেছে তার প্রমাণ আছে।

এছাড়াও বলা হয়েছে সরকারের সব প্রমাণ তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। বলা হয়েছে বিমান চালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৯ জন ছিনতাইকারী এই কাজটি করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন বিমান যেভাবে টার্ন বা বাক নিয়েছে সেটা ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমি দীর্ঘদিন আকাশ পথে বড় বিমান চালকের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে এভাবে বাঁক নেয়া অসম্ভব। তাহলে চিন্তা করুন, কতদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা লোক এভাবে প্লেন বা বিমান চালাতে পারে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটা অবশ্যই সামরিক বিমান। সরকার আমাদের আরো তথ্য দিয়েছে। তখন একটা ফোন এসেছিল যে বিমানটা ছিনতাই করা হয়েছে আর যাত্রীরা সবাই সেখানে বন্দি। সে সময় একটা ফোন করেছিল একজন ফ্লাইট অফিসার। সে বলছে যে, 'বিল্ডিং, পানি, ওহ ঈশ্বর! ওহ ঈশ্বর! যে সারা বছর বিমানে উড়ে বেড়ায় সেকি নিউইয়র্কে কখনো বিল্ডিং দেখেনি? আর একজন লোক বলছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম বলছি। মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আমাদেরকে ছিনতাই করা হয়েছে, তুমি বিশ্বাস করো।'

এখানে আমার প্রশ্নটা হলো, যদি আমি আমার মায়ের সাথে কথা বলি, তখন বলি আমি জাকির। এরূপ বলি না যে, আমি জাকির নায়েক বলছি; কিন্তু সে ব্যক্তি বলেছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম। যদি মার্ক তার মায়ের সাথে কথা বলে, তাহলে এভাবে বলবে কেন? আর টেলিফোন কল আপনি পাবেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে। আমি একটা সার্ভে করেছিলাম ৩২,০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করে কিনা? ৪,০০০ ফুট উপরে মোবাইল কাজ করার সম্ভাবনা .৪%। আর ৮,০০০ ফুট উপরে সম্ভাবনাটা হবে ০.১% আর ৩২,০০০ ফুট উপরে এই সম্ভাবনা .০০৬%। অর্থাৎ মোবাইল কাজ করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ প্রামাণ্য চিত্র বলছে আমেরিকার ফোন কোম্পানিগুলো এত উচ্চতায় সংকেত পাঠানোর চেষ্টা

করছে আর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আরো জানা যায় যে, প্রত্যেক বিমানের দুটি 'ব্লাকবক্স' থাকে যেটা ৩,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায়ও কিছু হয় না। অথচ ১,০০০ থেকে ২,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সেই বক্সের সব শেষ।

এসব কিছুই এখন প্রমাণ। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে 'উম্মাহ' নামে একটি সাময়িকীতে সাক্ষাৎকার দিলেন। তিনি বলেন, 'আমি একজন মুসলিম তাই কোনো মিথ্যা বলবো না। আমার মত অনুযায়ী নিরীহ মানুষকে, নিরীহ নারী ও শিশুকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরধে। ইসলাম এটার তীব্র নিন্দা করে। ওসামা বিন লাদেন সাক্ষাৎকারে একথা বলেছিলেন। কয়েক দিন আগে 'আল-জাজিরায়' একটি ভিডিও চিত্র দেখলাম 'ওসামা বিন লাদেন নাইন-ইলেভেন।' যেহেতু ৭৫ জন অধ্যাপক বলছে এটা নিজেদের কাজ তাই সেটা ঘোরানোর জন্য পাঁচ বছর পরে এই খবর টিভিতে আসছে। এই ৭৫ জন অধ্যাপক কথা দিয়েছেন এর রহস্য ভেদ করবেনই। এবার পেন্টাগনের দ্বিতীয় আক্রমণটা নিয়ে বলি, পেন্টাগনে যখন বিমান ধ্বংস হলো ঘাসের ওপর সেই বিমানের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু পেন্টাগনের দেয়ালে একটা গর্ত। টিভিতে দেখেছি সেই গর্তটা বিমানের বডির সমান বড়। কিন্তু বিমানের ডানাটা কোথায় গেল? ডানার আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই পেন্টাগনে। যদি বিমানটা পেন্টাগনে ঢুকে যায় আর ডানা বাইরে থাকে, তাহলে ডানাটা হয় বাইরে থেকে যাবে অথবা দেয়ালের গায়ে গর্ত হবে। কিন্তু ভবনটিতে কিছুই হয় নি। সবকিছুই যেন সাজানো। এছাড়া লোকে বলছে বিমানটা ৪০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেছে। বিজ্ঞান বলে– বোয়িং বিমান ৪০ ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেলে একটা গাড়িও ছিটকে যাবে। একজন প্রাক্তন মিলিটারিম্যান বলেছেন, এটার শব্দ ছিল একটা মিসাইলের মতো। বিমানের কিছুই সেখানে পাওয়া যায় নি, শুধু একটা যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন পাওয়া গেছে। এমনকি অন্য জায়গায় মাটিতে শুধু একটা গর্ত হয়েছে। এর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু সময় স্বল্প। একজন বোকাও বুঝতে পারবে এটা ভেতরের কাজ, কিন্তু মিঃ বুশ এ কথাটা বুঝতে পারেন নি।

আরো বলা হচ্ছে, এসবের কারণেই আফগানিস্তানে আক্রমণ করা। তারপর ইরাক সব শেষে ইরান। এটা ধারণা করা হচ্ছে যে, ইরানেও আক্রমণ করা হবে, তারা তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে চায়। তাহলে এ সন্ত্রাসী আক্রমণ কেন? প্রথমত, এটা হলো অবিচার, দ্বিতীয়ত, এটা টাকার জন্য, ক্ষমতার জন্য। যখনই রাজনীতিবিদরা দেখে তারা ভোট হারাতে যাচ্ছে তখনই মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে যে, 'হয় আমাকে ক্ষমতায় বসাও নয়তো মুসলমানরা ক্ষমতায় বসবে, শাসন করবে।' গুজরাটেও একই ঘটনা, মানুষের মনে ভয় তৈরি করা হচ্ছে যে, আমাদের ক্ষমতায় না বসালে মুসলমানরা তোমাদের মেরে ফেলবে, তাই তারা আবার

ক্ষমতায় আসলো। আমরা যেটা বুঝি নাইন-ইলেভেনের ঘটনা আসলে এটা একটা ভেতরের কাজ। যার সপক্ষে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে, তাই এটা একেবারে ওপেন সিক্রেট (সর্বজনবিদিত গোপন তথ্য) যে, এই আক্রমণটায় বুশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এক কথায় আক্রমণটা বুশ নিজেই করেছিল।

প্রশ্ন ৫. আমার প্রশ্ন হলো– আমি বিশ্বাস করি যে, সন্ত্রাস হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আরো মনে করি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেও। কোনো মানুষের সাথে যদি অন্যায় করা হয়, তাহলে সে প্রতিশোধ নিতে অন্য মানুষকে হত্যা করে, তবে সেটা কি তার জন্য অপরাধ? আমার অবস্থাও যদি গুজরাটির মতো হতো, তাহলে তারা যা করেছে আমিও তাই করতাম। পুলিশ ন্যায় বিচার করে না, আদালতে গেলে ১০ বছর লেগে যায়, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ এখানেও কি করবে? আপনি কি উপদেশ দিবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আমিও একমত যে, এই পরিস্থিতিতে আপনিও একই কাজ করবেন এবং যে কোনো সাধারণ মানুষও এই কাজ করবে এটা স্বাভাবিক। যদি না আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থাকে। এমনকি আমি নিজেও এ কাজ করতে চাইবো, যখন আমি কুরআনকে জানবো এবং এটা জানবো না যে, কুরআন এটা নিষেধ করেছে। কারণ, আমি যদি নিরীহ মানুষকে হত্যা করি, তাহলে আমিও সেই ব্যক্তির মতো কাজ করলাম যে আমার ওপর অন্যায়-অবিচার করেছে। অর্থাৎ, কেউ আমার ওপর অন্যায় করেছে এর অর্থ এই নয় যে, আমি নিরীহ মানুষকে হত্যা করবো। কেউ আমার ঘরে ডাকাতি করলে, আমিও আরেকজনের ঘরে ডাকাতি করতে পারি না। তবে যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে পারি এবং প্রমাণ করে শাস্তি দেই সেটা আলাদা কথা।

আল-কুরআনও একথাই বলেছে নিরীহ মানুষ হত্যা করা যাবে না। সুতরাং কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এই উপায়ে প্রতিশোধ নেয়া সমীচীন নয়। আমি সাধ্যমত প্রমাণ জোগাড় করবো, সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করবো। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পায়, তখন আমার কিছুই করার নেই। এই সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর জন্য যারা দায়ী তারা হচ্ছে– রাজনীতিবিদরা ও পুলিশ, আর যারা মারা গেছে অথবা বোমা ফাটিয়েছে যদিও এই পৃথিবীতে তাদের উপযুক্ত বিচার হয় না। তাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .

অর্থ : প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।

আসল বিচার হবে কিয়ামতের দিন। এটাই আমরা মনে করি। আমরা আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করবো তিনিই বিচার করবেন। যেমন আমরা যদি আজকে হিটলারকে ধরি, তাহলে তাকে আপনি কি শাস্তি দিবেন? ৬০ লক্ষ নর হত্যার শাস্তি আপনি দিতে পারবেন? তাকে আপনি সর্বোচ্চ একবার মারতে পারবেন। বাকি ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জনের কি হবে?

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط

অর্থ ঃ যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবো, আর যখনই তাদের চামড়া আগুনে পুড়ে গলে যাবে, তখনই নতুন চামড়া সংযোজন করে দিবো, যাতে তারা শাস্তি ভালভাবে আস্বাদন করতে পারে।

বিজ্ঞান বলে মানুষের শরীরে ব্যথা অনুভবকারী আছে যেটা ব্যথা বা যন্ত্রণাকে ধরে রাখে, তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন– কিয়ামতের দিন তাদের চামড়া আগুনে পোড়ানো হবে, যাতে তারা শাস্তির যন্ত্রণাটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহ যদি চান হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার মারতে পারবেন। যেটা আমরা কেউ পারবো না। তাই আমরা তাদের বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেবো।

মোঃ জাকির নায়েক ঃ আপনাদের সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কাছে জাকির নায়েকের উদ্দেশ্যে অনেক প্রশ্ন এসেছে, ভবিষ্যতে আমরা (ইনশাআল্লাহ) এসব প্রশ্নোত্তর ডা. জাকির নায়েকের মুখে শুনবো।

ডা. জাকির নায়েককে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য এবং আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরও ধন্যবাদ জানাই অনেক আগ্রহ নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ, আস্‌সালামু আলাইকুম।

সুদমুক্ত অর্থনীতি

INTEREST FREE ECONOMICS

মূল
ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদক
মনিরুজ্জামান খান
বি.এস.এস. (অনার্স) এম.এস.এস (অর্থনীতি)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়
মোঃ আব্দুল কুদ্দূস
বি.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম); এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
এম.এম. (অল ফার্স্ট ক্লাশ অ্যান্ড স্কলারস)
বি.এস.এস. (অনার্স) এম.এস.এস (অর্থনীতি), ঢা. বি.
প্রবেশনারি অফিসার, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুদমুক্ত অর্থনীতি

আজকের এ অনুষ্ঠানে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষপটে মানব সমাজের সাথে সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থনীতি এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলছে। বিশেষ করে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণের মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে। আমাদের ইসলামীক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য পণ্ডিতদের নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের ওপর সেমিনার আয়োজন করে চলছি। আন্তর্জাতিকভাবে এসব আলোচিত বিষয়গুলো হলো : নারী অধিকার, মানবাধিকার এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পদ্ধতি।

অর্থনীতি এসবের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কারণ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায়, যারা বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি, যেমন ঃ বিশ্বব্যাংক, IMF, এরা বর্তমানে যে নীতিতে চলছে তার বাস্তবায়ন ও সমাধান করে থাকে এবং এসব সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যা এবং অদক্ষতার মোকাবিলা করে অগ্রগতির দিকে এগুচ্ছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক লোক ইসলামীক অর্থব্যবস্থা অধ্যয়ন করছে এবং তুলনামূলক অধ্যয়নও করছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য যে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না এবং এর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব কিনা, তাও ভাবতে শুরু করেছে। এ বিষয়েই কথা বলতে ডা. জাকির নায়েককে 'কুরআনের আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি' বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি মূলত প্রথমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতির ওপর আলোচনা করবেন এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের অবশিষ্ট যা আছে তা মাফ করে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।

আজকের এ মহতী সভায় আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান আগেই উল্লেখ করেছেন, আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'কুরআনের আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি'।

'রিবা' শব্দটি কুরআনে ৮ বার এসেছে। 'রিবা' শব্দটি কুরআনের যে সব স্থানে উল্লেখ রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

সূরা রূম, পারা ১৩, আয়াত ৩৯।

সূরা নিসা, পারা ৪, আয়াত ১৫১।

সূরা আলে ইমরান, পারা ৩, আয়াত ১৩০।

সূরা বাকারা, পারা ২, আয়াত ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০।

'রিবা' শব্দটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মোট ৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। 'রিবা' শব্দটি প্রথমে নাযিল হয় সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ـ

অর্থ : মানুষের ধনসম্পদে তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো, তারই দ্বিগুণ লাভ করে।

'রিবা' শব্দটির অর্থ আসলের অতিরিক্ত যোগ হওয়া। কুরআন এ আসলের অতিরিক্ত যোগ হওয়াকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। পদ্ধতিগতভাবে কুরআন যখন প্রথম 'রিবা' শব্দটি উল্লেখ করেছে তখন কুরআন বলে নি যে, 'রিবা' হারাম বা রিবা নিষিদ্ধ। যেমন সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

'রিবা' সম্পর্কে যখন কুরআনে এসেছে, এটা ঠিক কুরআনে মদপান সম্পর্কে যেমন পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেরকম।

কুরআন প্রথম যখন মদপান সম্পর্কে উল্লেখ করেছে তখন তা মদের অন্তর্নিহিত ভালোমন্দ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। যেমন সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط

অর্থ : তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন এ দুটির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আর যদিও মানুষের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।

কুরআনে আল্লাহপাক মদকে একসাথে নিষিদ্ধ করেন নি। বরং মদপানকে আল্লাহ পর্যায়ক্রমে হারাম করেন। যেমন এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আল্লাহপাক সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বলছো তার মর্মার্থ বুঝতে পারো।

এ আয়াতে মদপান করে মাতাল অবস্থায় নামায আদায় করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্তভাবে মদপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাধ্যমে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্বরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। তাহলে তোমরা কি এসব বস্তু থেকে বিরত থাকবে?

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদ বহন করে মদিনার রাস্তায় ঢেলে ফেলা হয় এবং কখনো তা আর পান করা হয়নি। এভাবে পর্যায়ক্রমে মদ নিষিদ্ধ হয়েছে। একইভাবে সুদও পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রথম যখন সুদ 'রিবা' শব্দটি উল্লেখ করা হলো তখন বলা হলো 'তোমরা কি আল্লাহকে ভালোবাসো?'

সুদ সম্পর্কে পরবর্তী যে আয়াত নাযিল হয় সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে–

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

অর্থ : আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি।

কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য যেমন ঃ উটের গোশ্‌ত, ভেড়ার গোশ্‌ত, ছাগলের গোশ্‌ত, ষাড়ের গোশ্‌ত, মুরগির গোশ্‌ত এগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (ইহুদিদের জন্য)। কারণ, তারা আল্লাহর পথে বাধাদান করতো, তারা সুদ গ্রহণ করতো, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

তারপর সূরা আলে-ইমরান-এর ১৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰۤوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوْا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

কিন্তু অনেক মুসলমান আছে যারা জোর দিয়ে বলে যে, কুরআন যে সুদের কথা বলেছে তা মানি লন্ডারিং-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যখন (মানি লন্ডার) জনগণকে ঋণ দেয় এবং মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত সুদ (Usury) নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু Interest নিষিদ্ধ করে নি– যা বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো নিয়ে থাকে। আমাদের Usury শব্দের অর্থ বুঝা উচিত Oxford dictionary-এর মতে, 'The Practice of lending money to people at unfairly high rates of interest' অর্থাৎ অন্যায্যভাবে অর্থ ধারের ব্যবসা। তারা বলে, কুরআন এ মাত্রাতিরিক্ত হারে (Usury) সুদের লেনদেন হারাম করেছে কিন্তু বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো যে সুদ (Interest) নেয় তা নিষিদ্ধ করা হয়নি।

Oxford dictionary-এর মতে, Interest-এর অর্থ, ঋণের অর্থ ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়। অর্থাৎ, অর্থ ঋণ নিয়ে ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান এবং Usury-এর অর্থ হলো অন্যায়ভাবে, অন্যায্যভাবে বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদের ঋণের লেনদেন। অল্প কথায়, Usury-এর অর্থ হলো মাত্রাতিরিক্ত সুদের হার।

'রিবা' অর্থ হলো, আসলের সাথে অতিরিক্ত যোগ বা আসলের ওপর বৃদ্ধি। এটা অন্যায্য যোগ বা বৃদ্ধি এবং প্রথমে উভয়ই উপকৃত হয়। Usuary হলো সুদেরই একটি অনুরূপ তা ছোট হোক বা বড় হোক, রিবা, তা Interest বা Usury। এটা কুরআনে নিষিদ্ধ।

আরো অনেক মুসলমান আছেন যারা যুক্তি দেখান যে, সুদ হলো একপ্রকার ব্যবসা। সুতরাং কেন তা হারাম হবে, যেখানে বিশ্বময় সম্পদের লেন-দেন সুদের মাধ্যমেই হচ্ছে, তাদের জন্য কুরআন স্পষ্ট জবাব দিচ্ছে। সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ

অর্থ : আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।

আর তিনি Interest বা Usury-কে হারাম করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশনা পাওয়ার পরও কুরআনে আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন কিন্তু সুদকে হারাম করেছেন এবং যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা শাস্তির শিকার হবে এবং তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকবে।

এর পরবর্তী আয়াতে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে–

'আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন, আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।'

আবার কোনো কোনো মুসলিম যুক্তি দেখান যে, কুরআন যে রিবার কথা উল্লেখ করেছে তা রিবা ইসতিলাক। ইসতিলাক হলো, যখন একজন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ ঋণ দেয় এবং এ লোনের (ধারের) ওপর সে সুদ আদায় করে। সংক্ষেপে এ প্রকার রিবা হলো রিবা ইসতিলাক যা কুরআন নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু অন্য প্রকার সুদ যা বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো ব্যবসা করার জন্য ঋণের ওপর ধার্য করে তা কুরআন নিষিদ্ধ করে নি। আমাদের বুঝতে হবে যে, কুরআন কী বলতে চাচ্ছে। আমি কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। আমি তিলাওয়াত করেছিলাম সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াত। এখানে বলা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

এরপরের আয়াতটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়ার পর তিনি বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আমার এক আত্মীয়কে সুদ থেকে বিরত রাখতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা)-এর নিকট যেতে হয়েছিল।

ইসলামপূর্ব আরব সমাজে দুই ধরনের ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হলো– মুদারাবা পদ্ধতি। মুদারাবা পদ্ধতি হলো, একজন লোক অন্য একজনকে অর্থ বা যেকোনো কিছু ঋণ দিবে (মুদারিবকে) ব্যবসা করার জন্য যে ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং যে লাভ অর্জন করবে তা ঋণদাতা এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগ হবে বা বণ্টন হবে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবসা হলো, একজন অন্য একজনকে অর্থ ঋণ দিবে এবং ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে সুদ আদায় করবে। যখন এ মুসলমানরা বলে যে, কুরআন যে রিবা নিষিদ্ধ করেছে তা রিবা ইসতিলাক, যা মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর ধার্য করা হয়। যেমন ঃ খাদ্য ক্রয়ের জন্য, পোশাক ক্রয়ের জন্য, এরকম মৌলিক প্রয়োজন। এ ধরনের রিবা নিষিদ্ধ। সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে বলা হলো–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ -

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ প্রথমত হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) যিনি গরিবদেরকে তাদের মৌলিক অভাব মেটানোর জন্য ঋণ দিতেন এবং তাদের নিকট থেকে সুদ আদায় করতেন। যেমনটি ইহুদিরা করতো। তিনি ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা করার জন্য ঋণ দিতেন এবং এ ঋণের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করতেন। এ দুই আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে পরিমাণ সুদ তাদের আত্মীয়দের নিকট বকেয়া ছিল তা মওকুফ করে দিল। তখন সব মুসলিম যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাদের যে পরিমাণ সুদী অর্থ বকেয়া ছিল তা মওকুফ করে দিতে হয়েছিল।

চিন্তা করুন, কুরআন মদকেও নিষিদ্ধ করেছে, জুয়াকেও নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি যে, তোমরা যদি মদপান করো, জুয়া খেলো তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তোমরা কেউ তোমাদের ইচ্ছেকে চরিতার্থ করো না, যদি তোমরা তোমাদের ইচ্ছেকে চরিতার্থ করো, বাসনা পূরণ করো, তাহলে তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এমন কথা কুরআনে বলা হয় নি। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে

কুরআন বলেছে যে, যদি তোমরা সুদের সাথে জড়িত হও অথবা তোমরা যদি নিজেদেরকে সুদের সাথে সম্পৃক্ত করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

আমি আমার কথা শুরু করেছি কুরআনের কতগুলো আয়াত তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। তাদের মধ্যে রয়েছে সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

এ আয়াত মহানবী ﷺ এর ওপর নাযিল হওয়ার পর তিনি বলেন, আমিই হলাম প্রথম ব্যক্তি যে, প্রথম সুদ ত্যাগ করার জন্য হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের নিকট যাই, তাকে এই সুদ মওকুফ করার জন্য।

এ আয়াতের পরের আয়াতেই অর্থাৎ ২৭৯ আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর তোমরা যদি পরিত্যাগ না করো তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি তোমরা তাওবা করো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা জুলুম করো না; তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।

চিন্তা করুন, কুরআন মদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে উল্লেখ করেছে এবং এটা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু কুরআন এখানে এ কথা বলে নি যে, তোমরা মদকে প্রশ্রয় দিয়ো না। যদি তোমরা মদকে প্রশ্রয় দাও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কিন্তু সুদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রকাশ্য ও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি তোমরা সুদের সাথে জড়িত হও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করো বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে লড়বেন। আমি জানতে চাই, বর্তমান বিশ্বে এমন কোন্ মুসলমান আছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। যদি আপনি আপনাকে সুদের সাথে জড়িত রাখেন তাহলে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন।

এর পরবর্তী আয়াত সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৮০-তে বলা হয়েছে–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি সাদকা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীসও রয়েছে, যেমন মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهِ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ۔

অর্থ : যাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন তাদের প্রতি যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লিখে ও সুদের সাক্ষী দেয়। তিনি বলেছেন, এরা সবাই সমান অপরাধী। (মুসলিম শরীফ)

আরো বর্ণিত আছে যে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَةُ دِرْهَمُ رِبًا يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةِ وَثَلَاثِيْنَ زَانِيَةٌ ۔

অর্থ : আবদুল্লাহ হানতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি টাকা খায়, সে ছত্রিশবার যিনার চেয়েও বেশি অপরাধ করলো।

আর একটি হাদীস হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ ۔

অর্থ : আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, সুদের পাপের সত্তরটি অংশ রয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাযা, বায়হাকী)

সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সুদ নিষিদ্ধ করার জন্য। এ আয়াতগুলো ২৭৫ থেকে ২৮১ নং পর্যন্ত। এরপর মহানবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ

এর তিরোধানের পর সাধারণ লোকদের শরিয়া'হ-র বাস্তবায়ন সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিলনা। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর উল্লেখ করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন, মহানবী ﷺ তিনটি জিনিসকে ছুঁড়ে ফেলেছেন। প্রথমত, সুদ অন্য দুটি হলো : খিলাফা এবং কেলালা। অর্থাৎ, তা হলো একজন অসুস্থ ব্যক্তি, যার কোনো ওয়ারিশ নেই তার সম্পদ কীভাবে বণ্টন হবে। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১২নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : স্ত্রীরা যা রেখে যায় তোমাদের জন্য তার অর্ধেক যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের ওসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার এক- চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা তার এক-চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে তাহলে তারা এক-অষ্টমাংশ পাবে তোমাদের ওসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা হতে। আর কোনো ব্যক্তি যদি 'কালালা'কে উত্তরসূরি বানায় অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। আর যদি সংখ্যা উহার বেশি হয় তবে তারা ওসিয়ত এবং ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সহিষ্ণু।

কিন্তু কুরআনের উল্লেখ ছাড়াই আপনি হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন, এগুলো বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি সহীহ্ বুখারীর সূচি থেকে একের পর একটি অধ্যায় পড়তে থাকেন তাহলে সহীহ্, বুখারীর রিবা অধ্যায়ের টিকা গ্রন্থ হতে জানতে পারবেন যে, রিবা দুই প্রকার, 'রিবা নাসিয়া' এ

হলো এমন ধরনের ঋণ যা অন্যকে ব্যবসার জন্য দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করা হয় এ ঋণের ওপর।

অন্য প্রকার সুদ হলো 'রিবা ফাদল'। এটা হলো এক প্রকার মালের পরিবর্তে অন্য ভালো উৎকৃষ্ট মানের বা বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিনিময়।

অর্থাৎ খারাপ মালের পরিবর্তে ভালো মাল বা কম মালের পরিবর্তে বেশি পরিমাণ মালের বিনিময়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, এসব প্রকার রিবা নিষিদ্ধ বা হারাম। সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিমেও উল্লেখ করা হয়েছে।

খণ্ড নং ৩ অধ্যায় নং ৬২৩, হাদীস নং ৩৮৯৪৫ থেকে ৩৮৯৪৯ পর্যন্ত। এই পাঁচটি হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুদ হারাম।

কুরআন কেন সুদমুক্ত অর্থনীতির ব্যাপারে জোর দিল? এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই বা কী? কুরআন কেন সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার বিধান জারি করলো? কুরআন কোন্ উদ্দেশ্যে সুদ মুক্ত অর্থব্যবস্থার বিধান দিল? এর জবাব নিম্নরূপ :

প্রথমত, যদি অর্থনীতিকে কল্যাণকর করতে হয় তাহলে ইসলামের উদার অর্থনৈতিক জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য।

তৃতীয়ত, সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য।

চতুর্থত, সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য।

আসুন আমরা প্রথম উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করি, এটা হলো ইসলামের আধুনিক উদার জীবনব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক কল্যাণকামিতা।

আল-কুরআনে সূরা বাকারার ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ لا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ۔

অর্থ : তারা বললো, তোমার প্রভুকে বলো তিনি যেন আমাদের তার (গাভীর) রং বলে দেন। তিনি বললেন, তিনি বলেছেন যে, তার রং হবে হলুদ বর্ণের। তার উজ্জ্বল রং দর্শনার্থীদের আনন্দ দেবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে সূরা বাকারার আয়াত নং ১৬০-এ

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِم ج وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔

অর্থ : যারা এ নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যেগুলো গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিবো। আর আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সূরা জুমু'আর ১০নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো আশা করা যায় তোমরা তোমরা সফলকাম হবে।

এসব আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন মানুষকে আল্লাহর অনুগত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করছে এবং আল্লাহ আমাদের জন্য সেসব ভালো জিনিস দিয়েছেন তা ভোগ করতে। এ বিষয়ে হাদীসেও এসেছে। যা বায়হাকীতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, অন্যান্য ফরজের মতো হালাল উপার্জনও একটি ফরজ। (বায়হাকী)

ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এ বিষয়ে সহীহ্ বুখারীতে এসেছে খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ১৩৩-এ। এখানে বলা হয়েছে, 'উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।' এ সম্পর্কে আরো এসেছে 'ইবনে মাযা'তে। খণ্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৭৩৩। এখানে বলা হয়েছে যে, নিজের হাতে নিজের পরিশ্রমের আয় হলো সর্বোত্তম আয়। সুতরাং ইসলাম একজন মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এবং নিজে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতা।

পবিত্র কুরআনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে, এ আয়াতে বলা হয়েছে –

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী যে সর্বাধিক পরহেজগার, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।

সূরা হুজুরাতের ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধন করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে করে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

পূর্বে আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহর নিকট সম্ভ্রান্ত হওয়ার, প্রিয় হওয়ার, বিশিষ্ট হওয়ার মাপকাঠি, তা কোনো লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য নয়, সম্পদশালী হওয়া নয়, জাতপাত নয়, বর্ণও নয় বরং এটা হলো তাকওয়া, আর তা হলো আল্লাহভীতি। আমরা আরো জানতে পারি যে, যখন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ বিদায় হজের ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, 'কোনো আরব অনারব থেকে উত্তম নয়, কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে উত্তম নয়, বরং তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তাকওয়াবান, অধিক জ্ঞানী, যার তাকওয়া বেশি সেই উত্তম।' এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়– তা হলো সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াত। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ج

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর সাক্ষী হয়ে যাও (তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য) যদিও তা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো : সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন। ইসলাম আবারও দার্শনিক ও আদর্শিক দিক থেকে সম্পদের গুটি কয়েক ব্যক্তির নিকট সম্পদের পুঞ্জীভূত হওয়াকে সমর্থন করে না এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের বৈষম্যকে হ্রাস করার জন্য এ বণ্টন ব্যবস্থা। কেননা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য না কমলে তারা শত্রুতে পরিণত হবে। এজন্য ইসলাম যে মহৎ ব্যবস্থা রেখেছে তা হলো যাকাত। এটা যেসব মুসলমান নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তাদের ওপর ফরজ। যেসব মুসলমানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকবে তাকে শতকরা ২.৫ টাকা হারে প্রতি চন্দ্র বছরে

গরিবদেরকে দিয়ে দিতে হবে। এ অর্থ যেসব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেয়া হবে তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে–

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ : এ সাদ্‌কাগুলো তো আসলে , মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত জয় প্রয়োজন, এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য– এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

যাকাতের ৮টি খাতের বিবরণ

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে যাকাত বণ্টন করার জন্য যে ৮টি খাতের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **ফকির :** অর্থাৎ যার কোনো সম্পদ নেই বা থাকলেও খুব সামান্যই আছে।

২. **মিসকিন :** যে ব্যক্তির কাছে ফকির থেকে কিছু বেশি সম্পদ আছে কিন্তু তা তার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়, তিনিই মিসকিন।

৩. **আমেল বা কর্মচারী :** যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীদের আমেল বলা হয়। এ ধরনের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে।

৪. **মন জয় করার জন্য :** অমুসলিম, নওমুসলিম ও ইসলাম বিরোধিতাকারীদের মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয়।

৫. **দাসমুক্তি :** দাসমুক্তির জন্য, বন্দিদের মুক্তির জন্য ও মিথ্যা মামলায় গরিব আসামী মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. **ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ :** ঋণ পরিশোধে অক্ষম, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।

৭. **আল্লাহর পথে :** জিহাদসহ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব ধরনের ব্যয় মেটানোর জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।

৮. **মুসাফির :** বিদেশে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।

এ ৮টি খাত ব্যতীত যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। কারণ এগুলো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট

বা পুল নির্মাণ, টিউবওয়েল বসানো, খাল খনন, মাহফিল অনুষ্ঠান এবং মৃতের দাফন সংক্রান্ত কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

যাকাতের কিছু শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যাকাত ব্যবস্থার জন্য কিছু শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এর কারণ সূরা হাশরের ৭নং আয়াতে এসেছে–

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ط وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

যাকাতব্যবস্থার প্রবর্তন হলো সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, দারিদ্র্যবিমোচন, যদি প্রত্যেকে এ যাকাত চর্চা করে, যাকাত ব্যবস্থা মেনে চলে তাহলে কোনো মানুষই না খেয়ে, ক্ষুধায় মারা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো অনেক মুসলমানই যাকাত সঠিকভাবে আদায় করে না। অধিকাংশ মুসলমান সঠিকভাবে যাকাত দেয় না। মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশের প্রত্যেকে যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তাহলে বিশ্বের মুসলমানদের একজনও দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে না। ইসলাম শিক্ষা দেয় সঠিক কর্মসংস্থানের, যে বেকার তাকে সঠিক কর্মসংস্থানের এবং তার কাজের ন্যায্য মজুরি দেয়ার জন্য। ইসলাম মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদের বিভাজনের, বণ্টনের বিধি-বিধান জারি করেছে, যা কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ ۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ

الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ط فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, দুই মেয়ের সমান এক ছেলে পাবে।

স্ত্রীরা যা রেখে যায় তোমাদের জন্য তার অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের অসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা তার এক-চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোনো পুত্র না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে তাহলে তারা এক-অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের অসিয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা হতে। আর কোনো ব্যক্তি যদি 'কালালা'কে উত্তরসূরি বানায় অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায় তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। আর যদি সংখ্যা তার বেশি হয় তবে তারা অসিয়ত এবং ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল। (সূরা নিসা : ১১, ১২)

কিন্তু কুরআন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাদের সম্পদ অবশ্যই বণ্টিত হবে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী।

ইসলাম অনুসারে একজন মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, কোনো লোক বা কেউ এমন কি রাষ্ট্রও তার স্বাধীনতাকে রহিত করতে পারে না। কোনো বিষয়েই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং তার স্বাধীনতায় কেউ বাধা দিতে পারে না, যতক্ষণ না সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কার্যক্রম করে থাকে। কারণ, ইসলামে বৃহৎ কল্যাণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বার্থ থেকে অগ্রাধিকার পায়। কর্ম ও শ্রম উভয় এবং ব্যবসায় লাভ উভয়ই শরিআতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষক এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তাহলে বড় লোকসান দিয়ে ছোট ক্ষতি গ্রহণ করবেন অর্থাৎ ছোট ক্ষতির পরিবর্তে বড় ক্ষতি গ্রহণ করবেন না। আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যে, বড় লাভ বিসর্জন দিয়ে ছোট লাভ গ্রহণ করবেন? সংক্ষেপে, সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনেক মন্দ ফলাফল রয়েছে, যে কারণে কুরআনে সুদকে হারাম করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণ করলো ব্যবসা করার জন্য এবং সে চাইবে এ থেকে ১০০ রুপি লাভ করার জন্য এবং তাকে সুদ পরিশোধ করতে হবে, তখন তার ধারণা তার উৎপাদন খরচ হলো ১০০ রুপি এবং সে এ থেকে লাভ করতে চায়। সুতরাং বিক্রয় মূল্যের সাথে উৎপাদন মূল্য যোগ হবে। তাহলে বিক্রয় মূল্যের সাথে Cost price সুদ-এর সাথে সুদ যোগ হয়ে বিক্রয়মূল্য বেড়ে যাবে।

সুতরাং বিক্রয়মূল্য হবে ১০০, এবং এ বিক্রয় মূল্য সুদের কারণে বৃদ্ধি পাবে, এবং যদি বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাবে। চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কারণে যোগানও কমে যাবে। এভাবে উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং যখন উৎপাদন কমে যাবে তখন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে, দেখা দিবে বেকারত্বের সমস্যা। এভাবে সুদের কারণে সমাজে অনেক অন্যায় অবিচার দেখা দেয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলে সে লাভ করুক বা নাই করুক তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পরিশোধ করতে হবে। কোনো পরিবারের জন্য কি এমন কোনো দুর্বিপাক আসতে পারে না যেমন বন্যা, এমন ক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তিকে সুদের পরিমাণসহ ঋণ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। এখানে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ঋণগ্রহীতা লাভ করুক আর লোকসান দিক তাকে অবশ্যই ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। তাকে অতিরিক্ত কোনো সময় বা সুযোগ দেয়া হয় না।

অন্যদিকে আধুনিক ব্যাংকের কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে না শুধু সুদের কারণে। সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ তাদের বিবেচনার বিষয় নয় বরং তাদের মূল লক্ষ্য হলো অধিক লাভ পাওয়া। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা বিনিয়োগ করে না। যেমন : দুজন লোক একই সময়ে ঋণের জন্য আধুনিক ব্যাংকে এলো এবং প্রথমজন বললো, আমি একটি অ্যালকোহল ফ্যাক্টরি করবো এবং এর থেকে ১০০% লাভের সম্ভাবনা আছে, আপনাদেরকে (ব্যাংককে) বেশি লাভ দেয়া হবে, ২য় ব্যক্তি বললো, আমি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ চাই এ প্রকল্পে লাভ কম। এক্ষেত্রে বেশি লাভ অর্থাৎ ১ম ব্যক্তিকে ঋণ দিবে ২য় ব্যক্তিকে দিবে না। অ্যালকোহল যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে তা বিবেচনার বিষয় নয়, সুদ এভাবে সমাজকে সামনে অগ্রসরের পথে বাধা দেয় এবং সমাজকে পশ্চাদগামী করে তোলে।

সুদের অন্য একটা কুপ্রভাব হলো, সুদ সমাজে অলস পুঁজি সৃষ্টি করে। মানুষ চায় নিরাপদে উপার্জন করতে। সুদ যেহেতু নিশ্চিত তাই মানুষ অর্থ লেনদেন না করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার না করে পুঁজিকে অলস বসিয়ে রাখে, এতে করে অলস পুঁজির সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সুদের আরো একটি কুফল হলো অর্থের গুটিকয়েক ব্যক্তির নিকট সম্পদের পুঞ্জীভূত হওয়া। সুদ সম্পদের অসম বণ্টনকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে

ব্যাংকের ক্লায়েন্টগণ অংশীদার নয়। সুদ শোষণের হাতিয়ার। যার ফলে বর্তমান বিশ্বে সম্পদের একমুখী গতি বেড়েই চলছে। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদিদের নিকট বর্তমানে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠেছে। কারণ, তারা বর্তমানে বিশ্বের এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

ইসলামী বিধানে উৎপাদনে জড়িত উপকরণ চারটি। প্রথমটি হলো ভূমি, দ্বিতীয়টি শ্রম, তৃতীয়টি হলো মূলধন এবং চতুর্থটি সংগঠন।

আধুনিক মতবাদে ভূমির প্রাপ্য হলো খাজনা বা ভাড়া। ইসলামী বিধানও একই অর্থাৎ ভূমির জন্য খাজনা। দ্বিতীয় উপকরণ শ্রম, শ্রমের প্রাপ্য, আধুনিক মতবাদে মজুরির কথা বলা হয়। একইভাবে ইসলামী বিধানেও শ্রমের জন্য Wage-এর কথা বলা হয়।

উৎপাদনের তৃতীয় উপকরণ হলো মূলধন। আধুনিক মতবাদে মূলধনের ক্ষেত্রে দেয়া হয় সুদ। কিন্তু ইসলামী বিধানে বলা হয় মূলধনের প্রাপ্য হলো লাভ-লোকসান, বা অংশীদারিত্ব।

উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ হলো সংগঠন। আধুনিক মতবাদে সংগঠককে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব বহন করতে হয়। ইসলামী বিধান সংগঠকের জন্য লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের কথা বলে।

চারটি উপকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, তৃতীয় উপকরণ তথা মূলধনের ক্ষেত্রে। আধুনিক মতবাদ বলে, মূলধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ধার্য করার কথা। অন্যথায় ইসলামী বিধান মূলধনের জন্য লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের কথা বলে। আধুনিক মতবাদ এবং ইসলামী বিধানের এটিই হলো মূল পার্থক্য।

ইসলাম মূলধন এবং সংগঠকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নি। কারণ টাকা পয়সা তথা মূলধন– যা ব্যাংক ধার দেয় তা মূলত ব্যাংকের নয়। এ মূলধনের মালিক মূলত আমানতকারী। সুতরাং আমানতকারী এবং সংগঠক একই। এভাবে ধার করা অর্থই ব্যাংকে আমানত করা হয়। এ অর্থ বা মূলধন অবশ্যই সংগঠকের সাথে সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যে কারণে ইসলামী বিধানে সংগঠন মূলধন এবং এটির ভিত্তি হলো লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পাঁচটি মৌলিক মূলনীতি হলো–

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহর একত্ববাদ।

২. রিসালাত তথা মহানবী (সা)-এর নবুয়াতের পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা।

৩. 'খিলাফা' তথা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাঁর মতো জ্ঞানী আর কেউ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

৪. 'তাযকিয়াহ'।

৫. Accountability তথা জবাবদিহিতা।

ইসলামী ব্যাংকিং এ পাঁচটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের ইতিহাসে ঘাটতি ইউনিট এবং উদ্বৃত্ত ইউনিটের সর্বোত্তম দুটি উদাহরণ রয়েছে যা আমরা আপনাদের দিতে পারি।

আসুন, আমরা ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ করি। সর্বাগ্রে আমরা প্রথমটি বিশ্লেষণ করবো। কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একটি চলতি হিসাব খুলতে পারে ইসলামী ব্যাংকে। এটি একটি চলতি হিসাব। এ চলতি হিসাবের নাম 'আল ওয়াদিয়া'। আল ওয়াদিয়া হিসাবের বৈশিষ্ট্য হলো আমানতকারী ইসলামী ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবের এ হিসাবে টাকা আমানত করবে। ইসলামী ব্যাংক যে টাকা আমানতকারীর নিকট থেকে গ্রহণ করবে, তা আমানতকারীর অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করার সুযাগ পাবে। আপনি একজন আমানতকারী এবং আপনি ব্যাংকে অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন এবং ব্যাংক যদি লোকসান দেয়, তবে এ লোকসানের ভার আমানতকারীর ওপর পড়বে না। কিন্তু যদি ব্যাংক লাভ করে তাহলে ব্যাংক আমানতকারীকে লাভের অংশ দিবে না। আমানতকারী টাকা জমা রাখবে শুধু তার অর্থের নিরাপত্তার জন্য, এখানে আমানতকারী লাভ-লোকসানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে।

সে তার সম্পদের নিরাপত্তার জন্যই অর্থ জমা রাখবে অর্থাৎ আমানত হলো তার নিকট মুখ্য। ইসলামী শরিআত এ বিষয়ে আমাদেরকে বৈধতা দেয় অর্থাৎ আপনি আপনার অর্থ ব্যাংকে আমানত হিসেবে জমা করতে পারেন এবং ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে, একই সময়ে ইসলামী ব্যাংক আপনাকে একটি চেক এবং স্লিপ বুক দিল। কিন্তু সাধারণত এ চেক বই দিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজনমতো অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং স্লিপ বুক দিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজনমতো অর্থ জমা করতে পারেন। যা আপনি আধুনিক ব্যাংকে করে থাকেন। আমরা এখন ২য় প্রকার deposit account-এর কথা বলবো, এটি হলো একটি saving account—এ Saving account-এ আপনি একজন আমানতকারী এবং আপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আপনার অর্থের নিরাপত্তা। লাভ-লোকসানের ব্যাপারে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই। যদি ব্যাংক আপনার অর্থের দ্বারা কোনো লাভ করে তাহলে ঐ লাভের অংশ থেকে কিছু নিতে আপনার আপত্তি নেই। শরিআত বলে আপনি আপনার ব্যবসা থেকে যে লাভ করেন তা থেকে একটি অংশ অন্যকে উপহার বা পুরস্কার হিসেবে দেয়ার অধিকার আপনার আছে। শরিআতে এ উপহারকে বলা হয় সাদকাহ। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকে আপনার জমা টাকা থেকে ইসলামী ব্যাংক লাভ করলে লাভের অংশ থেকে আপনাকে একটি অংশ দিতে

পারে। কিন্তু আপনি কোনোক্রমেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দাবী করতে পারেন না। এটা ইসলাম অনুমোদন করে না বা অনুমতি দেয় না। ব্যাংক আপনাকে যে অংশ দিল তা গ্রহণ করলেন এবং বাকি লভ্যাংশ ব্যাংককে দেয় হিসেবে প্রযোজ্য হবে। আপনার যদি ইচ্ছে হয় তবে আপনার অধিকার আছে এ অর্থ ফেরত দেয়ার। এটা ইসলামী শরিআতে বৈধ।

সুতরাং এ account, চলতি হিসাব এবং Saving account-এ আমানতকারী প্রধানত তার অর্থের নিরাপত্তার বিষয়ে আগ্রহী থাকে, তারা লাভের ব্যাপারে নয়।

আরো অন্য হিসাব আছে। যেমন Investment account একে আধুনিক ব্যাংকের Fixed deposit account-এর সমতুল্য বলা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আরো বেশ কিছু হিসাব রয়েছে। তা হলো মুরাবাহা-এর অর্থ হলো লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব অর্থাৎ একজন আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা দেয়। এ নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় হতে পারে ৩ মাস বা ৩ মাসের গুণিতক। এমন হতে পারে ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ২ মাস ইত্যাদি। এ উদাহরণ আপনাদেরকে দেয়া হলো মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংকের ওপর ভিত্তি করে। এটিই হলো বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উত্তম ইসলামী ব্যাংক। শুধু তাই নয় মালয়েশিয়ান ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও এটি সেরা।

বিশ্বের অন্য কোনো ইসলামী ব্যাংক কোনো দিক দিয়ে মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংক থেকে উত্তম নয়। অন্যসব দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো আংশিক ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করে আবার আংশিক আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। আমার জানা মতে মালয়েশিয়া একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ১০০ ভাগ শরিয়া অনুসরণ করে। আমি আপনাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যে ধারণা বলছি তা মালয়েশিয়ান ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর ভিত্তি করে।

এ Investment account, যাকে বলা হয় 'মুদারাবাহ্'।

আপনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ রাখলেন, সময় হতে পারে ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস অথবা ১২ মাস অথবা ৩ মাসের যেকোনো গুণিতক, কোনো কোনো ব্যাংক ৪ মাসের গুণিতক হিসাব করে থাকে। এ অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবহার করে থাকে। এ অর্থ ব্যাংকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। সুতরাং এ একাউন্টে ডিপোজিটর যে অর্থ জমা রাখে এক্ষেত্রে Depositor-কে বলা হয় 'সাহেবে মাল' এবং ব্যাংককে বলা হয় 'সাহেবে আমল'। আপনি হলেন উদ্বৃত্ত ইউনিট। Depositor হলেন Surplus unit এবং (I.B) ব্যাংক হলো deficite unit। ইসলামী ব্যাংক যে পরিমাণ লাভ করুক না কেন তা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন হবে। ইসলামী ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ লাভ করবে তা ইসলামী ব্যাংক এবং Depositor-এর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন হবে। মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকে এ অনুপাত হলো ৭ ভাগ

এবং ৩ ভাগ। ৭ ভাগ লাভ দেয়া হয় Depositor-কে, ৩ ভাগ লভ্যাংশ দেয়া হয় Bank-কে, অর্থাৎ ৭০% লভ্যাংশ পায় Depositor এবং ৩০% লভ্যাংশ পাবে ব্যাংক।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকে এক বছরের জন্য ১,০০০ টাকা আমানত রাখলেন এবং ব্যাংক ১০০ টাকা লাভ করলো, সুতরাং ব্যাংক আপনাকে ৭০ টাকা দিবে এবং ব্যাংক লাভের বাকি ৩০ টাকা রাখবে। কিন্তু সাধারণত আপনি আপনার মূলধন ফেরত পাবেন। লাভ ৭০% হলে আপনি পাবেন ৭০ টাকা, ব্যাংক রাখবে ৩০ টাকা। আর যদি ব্যাংক ৩০০ টাকা লাভ করে তখন ব্যাংক ৩০% লভ্যাংশ তথা ৯০ টাকা রাখবে আপনাকে ৭০% লভ্যাংশ অর্থাৎ ২১০ টাকা দিবে। সুতরাং লাভের পরিমাণ যত বেশি হবে আমানতকারীর লভ্যাংশ তত বেশি হবে এবং ব্যাংকের লভ্যাংশ তত বেশি হবে। একইভাবে লাভের পরিমাণ যত কম হবে আমানতকারী এবং ব্যাংকের লভ্যাংশ তত কম হবে।

এ হলো লাভের বণ্টন এবং যদি লাভ হয় শূন্য অন্য কোথাও কোনো লাভ না হয় তাহলে ব্যাংক এবং আমানতকারী উভয়ই কোনো লাভ পাবে না তথা ০০ লাভ পাবে। কিন্তু মনে করুন এমন একটি পরিস্থিতি যে, ব্যাংক লোকসান দিল– তাহলে মুদারাবা পদ্ধতিতে এ লোকসান বহন করবে শুধু Depositor।

এ ব্যবসার লোকসান কেবল Depositor-ই বহন করবে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, আপনি ১,০০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন ১ বছর মেয়াদি এবং ১০০ টাকা লোকসান হলো তাহলে আপনার উপরই ১০০ টাকা লোকসান বর্তাবে এবং সেজন্য আপনি আপনার মূলধন তখন ৯০০ টাকা ফেরত পাবেন। এ ১০০ টাকা লোকসান হিসেবে কর্তন করা হবে। অর্থাৎ এ লোকসান কেবল আমানতকারীই বহন করবে। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু ইসলামী ব্যাংকও লোকসানের সম্মুখীন হলো। কারণ সাধারণভাবে তাদের অফিস স্টাফদের বেতন দেয়া এবং তাদের পরিচালন ব্যয় আছে কিন্তু এগুলো ধরা হয় না। বস্তুত, এ ব্যাংক Cost free চলে না।

সুতরাং ব্যাংক নিজেও এ লোকসানের ভাগীদার হয়। যদিও তা আমানতকারীর সাথে তুলনামূলকভাবে শতকরা হিসেবে কম। এটাই হলো পদ্ধতি। এখন আমরা ইসলামী ব্যাংকের একটি বিনিয়োগ প্রকল্প দেখবো। মনে করুন, একজন ব্যবসায়ী সে ইসলামী ব্যাংক থেকে Loan নিতে চায়। সে ইসলামী ব্যাংকে গেল এবং বললো, আমার প্রকল্পের জন্য অর্থ চাই। তার জন্য প্রথম পদ্ধতি হলো মুদারাবা পদ্ধতি। তা হলো, ঐ ব্যবসায়ী ইসলামী ব্যাংকে যাবে এবং বলবে, আমার একটি ৬ মাসের প্রকল্প আছে এবং এর জন্য আমার ৫ লাখ টাকা দরকার। আমি ৬ মাস পর এ প্রকল্প থেকে ১ লাখ টাকা লাভ পাবো। এ প্রকল্প থেকে ৬ মাস পর ১ লাখ টাকা লাভ পাওয়া যাবে। তাহলে ইসলামী ব্যাংক কি ব্যবসায়ীকে ১ লাখ টাকা ৬ মাসের জন্য দিবে? কিন্তু সাধারণভাবে ইসলামী ব্যাংক যা করবে তা হলো, তারা প্রথমে ব্যবসাটি কী এবং ব্যবসাটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তা লাভজনক হবে কিনা তা

বিশ্লেষণ করে দেখবে। যদি তাদের বিশ্লেষণ ইতিবাচক হয় তাহলে তখন ইসলামী ব্যাংক এবং ব্যবসায়ী এক টেবিলে বসবে এবং লাভের অংশীদারিত্বের অনুপাত চূড়ান্ত করবে। অর্থাৎ তারা তাদের ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর লাভের অনুপাত কী হবে তা চূড়ান্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী ব্যাংক বললো, আপনার প্রকল্প থেকে যে লাভ হবে তার ৩ ভাগ পাবে ইসলামী ব্যাংক এবং ২ ভাগ পাবেন আপনি (ব্যবসায়ী) অর্থাৎ উদ্যোক্তা যে লাভ করবে তার ৬০ ভাগ পাবে ইসলামী ব্যাংক এবং বাকি ৪০ ভাগ পাবে উদ্যোক্তা। এটি তারা দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারে। (লাভের অনুপাত)

আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সুদের হারের ক্ষেত্রে দরকষাকষি চলে। ইসলামী ব্যাংকিং- এর ক্ষেত্রে লাভের অনুপাতের ক্ষেত্রে দরকষাকষি চলে। সুতরাং ব্যবসায়ী তখন বললো যে, আমার ৬ মাস মেয়াদী ব্যবসার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। এ ৫০ হাজার টাকা তার ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হলো তথা ব্যবসায় কাজ করলো এবং এর সাথে তার বেতনও একীভূত হবে। যদি সে নিজে কাজ না করে। যদি অন্য কোনো লোক নিয়োগ করে তাহলে তার বেতন যোগ হবে না। কিন্তু সে যদি কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ অন্য লোক কাজ করলো ২,০০০ টাকায় মাস প্রতি তাহলে সে ২,০০০ টাকা মাস প্রতি পাবে ঐ ৫০ হাজার টাকা থেকে। ৬ মাসের জন্য সে ১২ হাজার (৬ × ২,০০০) টাকা পাবে। সে ৬ মাস শেষে ১২ হাজার টাকা পাবে এবং এ ১২ হাজার হিসাবে ধরা হবে এবং বাকি ৩৮ হাজার টাকা ব্যবসার মাল ক্রয় করতে এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হবে। বেতন হিসেবে ধরা হবে (৫০ হাজার টাকা হতে) তবুও সে (উদ্যোক্তা) ৫০ হাজার টাকা লাভ করবে। সে ফেরত পাবে ১ লাখ টাকা। কিন্তু সাধারণভাবে সে মূলধনের ৫ হাজার টাকা ব্যাংককে ফেরত দিবে। এবং বাকি ৫০ হাজার টাকা লাভের অংশ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে বণ্টন হবে। ইসলামী ব্যাংক নিবে ৬০ ভাগ, ৩৩ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ী নিবে ৪০ ভাগ, ১৩ হাজার টাকা। ৬ মাস শেষে ব্যবসায়ী পাবে ২০ হাজার লাভ এবং ১২ হাজার টাকা তার পারিশ্রমিক হিসেবে যদি লাভ হয়।

যদি ব্যবসায়ী ৪০ হাজার টাকা লাভ করে তাহলে সে ব্যাংককে দিবে ৬০ ভাগ ২৪ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ী যদি ৬০ হাজার টাকার লাভ করে তাহলে ব্যাংকে জমা দিবে ৬০ ভাগ, ৩৬ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ী রাখবে ৬০ ভাগ, ২৪ হাজার টাকা, লাভের পরিমাণ যত বেশি হবে ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর অংশও তত বেশি হবে। লাভের পরিমাণ যত কম হবে তাদের লাভের অংশও তত কম হবে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ী লোকসান দেয় তাহলে পুরোপুরি লোকসান। সবটুকু লোকসান ইসলামী ব্যাংক বহন করবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক এ লোকসান আমানতকারীদের ওপর চাপাবে। কিন্তু মুদারাবা পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যাংকের কোনো সেবিকা নেই যে, তা ব্যবসায়ী। উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনা Interfere করে। ব্যাংক প্রতি

সপ্তাহে, প্রতি মাসের জবাবদিহিতা নিতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ব্যবসা কীভাবে চলবে সে ব্যাপারে ব্যাংক Interfere করতে পারবে না। ধরুন, ব্যবসায়ী ১০তলা একটি বিল্ডিং তৈরি করতে চায় সুতরাং ব্যাংক তাকে বলতে পারবে না যে, আরো ২তলা বেশি বানাও এবং ব্যাংক এটাও বলতে পারবে না যে, তুমি যদি B গ্রেডের পরিবর্তে A গ্রেড সিমেন্ট ব্যবহার কর তাহলে কোনো লাভ হবে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসায়ীর ব্যবসার ব্যপস্থাপনার বিষয়ে কোনোই Interfere করতে পারবে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, 'মুশারাকা' পদ্ধতি। একে অংশীদারি কারবার বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবসার ব্যবস্থাপনাকে Interfere করার অধিকার থাকে। এখানে ব্যাংক দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং বলতে পারে যে, এটি একটি নির্দিষ্ট ধারা তৈরি করতে চায় বা নির্দিষ্ট ধারা তৈরি করতে চায় না, ১০তলা বিল্ডিংকে ১২ তলা বিল্ডিংয়ে রূপান্তর করা হবে। মুশারাকা সিস্টেমে ব্যবসা হলো মূলধনের একটি অংশ এবং এ মূলধন ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা হয়। এ মূলধন ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা হয় বিনিয়োগ হার হিসেবে। ধরুন, উভয় ৫০% হিসেবে মূলধন দিল, ব্যবসায়ী দিল ৫০% এবং ব্যাংক দিল ৫০%। কিন্তু সে ব্যবসা থেকে যে লাভ অর্জন হবে তা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে। উদাহরণস্বরূপ, এটা হতে পারে ৫০%, ৫০% যে লাভ হবে তার ৫০% পাবে ব্যাংক এবং বাকি ৫০% পাবে ব্যবসায়ী এবং যদি লোকসান হয় তাহলে লোকসানও উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে। উভয়েই বহন করবে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে। মুদারাবা পদ্ধতিতে লোকসানের পুরোটাই ব্যাংক বহন করে কিন্তু মুশারাকা পদ্ধতিতে লোকসানের অংশ পূর্ব নির্ধারিত হার অনুপাত অনুযায়ী উভয়ই বহন করে, এক্ষেত্রে লোকসানের অনুপাত বণ্টন লাভের অনুপাত বণ্টন থেকে পৃথক। যেমন : লাভের অনুপাত অর্ধেক অর্ধেক বা ৫০% এবং ৫০% কিন্তু লাভের অনুপাত ব্যাংকের জন্য ৬০% এবং ব্যবসায়ীর জন্য ৪০%। লোকসানের ক্ষেত্রে লাভের বেশি অংশ বহন করে। ধরুন, ব্যাংক লোকসান দিল তাহলে ব্যাংক লোকসানের ৬০% বহন করবে এবং ব্যবসায়ী ৪০% বহন করবে, এটা হলো মুদারাবা পদ্ধতি।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, মুরাবাহা পদ্ধতি। এর উদাহরণ হলো, ধরুন আপনি নির্দিষ্ট কোনো প্রকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে চান ব্যাংক থেকে। এ যন্ত্রপাতির দাম ১ লাখ টাকা। আধুনিক ব্যাংক আপনাকে এতে একটি এলসি বা লেটার অভ্ ক্রেডিট অথবা TR Cost recipt খুলতে হবে। আপনি ব্যাংকে এ পরিমাণ অর্থাৎ ১ লাখ টাকা অর্থ জমা রাখবেন এবং ব্যাংক এটি ক্রয় করবে এ আধুনিক ব্যাংক থেকে। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সময় লাগবে তার জন্য ব্যাংক আপনার ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. ডা. জাকির নায়েক আপনি যে মেয়াদ উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই। ধরুন, ২ বছর মেয়াদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলো এবং উদ্যোক্তা এ সময়ের মধ্যে কোনো লাভ অর্জন করতে ব্যর্থ হলো এবং কোনো লোকসানও দিল না এবং সময় নিলো। সুতরাং ব্যাংক কি এ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হবে না কি?

উত্তর : ধরুন, এ ব্যাংক হলো ইসলামী ব্যাংক। এ ইসলামী ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ২ বছর মেয়াদে বিনিয়োগ করলো এবং ব্যবসায়ী কোনো প্রকার লাভ অর্জন করতে ব্যর্থ হলো লোকসানও দিল না। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ ফেরত নিবে কি নিবে না তা শর্ত নির্দিষ্ট থাকে যে, ২ বছরের জন্য অর্থ নেয়া হবে ব্যাংক থেকে তাহলে ইসলামী ব্যাংকের অধিকার আছে যে, এ অর্থ ফেরত নেয়া। লোকসান হোক কিংবা লাভ হোক। এক্ষেত্রে লাভ-লোকসান মুখ্য বিষয় নয়। কিন্তু যদি ব্যাংক মনে করে ব্যবসায়ীকে আরো ৬ মাস সময় দেয়া হবে তাহলে ব্যবসায়ী হয়তো লাভ অর্জন করতে পারবে তখন ব্যাংক সময় ১/২ বছর কিংবা ২ বছর বাড়াতে পারে, তবে তা নির্ভর করে ব্যবসা কতটুকু লাভজনক। এটা সম্পূর্ণ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আর লোকসান বহনের মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যবসা যদি মুদারাবা সিস্টেমে হয় তাহলে ব্যবসায়ী সরাসরি লোকসান বহন করবে না, লোকসান বহন করবে ব্যাংক।

প্রশ্ন ২. আমার প্রশ্ন ব্যাংক জনগণকে যে হাউজিং লোন দেয় সে সম্পর্কিত। অনুগ্রহ করে আপনি কি বলবেন ইসলামী বিধানে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এ লোন কীভাবে হতে পারে– যা জনগণের বাসস্থান নির্মাণে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : ধরুন, একজন ব্যক্তি একটি বাড়ি কিনতে চায় এবং এজন্য ঋণ নিতে চায়। একটি আধুনিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ, ঋণদান এ হাউজিং-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের তুলনা কী হবে। আধুনিক ব্যাংকের আসল পার্থক্য হলো, মনে করুন, আপনি একটি বাড়ি কেনার জন্য হাউজিং লোন চান, কিন্তু সাধারণত এর জন্য আপনার নিজস্ব একটা হারে অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। এটা হতে পারে ১৫% অথবা ৫০%। ব্যাংক হারে যাহোক যা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তা হতে পারে ২৫% অথবা ৩০% অথবা ৫০%। এ পরিমাণ অর্থ আপনি দেয়ার পর বাকি ৭৫% বা ৫০% বা ২৫% পরিমাণ অর্থ ব্যাংক দিবে। মনে করুন, একটি বাড়ির

দাম ৩-৪ লাখ টাকা। প্রথমত আপনি দিলেন ১ লাখ টাকা এবং বাকী ৩ লাখ টাকা দিবে ব্যাংক এবং ব্যাংক আপনাকে বললো আপনি ৩ বছর সময় পাবেন এ অর্থ পরিশোধ করার জন্য। যে ৩ লাখ টাকা আধুনিক ব্যাংক থেকে নেয়া হলো তাতে ৩ বছরের সুদের হার ধরা হলো তা হলে কতটুকু পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তা হতে পারে ৪০ হাজার টাকা অথবা ৫০ হাজার টাকা। সুতরাং হিসাব করা হবে আপনাকে দেয়া প্রাথমিক লোন (৩ লাখ) যোগ হবে সুদ। সুতরাং সুদ হলো ৫০ হাজার টাকা। এ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৩ বছর মেয়াদ পরিশোধ করতে হবে। এ হারে ৫০ হাজার টাকা মাসের সংখ্যা দ্বারা এটা হবে মাসিক প্রায় ১০ হাজার টাকা। এটা হলো মাসিক কিস্তি। তাহলে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হচ্ছে। এটা হলো আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি। আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি হলো সুদভিত্তিক। আপনি যে কিস্তি দিলেন তা আপনাকে দেয়া লোনের সাথে সুদ যোগ হয়ে পরিশোধ হলো। কিন্তু এটা হলো সুদ এটা ইসলামে হারাম।

ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে যে লোন নিবেন তা নেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায় আছে। বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প আছে। মনে করুন, আপনি ৪ লাখ টাকার একটি ফ্লাটের ২৫% বা ৩০% বা ৪০% বা ৫০% প্রথমেই দিলেন। আপনি যদি ১ লাখ টাকা দেন তাহলে ব্যাংক দিবে ৩ লাখ টাকা। এখন ইসলামী ব্যাংক হিসেব করবে এ ফ্লাটের গড় মাসিক ভাড়া কত হবে। এটা হতে পারে মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা। যেহেতু আপনি প্রথমেই ১ লাখ বা ২৫% নিজে দিয়েছেন এবং বাকি ৭৫% ব্যাংক দিয়েছে, সুতরাং ২৫% আপনাকে দিতে হবে না, বরং বাকি ৭৫% আপনাকে দিতে হবে এবং ৭৫% হিসেবে ভাগ হবে। তাহলে মাসিক ভাড়া কত দাঁড়াবে? যেহেতু ইসলামী ব্যাংক ৭৫% বিনিয়োগ করেছে এবং ২৫% আপনি বিনিয়োগ করেছেন।

সুতরাং আপনি ভাড়া হিসেব করবেন এবং ৩ বছর শেষে অবস্থা দাঁড়াবে এমন যে, ইসলামী ব্যাংক বললো সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নিবে। তা হতে পারে ৩০ হাজার বা ৪৫ হাজার টাকা। সুতরাং ৩০ হাজার টাকা ৩ লাখের সাথে যোগ হবে। ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা ৩৬ মাস দ্বারা ভাগ করলে যা হবে তা মাসিক কিস্তি বা ভাড়া হবে। এখানে এটাকে সুদ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে না বরং তা লাভের ওপর লাভ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। আপনি প্রতি মাসে ঐ বাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছেন এটা হলো লোন নেয়ার একটি উপায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আলামিন ব্যাংকে গেলেন, তাদের একটা আবাসন প্রকল্প আছে। যেখানে ব্যাংক আপনাকে বললো, আপনাকে এখন থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত হতে হবে। আপনি প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা বা ২ হাজার টাকা বা ৩ হাজার টাকা জমা করলেন। এ জমা

পরবর্তীতে আসিয়ান স্কিমে পরিবর্তিত হলো। এ বিনিয়োগ মুদারাবা পদ্ধতিতে যোগ হলো। আপনি এখান থেকে লাভ পেলেন। ফলে ৩ বছর পর প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা। জমার টাকা দাঁড়াবে ৩,০০০ × ৩৬ = ১,০৮,০০০ টাকা। এ ১ লাখ ৮ হাজার এবং লাভ যোগ হয়ে এ পরিমাণ হতে পারে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার, বাকি যা থাকবে তা আপনাকে দিবে আলামিন ব্যাংক। এ টাকা ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেয়া হবে, এটা সুদ নয়। এটা লাভ। সুতরাং যাই কিছু সুদভিত্তিক তা হারাম বরং যা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয় তা হালাল, বৈধ।

প্রশ্ন ৩. ধরুন, আপনার নিকট সুদ থেকে পাওয়া অর্থ আছে। কেউ কেউ বলেন, আপনি এ অর্থ দিয়ে টয়লেট, বাথরুম তৈরি করতে পারেন, এটা কি ঠিক?

উত্তর : আপনার প্রশ্ন হলো যে, আপনার নিকট সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আছে, কেউ কেউ বলেন যে, এ অর্থ দিয়ে টয়লেট বাথরুম বানানো যাবে, আসলেই এটা করা যাবে কি-না?

প্রথমত, আপনি একজন মুসলিম, আপনি একজন মুসলিম হিসেবে কোনো ভাবেই সুদের সাথে জড়িত হতে পারেন না। সুতরাং আপনি যদি সুদের সাথে জড়িত না হন, তাহলে তো কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করবেই না। মনে করুন, আপনি কোনো সুদের সাথে জড়িত কোনো Institute বা সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখলেন না। তাহলে আপনি যদি সুদী প্রতিষ্ঠানে অর্থ না রাখেন তাহলে তো তারা আপনাকে সুদ দিবেই না। তাহলে তো এ প্রশ্ন উঠবেই না। মনে করুন, আপনি আজই জানলেন যে, সুদ হারাম এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি এখন থেকে, সুদ থেকে বিরত থাকবেন। যদি কোনো মানুষকে তাওবা করতে হয় তাহলে তাকে তিনটি বিষয় করতে হয়। প্রথমত, তাকে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়টি বা কাজটি করা হারাম। এটা নিষেধ, দ্বিতীয়ত, তাকে তৎক্ষণাৎ তা করা থেকে বিরত হতে হবে এবং তৃতীয়ত, তাকে ভবিষ্যতে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তখন আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার নিকট যদি কোনো সুদী অর্থ জমা থাকে তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, কোনো সুদভিত্তিক ব্যাংকে আপনার Fixed deposite এবং Current একাউন্ট আছে এবং এ ব্যাংক থেকে প্রতি বছর নিয়মিত যে অর্থ পান তা দিয়ে আপনি টয়লেট বানাতে চান। এই টাকা আপনি বাথরুম, টয়লেট তৈরির মাধ্যমে খরচ করবেন, কেউ কেউ যদি বলে থাকে আপনি এগুলো তৈরিতে ব্যয় করতে পারেন কিন্তু তারা এ কথা কোথা হতে পেল তা আমি জানি না। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন, কোনো একজন ব্যক্তি মাদকের ব্যবসা

করে। তা কোকেনের বা হেরোইনের ব্যবসা হতে পারে। সে বললো, আমি মাদকের ব্যবসাতে ১ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছি এবং আমার এ টাকা বিনিয়োগ থেকে প্রতিমাসে ১ লাখ টাকা লাভ পাই। যেহেতু মাদক হারাম, সেহেতু এ ব্যবসায়েই ১ লাখ টাকার এক পয়সাও নিব না, আমি টাকা গরিব লোকদের জন্য ব্যয় করবো। আপনি কি মনে করেন এটা ইসলামে বৈধ? সাধারণভাবে এটা ইসলামে বৈধ না। কিন্তু যেহেতু মাদক ইসলামে হারাম তাই মাদকের ব্যবসাও ইসলামে হারাম, আপনি বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি মাদক ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভালো কাজে ব্যবহার করবো। এটা বৈধ নয়। একইভাবে আপনার অর্থ যদি কোনো সুদী ব্যাংকে Fixed deposit করেন এবং তা হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারাই আপনি গ্রামে বাথরুম, টয়লেট তৈরি করে দেন, আপনি বললেন যে, আমি ১ লাখ টাকা দিয়ে প্রত্যেক গ্রামে টয়লেট তৈরি করে দেবো আপনি কি মনে করেন এটা বৈধ?

কেউ হয়তো মাদকের ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা মূল্যের হাজার হাজার জীবন ধ্বংস করে লাখ লাখ টাকা অর্জন করলো। কিন্তু এক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা অতি তুচ্ছ। সুতরাং আপনি ১ লাখ টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করে সামান্য ক্ষতি পূরণ করতে পারেন না। সুদ হারাম। সুতরাং আপনি সুদী প্রতিষ্ঠানে আপনার অর্থ না রাখলেই পারেন। তখন সুদী অর্থ ব্যয় করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনাকে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সুদ হারাম এবং আপনার যেকোনো ধরনের আয় হবে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তা কবুল করবেন।

প্রশ্ন ৪. জাকির ভাই, আপনি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সুদ নেয়া হারাম। সুদ দেয়াও কি হারাম?

উত্তর : আপনি একমত যে, সুদ গ্রহণ হারাম। আপনার প্রশ্ন হলো সুদ দেয়াও কি হারাম? সুদ ও জুয়া সম্পর্কে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

কুরআন মাদক নিষিদ্ধ করেছে ঠিক আছে, তাই আমি যদি বলি, মাদক সেবন তো হারাম, তাহলে মাদক বিক্রি কি বৈধ হবে? যেহেতু মাদক কুরআন নিষিদ্ধ করেছে, সেহেতু মাদক বিষয়ক সব কারবার হারাম। এ বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিত এসেছে।

উদাহরণস্বরূপ, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। এ হাদীসে হযরত আনাস (রা) বলেন, ১০ প্রকার মানুষকে আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন। এ দশ প্রকার মানুষ অভিশপ্ত। তাদের মধ্যে সুদের সাথে লেন-দেনকারীর উল্লেখও রয়েছে।

সুতরাং সুদ হারাম। একইভাবে আমিও একমত যে, কুরআন বিভিন্ন স্থানে সুদ গ্রহণ করা, সুদ দেয়া, এসব করতে নিষেধ করেছে। সুদ গ্রহণও নিষেধ। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমি আগেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছি, যেমন সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে এখানে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ط وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ : কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার রবের পক্ষ থেকে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে সুদ হতে বিরত থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সুদ যদিও ব্যবসার মতো, আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন কিন্তু সুদকে করেছেন হারাম। আল্লাহ এখানে সুদ দেয়া বা নেয়া উল্লেখ করেন নি। সুদের সর্বপ্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ, আরো জানার জন্য আপনাকে হাদীস থেকে বলছি, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সাক্ষী সবাই অভিশপ্ত। তারা সবাই এক।' তারপরের আরেকটি হাসীস মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করছি, জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সাথী তাদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, সবাই একই সমান।' আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৫. আমার মতে, Current Account সুদের সাথে জড়িত না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন, মর্ডান ব্যাংকের Current Account এবং ইসলামী ব্যাংকে Current Account-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

হ্যাঁ, Current Account-এ আপনি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন না এবং এ Account আপনাকে কোনো লাভ দেয় না। আপনি কেবল আপনার অর্থের নিরাপত্তার জন্য Current Account ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, মর্ডান ব্যাংক যেহেতু Account-এ সুদ লেনদেন করে না তাই মর্ডান ব্যাংকের Current একাউন্টেও অর্থ রাখা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আমি যৌক্তিক কিছু কারণ বলবো, যে কারণে মর্ডান ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের চেয়ে ইসলামী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট অধিক লাভজনক।

প্রথমত, যদিও ইসলামী ব্যাংকের এবং মডার্ন ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট কোনো লাভ দেয় না এবং এগুলো সুদের সাথে জড়িত নয় বা সুদ লেনদেন করে না তবুও মডার্ন ব্যাংকের Current Account-এ রাখা আপনার অর্থ কিছু কিছু প্রকল্পে ব্যবহৃত হতে পারে যেগুলো আসলেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন, এ অর্থ দিয়ে জুয়ার ব্যবসা হতে পারে কিংবা এমন একটি কারখানা করলো যা মাদকদ্রব্য তৈরি করে, সুতরাং স্বল্প মেয়াদে আপনি অর্থ জমা রেখে সমাজকে আরো পিছিয়ে দেয়ার কাজে সাহায্য করছেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার অর্থ ইসলামী ব্যাংকের Current একাউন্টে রাখেন তাহলে ইসলামী ব্যাংক এমন কোন্ প্রকল্প গ্রহণ করবে না যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামী ব্যাংকের সব প্রকল্প বিনিয়োগ শরিয়া বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। সুতরাং সব মুসলমান এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু অমুসলিমদের জন্য এটি ক্ষতিকর কিছু করে না। ইসলামী ব্যাংক বলে, আমি হলাম সমাজের জন্য ভ্রাতৃসুলভ। I am only for society.

তাহলে আপনি আরো বলতে পারেন ইসলামী ব্যাংক এবং মর্ডান ব্যাংকে অর্থ রাখার পার্থক্য কী?

ধরুন, আপনার অর্থ আপনি মডার্ন ব্যাংকে রাখলেন এবং ব্যাংক কোনো কারণে অকৃতকার্য হলো, তাহলে মর্ডান ব্যাংকের আইন অনুযায়ী ব্যাংকে Creditor-রা আগে অর্থ নিয়ে নিবে পরে Depositor-রা পাবে এবং সময়সাপেক্ষে Creditor -দেরকে অর্থ দিয়ে দেয়া হবে এবং অর্থ শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি অর্থ ফেরত পাবেন না। এভাবে আপনি আপনার অর্থ মডার্ন ব্যাংকে রাখলেন এবং মডার্ন ব্যাংক কোনো সমস্যায় পড়লে আপনার অর্থ ফেরত না পাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। আর আপনি যদি ইসলামী ব্যাংকে অর্থ রাখেন এবং ব্যাংক সমস্যায়

পড়ে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আপনার তথা Depositor আগে অর্থ ফেরত পাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ রাখা মডার্ন ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ জমা রাখার চেয়ে অধিক নিরাপদ।

প্রশ্ন ৬. আমরা কোন্ ধরনের ব্যাংকে লেনদেন করবো? এবং চাকুরি করবো?

উত্তর : আপনি কি একজন মুসলমান? মডার্ন ব্যাংকের কথা বলছেন না ইসলামী ব্যাংকের? আচ্ছা ধরলাম, আপনি ইসলামী ব্যাংকের কথা বলছেন বা আধুনিক ব্যাংকও হতে পারে। ধরলাম, আপনি আধুনিক ব্যাংকের কথা বলেছেন। আমি আগেই বলেছি যাই কিছু হোক না কেন, যা সুদের সাথে জড়িত তা নিষিদ্ধ। আপনি সুদ দেন, সুদ গ্রহণ করেন, অথবা সুদের লেখক হন বা সাক্ষী হন না কেন, আমি সহীহ্ মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করতে পারি।

খণ্ড ৩, অধ্যায় ৬২৮, হাদিস নং ৩৮৮১। জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী সবাই সমান।"

সুতরাং ব্যাংকে রেকর্ড রাখা হলো সাক্ষী হওয়া। তাহলে সহীহ্ মুসলিম থেকে জানা গেল আধুনিক ব্যাংকে লেনদেন করা, চাকুরি করা হারাম। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, 'আমি বর্তমানে আধুনিক ব্যাংককে চাকুরি করছি। আমি এখন কি করবো? আমি কি এ ব্যাংক ত্যাগ করবো?' হ্যাঁ, যদি আপনার ব্যাংক ত্যাগ করার সুযোগ থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করুন। আপনার কি করা উচিত? আপনার এখন অন্য কোনো বিকল্প চাকুরির খোঁজ করার চেষ্টা করতে হবে। আপনি এখন যে কাজ করছেন তা ত্যাগ করে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, এখন এমন অনেক লোক আছে যারা বলবে যে, আমি তো মডার্ন ব্যাংক ত্যাগ করতে চাই কিন্তু আমার তো সে সুযোগ নেই। কারণ, মডার্ন ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা পাই। কিন্তু তারা অন্য কোথাও থেকে ৩০ হাজার টাকা পেতে পারি। তারা অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে। সেখান থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবে।

আমি অন্য কোথাও চাকুরি করলে তা মডার্ন ব্যাংকের মতো সমতুল্য বেতনের চাকুরি পাবো না, অর্থাৎ বলা হচ্ছে, তাদের অন্য কোনো পছন্দ বা সুযোগ নেই বিকল্প নেই। অবশ্যই তাদের সুযোগ আছে বরং তারা ভয় পচ্ছে। তারা এ বেতন অন্য কোথা থেকে পেতে পারে। যদি তারা ৪০ হাজার টাকা নাও পায় তাহলে তারা

৩০ হাজার টাকার চাকুরি করবে। আসলে আরো অল্প সময়ে বেশি অর্থ চায় এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি মডার্ন ব্যাংকে চাকুরি করে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাংক ত্যাগ করেন এবং অন্য চাকরি করেন। যদিও তা কম বেতনের হোক। ইনশাল্লাহ হয়তো আপনি পরবর্তীতে বেশি বেতন পাবেন। আর আপনি যদি বেশি বেতন নাও পান তাহলে আল্লাহ আপনাকে পরকালে এর পুরস্কার দিবেন। যদি এ কোম্পানির সাহায্য প্রাপ্ত না হন। সাহায্য না পান তাহলে আপনি প্রতিদান হিসেবে কমপক্ষে ৭০০ গুণ বেশি পেয়ে যাবেন। যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন, আমি এখন মডার্ন ব্যাংকে চাকুরি করছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি এখন আধুনিক অর্থব্যবস্থা বুঝার চেষ্টা করছি যাতে আগামী চার বছর পর যে ইসলামী ব্যাংক শুরু করতে যাচ্ছি তা যেন আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি। আধুনিক ব্যাংকের চেয়েও ভালোভাবে।

আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, আপনার আসল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য এবং বাস্তবায়নের জন্য মডার্ন ব্যাংকিং শেখা। একইভাবে আপনি যদি কোনো কলসপের কথা, যদি আপনি কলসপে কাজ করেন তা অবশ্যই হারাম হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি এখানে ২-৩ মাসের জন্য চাকুরি করবো এ উদ্দেশ্যে যে, এটাকে বন্ধ করে দিব এবং এটাকে আমি মেডিকেল সেন্টারে পরিবর্তিত করে ফেলবো। তাহলে আমি মনে করি, আল্লাহ আপনাকে সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আপনি মডার্ন ব্যাংকে চাকুরি করতে পারেন যেন এ মডার্ন ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি শুধু বেতনের জন্য বেশি বেতনের উদ্দেশ্যে মডার্ন ব্যাংকে চাকুরি করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

প্রশ্ন ৭. ইসলামী ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ কি মডার্ন ব্যাংকের সুদ আদায়ের মতো নয়? ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য এ বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে থাকে?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ হিসেবে যে ফী নেয় তা মর্ডান ব্যাংকের সুদ চার্জ করার মতো কিনা। শুধু মুসলিমদেরকে আকর্ষণ করার জন্য শব্দ পরিবর্তনের কৌশল নয়? এটা কি মুসলমানদের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা নয়? আমি আমার বক্তব্যের তৃতীয় অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছিলাম যে, এটি একটি বিতর্ক-ই বটে। আধুনিক ব্যাংক যে সুদ গ্রহণ করে থাকে তা আমি ১১% বলে উল্লেখ করে থাকলে আমি দুঃখিত। এটা ১৪% থেকে ১৫% এর মতো। এটা প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে। এটা ২০% পর্যন্তও হতে পারে। আপনি যদি

ইসলামী ব্যাংকের বায়তুন নসর থেকে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নিতে চান তাহলে ইসলামী ব্যাংক আপনার নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে, তা হতে পারে ১০% থেকে ১৫% এর মধ্যে। এটা ৮% থেকে ১০%-এর মধ্যে ওঠা-নামা করে। কিন্তু ২ বছর পর এটা ১৪% হতে পারে।

এক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে, মডার্ন ব্যাংকের ১৬% সুদ আদায় করা আর ইসলামী ব্যাংকের ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করা একই কথা। আপনি বলতে পারেন ২% পার্থক্য সামান্য। এক্ষেত্রে কেবল শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের প্রথমে বিশ্লেষণ করতে হবে যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ইসলামী ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা আসলে লাভ-লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। এটা সুদভিত্তিক নয়। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকগুলো নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে এটা ১৫% থেকে ১৬% হতে পারে। অথচ ইসলামী ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা ১ বছরের লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। তা কোনো নির্দিষ্ট Company বা Institute-এর পার্থক্য হতে পারে।

সুতরাং যত বেশি মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে জড়িত হবে সার্ভিস চার্জ ততই হ্রাস পাবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এটা ৮% হতে ৯%-এর মধ্যে রাখতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, যদি আপনি বিশ্লেষণ করে দেখেন, কোনো ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে Fixed deposit করেন, ধরুন বরকত Investment-এ। বর্তমানে ইন্ডিয়াতে কোনো Investment company নেই যা পুরোপুরি ইসলামী Investment rule মেনে চলে। কেননা IRB এগুলোকে ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম চালাতে অনুমতি দেয় না। এগুলো কোনো চেক ইস্যু করতে পারে না। IRB তাদের এ অনুমতি দেয় না। ইসলামী ব্যাংক যে ধরনের বিনিয়োগ প্রাধান্য দেয় তা হবে এমন যে, উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট। যদি আপনি আপনার অর্থ মুশারাকা অথবা মুদারাবা পদ্ধতিতে স্থায়ী আমানত করেন তাহলে আপনি যে মুনাফা পাবেন বা তারা আপনাকে যে লাভ দিবে তা ১৬% হতে ২৬%-এর মধ্যে হতে পারে। তারা যে খরচ দেখায় তা একটির ক্ষেত্রে ১৬%, আবার আরো বেশি ১৭%, আবার অন্যের আরো বেশি ১৮%।

উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট ১৯% লাভ বা মুনাফা দেয় এবং ব্যাংক আপনার নিকট থেকে যে সার্ভিস চার্জ আদায় করে যদি আপনি বায়তুন নসর যা কিনা বরকত ইনভেস্টের সাথে সম্পর্কিত, ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করবে। আপনি যদি চালাক হন তাহলে ব্যাংকে বায়তুন নসরে ১ লাখ টাকা জমা বা বিনিয়োগ করুন এবং ৯০ হাজার অথবা ১ লাখ

টাকা নিন। যেহেতু আপনি একই সময়ে ১ লাখ টাকা ফেরত পাচ্ছেন, আপনি বায়তুন নসর থেকে আপনার ডিপোজিটের ওপর ভিত্তি করে ১ লাখ টাকা লোন নিতেও পারেন এবং এর জন্য আপনাকে শুধু ১০% সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সুতরাং সরাসরি আপনি যদি ১ লাখ টাকা ডিপোজিট করছেন তখনই ৯০ হাজার টাকা পেতে পারেন। একই দিন ১ লক্ষ টাকার ভিত্তি করে বায়তুন নসর থেকে পাবেন এবং বছর শেষে আপনাকে ১৪% হারে ১৪ হাজার টাকা দিতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, আপনি বরকত ইনভেস্টমেন্ট থেকে যে ১৯% মুনাফা পেলেন এবং যে ১৪% সার্ভিস চার্জ দিলেন তা আদৌ পরস্পরে সম্পর্কিত নয়। আধুনিক ব্যাংকে এটা পরস্পর সম্পর্কিত। এটা ব্যাংক যে Fixed deposit করে তা সুদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এটা ১০% থেকে ১১% হতে পারে। আপনি যদি এ ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার থেকে ১৬% আদায় করবে। তাদের এ শতকরা হার সর্বদাই ৫% বেশি হয় যা তারা আমানতকারীকে দেয় তার থেকে। ইসলামী ব্যাংক কখনোই এমন করে না। সুতরাং সার্ভিস চার্জ এবং সুদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি যদি চান সার্ভিস চার্জ কমাতে তাহলে আপনার উচিত হবে অধিক সংখ্যক মুসলিমকে ইসলামী ব্যাংকের সাথে জড়িত হতে রাজি করা, এ ব্যাংকের ওপর আস্থা সৃষ্টি করে অধিক বিনিয়োগ করতে রাজি করা। ইনশাআল্লাহ্ সার্ভিস চার্জ আরো কমে যাবে।

প্রশ্ন ৮. ডা বাকের 'বেদ'-এর অর্থনৈতিক সিস্টেম অধ্যয়ন করে বলেছেন, 'বেদ'-এ লেখা অর্থনৈতিক সিস্টেম সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি আরো দাবি করেন, যদি বেদ-এ বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা India-তে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সামাজিক বৈষম্য দূর হয়ে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং বেদ-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কুরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতুল্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে 'বেদ'-এর লেখক একজন আল্লাহর নবী?

উত্তর: অধ্যাপকের নাম, ড. বাকার বা বাকরে। তিনি বলেছেন যে, 'বেদ' যদি সুদমুক্ত অর্থনীতি বিষয়ে বলে থাকে তাহলে তা কি কুরআন বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধানের মতো এক? এবং এ 'বেদ'-এর বর্ণনা যদি কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলে যায় তাহলে কি 'বেদ'-এর গ্রন্থকার একজন আল্লাহর নবী?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমিও একমত। কুরআন যেমন সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বেদও তেমনি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন পার্থক্য হতে পারে? এটা পার্থক্য হতে পারে যেমন আপনারা সুদমুক্ত

অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখেছেন। এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে পার্থক্য হতে পারে। সুদমুক্ত পদ্ধতি যেমন বাস্তবায়নে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন হাদীস থেকে মত পার্থক্য দেখান একইভাবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে মতপার্থক্য করেন। বেদ যদি সুদমুক্ত ব্যবস্থার কথা বলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সুদমুক্ত হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এটা স্থায়ী হবে।

এবার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বলছি। এই প্রশ্ন এ অর্থ বুঝায় যে, 'বেদ' যদি ওহী হয়ে থাকে তাহলে এর গ্রন্থকার কি আল্লাহর নবী হবেন না? একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আরো অনেক আসমানী কিতাব এসেছে। এর মধ্যে চারটির নাম হলো : তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং ফুরকান। ফুরকান হলো কুরআন।

তাওরাত হলো হযরত মূসা (আ)-এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

যাবুর হলো হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

ইনজিল হলো হযরত ইসা (আ)-এর ওপর নাজিল হওয়া আল্লাহর কিতাব।

আর ফুরকান হলো কুরআন, কুরআন হলো শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ চূড়ান্ত কিতাব। এ কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে আরো অসংখ্য কিতাব নাযিল হয়েছে যেগুলোর নাম উল্লেখ নেই। সুতরাং আপনি কুরআন থেকে সব নবীর নাম জানতে পারবেন না। কুরআন মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে কতকগুলো হলো আদম, ইব্রাহীম, সুলাইমান, দাউদ, ইয়াকুব, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ ﷺ ইত্যাদি। হাদীসে মোট ৯৯ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায়, মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীর সংখ্যা, যেমন কুরআন বলে, প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী বিভিন্নভাবে নাযিল হয়েছে।

এসব বাণী আল্লাহর নবীর নয়, আল্লাহর নাযিলকৃত। কিন্তু আপনি আমাকে কুরআন ও বাইবেলের কিছু অংশের মিল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। যদি বাইবেলের কিছু অংশ কুরআনের সাথে মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বাইবেল আল্লাহর বাণী? 'বেদ' এর কিছু কিছু অংশও যদি মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বেদ আল্লাহর বাণী। আপনি তা বলতে পারেন না। যদিও কোনো কোনো অংশ মিলে যায় তাহলে, এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আবার এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাও আসতে পারে। যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেও থাকে, তবুও আপনি এর সাথে একমত হতে পারেন না। কারণ এটা চূড়ান্ত, শেষ নাযিলকৃত ওহী বা কিতাব নয়। শেষ কিতাব হলো কুরআন। এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা

বাকারার ১০৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

অর্থ : আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান?

যাহোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল থাকতে পারে, কোনো কোনো বাণী কুরআনের আয়াতের মতো হতে পারে। তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে, এগুলো কুরআনের বাণী।

উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলের অনেক বাণী আছে যা কুরআনেরও বাণী। আবার বাইবেলের কোনো কোনো বাণী ইনজিলেও আছে। তাই বলে আপনি বাইবেলের সব শব্দকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। একইভাবে আপনি বেদকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। হয়তো বা এটা আল্লাহর বাণী হতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত না। তবে নিশ্চিতরূপে বলা যায় ইনজিল-এর কিছু অংশ আল্লাহর বাণী।

প্রশ্ন ৯. ডা. জাকির, আপনি কুরআন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রিবা অর্থ হলো সুদ। সুতরাং সুদ বা Interest হলো Usary-এর একটি রূপ। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি ব্যবসা করার জন্য প্রকল্প পাস করতে চাই। কিন্তু বর্তমান ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে এমন একটি প্রকল্প পাস করানোর জন্য সুদ দেয়া বাধ্যতামূলকই বলা যায়। এখন এ ব্যবস্থা করে আমি লাভ করলাম, তখন আমার এ উপস্থিত অর্থ কি সুদ হবে?

উত্তর : আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা সংক্ষেপে সুদ বৈধ কিনা। যেহেতু আমরা সুদভিত্তিক তথা আমরা যে পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাপন করি তা সুদের সাথে জড়িত। তাহলে আপনি যদি কোনো প্রকল্প হাতে নেন এবং এ থেকে যে সুদী অর্থ পাবেন তা ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না? প্রশ্ন হলো, আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য অর্থ ঋণ নিলেন এবং আপনি একটি প্রকল্পের বিনিয়োগ করতে চান। সমাজ ঘুষ চক্রের কারণে এ প্রকল্পের জন্য ইসলামী ব্যাংক থেকে নেয়া অর্থ হতে সুদ দিতে হলো, এখন এ প্রকল্প থেকে যে লাভ উপার্জন হবে তা কি সুদ হয়ে যাবে?

সংক্ষেপে আপনার প্রশ্ন হলো ঘুষ বৈধ কিনা? আপনিই সংক্ষেপে বলুন, ঘুষ বৈধ না অবৈধ? আপনি ব্যাংক থেকে যে হালাল অর্থ নিলেন তা দিয়ে কি ঘুষ দেয়া যাবে?

আপনি কি দায়ী হবেন না? মনে করুন, আমি ৫০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করলাম এবং ৫ হাজার টাকা ঘুষ দিলাম। তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে ৫০ হাজার টাকা ৫ হাজার টাকা সুদের ফিস। সুতরাং নিট মুনাফা হবে ৪৫ হাজার যদি ৫ হাজার টাকা ঘুষের জন্য ব্যয় হয়।

ভাই, আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, ঘুষ ইসলামে নিষিদ্ধ। আপনি কি হারাম অর্থ প্রত্যাশা করেন না হালাল অর্থ? জবাবদিহিতার ব্যাপার তো পরের ব্যাপার। ঘুষ দেয়া আপনার জন্য জায়েয নয়। এ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টভাবে এসেছে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। অন্যায়ভাবে এক ধরনের মানুষের সম্পদ খাওয়ার জন্য শাসকদের নিকট সমর্পণ করো না, অথচ তোমরা জানো।

কুরআন ঘুষকে হারাম রেখেছে এবং ঘুষ দেয়াও হারাম। আমি কি ঘুষ নিতে পারবো? আমি এ সম্পর্কে অনেক উল্লেখ করতে পারি। আহমদ থেকে একটি হাদীস স্পষ্টভাবে এসেছে, যে ঘুষ গ্রহণ করে, যে ঘুষ দেয় যে, এবং ঘুষের মধ্যস্থতাকারীদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং ঘুষ (দেয়া-নেয়া) লেনদেন হারাম। এরপর প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই যে এটা সঠিক বা সঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংকে আপনি ঘুষ দিতে পারবেন না।

আপনি যদি বলেন আমি ঘুষ দিব তাহলে আপনাকে বলবে আপনি টাকা নিবেন না।

এটা কি ইন্ডিয়াতে অনুমোদিত? আমি জানি না। ইসলামী শরিআতের....আপনি যদি বলেন আমি একটি শিল্প কারখানা করার জন্য টাকা চাই এবং এজন্য আপনাকে টাকা দিব তাহলে এটা হারাম হবে, আমি এটাকে হারাম বলবো। আপনি এ অর্থ ঘুষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। ইসলামী আইনে এটা বৈধ নয় এবং এটা জানার পর যদি আপনি এটা করেন তাহলে তা হবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা। দায়িত্বশীলতা থেকে তা জবাবদিহিতা যাই বলুন না কেন ঘুষ হারাম। কেননা, আল-কুরআনে ইনজিল শব্দটি উল্লেখ আছে। এটা আল্লাহর বাণী, কিন্তু 'বেদ' সম্পর্কে কুরআনে কিছুই বলা হয়নি। সুতরাং এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়। আপনার দায়িত্ব হলো আপনাকে সর্বশেষ কিতাব কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

প্রশ্ন ১০. ইসলামে কি ইন্স্যুরেন্স বৈধ? বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স? যদি এটা ইসলামে বৈধ না হয় তাহলে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? অথবা অন্য কোনো ইসলামীক সমাধান আছে?

উত্তর : বীমার ধারণাটি অনেক পুরাতন। কোনো সম্প্রদায়ের লোকজন অর্থ জমা করতে পারে এবং এটা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনার কোনো দুর্ঘটনায় যা জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এ জমা রাখা অর্থ ব্যবহার একটি ভালো কনসেপ্ট। কিন্তু যদি জীবনবীমার কথায় আসি তাহলে এটাকে কি বৈধ বলা যায়? মিসরের মাওলানা মোঃ আবু জরার দেয়া ফতোয়া অনুযায়ী জীবনবীমা, যাতে আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে টাকা জমা দেন এবং আপনার কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আপনি পুরো অর্থ বা দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরত পান কিংবা এ সেবার শেষে আপনি পুরো অর্থ লাভসহ ফেরত পান তাহলে তা রিবা ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, যে বিনিয়োগই হোক না কেন, তা জীবনবীমা হোক, গাড়ি বীমা হোক আর মুনাফা বীমা হোক তা যদি সুদভিত্তিক হয় তাহলে তা হারাম। যেকোনো সুদী বিনিয়োগই হারাম। মাওলানা সাহেবের নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানের জীবনবীমা করপোরেশনগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগই Fixed Money Market-এর। সুতরাং যে অর্থই হোক। যেমন আপনার একটি ১০ বছর মেয়াদি পলিসি আছে যেখানে প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয় এবং যদি আপনি এর মধ্যে মারা যান কিংবা দুর্ঘটনার শিকার হন আপনি যদিও মাত্র দুই কিস্তির অর্থ পরিশোধ করেন (১ লক্ষ টাকা) তাহলেও আপনি দ্বিগুণ তথা দুই লক্ষ টাকা ফেরত পাবেন। আর আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যান তাহলে আপনি পুরো অর্থ ফেরত পাবেন। আপনার পলিসি ম্যাচিউরিটির আগেই যদি মারা যান। আপনি পুরো ১০ লক্ষই লাভসহ ফেরত পাবেন। কিন্তু আপনাকে এ লাভ কোথা হতে দেয়া হবে? জীবনবীমা করপোরেশনের অধিকাংশ বিনিয়োগই ফিক্সড মানি মার্কেট হার থাকে, যা কিনা সুদভিত্তিক। আপনি তো জানেনই যে, সুদ হারাম। আপনি যদি জানেন, কোনো প্রতিষ্ঠান যারা বীমা দিয়ে থাকে এবং তারা Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত নয় এবং শেয়ার, ইকুইটির সাথে জড়িত তাহলে এ বীমা বৈধ হবে।

সম্প্রতি এই কিছুদিন আগে আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে পরিচালিত 'গোল্ডেন বন্ড' নামক একটি ফার্ম থেকে দেখে এলাম, তাদের সর্বনিম্ন বিনিয়োগ পরিমাণ আড়াই হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ আপনাকে কমপক্ষে ২.৫ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করতে

হবে যা কিনা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সমান। তারা (Golden Bond) আপনার নিকট থেকে এ পরিমাণ অর্থ নিবে এবং তা শেয়ার ও ইকুয়িটি-তে বিনিয়োগ করে থাকে, যা ইসলামে বৈধ।

শেয়ার এবং ইকুয়িটি Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত নয়। তারা আপনাকে সম্ভাব্য একটি পরিমাণ মুনাফা দিবে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নয় বলা যায় তা হতে পারে ১% বা $\frac{১}{২}$% এটা নির্দিষ্ট অংক নয় বরং কাছাকাছি সম্ভাব্য একটা পরিমাণ এবং তারা আপনাকে আরো কিছু সুবিধা দিবে যদি আপনি মারা যান, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোনাস পেতে পারেন। ফলে এ ধরনের বিনিয়োগ যা সুদের কারবারে সম্পর্কিত নয় তা অনুমোদিত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ জীবনবীমা কোম্পানিগুলো Fixed Money Market-এর সাথে জড়িত তা ইসলামে বৈধ নয়। এগুলো হারাম। যেসব বীমা সুদের বা রিবা নিয়ে কারবার করে তা সম্পূর্ণই হারাম।

এখন আপনার প্রশ্ন ছিল অন্য কোনো বিকল্প আছে কিনা? কিংবা জীবনবীমা ইসলামী শরিআহভিত্তিক হতে পারে কিনা? আপনি যদি ইসলামী শরিআহভিত্তিক ব্যাংক দেখতে বা পেতে পারেন তাহলে কেন ইসলামী শরিআহভিত্তিক জীবনবীমা হতে পারবে না? কেন আপনি শরিআহভিত্তিক বীমা পাবেন না?

পাকিস্তানের করাচীর দারুল উলুম-এর মুফতি মোহাম্মদ শফী (র) এ ব্যাপারে একটি ভালো সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি অবশ্যই শরিআভিত্তিক জীবন বীমা পেতে পারেন। তার মতে, আপনি কীভাবে মাসিক প্রিমিয়াম, মাসিক কিস্তি জীবনবীমা করাবেন, আপনি কীভাবে ইসলামী জীবনবীমা করাবেন। আপনি যে মাসিক কিস্তি দিবেন তা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হবে। আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিবেন তা মুদারাবা সিস্টেমে বিনিয়োগ হবে। তখন আপনি যে অর্থ বিনিয়োগ করলেন তা থেকে লভ্যাংশ পাবেন, এ লাভের নির্দিষ্ট অংশ যেমন তা হতে পারে $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৩}$ ভাগ আলাদা একটি বক্সে রেখে দিলেন। আপনার লাভের নির্দিষ্ট পরিমাণ আলাদা করে রাখলেন।

এখন মনে করুন এ ইসলামী শরিআভিত্তিক জীবনবীমার কোনো শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী কোনো সমস্যায় পড়লে যেমন তা হতে পারে কোনো দুর্ঘটনা, তাহলে আপনি তাকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য আপনার ঐ নির্দিষ্ট বক্স থেকে অর্থ দিতে পারেন এবং আপনার এ দেয়ার পরিমাণটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে পারেন, এ দেয়ার পরিমাণটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে, আপনিও যেসব

কারণে পেতেও পারেন, আপনার যদি কোনো রোগ হয় তাহলে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাবেন, আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্যের রোগ হলে দিবেন। এসব বিষয়গুলো শর্তের ওপর নির্ভর করবে। ইসলাম আপনার এ নিজস্ব বক্সের অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, আপনার এ বক্সের অর্থ আপনার লাভের একটা অংশ।

আধুনিক জীবনবীমা পদ্ধতিতে আপনাকে মাসিক কিস্তি হিসেবে অর্থ জমা দিতে হবে এবং আপনি যদি আপনার মাসিক কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দেন তাহলে আপনার পূর্বের জমা দেয়া সব অর্থ ফেরত পাবেন না। তারা আপনাকে একটি পয়সাও ফেরত দিবে না।

আপনি যদি আপনার কিস্তি দেয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে প্রিমিয়ামসহ পূর্বের সব অর্থই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আপনার অতীতের সর্ব অর্থই লাভসহ মার খাবে।

কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?

WHY THE WEST IS COMING BACK TO ISLAM?

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

হামিদুল ইসলাম সোহেল

বি. এ. (অনার্স) ইংরেজি (৩য় বর্ষ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে?

উপস্থাপক : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজকের এ মহতী সভায় আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের জানাচ্ছি সুস্বাগতম। বক্তব্য রাখবেন, ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক। প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট, ইসলামী রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মুম্বাই, ভারত। তিনি বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোর ওপর একজন চলমান কম্পিউটার। তাঁর মস্তিষ্ক এমনকি কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করে। এখন আপনাদের সামনে আসছেন, ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক : সম্মানিত চেয়ারম্যান, আমার গুরুজনেরা এবং দূর-দুরান্ত থেকে আগত আমার ভাই ও বোনেরা, আপনাদেরকে ইসলামের রীতি অনুযায়ী স্বাগতম জানাচ্ছি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আল্লাহর শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ আপনাদের সবার ওপর বর্ষিত হোক)।

পশ্চিমাদের (ভিন্ন ধর্মীদের) সমস্যার সমাধান দিতে পারে কেবল ইসলাম

আজকের আলোচনার বিষয় হলো– কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করছে? আর যদি এর উত্তরটা দেয়া হয় মাত্র একটি বাক্যে, তা হলো– পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করছে কারণ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভয়াবহ সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে। পাশ্চাত্যের মানুষ মনোযোগ দেয় শারীরিক শান্তির দিকে। অর্থাৎ ভোগ-বিলাসের দিকে। তাদের মনোযোগ শারীরিক শান্তি ও সুখের দিকে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মই মনোযোগ দেয় আত্মার উন্নতির দিকে। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামে এ দুটোই আছে। ইসলাম শারীরিক সুখ-শান্তির পাশাপাশি আমাদের আত্মার উন্নতির দিকেও মনোযোগ দেয়। দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। 'ইসলাম' শব্দটি এসেছে 'সালাম' থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। এর আরো একটি অর্থ হলো– আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ, ইসলাম হলো নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহ ত আলার কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা। পবিত্র আল-কুরআন হলো– আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি কিতাব। যা নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ওপর। আল কুরআন জ্ঞানের আধার। অমনোযোগীদের প্রতি সতর্কবাণী। বিপথগামীদের জন্য পথ প্রদর্শক। নিপীড়িতদের সান্ত্বনার বাণী, আর হতাশাগ্রস্তদের আশার আলো। এবার আসুন

আলোচনা করি– পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো– পশ্চিমারা মুক্তমনের অধিকারী। তারা রক্ষণশীল নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে যেমনটা আছে। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে, এসব বক্তৃতায় লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী?

আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার বাণী প্রতিটি আশরাফুল মাকলুকাতের কাছে পৌঁছে দেয়া। তিনিই হেদায়াত করেন। আল্লাহ পবিত্র আল-কুরআনে সূরা গাশিয়াহর (২১-২২) নং আয়াতে বলেছেন–

فَذَكِّرْ ط إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ . لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ .

অর্থ : বেশ (হে নবী) তাহলে তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র। তুমি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের একজন অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে, এটা পশ্চিমের পঞ্চাশ জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের সমান হবে। এর মানে এই নয় যে, একজন ভারতীয় পঞ্চাশ গুণ উপরে, এরকম নয়। যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, প্রাচ্যের, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার সমাজ হলো রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একজন মানুষ ইসলামকে ভালোবাসলেও পারিপার্শ্বিক সমাজকে ভয় পায়। সমাজ তাকে বয়কট করতে পারে। তার সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা হতে পারে। এমনকি জীবন বিপণ্ন হতে পারে। সমাজের মানুষ খুবই সংকীর্ণ মনের এবং রক্ষণশীল। তাই তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু তাই বলে এটা আবার ইন্ডিয়ার অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ না করার কোনো অজুহাত হতে পারে না। এজন্য তারাই দায়ী থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যান্য দেশেও পশ্চিমারা আমার বক্তৃতা শুনেছেন। কয়েকটা লেকচারের পর কোনো কোনো সময় একটা বক্তৃতা শোনার পর ইসলামকে এতোই পছন্দ করেছে যে, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুম্বাইতে এমনটা হয় নি। সেখানে বছরের পর বছর অনেকগুলো বক্তৃতার পর অবশেষে সত্যকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনেকে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণ কিন্তু দাওয়াত দানকারী নয় বরং আল্লাহ তাআলাই হেদায়াত দেন। তাহলে প্রথম কারণটা হলো, পশ্চিমারা অনেক বেশি মুক্ত মনের। একই পরিবারে বাবা খ্রিস্টান হতে পারেন কিন্তু তার সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি কিছু মনে করেন না। তারা একই সাথে বসবাস করে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে এমনটা হয় না। ভারতে বাবা এক ধর্ম পালন করেন আর সন্তানেরা অন্য ধর্ম এরকম খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্যই বলছি যে, পশ্চিমারা মুক্ত মনের।

আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে

আরেকটা কারণ হলো– পশ্চিমারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' আর পশ্চিমারা মনে করেন, কোনো কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো বিজ্ঞান। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র আল-কুরআন অনেক জায়গায় বিজ্ঞানের কথা বলেছে। যদিও এটি কোনো বিষয় ভিত্তিক সাইন্সের ওপর কোনো গ্রন্থ নয়। আল-কুরআনে রয়েছে সাইন বা নিদর্শন বা চিহ্ন। ছয় হাজারেরও বেশি সাইন বা আয়াত রয়েছে আল-কুরআনে। যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের কথা বলেছে।

আমার 'আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান মানানসই নাকি বেমানান। অথবা 'আল-কুরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ এবং নিষ্পত্তি' বিষয়ক বক্তৃতাগুলোতে আমি প্রমাণ করেছিলাম যে, আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তাহলে পশ্চিমাদের মানদণ্ড ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ করতে পারি, আমাদের মানদণ্ড অর্থাৎ আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তারা আজ যা বলছে, আল-কুরআন সেটা বলেছে ১৪০০ বছর আগে। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আমরা যদি তাদের সাথে কথা বলি হিকমা দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ, তারা বুঝবে আল-কুরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

আর তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তৃতীয়ত, পশ্চিমের মানুষেরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। তারা অন্ধের মতো কিছু মানতে চায় না। তারা যুক্তি দিয়ে বুঝবে, তদন্ত করবে তারপরই কোনো কিছু মেনে নেবে। তারা যুক্তিশীল, কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। পবিত্র আল-কুরআনে সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে 'দাওয়াতের' ব্যাপারে যুক্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ـ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়।

আল-কুরআন যুক্তির কথা বলে। সূরা বাকারার ২৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তার বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

আল্লাহ চান মানুষ যেন আল-কুরআন বুঝতে পারে এবং তারপর মেনে নেয়। সূরা ইব্রাহীমের ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْابِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓااَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : বস্তুত এ একটি পয়গাম (সংবাদ) যা মানুষের জন্য। আর পাঠান হয়েছে এ জন্য যে, এ দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে এবং তারা জেনে নেবে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শুধু একজন, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে।

ফলসিফিকেশন টেস্ট

কুরআন বলছে, তারা বুঝে শুনে বিশ্বাস করুক। আর আলহামদুলিল্লাহ, পশ্চিমের অধিকাংশ লোক বুঝে শুনে কাজ করে এবং তারা প্রশ্ন করে থাকে। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেটা মানবে না। কুরআনের মধ্যেও প্রশ্ন-উত্তর আছে। আপনি কুরআন পড়লে দেখবেন, সেখানে 'তায়ালু' বা 'তারা প্রশ্ন করে' আছে ৩৩২ বার। আবার ৩৩২ বার বলা হয়েছে 'কুল' বা বল। পশ্চিমারা মদ আর জুয়া নিয়ে প্রশ্ন করে কুরআন তার উত্তর দিচ্ছে। কুরআন বুদ্ধিমান মানুষকে সন্তুষ্ট করে। আজকের দিনের মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ খুবই ব্যস্ত থাকে। সব সময় নতুন দার্শনিক তত্ত্ব আর নতুন জিনিস আসছে। সব কিছু পরীক্ষা করার সময় আমাদের হাতে নেই। এখন আপনি যদি নতুন কোনো ফিলসফি কিংবা থিউরি নিয়ে আসেন, তাহলে তারা দেখবে যে, এটাকে ভুল প্রমাণ করা যায় কি-না।

এটাকে বলে 'ফলসিফিকেশন টেস্ট।' পশ্চিমারা ফলসিফিকেশন টেস্টে বিশ্বাস করে। প্রতিদিন মানুষ হাজার হাজার থিউরি আনছে। সবকিছু পরীক্ষা করার সময় কোথায়। যদি কোনোভাবে থিউরিকে ভুল প্রমাণ করা যায়, তাহলে সেটাকে আমরা ভুল বলবো। যদি ভুল প্রমাণ করতে না পারি তাহলে মেনে নেব। এ কারণেই আইনস্টাইন যখন "থিউরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, তখন বলেছিলেন, আমার থিউরি ভুল প্রমাণ করতে পারলে মানতে হবে না। তাই ছয় বছর ধরে তারা পরীক্ষা করলো এবং মেনে নিল। আর স্বাভাবিকভাবেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ আর ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে 'ফলসিফিকেশন টেস্ট" আছে। আর আমি অনেক ফলসিফিকেশন টেস্টের কথা বলছি 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী' নামের ক্যাসেট। আমি তার মধ্য থেকে একটি বলবো যেটা পশ্চিমারাদেরও সন্তুষ্ট করবে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ـ

অর্থ : তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে সেখানে অনেক অসামঞ্জস্য থাকতো।

তাই কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইলে শুধুমাত্র একটা অসামঞ্জস্য খুঁজে বের করুন। কোনো অসামঞ্জস্য বের না করা পর্যন্ত কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে, যদি বলেন কুরআন আল্লাহর বাণী না এ কথা দ্বারা। পরস্পর বিরোধী কিছু বের করুন, কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে। কুরআনেই ফলসিফিকেশন টেস্ট আছে। বিভিন্ন সময়ে কুরআনের ফলসিফিকেশন টেস্ট হয়েছে। তবে আজকের দিনে এই টেস্টটা আরো যথার্থ। কারণ এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আগের সময় ছিল সাহিত্য, কবিতার যুগ সে সময় অন্যরকম ফলসিফিকেশন টেস্ট ছিল। ইসলাম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভুলের যে অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি যদি বিজ্ঞান সম্পর্কে জানেন, ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে আপনি হবেন নাস্তিক; কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক জানলে আপনি হবেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী।'

এ কারণেই আজকে পশ্চিমা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করছে; কিন্তু তারা স্রষ্টার বিরোধিতা করছে না। আগেও বলেছিলাম পশ্চিমাদের সমস্যার সমাধান ইসলামে আছে। আমাদের হাতে সব সমস্যা ও তার সমাধান ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আমরা কয়েকটি সমস্যার কথা বলবো এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো। আমি বলেছিলাম পশ্চিমা বিশ্ব বস্তুবাদের ভেতর ডুবে আছে। এটা একটা বস্তুবাদী পৃথিবী। যেখানে শারীরিক সুখ শান্তির দিকে বেশি নজর দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে আছে 'তোমরা সম্পদ ব্যয় করো আল্লাহর পথে এবং সেই সব মানুষকে স্মরণ করে দাও– যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না। তাদেরকে কঠিন শাস্তির কথা জানিয়ে দাও। তাদের সম্পদ থেকে আগুন বের হবে। আর কিয়ামতের দিনে তাদের কপালের পেছনে ও পিঠে গরম মুদ্রার ছাপ থাকবে।'

সূরা মুলকের ২নং আয়াতে আছে–

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط

অর্থ : তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন– কে কর্মে উত্তম।

সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে আছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থ : প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

চূড়ান্ত পুরস্কার দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। আর যদি কেউ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে, সেই ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে। ইহকালের এ জীবন হচ্ছে এক ধরনের প্রলোভন।

আল-কুরআন অনুযায়ী মানুষের বস্তুবাদের পেছনে ছুটে চলা এক ধরনের প্রলোভন মাত্র। যে লোক জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে, সে জীবনে সফল।

অর্থ ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ـ

অর্থ : নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও, আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে ও তার অধিকার দাও, তোমরা অপব্যয় করো না। অপচয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

আজ পুরো পৃথিবীতে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে, কারো সম্পদ থাকলে সে আরো বেশি বেশি সম্পদ অর্জন করতে চায়। নিজের সম্পত্তি দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করে। এটাকে বলে 'ঘুষ'।

সূরা আল বাকারার ১৮৮ নং আয়াত বলছে–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা পারস্পরিক ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, আর শাসকের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে।

ঘুষ দেয়া বা নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। সূরা হুজরাতের ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে; আর না স্ত্রীলোকেরা অন্য স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের ওপর দোষারোপ করো না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকি কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ হতে বিরত না থাকবে তারাই জালেম।

সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি ধারণা পোষণ হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ্ খুব বেশি তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।

আল-কুরআন বলছে, যদি আপনি কারো পেছনে সমালোচনা করেন, তবে যেন আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের মাংস খাচ্ছেন। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার চেয়ে জঘন্য নাফরমানির কাজ আর কী হতে পারে? কারো পেছন থেকে কুৎসা রটানো, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আরো বড় অন্যায়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে এই পেছন থেকে আঘাত ও কুৎসা রটানো, পশ্চিমা বিশ্বের সব জায়গায় পাবেন। মানুষ একে অন্যকে অপমান করছে, কুৎসা রটাচ্ছে আর বলছে এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

আল-কুরআনের সূরা হুমাজার ১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ

অর্থ : ধ্বংস প্রত্যেকের, যারা সন্মুখে ও পিছনে কুৎসা রটায়।

আজকে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি আর যে সমস্যার কারণে অন্যান্য সমস্যাও তৈরি হচ্ছে সেটা হলো– 'রিবাহ' বা 'সুদ'। পশ্চিমা বিশ্বের সমস্যা হলো সুদ আর তারা এ অসুখটা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এর শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের রাজার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে টাকা দাও সেটা আমার কাছে থাকবে। আর আমি নির্দিষ্ট একটা সুদ দিব।' এভাবেই আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার শুরু হয়। কুরআন শরীফে সব মিলিয়ে 'রিবাহ' শব্দটি উল্লেখ আছে ৮ বার। সূরা আলে ইমরান-এর ১৩০ নং আয়াতে। সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে, সূরা রুম-এর ৩৯ নং আয়াতে। তিনবার সূরা আল-বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে। আরো উল্লেখ আছে সূরা বাকারার ২৭৬ নং এবং ২৭৮ নং আয়াতে। কেন সুদ হারাম সেটা আমার লেকচারে বলেছিলাম। 'আল-কুরআনের নিয়ম অনুযায়ী সুদবিহীন অর্থনীতি' এ শিরোনামে।

অনেকে মনে করে সুদ আর ব্যবসা এক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের হাতে সময় নেই, অর্থনীতির খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বলার। তবে আমি শুধু আল- কুরআনের দুটি আয়াতের অনুবাদ আপনাদের বলবো। সূরা বাকারার ২৭৮ নং ও ২৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে ভয় করো। সুদ-এর ওপর তোমাদের দাবি ছেড়ে দাও যদি যর্থার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো এবং যদি সুদের ওপর তোমাদের দাবি না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

আল কুরআনে অনেক ধরনের বড় বড় গুনাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিশেষ বড় অন্যায়ের পাশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি সুদ নেয় বা দেয়, আল্লাহ ও রাসূল (সা) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অর্থাৎ আপনি যদি সুদ নেন, আপনি আল্লাহ ও রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করছেন যুদ্ধের জন্য।

বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধহীনতার সমস্যা

এছাড়াও পশ্চিমা বিশ্বকে লক্ষ করলে দেখবেন যে, লোকজন বিশেষ করে বাচ্চারা, বাবা-মা'কে শ্রদ্ধা করে না। প্রাচ্যের চেয়ে পশ্চিমা বিশ্বে এ ব্যাপারটা বেশি দেখা

যায়। আধুনিক বিশ্বে আপনি দেখবেন 'স্পেশাল শিশু নির্যাতন সেল'। পশ্চিমা বিশ্বে, আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশে। ছেলে-মেয়েরা পুলিশকে ফোন করতে পারে, স্পেশাল শিশু নির্যাতন সেলে। তারা বাবা-মাকেও হুমকি দিতে পারে। বাবা-মাকে বলতে পারে সাবধান হয়ে যাও, নয়তো পুলিশে ফোন করবো।

ইসলামে সবাইকে ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। সন্তানের অধিকার আছে ইসলামে যা সর্বোচ্চ। স্বভাবতই শিশুদেরকে রক্ষা করতে হবে। তবে রক্ষার নামে এখন যেটা হয়, সন্তানেরা, বাবা মাকে হুমকি দেয়। অনেক জায়গায় আল-কুরআন বলেছে যে, বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। সূরা লুকমান-এর ১৪ নং আয়াতে, সূরা আল আহ্কাফ-এর ১৫ নং আয়াতে, সূরা আল আনআমের ১৫১ নং আয়াতে .... অনেক জায়গায়। তবে বিশেষ করে আল-কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে আদেশ দিচ্ছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না। আর তোমার বাবা-মার প্রতি সদয় হও। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা দুজনই বৃদ্ধ হয়ে তোমার কাছে পৌঁছে, তাদের অবজ্ঞা করে কোনো কথা বলো না। এমনকি 'উহ' শব্দটিও বলো না; বরং তাদের সাথে বিনয় ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করো এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যে, হে আল্লাহ; তুমি তাদের দয়া করো যেভাবে তারা আমাদের ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।

পশ্চিমা বিশ্বে বাবা-মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়; তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইসলামে বৃদ্ধাশ্রম বলতে কিছু নেই। বয়স্ক লোকদের দেখাশোনা করা সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। তাদেরকে সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে।

পশ্চিমাদের অবাধ যৌনাচার : সমাধান ইসলাম

পশ্চিমা বিশ্বের আরেকটা সমস্যা হলো ব্যভিচার, অবাধ যৌনাচার। পবিত্র কুরআনের বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَّسَآءَ سَبِيْلًا ـ

অর্থ : ব্যভিচারের কাছেও যেও না, কারণ এটা অশ্লীল এবং মন্দ আচরণ।

ব্যভিচার ক্ষতিকর ও অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিসেরও পথ খুলে দেয়। তাই বলে ইসলামে সন্যাসব্রত বা চিরকুমার থাকার নিয়ম নেই। ইসলামে বিয়ে করা বাধ্যতামূলক। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, (সহীহ বুখারী ৭ নং খণ্ড, কিতাবুন্নিকাহ, ৩ নং হাদিস-এ)–

অর্থ : হে যুবক ও যুবতীরা! যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, তাদের বিয়ে করা উচিত। যে বিয়ে করে, সে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করে।

দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। কেবল বিয়ে করলেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব থাকবে। আর ইসলামে এই দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূরা নিসার ২১ নং আয়াতে আছে–

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ـ

অর্থ : প্রকাশ্য পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এটা কি করে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করছো?

সূরা রূমের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ـ

অর্থ : তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদ্যতার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

মহিলার সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি

আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের অতিরিক্ত মহিলা জনসংখ্যা। প্রাচ্যে এমনটি হয় নি। তার কারণ হলো মেয়ে শিশুর ভ্রূণ চিহ্নিত করে হত্যা করা। এ খারাপ চর্চাটি বন্ধ হলে প্রাচ্যেও এই সমস্যা দেখা দেবে। পবিত্র কুরআন এ সমস্যারও সমাধান দিয়েছে। সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ : তোমাদের পছন্দ মতো মেয়েকে বিয়ে করো দুজন, তিনজন বা চারজনকে। তবে যদি ন্যায়বিচার করতে না পার তবে মাত্র একজনকে বিয়ে করো।

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

অর্থ : স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ইনসাফ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা চাইলেও এ ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে নেই। কাজেই এক স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রেখে অন্য স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে না।

এখানে আল-কুরআন বুঝাতে চাচ্ছে যে, এটা অসম্ভব সব স্ত্রীকে সমানভাবে ভালোবাসা। এমনকি একজন মা তার সন্তানদের ভালোবাসে। কিন্তু কোনো মা'ই বলবে না যে, আমি আমার সন্তানদের একই রকম ভালোবাসি। কম-বেশি হবেই। তবে সব মিলিয়ে কোনো অবিচার হবে না। তাই স্ত্রীদের অন্য সব ব্যাপারে যেমন টাকা-পয়সা, সময় ইত্যাদির ব্যাপারে ন্যায় বিচার করতে হবে। এক স্ত্রীকে বাড়ি কিনে দিলে অন্য স্ত্রীও যেন বাড়ি পায়। অনেকে মনে করে একাধিক বিয়ে করা ইসলামে বাধ্যতামূলক। এটি সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামে পাঁচ প্রকার কাজের কথা বলা হয়েছে। ১. 'ফরজ' যার অর্থ হলো বাধ্যতামূলক, ২. 'মুস্তাহাব' বা উৎসাহ দেয়া হয়েছে, ৩. 'মুবাহ' অর্থাৎ ঐচ্ছিক, ৪. 'মাকরূহ' বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে আর ৫. 'হারাম' অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

একাধিক বিয়ে করার ব্যাপারটা হলো ঐচ্ছিক। তাহলে আসুন আমরা দেখি যে, কেন আল কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো।

পুরুষ ও নারীকে সমান অনুপাতে বানানো হয়েছে। তবে এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যদি কোনো চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন যে, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে ভালোভাবে রোগ-জীবাণু প্রতিরোধ করতে পারে। তাই মেয়ে শিশুর চেয়ে ছেলে শিশু বেশি মারা যায়। দুর্ঘটনা, ধূমপান, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি মারা যায়। আর তাই এখন পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি। কেবল কয়েকটি দেশে, যেমন ভারতে পুরুষদের সংখ্যা নারীদের চেয়ে বেশি। এর কারণ অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে জন্মের পূর্বে আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ চিহ্নিত করে প্রত্যেক দিন তিন

হাজারেরও বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয় কেবল ভারতেই। যখন তারা বুঝতে পারে যে সন্তানটা মেয়ে। অর্থাৎ বছরে দশ লক্ষের বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয় শুধু ভারতে, যখন বুঝতে পারে যে সন্তানটা মেয়ে। এ মেয়ে হত্যা বন্ধ হলে ভারতসহ আরো কয়েকটি দেশে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে যাবে।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু আমেরিকাতেই নারীরা সংখ্যায় ছেলেদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ জন বেশি। শুধু নিউ ইয়র্কেই ১০ লক্ষ জন নারী বেশি পুরুষদের চেয়ে। নিউ ইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হল 'গে', 'গে' মানে হলো সমকামী। তার মানে পুরুষরা সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় পুরুষকে। আমেরিকায় আড়াই কোটির বেশি পুরুষ হলো 'গে'। এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক বিরাট সমস্যা। ইংল্যান্ডে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ জন বেশি। জার্মানিতে ৬০ লক্ষ জন এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ জন নারী জনসংখ্যা বেশি পুরুষদের চেয়ে। আল্লাহ তাআলাই জানেন পুরো পৃথিবীতে নারীদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে কতজন বেশি।

ধরুন, আমি পশ্চিমাদের দর্শন মেনে নিলাম যে, একজন লোক কেবল একটাই বিয়ে করতে পারবে। ধরেন, আমেরিকায় প্রত্যেক পুরুষ একটি করে মেয়েকে বিয়ে করলো। তারপরও তিন কোটি নারী থাকবে যারা জীবন সঙ্গী পাবে না। বাকিরা তাহলে কী করবে? তাদের জন্য পথ খোলা থাকে একটা, তারা হয় এমন পুরুষদের বিয়ে করবে, যাদের স্ত্রী আছে। অথবা তারা হতে পারে জনগণের সম্পত্তি (গনিকা বা বেশ্যা)।

আপনারা হয়তো বলবেন জনগণের সম্পত্তি .... ? ডা. জাকির এতো খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছে? আমি বলবো সবচেয়ে ভালো যে শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তাহলো জনগণের সম্পত্তি। আমি একজন ইসলাম প্রচারকারী হওয়ার কারণে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারছি না। জনগণের সম্পত্তি হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আর যে কোনো ভদ্র মহিলা বলবেন, তিনি প্রথমটিই বেছে নেবেন। সবার সম্পত্তি হওয়ার চেয়ে এমন একজনকে বিয়ে করা ভালো যার স্ত্রী আছে। আপনারা জানেন, পশ্চিমা বিশ্বে মানুষ রক্ষিতা রাখে। এটি খুবই সাধারণ। আমেরিকায় গড়ে একজন মানুষের আটজন যৌনসঙ্গী থাকে। কাউকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত সে তার জীবনসঙ্গী। কারো হয়তো কম। দুজন বা একজন। তবে গড়ে আটজন জীবনসঙ্গী থাকে একজনকে বিয়ে করে সংসার পাতার আগ পর্যন্ত। রক্ষিতা রাখলে কোনো দায়িত্ব থাকে না। আপনি একজন, দশজন, বিশজন যা খুশি রাখেন। সমস্যা নেই। কিন্তু যদি মহিলা রক্ষিতা হয়, তার কোনো সম্মান থাকে না। সে ছোট হয়ে যায়। যদি রক্ষিতাকে সেই মহিলার সাথে তুলনা করেন যে মহিলা

কোনো লোকের দ্বিতীয় স্ত্রী, তবে দেখবেন সে সম্মান পায়, সবাই শ্রদ্ধা করে। তার আইনসঙ্গত অধিকারও থাকে। আমরা ইসলামে মহিলাদের উপযুক্ত সম্মান দিই। রক্ষিতার কোনো সামাজিক সম্মান নেই।

সমস্যার বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী সমাধান

ইসলামে মানব জাতির সব সমস্যার সমাধান আছে। আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন, বেশির ভাগ ধর্মই ভালো কথা বলে। ডাকাতি করো না, ঠকিয়েও না ইত্যাদি। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হলো– ইসলাম ঐ কথাগুলো বলার পাশাপাশি আপনাকে পথ দেখাবে কীভাবে সেগুলো বর্জন করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সব প্রধান ধর্ম বলে যে, কোনো মানুষের ডাকাতি করা উচিত না। আমেরিকার সংবিধানে আছে, কোনো নাগরিকের ডাকাতি করা উচিত নয়। তার প্রতিকারের জন্য বিধান থাকলেও তা খুব সামান্য।

ইসলামও বলে, আপনি ডাকাতি করবেন না। তবে ইসলামের কাছে কিছু বাস্তব সমাধান আছে। ইসলাম দেখায় কীভাবে সেই অবস্থা অর্জন করবেন, যেখানে মানুষ ডাকাতি করবে না। ইসলাম ধর্মে যাকাতের ব্যবস্থা আছে। সেই ধনী লোকদের জন্য যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আছে। ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের আড়াই শতাংশ দান করবে প্রতি চন্দ্র বছরে। যদি প্রত্যেকে ধনী লোক যাকাত দেয়, পৃথিবীতে দারিদ্র বলে কিছুই থাকবে না। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا .

অর্থ : যে কোনো পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও।

এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, হাত কেটে ফেলা এটা বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। তারা মনে করে, সৌদি আরবে, যেখানে এই আইন প্রচলিত আছে, সেখানে প্রতি দুজনের মধ্যে একজনের হাত কাটা। আমি সৌদি আরবে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। আমি এমন একজন মানুষকেও দেখি নি যার হাত কাটা।

অবশ্য খুব সামান্য কিছু লোক থাকবে, যারা এ শাস্তি পেয়েছে। তবে পশ্চিমারা যে রকম মনে করে আর প্রচার করে, ব্যাপারটা তেমন মোটেই না। তারা বলে, যদি কেউ ডাকাতি করে, আর যদি তার হাত কেটে ফেলা হয়, তার পরিবারের কী হবে? তার সন্তানের কী হবে? এটা খুব নিষ্ঠুর কাজ। আমি বলবো ইসলামই সে ব্যবস্থা করবে। যদি কারো সমস্যা থাকে। ইসলামী সরকার তার পরিবারের দেখাশোনা

করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কতজন মানুষের হাত কাটা হবে? আইনের কারণে কেউ ডাকাতির সাহসই পাবে না। তাহলে শাস্তিটা দেয়া হবে কাকে? অন্যায়ই যেখানে থাকবে না, সেখানে শাস্তি প্রয়োগ করার কথাই কেন আসবে? আমেরিকা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর একটি। আপনি কি জানেন আমেরিকায় অপরাধের হারও বেশি? আমার প্রশ্ন হলো, আমেরিকায় যদি ইসলামী শরিআর প্রচলন করা হয় যেখানে সব ধনী লোক যাকাত দেবে। এরপরও কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলা হবে শাস্তি হিসেবে। এতে করে কি আমেরিকায় সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতির হার বেড়ে যাবে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? আর এটাই কার্যকর আইন। ইসলামী শরিআ প্রয়োগ করলে তার ফলও পাওয়া যাবে। সে জন্যই বলেছিলাম, ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের পথও দেখায়। আর এ কারণেই পশ্চিমাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করছে। আপনাকে একটি উদাহরণ দিই, বেশির দর্শন, ধর্ম এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সংবিধানও বলে যে, আপনি মহিলাদের উত্যক্ত করবেন না, তাদের ধর্ষণ করবেন না। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম আপনাকে পথ দেখায় কীভাবে এ অবস্থা অর্জন করবেন। যেখানে লোকজন মেয়েদের উত্যক্ত করবে না অথবা মেয়েদের ধর্ষণ করবে না।

পর্দা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য

ইসলামে পর্দা হিসেবে হিজাবের বিধান রয়েছে। সাধারণত ইসলামী বক্তারা সব সময় মহিলাদের হিজাবের কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কুরআনে প্রথমে বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা, তারপর নারীদের হিজাব।

সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ

অর্থ : মুমিনদেরকে বলো তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে।

যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকাবে, যদি তার মনে কোনো খারাপ চিন্তা আসে, আল-কুরআন বলছে যে, তার দৃষ্টি নিচু করবে। আমার একজন বন্ধু একটা মেয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, তুমি কী করছো? ইসলাম এটার অনুমোদন দেয় না। সে আমাকে বললো, রাসূল (সা) বলেছেন, 'প্রথম দৃষ্টিটার অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ।' আমি আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেকও পূরণ করি নি। আমাদের নবী করীম (সা) কি বুঝিয়েছেন যে, প্রথম দৃষ্টির অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ? এর মানে এই না যে, আপনি একজন মহিলার দিকে তাকাবেন আর দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে

থাকবেন। চোখের পলক না ফেলে। আমাদের নবী করীম (সা) যা বলেছেন তা হলো, যদি কোনো মহিলার দিকে হঠাৎ করে নজর পড়ে গেল, তৎক্ষণাত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন এবং তার দিকে আর দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় তাকাবেন না।

এর পরের আয়াত অর্থাৎ সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী, মুমিন মহিলাদের বলেন, তারা যেন নিজেদের চোখকে নিম্নগামী রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা না দেখায়। কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না; কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে, তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, নিজের মেলামেশার মেয়েদের, নিজের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই। আর সেসব বালক যারা মেয়েদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি। তারা নিজেদের পা জমিনের ওপর মেরে চলাফেরা করবে না, এভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মুমিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।

হিজাবের নিয়ম-কানুন আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে। প্রধানত নিয়ম ছয়টি।

১. পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। মেয়েদের জন্য মুখ আর হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে। অন্য পাঁচটি নিয়ম পুরুষ ও মহিলার জন্য একই।
২. তারা যে পোশাক পরবে সেটা এ রকম আঁটসাঁট হবে না যে, তাদের দেহের গড়ন বুঝা যাবে।
৩. পোশাক এমন স্বচ্ছ হবে না, যাতে ভেতর দিকে দেখা যায়।
৪. পোশাক এরকম আকর্ষণীয় হবে না যা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।
৫. এ পোশাক এমন হবে না, যা অবিশ্বাসীদের মতো, যেমন : খ্রিস্টানদের মতো ক্রুস পরতে পারবে না। আর
৬. এমন পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো। হিজাব বলতে শুধু পোশাক বুঝায় না। মানুষের আচরণ, ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি অভিপ্রায়কেও বুঝায়। পোশাকের পাশাপাশি চোখ, মন, চিন্তা এমনকি হৃদয়েরও হিজাব থাকবে।

সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে মেয়েদের হিজাবের কারণের কথা বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

অর্থ : হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীগণকে বলো, তারা যেন নিজেদের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি। ফলে তাদেরকে চিনতে পারা যাবে এবং উত্যক্ত করা হবে না।

ধরুন, কুয়ালালামপুরের রাস্তায় দুজন সহদর বোন হাঁটছে। একজন ইসলামীক হিজাব পরে আছে– পুরো শরীর ঢাকা শুধু মুখ ও হাতের কব্জি বাদে। আর অন্য বোনটি পোশাক পরে আছে আধুনিক স্টাইলে স্কার্ট আর মিনি। তারা দু'জনেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তায় বখাটে মাস্তান দাঁড়িয়ে আছে উত্যক্ত করার জন্য, শিকারের আশায়। এবার বলুন বোনদের মধ্যে কোন্ বোনকে সে উত্যক্ত করবে? এটাই স্বাভাবিক যে, সে মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটাকে উত্যক্ত করবে।

ধর্ষণের শাস্তি কেন মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত

এরপর পবিত্র কুরআনে বলছে, যদি কোনো লোক কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করে, এর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, মৃত্যুদণ্ড.....? ইসলাম একটা বর্বরসুলভ ধর্ম। কিন্তু আমি অনেক পশ্চিমাকে জিজ্ঞেস করেছি। ধরুন, আল্লাহ না করুন, কেউ একজন যদি আপনার স্ত্রী অথবা মাকে অথবা বোনকে ধর্ষণ করে। আর আপনিই সেখানে বিচারক। ধর্ষককে আপনার সামনে নিয়ে আসা হলে আপনি

তাকে কী শাস্তি দেবেন? বিশ্বাস করুন, তারা সবাই বলেছে, তারা সেই ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দিবে।

কেউ কেউ এটাও বলেছে, তারা তাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে মারবে। তারা এমন বলে কেন? কেন এই দুমুখো নীতি? অন্য কারো স্ত্রী বা মাকে ধর্ষণ করা হলে বলে, ওহ! মৃত্যুদণ্ড একটা বর্বরসুলভ আইন। আর আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনারা মৃত্যুদণ্ড দিতে চান। কেন এই দুমুখো নীতি? মাত্র একজন লোক, এখন পর্যন্ত মাত্র একজন পশ্চিমাবাসী আমাকে অন্য রকম উত্তর দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, 'প্রথমে যদি কেউ আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তাহলে আমি তাকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিব। আর এরপর যদি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিব।' ওখানে অনেক স্মার্ট লোক আছে যারা এভাবে উত্তর দেয়। আমি তখন তাকে বললাম, ভাই তুমি কি আমেরিকার পরিসংখ্যান জানো, যেটা আমরা জানি? যদি কেউ ধর্ষণ করার কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়, আমেরিকার সরকার বলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা জেল খাটার পর যখন মুক্তি পায়, তাদের শতকরা ৯৫ জনই আবার ধর্ষণ করে। আমি সেই পশ্চিমাকে বলেছিলাম, যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী আবার ধর্ষিতা হোক সেটা আপনার ব্যাপার। তাকে সাত বছর জেল দিয়ে আবার ধর্ষণ করার জন্য মুক্তি দেবেন? যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী বারবার ধর্ষিতা হবে, তবে আপনি সেই আইন প্রয়োগ করুন। সে যখন এই পরিসংখ্যান শুনলো, তখন বললো, এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমি প্রথমবারেই মৃত্যুদণ্ড দিব।

আজকের দিনে, আমেরিকায়, এফ.বি.আই এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ সালে এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চান্নটি ধর্ষণের কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। আরো বলেছে যে, এ রিপোর্ট মোট ধর্ষণের ঘটনার মাত্র ১৬ ভাগ কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। তার মানে ১৯৯০ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৯ শত ৬৮টি। অর্থাৎ ১৯৯০ সালে গড়ে প্রতিদিন ১ হাজার ৭ শত ৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ৯ শতেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে একটা। আমরা এখানে আছি প্রায় ১ ঘন্টা। এ সময়ে ৪০টিরও বেশি ধর্ষণ হয়েছে আমেরিকায়।

আবারও বলছি যতগুলো ঘটনা ঘটছে, তার কেস রিপোর্ট করা হয়েছে ১৬%। যতগুলো কেস রিপোর্ট করা হয়েছে তার ১০% অ্যারেস্ট হয়েছে। তার মানে ধর্ষকদের মাত্র ১.৬% এরেস্ট হয়েছে। যারা অ্যা:রস্ট হয়েছে তাদের ৫০% মুক্তি পেয়েছে বিচার হওয়ার আগেই বিনা বিচারে। অর্থাৎ মাত্র .০৮ শতাংশ ধর্ষকের বিচার হয়েছে। এর অর্থ হলো, যদি একজন মানুষ ১২৫টি ধর্ষণ করে, তার অ্যারেস্ট এবং বিচার হওয়ার সম্ভাবনাও মাত্র ১%। ১২৫টি ধর্ষণ করলেন আর মাত্র একবার শাস্তি পেলেন। কেউ ১২৫টি ধর্ষণ করবে আর সরকার তাকে শাস্তি দেবে

এর সম্ভাবনা ১%, বেশ সুন্দর খেলা। আর যাদের বিচার হয়, তাদের ৫০% শাস্তি পায় ১ বছরের কম কারাদণ্ড। আইনে সাত বছরের কারাদণ্ড থাকলেও জজ বলে যে, সে প্রথমবার ধর্ষণ করেছে; শাস্তি একটু কমই দিই। একটু নরম হই।

১২৫টি ধর্ষণ করলে সে একবার বিচারের সম্মুখীন হয়। আর জজ বলে একটু নরম হই। প্রথমবার ধর্ষণ করেছে। এটা হলো আমেরিকার এফ. বি. আই- এরই পরিসংখ্যান। আমার প্রশ্ন হলো, যদি আমেরিকায় ইসলামীক শরিয়া প্রয়োগ করা হয়, যখনই কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে দেখবে সে দৃষ্টি নিচু করবে, মহিলারা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা মুখ আর হাতের কব্জি বাদে। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তাহলে আমেরিকায় ধর্ষণের হার কি বেড়ে যাবে? নাকি একই রকম থাকবে? নাকি কমবে? নিশ্চয়ই কমবে। এটাই কার্যকর আইন। আপনি ইসলামী শরিয়া প্রয়োগ করলে হাতে হাতে ফল পাবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আগেও বলেছি, ইসলাম মানব জাতির সমস্যার সমাধান দেয়।

পশ্চিমের ভয়াবহ মাদক সমস্যা

পশ্চিমা দেশগুলোর আরেকটা সমস্যা মাদক। এটা থেকে অন্যান্য সমস্যাও জন্ম নেয়। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে সমাধান দিয়ে বলছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! মদপান ও জুয়া ঘৃণ্য বস্তু। মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো ঘৃণিত শয়তানের কাজ, এগুলো বর্জন করো আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

আল-কুরআন বলছে, মদপান, জুয়া, ভাগ্য গণনা এগুলো শয়তানের কাজ। এ কাজগুলো বর্জন করো যেন তোমরা সফল হও। মস্তিষ্কের একটা অংশ আছে যা আপনাকে অনুচিত কাজ করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমার যদি এখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়, মন বলবে এখানে করো না, টয়লেটে যাও। কারো সাথে অশ্রদ্ধার সাথে কথা বললে, মন বলবে, শ্রদ্ধার সাথে কথা বলো। যখন আপনি মদপান করেন, মস্তিষ্কের এই অংশটা ঘুমিয়ে পড়ে অ্যালকোহলের জন্য। আর আপনি অনেক মদ্যপ পাবেন, যারা জামা-কাপড়েই প্রস্রাব করে। কথা বলে অশ্লীল ভাষায়। বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করে। সামনে কে আছে কেয়ার করে না। মুখে যা আসে তাই বলে।

কারণ, মস্তিষ্কের সজাগ অংশটা ঘুমিয়ে পড়ে। আর পরিসংখ্যান বলে, আমেরিকায় যে ধর্ষণ সংঘটিত হয় তার বেশির ভাগ, বেশিরভাগ মানে শতকরা ৯৫ ভাগের

বেশি ধর্ষণ সংঘটিত হয় একজন যখন মাতাল থাকে সেই অবস্থায়। হয় ধর্ষক মাতাল থাকে নতুবা দুর্বল জন, যে ধর্ষিতা হয় সে মাতাল থাকে। আর এর প্রায় সব ঘটনাই হল অজাচার। অজাচার মানে কি জানেন? অজাচার মানে নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌনকর্ম। বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন। আর এটা তখনই হয় যখন মানুষ মাতাল থাকে। আর এমনকি এইডসের অন্যতম একটি কারণ হলো অ্যালকোহলিজম। এটা খুবই বিপদজনক একটা রোগ। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে আমরা তো সোস্যাল ড্রিংকার। মানে, এই মাঝে মাঝে একটু খাই। কিছু লোক বলে, ঠাণ্ডা দেশে যেহেতু অনেক ঠাণ্ডা, তাই এক পেগ খাই। আমি তাদের বলি তাহলে ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসুন। আর খেতে যদি হয়, তাহলে মধু খান। এতে আপনি এলকোহলের চেয়ে বেশি গরম হবেন। কোনো ধাক্কা পাবেন না যেটা বিয়ারে পাবেন। কিছু পশ্চিমা লোক আমাকে বলে, দেখেন জাকির ভাই, ইসলাম গ্রহণে আপত্তি নেই; কিন্তু আমি অ্যালকোহল ছাড়তে পারবো না।

কিছু কিছু লোক আছে যারা এমন অজুহাত দেবে ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য। আমি বলেছিলাম, দেখেন, ধরুন, আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম অ্যালকোহল গ্রহণ করার। আপনি মুসলিম হয়েও অ্যালকোহল গ্রহণ করতে পারবেন। তাহলে কি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন? সে চুপ হয়ে গেল। শুধু এই একটি কারণেই ইসলাম গ্রহণ করছে না তা না, সমস্যা নেই ইসলাম গ্রহণে যদি মদপানই একমাত্র বাধা হয়। আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দেবো কোনো সমস্যা নেই। ইসলামের অন্য কর্তব্যগুলো পালন করুন। আল্লাহ মানুষের ইসলাম গ্রহণ না করার অজুহাতগুলো দেখবেন না। তবে ইসলামে এ সমস্যার সমাধান আছে।

কেউ কেউ বলে, আমার বাবা একজন সোশ্যাল ড্রিংকার। অনেকদিন ধরেই ড্রিংক করছে। আমি তাদেরকে বলি, প্রত্যেক মদ্যপায়ী যদি তার ইন্টারভিউ নেন, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো মানুষই অ্যালকোহলিক মধ্যপ হওয়ার জন্য মদ পান শুরু করে না। শুরু করে একজন সোশ্যাল ড্রিংকার হিসেবে। আর অনেকেই শেষে মদ্যপ হয়ে যায়। সে হয়তো বলবে তার ইচ্ছেশক্তির খুব জোর। সপ্তাহে মাত্র এক পেগ বা দুই পেগ খান আর কখনো মাতাল হন না। আমি বলবো যে, কোনো মানুষ, যদি সে সোশ্যাল ড্রিংকার হয়। অন্ততপক্ষে জীবনে একবার যদি কোনো অন্যায় করে যেমন ধর্ষণ অথবা অজাচার। সে ভদ্রলোক হয়ে থাকলে নিজেকে কি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে তা আর পূরণীয় নয়।

অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তার নিজের আর যে আক্রান্ত সে কখনো ভুলতে পারবে না। ধরুন, মাতাল অবস্থায় বাবা মেয়ের সাথে অজাচার করলো, সে কি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? তাই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৩, হাদিস ৩৩৯২ নং এ বলেছেন–

'যেটা বেশি খেলে তুমি মাতাল হও, সেটা কম খাওয়াও নিষিদ্ধ, এখানে কোনো অজুহাত চলবে না।' নবী করীম ﷺ ইবনে মাজাহ্-এর খণ্ড তিন অধ্যায়-৩০, হাদীস-৩৩৭১-এ আরো বলেছেন, 'মাদকদ্রব্য হচ্ছে অন্যান্য অন্যায়ের মূল।'

এটা সব অন্যায়ের মূল। মাদক দ্রব্যের কারণেই আজ আমাদের সমাজে এতো অন্যায়। টিজ করা, ধর্ষণ, অসুখ অনেক কিছু। হাদীস নং ৩৩৮০-এ বলেছেন, 'দশ প্রকার মানুষ হলো অভিশপ্ত। যেমন :

১. যারা অ্যালকোহল নিয়ে থাকে,

২. যারা অ্যালকোহল তৈরি করে,

৩. যারা অন্যের জন্য তৈরি করে,

৪. যারা এটা পান করে,

৫. যারা এটা বহন করে,

৬. যারা অন্যের জন্য বহন করে,

৭. যারা পরিবেশন করে,

৮. যারা এটা বিক্রি করে,

৯. যারা এই মদ বিক্রি থেকে লাভ করে এবং

১০. যারা অন্যের জন্য কেনে। এসব ধরনের মানুষের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।

আর অনেক অসুখ আছে যাতে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে যদি মাদকদ্রব্য নেয়- যেটা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বও জানে। এর ওপর আলোচনা করলে, শুধু অসুখের নামের লিস্ট করলেই দিন পেরিয়ে যাবে। আমি কয়েকটার নাম উল্লেখ করছি। খুব বিপদজ্জনক একটা অসুখ হলো লিভার সিরোসিস। গলায় টিউমার, মাথায় ও ঘাড়ে টিউমার, পাকস্থলিতে, লিভারে টিউমার। ইউমোফ্র্যাজাইটিস, গ্যাস্টাইটিস, প্যানকার্টাইটিস, হেপাটাইটিস, কার্ডিও মায়াপ্যাথি, এনজায়না, হাইপারটেনশন, আরথ্রো সিরোসিস। এ সব অসুখই অ্যালকোহলের সাথে যুক্ত। মদের সাথে সম্পর্ক আছে স্ট্রোক, ফিট হওয়া, প্যারালাইসিস অ্যাপোপ্লেক্সির হতে পারে ওয়াটনিক্স কাসকো সিনড্রোম যার ফলে রোগী বর্তমানের কথা ভুলে যায় আর অতীতের কথা মনে পড়ে। হতে পারে থাইসেন ডেফিশিয়েন্সি। প্যালগ্রা, বেরি বেরি, ডেলিরিয়াম ইন্টারমিনেন্স, অপারেশনের পর ইনফেকশন। যখন সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে চায় আর এরকম অবস্থায় খুব আধুনিক হাসপাতালেও সে মারা যেতে পারে।

বিভিন্ন এন্ড্রোক্রাইনাল সমস্যা যেমন মিক্সোডিমা, হাইপোথারডিজম, কাসকি সিনড্রোম ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। হতে পারে ফলিক এসিড ডেফিশিয়েন্সি-যার সাথেই আছে মাইক্রোসারন্টিক এনিমিয়া। হতে পারে প্লেটলি ডিজঅর্ডার, থাম্বোসাইটাপিনিয়া। সাধারণ ওষুধ যেমন ফ্লাজিল বা মেট্রোনিডাজল কাজ করবে না

যদি সে নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে। অ্যালকোহল পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হতে পারে। এরকম সময়ে কফ ফুসফুসে চলে যেতে পারে। হতে পারে লং অ্যাবসিসি, এনফেসিমা। মানুষ এসব রোগে মারাও যায়। অ্যালকোহল মহিলাদের আরো বেশি ক্ষতি করে। গর্ভবতী অবস্থায় অ্যালকোহল পান করলে হতে পারে অ্যালকোহল ফিটা সিনড্রোম। এতে সন্তানেরও ক্ষতি হতে পারে। চর্মরোগ হতে পারে। অনেক অসুখ হতে পারে। আপনি এই অসুখগুলোর লিস্ট করবেন কয়েকদিন, আলোচনা করবেন কয়েক মাস। তবে, পশ্চিমা ডাক্তারগণ বলছে, অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ, অ্যাডিক্শন না।

আপনাদের যেমন টাইফয়েড হতে পারে, টিউবার ফুলোসিস হতে পারে, আর আমরা সাধারণত অসুস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখাই। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে, অসুখে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তাররাই জানাচ্ছে অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ। আমি তাদের বলি, অ্যালকোহলিজম অসুখ হয়ে থাকলে এটাই একমাত্র অসুখ যা বোতলে বিক্রি হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা দিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার আয় করে পশ্চিমা সরকারগুলোর সাহায্যে। এটাই একমাত্র অসুখ যার বিজ্ঞাপন দেখানো হয় টেলিভিশনে, রেডিওতে। নিউজপেপারে আর মাগ্যাজিনে। এটাই একমাত্র অসুখ যার কারণে হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা পরিবার ধ্বংস করে দেয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা ভাইরাস বা রোগ জীবাণুতে ছড়ায় না। এটা কোনো অসুখ না।

আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্য নির্ধারক তীর (এসব অসুখ নয়) ঘৃণ্য শয়তানের কাজ। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।

আর ইসলামে সমাধানও আছে। আর সেটা হলো সালাতে। সালাত শুধু প্রার্থনাই নয়, প্রার্থনা মানে মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন করা। সালাতে সাহায্য চাওয়ার পাশাপশি আমরা আল্লাহর নির্দেশনা চাই এবং তার প্রশংসা করি। এজন্য সালাতকে আমি বলি এক ধরনের প্রোগ্রামিং, এক ধরনের কন্ডিশনিং। কেউ যদি বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর প্রোগ্রামিং-এ যাচ্ছি। উত্তরটা ভালো শোনায় না সেজন্যে লোকে প্রার্থনাকে সালাত করে সালাতের পুরো অর্থ বুঝা যায় না। সালাতে আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়। যখন ইমাম সূরা ফাতিহার পর বিভিন্ন আয়াত পাঠ

করেন, তিনি সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াত পড়তে পারেন যে, তোমার সম্পদ বিচারকগণের নিকট পেশ করো না' অর্থাৎ ঘুষ দিয়ো না। সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াত পড়তে পারেন, মদ্যপান ও জুয়া শয়তানের কাজ।

আমরা বার বার প্রোগ্রামড হচ্ছি। কারণ, পৃথিবী এমনভাবে প্রলুব্ধ করে তাতে করে হতে পারে আমরা বিপথে চলে গেলাম। সে জন্য আল্লাহ আমাদের সমাধান দিয়েছেন। কিভাবে আমরা সুপথে থাকবো। আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্ব সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইসলামকে। আপনি জানেন, কেন? কারণ, যে আনন্দ বিলাসের শীর্ষে তারা আছে, সব ক্ষতিকর জিনিসই তাদের সমাজে আছে। তারা ভয় পাচ্ছে যদি ইসলাম ছড়িয়ে যায়, এসব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যালকোহল, মদ, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন, নিউজ পেপার সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বলছে। ইসলামের নিন্দা করছে। কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা অবশ্যই কোনো মুসলমান করেছে। মুসলমানরা মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা বোম্বিং-এর সময়ও। নিউজপেপারের হেডিং ছিল– মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র। কিছুদিন পর তারা জানতে পারল কাজটা একজন আমেরিকার সৈন্যের। কিন্তু এটা খবরের কাগজের মাঝখানে এসেছিল, হেডলাইন হয় নি।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

মুসলমানরা মৌলবাদী এটা হেডলাইনে আসবে আর আসল কারণ ভেতরে। এরকম খবরও শুনে থাকবেন যে, পঞ্চাশ বছরের একজন মুসলমান ষোলো বছরের এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। ছোট করে লেখা যে অনুমতি নিয়ে। খবরের কাগজের হেড লাইন হবে এটা। কিন্তু যখন পঞ্চাশ বছরের অমুসলিম লোক ছয় বছরের একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে। এ খবরটা ছোট করে আসবে। কাগজের কোনো এক কোণায়। অনুমতি নিয়ে যদি বিয়ে করেন, মেয়ে, বাবা-মায়ের অনুমতি, তারপরও সেটা অন্যায়। তার মানে হলো পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা ইসলামের নিন্দা করে। মুসলমানরা মৌলবাদী, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। ইসলাম মেয়েদেরকে ছোট করে দেখে, এসব। এর উত্তর আমি দিয়েছি আমার 'ইসলামে মেয়েদের অধিকার' ক্যাসেটে।

পশ্চিমারা ফিরে আসছে ইসলামে

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার উপর যে লেকচার দিয়েছিলাম সেখানেও পাবেন। পশ্চিমা নেতারা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক পশ্চিমাই ইসলাম গ্রহণ করছে। এই প্রশ্নটা ভুল হবে যদি বলেন, কেন পশ্চিমারা ইসলামের কাছে আসছে? পশ্চিমারা ইসলামের কাছে আসছে না তারা ইসলামের কাছে ফিরে আসছে। কারণ আমাদের মহানবী (সা) বলেছেন– كل مولد يولد على

الفطرة। 'প্রত্যেক মানুষ দ্বীন-উল-ফিতর নিয়ে জন্মায়'। অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম, মুসলমান হয়ে জন্ম নেয়। পরবর্তীতে তার বাবা-মা আর আশেপাশের অন্যান্য লোকের প্রভাবে সে শুরু করে দেয় মূর্তিপূজা বা আগুন পূজা। তাই লোকে বলে 'কনভার্ট' আর আমি বলবো 'রিভার্ট'। 'কনভার্ট' মানে এক পথ থেকে অন্য পথে যাওয়া। 'রিভার্ট' মানে আর সঠিক পথে ফিরে আসা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,- 'আমি তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ কিতাব, মানবজাতির নির্দেশনার জন্য। শুধু মুসলমান, আরব বা পশ্চিমাদের নির্দেশনার জন্য না, সমগ্র মানব জাতির জন্য।'

মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ শুধু আরবদের বা পশ্চিমাদের নবী নন, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের নবী।

সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে আছে-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।

সূরা সাবায় ২৮ নং আয়াতে আছে-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : আর (হে নবী!) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাদের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

তাই সঠিক আর নির্ভুল শব্দটা হবে রিভার্ট। সে জন্য আমি বলবো পশ্চিমারা আসছে না, পশ্চিমারা ফিরে আসছে ইসলামের দিকে। ইসলাম শুধু পশ্চিমাদের জন্যও নয়। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য।

সূরা ইব্রাহীমের ১ নং আয়াতে আছে-

الٓر قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ٧

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোতে।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থ : রমজান মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারী রূপে।

পশ্চিমে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করছে ইসলাম

আর সে জন্যই ইসলাম ধর্ম সমগ্র মানবজাতির। এ কথাটাই একবার ছাপা হয়েছিল 'প্লেইনট্রুথ' ম্যাগাজিনে। রেফারেন্স ছিল। রিডার্স ডাইজেস্ট অ্যালামনাই ইয়ারবুক ১৯৮৬, সেখানে পরিসংখ্যান ছিল, প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীর সংখ্যা কত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে? এক নম্বরে ছিল ইসলাম ২৩৪ পারসেন্ট। খ্রিস্টান ধর্ম মাত্র ৪৭%। আজ আমেরিকাসহ ইউরোপের সর্বত্র যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটা হলো ইসলাম।

এ কথাটাই আল্লাহ বলেছেন সূরা সাফ-এর ৯ নং আয়াত এবং সূরা আত তাওবার ৩৩ নং আয়াতে–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ -

অর্থ : আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ।

যাতে করে ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর থাকে। তা হতে পারে নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, মার্কসিজম, কম্যুনিজম, পশ্চিমাবাদ, পুঁজিবাদ ইসলাম সবার উপরে অবস্থান করে, সবার উপরে বিজয়ী হয়। 'যদিও মুনাফিকগণ এটা অপছন্দ করে। যদিও পূজারিগণ এটা অপছন্দ করে।'

সূরা আল-ফাত্‌হ-এর ২৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থ : আল্লাহ তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ যেন ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর থাকে।

হতে পারে সেটা হিন্দুধর্ম, ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, কম্যুনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, পশ্চিমাবাদ ইসলাম সব কিছুর উপরে অবস্থান করে। আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, আমাদের এই ইসলাম ধর্ম পুরো পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

আমার কথা শেষ করার আগে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

অর্থ : নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।

ওয়া আখিরুদ্দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বহুবিবাহের মাধ্যমে কি পুরুষ নিজেকে পরীক্ষায় ফেলে?

প্রশ্ন ১. প্রশ্নকারিনী মহিলা ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কুরআনে খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, বহুবিবাহ করলে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে হবে। যদিও এটা খুব কঠিন। তাই যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলেছেন। অন্যদিকে আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে মনে হয় বহুবিবাহ-ই একমাত্র সমাধান। এখন আমার ধারণা যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলছেন। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি বেশ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করছে, সে আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলছে। আর আমরা আসলে সবাই এখানে পরীক্ষা দিতেই এসেছি। আর আপনি ভাবতে পারেন যে, আমরাতো কম পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারি। মানুষ আসলে বোকা, তাই বেশি পরীক্ষা দিতে চায়। যদি পরীক্ষায় ফেল করেন, তাহলে আপনার সমস্যা হবে। কিন্তু যদি পাস করেন, তাহলে আপনি পুরস্কারও পাবেন। কারণ ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য। আর সেজন্য আমাদের রাসূল ﷺ বলেছেন যে, 'সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।' একাধিক স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচার করা খুব কঠিন। আমি পরিসংখ্যানে বলেছি, পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা বেশি। তবে আমি অনুপাতটা বলি নি। প্রতি হাজার পুরুষের জন্য পৃথিবীতে মহিলা রয়েছে এক হাজার পাঁচ জন। তার অর্থ প্রতি দুশো জনে একজন একাধিক বিয়ে করতে পারবেন। অনুপাতটা এরকম না যে প্রতি ১ জনে ৪ জন। মাত্র অর্ধেক পার্সেন্টি বেশি। আর এটাই বহুবিবাহ অনুমোদনের একটা কারণ। অন্য আরো কারণ আছে। অনেকের শারীরিক চাহিদা বেশি থাকে। যেটা সে বাজারে গিয়ে পছন্দ করে রক্ষিতা কিনতে পারে অথবা একাধিক বিয়ে করতে পারে।

এভাবে সে দুজনের উপকার করছে। নিজের উপকার করছে আর যে মহিলার নিরাপত্তা দরকার তারও উপকার করছে। ইসলাম সবার উপরেই সুবিচার করে। সবাইকে একটার বেশি বিয়ে করাতে বাধ্য করছে না। কিন্তু যদি বিয়ে করে ন্যায়বিচার করতে পারেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ পুরস্কার পাবেন। আর যদি না

পারেন এটা কোন ফরয না যে অবশ্যই করতে হবে। এমনকি মুস্তাহাবও না। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

ডা. জাকির নায়েককে তার পিতা-মাতা কিভাবে লালন করেছেন?

প্রশ্ন ২. আমার নাম ফরিদা। এতোক্ষণ আপনার লেকচার শুনছিলাম যা খুব ভালো লাগছিল। আমি আপনাকে প্রশ্নটা এই জন্য করছি যে, আমি একজন মা। আমার সন্তানদের বড় করতে হবে। আপনি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন, ডাক্তারি পাস করেছেন। আর এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের ওপর লেকচার দিচ্ছেন। আপনার বাবা-মা আপনাকে কিভাবে বড়ো করেছিলেন? আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন যাতে আমার মতো মায়েরা উপকৃত হতে পারে।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি আমার লেকচার শুনেছেন। জানেন যে, আমি একজন ডাক্তার। আল্লাহর পর এই পৃথিবীতে কাউকে যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি আমার মা। তবে আমার বাবা, স্ত্রীসহ পরিবারের অন্য সবাইও দাওয়ায় নিয়োজিত। লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, আপনার পরিবারের সবাই একই রকম! এটাতো দারুণ 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং'। আমি বলি যে, আমি বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। তারা যদি 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। ভেবেছিলাম উনি প্রশ্নটা দিয়ে এমন কিছু বুঝাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ সে রকম ছিল না। লোকে ভাবে বেশি ছেলেমেয়ে থাকা ভাল না। তবে এটা ভাল হতেও পারে। এটা নির্ভর করে কিভাবে তাদের বড় করছেন, মানুষ করছেন। আমার বাবা-মা আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। তারা কখনো জোর করেন নি যে, এটা মানো, ধর্ম মানো। তবে তারা সব সময় কুরআন ও সুন্নাত মেনে চলেছেন। মানুষ তার বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শেখে। তবে সব সময় এমনটা হয় না। আমরা ইতিহাস থেকে জানি নবীদের সন্তানেরাও কুপথে গিয়েছিল। এটা আসলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছাড়া হয় না। কারণ সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে আছে,

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তবে কেউ তোমাদের হারাতে পারবে না। যদি আল্লাহ সাহায্য না করেন, তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? তাই মুমিনদের উচিত আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা।

আমার বাবা-মা আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছেন। তারা আমাকে ডাক্তার বানানোর জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন। তারা চাইতেন আমি যেন ক্রিস বার্নাডের মতো হই। ক্রিস বার্নাড দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তার যে প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন করেছিল। মা তার সাথে দেখাও করেছিলেন। আমিও এই পেশাটা বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, মানুষের সেবা করার জন্য ডাক্তারি সবচেয়ে ভালো পেশাগুলোর একটা। তাই আমি ডাক্তার হয়েছিলাম। আমার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। পরবর্তীতে শেখ আহমদ দীদাতের উৎসাহে আমি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করলাম। তখন আবিষ্কার করলাম যে, আমার রোগীদের শারীরিক অসুখের বদলে আধ্যাত্মিক অসুখ সারিয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পাচ্ছি।

পৃথিবীতে হাজার হাজার ডাক্তার রয়েছেন, যারা বিনা মূল্যে চিকিৎসা করছেন। আমিও তাদের মতোই হবো। তাই ঠিক করলাম ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হবো। তখন আমার বাবা-মা আমাকে সমর্থন করেছেন। তারা বলতে পারতেন, তোমার পিছনে আমরা এতো টাকা খরচ করেছি, আমাদের অনেক আশা ছিল ইত্যাদি। আমার বাবা-মা আমাকে বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই। এটাই আল্লাহর পথ। আমার মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি চাও আমি শেখ আহমদ দীদাতের মতো হই, নাকি ক্রিস বার্নাড হই? তিনি বলেছিলেন আমি চাই তুমি এক সঙ্গে দুটোই হও। তবে এখন তিনি বলেন, আহমদ দীদাতের মতো একজন দা'য়ীর জন্য আমি হাজার ক্রিস বার্নাড ছাড়তে পারি।

দাওয়ার ক্ষেত্রে ফ্যামিলির সমর্থন খুব বেশি দরকার। সন্তানকে কিভাবে বড় করতো হবে এ ব্যাপারে জানতে পারবেন আমার লেকচার 'শিশুর জন্য ইসলাম'। শিশুর সেরা শিক্ষক হলো তার মা। আর প্রথমে যে বইটা বাবা-মায়ের উচিত সন্তানকে দেয়া, সেটা হলো কুরআন। কোন্ জীবনের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কার সঙ্গী থাকবে। আমার বাবা-মা আরবি ভাষার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। আরবি ভাষা জানা থাকলে পবিত্র কুরআন সহজে বুঝা যায়। আপনার সন্তানকে আরবি ভাষা শেখালে সে সহজেই পবিত্র কুরআন পড়তে পারবে। কেউ যদি আল্লাহর পথে চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে পথ দেখান।

সূরা আনকাবুতের ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ : যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।

তাই আপনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে যান। ঠিক পথে সংগ্রাম করে যান। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে সাহায্য করবেন। তাই প্রথমে দরকার আল্লাহর উপর বিশ্বাস, দ্বিতীয়টা হলো সংগ্রাম, আর তৃতীয়টা হলো কৌশল। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মহিলাদের সংখ্যা বেশি : সমাধান বহুবিবাহ

প্রশ্ন ৩. (পুরুষ) ঃ শুভ সন্ধ্যা। আমার প্রশ্নটাও বহুবিবাহের ওপর। ইসলামে যাকাতের মতো সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এখন পৃথিবীতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এর সমাধানের জন্য যাকাতের মতো কোনো ব্যবস্থার প্রচলন করা যায় কিনা?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা আছে যা দারিদ্র্য আর অপরাধ কমায়। বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও এমন ব্যবস্থা নেই কেন? ব্যবস্থা আছে। যাকাতের ক্ষেত্রে ধনীরা দরিদ্রদের সাথে সম্পত্তি শেয়ার করেন। আর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা স্বামীকে শেয়ার করেন। আলহামদুলিল্লাহ্। যাকাত আর বহুবিবাহের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। এভাবে আগে কখনো ভেবে দেখিনি। আপনার প্রশ্নই আমাকে দেখালো। তাই, এই প্রশ্ন-উত্তর সেশনটা আমার বেশ পছন্দ। যত বেশি প্রশ্ন আসে, আমার উত্তর তত বেশি উন্নত হয়। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন। মানুষ যত বেশি প্রশ্ন করে, আমার মাথা ততই খোলে। যাকাতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের সাথে শেয়ার করা হয়। আর মহিলারা স্বামীকে শেয়ার করছেন এতে অন্য মহিলাদেরও রক্ষা করা হচ্ছে।

অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ

প্রশ্ন ৪. (মহিলা) ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। পশ্চিমারা একেবারে নিয়মিতভাবে ইসলামের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। আর কিছু কিছু মুসলমানের ব্যবহার একেবারেই ইসলামীক নয়। তারপরও অমুসলিমরা কেন ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে জানতে চায়? এর কারণ কি কোনো মুসলমানের ব্যবহার? নাকি পশ্চিমা দেশগুলোতে কোনো দায়ী'র আমন্ত্রণ? অথবা এখানে কি আল্লাহর দেয়া হিদায়ার পাশাপাশি অন্য কারণও আছে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে, পশ্চিমা মিডিয়া সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে। তারপরও কেন পশ্চিমারা (আলহামদুলিল্লাহ) ইসলাম গ্রহণ করছে। হিদায়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। এখন এটা কি দায়ী'দের কারণে হচ্ছে নাকি মুসলমানদের ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে?

নাকি কারণটা অন্য কিছু। আমার মনে হয় না যে, আজকের মুসলমানদের দেখে পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ইউসুফ ইসলাম (খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণকারী বিখ্যাত সঙ্গীত তারকা, নাম ক্যাটস্ স্টিফেন।) বলেছিলেন, কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হওয়ার আগে কুরআন পড়ে ভালই করেছিলেন। ওদের আগে দেখলে আমি কখনোই ইসলাম গ্রহণ করতাম না। এটা তার নিজের মতামত। হয়তো তিনি যে মুসলমানদের দেখেছিলেন, তারা অতোটা ভাল ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধু মুসলমানদের ব্যবহার দেখে। সেজন্য, আমি আমার লেকচারে বলি, ইসলাম ধর্ম ভাল কথা বলে; কিন্তু কিছু লোক ঠকাচ্ছে, ঘুষ দিচ্ছে, খারাপ কাজ করছে। এই ক্ষেত্রে আমি বলি যে, প্রত্যেক সমাজেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এখন, মিডিয়া এই কুলাঙ্গারগুলোকে সবার সামনে দেখাচ্ছে আর বলছে যে, মুসলমানরা এ রকম। বুঝাতে চায়, প্রত্যেক মুসলমানই খারাপ। তারা নিজেদের স্বার্থে এগুলো করছে। আমি তাদের বলি, (আলহামদুলিল্লাহ) মুসলমানরা ধর্মীয়ভাবে মদ পান করে না। মদ্যপান এখানে নিষিদ্ধ। মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি দান-খয়রাত করে।

পশ্চিমা মিডিয়া কুলাঙ্গারদের তুলে ধরে বলছে, এরাই মুসলমান। আমি একটা উদাহরণ দেব। ধরেন আপনি মার্সিডিজ রেঞ্জের নতুন মডেলের গাড়ি কিনতে গেছেন। আপনি গাড়িটা কেমন ভালো তা জানার জন্য একজন ড্রাইভারকে চালাতে দিলেন। ড্রাইভার অদক্ষ হওয়ার কারণে গাড়িটা এক্সিডেন্ট করলো, কাকে দোষ দিবেন? গাড়িকে নাকি ড্রাইভারকে? নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে দিবেন। গাড়িটাকে বিচার করতে হলে দেখতে হবে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, ব্যবস্থাগুলো কতটা ভালো, কেমন তেল লাগে, স্পিড কেমন, যন্ত্রপাতির মান কেমন ইত্যাদি। তাই ইসলামকে বিচার করতে চাইলে, বিচার করুন পবিত্র কুরআন আর সহীহ্ হাদীস দিয়ে। গাড়িটা কত ভালো, সেটা দেখতে চাইলে একজন ভালো ড্রাইভারকে গাড়িতে বসান। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান এর অনুসারীদের দিয়ে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিচার করুন। বিচার যদি করতে চান, মূল গ্রন্থ দিয়ে বিচার করুন। যদিও মিডিয়া ইসলামের বিপক্ষে। আপনারা পাবেন সালমান রুশদীর মতো মানুষ যে 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটা লিখেছে।

যারা বইটা পড়েছেন তারা জানেন। যদিও সে ওই বইতে নবী করীম (সা) আর তাঁর স্ত্রীগণকে ছোট করেছে, (নাউযুবিল্লাহ)। তবুও অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তার ঐ বইয়ের জন্য। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি শয়তানকে তার নিজের কাজে লাগাতে পারেন। অনেক লোকজন এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেখলো যে, সে ভুল করেছে। তারা যখন মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর গবেষণা

করলো, (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলো। পশ্চিমারা ইসলামের যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে, সেটা হলো ইসলামে মেয়েদের অধিকার। এ ব্যাপারে আমি লেকচার দিয়েছি, 'ইসলামে মেয়েদের অধিকার : আধুনিক নাকি সেকেলে?' ভুল ধারণাগুলো কী কী?

পশ্চিমাদের মধ্যে পুরুষের চাইতে অনেক বেশি মহিলা মুসলমান হচ্ছে। কেন জানেন? কারণ তারা গবেষণা করে। অনেকে গবেষণা করে ইসলামের বিরুদ্ধে বলার জন্য। যেমন– গ্যারি মিলার। তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হলেন 'আহাদ ওমর।' তিনি পবিত্র কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এমন অনেকেই ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ একেক জনকে একেক উপায়ে হেদায়েত দান করেন। কেউ হয়তো মুসলমানদের দেখেই ইসলাম গ্রহণ করছেন। কেউ ইসলামকে আক্রমণ করছে তারপর মুসলমান হচ্ছেন। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলেন, হযরত ওমর (রা)। এক সময় তিনি ছিলেন ইসলামের বড় শত্রু। রাসূল ﷺ তাঁর হেদায়াতের জন্য দোআ করেন। আর তাই, (আলহামদুলিল্লাহ) একেক জায়গায় একেক কারণ। দায়ীদে:র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলি। আমরা মুসলমানেরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি না। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যেটা প্রচার করতে হয়।

সূরা আলে-ইমরানের ১১০ নং আয়াতে আছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করো, অসৎ কাজের নিষেধ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো। কিতাবিগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। কারণ, আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দায়ী' হওয়া। ফুল টাইম দায়ী' না হলেও পার্ট টাইম দা'য়ী হওয়া উচিত। আমাদের মাঝে কতজন ফুল টাইম দা'য়ী আছেন? অল্প কয়েকজন। এটা মুসলিম

উম্মাহর জন্য লজ্জার ব্যাপার। তবে আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, সূরা আস সাফ ঃ আয়াত ৯, সূরা আত তাওবা ঃ আয়াত ৩৩, এবং সূরা আল ফাতহ্-এর ২৮ নং আয়াতে–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

অর্থ : তিনি রাসূল ﷺ-কে হেদায়াত সহ পাঠিয়েছেন ইসলামকে অন্য সব মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করতে।

আমরা কাজ করি বা না করি তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কাজ করে কিছু পুরস্কার পাওয়ার। পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করার। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না। মুসলমানদের সবারই উচিত দ্বীনের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত থাকা। ৬০,০০০ খ্রিস্টান মিশনারীরা ফুলটাইম পুরো পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করছে। আর তাদের সাহায্য করছে আরো হাজার হাজার মানুষ। কতজন মুসলমান দা'য়ী আছেন সার্বক্ষণিক?

সূরা মুহাম্মদের ৩৮ নং আয়াতে আছে–

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ـ

অর্থ : যদি তোমরা বিমুখ হও আল্লাহ্ অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাবর্তী করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।

আমরা তো ভাবি পশ্চিমারা খারাপ। আল্লাহ হয়তো আমাদের সরিয়ে তাদেরকেই দায়িত্ব দেবেন–যদি আমরা দায়িত্ব পালন না করি। দা'য়ীদের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় আমরা অনেক পেছনে আছি, এমনকি পাস মার্কেরও নিচে। কিছু লোক অবশ্য (আলহামদুলিল্লাহ) দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ সংখ্যা অনেক কম। যদি আমরা কুরআনের অনুসরণ করি, তাহলে আরো অনেক মুসলমান দাওয়ায় যোগ দেবেন।

ধর্মগ্রন্থে অবিশ্বাসীদের বুঝানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন ৬. (পুরুষ) ঃ ডা. জাকির নায়েক, আপনার জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল লেকচারের জন্য ধন্যবাদ। অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা কি ভূমিকা পালন করছি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো, যখন দেখি যে, পশ্চিমাদের কেউ কেউ কোনো ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না। ফলে এদেরকে ইসলামের কথা বুঝাতে খুব সমস্যা হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে কী করা উচিত? আরব আমিরাতে আপনার লেকচারে আপনি বলেছিলেন যে,

ভারতে কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়াই তারা বিভিন্ন বাণী দিচ্ছে আমাদের কাছে। কারণ তারা ঈশ্বর। এসব ঈশ্বরকে আপনি কিভাবে বিশ্বাস করবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন। **প্রথমটা হলো** ইসলামের প্রসারে মুসলমানেরা কী ভূমিকা পালন করছেন। যখন বলেছি যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না, তার মানে এই না যে, আমরা কোনো কাজই করছি না। পশ্চিমা বিশ্বে বেশ কিছু ভালো অর্গানাইজেশন যেমন : ইস্না, ইক্না কাজ করে যাচ্ছে। পুরো মুসলিম উম্মার এই কাজগুলো করা উচিত। আমি পশ্চিমে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ভাই ইউসুফ ইসলামের খুব সুন্দর একটি স্কুল আছে। সেরা ইসলামী স্কুলগুলোর একটা। এই প্রচেষ্টাগুলো যথেষ্ট নয়। আরো অনেককে আসতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি – যারা ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না, কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। তারা হলো নাস্তিক। খ্রিস্টানরা বাইবেলে বিশ্বাস করে, হিন্দুরা বেদে বিশ্বাস করে। তাই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলা যায়। কিন্তু একজন নাস্তিককে বোঝাবেন কিভাবে। আজ বিকেলে আমার লেকচারের সময় বলেছিলাম মূল চাবিকাঠির কথা।

সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে আছে–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

অর্থ : আসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।

দাওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো 'আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই কথায় আসো।' নাস্তিকের সাথে কী মিল আছে? আমি নাস্তিকের সাথে দেখা হলে তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, মানুষ খ্রিস্টান হয় যেহেতু তার বাবা খ্রিস্টান। কিংবা হিন্দু কারণ বাবা হিন্দু। অনেকে আবার মুসলমান কারণ তার বাবা মুসলমান। এই নাস্তিক লোকটা হিন্দুর ঘরে জন্মালে হয়তো ভাববে যে, এক দেবতা আরেক দেবতার সাথে যুদ্ধ করছে, স্ত্রীকে অপহরণ করা হচ্ছে আর দেবতা তাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যাচ্ছে। তাহলে আমি বিপদে পড়লে এই দেবতা আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে? অথবা খ্রিস্টান হলে ভাবছে, দেবতাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা হচ্ছে আর তাহলে তাকে কিভাবে বিশ্বাস করবো? তাই সে এরকম কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, সে কালেমার প্রথম অংশটা বলে ফেলেছে যে, 'লা ইলাহা' কোনো ঈশ্বর নেই। আমাকে পরের অংশটা বলতে হবে 'ইল্লাল্লাহু' বা

আল্লাহ ছাড়া। হিন্দু বা খ্রিস্টানকে আগে বুঝাতে হয় যে, তারা যে ঈশ্বরের পূজা করে তা ভুল। তারপর তাকে বুঝাতে হয় আল্লাহর কথা। আর নাস্তিকের ক্ষেত্রে আমার অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। সে ইতোমধ্যে বিশ্বাস করে যে, কোনো 'ঈশ্বর' নেই। এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে 'ইল্লাল্লাহ'। আর এ ব্যাপারে আমার লেকচার পাবেন বিভিন্ন ক্যাসেটে 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী? কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কথা।' আমি এখানে সংক্ষেপে কিছু বলছি। আমি তাকে বলবো, ধরেন আপনার হাতে একটা যন্ত্র আছে যা পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখে নি। সেটা প্রথমেই আপনার সামনে আনা হলো। কে সবার আগে বলতে পারবে এই যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে? নিশ্চয়ই এর প্রস্তুতকারী কিংবা সৃষ্টিকর্তা যে লোক যন্ত্রটা বানিয়েছে।

সে নাস্তিক যে উত্তরই দিক প্রস্তুতকারী, সৃষ্টিকর্তা, ম্যানুফ্যাকচারার, প্রডিউসার সব মোটামুটি একই কথা। এখন তাকে প্রশ্ন করেন, এই বিশ্বজগৎ কোথা থেকে এলো? সে বলবে, আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, একদম প্রথমে ছিল প্রাইমারি নেবুলা তারপর থেকে সব আলাদা হতে লাগলো। তারপর বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে (মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) সৃষ্টি হলো গ্যালাক্সি, গ্রহ, নক্ষত্র তথা এই বিশ্বজগৎ। এটা বিগ ব্যাঙ থিওরি। আমি তাকে বলবো, এই কথা তো ১৪০০ বছর আগে কুরআনেই বলা হয়েছে। সূরা আল-আম্বিয়ায়ের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط

অর্থ : অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি তাদের পৃথক করে দিলাম।

অথচ এই বিগব্যাঙ থিউরি বিজ্ঞান জেনেছে একশত বছর আগে। কুরআন এই কথা বলে ১৪০০ বছর আগে। সে হয়তো বলবে এসব হঠাৎ করে মিলে গেছে। আচ্ছা মানলাম এরপর আসি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে এখানকার সব বস্তু কি অবস্থায় ছিল? সে বলবে 'সবকিছু গ্যাস'। আপনি তাকে বলবেন পবিত্র কুরআন বলছে 'সেখানে ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ'। যদি সে বিজ্ঞান জেনে থাকে, তাহলে সে জানবে যে গ্যাসকে আরো ভালোভাবে বলা যায় ধোঁয়া। যদি তাকে বলেন, পৃথিবীর আকার কেমন? সে বিজ্ঞান জানলে আপনাকে বলবে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফান্সিস ড্রেক নামে এক নাবিক সমুদ্রপথে পৃথিবী ঘুরে আসেন। পৃথিবী বর্তুলাকার। আপনি তাকে বলবেন। পবিত্র কুরআনে সূরা নাযিয়াতের ৩০ নং আয়াতে আছে–

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۔

অর্থ : এরপর তিনি পৃথিবীকে বানালেন ডিম্বাকৃতি।

আপনি তাকে বলবেন যে, কুরআন বলেছে পৃথিবী বলের মতো গোল নয় এটি বর্তুলাকার। আল-কুরআন একথা বলেছে ১৪০০ বছর আগে। এরপর আসি চাঁদের আলো সম্পর্কে– সে বলবে যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্য থেকে ধার করা। আমি স্কুলে পড়েছিলাম যে সূর্য তার স্থানে স্থির থাকে। নিজের চারপাশে ঘোরে না।

সূরা আল-আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে আছে,

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

অর্থ : আল্লাহই রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চন্দ্র যাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

কুরআন বলেছে যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। আমি স্কুলে এটা শিখিনি। শিখেছি, সূর্য স্থির হয়ে থাকে। সে তখন বলবে, কিছুদিন আগে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সূর্য নিজের চারপাশে ঘোরে। পঁচিশ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। কুরআন কিভাবে একথা বলতে পারলো? কুরআন এভাবে বলেছে বায়োলজির কথা। জীব জগতের সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানি চক্র অর্থাৎ কিভাবে পানি উপরে ওঠে, মেঘ হয় এবং তা থেকে বৃষ্টি হয় সেই কথাও বলেছে কুরআন। কুরআন বলেছে নোনা পানি আর মিষ্টি পানির কথা।

একথা আছে সূরা আল ফুরকান-এর ৫৩ নং আয়াতে এবং সূরা আর রহমানের ১৯ ও ২০ নং আয়াতে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ـ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থ : তিনি দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্টি অপরটি লোনা উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন অন্তরায়।

কুরআন জুওলজির কথা বলেছে। এটা আছে সূরা নাবা'র ৬ ও ৭ নং আয়াতে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি ভূমিকে শয্যা এবং পর্বতমালাকে পেরেক স্বরূপ করি নি?

এসব কথা কি ১৪০০ বছর আগে একজন অশিক্ষিত মানুষ বলতে পারে? এখানে একটা উত্তরই সে দিতে পারে– সব কিছুই হঠাৎ করে মিলে গেছে। এই হলো 'থিউরি অব প্রবাবিলিটি' বা 'সম্ভাবনার সূত্র'। হঠাৎ করে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। ধরুন, আমি একটা পয়সা টস করলাম, আমি যদি আন্দাজ করে মেলাতে চাই, তার

সম্ভাবনা দুই ভাগের এক ভাগ। হেডও হতে পারে আবার টেইলও পড়তে পারে। যদি পয়সাটা দুইবার টস করি, দুবারই ঠিক বলবো তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান চারভাগের একভাগ অর্থাৎ ২৫%। তিনবার টস করলে তিনবারই ঠিক বলবো তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান আটভাগের একভাগ অর্থাৎ ১২.৫%।

এভাবে 'প্রবাবিলিটি থিউরি' দিয়ে যদি কুরআনকে দেখেন যে, পৃথিবীর কতগুলো আকারের কথা একজন মানুষ চিন্তা করতে পারে? একজন মানুষ ৩০ টার বেশি আকার চিন্তা করতে পারে। যেমন- বর্গাকার, চতুর্ভুজ, চ্যাপ্টা, আয়তকার, ত্রিভুজ, বর্তুলাকার ইত্যাদি। এখন পৃথিবীর আকার কি হবে তা আন্দাজে মিলিয়ে ফেলবে তার সম্ভাবনা ৩০ ভাগের একভাগ। চাঁদের আলো নিজস্ব নাকি ধার করা তা কেউ আন্দাজে বললে তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দুভাগের ১ ভাগ। তাহলে পৃথিবীর আকার এবং চাঁদের আলো এই দুটোই ঠিকমতো বলার সম্ভাবনা হল ৬০ ভাগের ১ ভাগ। জীবজগত কোথা হতে সৃষ্টি হয়েছে একথা আন্দাজে বলতে গেলে যে লোক মরুভূমিতে থাকে সে প্রথমেই চিন্তা করবে বালির কথা।

এছাড়া হতে পারে অন্য কোনো বস্তু যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, পাথর, গ্যাস, কাঠ, বালি, মাটি এরকম ১০,০০০টি জিনিসের কথা মানুষ ভাবতে পারে, যা দিয়ে জীব জগত তৈরি হয়েছে। এখানে আন্দাজে বললে তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১০,০০০ ভাগের ১ ভাগ। এই তিনটি উত্তরই ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বা ছয় লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ .০০০১৭%। এরকম কুরআন হাজার কথা বলে বিজ্ঞান সম্পর্কে যার সবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর ম্যাথমেটিকস আমাদের বলে যে, যদি পশ্চাৎটা শূন্য দশমিকের পর থাকে, সেটার অর্থ আসলে শূন্য। তাহলে কুরআনের সবকিছু আন্দাজে বলা হয়েছে তার সম্ভাবনা শূন্য। তাহলে কে এই কথাগুলো বলতে পারে? তিনি বলতে পারেন, যিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ! আমি এখানে সংক্ষেপে বললাম। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখুন। কুরআন কি আল্লাহর বাণী? অনেকভাবে প্রমাণ করা যায় যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী।

তৃতীয় প্রশ্নটা হলো যে, একজন মানুষ আল্লাহ্‌কে কিভাবে বুঝাবে যে, সে ভুল পথে চলছে? মনে করুন, কেউ আপনাকে বললো, এটা সোনার অলংকার, তোমার কাছে বিক্রি করবো। ২৫ ক্যারেট সোনা। আপনি তখন সেটা কিনে ফেলবেন? নাকি পরীক্ষা করে দেখবেন কথাটা সত্যি কিনা? আপনি স্বর্ণকারের কাছে যাবেন, সে কষ্টি পাথরে ঘষবে তারপর সে রং মিলাবে। যদি সে ২৪ ক্যারেটের সাথে মিলে যায় তাহলে বলবে ২৪ ক্যারেট। যদি ২২ ক্যারেটের সাথে মিলে যায়

তাহলে ২২ অথবা ১৮ ক্যারেটর সাথে মিলে গেলে ১৮ ক্যারেট বলবে। আবার এটা সোনা নাও হতে পারে। কারণ, চকচক করলেই সোনা হয় না। তাহলে রজনীশের উদাহরণ দিলাম। ধরুন, রজনীশ নিজেকে আল্লাহ্ বলে। তাকে সূরা ইখলাস দিয়ে পরীক্ষা করুন। রজনীশ এখনো অদ্বিতীয়? সে কি অমুখাপেক্ষী? কারো ওপর নির্ভরশীল নয়?

অথবা, অন্য যে কেউ যে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে। হতে পারে যীশুখ্রিস্ট, রাম-লক্ষণ যে কাউকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কারো ঈশ্বরকে ছোট করতে চাই না। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে আছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থ : আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা সীমা লংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।

তাহলে এই লোকগুলো যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে তাদের সূরা ইখলাসের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করবেন, তাহলেই প্রমাণ করতে পারবেন তারা আল্লাহ্ নয়। আর যদি আল্লাহ্ না হয়; তাহলে তো ধর্মগ্রন্থের কথাই আসছে না।

কেবল বিয়ে করলেই দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয় না

প্রশ্ন ৮. আস্সালামু আলাইকুম। আপনি একটি হাদীস বলেছেন যে, 'বিয়ে অর্ধেক দ্বীন পূরণ করে।' বিয়ে করলেই কি অর্ধেক দ্বীন পূরণ হবে? নাকি বিয়ের পুরো প্রক্রিয়া যেমন–কিভাবে বিয়ে করলেন, স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ব্যবহার, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি আগেও বলেছি 'বিয়ে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে' কথার দ্বারা মহানবী (সা) বুঝিয়েছেন যে, বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। বিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের প্রিয়নবী (সা) বলেছেন যখন বিয়ে করবে, তুমি সাধারণত চারটা বিষয় দেখবে। সম্পদ, সৌন্দর্য, আভিজাত্য আর সদগুণ। মানুষ বিয়ে করার সময় প্রথম সৌন্দর্য দেখে তারপর সম্পদ এরপর আভিজাত্য এবং সর্বশেষ দেখে সদগুণ। মহানবী (সা) বলেছেন, এই চারটার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সদগুণ। কিভাবে বিয়ে করবেন? রাসূল (সা) বলেছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিয়ে হলো যেখানে সবচেয়ে কম খরচ হয়। তাই অপচয় করা যাবে না। জীবন সঙ্গী বেছে নেয়া, বিয়ে করা, সন্তানদের বড় করা এসবই সুন্নাহ মেনে করতে হবে। বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত হবেন। এমন হবে না যে,

বিয়ের পর আপনি ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

সূরা নিসা'র ১৯নং আয়াতে আছে–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا .

অর্থ : তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তবে এমনও হতে পারে যে, একটা জিনিস তোমরা পছন্দ করো না। আল্লাহ্ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন ।

প্রাচ্যের দেশগুলোতে যেমন ভারতের পুরুষরা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক নেয়। ইসলামে আপনি দেবেন দেনমোহর। বিয়ে করলে আপনাকে একজন ভালো স্বামী হতে হবে, সন্তান সন্তুতি হলে আপনাকে ভালো মা কিংবা বাবা হতে হবে। এ রকম বিয়ের সাথে সম্পর্কিত সব দায়িত্ব ও কর্তব্য যখন আপনি পালন করবেন, তখন আপনার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

পশ্চিমা নেতারা ইসলামকে ভয় পায়

প্রশ্ন ৯. আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ডা. জাকির, আমি আসলে এ ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করতে চাই। আপনি বলেছেন, পশ্চিমা নেতারা ইসলামকে ভয় পায়। আপনি দেখবেন, এমনকি জাহেলিয়াতের যুগেও তাদের বিভিন্ন নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। সে জন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা যেটা ভয় পেয়েছিল সেটা হলো ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে বদলাতে হবে। আর পৃথিবীর অধিকাংশ নেতাই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। আর আমার মতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো তাদেরকে একেবারে সাধারণ মুসলমান হয়ে চলাফেরা করতে হবে। হোক সেটা আমেরিকায় বা অন্য কোথাও।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আপনি বলেছেন যে, জাহিলিয়াতের নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। দুঃখিত ভাই আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। সে সময়ের বড় বড় নেতারা ইসলামকে প্রচণ্ড ভয় পেত। তারা একমাত্র যে জিনিসটাকে ভয় পেত তাহলো ইসলাম। আর এজন্যই তারা নবীজিকে বলেছিল, আমরা তোমাকে রাজা বানাব, সবচেয়ে ধনী লোক বানিয়ে দেব, যদি তুমি ইসলাম প্রচার করা বন্ধ করে দাও। মহানবী (সা) উত্তরে বলেছিলেন, আমার ডান হাতে সূর্য

আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি ইসলামের এই দাওয়াত প্রচার থেকে বিরত থাকবো না।

পরবর্তীতে (আলহামদুলিল্লাহ) সত্যেরই জয় হলো। তখন তারা মুসলমান হয়েছে। এজন্যই কুরআন বলছে প্রথমে গোত্রের নেতাদের বুঝাও। যদি তারা মুসলমান হয়, অনেকেই তাদের অনুসরণ করবে। সেজন্যই আমি বলবো, পশ্চিমা বিশ্বেও বেশির ভাগ নেতাই ইসলামকে ভয় পায়। অবশ্য সবাই না, ভালো কিছু লোক আছে। যেমন ব্রুনো চার্লস বেশ কিছু ভালো কথা বলেছেন। তার নিয়ত আল্লাহই ভালো জানেন। ইংল্যান্ডের বেশ কিছু মন্ত্রী ইসলাম সম্পর্কে ভালো কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন মুসলমান হওয়া তাদের জন্য খুব সহজ। ব্যাপারটা আসলে মোটেও সহজ না, ভাই। সেই সময়ে আবু সুফিয়ান আর অন্যান্য নেতারা অনেক ধনী ছিল। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কে তাদের কুর্নিশ করবে? ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব মানুষ সমান। ফলে, তাদের সাথে কোলাকোলি করতে হবে। জীবনটাই পুরো বদলে যাবে। নেতারা ভয় পেয়েছিল যে, তারা যে বিলাসিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছিল সে সবই ছাড়তে হবে শুধু ইসলামের কারণে। আল্লাহ তাদের হেদায়াত দান করেছিলেন। তারা পৃথিবীর বদলে আল্লাহর কাছে আখিরাতে প্রাসাদ চেয়েছিল। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উদাহরণটা হলো বিবি আসিয়ার। তিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। সূরা তাহরীমের ১১ নং আয়াতে আছে-

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যখন যেস প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি এবং যালিম সম্প্রদায় হতে।

তিনি ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ফেরাউনের স্ত্রী। তারপরও তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করেছেন। তাই (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহ যখন হিদায়াত দান করেন তখন সে যত বড় নেতাই হোক না কেন, সে ইসলাম গ্রহণ করে আখিরাতের জন্য।

আকিকায় ছেলের জন্য দুটি মেয়ের জন্য একটি কেন?

প্রশ্ন ১০. (মহিলা) ঃ আমরা আল-কুরআন পড়ে জেনেছি যে, পুরুষ আর মহিলা আল্লাহর কাছে সমান। আমাদের মহানবী ﷺ-এর হাদীসেও আছে যে, বাবার চেয়ে মা'র অধিকার বেশি। কিন্তু আকিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মেয়ের জন্য দেয়া হয় একটি বকরি কুরবানি আর ছেলের জন্য দুটো। বুঝানো হচ্ছে যে, ছেলেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা হলো, অধিকারের সময় কেন ছেলের জন্য দুটো বকরি আর মেয়ের একটা বকরি কুরবানি দেয়া হয়। বোন, অনেক সহীহ্ হাদীসে আছে, ছেলের জন্য একটা বকরিও কুরবানি দেয়া যায়। এটি এমন নয় যে, ছেলের জন্য দুটি কুরবানি দেয়া উচিত। ইসলামে পুরুষ মানুষই রোজগার করে। পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের ওপর। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব বাবার অথবা ভাইয়ের। বিয়ের পর তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সব দায়িত্ব স্বামীর আর সন্তানের। সে অর্থনৈতিক দায়মুক্ত। সবাই তাকে রক্ষা করছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)। এটা আমি বলছি আমার যুক্তি দিয়ে–এটাই যে আসল কারণ তা নাও হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন কেন ছেলের জন্য দুটি বকরি। তাই একজন মানুষ ছেলে হলে বেশি টাকা খরচ করতে চায়। এটা হতে পারে একটা কারণ। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে বাধ্যতামূলকভাবে দুটি কুরবানি কোনো সহীহ্ হাদীসে নেই। সহীহ্ হাদীস বলছে হয় একটি নয়তো দুটি। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটা বকরি কোনো সমস্যা নয়, আপনি ইচ্ছে করলে আরো বেশি কুরবানি দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা ও আমাদের প্রিয়নবী (সা) সে সুযোগ রেখেছেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

পশ্চিমাদের সমালোচনা করা কি ঠিক?

প্রশ্ন ১১. (মহিলা) ঃ আমি একজন কনভার্টেট মুসলমান। মুসলমান হওয়ার আগে ইসলাম সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিল। এর কারণ, আমি যে মুসলমানদের দেখেছিলাম, তারা ভালো ছিল না। ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম। কিন্তু সব সময় অন্য ধর্মের সমালোচনা করা কি ঠিক? মানে আমি বলতে চাচ্ছি এভাবে কথা বলাটা ঠিক না। পশ্চিমাদের এতো বেশি সমালোচনা করা যেমন– ধর্ষণের কথা বলেছেন, মুসলিম দেশেও সেটা হয়, মধ্যপ্রাচ্যেও হয়। হয়তো এতো বেশি রিপোর্ট করা হয় না। কিন্তু এখানেও হয়। তাহলে পশ্চিমাদের ওপর এতো বেশি আক্রমণ কেন? আপনি বললেন যে, অমুসলিমরা বলে যে, ইসলাম মহিলাদের ছোট করে দেখে। কুরআনে অনেক কথাই বলা হয়েছে পুরুষ আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু

পুরুষদের যেগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো সবাই এড়িয়ে যায় আর মহিলাদের জন্য যা বলা হয়েছে সেগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

আপনি একটু আগে বললেন, গুণী স্বামী এবং স্ত্রীর কথা। কিন্তু যখন বিভিন্ন বই পড়ি সেখানে লেখা থাকে কেবল গুণবতী স্ত্রীর কথা। আর শুধুই বলা হচ্ছে মহিলাদের কি কি করা উচিত। এমনটা কেন করা হচ্ছে? আমরা এরকম করি বলেই অনেক সময় অমুসলিমদের বুঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বইগুলোতে কিভাবে ভালো স্ত্রী হওয়া যায় সে কথা লিখার পাশাপাশি কিভাবে একজন ভাল স্বামী হওয়া যায় সে কথাও কেন লেখা হয় না? এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, রাসূল (সা) নিজে স্ত্রীদের গৃহাস্থলীর বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। সব জায়গায় সব কিছুতেই কেবল মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে। যেমন, মহিলাদের এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। ইসলাম ধর্ম একথাই বলছে। আর এভাবে অমুসলিমদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। তিনি রিভার্ট হয়েছেন এজন্য তাকে জানাই অভিনন্দন। তিনি বলছিলেন কিভাবে পশ্চিমাদের সাথে ব্যবহার করা উচিত, কথা বলা উচিত। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, 'বিষয় এইটা না যে, পশ্চিমাদের কিভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে?' তাদের মুসলমান হওয়ার কারণ বলছি। আর বলার ক্ষেত্রে কোদালটাকে কোদালই বলছি। আর বোন, আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করা উচিত না। কারণ, পবিত্র কুরআনের সূরা আল আনআমের ১০৮ নং আয়াতে আছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থ : আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে গালি দিও না। কেননা, অজ্ঞানতা বশত তারা সীমা লংঘন করে আল্লাহকেও গালি দিতে পারে।

আপনি বলেছেন যে, আমি পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনা করছি। বোন, সমালোচনা করা মানে আমি যেটা বলবো যে, কোনো প্রমাণ ছাড়া বলা। আমি যা বলছি তা আমেরিকারই পরিসংখ্যান। তাহলে আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সমালোচনা করা মানে কোনো একটা পয়েন্ট ধরে সেটাকে নিয়ে প্যাঁচানো আর এটা পশ্চিমারাই বেশি করে। পশ্চিমারা খুব গর্বিত যে, তারা খুব স্পষ্টবাদী। তারা বলে যে, আমরা সাহসী, সত্যবাদী।

আলহামদুলিল্লাহ, আর আমিও সত্যবাদী। তারা মিডিয়ায় দেখায় যে, মেয়েদের ছোট করে দেখা হয় আর আমি এফ. বি. আই.-এর রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান আমি দিয়েছি, সেটা কোনো মুসলমান নয়, পশ্চিমারাই লিখেছে। তাই তারা বলতে পারবে না যে, জাকির সমালোচনা করছে। আর এজন্য আমি ব্যবহার করেছি আমার হিক্‌মা।

আপনি বললেন, ধর্ষণের ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটছে; কিন্তু রিপোর্ট করা হচ্ছে না। আমি আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। ধর্ষণ খুব বেশি হয় পশ্চিমা বিশ্বে; কিন্তু ওখানেই রিপোর্ট করা হয় না। কারণ, এটা ওখানে এতই সাধারণ যে রিপোর্টই করা হয় না। খবরের কাগজে খুব ছোট করে লেখা থাকে। অন্য কোনো দেশে ধর্ষণ হলে হেডলাইনে আসবে। আমি বলছি না যে, এখানে ধর্ষণ হয় না। ধর্ষণ পুরো পৃথিবীতেই হয়। সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় মুসলিম দেশগুলোতে। যেসব দেশগুলো ইসলামীক শরিয়া নেই, সেখানে হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় সৌদি আরবে। সবচেয়ে কম। সেখানেও ধর্ষণ হয়। কারণ সেখানেও কুলাঙ্গার থাকে। সবচেয়ে কম ডাকাতির ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। অনেক মুসলিম দেশ আছে যারা ইসলাম অনুসরণ করে না, তারা হলো নকল মুসলমান। এসব দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে খবরের কাগজের হেডলাইন হয়। কারণ এটা একটা কলঙ্কিত ঘটনা। আর আমেরিকায় এটা হলো দৈনন্দিন জীবন। যেমন একজন রোগী বললো তার যৌনরোগ আছে, ডাক্তার বললো যে তারও আছে। তারা নির্লজ্জ সুতরাং অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বোন, আমি যেহেতু সত্যি কথা বলছি, সেহেতু আমাকে বলতে হবেই। আমি ভদ্র ভাষায় বলেছি 'জনগণের সম্পত্তি' গনিকা কিন্তু এটাইতো সত্যি। লোকে সমালোচনা মনে করলেও কোদালকে আমি কোদালই বলবো। পশ্চিমারা (আলহামদুলিল্লাহ) এ রকম স্পষ্ট কথাই পছন্দ করে।

আপনি যদি খ্রিস্টানদেরকে বলেন, তোমরা শিরক করো না। এসব থামাও। এটা তোমাদের জন্য ভালো। একথা আপনি যতো ভদ্রভাবে বলেন, সে কষ্ট পাবেই। কোনো মানুষকে মিথ্যা হতে মুক্ত করতে চাইলে সে কষ্ট পাবেই। আপনি যদি খুব ভদ্রভাবেও কোন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি যীশু খ্রিস্টের পূজা করো?' তারপরও সে কষ্ট পাবে।

এমন তো নয় যে,আমি তাদের অপমান করার জন্যই এভাবে বলছি। আমি এখানে শুধু তাদেরই পরিসংখ্যান দিয়েছি। এই হলো আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নটা হলো কেন মুসলমান পণ্ডিতরা শুধু মহিলাদের কথা বলে পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে না কেন? বোন, আমার 'ইসলামে মেয়েদের অধিকার' ক্যাসেটটি আপনার দেখা উচিত। আমার লেকচার শুনে

লোকজন প্রশ্ন করেছিল আমি কখন 'ইসলামে পুরুষের অধিকার' নিয়ে বলবো। আমি আমার ক্যাসেটে বলেছি স্ত্রীর সাথে স্বামীর কিভাবে ব্যবহার করা উচিত। এমনকি আজকেও আমি যখন হিজাবের কথা বলছিলাম, তখন ঠিক সেই কথাটাই বলেছি যা আপনি বলেছেন। সাধারণ মুসলমান বক্তারা মেয়েদের হিজাবের কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন প্রথমে পুরুষের হিজাবের কথা। আপনি যদি ইসলামের নিরপেক্ষ পথ দেখতে চান, আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো দেখতে পারেন। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কি রকম ব্যবহার করবে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সেসব কথা। অনেক পুরুষই আমার এরকম কথা পছন্দ করে নি।

বোন, আমি আগেও বলেছি যে, ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। তবে সাম্যবাদ মানে অভিন্নতা নয়। পুরুষ-মহিলা সমান কিন্তু তারা একই রকম নয়। আমি আমার লেকচারে মহিলাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও শিক্ষার অধিকারের কথা বলেছি। পশ্চিমা বিশ্ব যে মানব সভ্যতার কথা বলে সেটা ছদ্মাবরণ মাত্র। শরীরকে শোষণ করা, সম্মানের অবমাননা এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছুই করে না তারা। মহিলাদের অধিকারের কথা বলে তাদেরকে উপপত্নীর, রক্ষিতার স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে তারা। তারা পরিণত হচ্ছে আনন্দ পিয়াসী আর সেক্স ব্যবসায়ীদের হাতের খেলনায়। আর্ট এবং কালচারের রঙ্গীন জগতের মাধ্যমে তাদেরকে প্রলোভিত ও অপব্যবহার করছে। পুরুষ ও মহিলা মানুষ হিসেবে সমান। কিন্তু তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠন আলাদা। পুরুষরা মহিলাদের সব কাজ করতে পারে না। মহিলারাও পুরুষদের সব কাজ করতে পারে না। আমি এখন থেকে সন্তান ধারণ ও জন্মদান করতে পারবো না।

قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ ، وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ ـ

অর্থ : একলোক নবীজির কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে আমার ভালোবাসা ও সাহচর্য সবচেয়ে বেশি কার প্রাপ্য? নবীজি বললেন, তোমার মা'র। লোকটি আবার বললো, এরপর কার? নবীজী বললেন, তোমার মা'র। লোকটি আবারো বললো, এরপর কার। নবীজি বললেন, তোমার মা'র। লোকটি বললো,

এরপর কার? নবীজি ﷺ বললেন, তোমার পিতার। তারপর নিকট আত্মীয়, তারপর পর্যায়ক্রমে। (বুখারী ও মুসলিম)

তার মানে চারভাগের তিনভাগ ভালোবাসা আর সাহচর্যের দাবিদার মা আর এক ভাগ মাত্র পিতার। এখন আমি বলতে পারবো না যে, মাকে এত বেশি অধিকার দেয়া হচ্ছে কেন. আমিও সন্তানের জন্ম দেব। ধরুন, একটা ক্লাসে দুইজন ছাত্র আছে, "A" আর "B"। তারা দুজনেই ১০০ নাম্বারের মধ্যে ৮০ নাম্বার পেয়ে যৌথভাবে প্রথম হলো। প্রশ্নের পেপারে ১০টি প্রশ্ন ছিল যার প্রত্যেকটিতে ১০ নাম্বার। এখন, এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে যার নাম "A" সে ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে। আর "B" পেয়েছে ১০-এর ৭। তাহলে ১ নাম্বার প্রশ্নে "A" "B" এর চেয়ে ভাল। ২নং প্রশ্নে "A" ১০-এর মধ্যে পেল ৭ আর "B" পেল ১০-এর মধ্যে ৯। তাহলে ২ নং প্রশ্নের "B" "A" এর চেয়ে ভালো। বাকি ৮টি প্রশ্নের উত্তরে দুজনই ১০-এ ৮ পেল। সব মিলিয়ে দুজনেই ১০০-তে পেয়েছে ৮০। তবে ১ নং প্রশ্নে "A""B"-এর চেয়েও ভালো। আবার ২নং প্রশ্নে "B" "A" এর চেয়েও ভালো। এমনিভাবে, পুরুষ আর মহিলা সমান; কিন্তু তারা একই রকম নয়। ধরুন, আমার বাড়িতে ডাকাত আসলো ডাকাতি করার জন্য। আমি বলবো না যে, পুরুষ আর মহিলা সমান। আমি আমার স্ত্রী আর বোনকে বলবো না গিয়ে মারামারি করতে।

সূরা নেসার ৩৫ নং আয়াতে আছে–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ ـ

অর্থ : পুরুষরা মহিলাদের নেতা (তত্ত্বাবধায়ক)।

শক্তির দিক থেকে পুরুষ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। অর্থাৎ কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। আর কিছু কিছু ব্যাপারে মহিলারা সুবিধাজনক অবস্থানে। সব মিলিয়ে পুরুষ-মহিলা সমান। 'স্বামীর কর্তব্য' নিয়ে ইসলামীক কোনো বই নেই। ইনশাআল্লাহ, আপনি রিসার্চ করে বক্তব্য দেবেন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যেহেতু রিভার্ট হয়েছেন, আপনি বক্তব্য দিলে সেটার প্রভাব ভালমতো পড়বে। আমি অনুরোধ করবো আমার ক্যাসেটগুলো দেখেন। আপনার ধারণা বদলাবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া উচিত

প্রশ্ন ১২. আস্সালামু আলাইকুম। আগের দিনের ইতিহাস বলে যে, আমরা টার্গেট করতাম কাফের নেতাদেরকে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মুসলমান। আমার মনে হয়, মুসলিম উম্মার জন্য

এখন একটা নেতৃত্বের প্রয়োজন। এখন কি আমাদের উচিত নয়, বিভিন্ন দেশের নেতাদের টার্গেট করে দাওয়াতী কাজ করা?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের কোনো নেতা নেই। বিভিন্ন দেশের মুসলিম নেতাদের টার্গেট করা উচিত কি-না। হ্যাঁ উচিত। এমনকি ভিন্ন ধর্মের নেতাদেরও টার্গেট করা উচিত। আমাদের একজন নেতা প্রয়োজন। ইসলাম নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। খিলাফতের আমিরের আনুগত্যের নির্দেশ দেয় ইসলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে সর্বশেষ তুরস্কে। আবার খিলাফত কায়েম করা উচিত। আমাদের একজন খলিফা থাকা উচিত। সারা বিশ্বে অনেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন নতুন করে খিলাফতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহ তাদের সাফল্য দান করুন। দোয়া করি মুসলিম উম্মার মধ্য থেকে একজন নেতা আসুক। নেতৃত্ব থাকলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো। তাই আমাদেরকে ভাল নেতা খুঁজে বের করতে হবে। আজকের দিনে মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ নেতারাই কুরআন সুন্নাহ মেনে চলেন না। যখনই কোন ইসলামী নেতৃত্ব আসে, অমুসলিমরা তাকে ছোট করার চেষ্টা করে। তারা তাদের কাজ করছে। আমাদেরকে আমাদের যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে।

উপস্থাপক ঃ ধন্যবাদ ডা. জাকির নায়েককে তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য। **ইসলামের প্রসারের জন্য আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আমরা জানতে পারলাম। আমরা তাকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানাচ্ছি।**

ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃশ্য

THE SIMILARITIES BETWEEN ISLAM AND CHRIS RELIGION

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ মারুফ হাসান

বি.বি.এ (হিসাববিজ্ঞান)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও খ্রিস্টিয়ান-এর মধ্যে সাদৃশ্য

শ্রদ্ধেয় গুরুজন ভাই ও বোনেরা। আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামিক নিয়মে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া-রহমাতুল্লাহি ওয়া-বারাকাতুহু।' অর্থ আল্লাহর দয়া, শান্তি ও রহমত সবার ওপর বর্ষিত হোক। একইভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন যীশুখ্রিস্ট 'হিব্রুতুস সালামালাইকুম।' (গ্রুজবেল অব লূক, অধ্যায়-২৪, অনুচ্ছেদ-৩৬) অর্থ 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আজকের আলোচনার বিষয় হলো ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। 'ইসলাম' শব্দটি এসেছে 'সালাম' থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। আরেকটি অর্থ হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। এক কথায় 'ইসলাম' মানে নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করা। আর যে লোক নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সে হলো মুসলমান। অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে, ইসলাম হলো একটি নতুন ধর্ম। যে ধর্মটি পৃথিবীতে এসেছে ১৪০০ বছর আগে। আর মহানবী ﷺ হলেন এই ধর্মের প্রবর্তক। সত্যি বলতে ইসলাম পৃথিবীতে আসে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই। যে সময় থেকে আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর মহানবী ﷺ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহ তাআলার শেষ নবী। পবিত্র কুরআনে সূরা ফাতিরের ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ.

অর্থ : এমন কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় নেই যেখানে আমি পথপ্রদর্শক বা সতর্ককারী পাঠাই নি।'

আর পবিত্র কুরআনের সূরা রা'দ-এর ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি প্রত্যেক গোত্রের জন্য পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছি।'

পবিত্র কুরআন এখানে বলছে প্রত্যেক গোত্র বা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। এছাড়া পবিত্র কুরআনে সূরা মুমিনের ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط

অর্থ : আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নি।

তার মানে, কুরআনে কয়েকজন নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ আছে আর বাকিদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবী রাসূলের কথা নাম নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : আদম, নূহ, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ। সবাই শান্তিতে থাকুক। আর ইসলাম হলো এমন একটা অ-খ্রিস্টান ধর্ম, যে ধর্মের মূল ভিত্তি যীশুখ্রিস্টকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। সে আসলে মুসলমান নয় যে যীশুখ্রিস্টকে নবী হিসেবে মানে না। আমরা মানি যে, তিনি একজন আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দূত ছিলেন। আমরা এ-ও মানি যে, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন, কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই যা অনেক আধুনিক খ্রিস্টান বিশ্বাস করেন না। আমরা মানি যে, তিনি মৃতকে জীবিত করে ছিলেন আল্লাহর নির্দেশে। আমরা জানি যে, তিনি স্রষ্টার নির্দেশে অন্ধ আর কুষ্ঠ রোগীকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

ইসলাম হলো একমাত্র অখ্রিস্ট ধর্ম যে ধর্মে যীশুকে নবী হিসেবে মানতে হবে। আমি পূর্বেই বলেছি ২৫ জন নবী ও রাসূলের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। তবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন এ পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাজার নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন। ১ লাখ ২৪ হাজার নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন, নাম দিয়ে ২৫ জনের উল্লেখ আছে। তবে এ সব নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে। তারা এসেছিলেন শুধু তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে। আর তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে নির্দেশ নিয়ে ছিলেন তা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। যেসব নবী-রাসূল এসেছিলেন মহানবী ﷺ-এর পূর্বে তারা এসেছিলেন শুধু তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে। আর সেই নির্দেশগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেমন সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ـ

অর্থ : আমি ঈসা (আ)-কে পাঠিয়েছি বনী ঈসরাইলের রাসূল হিসেবে।

আর এই একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে (গ্রসবেল অভ মেথিও, অধ্যায় ১০ম, অনুচ্ছেদ ৫ম)। এখানে উল্লেখ আছে যে, যীশুখ্রিস্ট তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে একথা বলেছেন যে, 'তোমরা কখনো জেন্টাইলদের পথ অনুসরণ করো না।' এই জেন্টাইল হলো তারা যারা ইহুদি নয়, হিন্দু আর মুসলিম। যীশুখ্রিস্ট তার শিষ্যদের বলছেন, 'তোমরা জেন্টাইলদের পথ অনুসরণ করো না। আর সামারকানদের কোনো শহরে প্রবেশ করবে না। বরং তোমরা ইসরাঈলবাসীদের পথ অনুসরণ করে চলবে।' যীশু তার শিষ্যদের বলছেন, 'তোমরা শুধু ইসরাঈলবাসীদের পথ

অনুসরণ করবে।' আর যীশু তার নিজের মুখেই বলেছেন যে, 'আমি এ পৃথিবীতে এসেছি শুধু ইসরাঈলবাসীদের পথ দেখানোর জন্যে।' (গ্রসবেল অভ মেথিও, অধ্যায় নং ১৫, অনুচ্ছেদ-২৪'শ)।

তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন শুধু ইহুদিদের জন্যে অর্থাৎ ইসরাঈলবাসীদের জন্যে, পুরো মানবজাতির জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۔

অর্থ : মহানবী ﷺ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং তিনি হলেন শেষ নবী, আল্লাহ সব বিষয়ে সব কিছু জানেন। (সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ৪০)।

মহানবী ﷺ হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর মহানবী ﷺ শুধু মুসলমান বা আরবদের জন্যে পৃথিবীতে আসেন নি। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থ : আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং ১০৭)।

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (সূরা সাবাহ্, আয়াত নং ২৮)।

মহানবী ﷺ হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর তিনি শুধু আরব কিংবা মুসলিমদের জন্যে আসেন নি, তিনি পৃথিবীতে এসেছেন সমগ্র মানবজাতির জন্যে। আর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, বাইবেলে বলা হয়েছে, খ্রিস্টান ধর্মে বলা হয়েছে। এটা পাবেন (বুক অভ ডিওটোরনসী, অধ্যায় ১৮শ, অনুচ্ছেদ ১৮'শ)। যেখানে বলা হয়েছে যে, 'আমি একজন নবীকে পাঠাবো তাদের ভাইদের মধ্য থেকে যে হবে তোমার মতো এবং তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলবো, সে আমার নির্দেশেই কাজ করে যাবে।' এই ভবিষ্যৎবাণীটি একজন

নবীর আসার কথা বলছে। আজ অনেক খ্রিস্টানকেই আপনারা বলতে শুনবেন যে, এই ভবিষ্যৎবাণীটি আসলে যীশু খ্রিস্টের আসার কথা বলছে। যদি জিজ্ঞেস করেন এটা কীভাবে যীশু খ্রিস্টের কথা বলছে? তারা আপনাকে বলবে ভবিষ্যৎবাণীটি বলছে–

'আমি একজন নবী পাঠাবো তাদের মধ্য থেকে, সে হবে তোমার মতো, যে হবে মূসা (আ) এর মতো।' যদি সেই নবী মূসার মতো হয় তাহলে বলা যায় সেই নবীর কথাই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। আর খ্রিস্টানরা বলে যে, ঈসা আর মূসা (আ) দু'জনে একই রকম। এখানে তারা যুক্তি দেখায় যে, মূসা (আ) ঈশ্বরের একজন নবী আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরিত নবী। মূসা (আ) একজন ইহুদি আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন একজন ইহুদি। তাহলে দুটোর মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। তখন তাদের জিজ্ঞেস করেন এ দু দুটি সাদৃশ্যই যথেষ্ট যাতে প্রমাণ হয় যে, ভবিষ্যৎবাণীটি যীশু খ্রিস্টের কথা বলছে? তারা বলবে যথেষ্ট।

এই দু'টো সাদৃশ্য দিয়েই যদি এটাকে বিচার করা হয় তাহলে বাইবেলে যত নবীর নাম উল্লেখ আছে যারা মূসা (আ)-এর পরে এসেছেন। যেমন : সলোমান, সীহজায়েল, ডেনিয়েল জোয়েল, জন, হোসেইরা, সবাই ছিলেন ঈশ্বরের নবী, আর সবাই ছিলেন ইহুদি। তবে মূসা (আ)-এর পরে যে সমস্ত নবীর কথা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে তারা সবাই এ শর্ত দুটো পূরণ করেছেন। যদি ভালো করে দেখেন, ডিওটোরনসী'র এ ভবিষ্যৎবাণী ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ১৮ অনুচ্ছেদ, এ ভবিষ্যৎবাণীটি মিলে যার শুধু সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে। কারণ যদি ভালো করে দেখেন মূসা এবং মুহাম্মাদ (তারা দুজনই শান্তিতে থাকুন) তাদের দুজনেরই স্বাভাবিক জন্ম হয়েছে। তাদের দুজনেরই বাবা এবং মা ছিল। যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে সূরা আলে-ইমরানের ৪৩-৪৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে,

'তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছেন কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই।' এ কথা বাইবেলেও আছে (গ্রজবেল অভ মেথিও, অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ১৮)। এ ছাড়াও (গ্রজবেল অভ্ লুক, অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ৩৫)।

যে যীশু অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কোনো মানুষ বাবা ছিল না। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে, হযরত মূসা (আ) এখানে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো, কিন্তু যীশুখ্রিস্টের মতো তিনি নন। তারা দুজনেই (মুহাম্মাদ ও মূসা) বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁদের সন্তান ছিল। বাইবেল অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট বিবাহিত ছিলেন না এবং তার কোনো সন্তানও ছিল না। এছাড়াও মুহাম্মাদ ও মূসা তাদের দু জনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যীশুখ্রিস্ট স্বাভাবিকভাবে মারা যান নি।

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ১৫৭-১৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যীশুখ্রিস্টকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন, তিনি মারা যান নি। আর চার্চ-এর কথা অনুযায়ী বাইবেল বলছে যে, 'যীশুখ্রিস্টকে ইহুদিরা ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে।'

দুটো ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীই তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাননি। তাহলে হযরত মূসা (আ) কখনোই যীশুখ্রিস্টের মতো ছিলেন না। মূসা এবং মুহাম্মাদ (দুজনেই শান্তিতে থাকুন) তাদের দুজনকেই তার লোকেরা গ্রহণ করেছিল তাদের কথা মেনে নিয়েছিল। (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ১) বলছে যখন যীশু আসলেন তার লোকেরাই তাকে মেনে নিল না। মূসা এবং মুহাম্মাদ (দুজনই শান্তিতে থাকুন) তারা শুধু আল্লাহর প্রেরিত দূতই ছিলেন না তারা রাজাও ছিলেন। রাজা মানে তারা কাউকে শাস্তি দিতে পারতেন। তারা মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারতেন। যারা অপরাধ করতো তাদের শাস্তি দিতেন। আল্লাহর নবী হওয়ার পাশাপাশি তারা ছিলেন দেশের প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ দেশের রাজা সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। কিন্তু যীশু নিজের মুখেই বলেছিলেন (গ্রজবেল অভ জন, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৩৬) 'আমার রাজ্য এই পৃথিবীতে নয়।' তার অর্থ যীশু পৃথিবীতে কোনো রাজ্যের রাজা ছিলেন না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মূসা এবং মুহাম্মাদ (তারা শান্তিতে থাকুন) তারা দুজনে আসলে একই রকম। কিন্তু মূসা ও ঈসা (তারা শান্তিতে থাকুন) তারা একই রকম নয়। তাহলে এ ভবিষ্যৎবাণীটি মিলে যায় শুধু চূড়ান্ত ও শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে। এ ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হয়েছে, 'আমি একজন নবী পাঠাবো তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে।' ভাই মানে আত্মীয় আর আমরা জানি ইহুদিরা ও আরবরা তারা অন্যের জ্ঞাতি ভাই। ভবিষ্যৎবাণী আরো বলছে, তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলবো। আমরা জানি মুহাম্মাদ ﷺ যে সমস্ত অহি পেয়েছিলেন, তিনি সেগুলো তিলাওয়াত করছিলেন যেন সেগুলো তার মুখ দিয়েই বলা হয়েছে। তাহলে এ ভবিষ্যৎবাণীটি মিলে যায় পুরোপুরিভাবে মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে।

আরো একটি ভবিষ্যৎবাণী বলছে (বুক অভ আইজায়ার, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ২৯), এ কিতাব দেয়া হবে তাকে যার অক্ষর জ্ঞান নেই। যখন তাকে বলা হবে যে 'পড়'। তখন সে বলবে 'আমি তো পড়তে জানি না।' আমরা জানি যে, প্রথম অহী যা মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর নাযিল হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের (সূরা ইকরা, আয়াত নং ১) উল্লেখ আছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ

অর্থ : পড়ো তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

নবীজি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না'। আর এই কথাটিরই ঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টে বুক অভ আইজারার, অধ্যায় ২৯, অনুচ্ছেদ ১২)।

এছাড়াও উল্লেখ আছে Song of Solomon-এ অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৬)। বলা হয়েছে যে, 'তার কথাগুলো খুবই মধুর, সব কিছু মিলিয়ে মনোরম। যদি ভালো করে দেখেন হিব্রু ভাষায় 'ইম' এ শব্দটি দিয়ে সম্মান দেখানো হয়। 'ইম' যেমন 'এলোহিম'। এটা সম্মানের জন্যে সম্মানের বহুবচন। একইভাবে মুহাম্মাদ তার পরে 'ইম' তখন নাম হলো 'মুহাম্মাদীস'। তাহলে আমরা দেখি মুহাম্মাদ-এর নাম অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও আছে। কিন্তু অনুবাদ করার সময় এখানে বলা হয়েছে, তার কথাগুলো মধুর, সব মিলিয়ে মনোরম। মুহাম্মাদী-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'সব মিলিয়ে মনোরম'। 'তিনি আমার প্রিয় পাত্র, আমার বন্ধু, হে জেরুসালেমের কন্যারা।' তাহলে নাম দিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ ﷺ এর কথা উল্লেখ আছে। এমনকি পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও আছে। তবে কিছু খ্রিস্টান হয়তো বলবে, 'ওল্ড টেস্টামেন্ট আমরা বিশ্বাস করি না, নিউ টেস্টামেন্টের ওপর বেশি গুরুত্ব দিই।'

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে নিও টেস্টামেন্টেও মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। বাইবেলের (গ্রজবেল অভ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৬) যীশুখ্রিস্ট তার শিষ্যদের বলছেন যে, 'আমি আমার পিতাকে বলবো তোমাদের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক পাঠাতে। (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪) আছে 'যখন আমার পিতা পরামর্শক পাঠাবেন যে আমারই প্রশংসা করবে। এরপর উল্লেখ আছে (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ৭) আমি তোমাদের সত্য কথা বলি যে, এটাই মঙ্গল যদি আমি চলে যাই। যদি আমি না চলে যাই তবে সেই পরামর্শক আসবেন না। তবে আমি চলে গেলে তিনি পৃথিবীতে আসবেন। এখন এই 'পরামর্শক' শব্দটা আপনারা এখনকার বাইবেলে পাবেন এটা, তাহলো 'পেরাক্লিটস', যেটা 'পেরিক্লিটস' শব্দটার অপভ্রংশ। 'পেরিক্লিস' শব্দটার অর্থ যে প্রশংসা করে। যার প্রশংসা করা যায় এ শব্দটার আরবি হলো 'মুহাম্মাদ' আর যে প্রশংসা করে তার অর্থ হলো 'আহাম্মদ'। আলহামদুলিল্লাহ, এই দুটো নামই মুহাম্মাদ ﷺ-এর।

পবিত্র কুরআনে আছে যে, 'ঈসা (আ) মরিয়মের পুত্র, তাকে পাঠানো হয়েছিল বনী ইসরাঈলের রাসূল হিসেবে।' আর তিনি বলেছেন, 'আমি সেই আইনকে সমর্থন করতে এসেছি যারা আমার পূর্বে এসেছে। আর সুসংবাদ দিচ্ছি আমার পরে আরেকজন রাসূল আসবেন যার নাম হবে আহমদ।' (তিনি শান্তিতে থাকুন) তাহলে কুরআন বলছে তিনি তার নিজের মুখেই এ ভবিষ্যৎবাণীটির কথা বলছেন। তাহলে মূল শব্দটা হলো 'পেরিক্লিটস' যাকে প্রশংসা করা হয় বা যে প্রশংসা করে এর অপভ্রংশ হলো 'পেরাক্লিটস', যেটার অনুবাদ করা হয়েছে পরামর্শক। আসলে 'পেরাক্লিটস' শব্দটার অর্থ পরামর্শক নয়, এর অর্থ যে দয়ালু। এখন এই শব্দটা

হোক 'পেরাক্লিটস' বা 'পেরিক্লিটস'– প্রশংসা করা যায় বা প্রশংসা যে করে অথবা দয়ালু বা পরামর্শক। আলহামদুলিল্লাহ, এ সব নামই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে মিলে যায়।

এখানে হয়তো কিছু খ্রিস্টান বলতে পারে যে, এ ভবিষ্যৎবাণীটি আসলে বলছে পবিত্র আত্মার কথা। এখানে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণীটি ভালো করে দেখলে বুঝবেন যে 'এটাই তোমাদের জন্যে উপকারী যদি আমি চলে যাই। কারণ আমি চলে না গেলে সেই পরামর্শক আসবেন না, আমি চলে গেলে তখনই তিনি আসবেন।' সেই পরামর্শক তখনই পৃথিবীতে আসবেন যদি যীশুখ্রিস্ট পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আর আমরা জানি যে, পবিত্র আত্মা যীশুখ্রিস্টের জন্মের আগেও যেখানে ছিল। যীশু জন্মানোর সময়ও সেখানে পবিত্র আত্মা ছিল। যীশু ব্যালটাইঞ্জ হওয়ার সময়ও সেখানে পবিত্র আত্মা ছিল। নিশ্চিতভাবে এই পরামর্শক বাইবেলে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি পবিত্র আত্মা নন, পবিত্র আত্মা তখনো ছিল, যখন যীশুখ্রিস্ট এ পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন।

আরো উল্লেখ আছে (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ১২-১৪) যে, আমি তোমাদেরকে আরো কিছু কথা বলবো, কিন্তু তোমরা সেগুলো এখন মেনে নিতে পারবে না। কারণ সে সত্যের আত্মা যখন আসবে, সে-ই তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, যে অহী সে পাবে, সেগুলোই সে বলবে। আর সে আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে, সে আমার প্রশংসা করবে, সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে। এখানে বাইবেলে যে সত্যের আত্মার কথা বলছে, এটাও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথাই বলছে। তাহলে যদি আপনারা বাইবেল পড়েন, এমনকি বাইবেলেও সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মাদ ﷺ এ কথাই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত অনেক আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। নাম দিয়ে ৪টার কথা আমরা জানি। পবিত্র কুরআনে যেগুলোর উল্লেখ আছে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। তাওরাত হলো সেই কিতাব যা হযরত মূসা (আ)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। যাবুর হলো সেই কিতাব যা হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। ইঞ্জিল হলো সেই অহি বা কিতাব যা নাযিল হয়েছিল ঈসা (আ)-এর ওপর। আর কুরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব যা নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর।

এছাড়াও পৃথিবীতে অনেক আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে, নাম দিয়ে পবিত্র কুরআনে মাত্র ৪টার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআনের পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিল। সেগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্যে। আর সেই নির্দেশগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। তবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব পবিত্র কুরআন শুধু মুসলমান বা আরবদের জন্যে নাযিল হয়নি। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : এটা মানবজাতির জন্যে একটা বার্তা, যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং জানতে পারে স্রষ্টা কেবল একজনই এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৫২)।

তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব নাযিল হয়েছে তো পুরো মানবজাতির জন্য। এছাড়াও পবিত্র কুরআনের (সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে) উল্লেখ আছে যে, 'পবিত্র রমজান হলো সেই মাস যে মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানব জাতির দিশারী হিসেবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।'

الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থ : আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি) এই কিতাব মানুষ জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে এবং সত্য-মিথ্যাকে পার্থক্যকারী রূপে।

পবিত্র কুরআনের সূরা যুমারের আয়াত নং-৪১-এ বলা হয়েছে–

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ـ

অর্থ : (হে নবী!) আমি সব মানুষের জন্য এ সত্য কিতাব নাযিল করেছি। এখানে শুধু মুসলমান বা আরবদের কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে পুরো মানবজাতির কথা। তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব নাযিল হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্যে। সেজন্যে পবিত্র কুরআনের পূর্বে যতগুলো আসমানি কিতাব এসেছিল সেগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এসেছিল সে জন্য আল্লাহ তাআলা এগুলোর বিশুদ্ধতার জন্যে কিছু করেন নি। বর্তমানে যে আসমানি কিতাবগুলো আছে তার মধ্যে যেটা পূর্বের মতোই আছে সেটা হলো পবিত্র কুরআন। আর উইলিয়াম মূর যে একজন ইসলামের কড়া সমালোচক। তিনি বলেছেন, আর কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যা পবিত্র কুরআনের মতো বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পেরেছে ১২০০ বছর ধরে। তিনি একথা বলেছেন ২০০ বছর পূর্বে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন যে, 'ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে ৫টি স্তম্ভের ওপর।' (সহীহ্ বুখারী, খণ্ড ১, হাদিস নং ৭)।

প্রথমটি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।) ২য়টি হলো 'সালাত', ৩য় 'যাকাত', ৪র্থ 'হজ্জ্ব' এবং ৫ম হলো 'রোজা'। প্রথমটি হলো আল্লাহ ছাড়া

কোনো মাবুদ নেই এবং মহানবী ﷺ আল্লাহর প্রেরিত দূত। এটা হলো আল্লাহ সম্পর্কে একটি ধারণা। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৭) পূর্ব বা পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই, তবে পুণ্য আছে সেখানে, যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করো। মৃত্যুর পর পরজীবনকে বিশ্বাস করো, আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করো। ফেরেশতাদের বিশ্বাস করো, নবীদের বিশ্বাস করো, আর বিশ্বাস করো তকদীরের।

পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের, নং ৬৪ আয়াতে উল্লেখ আছে যে,

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : বল! হে কিতাবের অনুসারীরা! এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না, আমরা কোনো কিছুকে তার সাথে শরিক করবো না, আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রব বলে স্বীকার করবো না। যদি তারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলিম।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আমাদের পথ দেখাচ্ছে যে, কীভাবে আহ্লে কিতাবদের সাথে (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কথা বলতে হবে। 'এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক' প্রথম সাদৃশ্যটা কী? আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদাত করি না। ইসলাম ধর্মে মহান আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে খুব সুন্দর একটি সংজ্ঞা আছে, পবিত্র কুরআনের সূরা এখলাছ নং ১-৪ আয়াতে আছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : বল! তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তার সমতুল্য কেউ নেই।

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী। এই হলো আল্লাহ তাআলার ৪ লাইনের সংজ্ঞা যদি কোনো মানুষ নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন যদি সেই সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, তাহলে আমাদের মুসলিমদের কোনো আপত্তি থাকবে না তাকে ঈশ্বর বলে মেনে নিতে।

আর পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা'র নং ৪৮ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় 'আল্লাহ তার সাথে শরিক করাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে সে এক মহাপাপ করে।'

আল্লাহ চাইলে যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে শরিক করা কখনোই ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআন আরো বলেছে সূরা নিসার নং ১১৬ আয়াতে

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ـ

অর্থ : আল্লাহ তার সাথে শরিক করাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।

কিন্তু আল্লাহর সাথে শরিক করলে তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না। তার মানে 'শিরক' অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা হলো ইসলামে সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর একই কথা পবিত্র বাইবেলে আছে– (বুক অভ্ হেক্রোডাজ ওল্ড টেস্টামেন্ট, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৩-৫) যে, 'আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করো না, আমার প্রতিমূর্তি তৈরি করো না। উপরের আকাশমণ্ডলি থেকে নিচের পৃথিবী থেকে, অথবা পৃথিবীর নিচে সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর খুবই ঈর্ষাপরায়ণ। একই কথা আছে (বুক অভ্ ডিওটরনমী অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৭৯) যে, 'তোমরা আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো প্রতিমূর্তি বানাবে না।' 'উপরের আকাশমণ্ডলি' থেকে নিচের পৃথিবী থেকে অথবা পৃথিবীর নিচে সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষা পরায়ণ।'

তার অর্থ মহান প্রভুর প্রতিমূর্তি তৈরি করা ও তার সামনে মাথা নত করা পবিত্র বাইবেলে স্পষ্ট করে নিষেধ করা হয়েছে। আমার ভাষণের শুরুর দিকে পবিত্র কুরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত নং ৭২) যে, 'অর্থাৎ তারা কুফরি করছে, ধর্মের অবমাননা করছে, যারা একথা বলে যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) তিনি হলেন আল্লাহ।' তারা কুফরী করে যারা দাবি করে যে ঈসা (আ) হলেন আল্লাহ।

অথচ ঈসা (আ) বলেছেন, 'হে বনী ইসরাঈলা, আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, যে আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরিক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করে দেবেন। সে জান্নাতের ভেতর ঢুকতে পারবে না এবং তার আবাস হবে জাহান্নামে, জালিমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।' কিছু খ্রিস্টান আছেন যারা বলবেন যে, যীশু নিজের মুখেই বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর' তিনি বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বর। সত্যি বলতে আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, একেবারে স্পষ্ট করে যীশু একবারও বলেন নি গোটা বাইবেলের কোথাও পাবেন না, যেখানে যীশুখ্রিস্ট স্পষ্ট করে বলেছেন, নিজের মুখেই বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর' আমার উপাসনা করো। যদি কোনো খ্রিস্টান পবিত্র বাইবেলের কোনো অনুচ্ছেদ দেখাতে পারেন যেখানে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন যে, 'আমি ঈশ্বর এবং আমার উপাসনা করো' তবে তখন থেকেই আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবো। আমি এ কথাটা অন্যান্য মুসলমানদের হয়ে বলছি না, যেহেতু আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ছাত্র, আমি বাইবেল পড়েছি, আমি আমার মাথাটাকে শিরোশ্ছেদ যন্ত্র গিলোটিনের নিচে দিতে রাজি আছি।

সত্যি বলতে, আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, যীশু তার নিজের মুখেই বলেছেন, এটা আছে পবিত্র বাইবেলের (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ২৮) যে, 'আমার পিতা আমার চেয়ে অনেক বড়।' আর (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ২৯) "আমার পিতা সবার চেয়ে বড়।' (গ্রজবেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ২৯) "আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দিই। (গ্রজবেল অভ্ লূক, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ২০) আমি শয়তানকে তাড়িয়ে দিই ঈশ্বরের আঙুলের সাহায্যে।' (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩০) 'আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করতে পারি না, আমি সবকিছু শুনে বিচার করি, আর আমার বিচার সঠিক। কারণ, আমি আমার ইচ্ছেটাকে দেখি না, পিতার ইচ্ছেটাকে দেখি।' যীশু বলেছেন, 'আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করতে পারি না। তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি। পবিত্র কুরআনে আছে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন।'

পবিত্র কুরআন বলছে (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-১১০) -এ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ج

অর্থ : হে নবী! এদেরকে বলে দাও তোমরা তাঁকে আল্লাহ নামে আহ্বান করো অথবা রহমান নামে, তোমরা তাঁকে যে নামেই আহ্বান করো সব সুন্দর নামগুলোতো তাঁরই।

আপনারা আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন, তবে সেটা হতে হবে একটা সুন্দর নাম। এ নামে আপনার মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না। আর পবিত্র কুরআনে সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে আহ্বান করা হয়েছে। যেমন : রহমান, রাহিম, আল-হাকিম, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ। সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। আর একথাটা আরো আছে (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০), (সূরা ত্বা-হা, আয়াত নং ৮), (সূরা হাশরের, আয়াত নং-২৪), যে, 'সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো যেগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার।'

কিন্তু আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে কেন আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি, কিন্তু ইংরেজিতে 'গড' বলে ডাকি না কেন? আল্লাহ একটা বিশুদ্ধ শব্দ। ইংরেজিতে God শব্দটিকে অনেকভাবে বিকৃত করা যায়, যদি God-এর পরে একটা s যোগ করেন সেটা হয় Gods, God-এর বহুবচন। ইসলামে 'আল্লাহ' শব্দটার কোনো বহুবচন নেই। 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'। 'বল, তিনি আল্লাহ্ একক।' যদি God-এর পরে es যোগ করেন সেটা হবে Godes, একজন মহিলা God, ইসলামে পুরুষ আল্লাহ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছুই নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো লিঙ্গ নেই। যদি God এর পরে father যোগ করেন সেটা হবে God father, যে আমার God father 'আমার অভিভাবক।' ইসলামে 'আল্লাহ ফাদার' বা 'আল্লাহ আব্বা' বলে কিছু নেই। 'আল্লাহ' একটা মৌলিক শব্দ। যদি God-এর পরে Mother যোগ করেন সেটা হবে God-Mother, ইসলামে 'আল্লাহ মাদার' বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু নেই। যদি গডের পরে 'টিন' শব্দটা লাগান তবে হয় 'টিন গড'। ইসলামে 'টিন আল্লাহ' বলে কিছু নেই।

এ জন্যে আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি। 'গড' বলে ডাকি না। তবে যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলি তারা হয়তো 'আল্লাহ' শব্দটার মানে বুঝবে না তখন যদি ইংরেজি God ব্যবহার করা হয় তবে কোনো আপত্তি নেই। তবে আল্লাহকে ডাকার সঠিক পদ্ধতি হলো 'আল্লাহ' শব্দটাই। God শব্দটা এখানে সঠিক অনুবাদ নয়। আর এই 'আল্লাহ' নামটা আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে। বাইবেলেও দেখতে পাবেন। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন যে, ঈশ্বরকে যে নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'এলোহিম' 'এলা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'ইম' হচ্ছে সম্মানার্থে বহুবচন 'এলোহিম'। আর যদি আপনারা বাইবেল পড়েন অনুবাদ (ব্রাদার স্করফিট) তিনি এই এলাহকে লিখেছেন Elah অথবা আরেকটি বানান হলো Allah (এল্লাহ্)। তাই দেখতে পাচ্ছেন ভাই স্করফিটাও একমত যে, উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন 'এল্লাহ্' আর আমরা বলি 'আল্লাহ'। উচ্চারণ আলাদা তবে শব্দ দুটি এক। এরপরে যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশে ঝুলানো হলো, বাইবেলের কথা অনুযায়ী (গ্রজবেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ২৭,

অনুচ্ছেদ ৪৬), (গ্রজবেল অভ্ মার্ক, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪) যে, 'যখন যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলানো হলো তিনি বলেছিলেন 'এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি'।

এই কথাটা বাইবেলের প্রতিটি অনুবাদেই আছে, বাইবেলের ইংরেজি, হিন্দি, মালায়িলাম, কর্নাটিক অনুবাদ পড়েন এই হিব্রু উদ্ধৃতি 'এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি' যেখানে আছে, তারপরে লেখা আছে, তিনি বললেন, 'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' আমি আপনাদের প্রশ্ন করি, হিব্রু ভাষায় যীশুখ্রিস্ট তখন বলেছিলেন, 'এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি।' একথাটি কি এমন শোনায়? 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' এটি একই রকম লাগে? এই এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি কি এমন শোনায় যে, 'যোহা যোহা কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? এই বাক্যটি এমন শোনায় যে, 'যীশুযীশু কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' যদি এটার আরবি অনুবাদ করেন তাহলে হবে 'আল্লাহ আল্লাহ লামা তারাক্তানি।'

আরবি এবং হিব্রু একই ধরনের ভাষা, এখানেই শুনছেন দেখতে একই রকম। তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, বাইবেল অনুযায়ী যখন তাকে ক্রুসে ঝুলানো হয়েছিল তিনি তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহ'। সে জন্যে আমরা মুসলিমরা যেহেতু 'আল্লাহ' একটি বিশুদ্ধ শব্দ, আমরা তাই স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামেই ডাকি। ইংরেজিতে God বলি না। যীশুখ্রিস্ট ঠিক এ নামেই ডেকেছিলেন। ২য় স্তম্ভ হলো সালাত। বাংলায় সালাতের অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকেই বলেন 'প্রার্থনা', প্রার্থনা দিয়ে পুরোপুরি সালাত এই আরবিটাকে বুঝানো যায় না। কারণ প্রার্থনা করা মানে সাহায্যের আবেদন করা, মিনতি জানানো, আপনি আদালতে কীভাবে আবেদন করেন, কীভাবে সাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। সালাত আদায়ের সময় আমরা প্রার্থনার পাশাপাশি আল্লাহর প্রশংসাও করি। আর একই সাথে আমরা তার নির্দেশও মেনে চলি। প্রার্থনা দিয়ে সালাতকে পুরোপুরি বুঝানো যায় না। প্রার্থনা মানে শুধু সাহায্যের জন্য আবেদন, আর সালাতে আমরা সাহায্যের পাশাপাশি তার প্রশংসা করি একই সাথে তার নির্দেশও মেনে চলি।

যদি প্রশ্ন করেন তবে আমি বলবো, সালাত অনেকটা ঠিক প্রোগ্রামিং-এর মতো, এক ধরনের অভ্যাস। এখন যদি কেউ বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি যদি বলি প্রোগ্রামিং-এ যাচ্ছি, তাহলে উত্তরটা অদ্ভুত শোনাবে। এ জন্যে কেউ যদি প্রার্থনা শব্দটা ব্যবহার করে আমার কোনো আপত্তি নেই। বাংলায় 'প্রার্থনা' আরবি সালাতের অনুবাদ। তবে আপনাদের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিই যে, 'প্রার্থনা' শব্দ দিয়ে আরবি সালাতের পুরো অর্থ বুঝা যায় না। কেননা আমি বললাম যে, সালাত অনেকটা প্রোগ্রামিং এর মতো। কারণ তখন সালাতই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ

করে। যেমন ধরুন, মসজিদে যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে, তারপর হয়তো সূরা মায়িদা পড়বেন, মায়িদার ৯০ নং আয়াত পড়বেন, সেখানে বলা হচ্ছে যে,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ : হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজা এবং ভাগ্য নির্ণয়ক শর, এগুলো ঘৃন্য শয়তানের কাজ, এগুলো তোমরা বর্জন করো, আশা করা যায় যে, তোমরা সফলতা লাভ।

আজ এখানে মহান স্রষ্টা আমাদের পথ দেখাচ্ছেন যে, মদপান, জুয়া খেলা, মূর্তিপূজা করা, ভাগ্য গণনা, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো বর্জন করো যাতে সফলকাম হতে পারো। সালাতের মধ্যেই আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে, সালাতই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি, ইমাম হয়তো পড়বেন সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াত, যেখানে বলা হচ্ছে যে–

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে-একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতীতে খেয়োনা। আর শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোনো উদ্দেশ্যে পেশ করো না যাতে করে তোমরা অন্য কারো সম্পদ গ্রাস করে নিতে পারো।'

পবিত্র কুরআন বলছে ইসলামে ঘুষ দেয়া ও নেয়ার অনুমতি নেই। আপনি প্রোগ্রামড হয়ে যাবেন যে, ঘুষ জিনিসটা অন্যায়। পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ৪৫–এ উল্লেখ যে–

হে নবী 'তুমি আবৃত্তি করো কিতাব থেকে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয় এবং তুমি সালাত আদায় করো, কারণ সালাত অবশ্যই তোমাকে অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'

পবিত্র কুরআন বলছে যে, সালাত আপনাকে সব মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর প্রত্যেক মুসলিমের প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়াটা একেবারে বাধ্যতামূলক। যেমন : ভালো স্বাস্থ্যের জন্যে আপনাকে তিনবেলা খেতে হবে এবং আত্মিকভাবে ভালো থাকার জন্যে আপনি সালাত পড়বেন প্রতিদিন অন্তত ৫ বার। পবিত্র কুরআন বলছে সূরা ত্বো-হা, নং-১১ ও ১২ আয়াত

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۔ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔

অর্থ : অতঃপর সেখানে পৌঁছলে তাকে (মূসাকে) ডেকে বলা হলো হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক, তোমার জুতো খুলে ফেল, কারণ তুমি এখন পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছো।

আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তার জুতো খুলে ফেলতে। কারণ জায়গাটি ছিল পবিত্র। একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে (বুক অভ্ হেক্সোডাজ অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৫) বলা হচ্ছে যে, 'তুমি কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতো খুলে ফেল। কারণ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সে জায়গাটা পবিত্র।' একই কথা বলা হয়েছে বুক অভ্ এক্স এ অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৩৩ যে, 'মহান স্রষ্টা মূসাকে বলছেন, একজন মুসলিম খালি পায়ে নামাজ পড়তে পার, আর জুতো পরে নামাজ পড়তে হলে জুতোর তলা পরিষ্কার করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার জন্যে নবীজি বলেছেন যেন নামাজ পড়ার জায়গাটি পরিষ্কার থাকে। পবিত্র কুরআনে (সূরা মায়িদা, আয়াত নং-৬) আছে যে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط

অর্থ : হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুত হবে, তোমাদের মুখমণ্ডল ধুবে, আর তোমাদের হাত ধুবে কুনুই পর্যন্ত, পানি দিয়ে তোমাদের মাথা মাছেহ করবে, আর তোমাদের পা ধুবে গোড়ালি পর্যন্ত।

সালাত আদায় করার আগে অজু করা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। আর একই কথা দেখবেন যদি আপনারা বাইবেল পড়েন। এটা আছে (বুক অভ্ হেক্সোডাজ, অধ্যায় ৪০, অনুচ্ছেদ ৩১, ৩২) যে, মূসা ৩০২ আদম তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের হাত ও পা ধুয়ে ফেললো, আর যখন তারা মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলো, যেখানে তারা প্রভুর সামনে যাওয়ার আগে হাত পা ধুয়ে নিল।' এটা আছে (বুক অভ্ এক্স এ অধ্যায় ২১, অনুচ্ছেদ ২৬) যে, 'পল অন্যান্য লোকদের সাথে পরের দিনে পরিষ্কার হয়ে তারপর প্রভুর সামনে গেল।' তাহলে অজু করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আমরা মুসলিমরা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন জাতি। আমরা পরিষ্কার থাকতে চাই, আর এটার পাশাপাশি এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি। ফাইনাল পরীক্ষার আগে যেমন টেস্ট হয়। প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর আগে এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি।

ধরি, খ্রিস্টানরা একটা জাতি যারা যীশুখ্রিস্টের বিভিন্ন নির্দেশাবলী মেনে চলে, তাহলে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। কারণ আমরাই বাইবেলকে বেশি মানি। সালাত আদায়ের সময় বাইবেল যেভাবে বলেছে, আমরা সেভাবে অজু করি। এ ছাড়াও আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন (সহীহ্ বুখারী, খণ্ড নং ১, বুক অভ্

আযান, অধ্যায় ৭৫, হাদিস নং ৬৯২) যে, 'হযরত আনাস (রা) তিনি বলেছেন, যখন আমরা সালাত আদায় করতাম একজনের কাঁধ আরেকজনের সাথে লেগে যেত, একজনের পা অন্যজনের পায়ের সাথে মিলে যেত।' আমাদের নবী আরো বলেছেন, এটা আছে (আবু দাউদে, খণ্ড নং ১, বুক অব সালাত, অধ্যায় ২৪৫, হাদিস নং ৬৬৬) যে,

'নামাজ পড়ার আগে তোমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও, মাঝখানে কোনো ফাঁকা রেখ না, ফাঁকাগুলো পূরণ করো, শয়তানের প্রবেশের কোনো পথ রেখো না।'

নবীজি এমন কোনো শয়তানের কথা বলছেন না যা আমরা টিভিতে দেখে থাকি দুটি শিং আর একটি লেজ। নবীজি যে শয়তানের কথা বলছেন সেটা আসে জাতি থেকে, গোত্র থেকে, বর্ণ থেকে। যারা নামায পড়ছে তারা ধনী বা গরিব, অথবা হোক ফকির। যখন নামাজ পড়তে দাড়াবে তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। যারা নামায পড়ছে হোক সে সাদা বা কালো, বাদামি বা হলুদ, নামায পড়ার সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। এই হলো আমাদের নবীজির শিক্ষা। আর সালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলো সিজদা করা। আর মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, আমাদের মন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, আমাদের শরীর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমি চাইলে আমি আমার হাত ওঠাতে পারবো, আবার নামাতে চাইলে নামাতে পারবো। এক পা সামনে যেতে চাইলে যেতে পারবো, আবার পেছনে আসতে চাইলে আসতে পারবো। আমাদের শরীর সবসময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু মন সব সময় ঘুরে বেড়ায়, মন সবসময় আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মনকে যদি বিনীত করতে চান তাহলে আপনার শরীরটাকে বিনীত করতে হবে। এর জন্যে ভালো উপায় হলো শরীরের সবচেয়ে উঁচু অংশটা অর্থাৎ কপাল একেবারে মাটিতে ঠেকিয়ে দিন এবং বলুন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সবার উপরে'। আর বাইবেলেও ঠিক একই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে। নিউ টেস্টামেন্টও আছে (বুক অভ্ জেনোসিজ, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ৩) যে, 'ইব্রাহীম মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন' এছাড়াও (বুক অভ্ নাম্বারস, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৬) মূসা আর হারুন মাটিতে মাথা ঠেকান। (বুক অভ্ যসোয়া, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৪), যসোয়া মাটিতে মাথা ঠেকান এবং প্রার্থনা করেন।

আর নিউ টেস্টামেন্টে আছে যীশু যখন গেতমামেনের বাগানে গেলেন (গ্রেজবেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় ২৬, অনুচ্ছেদ ৩৯) বলছে, যে, যীশুখ্রিস্ট কয়েক পা সামনে গেলেন, মাটিতে মাথা ঠেকালেন আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।' এমনকি একজন সার্কাসের লোক সেও ভালোভাবে পড়বে না মাটিতে মাথা রেখে ঈশ্বরের

প্রার্থনা করতে, যেভাবে আমরা মুসলিমরা করি। এখানে নিয়মটা একই যেভাবে যীশুখ্রিস্ট প্রার্থনা করেছিলেন। তাহলে যদি যীশুখ্রিস্টের নিয়ম মেনে চললেই খ্রিস্টান হওয়া যায়, এজন্য আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান।

৩য় স্তম্ভটা হলো যাকাত। এটা একটা আরবি শব্দ, যার অর্থ বিশুদ্ধ করা, বেড়ে যাওয়া। আর প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম, যারা ধনী, আর যাদের সঞ্চয় তাদের নিসাবের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, তারা তাদের সঞ্চয়ের (২½)% প্রত্যেক হিজরি সালে গরিবদের মাঝে দান করে দেবেন। এটা আবশ্যিক। আর প্রত্যেক ধনী লোকের জন্যে যাকাত দেয়া ফরজ। এটা আছে পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবা, আয়াত নং ৬০-এ-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط

অর্থ : যাকাত দেয়া যেতে পারে- ১. গরিব, ২. মিসকিন, ৩. যেসব লোক যাকাত সংগ্রহ করে, ৪. যাদের হৃদয় চলে এসেছে ইসলাম ধর্মের পথে, ৫. দাসদের মুক্তির জন্যে, ৬. ঋণগ্রস্তকে, ৭. মুসাফির, ৮. আল্লাহর পথে।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যাকাত দেয়, পৃথিবীতে দারিদ্র্য বলে আর কিছুই থাকবে না। তখন পৃথিবীতে একজন মানুষও আর না খেয়ে মারা যাবে না। একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে (ফার্স্ট পিটারস, অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ ৮) যে 'তোমরা দান করো, দান করলে অপরাধের মাত্রা কমে যায়।'

আর পবিত্র কুরআন বলছে সূরা আল-হাশর, আয়াত-৭-এ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : যাতে তা তোমাদের ধনীদের মধ্যেই কেবল অবর্তিত হতে না থাকে।

সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৪-এ উল্লেখ আছে যে, 'কিছু লোক আছে যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না। তাদেরকে মর্মবিদারী শাস্তির সংবাদ দাও; তাদের সম্পদে আগুনের উৎপন্ন হবে, জাহান্নামের আগুন থেকে. আর সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন দাগ দেয়া হবে তাদের, পিঠে, কপালে এবং সামনে আর তাদের বলা হবে এই সম্পদ তোমরা জমিয়েছিলে, এখন এ সম্পদের স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো।' নিজের স্বাদ জমিয়ে রাখার অনুমতি ইসলামে নেই।

৪র্থ স্তম্ভটি হলো হজ্জ। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম যাদের পার্থিব সামর্থ্য আছে তারা জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ্জে যাবেন হজ্জের সময়, তারপর যাবেন মিনায়, আরাফায় ইত্যাদি জায়গায়। আর এটা সবচেয়ে বড় ইসলামী সম্মেলন, প্রায়

২৫ লক্ষ মানুষ মক্কায় আসেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে তারা আসেন। আর পুরুষরা সে সময় পরিধান করেন দু'টুকরো সেলাই ছাড়া কাপড় এবং তা সাদা হলে ভালো। আপনার পাশের লোকটিকে দেখে বুঝতেই পারবেন না সে রাজা না ফকির। সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পবিত্র কুরআন বলছে সূরা হুজরাত, আয়াত নং-১৩-এ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

অর্থ : হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যার রয়েছে তাক্বওয়া। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।

আল্লাহ আমাদের যে জিনিসটি দিয়ে বিচার করবেন, সেটা লিঙ্গ নয়, সেটা সম্পদ নয়, গোত্র নয়, গায়ের রং নয়, সেটা হচ্ছে তাক্বওয়া। অর্থাৎ আল্লাহকে মানা, ধার্মিকতা আর ন্যায়পরায়নতা।

৫ম স্তম্ভটি হলো সিয়াম বা রোযা রাখা। রমযান মাসের সময় প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানরা সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় আর ইন্দ্রিয়মিলন থেকে বিরত থাকবেন, প্রত্যেক হিজরী সালের রমযান মাসের প্রত্যেক দিন রোযা রাখবেন। আর পবিত্র কুরআনে আছে সূরা বাকারার , আয়াত নং-১৮৩-এ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্যে সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যাতে তোমরা শিখতে পার আত্মসংযম।

রোযা রাখার বিধান করা হয়েছে যাতে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 'আত্মসংযম' করা যায় তবে বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, "যদি আপনারা ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাহলে বেশির ভাগ আকাঙ্ক্ষাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।' একই ধরনের কথা আছে (গ্রজবেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় নং ১৭, অনুচ্ছেদ ২১), (গ্রজবেল অভ্ মার্ক, অধ্যায় ৯, অনুচ্ছেদ ২৯) যে, 'মানুষকে নির্দেশে দেয়া হচ্ছে

উপবাসের"। আর রমযান মাসে আপনি চেষ্টা করবেন যাতে কোনো খারাপ কাজ না করেন, খারাপ কাজগুলো সাধারণত অন্য সময় করতেন রোযার সময় সেগুলো করবেন না।

আর এতে করেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। যে ভালো কাজগুলো করতেন না রমযান মাসের সময় সেগুলো করবেন এবং এতে করেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। আর যদি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান বাদ দিতে পারেন তাহলে জীবনের পুরোটা সময়ই ধূমপান বাদ দিতে পারবেন। যদি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাদকদ্রব্য বাদ দেন, তবে জীবনের পুরোটা সময় তা বাদ দিতে পারবেন। আরো একটা ব্যাপার রোযা রাখলে আমাদের হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এগুলো হলো ইসলামের প্রধান ৫টি স্তম্ভ। তবে এই ৫টি স্তম্ভ দিয়েই পুরো ইসলাম ধর্ম তৈরি হয় নি। আমাদের নবী করীম ﷺ বলেছেন, এগুলো হলো ৫টি মূলনীতি ৫টি স্তম্ভ। আর একজন ইঞ্জিনিয়ার অপরজন আর্কিটেকচার বলবেন যে, যদি স্তম্ভটি শক্ত হয় তবে কাঠামোটা শক্ত হবে। যদি কোনো মানুষ এই ৫টা স্তম্ভ সঠিক নিয়মে মেনে চলেন তবে তার অন্য মূলনীতিগুলোও শক্ত হবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা যারিয়াতের নং ৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থ : আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি এজন্যে যে, তারা শুধু আমার ইবাদাত করবে।

সুতরাং আল্লাহ মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাত করার জন্যে। আরবিতে 'ইবাদত' শব্দটা এসেছে মূল শব্দ 'আবদ' থেকে। আরবিতে 'আবদ' মানে আল্লাহ তাআলার দাস। আর এটার অর্থ হলো দাসত্ব। তাহলে ইবাদাত হলো কোনো একজন মানুষের সেবা। যে তার প্রভুকে মান্য করবে। কেউ যদি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে সেটা হলো ইবাদাত। অনেকে মনে করে সালাত হলো একমাত্র ইবাদাত। কিন্তু একমাত্র ইবাদাত নয়, বড় ইবাদতগুলোর একটি। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মেনে চলাটাও একটা ইবাদত। যেমন ধরুন, আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যে খাবারগুলো হারাম করেছেন, সেগুলো যদি আপনি না খান সেটাও হবে ইবাদাত।

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদা নং ৯০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজা এবং ভাগ্য গণনা এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'

যদি আপনি দূরে থাকতে পারেন মাদকদ্রব্য থেকে, মূর্তিপূজা থেকে এবং ভাগ্য গণনা থেকে তাহলে আপনি ইবাদাত করছেন। একথা বাইবেলেও দেখবেন (বুক অভ্ প্রভার্স, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ১) বলা হয়েছে যে, 'মদ একটা প্রতারক' (এফিসেন্স, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৮-এ) বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মদ পান করে মাতাল হয়ো না।' তাহলে বাইবেল বলছে 'মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবে না।' নিষিদ্ধ খাবারের ব্যাপারে কুরআন বলছে সব মিলিয়ে ৪টি আলাদা জায়গায়। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৩; সূরা মায়িদা; আয়াত নং ৩; সূরা আন্-আম, আয়াত নং ১৪৫ এবং সূরা আন নাহল, আয়াত নং ১১৫-এ) বলা হয়েছে যে,

'তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয় এমন প্রাণী।'

এ খাবারগুলোকে পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি আপনারা বাইবেল পড়েন (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ১৫); (বুক অভ্ ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ২১-এ) বলা হয়েছে যে 'তোমরা এমন কোনো পশুর মাংস খাবে না যা জবাইয়ের আগে মারা গেছে।' তার মানে মৃত পশু নিষেধ করা হয়েছে। আর তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, মৃত পশুর মাংস খেলে বিভিন্ন ধরনের অসুখ হতে পারে। এটা হতে পারে খাওয়ার কারণে সংস্পর্শ হওয়ার কারণে। অনেক অসুখ হতে পারে, হতে পারে দুরারোগ্য ব্যাধি। তাহলে মৃত পশু খাওয়া যাবে না। আরেকটি নিষিদ্ধ খাবার হলো রক্ত। একই কথা আছে বাইবেলে। বাইবেলে আছে সব মিলিয়ে ৫টি অনুচ্ছেদে বাইবেল রক্ত খাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ১৪; বুক অব ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ১৬; বুক অভ্ জেনিসিস, অধ্যায় ৯, অনুচ্ছেদ ৪); (ফার্স্ট সেমুয়েল- অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৩৩); (বুক অব এক্স, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ২৯-এ) বলা হয়েছে যে, 'তোমরা রক্ত পান করবে না।'

আরেকটি হলো শূকরের মাংস খাওয়া। আর এটার পেছনে আছে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আমি একটা লেকচারেও বলেছি কেন হারাম খাওয়া উচিত নয়, কেন শূকরের মাংস খাবেন না। কারণ, আপনার অনেক অসুখ,-বিসুখ হতে পারে। একই কথা আছে পবিত্র বাইবেলে, (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮-এ) বলা হয়েছে যে 'যদিও শূকরের খুর দুই ভাগে বিভক্ত, তবুও এরা যাবর কাটে না, এর মাংস তোমাদের জন্যে অপরিচ্ছন্ন। তোমরা এই প্রাণিটার মাংস খাবে না, এর মৃতদেহ স্পর্শ করবে না।' একই কথা আছে (বুক অব ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৮-এ) বলা হয়েছে যে, শূকরের পায়ের খুর যদিও দুই ভাগ করা, তারপরও এর জাবর কাটে না। তোমরা শূকরের মাংস খাবে না এবং এর মৃতদেহ স্পর্শও করবে না। একই ধরনের কথা আছে (বুক অভ্ আইজায়ায়, অধ্যায় ৬৫, অনুচ্ছেদ ২, ৪, ৫-এ) যে, 'শূকরের গোশত খাওয়া তোমাদের জন্যে

নিষিদ্ধ। যেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।' একই ধরনের কথা আছে বুক অভ্ এক্স, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ২৯ এবং রেভ্যুলেশন, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ১৪ যে, 'তোমরা এমন খাবার খাবে না যেখানে নাম নেয়া হয়েছে অন্য উপাস্যের।' অর্থাৎ মহান ঈশ্বর বাদে অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।

যদি ভালো করে দেখেন, আপনারা যদি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চলেন, আর হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকেন, তাহলে আপনি ইবাদাত করছেন। যদি আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসেন আপনি ইবাদাত করছেন। আর যীশু বলেছেন, 'প্রতিবেশীকে ভালোবাস'। পবিত্র কুরআনে সূরা মাউন, আয়াত নং ১-৭-এ বলা হয়েছে যে, তুমি কি দেখেছ তাকে যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। দুর্ভোগ সে সমস্ত নামাজির। যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন। যারা তা পড়ে লোক দেখানোর জন্য। আর প্রতিবেশীকে ছোটখাটো জিনিস দিয়েও সাহায্য করে না।" যদি প্রতিবেশীকে সাহায্য করেন তাদের ভালোবাসেন তাহলে আপনি আল্লাহর ইবাদাত করছেন। যদি ব্যবসায় সৎ থাকেন আপনি ইবাদাত করছেন। যদি কুৎসা রটনা বন্ধ করেন, পবিত্র কুরআনের সূরা হুমাযাহ্, আয়াত নং ১-এ আছে যে,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۔

অর্থ : 'দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে ও পেছনে নিন্দা করে।'

যদি আপনি সামনে ও পেছনে নিন্দা না করেন, তাহলে আপনি ইবাদাত করছেন। আল্লাহ্ তাআলা ইবাদাত করার পাশাপাশি পবিত্র কুরআনে বলছে, 'তোমরা পিতা-মাতাকে ভালোবাস।'

পিতা-মাতাকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা ইবাদত। পবিত্র কুরআন বলছে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াত নং ২৩ ও ২৪-এ–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۔

অর্থ : আমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, আমাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করে না। আর পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, যদি তাদের মধ্যে একজন বা দুজন বার্ধক্যে উপনীত হয় তাদেরকে কোনোরকম ধমক দিও না। এমনকি তাদের সাথে উহ্ শব্দটাও বলতে পারবে না। বরং নম্রতার সাথে ভদ্র ব্যবহার করো।

যদি আপনার পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন তাহলে আপনি ইবাদাত করছেন। যদি বিয়ে করেন আপনি ইবাদাত করছেন। নবীজি ﷺ বলেছেন, 'যে লোক বিয়ে করবে না সে আমার উম্মত নয়। যদি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন, আপনি ইবাদাত করছেন।' পবিত্র কুরআন বলছে (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৯) যে, 'তোমার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, যদিও তুমি তাকে অপছন্দ করো।' আপনি যদি স্ত্রীকে অপছন্দ করেন তবুও পবিত্র কুরআন বলছে তার সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো। যদি ব্যভিচার থেকে দূরে থাকেন তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ঈসরাঈল, নং ৩২ আয়াতে আছে যে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ـ

অর্থ : তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

যদি ভদ্রভাবে পোশাক পরেন আপনি ইবাদাত করছেন। কুরআন প্রথমে যে ইবাদাতের কথা বলছে যেটা পুরুষের। মুমিন লোকদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও লজ্জা স্থানের হেফাজত করে। (সূরা নূর, আয়াত নং ৩০)

যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকায়, কোনো রকম খারাপ চিন্তা, বাজে চিন্তা যদি তার মাথায় আসে, সে দৃষ্টি নিচু করবে। এটা হলো পুরুষের হিজাব। আর পবিত্র বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট একই ধরনের কথা বলেছেন (গ্রজবেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ২৭-২৮) যে, 'প্রাচীনকাল থেকে বলা হচ্ছে তোমরা ব্যভিচার করবে না।' আর এখন আমি তোমাদের বলছি, 'যদি কোনো পুরুষ আবার মহিলার দিকে তাকায় কোনো লালসা নিয়ে, তাহলে সে মনে মনে ব্যভিচার করে ফেলেছে। যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'তোমরা কোনো মহিলার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাবে না।' এর পর সূরা নূর এর ৩১ নং আয়াতে মহিলাদের হিজাবের কথা বলা হয়েছে,

'মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত ও লজ্জা স্থানের হেফাজত করে, যেটা সাধারণত প্রকাশ থাকে সেটা ছাড়া। মাথার কাপড় দিয়ে বক্ষদেশ ঢাকবে। হিজাব পালনের ৬টি নিয়ম আছে।'

সহীহ্ হাদীস ও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, ১মটি হলো পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে, পুরুষরা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর মহিলারা পুরো শরীরটাকেই ঢেকে রাখবে। যে অংশটা দেখা যেতে পারে তাহলো মুখমণ্ডল আর হাতের কব্জি পর্যন্ত। চাইলে এগুলোও ঢেকে রাখতে পারেন। ২য়টি হলো তারা যে পোশাকগুলো পরবে তা শরীরের অঙ্গ বোঝার মতো টাইট হবে না। ৩ নম্বর এমন স্বচ্ছ হবে না যা ভেতর থেকে দেখা যায়। ৪র্থ হলো এমন হবে না যেন বিপরীত লিঙ্গ আকৃষ্ট হয়।

৫নং অবিশ্বাসীদের মতো পোশাক হবে না। ৬নং পোশাকটি বিপরীত লিঙ্গের মতো হবে না। আর বাইবেলেও একই ধরনের কথা আছে। (বুক অভ্ ডিওটোরনমি, অধ্যায় ২২, অনুচ্ছেদ ৫) উল্লেখ আছে, 'মহিলারা এমন কোনো পোশাক পরবে না যা পুরুষরা পরে। আর পুরুষরা এমন কোনো পোশাক পরবে না যা মহিলারা পরে থাকে।'

হিজাবের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের কথা আছে, 'আপনারা বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরবেন না।' যদি পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখেন পুরুষরা কানে দুল পরে। এক কানে দুল পরার একটা অর্থ আছে, এটা আপনারা জানেন কি? আমি জানি না। এক কানে দুল পরা ইসলামে একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি বাইবেলও এটার বিরুদ্ধে। এটা কেন করে? আমি জানি না। আপনারা বাইবেল পড়লে দেখবেন (ফাস্ট থিমেতিতে, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৯) যে মহিলারা পোশাক পরবে ভদ্রভাবে, শালীনতার সাথে এবং লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে। তারা কোনো দামি পোশাক স্বর্ণ দিয়ে বা কারুকাজ করা দুল পরবে না। এছাড়া তারা স্বর্ণ বা মুক্তাও পরবে না সাধারণভাবে থাকবে। আর এছাড়া আরো আছে (দি ফাস্ট কাউনথিয়ান্স, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৫ ও ৬) যে, 'যে মহিলা তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে না, সে তার মাথাকে অসম্মান করে।' আর ৬নং অনুচ্ছেদ বলছে যে, 'যে মহিলা তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে না, তার মাথা কামিয়ে দিতে হবে।'

কুরআন বা সহীহ্ হাদিস একথা বলছে না, বাইবেল বলছে। যদি যীশুখ্রিস্টের আদেশ মেনে চললে খ্রিস্টান হওয়া যায় তাহলে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়ে বেশি খ্রিস্টান। যদি আপনারা দেখেন মুসলমানদের জন্যে একটা সুন্নাহ হলো খাত্না করা। বাইবেলে একই কথা আছে। পবিত্র বাইবেল পড়লে আপনি দেখতে পাবেন (গ্রজবেল অব জন, অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ২২) যে, মূসা তোমাদের দিয়েছেন খাত্না করার একটি নিয়ম। (এক্স এর অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৮-এ) যে, তোমাদের জন্যে খাত্না করার একটি নিয়ম দেয়া হয়েছে। (গ্রজবেল অব লূক, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ২১-এ) যে, জন্মের ৮ দিন পরে যীশুখ্রিস্টের খাত্না দেয়া হয়েছিল। তাহলে দেখছেন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মেনে চললেই আপনি ইবাদত করছেন। আমি আগেই বলেছি ইসলাম মানে নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। আর যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সমর্পণ করে তাকে বলে 'মুসলিম'। আর পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের, আয়াত নং ৫২-এ বলা হয়েছে যে, 'যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মুসলিম।' একই ধরনের কথা আছে বাইবেলে (গ্রজবেল অভ্ জন, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩০-এ) যে, যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, আমার ইচ্ছে নয় আমার পিতার ইচ্ছেকেই দেখি। আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না।

আমি সব কিছুর শুধু বিচার করি আর আমার বিচার সঠিক। কারণ এখানে আমি আমার নিজের ইচ্ছেকে দেখি না আমার পিতার ইচ্ছেকেই দেখি। আমার ইচ্ছে নয়, মহান স্রষ্টার ইচ্ছে দেখি। যদি এটার আরবি করেন সেটা হবে ইসলাম। আর যে ব্যক্তি ইসলাম মেনে চলেন তিনি হলেন মুসলিম। তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মুসলিম। আমার লেকচার শেষ করার আগে পবিত্র কুরআন থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি (সূরা নাহল, আয়াত-১২৫-এ) বলা হয়েছে যে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো হিকমতের মাধ্যমে ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো, (যুক্তি দেখাও) সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. আমি মোঃ ফরিদউদ্দিন, ফিজিওথেরাপি নিয়ে পড়াশুনা করছি। ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মে মুক্তি লাভের ন্যূনতম শর্তের মধ্যে কী সাদৃশ্য রয়েছে?

উত্তর : যদি পবিত্র কুরআন পড়েন সেখানে বলা আছে যে, একজন মানুষ কীভাবে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে। (সূরা আল আসর, আয়াত নং ১০৩-এ) উল্লেখ আছে যে, "কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" তাহলে যদি কেউ বেহেশ্‌তে যেতে চান কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। ১। ঈমান ২। সৎকর্ম ৩। মানুষকে সৎকর্মের উপদেশ দেয়া ৪। আর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়া। এ ৪টি শর্তের যদি একটিও বাদ থাকে সাধারণভাবে কোনো লোক বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। যদি আল্লাহ্ ক্ষমা করেন সেটা আলাদা কথা। আর এগুলোই হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত। আর আল্লাহ্ যে অপরাধকে ক্ষমা করবেন না সেটা আমি আগেও বলেছি (সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৮); (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৬) সেটা হলো 'শিরক' আর খ্রিস্টান ধর্মে চার্চ যেটা বলে, প্রথমে চার্চ-এর কথা বলছি, তারপর বাইবেলের কথা বলবো।

চার্চ বলে যে, 'যীশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্যে মারা গেছেন। আমাদের অপরাধের জন্যে মারা গেছেন। যদি সেটা বিশ্বাস করেন আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। যদি বিশ্বাস করেন যে, যীশুখ্রিস্ট আপনার অপরাধের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তাহলে আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। এ প্রমাণটা আপনি বাইবেলেও পাবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হন নি। এটার ওপর আমার একটা ভিডিও ক্যাসেট আছে, যেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুসবিদ্ধ হন নি।

প্রমাণ করেছি পবিত্র কুরআন দিয়ে নয়, পবিত্র বাইবেল দিয়েই। কুরআন সেটা বলে আমরাও মানি। এমনকি বাইবেল যদি সঠিকভাবে পড়েন একথা বলে না যে যীশু ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু চার্চ বলে, যদি আপনি এটা বিশ্বাস করেন যীশুখ্রিস্ট আপনার পাপের জন্যে মারা গেছেন, আপনি মুক্তি লাভ করবেন। কিন্তু যদি আপনি বাইবেল পড়েন তবে দেখবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ঠিক উল্টোটি বলেছেন। যদি গসপেল অভ্ মেথিও পড়েন অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬-১৮ বলেছে, একজন লোক যীশুখ্রিস্টের কাছে এসে বললেন যে, 'হে ভালো প্রভু কোনো কাজটি করলে আমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারি?' যীশুখ্রিস্ট তখন বললেন, 'কেন, তুমি আমাকে ভালো বলছো? ভালো শুধু একজনই তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন। আর যদি তুমি স্থায়ী জীবন পেতে চাও, ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।'

তিনি বলেন নি যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে আমাকে ঈশ্বর মানতে হবে। তিনি বলেন নি যে, এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আমি তোমাদের পাপের জন্যে ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মারা গেছি। তিনি বলেছেন যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে হলে ঈশ্বরের যে নির্দেশ সেগুলো মেনে চলতে হবে। তার মানে আপনি যদি বেহেশ্‌তে যেতে চান, বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে ঈশ্বরের সব নির্দেশ মেনে চলতে হবে। শূকরের মাংস খাবেন না, মদ খাওয়া যাবে না, জুয়া খেলা যাবে না, নামাজ আদায় করতে হবে। সিজদায় যেতে হবে। সবকিছু আপনাকে মানতে হবে। যদি বলেন, যীশুখ্রিস্টের নির্দেশ মানলেই খ্রিস্টান হওয়া যায় তাহলে আলহামদুল্লিাহ। যদিও আমরা মুসলিম আমরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিষ্টান। আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন একজন মুসলমান। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২. আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে খাইরুন্নেসা, একজন গৃহিণী। যীশু মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, আর মুহাম্মাদ তার অনুসারীদের ধর্মের জন্যে যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর সে জন্যে আপনার কি মনে হয় না যে, ধর্ম দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে?

উত্তর : বোন, আপনি বলেছেন যে, যীশুখ্রিস্ট তার অনুসারীদের বলেছেন মানুষকে ভালোবাসতে আর মহানবী ﷺ বলেছেন, প্রয়োজন হলে তোমরা যুদ্ধ করবে ইত্যাদি আর দুটো ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। বোন, যদি আপনি জানেন এটা আছে (গজপেল অভ্‌ মেথিও, অধ্যায় ৫) যে, এই আইনটা প্রাচীনকালের আইন যে, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত এটা ছিল মূসা (আ)-এর আইন। তিনি আইনটা এনেছিলেন যদি কেউ আপনার চোখ তুলে নেয় আপনি তার চোখ তুলে নিবেন। সুবিচারের কোনো সুযোগ তখন ছিল না। সে সময় কোনো আদালত ছিল না। আপনি আমার চোখ তুললে আপনারটাও আমি তুলবো। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। সোজা কথা সব কিছুই সংক্ষিপ্ত। আদালতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যদি কোনো বাচ্চা ছেলে খেলতে খেলতে আপনার চোখে আঘাত করে, যদি ভুল করে কেউ আঘাত করে, এখনকার দিনে তার চোখ তুলে নেবেন না। কিন্তু তখন মানুষ এটা মেনে চলতো। যীশু এটার প্রতিকার করলেন। এটা আছে (গজপেল অভ্‌ মেথিও, অধ্যায় নং ৫-এ) যে, এটা প্রাচীনকালের নিয়ম চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ তোমার একগালে থাপ্পড় মারে, তাহলে তুমি অন্য গালটি বাড়িয়ে দাও। যদি তোমার কাছে কেউ গরম কাপড় চায়, তুমি কম্বল দিয়ে দাও। যদি তার সাথে এক মাইল হাঁটতে বলে, তুমি দুই মাইল হাঁটো। মানুষ তখন সেই আইনটাই মেনে চলতো। তারা

মূসার আইন মেনে চলতো। যীশুখ্রিস্ট এর প্রতিকার চাইলেন আর নতুন আইনের কথা বললেন। যে কেউ একগালে থাপ্পড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দিতে। সেটা তখনকার জন্যে ভালো ছিল।

তবে আমি প্রশ্ন করছি এখনকার দিনে কোনো খ্রিস্টান কি এটা মেনে চলেন? যদি একগালে থাপ্পড় মারেন আর লোকজন সামনে থাকলে হয়তো আরেক গাল বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যদি আপনি কোনো ফাদার কিংস যাজকের কাছে যান। তারপর জোরে একটা থাপ্পড় মারেন হয়তো মানুষের সামনে একটা থাপ্পড় খাবেন কিন্তু থাপ্পড় মারতে থাকলে তিনি গাল বাড়িয়ে দেবেন না। এখন সেই সময় নয় যে, কেউ থাপ্পড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে। যদি কেউ ভুল করে আপনাকে থাপ্পড় মারে আপনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। যদি কেউ ইচ্ছে করে থাপ্পড় মারে আর আপনি গাল বাড়িয়ে দেন তাহলে প্রতিদিন সে আপনাকে থাপ্পড় মারবে। হয়তো একদিন বা দু দিন ফাদার রাজি হবেন কিন্তু প্রত্যেক দিন রাজি হবেন না। তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ তিনি আল্লাহর আরেকজন দূত। তিনি বলেছেন, 'তোমরা পরিস্থিতি বিচার করবে।' পবিত্র কুরআন (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৪১-এ) বলছে যে, 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না।'

ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলে। যদি ভুল করে আপনাকে আঘাত করে, আপনি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছে করে আঘাত করে, আপনিও আঘাত করুন। ইসলামিক আইন বলে, যদি কারো ওপর অত্যাচার করা হয় আর সে যদি প্রতিবাদ না করে, তাহলে যার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেও অপরাধী। যে অত্যাচার করে তাকে শিক্ষা দেয়া উচিত, যদি না করে তবে সেও অপরাধী। যেমন ধরুন, কোনো একটা লোক অন্যায় করছে আর আপনি দেখছেন, কেউ চুরি করছে, কেউ মহিলাদের উত্যক্ত করছে। আমাদের নবী করীম ﷺ হাদিসে বলেছেন, যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখ সেটা হাত দিয়ে থামানো সবচেয়ে ভালো। যদি হাত দিয়ে না পারো তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি সেটাও না পারো, মনে মনে তাকে ঘৃণা করো। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখনকার দিনে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে যে আইনটা পেয়েছেন সেটাই শ্রেষ্ঠ আইন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৩. আমি একটি কলেজের থিওলোজিক্যাল। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি এখানে যা শুনলাম তা হচ্ছে দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। আমার মনে হয় পার্থক্যের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি বলেছেন যে, যীশু এসেছেন শুধু ইহুদিদের জন্যে। আর মুহাম্মাদ এসেছেন পুরো মানবজাতির জন্যে। আমার মনে হয় না এটা সত্য। আর বাইবেলেও এমন কথা বলা হচ্ছে না আর

আপনি বলেছেন যে, যীশু ঈশ্বর নন। কিন্তু এ ব্যাপারে কি বলবেন যে যীশু বলেছেন, 'আমিই সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। আমার পিতা এবং আমি এক। যারা আমাকে দেখছো, তারা পিতাকেই দেখছো।' আর বাইবেলেই পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, যীশুখ্রিস্টই ঈশ্বর! আর সে কথাটাই আমরা বিশ্বাস করি এবং পুরো পৃথিবীর মানুষই বিশ্বাস করে।

উত্তর : কোনো সমস্যা নেই ভাই। আপনি যতগুলো ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে। আপনি বলেছেন যে, আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি সাদৃশ্য থেকে পার্থক্য নিয়েই বেশি আলোচনা করেছি। যদি দেখেন আমি বাইবেল থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমি এখানে বলবো যে, ইসলাম ও বাইবেলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আর এখানে আমি সেই সাদৃশ্যগুলোর প্রতি বেশি জোর দিয়েছি, যেগুলোর কথা বাইবেল ও কুরআনে আছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা সেগুলো মানে না। আমি এমন কথা বলছি না যে, খ্রিস্টানরা বাইবেল মানছে কি মানছে না। এ বিষয়টা যদি আসে হতে পারে ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য। আজকের বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য নয়। আজকের বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। খ্রিস্টানধর্ম আর এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তেমনি ইসলাম আর মুসলিমদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। সেজন্য ভাই আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে, আজকের বিষয় ইসলাম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে সাদৃশ্য নয়। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য।

খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তি হলো 'বাইবেল'। আমি যে সাদৃশ্যগুলো নিয়ে বলেছিলাম সেগুলো কুরআন আর বাইবেলের। কুরআন আর বাইবেল দুই-ই বলছে শূকর খেও না, কিন্তু খ্রিস্টানরা খায়, আর মুসলিমরা খায় না। কুরআন আর বাইবেল দুই বলছে, তোমরা মদ খেও না, খ্রিস্টানরা খায় আর মুসলিমরা খায় না। মুসলিমরা করে আর খ্রিস্টানরা করে না। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, তোমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করো কিন্তু আপনারা ট্রিনিটিকে বিশ্বাস করেন। যীশু বলেছে, তোমরা আমার উপাসনা করো না। কিন্তু আপনারা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি.....। যদি আপনারা আমার ক্যাসেট দেখেন। আমি এমন কোনো পার্থক্যের কথা বলি নি বাইবেল যে কথা বলছে কুরআনে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু না আমি সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলেছি। আমি সেখানে পার্থক্যের কথা বলেছি যেখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের আমি বলেছিলাম তারা আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল যে, ডিওটোরনমীর ১৮ সেটা হলো যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী। সেখানে যুক্তি দিতে গিয়ে আমি হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর পার্থক্যটা বলেছিলাম। আপনি বুঝতে পেরেছেন।

যদি ভালো করে দেখেন আমি যে সাদৃশ্যের কথা বলেছিলাম বাইবেল আর কুরআনের সেগুলো খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। এবার প্রশ্নতে আসি। আপনি

বলেছেন যে, আমি একটা কথা বলেছি আর সেটা আমি আবারও বলছি– যীশুখ্রিস্ট বলেন নি পরিষ্কারভাবে পুরো বাইবেলে যে, 'আমি ঈশ্বর তোমরা আমার উপাসনা করো।' আপনি তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যীশু বলেছেন, 'আমি সত্যি এবং জীবনের একমাত্র পথ। কেনো মানুষ আমার এবং পিতার মাঝখানে আসবে না। যারা আমাকে দেখছে তারা পিতাকেই দেখছো এবং আমি ও আমার পিতা এক।' আপনি তিনটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন কোনো রেফারেন্স ছাড়া। আমি তিনটিরই রেফারেন্স দিচ্ছি। প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ আছে (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৬ ও ৯) যাচাই করতে পারেন বাইবেলে।

আমি আমার স্মৃতি থেকে বলছি, কিন্তু বাইবেল থেকে বলছি। আপনি একজন রেফারেন্স আর থিওলজিকাল কলেজে পড়ান, যদি উল্টো-পাল্টা বলে থাকি, এখানে বাইবেল আছে যাচাই করতে পারেন। তবে ভাই এখানে প্রসঙ্গটা দেখতে হবে। আপনি প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো উদ্ধৃতি দিতে পারবেন না। প্রসঙ্গটা জানতে ১ নং অনুচ্ছেদে যান গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, দেখলে বুঝতে পারবেন যীশুখ্রিষ্ট নিজেই বলেছেন, "আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে, অনেক প্রাসাদ যদি এরকমটা না হতো, আমি তোমাদের বলতাম না। আমি সেখানে যাচ্ছি তোমাদের একটা জায়গা তৈরি করতে। আর তোমরা জানো আমি কোথায় যাচ্ছি। থমাস বললো, আমি জানি না আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আমরা সে পথ চিনি না আপনি যেখানে যাচ্ছেন। যীশু বললেন, 'আমিই সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আমার আর আমার পিতার মাঝে আসতে পারে না।'

আমিও এটার সাথে একমত যে, যীশুখ্রিস্ট জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আল্লাহর কাছে যাবে না যীশুখ্রিস্টকে বাদ দিয়ে। এটা তার সময়ে। প্রত্যেক নবীই তার সময়ে ছিলেন আল্লাহর পথে সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষই আল্লাহ ও মূসার মাঝখানে আসবে না। আর নবীজি ﷺ-এর সময় তিনিই ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। তাহলে প্রত্যেক নবীর সময়ে তিনিই ছিলেন সত্যের পথ। আমিও একমত। এর অর্থ যদি আমাকে অনুসরণ করো তাহলে ঈশ্বরকে মেনে চলছো, তিনিই ছিলেন পথ। এরপরও যদি বাইবেল পড়েন যীশুকে তার শিষ্যরা বললো যে, 'আমরা তো ঈশ্বরকে দেখি নি।' তখন যীশু তাদের বললেন, যারা আমাকে দেখছো তারা ঈশ্বরকে দেখছো। আমাকে দেখছো মানে যারা আমার নির্দেশ মেনে চলছো তারা আসলে ঈশ্বরের নির্দেশই মেনে চলছো।

যদি প্রসঙ্গটা দেখেন প্রথম অনুচ্ছেদেই আছে, 'আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে'। তিনি বলেন নি যে, আমার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে। এখানে দেখতে

পাচ্ছেন তিনি মহান ঈশ্বরের কথা বলছেন। একইভাবে সব নবী রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো যদি মেনে চলেন, আপনি পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশই মানছেন। আর একথাটা মেনে নিতে আমার কোনো রকম আপত্তি নেই। আরেকটি অনুচ্ছেদের কথা বললেন যে, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এটা আছে (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০-এ)।

আর এখানেও আপনাকে প্রসঙ্গটা বলবো, এরপর আপনি বলবেন আপনি মানেন কি না যে যীশুখ্রিস্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যদি প্রসঙ্গটা পড়েন সেটা জানতে ২৩ নং অনুচ্ছেদে যান। (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০) যে, 'যীশুখ্রিস্ট যখন মন্দিরের সলোমনের বারান্দায় গেলেন, ২৪ নং অনুচ্ছেদ বলছে ইহুদিরা তার চারপাশে জড়ো হলো। আর বললো আমাদের কতদিন দ্বিধার মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি খ্রিস্ট হোন সরাসরি বলুন। ২৫ অনুচ্ছেদে বলছে, 'আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো নি। আমি যে কাজগুলো করি আমার পিতার নামে তারাই আমার হয়ে এখানে সাক্ষ্য দেবে।' ২৬ অনুচ্ছেদ বলছে, 'আমি বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো নি। কারণ তোমরা আমার অনুসারী নও।' ২৭ অনুচ্ছেদ, 'আমার অনুসারীরা আমার কথা শোনে, আমি তাদের চিনি, তারা আমার অনুসরণ করে।' ২৮নং অনুচ্ছেদ, 'আমি তাদের চিরস্থায়ী জীবন দিয়েছি তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউ তাদের আমার হাত থেকে নিতে পারবে না।' ২৯ অনুচ্ছেদ, 'আমার পিতা আমাকে যা দিয়েছেন তিনি সবার চেয়ে বড়। কেউ তাদের আমার পিতার হাত থেকে তুলে নিতে পারবে না।' ৩০ অনুচ্ছেদ বলছে, 'আমি এবং আমার পিতা এক।' প্রসঙ্গটা পড়লে বুঝতে পারবেন উদ্দেশ্যের দিক থেকে যীশু এবং তার পিতা এক। আমার বাবা হলেন একজন ডাক্তার আর আমিও একজন ডাক্তার।

আমি যদি বলি, আমরা দুজন এক, তার মানে কি আমরা দুজন একই লোক? না আমরা পেশার দিক থেকে এক। এর মানে এই নয় যে, আমরা একই ব্যক্তি। এটা খুবই পরিষ্কার। তারপরও যদি বলেন, এই একমাত্র একজন ব্যক্তি আমি বলবো ঠিক আছে। এরপর যদি বাইবেল পড়েন (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১) যে, "আমার পিতা আমার মধ্যে রয়েছে, আমি তোমাদের মধ্যে।" যীশুখ্রিস্ট তার ১২ জন শিষ্যকে বলছে আমরা সবাই এক। যদি একজন ধরেন তবে ১৪ জন ঈশ্বরকে মানতে হবে। মহান স্রষ্টা, যীশুখ্রিস্ট আর ১২ জন শিষ্য। আর আপনি যদি মূল বাইবেলটা পড়েন সেখানে এক শব্দটা দুই জায়গায় একই রকম। (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০-এ) এখানে যে এক শব্দটা আছে এই একই শব্দটা আছে (গসপেল অভ্ জন অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১-এ) একই শব্দ 'আমার পিতা আমার মধ্যে, আমি তোমাদের মধ্যে আর আমরা সবাই এক।'

এ কথাটার মানে হলো মহান স্রষ্টা, যীশুখ্রিস্ট আর শিষ্যরা, তারা একই নির্দেশ দিচ্ছেন। আর এ নির্দেশের ক্ষেত্রে সবাই এক। কিন্তু যদি বলেন, তারা একজন ব্যক্তি তবে ট্রিনিটিকে বদলাতে হবে। অন্য ধারণা লাগবে ১৪ জন ঈশ্বরের। আপনি প্রসঙ্গটা পড়লেই বুঝবেন। কিন্তু যদি এটার সাথে একমত না হোন, যদি বলেন যে, এখানে একই উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে না তাহলে আপনাকে এটাও মানতে হবে যে, যীশুর ১২ জন শিষ্যও ঈশ্বর। এরপর আরো দেখেন (গসপেল অভ্ জন অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩১-এ) যখন যীশু বললেন, আমি ও আমার পিতা এক তখন ইহুদিরা পাথর মারতে চাইলো। আমি বলি, ঠিক আছে যদি মারতে চান তবে অজুহাত দরকার।

৩২নং অনুচ্ছেদে এর উত্তর দেয়া আছে যে, যীশু বললেন, আমি আমার পিতার অনেক ভালো কাজ তোমাদের দেখিয়েছি। তোমরা কোন ভালো কাজটির জন্যে আমাকে পাথর মারতে চাইছো। ৩৩ নং-এ আছে 'ইহুদিরা বললো, আমরা আপনাকে ভালো কাজের জন্যে পাথর মারছি না। আপনাকে পাথর মারছি, কারণ আপনি মানুষ হয়ে ধর্মের অবমাননা করেছেন। নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। এরপর যীশু বললেন (৩৪-৩৫ অনুচ্ছেদে) এটা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা নেই যে, তোমরাই ঈশ্বর। আর যে ব্যক্তির কাছে মহান স্রষ্টার নির্দেশ আসে তবে সেই ব্যক্তিকে যদি ঈশ্বর বলো ধর্মগ্রন্থের নিয়ম ভাঙা হবে না। একই ধরনের কথা আছে সামস-এ ৮২ নং অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬-এ 'যে তোমরাই ঈশ্বর' তাহলে যদি আপনি প্রসঙ্গটা পড়েন যীশুখ্রিস্ট কখনোই নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। তবে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহান স্রষ্টা ও যীশুখ্রিস্ট একই নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন। আপনার পরের প্রশ্ন।

প্রশ্ন ৪. যে লোক একবার যীশুখ্রিস্টকে চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যীশু বলেছিল, ঈশ্বরের নির্দেশ মানে, তখন লোকটি বলেছিল, আমি সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করে এসেছি। তখন যীশু বললেন, 'তাহলে তোমার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ করো।' এ কথাটার অর্থ কী?

উত্তর : ঠিক আছে আমি আপনাকে প্রসঙ্গটা রেফারেন্সসহ বলছি। (মোথিও, অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬) যে, 'একজন লোক যীশুখ্রিস্টের কাছে এসে বললেন, হে ভালো প্রভু আমি কোনো ভালো কাজটি করবো যাতে চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারি। পরের অনুচ্ছেদ, কেন তুমি আমাকে ভালো বলছ? ভালো কেবল একজনই, তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন।' যদি তুমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে চাও ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।' এটুকুই বলেছিলাম এবং এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া ১৮, ১৯ ও ২০

অনুচ্ছেদ বলছে, আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি। এখন সেই লোক হয়তো জান্নাতুল ফেরদৌস পেতে চায়। সে লোক বললো, আমি বেশি পেতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি। তখন যীশু বললো, তোমার কাপড় বেঁচে দাও, সম্পদ বেঁচে দাও, অর্থ কড়ি দান করে দাও। এটা বাইবেলেই আছে। তোমার সব সম্পদ ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ করো। সে লোক ভাবলো এটা কঠিন। খুবই কঠিন। অনুসরণ করা মানে সব নবীই অনুসরণ করতে বলেছেন। কুরআন বলছে, 'আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে মান।' তার মানে কি নবী নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন? প্রত্যেক মানুষই নবীকে অনুসরণ করবে।

তার মানে এই নয় যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) বলেছেন, তাদের অনুসরণ করতে। আল্লাহ্ বলেছেন নবীদের অনুসরণ করতে। কোনো নবীকে অনুসরণ করা মানে তিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। তার মানে আপনি নবীদের নির্দেশ মেনে চলবেন যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। যীশু বলেন নি, আমাকে উপাসনা করো; তিনি বলেছেন, আমাকে অনুসরণ করো। তিনি বলেন নি, আমি ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মারা গেছি– এটা বিশ্বাস করো। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলো আর ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলা ও নবীদের কথা মেনে চলা একই কথা। কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে প্রসঙ্গটা পড়ে জানতে পারবেন যীশু নিজের মুখেই বলেছেন, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি তা মেনে চলো। তাহলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। তিনি কখনোই বলেন নি যে, আমাকে ঈশ্বর মানলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৫. আমি মেরি ডি কস্টা। আপনি কি পাপের উৎস সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

উত্তর : বোন, আমরা ইসলাম ধর্মে কোনো রকম পাপের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আর কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, কোনো মানুষ কখনো অন্যের ভার বহন করতে পারবে না। এখন এই পাপের উৎস সম্পর্কে চার্চ আপনাদের যা শেখায় সে সম্পর্কে বলি। আর বাইবেল কি বলছে সেটাও বলবো। আমি বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে দুটি ধারণাই বলবো। চার্চ যেটা শেখায় যে ইব্ (বিবি হাওয়া) তিনি আর আদম গন্ধবফল খেয়েছিলেন। আর এ ঘটনাটা আপনারা পাবেন (বুক অব জেনোসিজ, অধ্যায় ৩) যে তিনি আদমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন গন্ধব ফল খাওয়ার জন্য। আর এজন্যে মানুষ জন্মায় পাপের ভেতরে।

পবিত্র কুরআনে আদম ও হাওয়ার ঘটনাটা উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দিয়েছে। আর পবিত্র কুরআনের (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৯-২৭-এ) বলা হয়েছে যে, আদম (আ) আর বিবি হাওয়া (আ) তাদের অনেক বার সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। বলা আছে, তারা দুজনেই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছেন। তারা দু জনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাদের দুজনকেই ক্ষমা করা হয়েছিল। তাদের দুজনেই এ অপরাধে সমান অপরাধী। কুরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দেয়া হয়েছে। তবে কুরআনের একটি আয়াতে শুধু আদম (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। (সূরা ত্বো-হা, আয়াত নং ১২১-এ) উল্লেখ আছে যে, আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছিলেন। তবে যদি পুরো কুরআন পড়েন দেখবেন তাদের দু জনকেই সমান অপরাধী করা হয়েছে।

আর বাইবেলে এই দোষটা শুধু দেয়া হচ্ছে বিবি হাওয়াকে। (বুক অভ্ জেনোসিজ, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬-এ) বলছে, 'সৃষ্টিকর্তা বলছেন, তোমরা নারী, তোমরা এখন থেকে গর্ভ ধারণ করবে, আর প্রসব বেদনা ভোগ করবে।' তাহলে বাইবেল অনুযায়ী গর্ভধারণ একটা শাস্তি। কারণ বিবি হাওয়া আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। এর সঙ্গে যদি কুরআনকে তুলনা করেন তবে (সূরা নিসা, আয়াত নং ১-এ) বলা হচ্ছে যে, 'মাতৃগর্ভকে শ্রদ্ধা করো।' (সূরা লোকমান, আয়াত নং ১৪-এ); (সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ১৫-এ) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে আর প্রসব করে কষ্টের সাথে। গর্ভধারণ নারীকে উপরে তোলে বাইবেলের মতো নিচে নামায় না। পাপের উৎস সম্পর্কে বলি। তারা যেটা বলে যেহেতু বিবি হাওয়া আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলোভন দেখিয়েছিল তাই মানুষ জাতি পাপের ভেতর জন্মাবে। প্রত্যেক শিশুই পাপী হয়ে জন্মায়। আমি তাদের প্রশ্ন করবো, বিবি হাওয়া কি গন্ধব খাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল?

যদি বলতাম, হে! খাও, তাহলে আমি দায়ী থাকতাম। আর আদম কি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা এ ফল খাবেন কি-না? তারা যেহেতু আমাকে জিজ্ঞেস করে খান নি তবে আমি দায়ী থাকবো কেন? এটা অযৌক্তিক। তাই বলছি এটার জন্যে আমি দায়ী নই। কিন্তু খ্রিস্টান চার্চ শেখায় যেহেতু হাওয়া ঈশ্বরকে মানেন নি, আদম হাওয়া দুজনেই মানেন নি, হাওয়ার কারণে মানেন নি। তাই মানবজাতি পাপের ভেতর জন্মায়। আর এ কারণেই তারা যেটা বলে যে, সৃষ্টিকর্তা একারণেই তার নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। তারা এখানে বলে যে, (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬) যে 'ঈশ্বর পৃথিবীকে এতো ভালোবাসেন যে, একমাত্র

পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। যারা এটা বিশ্বাস করে তারা মারা যাবে না, চিরস্থায়ী জীবন পাবে। এই 'সন্তান' শব্দটা মূল বাইবেলে ছিল না বলে ধারণা করেন ৩২ জন উচ্চ খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছেন, মূল বাইবেলে এই 'সন্তান' শব্দটা ছিল না। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন চার্চ আমাদের শেখায় প্রত্যেক মানুষ পাপী হয়ে জন্মায়। তারা বলে, যে আত্মা পাপ করে সে মারা যাবে।

আর এটা বাইবেলের উদ্ধৃতি, আমিও একমত, এটা আছে (ইজিকিয়েল, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ২০), যে আত্মা পাপ করে সে মারা যাবে। তবে এ কথাটাই কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। পরে আছে ভালো লোকের ভালো কাজ তার সঙ্গে থাকবে, আর খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার সঙ্গে থাকবে। পিতা তার পুত্রের অপরাধের ভার বহন করবে না। পুত্রও পিতার ভার বহন করবে না। বাইবেল বলছে পাপ করলে আত্মা মারা যাবে। ভালো লোকের ভালো কাজ তার সঙ্গে থাকবে, খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু কোনো খারাপ লোক যদি ঘুরে দাঁড়ায়, সে মারা যাবে না। পুরো অনুচ্ছেদটি এমন কথাই বলছে। তাহলে কোনো বাইবেলের কথা অনুযায়ী পাপ জন্ম থেকে আসে না। চার্চ সেটা বলে যে পাপ জন্ম থেকে আসে সেটা বাইবেলের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষণীয় বিষয় কী? সেটা বাইবেল থেকে জানতে হবে।

কিছু মুসলিম লোক নারীদের ছোট করে দেখে তার মানে এই নয় যে, ইসলাম নারীদের ছোট করে দেখে। ইসলাম কীভাবে নারীদের দেখে সেটা জানতে কুরআন ও হাদিস পড়ুন। সেজন্যে কোনো বাইবেল দেখেন, যেখানে পাপের কোনো উৎস নেই। বাইবেল অনুযায়ী ছেলে তার পিতার পাপের বোঝা বইবে না তাহলে আমরা কীভাবে পাপী হয়ে জন্মালাম? ইসলাম অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুই জন্মায় নিষ্পাপ হয়ে। যে শিশু যেকোনো ধর্মেই জন্মাক। যে শিশু জন্মায় মুসলিম হয়ে। আমাদের নবীজি বলেছেন, প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৬. আমার নাম সদানন্দ। আমি এখানকার থিওলজিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল। দুই ধর্মের সমান দখল দেখে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি এই প্রলাপটার ব্যাপারে কি বলবেন, জনের গসপেল অনুযায়ী 'শব্দটা মাংসে পরিণত হলো', শব্দটা মানুষে পরিণত হলো। আর এখান থেকেই আমরা বিশ্বাসটা পেয়েছি যে ঈশ্বর যীশু রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। শব্দটা ছিল 'ঈশ্বর'। যা শুরুতে ছিল।

উত্তর : ভাই আপনি একটি সুন্দর উদ্ধৃতি দিলেন বাইবেল থেকে। রেফারেন্স হলো (অনুচ্ছেদ ১, অধ্যায় ১, গসপেল অভ্ জন)। আর আমিও একমত যে, শুরুতে যে

শব্দটা ছিল তা ছিল ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিল ঈশ্বর। আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, যদি বুঝতে না পারেন তবে বিষয়ের গভীরে যান। আপনার সাথে আমিও একমত। যীশুখ্রিস্ট কথা বলতেন হিব্রু ভাষায়, কিন্তু মূল বাইবেল আছে গ্রিক ভাষায়। যীশুখ্রিস্ট এটা নিজ হাতে লেখেন নি। যদি গ্রিক ভাষা পড়েন সেখানে যে শব্দটা প্রথমে ছিল তা হলো ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিল 'ঈশ্বর'। প্রথম যখন শব্দটা এলো আর যদি বলেন শব্দটা ছিল ঈশ্বর। এখন এই শব্দটাকে ঈশ্বরের সাথে পাল্টে নেন। শব্দটা হয়ে যাবে শুরুতে ছিল ঈশ্বর। শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, হয়ে যাবে ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সাথে।

এটা কোনো অর্থ হয় না, ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সাথে। এটা বুঝা খুব কঠিন। আপনাকে আরো গভীরে যেতে হবে। যদি আপনি মূল গ্রিক ভাষায় পড়েন। প্রথমবার যে শব্দটা লেখা আছে, শুরুতে ছিল শব্দটা, আর শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে। এই ঈশ্বর শব্দটা হলো 'ইতিয়াস' অর্থাৎ 'দি গড'। বড় হাতের (G)। ২য় বার শব্দটাই ছিল ঈশ্বর এটা হলো 'টনথিয়স'। 'টনথিয়স' মানে আমাদের গড। ছোট হাতের (g) অর্থ একজন মহান ব্যক্তি। কিন্তু যদি বাইবেল দেখেন দুই জায়গাতেই বড় হাতের (G)। এখানে কে ভুল করেছে মহান স্রষ্টা করেন নি, করেছেন অনুবাদকরা। গ্রিক ভাষায় প্রথম শব্দটা হলো 'ইতিয়াস', ২য়টি হলো 'টনথিয়াস'। তাহলে দুই জায়গাতেই বড় হাতের (G) কেন? আপনারা কাকে ঠকাচ্ছেন? বলার জন্যে দুঃখিত। তাহলে শুরুতে ছিল শব্দটা, শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, 'মহান ঈশ্বর'।

আর ২য়টি ছিল ঈশ্বর। মানে ঈশ্বরের দূত। আমরাও মানি। কুরআন বলছে যীশুখ্রিস্ট আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দূত। আল্লাহর রাসূল। আর প্রত্যেক দূতই আল্লাহর কথা বলেন। তাহলে এ কথাটা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই যে, যীশুখ্রিস্ট ছিলেন মহান গড। অর্থাৎ ছোট হাতের (g)। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়লে দেখতে পারবেন যেখানে বলা হয়েছে মূসাকে ফারাওদের কাছে ঈশ্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছে। ঈশ্বর মানে কী? তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন? তাকে পাঠানো হয়েছে ঈশ্বরের একজন দূত হিসেবে। কিন্তু মূল ধর্মগ্রন্থটা আমাদের কাছে আছে। সেটার সঠিক অনুবাদ হবে মহান ব্যক্তি। তাহলে ভাই প্রসঙ্গটা দেখলে বুঝতে পারবেন, এখানে যদি সঠিক অনুবাদ করি যীশুখিস্ট ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। আর শব্দটা মাংসে পরিণত হলো। অর্থাৎ যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছেন রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে। আর যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কার করেই বলেছেন (গসপেল অভ্ লুক, অধ্যায় ২৪, অনুচ্ছেদ ৩৬)। তিনি যখন উপরের ঘরে গেলেন 'সালামালাইকুম' সবাই তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা ভেবেছিল যীশুখ্রিস্ট

ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন। তারা এটা বিশ্বাস করতে পারলো না। যীশু বললেন, তোমরা আমাকে ছুঁয়ে দেখ।

কারণ আত্মার কোনো শরীর থাকে না যেমনটা আমার কাছে। অর্থাৎ তিনি রক্ত মাংসের মানুষ। তারপর বললেন, এখানে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তারা তাকে মধু দিল, আর তিনি খেলেন। কী প্রমাণ করতে? যে তিনি ঈশ্বর নন, ক্রুসবিদ্ধ হন নি, জীবিত ছিলেন। আর কোনো সমস্যা থাকলে মূল গ্রন্থটা পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যটা আসলে কী? আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৭. এ ব্যাপারে কী বলবেন যে, টমাস বলেছেন তিনি আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর।

উত্তর : ভাই, আপনি আরো একটি উদ্ধৃতি দিলেন। একশো উদ্ধৃতি দিতে পারেন আপনি। আমার কথা হলো প্রথম যে উদ্ধৃতিটি আমি দিয়েছি সে ব্যাপারে কি একমত? এটা মানলে আমি পরের অনুচ্ছেদে যাব। তবে পরের অনুচ্ছেদে যাওয়ার আগে আপনি বলেছেন, আসুন আমরা সবাই মত-বিনিময় করি। এ ব্যাপারে কুরআন বলেছে যে, এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক। আমার ভুল হলে আমি বদলাবো, আপনার ভুল হলে আপনি পাল্টে ফেলবেন। আমাদের মধ্যে সাদৃশ্যটা দেখতে হবে। সূরা মায়িদার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। মুসলিম অথবা বিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তারা, যারা পৌত্তলিক। মূর্তিপূজারি আর ইহুদি। কিন্তু তাদের নিকটতম বন্ধু তারা যারা খ্রিস্টান। আমরা আপনাদের ভালোবাসি। যদি মতের অমিল হয় তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনি আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমিও একমত যে টমাস বলেছেন, 'আমার ঈশ্বর।' একটা উদাহরণ দিই, একজন লোক আমার কাছে এসে বললো যে, ভাই জাকির, সে বললো, 'আপনি তো লেট, এখন তো অনুষ্ঠান শেষ করে দিতে হবে।' আমি বললাম 'ও মাই গড'। এর মানে কি আমি তাকে 'ঈশ্বর' বলে ডাকছি? যদি ভালো করে প্রসঙ্গটা দেখেন। যীশু বলছে, 'আমাকে ভালো বলো না' তাহলে ঈশ্বর বলার ব্যাপারইতো আসছে না। এখানে আমি উত্তেজিত হয়ে বলছি 'ও মাই গড' দেরি হয়ে গেছে , তাহলে ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারবে যে আমি লোকটিকে ঈশ্বর বলছি না। টমাস এখানে বলছেন না যে, যীশু হলেন তার ঈশ্বর। আর যীশু এটা বলেন নি, মন্তব্যটা করেছেন টমাস। আমি আপনাকে যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছি সেটা এরকম না। আমার চ্যালেঞ্জটা ছিল পুরো বাইবেলে কোথাও পাবেন না যে, যীশু বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা করো।' কিন্তু আপনার এই উদ্ধৃতিটি ছিল টমাসের। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৮. আমার নাম সোনিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আপনি বললেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ পুরো মানবজাতির জন্যে এসেছেন। আর যীশু এসেছেন শুধু ইসরাঈলের জন্যে। আমরা খ্রিস্টান ও মুসলিমরা বিশ্বাস করি যীশু আবার পৃথিবীতে আসবেন। সেটা হলে কীভাবে বলবেন যে, মুহাম্মাদ হলেন শেষ নবী?

উত্তর: আমিও আপনার সাথে একমত যে, যীশু পৃথিবীতে আবার আসবেন। এর জন্যে সব মিলিয়ে ৭০টির মতো হাদিস আছে। সহীহ্ হাদিস বলছে যে, যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে আবার আসবেন। বাইবেলেও বলা আছে যে, যীশু ২য় বারের মতো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তবে পবিত্র কুরআনেও একথা আছে (সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ৪০-এ) যে, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং সে আল্লাহর রাসূল। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী। এখন দুটোই ঠিক, কীভাবে? কারণ ঈসা (আ) তিনি আবারও আসবেন। তিনি কী জন্যে পৃথিবীতে আসবেন? তিনিই একমাত্র নবী যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার কোনো রাসূলকেই জীবিত অবস্থায় তুলে নেন নি। পবিত্র কুরআনে (সূরা নিসা- আয়াত নং ১৫৮-এ) আছে যে, যীশুখ্রিস্টকে জীবিত অবস্থায় তুলে নেয়া হয়েছে। ১৫৭ নং আয়াতে বলছে, 'তারা তাকে হত্যাও করে নি ক্রুশবিদ্ধও করে নি। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়েছিল। তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তাদের মনেও সংশয় ছিল। তারা শুধু অনুমানই করতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি।

আমরা মানি যে, যীশুখ্রিস্ট মারা যান নি। এমনকি বাইবেলও বলছে যীশুখ্রিস্ট জীবিত ছিলেন। হাদিসও একথা বলে, বাইবেলও বলে। তবে আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলা যীশুখ্রিস্টকে তার নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। কারণ তিনিই মহান স্রষ্টার একমাত্র দূত, যার অনুসারীরা ভাবে তিনিই ঈশ্বর। আর কোনো রাসূল নেই। যেমন : মূসা, নূহ্, ইব্রাহিম, আয়জারা, ইসহাক, সলোমান, আদম এই নবীদের অনুসারীরা কেউ-ই বলেন নি তাদের নবীরা নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। একমাত্র যে নবীর অনুসারীরা এটা মানে এমনকি আজকের দিনেও মানে যে তাদের নবী ঈসা (আ) ঈশ্বর। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার, আয়াত নং ১১৬ তে আছে যে, যীশু বলেছেন, 'হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রভু আপনি সাক্ষী থাকুন আমি কখনোই বলি নি আমার উপাসনা করো। বরং আমি বলেছি, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু।'

তাহলে যীশুখ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে আসবেন তার অনুসারীদের একথা বলতে যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি। আর যীশু তখন কোনো রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে

আসবেন না। তিনি নতুন কোনো নির্দেশ নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন না। কারণ, নবুয়ত পাওয়া বন্ধ। তিনি তখন নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন। পবিত্র কুরআনে (সূরা মায়িদার আয়াত নং ৩-এ) উল্লেখ আছে যে,

'আমি আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। এই কিতাবের পরে আর কোনো নির্দেশ আসবে না। যীশু যখন পৃথিবীতে আসবেন তিনি তখন মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত হিসেবে আসবেন। তিনি পূর্বেও মুসলিম ছিলেন। পরেও তিনি মুসলিম থাকবেন। আর বাইবেলে আছে (গসপেল বলছে, যীশু ২য় বার আসলে খ্রিস্টানরা তাকে বলবে 'হে প্রভু আমরা কি তোমার নামে বিস্ময়কর কাজ করি নি?' যীশু তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের চিনি না তোমরা সবাই অপরাধী, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।' আমি একথা বলছি না গসপেলই একথা বলছে। তিনি একথা কাদের বলবেন? মুসলিমদের? হিন্দুদের, নাকি খ্রিস্টানদের বলবেন? যারা বলবে আমরা আপনার নামে বিস্ময়কর কাজ করেছি। সুতরাং যীশু ২য় বার পৃথিবীতে এসে বলবে, আমি নিজেকে ঈশ্বর বলি নি বরং আমি বলেছি আল্লাহর উপাসনা করো। আমার প্রভুই তোমার প্রভু। (ওয়া আখিরী দা ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বীল আ'লামিন)।

ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু
FOCUS ON ISLAM

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ সফিউল্লাহ [সফি]

বি.এস.এস. (সম্মান) অর্থনীতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু

পরম করুণাময় ক্ষমাশীল আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমার বামপাশে বসে থাকা মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি মি. লাক্সমানান-এর সম্মতি নিয়ে এ সভাটি শুরু করছি। মি. ল্যাক্সমানান, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ! এ সভাটির উদ্দেশ্য হলো এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সব অমুসলিম বন্ধুদের ইসলাম সম্পর্কে কিছু শোনার সুযোগ করে দেয়া, যিনি এ বিষয়ে দক্ষ এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন। যিনি মস্তিষ্ক থেকে ভুল ধারণা ভেঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শেখান। আমার বামপাশে বসা আমাদের আজকের সন্ধ্যার সম্মানিত বক্তা হলেন মুম্বাই থেকে আগত ডা. জাকির নায়েক। তিনি একজন ডাক্তার এবং প্রশিক্ষক ও জীবিকায় একজন চিকিৎসাজীবী। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে ডা. জাকির নায়েক ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্যে এবং তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাঁর টেপ, সিডি, ক্যাসেট পৃথিবীব্যাপী চাহিদার শীর্ষে রয়েছে। তিনি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন অভ্ মুম্বাইর প্রতিষ্ঠাতা। যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামের সত্য জ্ঞানকে মুসলিম আর অমুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেসব মিথ্যা ধারণা মুসলিম এবং অমুসলিমদের পারস্পরিক সৌহার্দ ভেঙ্গে দিচ্ছিল এবং তা বিস্তার লাভ করছিল, সেসব ভুল ধারণা ও মিথ্যা উপলব্ধিকে তিনি ভেঙ্গে দিচ্ছেন। আজ এই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটি যেভাবে পরিচালিত হবে তা হলো, প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবেন মাস্টার কাবিল আব্দুল্লাহ। অতঃপর মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানান আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। অতঃপর বক্তব্য রাখবেন ভাই মোহাম্মদ আব্দুল আলী এবং সর্বশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ডা. জাকির নায়েক। বক্তব্য শুরুর আগে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এখন থেকে অনুষ্ঠান তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এ পর্যায়ে সম্মানিত প্রেসিডেন্টের অনুমতিক্রমে মাস্টার কাবিল আব্দুল্লাহকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এখন আমি মাদ্রাজ হাইকোর্টের সম্মানিত বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানানকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ, নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলী। ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন অভ্ মুম্বাই-এর সভাপতি ডা. জাকির নায়েক। মি. মাহমুদ আব্দুল্লাহ বাদশা, মি. নিজাম এ হারিস, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর মি. ফয়জুর রহমান, অন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। বক্তব্যের শুরুতেই আমাকে এ রকম একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের মাঝে আসার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আমার আচার ও ব্যবহার ইহজাগতিক। ৩ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে আমাদের সংবিধানের ৪৩তম সংশোধনীতে 'ইহজাগতিক' শব্দটি স্থান পায়। ইহবাদ বা ইহজাগতিকতা আমাদেরকে সব বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শনের ধারণা দেয়।

ভারতের সংবিধানে এটি উল্লেখ আছে যে, বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো নাগরিক বৈষম্যের স্বীকার হবে না। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে ধর্মের ভিত্তিতে, ধর্মের অধিকারে সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা বর্ণিত আছে। অনুচ্ছেদ ২৫-এ বিশ্বাসের অধিকার এবং তা প্রচার ও বিস্তারের অধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের সংবিধান সাম্য, একতা ও ধর্মীয় শান্তির ধারণা অনুমোদন করে। আমি নিশ্চিত এ ধরনের অনুষ্ঠান পারস্পরিক সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতি মানুষের উৎসাহ রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়তা করবে। শেষ করার পূর্বে আমি আবারো এই সন্ধ্যায় আপনাদের মাঝে আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি যখন আমার কার্যালয়ে ছিলাম নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলী আমাকে আমন্ত্রণ জানালে আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই। তিনি আমাকে বলেন, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর আলোচনা করবেন। সকালেই আমি বলেছিলাম ৮ টায় আমার আরো একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের ওয়াদা দেয়া আছে, সুতরাং এ আলোচনাটি শোনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হচ্ছি।

ডা. জাকির নায়েক, আমার বন্ধু ফয়জুর রহমান এবং আমাদের নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলী আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে পারছি না। যাহোক, আমি আজ এ সন্ধ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ডা. জাকির নায়েককে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব শীর্ষক বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে এ আলোচনার একটি অডিও ক্যাসেট আমাকে দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। যাতে করে পরবর্তীতে আমি আলোচনটি শুনতে পারি এবং আমার মতামত জানাতে পারি। একথা বলে এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আমরা বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানানকে তার উদ্দীপনামূলক ও অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যা আমাদের ভাবনা ও চিন্তাকে প্রসারিত করবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি সকল মুসলিম বন্ধুদের সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং অমুসলিম বন্ধু ও অতিথিদের বসার সুযোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এ আলোচনাটি মূলত অমুসলিম বন্ধুদের জন্য সুতরাং আমাদের অমুসলিম বন্ধুরা যেন ঠিক মতো বসে আরামের সাথে বক্তব্য শুনতে পারেন এবং সহযোগিতা করতে পারেন সে দিকে সকলকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ সান্ধ্যকালীন আলোচনা সভার উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অন্তর্জ্ঞান বৃদ্ধি করা। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাসের বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। একজন আরেকজন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের এ সভার উদ্দেশ্য হলো অমুসলিম বন্ধুদের বুঝানো, ইসলাম প্রকৃত অর্থে কী বলছে; ইসলাম কী বিশ্বাস করে। কেন তারা ইসলামকে বিশ্বাস করবে। বর্তমানে তারা কী বিশ্বাস করে এবং কেন বিশ্বাস করে? তাদের কাজকর্মকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তারা কী করছে আর কী বিশ্বাস করছে। আজকের এ অনুষ্ঠানের সম্মানিত বক্তা ডা. জাকির নায়েক খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ওপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। তাঁর বক্তব্যের শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে যেখানে শুধু অমুসলিম বন্ধুরা প্রশ্ন করতে পারবেন। একথার সাথে সাথে আমি সম্মানিত বক্তা ডা. জাকির নায়েককে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ওপর তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম। বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিত বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানান, নবাব মুহাম্মাদ আলী, ভাই ফাইয়াজ, আমার সম্মানিত বড় ভাই এবং আমার প্রাণপ্রিয় ভাই ও বোনেরা। আমি শান্তির বার্তাসহ সবাইকে স্বাগত জানাই, ইসলামিক শুভেচ্ছা, আস্‌সালামু আলাইকুম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আজকের এ সন্ধ্যার আলোচনার বিষয় ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলাম শব্দটি মূল 'সালাম' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ শান্তি। নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয়ার নামই ইসলাম। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেন তিনিই মুসলিম। অনেক মানুষের মাঝে ভুল ধারণা আছে যে, ইসলাম নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত একটি নতুন ধর্ম। বস্তুত সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানুষ যখন পৃথিবীতে পা রেখেছিল তখনো ইসলাম ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নন। যদিও পবিত্র কুরআনে সূরা আল-ফাতির– এর ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ط وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট সতর্ককারী আসে নি।

আবার পবিত্র কুরআনে সূরা রাদ-এর ৭ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ط إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ

অর্থ : কাফেররা বলে, তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন? আপনার কাজতো ভয় প্রদর্শন করা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক পাঠানো হয়েছে।

এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে যুগে যুগে, দেশে দেশে নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ২৫ জনের নাম মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন : আদম, নূহ, মূসা, ইবরাহিম, ঈসা, ইসমাঈল, দাউদ, সোলায়মান (আ) ও মুহাম্মাদ ﷺ। যদিও পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবীর কথা এসেছে কিন্তু আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) এর উপরে নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। তবে সব নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে এসেছেন এবং তাঁরা শুধু তাঁদের অঞ্চলের মানুষের সেই নির্দিষ্ট সময়ের পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থ : মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

সুতরাং কুরআন বলছে মুহাম্মাদ ﷺ পৃথিবীতে আগত শেষ এবং সর্বশেষ নবী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।

পবিত্র কুরআনে সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতে আরও উল্লেখ আছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে কেবল মুসলমান বা আরবদের জন্যে প্রেরণ করা হয়নি। সমস্ত বিশ্ব মানবতার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। অনেক অমুসলিম ইসলামকে 'মুহাম্মাদিজম'-এর সমর্থক শব্দ হিসেবে ভাবেন এবং মুসলমানদের বলেন 'মুহাম্মাদিয়ান'। 'ইসলাম' এবং 'মুহাম্মাদিজম' এক বিষয় নয়। ইসলাম ধর্ম কখনও মুহাম্মাদিজম নয়, মুহাম্মাদিজম কোনো ধর্ম নয়। আমি আগেই বলেছি ইসলাম হলো মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম যেটি সৃষ্টির উষালগ্ন ধরে চলে আসছে। হযরত আদম (আ) হলেন প্রথম নবী এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী। আর মুহাম্মাদিজম অর্থ একজন মানুষ যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে পূজা করেন। আমরা মুসলমান তাঁকে সম্মান করি, কিন্তু এখানে একজনও নেই যিনি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে পূজা করেন। এটি ইসলাম ধর্মে জায়েয নয়।

সুতরাং মুহাম্মাদিজম ভুলভাবে উপস্থাপিত একটি শব্দ। ধর্মের জন্য সঠিক শব্দ হলো ইসলাম এবং যেসব মানুষ ইসলামকে অনুসরণ করে তারাই মুসলিম। মুসলিম অর্থ এমন একজন মানুষ যিনি তার ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন এবং আমরা কেবল আল্লাহর উপাসনা করি, অন্য কারো নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি গোষ্ঠির জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিতাব নাযিল করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪টি গ্রন্থের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং ফুরকান। এ ফুরকানই হলো পবিত্র কুরআন। কিতাবগুলোর মধ্যে তাওরাত মূসা (আ)-এর ওপর, যাবূর দাউদ (আ)-এর ওপর, ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর ওহী আকারে নাযিল করা হয় এবং কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব যেটি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল করা হয়। যিনি সমস্ত বিশ্বের সর্বশেষ মানবতার অগ্রদূত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যাহোক, কুরআনে বলা হচ্ছে পৃথিবীতে বেশ কিছু কিতাব নাযিল করা হয়েছে যেমন সহিফা-ই ইব্রাহিম। কিন্তু এর মধ্যে ৪ খানা কিতাবের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। কুরআনের পূর্বে যে কিতাবগুলো এসেছে তাঁর প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট জাতির জন্যে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা ইব্রাহিমের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : এ কুরআন মানুষের জন্যে একটি সংবাদনামা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যাতে এ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা যায়। এবং তারা যাতে জেনে নেয় যে, আসলে মাত্র একজন উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

অর্থ : রমযান মাস হলো সে মাস, যে মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন। যা মানুষের জন্যে হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা যুমারের ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ـ

অর্থ : আমি আপনার ওপর সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে।

পবিত্র কুরআনে কেবল মুসলিম বা আরবদের কথা বলা হয়নি। সমস্ত বিশ্বমানবতার কথা বলা হয়েছে এবং এটাই শেষ গ্রন্থ। কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে না পবিত্র কুরআনই শেষগ্রন্থ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : এরা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এর মধ্যে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেতো।

এটা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এসেছে? যদি আসতো অবশ্যই এর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতো। আমি মুম্বাইতে 'কুরআন কি আল্লাহর বাণী' এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। যেখানে আমি প্রমাণ করেছিলাম মুসলিম এবং অমুসলিম

সবাই বিশ্বাস করে কুরআন আল্লাহর বাণী। এমন কি একজন বিধর্মী নাস্তিকও তা বৈজ্ঞানিকভাবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু একজন নাস্তিক সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করে না। তাহলে সে কীভাবে স্বীকার করে কুরআন আল্লাহর বাণী? যদি একজন নাস্তিক আল্লাহকে বিশ্বাস না করে, তবে সে কিভাবে বলে কুরআন আল্লাহর বাণী? একজন নাস্তিক যখন আমাকে এসে বলে, 'আমি আল্লাতে বিশ্বাস করি না।' আমি প্রথমত, ঐ নাস্তিককে অভিনন্দন জানাই। আপনারা কি জানেন? কোন্ কারণে সে অন্যদের মতো ভাবে না?

অধিকাংশ খ্রিস্টান চিন্তা করে সে খ্রিস্টান কারণ তার বাবা মা খ্রিস্টান। সে একজন হিন্দু কারণ তার বাবা হিন্দু, সে একজন মুসলিম কারণ তার আব্বা মুসলমান। একজন নাস্তিক চিন্তা করে প্রত্যেকে তার পিতার ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। সে চিন্তা করে, আমার পিতা যা বলে আল্লাহর ধারণা কি তাই? এটা ঠিক না। সুতরাং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ সে ইসলামের প্রথম মতবাদটি বুঝতে পেরেছে। কালিমা তৈয়্যবা-এর প্রথম অংশ হলো 'লা-ইলাহা' অর্থাৎ 'নেই কোনো মাবুদ'। যে ইসলামের প্রথম মত বিশ্বাসের সাথে একমত হয়েছে। এখন আমার কাজ হলো তাকে অন্য অংশ বিশ্বাস করানো 'ইল্লাল্লাহ' অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া'।

ইসলামিক মতবাদের মূল ভিত্তি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ 'নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল।' যখন একজন নাস্তিক ইসলামিক মতবাদের প্রথম অংশ বিশ্বাস করে তখন আমি তাকে স্বাগত জানিয়ে দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করি। সেটা আমি অবশ্যই করতে পারবো 'ইনশাল্লাহ'। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এমন একজনকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে, তার সামনে এমন একটি যন্ত্র রাখা হলো যেটি এ পৃথিবীর কোনো মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, যার পরিচয় এখনো ঘটেনি, যেটি সম্পর্কে এখনো কেউ কিছু শোনেনি।

এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন, কে সেই ব্যক্তি যিনি এই যন্ত্রটির কার্যক্রম এবং নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন? নাস্তিকরা কি ধরনের উত্তর দিবে? কোনো কোনো নাস্তিক বলবে প্রথমে যন্ত্র সম্পর্কে সেই ব্যক্তি বলতে পারবেন যিনি এটি সৃষ্টি করেছেন। কারণ, যন্ত্রটি ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি এ সম্পর্কে কিছু শোনেনি বা কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না। সুতরাং কেউ বলবে কেবল নির্মাণকারী, কেউ বলবে উৎপাদনকারী বা কেউ বলবে প্রস্তুতকারী অথবা কেউ বলবে সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারবেন। তারা যাই বলুক শুধু এটা মনে রাখা দরকার তারা একই রকম মত দিচ্ছে। যদি একজন নাস্তিককে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হলো এ বিষয়ে বিজ্ঞান সর্বশেষ কী বলছে। তিনি আপনাকে বলবেন 'বিগব্যাং' (Big Bang) থিউরি-এর মতে সমস্ত পৃথিবী একটি নীহারিকার আকৃতিতে ছিল।

তারপর সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভাজন ঘটে, যা গ্যালাক্সি, গ্রহ, চাঁদ, সূর্য-এর সৃষ্টি করে বর্তমানে যার মাঝে আমরা বসবাস করছি। সার্বিকভাবে এ তত্ত্বকে 'বিগ ব্যাং থিউরি' বলে। আমরা গতকাল যে বিগব্যাং থিউরি আবিষ্কার করেছি, তা কে লিখেছেন? তা আরো ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। তখন নাস্তিক হয়তো বলতে পারে, তিনি ধারণা করে বলেছেন। কিন্তু এটা কি সম্ভব একজন প্রবল বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এটি ধারণা করেছেন এবং তা লিখেছেন। ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলছে, সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবী গ্যাসে পরিপূর্ণ একটি পিণ্ড ছিল। এ বিষয় সম্পর্কে পবিত্র আল-কুরআনে সূরা হা-মীম আস-সাজদার ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ـ

অর্থ : অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুণ্ড তারপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছেয় অথবা অনিচ্ছেয়; তারা বললো আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

সুতরাং আল-কুরআন বলছে প্রথম দিকে এ গ্রহটি ছিল ধোঁয়া দ্বারা পূর্ণ। বর্তমানে বিজ্ঞান বলছে, প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী ধোঁয়া দ্বারাই পরিপূর্ণ ছিল। নাস্তিক বলতে পারে হয়তো কেউ এটা অনুমান করে বলতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই। কিছুক্ষণ আগেও আমরা আমাদের বসবাস যোগ্য পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করেছি। এটা সমতল তারপরও মানুষ চলতে ভয় পায় কারণ, সে যেকোনো সময় পড়ে যেতে পারে। আপনি নাস্তিককে প্রশ্ন করুন, পৃথিবীর আকার কী রকম? সে খুব সহজে উত্তর দিবে, পৃথিবী গোল। যদি প্রশ্ন করেন, আপনি কখন থেকে জানেন? তিনি আপনাকে ৫০ বা ১০০ বছর আগের কথা বলবে। যদি তার বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকে তাহলে বলবে স্যার ফ্রান্সিস দেব ১৫৯৭ সালে আবিষ্কার করেন পৃথিবী গোল। যখন তিনি পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করেন এবং প্রমাণ করেন পৃথিবী গোলাকার। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা যুমারের ৫নং এবং সূরা লুকমানের ২৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط

অর্থ : তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং সূর্য ও চাঁদকে অনুগত করেছেন।

এ দিন থেকে রাত হওয়া এবং রাত থেকে দিন হওয়া একটি ধীরগতি সম্পন্ন প্রক্রিয়া এবং এটি কেবল সম্ভব যদি পৃথিবী গোলাকার হয়। পৃথিবী সমতল হলে এটি সম্ভব না। কারণ তাহলে হঠাৎ হঠাৎ দিন ও রাতের পরিবর্তন দেখা যেত। সুতরাং পৃথিবী যে গোল এ বিষয়ে আল-কুরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা নাযিআতের ৩০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে-

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۔

অর্থ : এরপর পৃথিবীকে তৈরি করেছেন ডিম্বাকৃতি করে।

আরবি শব্দ 'দাহাহা' অর্থ প্রসারণ এবং এটা মূল শব্দ 'দাহিয়া' থেকে এসেছে। যার অর্থ ডিম। যা কোনো সাধারণ ডিমকে বুঝায় না। পৃথিবীর আকার বুঝানোর জন্যে এটিকে উটপাখির ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি বলের মতো গোল নয়। এর উপরিভাগ চ্যাপ্টা এবং মধ্যভাগ ফাঁপা। উটপাখির ডিম যেমন উপরিভাগ চ্যাপ্টা এবং মাঝে ফাঁপা ঠিক তেমন। অতএব, এখন যদি আমি নাস্তিককে প্রশ্ন করি, যে বিষয়টি আমরা ৩০০ থেকে ৪০০ বছর আগে জেনেছি তা পবিত্র কুরআনে ১৪০০ বছর আগে কে বলে দিয়েছেন? সে বলবে, সম্ভবত তোমাদের নবী সে খুবই বিচক্ষণ ছিল এবং সে-ই এটা লিখেছে। ইতিপূর্বে আমরা ভাবতাম চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে চাঁদের আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চাঁদ আলোকিত হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে-

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ۔

অর্থ : কল্যাণময় তিনি, যিনি আকাশে বুরুজ নির্মান করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য এবং দীপ্তিময় চন্দ্র।

আল-কুরআন বলছে সূর্যের নিজস্ব আলো আছে কিন্তু চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই। চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত বা জ্যোতির আলো বলা হয়েছে। যার অর্থ চাঁদ আলো ধার করে অথবা প্রতিফলিত আলোই চাঁদের আলোর উৎস। সূর্যের আলোকে 'স্বরাজ' 'ওয়াজ' অথবা 'দুজা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যার অর্থ টর্চ বা এমন কোনো বাতি যা সবসময় জ্বলছে। প্রত্যেকটি জায়গায় চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত আলো হিসেবে বলা হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় এটা গতকাল আবিষ্কার করলাম ৫০ বা ১০০ বছর আগে; পবিত্র কুরআনে সেটি ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন জানতাম সূর্য স্থির। এটা তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে না; যেখানে চন্দ্র ও পৃথিবী তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আল আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে-

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।

সুতরাং আল-কুরআন বলছে চাঁদ ও সূর্য তাদের নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করে। আমরা কিছুদিন হলো জানলাম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে সূর্য তার নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করে। যেটি ১৪০০ বছর আগে কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। কে এটা বলেছে? উত্তরে একজন নাস্তিক বলবে এটা সৌভাগ্যবশত আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে।

পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। ১৫৮০ সালে স্যার বার্নাড পাশি পানিচক্র ব্যাখ্যা করেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আল যুমার-এর ২১ নং আয়াতে, সূরা আর রুম-এর ২৪ নং আয়াতে, সূরা মুমিনূন-এর ১৮নং আয়াতে সূরা হিজর-এর ২২ নং আয়াতসহ বিভিন্ন জায়গায় কীভাবে পানিচক্র কাজ করে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। পানি কীভাবে বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘ যে পানির ফোঁটায় পরিণত হয়, পৃথিবীতে বৃষ্টির ফোঁটা আকারে ঝরে পড়ে এবং সমুদ্রে ফিরে যায়। এ পানি চক্রটি পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যা বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমরা আগেই জেনেছি পৃথিবীতে দু ধরনের পানি আছে লবণাক্ত এবং মিষ্টি পানি। পবিত্র কুরআনে সূরা ফুরকানের ৫৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا -

অর্থ : আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন, একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। উভয়ের মাঝে রেখেছেন একটি অন্তরায় একটি দুর্ভেদ্য আড়াল।

এই একই কথা আবারও বলা হচ্ছে সূরা আর রহমান-এর ১৯ এবং ২০নং আয়াতে– مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ -

অর্থ : তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না।

বর্তমানে বিজ্ঞান বলছে মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি একইসাথে প্রবাহিত হলেও তা মিশে যায় না। তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দেয়াল থাকে। যা পবিত্র কুরআনে ১৪০০

বছর আগেই বলা হয়েছে। এখন যদি আপনি নাস্তিককে বলেন, কে এটা নির্দেশ করলো? সে অস্বস্তির সাথে বলবে এটাও ভাগ্যবশত ঘটে গেছে।

কুরআনে জীববিজ্ঞান সম্পর্কেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

অর্থ : আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে।

আপনি একটু চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তার পাশাপাশি আরবের মরুভূমি যা সৃষ্টি হয়েছে পানি শূন্যতা থেকে। অর্থাৎ পানি ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া বা বেঁচে থাকা সম্ভব না। কে এই ন্যায়সঙ্গত কথাটি বিশ্বাস করবে না। বর্তমানে আমরা জানতে সমর্থ হয়েছি আমাদের শরীরের মূল কোষ সাইট্রোপ্লাজম প্রায় ৮০ শতাংশ পানি ধারণ করে। প্রত্যেকটি প্রাণী ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি দ্বারা গঠিত।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে সব সৃষ্টিকুল পুরুষ এবং মহিলা এ দুই লিঙ্গে বিভক্ত যা বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে। কুরআন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পাশাপাশি পাখির জীবন সম্পর্কে বলছে, পিঁপড়ার, মাকড়সার এমনকি মৌমাছির জীবন প্রণালী সম্পর্কেও বলেছে যা আমরা বর্তমানে জানতে পারছি। কুরআন মধুর মাঝে ওষুধের কথা বলেছে যা আমরা আজ আবিষ্কার করছি। কুরআন মানবশ্রূণ সম্পর্কে বলেছে, মানুষের প্রজননের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে যা আমরা বর্তমানে জানতে পারছি, এখন উদ্ভাবন করছি। এখন যদি নাস্তিকের কাছে জিজ্ঞেস করি, কে এ তথ্যগুলো দিল? সে বলতে পারে, ভাগ্যক্রমে। কারণ এটি একটি তত্ত্ব যা 'সম্ভাব্যতার তত্ত্ব' নামে পরিচিত। দৈবাৎ ঘটনা কম ঘটে যখন সে অধিক পরিমাণে ঠিক উত্তর প্রদান করে। কারণ, ভাগ্যক্রমে বারবার ঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব না যেটি 'সম্ভাব্যতার তত্ত্ব' বলে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে প্রথম ঐ একটি উত্তরই থাকে। তিনি উত্তরগুলো দিচ্ছেন, যিনি পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানেন। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা, প্রস্তুতকারী, নির্মাণকারী। আপনি তাঁকে যেকোনো নামেই ডাকতে পারেন। কিন্তু একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন যাকে আমরা আল্লাহ্ বলি। অথবা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলছি।

বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব? আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেটের কথা বলতে পারেন যেটি 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান দ্বন্দ্ব ও সমাধান' নামে পরিচিত। যেখানে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ বলেন, সহীহ্ বুখারী শরীফের ২ নং হাদীস..........
ইসলাম যে পাঁচটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো ইসলামের খুঁটি তার

প্রথমটি হলো তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যার অর্থ- 'নেই কোনো মাবুদ আল্লাহ ছাড়া এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল।' এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج

অর্থ : সৎকর্ম শুধু এই নয় যে তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং সব নবী রাসূলের ওপর।

একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বড় পরিচয় হিসেবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসের ১-৪ আয়াতে বলেছেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : বলুন তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাকে কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতূল্য কেউ নেই।

এটাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর চার লাইনের পরিচয়। আমরা মুসলমানরা বলি যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করে যদি সে এই চার লাইনের পরিচয় পূর্ণ করতে পারে তখন তাকে আল্লাহ হিসেবে মেনে নিতে মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে ১১০ নং আয়াতে বর্ণিত আছে,

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج

অর্থ : হে নবী! এদেরকে বলে দাও তোমরা আল্লাহ বলে আহ্বান করো কিংবা রহমান বলো, যে নামেই আহ্বান কর না কেন সব সুন্দর নাম তাঁরই।

অর্থাৎ আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে যে নামে ইচ্ছে ডাকতে পারেন; তবে তা সুন্দর হতে হবে। এটা শূন্য থেকে কিছু এনে মানুষের মন ছবিতে বসিয়ে দেয়া নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯টি নাম রয়েছে। যেমন : আর-রহমান, আর-রাহিম, আল জব্বার, আল কুদ্দুস, আল খায়ের। তিনি ক্ষমাশীল, তিনি পরোপকারী ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং নিখুঁত নাম হলো আল্লাহ। এখন কেন মুসলিমরা 'গড' অপেক্ষা 'আল্লাহ' ডাকতে অধিক পছন্দ করে। কারণ,

ইংরেজি শব্দ গড বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আরবি শব্দ 'আল্লাহ' বলতে এক ও অদ্বিতীয় একজনকেই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি God এর সাথে একটা s যোগ করে দেন তাহলে দাড়ায় Gods কিন্তু ইসলামে Allahs নামে কোনো শব্দ নেই। আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা এখলাস-এর ১নং আয়াতে বলা হয়েছে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

অর্থ : বলুন, তিনি আল্লাহ, একক।

আপনি যদি God-এর সাথে dess যোগ করেন তাহলে দাঁড়ায় God যার অর্থ মহিলা God কিন্তু ইসলামে মহিলা আল্লাহ বা পুরুষ আল্লাহ বলে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গ ভেদাভেদ নেই। তিনি এক। আপনি যদি God-এর পরে mother শব্দটি যোগ করেন তবে দাঁড়ায় God mother অর্থাৎ ধর্মমাতা। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে Allah-ammi বা Allah- Mother বলে কিছু নেই। আপনি যদি God-এর পূর্বে একটি উপসর্গ Tin ব্যবহার করেন তাহলে দাঁড়ায় Tin-god অর্থাৎ, ভ্রান্ত বা জাল। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে Tin Allah বলে ইসলামে কিছু নেই। তাই আমরা মুসলিমরা God (গড) অপেক্ষা আল্লাহ বলতে বেশি পছন্দ করি। আপনি তাকে যে কোনো নামেই ডাকতে পারেন। [সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত- ১১০] এটি সূরা আরাফ-এর ১৮০ নং আয়াতে, সূরা ত্বোহা এর ২০ নং এবং সূরা আল হাশরের ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে আপনি আল্লাহকে যে নামেই ডাকুন না কেন তা সর্বাপেক্ষা সুন্দর নাম। পবিত্র কুরআনে আবারো সূরা আন-আমের ১০৮ নং আয়াতে বলেছেন—

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

অর্থ : তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না। যাদের তারা আরাধনা করে, আল্লাহ ছাড়া; তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে।

সুতরাং কোনো মুসলিম যদি তাদেরকে বুঝাতে যেয়ে তারা যার আরাধনা করে তাকে খারাপ বলে তবে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলার দৃষ্টতা দেখাবে।

ইসলামের দ্বিতীয় খুঁটি হলো সালাত। অনেকে সালাতকে Prayer বা দোআ বলে থাকেন। দোআ অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন, সবিনয় প্রার্থনা। যেভাবে একজন মানুষ আদালতে সবিনয় নিবেদন জানিয়ে সাহায্য চায়। দোআ আরবি শব্দ সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ সালাতের মধ্যে আমরা সাহায্যের জন্যে আবেদন করি, আল্লাহর বন্দনা করি। সালাতের মধ্যে আমরা পথ নির্দেশনা পাই। সুতরাং ইংরেজি শব্দ Prayer আরবি শব্দ সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। সালাতের অধিক গ্রহণযোগ্য অর্থ হলো Programme বা অনুষ্ঠান আমরা মুসলমান আমরা

সালাত অনুষ্ঠান করি বা পালন করি। আমরা কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল, কোন্‌গুলো ভালো, কোন্‌গুলো খারাপ তা জেনে পালন করি। আমরা বেআইনিভাবে সম্পদ হরণ করি না। প্রতারণা করি না। ভালো কাজ করি, প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করি ইত্যাদি। সুতরাং সবই আমরা পালন করি। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং আমি যদি বলি আমি পালন করতে যাচ্ছি, মস্তিষ্ক ধোলাই করতে যাচ্ছি, সেটা খুবই খারাপ শোনায়। সুতরাং যদি কেউ সালাতের জায়গায় Pryaer বা দোআ শব্দ ব্যবহার করে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদিও Pryaer শব্দটি সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না।

আমরা মুসলমানরা সাধারণত দিনে ৫ (পাঁচ) বার সালাত আদায় করি। খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগে, যাকে ফজরের নামাজ বলি। যখন সূর্য মাথার ওপর যায় যোহরের নামাজ পড়ি। বিকেল হওয়ার পূর্বে আসর, বিকেল শেষ হয়ে সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিব এবং সন্ধ্যার পরে ও গভীর রাতের আগে এশার নামাজ আদায় করি। আমরা দিনে কমপক্ষে ৫ বার নামাজ পড়ি। ডাক্তাররা আমাদেরকে বলে সুস্বাস্থ্যের জন্য দিনে কমপক্ষে তিনবার খেতে হবে। তেমনি আত্মিক শুদ্ধতার জন্যে দিনে কমপক্ষে ৫ বার নামাজ পড়ার জন্যে বলা হয়েছে। যখন আমরা নামাজ আদায় করতে মসজিদে ঢুকি। আমরা আমাদের জুতা খুলে ঢুকি, যেটি হযরত মূসা (আ)-এর সময় থেকে চলে আসছে। পবিত্র কুরআনে সূরা ত্বোয়াহার ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۔ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۔

অর্থ : অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছালেন তখন আওয়াজ আসলো হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় রয়েছো।

এ আদেশটি মূসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল যা আমরা মুসলমানরা অনুসরণ করি। নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে ঢোকার পূর্বে আমরা জুতা খুলে ফেলি। আমরা স্বাস্থ্যসম্মত সেই মানুষ যারা তাদের উপাসনালয়কে পরিষ্কার রাখতে চাই এবং আমরা গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চাই। আমরা জুতার মাধ্যমে আসা ময়লা ধুলা দিয়ে অপরিষ্কার করতে চাই না। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৬ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط

অর্থ : হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হও তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো পরিশেষে টাখনু পর্যন্ত পদদ্বয় ধৌত করো।

আরবিতে একে ওজু বলে। নামাজের পূর্বে ওজু করা বাধ্যতামূলক।

আমরা অবশ্যই ওজু করবো, নিজেদের নিজেরা ধৌত করবো। কারণ আমরা স্বাস্থ্যসম্মত মানুষ। এবং আমরা প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর আগে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে চাই। এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি যে, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বুখারী শরীফের ৬৯২ নং হাদীসে বলেন, যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে।

অন্য একটি হাদীসে বলেন, যখন তোমরা নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়াও তখন এমনভাবে দাঁড়াও যেন শয়তান তোমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াতে না পারে। নবী করীম ﷺ সেই শয়তানের কথা বলেননি যাকে আপনারা ওনিডা টিভির বিজ্ঞাপনে দেখেন। আপনারা জানেন ওনিডা টিভি বিজ্ঞাপনের শয়তানের দুটো শিং একটা লেজ থাকে। নবী করীম ﷺ যে শয়তানের কথা বলেছেন যে অসংখ্য কাজ করে সব ধূলিসাৎ করে দেয়। তিনি বর্ণবাদী শয়তান, গোত্র বিভাজনকারী শয়তানের কথা বলেছেন। সম্পদের দ্বারা বিভাজিত শয়তান। এর অর্থ এটা বিবেচনার মধ্যে না আনা যে, তুমি গরিব না ধনী, তুমি সাদা না কালো, তুমি আমেরিকা থেকে এসেছো, চীন থেকে না ভারত না পাকিস্তান থেকে এসেছো। তুমি কি কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছো কিনা এটা কোনো বিষয় নয়। যখন তুমি নামাজের মধ্যে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিনে পাঁচবার দাঁড়াও তখন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে। সে ধনী না গরিব, পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত থেকে এসেছে এগুলো যখন আমরা গণনায় আনি না তখন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এটাই সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য বাস্তব উদাহরণ। সুতরাং বর্ণবাদী শয়তান, গোত্রবাদী শয়তান, সম্পদ সমৃদ্ধ শয়তান দুই মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আসতে পারে না।

নামাজের সবচেয়ে উত্তম অংশ হলো সিজদা, যেটি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে ৯২ জায়গায় সিজদা করার কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা বলেন, শরীর আমাদের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু আমাদের মন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে শরীরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এবং আমরা মুসলিমরা যে সালাত আদায় করি এটাই এজন্যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আমরা শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশ অর্থাৎ কপালকে সবচেয়ে নিচের অংশ মাটিতে ছোয়াই এবং বলতে থাকি সব প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মহান, প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সবচেয়ে বড়। এবং যদি আপনি বিশ্লেষণ করে দেখবেন যখন আমরা নামাজ আদায় করি আমাদের মস্তিষ্ক থেকে সারাদিন যে তড়িৎ বের

হতে থাকে সিজদার সময় সেই শক্তিটি মাটিকে স্পর্শ করে। আমাদের সামনের অংশ অর্থাৎ কপাল মাটিতে ঠেকানোর মাধ্যমে। আমাদের তিন মাথাওয়ালা প্লাগ এবং দুই মাথাওয়ালা প্লাগ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আপনি মাথার নিচের দিকে হাত রাখলে শট করবে। দুই হাত এবং মাথার সমন্বয়ে তিন জিন ওয়ালা প্লাগের সৃষ্টি হয়। এটা বিদ্যুৎতাড়িত হওয়ার বিষয় নয় কিন্তু এটা সম্মুখভাগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন থাকেন, সব সময় সোজা হয়ে থাকেন। হৃদপিণ্ড ব্রেইনে রক্ত সঞ্চালন করে কিন্তু একটি স্বাস্থ্যসম্মত মস্তিষ্কের জন্যে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং যখন আপনি সেজদাতে যান অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত আপনার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে যা মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে।

একটি অধিক শক্তিশালী মস্তিষ্কের জন্যে এই অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন অত্যাবশ্যক। যখন আমরা সিজদা করি আমাদের মুখের চামড়ায় অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় যা আমাদের মুখমণ্ডলকে রাখে সতেজ ও সুন্দর। যখন আমরা সিজদা করি তা আমাদের সাইনোসিস-এর সমস্যা দূর করে। অ্যাজমা সংক্রান্ত সাইনোসিসসহ অন্য সব ধরনের সাইনোসিস থেকে রক্ষা করে। একজন নামাজি ব্যক্তির সাইনোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন আপনার ফুসফুসের ধারণক্ষমতার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হয়। বাকি এক-তৃতীয়াংশ থেকে যায়। যখন আপনি সিজদা করেন অধিক পরিমাণে মুক্ত বাতাস আপনার ফুসফুসে প্রবেশ করে যা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। যখন আপনি সিজদা করেন ব্রঙ্কাল ট্রি-এর ক্ষরণ হয় যার ফলে ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আপনি যখন সিজদা করেন ভেনাস খুব দ্রুত তলপেটের দিকে ফিরে আসে তাই Hamroid হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

এছাড়াও আরো কিছু সুবিধা রয়েছে। যখন আপনি কিয়াম, রুকূ', সিজদা করতে গিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ান, আপনার কলফ এর পেশিগুলো কার্যকর হয়। কলফ পেশি বলতে হৃদপিণ্ডের প্রান্তিক অংশের পেশিকে বুঝায় যা শরীরের নিচের অংশে রক্ত সঞ্চালন করে। সুতরাং যখন আপনি কিয়াম, রুকূ', সিজদা করেন আপনার কল্ফ-এর পেশীগুলো কার্যকর হয়ে শরীরে নিচের অংশে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ করে। যখন উঠে দাঁড়ান আবার কিছুটা নিচু হন আপনার মেরুদণ্ডের ব্যায়াম হয়ে যায়। যা মেরুদণ্ডের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। যদি আপনি শুধু সালাত নিয়ে কথা বলেন সালাতের অনেক চিকিৎসীর গুণ রয়েছে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা চিকিৎসীয় গুণের জন্যে নামাজ পড়ি না। এগুলো হলো পার্শ্ববর্তী লক্ষ্য। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর প্রশংসা করা। এটাই আমাদের মূল খাবার, বিরিয়ানি। চিকিৎসীয় সুবিধা হলো আমাদের পাশের গামলার খাবার। চিকিৎসীয় সুবিধার জন্যে একজন অমুসলিম নামাজ আদায় করতে পারে। যেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা নামাজ আদায় করি কেবল আল্লাহর

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তাঁর গুণগান গাওয়া আমাদের প্রধান খাবার বিরিয়ানি। এটা নামাজের সাথে অতিরিক্ত সুবিধা যা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হলো যাকাত। আরবি শব্দ 'যাকাত' অর্থ পরিশুদ্ধিকরণ বা অর্থ বৃদ্ধি। ইসলামে যে ব্যক্তির নিসাব পরিমাণে অর্থাৎ কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা সোনা গচ্ছিত রয়েছে বা সমপরিমাণ টাকা গচ্ছিত রয়েছে তার জন্যে যাকাত ফরজ। সে শতকরা ২.৫ (আড়াই) টাকা দান করে দিবে। এ দানের প্রকার সম্পর্কে সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط

অর্থ ঃ যাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদেরকে এবং দাস-মুক্তির জন্যে ঋণীদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্য এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।

এই হলো আট প্রকারের মানুষ যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য। এটা প্রত্যেক মুসলিম ধনীর জন্যে ফরজ। যদি তার কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে প্রত্যেক চন্দ্র বছরে তার জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ করে দেবে। যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ তার জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত দান করতো তাহলে পৃথিবীর মানুষ দারিদ্র মুক্ত হতো। একটি মানুষও না খেয়ে মারা যেতো না। এজন্যে পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : আল্লাহ্ জনপদবাসীর কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহ, রাসূল, তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে। যাতে ধন ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়।

পবিত্র কুরআনে সূরা তাওবা-এর ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে আর তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিও। একদিন আসবে যখন এসোনা রুপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাটে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। সেদিন বলা হবে এগুলো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করে।

সম্পদ মজুদ করাকে পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনি সম্পদ মজুদ করতে পারবেন না।

ইসলামের চতুর্থ খুঁটি হলো হজ। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্য মুসলমানের জন্যে পবিত্র মক্কা শরীফে গিয়ে জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা ফরজ। এবং আমি বলতে চাই হজ হলো পৃথিবীতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। হজ-এর সময় প্রায় ২.৫ মিলিয়ন (২৫ লাখ) মানুষ মক্কায়, মিনায়, আরাফায় পরিভ্রমণ করে। ২৫ লাখ মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে। সব মানুষ দুই খণ্ড সেলাইবিহীন কাপড় পরে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে হজ্জ পালন করে। আপনার পক্ষে সেখানে এটি নির্ধারণ করা সম্ভব না যে, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে কি একজন রাজা না প্রজা। আপনি জানতে পারবেন না সে ধনী না গরিব। অন্তত তারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শনস্বরূপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হজ পালন করছে। আমি পবিত্র কুরআনের সূরা আল হুজুরাত-এর ১৩ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলাম সেখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরের পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু জানেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা একে অপরকে সম্মান করবে। তারা কখনো একে অপরকে ঘৃণা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। আমি সর্বোৎকৃষ্ট অথবা তুমি আমার চেয়ে নিম্ন এ ধরনের কথা বলবে না। এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেন, 'কোনো আরব কোনো অনারব থেকে বড় নয়, আবার কোনো অনারব আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের চেয়ে বড় নয়। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে বড় নয়। পবিত্র কুরআনে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে সেই সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত যে পরহেযগার। লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র বা সম্পদে যে শ্রেষ্ঠ সে নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। এটাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত পথ নির্দেশনা।

ইসলামের পঞ্চম খুঁটি হলো রমজান বা সিয়াম। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান অবশ্যই রোজা রাখবে। রমজানের পুরো চন্দ্রমাস জুড়ে সূর্য অস্ত থেকে উদয় পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ ও পানি পান থেকে বিরত থেকে রোজা পালন করবে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারো।

পবিত্র কুরআনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রোজা রাখতে বলা হয়েছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা আমাদেরকে বলছে, যদি তুমি তোমার ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, তবে তুমি তোমার সব আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে এটাই বলা হচ্ছে যে, রমজান মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণ নিতে শেখায়। সব কাম, লালসা, লোভ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন রকম সুবিধা রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মদ পান থেকে বিরত থাকতে পারে সে খুব ভালোভাবেই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মদ পান না করে থাকতে পারবে। যদি কেউ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধূমপান না করে থাকতে পারে সে সব সময় ধূমপান না করে থাকতে পারবে। নিজেকে শুধরে নেয়ার এটি একটি সুযোগ। আমি এটিকে আত্মসমর্পণ বা আত্মশুদ্ধি বলি। যেভাবে আপনার ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো মেরামত করা হয় যেমন আপনি আপনার গাড়ি প্রতি তিনমাস পরপর বা চারমাস পরপর সাফাই করেন, মোটরগাড়ি সাফাই করেন ৫

মাস পর পর। তেমনি আপনি নিজেকে যদি যন্ত্রের সাথে তুলনা করতে দেন আমি বলবো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সাবলীল যন্ত্র হলো মানুষের শরীর। রমজান হলো মানুষের শরীর শুদ্ধির প্রত্যেক চন্দ্র বছরের এক চন্দ্রমাস। রমজান পালনে সালাতের চেয়ে আরো বেশি চিকিৎসীয় উপকার রয়েছে। আমি সেসব দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু যখন আপনি রোজা রাখেন সেটা আপনার হজম শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

এটাই হলো ইসলামের ৫টি স্তম্ভের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যদি আপনি স্মরণ করেন নবী করীম ﷺ বলেন, ইসলামের ৫টি মূলনীতি রয়েছে; পাঁচটি খুঁটি রয়েছে। অনেকে ভুল বুঝে যে, তারা এই ৫টি করতে পেরেছে সুতরাং তারা খুব ভালো মুসলমান। এটা হচ্ছে কেবল ৫টি খুঁটি। একজন প্রকৌশলী আপনাকে বলবে যদি খুঁটি মজবুত হয় তবে সম্ভবত কাঠামোও মজবুত হবে। যদি ভিত্তি শক্তিশালী হয় তবে ঘরের কাঠামোও শক্তিশালী হবে। সুতরাং যদি আমরা ৫টি খুঁটি ঠিকমতো পালন করি ইনশাল্লাহ আমাদের কাঠামো ঠিক থাকবে। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কী করা যাবে, কী করা যাবে না সেটি পবিত্র কুরআনে খুব স্পষ্টভাবেই রয়েছে। কীভাবে একজন মুসলিম তার জীবন পরিচালনা করবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল যারিয়াত-এর ৫৬ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ۔

অর্থ : আমার ইবাদাত করার জন্যে আমি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

এর অর্থ হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং জিন জাতিকে শুধু তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আরবি শব্দ ইবাদাতের মূল অর্থ কী? ইবাদাত শব্দটি এসেছে মূল আরবি শব্দ 'আবদ' থেকে যার অর্থ 'হুকুম পালনকারী'। অনেক মানুষের একটা ভুল ধারণা রয়েছে তারা মনে করে যে, ইবাদাত বলতে শুধু নামাজকে বুঝায়। কিন্তু ইবাদাত বলতে শুধু সালাতকে বুঝায় না। নামাজ ইবাদাতের অন্যতম একটি মূল অংশ। আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন সেটি করার নামই ইবাদাত। যদি তুমি মদের মতো খাবার খাওয়া ছেড়ে দাও এটাই এক ধরনের ইবাদাত। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদা-এর ৯০ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۔

অর্থ : হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য ছাড়া কিছুই নয়।

যদি তুমি তোমার ব্যবসায় সৎ থাকো, তবে তুমি ইবাদত করছো। তুমি আল্লাহর গুণাগুণ করছো। তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, এটাও তোমার জন্য

ইবাদাতস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, প্রতিবেশীর প্রয়োজনে সাহায্য করো। [সূরা আল মাউন]

যদি তুমি পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রাখো, কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বন্ধ রাখো তবে তুমি ইবাদাত করছো। আল্লাহর গুণগান করছো। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ

অর্থ : প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ রয়েছে। (সূরা হুমাযাহ, : ১)

পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাত-এর ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۔

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! পুরুষরা যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। কোন মহিলাও অপর মহিলাকে উপহাস করবেনা, হতে পারে উপহাসকৃতরা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হবে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

হে ঈমানদারগণ! বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ, কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গোনাহ। দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন গীবত না করে। এমন কেউ কি আছে। তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?

এটা মূলত কী বুঝায়? মৃত মাংস খাওয়া ইসলামে হারাম। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া দ্বিগুণ গোনাহ। এমনকি মানুষ যেসব পশুপাখি খায়, তারাও তাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খায় না। সুতরাং কুরআন বলছে যদি তুমি পরনিন্দা করো, অগোচরে তার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলো তা তোমার জন্যে দ্বিগুণ গোনাহ, কারণ সে নিজেকে সমর্থন করার সুযোগ পায় নাই। তাই কুরআন বলছে যদি তুমি পরনিন্দা কর, তুমি

কি তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে তৈরি আছো? এবং আল্লাহ তার উত্তর দিচ্ছেন অবশ্যই না। তুমি এটি বর্জন করো। সুতরাং তুমি যদি পরনিন্দা না করো এটাও আল্লাহর গুণগান করা, আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া সুতরাং তা ইবাদাত। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

অর্থ : তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না। এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে 'উহ' বল না, তাদেরকে ধমক দিওনা। তাদের সাথে নম্রতার সাথে কথা বলো, এবং তাদের জন্য দোআ করতে থাকো এই বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেরূপ দয়া কর যেরূপ আমার শিশুকালে তারা আমার প্রতি দয়া করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন : তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমকও দিও না এবং তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে ক্ষমা চাও এই বলে যে, হে আল্লাহ! তারা আমাকে ছোট বেলায় যেমন আগলে রেখেছিলেন তুমি যেন তাদেরকে তেমনভাবে রাখো।

তুমি তোমার পিতা-মাতাকে ভালোবাসো তাদের সম্মান করো তবে তুমি আল্লাহর গুণগান করছো। সন্ত্রাসবাদ, কৌমার্যব্রত ইসলামে নিষিদ্ধ। আমাদের প্রিয় নবী (সা) সহী বুখারীর ৭নং অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৪নং হাদীসে বলেছেন–

অর্থ : হে 'যুবকরা তোমাদের মধ্যে যাদেরই বিবাহ করার সামর্থ্য আছে তাদের বিয়ে করে ফেলা উচিত। এটা তোমার দৃষ্টিকে সংযত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে এবং তোমার ভদ্রতা বজায় রাখবে।' মুহাম্মাদ ﷺ আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

বিবাহ করা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরজ। সুতরাং যদি আপনি বিয়ে করেন তবে তা আল্লাহর ইবাদাত করার শামিল। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেন এবং স্ত্রী ব্যতিত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছায় যৌনমিলন থেকে বিরত থাকেন তবে আপনি আল্লাহর ইবাদাত করছেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ـ

অর্থ : আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না; নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। সুতরাং আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন করেন এবং ব্যভিচার না করেন তবে আপনি ইবাদাত করছেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে বলা হচ্ছে,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ : নারীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে আপনি অবশ্যই তাকে ভালোবাসবেন এবং সমান অধিকার প্রদান করবেন। আপনি যদি সংযত পোশাক পরিধান করেন এটাই ইবাদাত এটাই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা। সংক্ষেপে আল্লাহ প্রদত্ত যেকোনো আদেশ মেনে চলাই আল্লাহকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা। তুমি যদি সেই সব কাজ থেকে বিরত থাকো যা আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন তাহলে তুমি ইবাদাত করছো। ইসলাম আমাদের জীবনে দু ভাবে ভূমিকা রাখছে; প্রথমত, এটা শরীরের যত্ন নিতে সাহায্য করছে পাশাপাশি আত্মা পবিত্র করছে। ইসলামে এমন কোনো বিষয় নেই যা মানুষের ভালোর পরিপন্থী। মানুষ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ভাবতে পারে ইসলামের এই শিক্ষা ভুল। তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে কম জ্ঞান রাখে অথবা পৃথিবীর পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানে না। যার ফলে তারা চিন্তা করে ইসলামে একের অধিক বিবাহ করা জায়েয যা একটি ভুল শিক্ষা। কিন্তু যদি ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান আপনার থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক পরিসংখ্যান আপনার কাছে থাকে ইসলামের এমন কোনো শিক্ষা নেই যা মানুষের জন্য খারাপ। ইসলামের প্রত্যেকটি শিক্ষা হয় শরীরের জন্যে উপকারী অথবা মনের জন্যে। পবিত্র কুরআনে সূরা মুল্‌কের ২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط

অর্থ : তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।

এখানে আপনি যে জীবনটা অতিবাহিত করছেন এটি পরকালের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। এটা একটা পরীক্ষা যার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। যদি তুমি ব্যর্থ হও দোযখে যাবে। পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমার যুবক ক্বারী ভাই কামালী তার কথার শুরুতে বলেছেন। তিনি সূরা আল আসর-এর ১ থেকে ৩ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالْعَصْرِ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

অর্থ : কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের এবং তাগিদ করে সবরের।

এটাই একটা মানুষের জান্নাতে যাওয়ার চারটি বৈশিষ্ট্য। তাকে বিশ্বাসী হতে হবে, সৎকর্ম করতে হবে, পরস্পরকে সত্যের ও সবরের তাগিদ দিতে হবে; তাহলেই সে জান্নাতে যেতে পারবে। এর মধ্যে দু-একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে একজন মানুষের অবশ্যই এসব গুণ থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারাহ-এর ২৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে–

অর্থ : (ইসলাম) ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আপনাকে সত্য উপস্থাপন করতে হবে। এটি ইসলাম মেনে নেয় না যে আপনি কাউকে তরবারি বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করবেন। আপনি সত্য উপস্থাপন করুন, তিনি যদি মেনে নেন 'আলহামদুলিল্লাহ' ভালো। তিনি যদি স্বীকার না করেন বা মেনে না নেন আপনি তাকে বাধ্য করতে পারবেন না। আমি আয়োজকদের সাথে কথা বলে ঠিক করেছি যত সংক্ষেপে সম্ভব বক্তব্য উপস্থাপন করবো এবং অধিক সময় প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয় করবো। ইসলাম সম্পর্কে অনেক অমুসলিম বন্ধুদের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও। আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত অমুসলিম বন্ধুদের জন্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং আমি তাদের যেকোনো ধরনের প্রশ্ন, সেটি ভুল হোক, যত বোকার মতো প্রশ্ন হোক, অযৌক্তিক হোক অথবা আক্রমণাত্মক হোক আমি তা গ্রহণ করবো।

আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা যেকোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন, ইসলামের যেকোনো রকম সমালোচনা করতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি কুরআন সম্পর্কে জানেন তবে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধান করে নেয়ার এটা একটা সুযোগ। সাধারণভাবে আমি ধর্মীয় সভার চেয়ে

প্রশ্নোত্তর পর্ব বেশি পছন্দ করি, আপনার যেকোনো ধরনের প্রশ্নই হোক না কেন? কিছু মানুষের মনে প্রশ্ন থাকে, কেন মুসলমানদের একটার বেশি বিবি থাকে? কেন তারা শূকরের মাংস খায় না? কেন তারা খাৎনা দেয়? আপনার জন্য এটা একটা সুযোগ যেকোনো ধরনের প্রশ্ন সমাধান করে নেয়ার। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি রাগ হবো না। আপনারা যেকোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন ইসলামের এই শিক্ষা ঠিক নয়, এটা সম্পর্কে বলুন। আপনি এমনকি সমালোচনা করতে চাইলেও আমি তা গ্রহণ করবো। আমি যদিও যুবক তবুও তা গ্রহণ করবো এটাই আমার কাজ, আমার কাজের ক্ষেত্র। আমি আজ আমার সন্ধ্যার বক্তব্য পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল-এর ১২৫ নং আয়াত তেলওয়াতের মাধ্যমে শেষ করতে চাই–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! আপন পালন কর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তম রূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছেন।

[ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।]

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. আমি ভিয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছি। আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আমি প্রথমে এ ধরনের একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং এ ধরনের আরো অনুষ্ঠানের যদি আয়োজন করা হয় ও প্রচার করা হয়; তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানতে পারবো যা ইতিপূর্বে জানতাম না। আমার প্রশ্নটি হলো, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা। তাহলে কেন সালমান রুশদীকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে? শিয়া এবং সুন্নীদের মৌলিক মতবিশ্বাসের পার্থক্যটি ঠিক কোথায়? কোন বিষয়টি তাদেরকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ ভাই আপনি অত্যন্ত ভালো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইসলাম কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে? যদি তা করে তাহলে কেন সালমান রুশদীকে মৃত্যুর পরওয়ানা পাঠানো হয়েছে। ভাই, এর পরিপূর্ণ উত্তর আমার ক্যাসেটে দেয়া আছে। যা মুম্বাইর সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিক বিতর্ক সংগঠনের কাছে রয়েছে। দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস জার্নালিস্ট, মুম্বাই ইউনিট অব জার্নালিস্টে রয়েছে। বিষয়টি ছিল 'ধর্মীয় মৌলবাদ কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে একটি বাধা'। তাসলিমা নাসরীনের 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর যখন তার হত্যার হুমকি দেয়া হয় তখন এই আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সব বিস্তারিত বলা রয়েছে এবং সেই বিতর্কে একজন হিন্দু পাদ্রি, একজন খ্রিস্টান পাদ্রি, যিনি 'লজ্জা' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন তিনি এবং ইসলামের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম। সেটা একটা খুব ভালো বিতর্ক ছিল। সেখান থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিস্তারিত বিবরণ* আমরা পেয়েছিলাম। কিছু মানুষ বলে অন্যান্য ধর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আপনি ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো কিছু বলতে পারেন। আবার কিছু মানুষ বলছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধর্ম একটি বাধা। যখন আরেকজন বক্তা কেম্প বলেছিলেন, ইসলামে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। এটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আমি কোনো কিছু চাপা দিচ্ছি না। সংক্ষেপে আমি বলছি যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে উদাহরণস্বরূপ যদি একজন আরেকজনের সুনাম করে গুণগান গায়, ইসলাম সে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সম্মতি প্রদান করছে। যেহেতু সে কারও ক্ষতি করছে না এবং এটা প্রমাণিত।

পয়েন্ট নং ১. সে যেকোনো কিছু বলতে পারে যদি তা কারও ক্ষতি না করে। যদি তা কারও ক্ষতি না করে তবে সেটা ভালো।

পয়েন্ট নং ২. যদি সেটা কারও ক্ষতি করে, এটা দুটো বিষয় প্রমাণ এবং প্রমাণ ছাড়া। যদি সেটা কারো ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ পরনিন্দা করা।

পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে তোমরা কেউ কাউকে খারাপ নামে ডেকো না, পরনিন্দা করো না তাই সেটি প্রমাণিত হোক বা না হোক। শুধু অপবাদ দেয়ার জন্যে, এটা জায়েয নয়। আপনি যদি কারো বিরুদ্ধে প্রমাণসহ বলেন এটা গ্রহণযোগ্য আমি একটি কোম্পানিতে কাজ করি যেই কোম্পানিটি দুর্নীতিগ্রস্ত, আমি সে প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলতে চাই এ বিষয়ে ইসলাম আমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি সেখানে যেয়ে বলতে পারি এ কোম্পানিটি দুর্নীতি করছে, প্রমাণসহ বলতে পারি তারা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু আমি প্রমাণ ছাড়া বলতে পারি না, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্নীতিবাজ। যদি প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু বলি, সেটা আমার বলার অধিকার নেই। যদি আমি কোনো মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই, আমার কাছে অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে।

ইসলাম আবারও বলছে, আমি যদি কোনো মহিলা সম্পর্কে কিছু বলি, যেমন তার সতীত্ব নিয়ে অভিযোগ করি, তার শালীনতাবোধ এর বিরুদ্ধে কিছু বলি। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে আমাকে অবশ্যই চারজন সাক্ষী দেখাতে হবে, যদি আমি তা না দেখাতে পারি তাহলে আমাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। এর অর্থ আপনি আমেরিকা, ইউরোপের মতো মেয়েদের কটুবাক্য বলে ছাড় পেয়ে যেতে পারেন না। ইসলামে বলা হচ্ছে, আপনি যদি মেয়েদের সম্পর্কে কটুবাক্য বলেন, তাদের নামে খারাপ কিছু রটিয়ে দেন। আপনি যদি তা চারজন সাক্ষীসহ প্রমাণ করতে না পারেন তবে আপনাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ দেখাতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে যে, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান দুর্নীতিবাজ। যে মানুষদের ঠকাচ্ছে, আপনি এটি পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে তা প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করছে। আবার কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। যেমন, আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করি। আমি এর অনেক গোপন তথ্য প্রমাণসহ জানি। কিন্তু আমি এটা ইচ্ছে করলেই আমাদের শত্রুদের কাছে বিক্রি করতে যেতে পারি না। সুতরাং এখানে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বৈধ নয়। যদি এটা মানুষের ক্ষতি করে, সরকারের বিরুদ্ধে যায়। যদিও আমি এটা কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আমাদের বিরোধী বা শত্রুদের কাছে বিক্রি করে নিজে অনেক মুনাফা অর্জন করি। কারণ, আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

সুতরাং মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেটি কোন ধরনের তথ্য বা মতামত তার উপর নির্ভর করে। আপনি যদি মনে করেন, আমি যে কাউকে অপবাদ দিবো, আমি কারো বিরুদ্ধে কটুকথা বলবো এবং তারপর বলবো এটা আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলাম এসব করতে অনুমতি দেয় না। আপনি যদি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সালমান রুশদীর বইটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন একই বিষয় ঘটেছে। আমি এ বিষয়ের ওপর আমার মতামত প্রকাশ করেছি। আপনি সেই ভিডিও ক্যাসেটটিরও কথা বলতে পারেন যেখানে আমেরিকা থেকে একজন মানুষ এসেছিল এবং তিনি মার্গারেট থেচার'স পলিসি সম্পর্কে চার বর্ণের একটি শব্দ বলেছিল এবং যখনি সে মার্গারেট থেচার-এর বিরুদ্ধে কিছু বলেছিল ইংল্যান্ড তাকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছিল। যদিও ইংল্যান্ড মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুতরাং এই সালমান রুশদী, যাকে আমি চিনি, সে আবারো ভুল করছে, সে আমাদের নবী করীম ﷺ-কে কটাক্ষ করছে, আমাদের সম্পর্কে কটুবাক্য বলছে, সে কটুকথা বলছে এবং ভুল করছে। সে সমস্ত মানবতাকে কটাক্ষ করেছে। হয়তো মানুষ তার বই পুরোপুরিভাবে পড়েনি। যা সে বলেছে আমি সেগুলোও বলতে চাচ্ছি না। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় সে সৃষ্টিকে কটাক্ষ করেছে। আমি সেই শব্দটি ব্যবহার করতে চাচ্ছি না কারণ, সেটা একটি আক্রমণাত্মক শব্দ। সে তাকে Magi (ম্যাগী) বলেছে, সে তাকে মহিলা কুকুর বলেছে। ইসলাম আপনাকে এসব বলার অনুমতি দেয় না। আপনি কি তাকে 'মহিলা কুকুর' কি জন্যে বলছেন তা প্রমাণ করতে পারবেন? আমি সেই সব শব্দ ব্যবহার করতে চাচ্ছি না যা তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে Magi ম্যাগী বলেছেন যা Margarat Thatcher (মাগারেট থ্যাচার)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তার বইয়ে তিনি এমন কি রাম এবং সীতাকেও কটাক্ষ করেছে যা মানুষ জানে না।

আমি এটা বলতে চাই না ঠিক কি বিষয়ে রাম এবং সীতা সম্পর্কে লিখেছে। আমি যেটি করতে চাই তা হলো রাজীব গান্ধীকে স্বাগত জানাতে চাই। কারণ, তিনি পৃথিবীর মধ্যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রথমেই তার বই অবাঞ্চিত ঘোষণা করেছেন। আমি সত্যিই তাকে ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানিয়ে। তিনি হয়তো জানেন না যে, এ বইয়ের মধ্যে রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। হয়তো রাজীব গান্ধী জানতেন না সালমান রুশদী রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করেছেন। আমি বইটি পড়েছি এবং চিন্তা ভাবনা করেও দেখেছি এটা ভারতের নিষিদ্ধ করা উচিত। আমি খুব ভালোভাবে বইটি পড়েছি এবং পড়ার পর নিশ্চিত হয়েই একথা বলছি। সুতরাং যদি কেউ কাউকে এমনকি আপনার মা বা বোনকে কোনো প্রমাণ ছাড়া কটুবাক্য বলে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এটি বাইবেলেও রয়েছে, আপনি যদি এটা পড়েন তাহলে দেখবেন Leviticus (লিভিটিকাস) বইয়ে বলা হচ্ছে 'যদি কেউ

ঈশ্বর বা ধর্মমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ কথা বলে তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাথর মারো। সুতরাং যদি কেউ অন্যায়ের চরম সীমায় পৌঁছে যায় তবে আপনি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। তাই যদি কেউ কোনো প্রমাণ ছাড়া, কোনো কিছু ছাড়াই কাউকে কটাক্ষ করে, ইসলাম তাকে সে অনুমতি দেয় না। এজন্যেই কেউ কেউ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা কখনও কখনও জীবননাশের হুমকি দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে ৪টি বিকল্পের কথা বলা হয়েছে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

চারটি পথ, হত্যা করা, শূলীতে চড়ানো, হাত পা কেটে নেয়া অথবা বহিষ্কার। দেখুন অত্যন্ত কঠিন শাস্তি, কিন্তু কেন? কারণ, দেখুন ইসলামে কেউ অন্যায় সুবিধা নিতে পারে না। কেউ যদি জিনা করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অনেকে ভাবে এটা একটি বর্বরচিত আইন। অনেকে বলে আধুনিক বিজ্ঞানের এই যুগেও মৃত্যুদণ্ড কেন? দেখুন সব ধর্মই ভালো কথা বলছে। হিন্দু ধর্ম বলছে আপনি কোনো মেয়েকে কটাক্ষ করবেন না, কোনো নারীকে ধর্ষণ করবেন না। খ্রিস্টান ধর্মও তাই বলছে ইসলাম ধর্মও।' ইসলামের ভিন্নতা হলো আপনি কিভাবে এমন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করবেন যেখানে কেউ একজন নারীকে ধর্ষণ করবে না। কোন পুরুষ যখন কোনো মহিলার দিকে তাকান এবং তার মনে খারাপ কোনো চিন্তা আসার আগেই যেন তিনি দৃষ্টি নামিয়ে নেন। যখন সে কোনো নারীর দিকে তাকাবে কুরআন বলছে, সে যেন তার দৃষ্টি সংযত করে। মহিলার জন্যে এটাই পুরুষের 'হিজাব'। আর নারীরা অবশ্যই সারা শরীর খুব ভালোভাবে ঢেকে রাখবে। কেবল দুটি অংশ বাইরে থাকবে তা হলো তার মুখমণ্ডল এবং হাতের কজির পূর্ব অংশ পর্যন্ত। যদি দুই জমজ বোন কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এবং একজন ইসলামিক হিজাব পরিধান করে যা তার পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে, শুধু তার মুখ এবং কজির ওপর অংশ পর্যন্ত হাত ছাড়া এবং অন্য বোন যদি স্কার্ট এবং মিনি পরিধান করে এবং যদি তারা সমান সুন্দরী হয় তাহলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাস্তান দ্বারা কে কটাক্ষ শুনবে? অবশ্যই যে বালিকা স্কার্ট ও মিনি পরিধান করেছে সে। পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে মুসলমান নারীদের হিজাব (বোরকা) পরতে বলা হচ্ছে–

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ـ

অর্থ ঃ এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।

আমেরিকাতে প্রত্যেক দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয় এবং যদি কেউ ধর্ষণ করে তাহলে ইসলাম বলছে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে। অনেকে এটিকে বর্বরচিত আখ্যায়িত করেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, যদি কেউ আপনার বোন বা স্ত্রীকে কেউ ধর্ষণ করে। আর আপনি তার বিচারক হন; আপনি কি করবেন? তাদের অধিকাংশই বলেন, আমি ধর্ষককে হত্যা করবো। তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবো। কেউ কেউ এমন আক্রমণাত্মক হয়ে যায় যে, বলে তাকে পিটিয়ে হত্যা করবো। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই "যে আমেরিকায় প্রত্যেক দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয়। সেখানে যদি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সব মহিলার সারা শরীর ঢেকে চলাফেরা করে পাশাপাশি পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করে। তাহলে ধর্ষণের মাত্রা কি বাড়বে, কমবে, না অপরিবর্তিত থাকবে? এটা অবশ্যই কমবে। সৌদি আরবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ। প্রত্যেক ধর্মই ভালো কথা বলে, আর ইসলাম আপনাকে ভালো কথা বলার পাশাপাশি পথ দেখায় কিভাবে সে ভালো অর্জন করতে হয়। এজন্যেই ইসলাম মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে না। কেউ আমার মা সম্পর্কে কটাক্ষ করতে পারবে না সেটি মুসলিম দেশ হোক আর অমুসলিম দেশ হোক। হ্যাঁ আমি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছি কিন্তু তা অবশ্যই মানুষের জন্যে উপকারী হতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা বনি ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ ঃ বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের কল্যান বয়ে আনে তবে সেই মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম স্বাধীনতা দেয়। যদি তা মানুষের জন্যে খারাপ হয়, ইসলাম অনুমতি দেয় না।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে আপনি জানতে চেয়েছেন শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে বিশ্বাসগত মত পার্থক্য ঠিক কোথায়? ভাই, পার্থক্যটি হলো রাজনৈতিক পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে শিয়া এবং সুন্নীর মত আলাদা আলাদা করে আসলে উল্লেখ নেই। পবিত্র কুরআনের কোনো জায়গায় 'শিয়া' বা 'সুন্নীর' কথা আলাদাভাবে নেই। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

অর্থ ঃ আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

ইসলামে 'শিয়া', 'সুন্নী' মত বলতে কিছু নেই। এগুলো পরবর্তী বর্ষে এসেছে ইসলামের ভেতরে রাজনৈতিক পার্থক্যের ভিত্তি ধরে। মুসলিম এক এবং একমাত্র সারি। মুসলিমদের ভেতরে কোনো বিভাজন নেই। 'শিয়া', 'সুন্নী' বা অন্য যেকোনো কিছুর মত। কারণ পবিত্র কুরআনে সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ -

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।

এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্মের বিভাজন বা খণ্ডীকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই 'শিয়া' এবং 'সুন্নী'দের মধ্যে যে পার্থক্য এটি কোনো ধর্মীয় পার্থক্য নয়। এটা একটি রাজনৈতিক পার্থক্য। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের সদুত্তোর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২. মাননীয় ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ, শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম বালাচন্দন, আমি মুম্বাই শহরের একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকুরি করি। ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আমার প্রশ্ন, যে রকম আজকের দুনিয়া ধারণা করে যে, ভারতীয় মুসলমানদের ২টি পরিচয় রয়েছে। একটি হলো ধর্মীয় পরিচয় যেটা তারা পেয়েছে মুসলমান হওয়ার কারণে, আর তা হলো তারা মুসলিম এবং অন্য পরিচয় হলো বিধিসম্মত/আইনত পরিচয়, যা মূলত "হিন্দু উপাদান" দ্বারা গঠিত, এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের মনে বিশেষত তাদের মধ্যে কতিপয় মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। আমি বিস্তারিতভাবে না বলে সংক্ষেপে বললে-- আমার কিছু বন্ধু আছে তাদেরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা স্বভাবগতভাবেই হিন্দু আদর্শের মনে হয়। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে রাশিফল নিয়ে জ্যোতিষ চর্চা করে। মুসলমান বন্ধু, মানুষ যাদের "রাহকালাম" ভাবে। সুতরাং এটি কি মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না? এখানে কি কোনো দ্বন্দ্ব থাকার কথা ছিল– এই দ্বন্দ্ব কি চলতে থাকবে? কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে? আপনি কি তাদের এই বলে চালিয়ে দিবেন যে, তারা আপনার চেয়ে কম ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন মুসলিম। আমি আশা করবো ডা. জাকির নায়েক এ বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দিবেন।

উত্তর ঃ ভাইজান একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন, ভারতীয় মুসলমানদের প্রসঙ্গে। এটি এমনই এক প্রশ্ন যা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো মুসলমানদের ব্যাপারে করা যেতে পারে যে, যদি তুমি একজন মুসলিম হও তবে তুমি কি অন্য ধর্মের,

অন্য জাতির, অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য সংস্কৃতির কোনো বিষয়কে অনুসরণ করতে পারো হোক সেটি ভারত বা আমেরিকা বা ইউরোপের কোনো একটি দেশ। মূলত 'মুসলিম' এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সমস্ত ইচ্ছে বিসর্জন দেয়। আমরা ভারতীয় বা আমেরিকান বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে পারবো, যদি এটি ইসলামের মূলনীতির বিপরীত না হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'মানুষ প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে একজন মুসলিম মহিলা কি শাড়ি পরতে পারবে। যেহেতু এটি ভারতীয় সংস্কৃতি? উত্তর হচ্ছে– হ্যাঁ, তিনি পরতে পারবেন, যদি তিনি পাঁচটি বিষয় মেনে চলেন। ইসলামে পর্দার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি বিষয় হলো– ১. তার মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত ছাড়া বাকি শরীর ঢাকা থাকতে হবে। ২. যে কাপড় সে পরিধান করবে সেটি অবশ্যই ঢিলা-ঢালা হতে হবে, টাইট হওয়া যাবে না যাতে এটি শরীরের ভাঁজকে প্রকাশ করে। ৩. এটি এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে কাপড় ভেদ করে শরীর দেখা যায়। ৪. এটি এতটা আকর্ষণীয় হওয়া যাবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গকে মোহনীয় করে। ৫. এই কাপড়টি বিপরীত লিঙ্গের সদৃশ হওয়া যাবে না।

এখন যদি আপনি শাড়ি পরতে চান তবে ইসলামী পদ্ধতি হলো– যেটি আপনি পরবেন সেটি যাতে আপনার মাথা ঢাকতে পারে, যাতে আপনার মাথার চুল দেখা না যায় এমনকি পেট দেখা না যায়, সাথে সাথে শরীরের অন্য কোন অংশও যাতে দেখা না যায়। যদি আপনি এটি অনুসরণ করতে পারেন, তবে আপনি ভারতীয় সংস্কৃতি অনুকরণ করতে পারেন, কোনো আইন ভঙ্গ করা ব্যতীত। কিন্তু যদি আপনি বলেন, আমি এমনভাবে শাড়ি পরবো যাতে কোন ব্লাউজ থাকবে না এবং পেট দেখা যাবে, তবে এক্ষেত্রে ইসলাম শাড়ি পরার অনুমতি দেয় না। একইভাবে আপনি যদি আমেরিকাতে বলেন, যে আমি স্কার্ট বা মিনি স্কার্ট পরতে চাই, সেক্ষেত্রেও ইসলাম অনুমতি দেবে না। সুতরাং আপনি ইসলামের শিক্ষার বিপরীতে না গিয়ে অন্য যেকোনো সংস্কৃতির অনুসরণ করতে পারবেন, ইসলামে এক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কারণ আমাদের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত আদর্শ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জাতিকে সার্বিক সহায়তা করতে হবে, তবে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং লালন পালন করে চলছেন তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সুতরাং আমাদেরকে তার কৃতজ্ঞতাপাশেই আবদ্ধ থাকা উচিত, বিশ্বের অন্য যে কারো চেয়ে যেকোন সরকারের চেয়ে। তবে আমাদেরকে অবশ্যই মানুষকে সম্মান করতে হবে। যদি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হয় তবে আপনি এ ধরনের সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারবেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আপনি বলেছেন, আমরা কি ভাগ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি? এ ব্যাপারে আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারণী তীর এগুলো অত্যন্ত ঘৃণ্য শয়তানি কাজ সুতরাং তোমরা এটি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক, তবেই আশা করা যায় যে তোমরা সফলকাম হবে।

আমি বলছি না যে কেউই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারে বা পারে না– অধিকাংশ মানুষ যারা বলে, তারা ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে, তারা একটু বেশিই বলছে। কুরআন এটি বলেনি যে, কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে বা মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। তবে কিছু মানুষ এমন থাকতে পারে যারা এই বিজ্ঞান শিখেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ যারা সেসব লোকদের কাছে যায়, তারা সবাই বলে যে আমি যার কাছে গিয়েছি, তিনি একজন ভালো জ্যোতিষী। আসলে তাদের অধিকাংশই প্রতারিত হয়। ঐ সমস্ত জ্যোতিষীর কাছে কম্পিউটার থাকে, সেখানে আপনি আপনার বয়স প্রবেশ করাবেন, আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে আমেরিকাতে এক জরিপ হয়েছিল সেখানে মনোবিজ্ঞানের এক প্রফেসর তার ক্লাসের ১০০ ছাত্রকে নিয়ে এক সপ্তাহ যারত চিন্তা-ভাবনা করলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রত্যেকের স্বভাব এক একটি চিরকুটে লিখে দিতে পারবো। তারপর তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকের হাতে তাদের চিরকুট দিলেন। তিনি এবার তাদেরকে বললেন, সবাই একসাথে চিরকুট খোল এবং তোমাদের মতামত বলো আমার ধারণা কি সত্য না মিথ্যা।

সুতরাং প্রফেসর লিখলেন যেমন ছাত্র 'A' এবং তার স্বভাব ও তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেককে তিনি একটি চিরকুট দিলেন। তারপর প্রফেসর বললেন, 'এখন চিরকুট খোল এবং পড়' তৎক্ষণাৎ সবাই চিরকুট খুলে পড়তে লাগলো এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৯০-৯২ শতাংশই বললো যে 'প্রফেসর ১০০% সঠিক। বাকি ৮-৯% বললেন প্রফেসর ৯৫% সঠিক। এবার প্রফেসর বললেন, 'আমি সবার জন্য একই কথা লিখেছি।' সুতরাং আমি যদি বলি 'আগামী একমাসের মধ্যে আপনার জন্য খারাপ কোনো সংবাদ আছে' যদিও সেখানে সহস্রাধিক ভাল জিনিস থাকে তথাপি দুই-একটি খারাপ সংবাদ তো থাকবেই। আর আমি যদি বলি 'বিগত বছরে আপনার ভাল কোনো ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে সহস্রাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল তথাপি সে সময় দু-একটি ভালো ঘটনা তো ঘটতেই পারে।'

সুতরাং এইসব অস্পষ্ট বক্তব্য, যেগুলো সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে। সুতরাং যখন আপনি পত্রিকায় পড়েন যে আজ তুলা রাশির এই এই হবে, সিংহ রাশির এই এই

হবে........এগুলো সব মানুষের মধ্যে কেবল এক ধরনের উত্তেজনাই সৃষ্টি করে। সুতরাং আল-কুরআন বলেছে 'প্রশ্রয় দিয়ো না'। এমন কিছু লোক থাকতে পারে যারা বিশেষজ্ঞ আমি বলছি না 'না'। বরং কুরআন বলে যে 'যদি তুমি এমন জিনিস জান যা তোমার জানা উচিত নয়'.......এটি কিভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিকর? কুরআন এ প্রসঙ্গে বলেছে, 'ভবিষ্যদ্বাণী করা থেকে বিরতো থাক; কিন্তু কেন? কারণ যা তোমার জানা উচিত নয়, এখন এটি তোমার ক্ষতির কারণ হবে যদি তুমি এটি জানতে আস। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি জ্যোতিষির কাছে যান এবং সে যদি বলে 'আপনি কোনো একটি ব্যাপারে অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছেন।' এই লোকটি বা ছেলেটি সর্বদা আগে ক্লাসে আসে, যেহেতু জ্যোতিষি বলেছে 'তুমি ব্যর্থ হবে' তাই সে পড়াশুনা ছেড়ে দিল এবং সে অকৃতকার্য হলো। এবার ভাবুন সে কাকে দোষারোপ করবে?......সে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দোষারোপ করবে। দেখুন জ্যোতিষিটি কি সমস্যা সৃষ্টি করলো। এখন দেখা যাবে যে, জ্যোতিষির কথা সত্যি হবে, কিন্তু কেন? কেননা জ্যোতিষির ওপর লোকটির অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু লোকটি যদি তার কথা বিশ্বাস না করে পড়াশুনা করতো তবে সে পাস করতো। সেজন্যই ইসলাম বলেছে, কুরআন বলেছে, 'ভবিষ্যৎবাণী করাকে প্রশ্রয় দিয়ো না।' যদি কোন মুসলমান এ কাজটি করে তবে সে নিশ্চিতভাবেই কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করলো– সে অবশ্যই ভালো মুসলিম নয়, সে ইসলামের এই নীতি অনুসরণ করলো না, ইসলামের অন্য সব নীতি হয়তো সে পালন করে থাকতে পারে।

প্রশ্ন ৩. 'ইসলাম' ও 'হিন্দুত্ববাদ' আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কী কী? পবিত্র কুরআন বলেছে, 'আল্লাহই প্রথম এবং তিনিই শেষ।' হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, 'আল্লাহ এক.........তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর ঃ ভাইজান, খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন যে, 'ইসলাম' এবং 'হিন্দুত্ববাদ'-এর মধ্যে মিল কী কী? এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য কী? আমি নিজে পড়েছি হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, 'আল্লাহ এক........তিনি সর্বত্র উপস্থিত'। পবিত্র কুরআনও বলেছে, 'তিনিই শুরু তিনিই শেষ'। কিন্তু আপনি যদি এ দু আদর্শের মধ্যে প্রধান পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে চান তবে আপনি একজন হিন্দুকে প্রশ্ন করুন 'আপনি কতজন দেবতাকে পূজা করেন?' কেউ হয়তো বলবেন তিনজন, কেউ বলবেন দশজন, কেউ হয়তো বলবেন একশো জন, আবার কেউ বলবেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি আপনি একজন শিক্ষিত হিন্দুকে প্রশ্ন করেন যেমন কোনো আইনজীবী যিনি সাধারণত খুব পটু হন তাদের ধর্মগ্রন্থে যে 'হিন্দুরা কতজন দেবতাকে পূজা করে?' তারা আপনাকে বলবে 'একজন'–কিন্তু তারা বিশ্বাস করে 'এনথ্রোপোসরফিজম' নামক দর্শনতত্ত্বে যার অর্থ 'দেবতা সর্বশক্তিমান'। এ দর্শনটি কেবল হিন্দু ধর্মেই নয় বরং অন্যান্য ধর্মেও আছে........যেমন খ্রিস্টান ধর্ম, এ ধর্ম বলে যে, 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান– তিনি এত খাঁটি, এতই পবিত্র যে তিনি জানেন না

যখন তিনি আহত হন বা যখন কেউ তাকে সমস্যায় ফেলে তখন মানুষ কিভাবে অনুভব করে। সুতরাং সর্বশক্তিমান মানুষ রূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন মানুষের জন্য আইন কানুন রচনা করার জন্য যে কোন্‌টি মানুষের জন্য ভাল আর কোন্‌টি খারাপ।

এই দর্শনের দিকে তাকালে মনে হয় এটি খুব ভালো যুক্তি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ এতো পবিত্র যে তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ম-কানুন স্থির করে দেন– তিনি পৃথিবীতে আসেন কেবল মানব জাতির চলার পথের নিয়ম কানুন বেধে দিয়ে পৃথিবীকে শান্তিতে রাখার জন্য কেননা তিনি খুব পবিত্র, তিনি এতোই পবিত্র যে মানব জাতির জন্য কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি খারাপ তা তিনি জানেন না। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– ধরুন আমি একটি ভিসিআর (ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার) তৈরি করেছি– আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি কি জানতে পারবো, কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ? না, কারণ আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, 'যখন তুমি ক্যাসেট চালু করতে চাও, তবে ভিডিও ক্যাসেট প্রবেশ করাও Play বাটন চাপ দাও তবেই এটি চালু হবে। Stop বাটন চাপ দাও, তবে ক্যাসেট বন্ধ হয়ে যাবে। উঁচু থেকে এটি ফেলে দিও না, তবে ভেঙ্গে যাবে। এটিকে পানিতে ফেলো না এটি নষ্ট হয়ে যাবে– এরকম আমি নির্দেশনা পত্র লিখে দিয়েছি।

এখন যদি আপনি বলেন, মানুষও একটি মেশিনের মতো, আমি বলবো এটি সবচেয়ে জটিল মেশিন। তবে কি এটি চালু করার জন্য বা চালানোর জন্য কি নির্দেশনাপত্র দরকার নেই? আর মানব জাতির জন্য কুরআন হলো সেই নির্দেশনা পত্র। কুরআন বলে এটি 'করো' এটি 'করোনা'। মানুষের জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে যে কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি খারাপ। সাধারণত হিন্দুরা বিশ্বাস করে 'পেনথেইজন' দর্শনে তার মানে হলো 'সব কিছুই ঈশ্বর'। তাই প্রায় সব হিন্দুই বলে, গাছ আমাদের প্রভু, সূর্য আমাদের প্রভু, চাঁদ আমাদের প্রভু, মানুষও আমাদের প্রভু, এমনকি বানর, সাপও আমাদের প্রভু।

কিন্তু হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো মুসলমানরা বলে, 'Everything is God's' মানে সবকিছু আল্লাহর। আর হিন্দুরা বলে, 'Everything is Gods' মানে সব কিছুই প্রভু/দেবতা। আমরা যদি এই God's এর মধ্যে s এর উদ্ধরণ চিহ্নের সমাধান করতে পারি তবে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্র হতে পারে। তুমি এটি কিভাবে পারবে? পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই'...... আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে রব স্থির করবো না, তারপরও যদি তারা বিমুখ হয় তবে তোমরা বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক আমি মুসলিম (মান্যকারী)। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে আপনি কিভাবে একই এবং অভিন্ন অবস্থানে আসবেন? আপনি যদি 'ভগবদগীতা' পড়েন, দেখবেন এটি বলেছে, 'এ সমস্ত মানুষ যারা উপদেবতার পূজা করে, অলীক দেবতারপূজা করে তারা বস্তুবাদী মানুষ; কে এটি বলেছে? ভগবতগীতার ৭নং অধ্যায়ের ১৯-২৩নং পংক্তিতে এটি বলা হয়েছে। হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'ইয়ায়ুরভেদ'-এর ৩২নং অধ্যায়ের ৩নং পংক্তিতে বলা হয়েছে, 'ঐ সকল দেবতাদের কোনো আকার নেই'। এই 'ইয়ায়ুরভেদের' ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'দেবতারা কোনো আকারবিহীন, শরিক নেই, তার কোনো গঠন নেই'। ইয়ায়ুরভেদ ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'ঐ সমস্ত লোক যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের পূজা করে যেমন– বাতাস, পানি, আগুন, তারা অন্ধকারে রয়েছে, তারা আরো গভীর অন্ধকারে পড়তে যাচ্ছে। আর ঐ সব লোক যারা 'সামভূতি' তথা সৃষ্ট জিনিসের পূজা করে এসব লোকের ক্ষেত্রে আমি কুরআন থেকে উদ্ধৃতি করছি না আমি ইয়ায়ুরভেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "যদি তোমরা পূজা করো 'সামভূতি' তথা 'সৃষ্ট জিনিসের'– চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তবে তোমরা অধিক অন্ধকারে পতিত হবে।'

সব বেদগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পূজনীয়, সম্মানিত গ্রন্থ ঋগবেদ-এ বলা হয়েছে, 'দেবতা কেবল একজনই, দ্বিতীয়টি নেই, মোটেই নেই, মোটেই নেই, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রও নেই।' ঋগবেদের ৮নং খণ্ডের ১ নং অধ্যায়ে ১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'সমস্ত প্রশংসা কেবল তারই জন্য।' যেমনটি কুরআনের সূরা ফাতিহার ১ম আয়াতে বলা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।' ঋগবেদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'দেবতা কেবল একজনই.......শুধু তারই পূজা করো।' যেমনটি কুরআনের সূরা ইখলাসের ১নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে নবী আপনি বলুন। আল্লাহ্ একক।

সুতরাং যদি আমরা হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ি এবং বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা জানবো বিভিন্ন ধর্মের সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ স্রষ্টার 'একত্ববাদ' সম্পর্কে একই কথা বলেছে– আর তা হলো 'এক স্রষ্টা'। সুতরাং যদি আমরা এগুলো অধ্যয়ন করি এবং যদি আমরা Everything is God's এবং Everything-এর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝি.......তবেই হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম এক হতে পারে।

প্রশ্ন ৪. আপনি আপনার বক্তৃতার শুরুতে কুরআনের ১টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে শুধু চন্দ্রই পরিভ্রমণ করছে না এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে সূর্যও পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু আপনার এ বক্তব্য মনে হয় প্রাচীন বিশ্বাসের সাথে মিলে যাচ্ছে, যে পৃথিবী ঘুরছে এবং সমস্ত স্বর্গীয় সত্তা সূর্যসহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এটি হচ্ছে 'জিও-সেন্টিক' তত্ত্ব–আপনি জানেন যে সমস্ত নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে–এই তত্ত্বের অধীনে,

যেখানে পৃথিবী সমস্ত কিছুর কেন্দ্র। সুতরাং আপনার বক্তব্য কি এই প্রাচীন মতো-বিশ্বাসের সাথে মিলে যাচ্ছে না?

উত্তর ঃ ভাইজান, চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন। আর এই জন্য আমি আপনাকে আমার 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান– দ্বন্দ্ব না আপস নামক ভিডিও ক্যাসেটের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এটি একটি চার ঘণ্টার ক্যাসেট, যেটা মুম্বাইতে পাওয়া যায়। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাকে সংক্ষেপে বলতে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংক্ষেপে এটি বুঝানো কঠিন এবং ভাই সঠিকই বলেছেন যে, এরকম একটি তত্ত্ব ছিল যা টলেমি প্রদান করেছেন খ্রিস্ট পূর্ব ২য় শতাব্দীতে যেটি 'জিওসেন্ট্রিজম' নামে পরিচিত। 'জিওসেন্ট্রিজম' মানে হলো– 'পৃথিবী হলো মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ এমনকি সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতো'– যেটা কুরআনের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরী সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে ভাইজান যেটি বলেছেন আমি কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : তিনিই সেই (মহান) আল্লাহ, 'যিনি দিন এবং রাত্রি সৃষ্টি করেছেন আরো সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র ও সূর্য, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে, (নিজস্ব গতিতে)।

এখানে বলা হচ্ছে সূর্য এবং চন্দ্র প্রত্যেকেই একটি কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্ট গতিতে তার মানে উভয়েই তাদের নিজ নিজ গতিতে তাদের আপন কক্ষপথে ঘুরছে। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'ইয়াসবাহুন' নামক আরবি শব্দটি বুঝায় 'গ্রহ বা নক্ষত্রের চলার পথের গতি'। এটি চক্রাকারে ঘুরছে ও পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু কুরআন এটি বলেনি যে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণ করছে। আজ বিজ্ঞান অনেক উন্নতি লাভ করেছে তাই আগের দেয়া তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান বলে সৌর জগতের কেন্দ্রে বাস করে সূর্য। বিভিন্ন গ্রহ যেমন মঙ্গল, পৃথিবী, বৃহস্পতি ইত্যাদি সবাই তাকে আবর্তন করছে। কিন্তু সূর্য নিজেও আপন গ্যালাক্সির চতুর্দিকে ২০ কোটি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে। যদি আপনি এই সর্বশেষ তত্ত্বটি জানেন যে সৌরজগৎ তার আপন গ্যালাক্সির একটি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ঘোরে এমনকি গ্যালাক্সিও মহাবিশ্বকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সুতরাং কুরআন বলেনি যে সূর্য ও চন্দ্র সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে– যে রকম তাসলীমা নাসরীন অপব্যাখ্যা করেছে। সে বলেছে– কুরআন বলে যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সে যেরকম অপব্যাখ্যা দিয়েছে এরকম একটি বক্তব্যও কুরআনে নেই। পবিত্র কুরআন বলেছে সূর্য এবং চন্দ্র পরিভ্রমণ করছে এবং চক্রাকারে ঘুরছে। কুরআন বলেনি যে, এগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে

যেটা তাসলীমা নিজে সংযোজন করেছে। ছোট বেলায় আমি যখন স্কুলে পড়ি, আমি ভাবতাম সূর্য পরিভ্রমণ করে........এটি আবর্তন করে না বরং এটি স্থির।

আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে আপনি সূর্যের ছবি দেখতে পারেন টেবিলের ওপর। যেহেতু আমরা সূর্যের প্রতি সরাসরি তাকাতে পারি না, সুতরাং আপনি টেবিলের ওপর তার ছবি দেখতে পারেন এবং আমরা জানতে পারবো সূর্যের কালো দাগ পড়বে। এবং একবার প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের কালো দাগগুলোর প্রায় ২৫ দিন দরকার হয়। সুতরাং বিজ্ঞান যা বলেছে আজ তা প্রমাণিত হয়েছে, স্কুলে আমি জানতাম না। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে সূর্য আবর্তন করে এবং চক্রাকারে ঘোরে যেটি কুরআন ১৪০০ বছর আগেই বলে গেছে। কুরআনে এমন একটি বাক্যও নেই যা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিপরীতে যায়। কিন্তু কিছু তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো কুরআনের সাথে বিপরীতমুখী অবস্থানে আছে যেমন ডারউইনের তত্ত্বসমূহ, পরবর্তীতে যেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ঐসব তত্ত্বসমূহ যেগুলো আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এমন একটি তত্ত্বও কুরআনের একটি আয়াতেরও বিপরীতে যায় না। আশা করি উত্তরটি ভাইজানকে সন্তুষ্ট করবে।

প্রশ্ন ৫. ইসলাম কেন অনিরামিষ খাদ্য বা আমিষ খাদ্য খেতে পরামর্শ দেয়? এবং কেন রাজনীতিবীদরা ধর্মীয় ব্যাপার টেনে আনে (রাজনীতিতে)? ধর্ম কি রাজনীতি ছাড়া স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না?

উত্তর ঃ ভাইজান ২টি প্রশ্ন করেছেন। ২য় প্রশ্নটি হলো ইসলাম ও রাজনীতি সম্পর্কিত.......ধর্ম কি রাজনীতি ব্যতিত অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে? ভাইয়েরা পূর্বেই আমি বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে অবশ্যই রাজনীতি আছে তবে আধুনিক যুগের মতো রাজনীতি নেই যেখানে সবাই তার পকেট ভরার কাজে ব্যস্ত থাকে; সুতরাং ইসলাম বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী। কিন্তু ইসলামে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু আমি আগেই বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আপনি একজন ভালো মুসলিম হতে পারবেন না– একজন ভালো পার্থিব মানুষ হওয়া ব্যতিত। সুতরাং ইসলাম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে রাজনীতির কথা বলেছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ইসলাম আধুনিক যুগের রাজনীতি থেকে অনেক দূরে। ইসলাম নিশ্চয়ই ঐসব রাজনীতির বিরুদ্ধে যেখানে সবাই চেষ্টা করে তাদের পকেট পূর্ণ করতে– এক্ষেত্রে তাদের পকেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, তাদের অধিকার তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার প্রথম প্রশ্ন প্রসঙ্গে বলি যেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা প্রশ্নোত্তর সেশনের পরই ডিনার করবো। আপনি প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলাম আমিষ খাবারের অনুমতি দিয়েছে? এটি একটি ভালো প্রশ্ন। আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতসমূহ নিয়ে যেমন গরু, ছাগল এবং ভেড়া তারা শাকসবজি খায়।

আপনি যদি মাংশাসী প্রাণীর দাঁত নিয়ে বিশ্লেষণ করেন, যেমন : সিংহ, বাঘ অথবা চিতা তাদের সবার রয়েছে সূচালো ও তীক্ষ্ণ দাঁত, তারা কেবলই আমিষ খাবার গ্রহণ করে। আপনি যদি এবার মানুষের দাঁত নিয়ে চিন্তা করেন তবে দেখবেন মানুষের রয়েছে সূচালো ও তীক্ষ্ণ দাঁত, যেহেতু মানুষ মাংশাসী সাথে সাথে তৃণভোজী– তাই মানুষের রয়েছে সর্বভুক দাঁত। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইতেন যে, আমরা কেবল নিরামিষভোজী হই, তবে তিনি আমাদের মসৃণ দাঁত দিতেন। কেন তিনি আমাদের তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়েছেন? এখানে একটি উদ্দেশ্য আছে, আর তা হলো গরু, ছাগল, ভেড়া এই সকল তৃণভোজী প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া আমিষ জাতীয় খাবার হজম করতে পারে না তা বুঝিয়ে দেয়া।

একইভাবে মাংশাসী প্রাণী হজম প্রক্রিয়া শাকসবজি হজম করতে পারে না। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া আমিষ, নিরামিষ সবই হজম করতে পারে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের নিরামিষভোজি হিসেবে দেখতে চাইতেন তবে কেন তিনি আমাদের হজম প্রক্রিয়া তৈরি করে দিলেন যাতে সবই হজম হতে পারে। আপনি যদি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বিশ্লেষণ করেন, আপনি যদি পড়েন তবে দেখতে পাবেন সাধু এবং ঋষিগণ অনিরামিষভোজি ছিলেন, এমনকি যদি রামায়ণ পড়েন, আপনারা লক্ষ করুন আমি রেফারেন্স দিচ্ছি, আমি সবসময় রেফারেন্স উল্লেখ করি। মানুষের এটি ভাবা ঠিক হবে না যে, আমি তাদের প্রতারিত করছি– আমি কাউকে প্রতারিত করছি না, কারণ আমি রেফারেন্স দিচ্ছি। যখন আমি মুসলমানদের সামনে কোনো তথ্য উপস্থাপন করি যে, এটি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে, তারা আঘাত পায় আবার যদি হিন্দুদের সামনে রামায়ণ এবং বেদ থেকে উল্লেখ করি তারাও বিক্ষুব্ধ হয়। আমিষ খাওয়া প্রসঙ্গে 'অযোধ্যা খানদম'-এর ৯০ নং অধ্যায়ের ২৬ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে, 'যখন রামকে বনবাসে পাঠানো হলো, সে তার মাকে বললো, 'আমাকে সুস্বাদু মাংসের স্বাদ ত্যাগ করতে হবে।' এটি থেকে বুঝা যায় রাম আমিষ জাতীয় খাবার খেত– সে মাংস খেত। পরবর্তীতে হিন্দু ধর্মের দর্শন কেন পরিবর্তিত হয়ে নিরামিষভোজি হয়ে গেল? কারণ, তখনকার মানুষ ক্রমে 'অহিংসা' (যা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত) দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করলো। কারণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 'অহিংসা' নীতিতে বিশ্বাস করে। সুতরাং মানুষকে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া থেকে নিবৃত রাখতে তারা নিরামিষভোজী হয়ে গেল।

আপনি যদি ঐসব জৈন ধর্মের লোকদের প্রশ্ন করেন 'কেন আপনারা কেবল শাকসবজি খান? তারা আপনাকে বলবে, 'উদ্ভিদ হলো প্রাণহীন, আর জীবজন্তুর প্রাণ আছে.........এবং যেকোন জীবিত সৃষ্টিকে হত্যা করা অন্যায়। আপনি যদি কোনো কারণ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকে হত্যা করেন তবে এটি ইসলামেও হারাম। আপনি যদি কোনো কারণ ছাড়া একটি পিঁপড়াও হত্যা করেন তবে এটিও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এখানে একটি ভুল ধারণা আছে যে, গাছপালার প্রাণ নেই। আজকাল

বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে এবং তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে । সুতরাং তাদের যুক্তি ব্যর্থ হয়ে গেল। সুতরাং তারা নতুন যুক্তি নিয়ে আসলো যে, যদিও উদ্ভিদের প্রাণ আছে তথাপি তারা ব্যথা পায় না; কিন্তু জীবজন্তু ব্যথা অনুভব করে। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা করার চেয়ে প্রাণী হত্যা আরো বড় অন্যায়। আজকে বিজ্ঞান আরো উন্নত হয়েছে এবং এমনকি এটিও জানা যাচ্ছে যে গাছপালাও ব্যথা অনুভব করে; এমনকি কাঁদে এবং সুখ-আনন্দও অনুভব করতে পারে। আপনি জানেন যে উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে, কিন্তু একথাটি সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমেরিকায় একটি গবেষণা হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয়েছে উদ্ভিদও কাঁদে এবং সুখ-আনন্দ অনুভব করতে পারে। উদ্ভিদের কান্না মানুষ শুনতে পারেনা, কারণ, মানুষের কানের শোনার ক্ষমতা প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র। আপনি জানেন যে একটি কুকুরের শ্রবণ শক্তি সেকেন্ডে ৪০,০০০ চক্র।

সম্ভবত উদ্ভিদের কান্নার সীমা অনেক বেশি তাই যখনই একজন কৃষক যন্ত্র নিয়ে আসে এবং পানি পায় না তখন সে কাঁদে এবং সে এটি শুনতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করে, এমনকি তারা সুখ-আনন্দ ও অনুভব করে এমনকি তারা কাঁদতেও পারে। সুতরাং একজন মানুষ আমাকে সর্বোচ্চ যুক্তি দিতে পারে এই বলে যে, জাকির ভাই, আমি আপনার সাথে একমত যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু যদি আপনি দেখেন যদি আপনি যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেন, যে প্রাণীদের ৫টি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু উদ্ভিদের ২ বা ৩টি ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং ৫ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন একটি সৃষ্টি হত্যা করা ২ বা ৩ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন একটি সৃষ্টি হত্যা করার চেয়ে নিশ্চিতভাবেই বেশি অপরাধ। আমি বলি, কথাটায় যুক্তি আছে। তর্কের খাতিরে আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরুন আপনার ভাই বধির ও বোবা হয়ে জন্ম নিল, যখন সে বড় হলো তখন যদি একজন অপরাধী এসে তাকে মেরে ফেলে তখন আপনি কি বিচারককে গিয়ে বলবেন, মাননীয় আপনি হত্যাকারীকে কম শাস্তি দিন, কারণ আমার ভাইয়ের ২টি ইন্দ্রিয় কম ছিল? আপনি কি এটি বলবেন? বরং আপনি বলবেন মাননীয় আদালত আপনি হত্যাকারীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিন কারণ, সে একজন অসহায়কে হত্যা করেছে।

সুতরাং ইসলাম ধর্মমতে আপনি সবই খেতে পারেন। আল্লাহ পাক সূরা বাক্বারার ১৬৮ নং আয়াতে বলেছেন, 'আমি তোমাদের (খাদ্যরূপে) যা দিয়েছি সেইসব পবিত্র খাদ্য খাও।'

কিন্তু একজন মুসলিম, একজন খুব ভালো মুসলিম হতে পারবে শুধু নিরামিষ খেয়েও। কুরআন এটি বলে নি যে তোমরা নিরামিষ খাবার খেতে পারবে না। আপনি শুধু শাকসবজি খেয়েও ভাল মুসলিম হতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন উদ্ভিদের মধ্যে কোনো প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন নেই। আপনি কি জানেন যে উদ্ভিদের মধ্যে বা শাকসবজির মধ্যে সর্বোচ্চ যে প্রোটিন

পাওয়া যায় সেটি হলো 'সয়াবিন' যেটি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন? উদ্ভিদজাত খাবারের মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন, যেটি উদ্ভিদের মধ্যে নেই। কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের তৈরি অনুচ্ছেদে লিখা রয়েছে যে অউদ্ভিদের চেয়ে উদ্ভিদজাতীয় খাবারে বেশি উপকারী বস্তু রয়েছে; কারণ তারা এটি লিখে এজন্য যে এটি তাদের জীবন দর্শন। অন্যদিকে অউদ্ভিদজাত বিজ্ঞানীরা তাদের অনুচ্ছেদে/রচনায় দেখিয়েছেন যে এটি প্রমাণিত সত্য নয়। সুতরাং আপনি যদি এমন লোক হন যিনি উদ্ভিদজাত ও অউদ্ভিদজাত উভয় প্রকার খাবারের গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তখন আপনি জানতে পারবেন, অউদ্ভিদজাত খাবার মানুষের শরীরের জন্য উপকারী। সুতরাং যখন আল্লাহ আমাদের ভাল খাদ্য দিয়েছেন, যা আমাদের কাছে রয়েছে, তবে কেন আমরা এসকল খাবার খাওয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবো। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ৬. কিছু মানুষ মনে করে মুসলমানগণ অউদ্ভিদজাত খাবার, যেমন : পশুর মাংস খায়, ফলে তারা তাদের আবেগ ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না– এটি কি সঠিক? দয়া করে-এর উপর আলোকপাত করুন।

উত্তর ঃ ভাইয়া একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং এটা ঠিক যে খাবারের প্রভাব মানুষের আচরণের ওপর পড়ে। আমি এ যুক্তির সাথে একমত যে, আপনি যে খাবার খান তার একটি প্রভাব অবশ্যই আপনার আচরণের ওপর পড়বে। আর এ জন্যই ইসলাম আমাদেরকে শুধু তৃণভোজী প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন– গরু, ছাগল এবং ভেড়া। আর তাই মুসলমানগণ শান্ত প্রকৃতির হতে যাচ্ছে। তাই আমাদের জন্য সিংহ, বাঘ, কিংবা চিতার মতো মাংশাসী প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। আপনি যদি এসব প্রাণীর মাংস খান তবে আপনি সিংহ, বাঘ বা চিতার মতো হয়ে যাবেন......সঠিক তাই না? আপনি যে খাবার খান, বিজ্ঞান বলে যে, তার প্রভাব আপনার আচরণের ওপর পড়বে। এই কারণে আপনাকে কেবল তৃণভোজি প্রাণী যেমন গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু খাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেখানে আপনি জানেন যে, গরু খুব নম্র প্রাণী। আমরা এই সব প্রাণী খাব কারণ, আমরাও নম্র হতে চাই।

অ-উদ্ভিদজাত খাবার যেমন পশুর মাংস বিশেষত সিংহ, বাঘ এবং চিতা,–এ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মাংশাসী প্রাণী যার ছেদক দাঁত এবং হিংস্র নখর রয়েছে তার মাংস খাওয়ার অনুমতি তোমাদের দেয়া হয়নি। আমেরিকায় এ ব্যাপারে গবেষণা করা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর মানুষ যারা কয়েকমাস যাবত শুধু উদ্ভিদজাত খাবার খেয়েছে এবং অন্য শ্রেণী যারা অউদ্ভিদজাত খাবার খেয়েছে।

যখন আপনি বলবেন অউদ্ভিদজাত তখন আপনি কেবল অউদ্ভিদজাত খাবারই খাবেন এবং এটি বুঝায় অউদ্ভিদজাত খাবারের সাথে উদ্ভিদ খাবারও বটে। যখন আপনি

উদ্ভিদজাত বলেন, এটি সাথে সাথে উদ্ভিদজাত খাবারও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ঐসব লোক যারা অউদ্ভিদজাত খাবার খায়, তাদের সামাজিক আচরণ অনেক সুন্দর হয় ঐ সমস্ত লোকের চেয়ে যারা কেবল উদ্ভিদভোজী। এটি একটি গবেষণার ফলাফল যার নথিপত্র এখানে রয়েছে। কিছু মানুষ এ ব্যাপারটি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে, আপনি যদি উদ্ভিদভোজী হন, তবে পার্থক্য খুব বেশি কিছু নয়। যারা উদ্ভিদভোজী তাদের আচরণ কিছুটা কম আন্তরিক হয়, অ-উদ্ভিদভোজীদের চেয়ে গবেষণায় তাই দেখা যায়।

কিন্তু অনেক উদ্ভিদভোজী আছেন যারা নরম মনের অধিকারী, কারো আচরণ হিংস্র, আবার অনেক অউদ্ভিদভোজী আছেন যাদের আচরণ নম্র-ভদ্র আবার কেউ কেউ হিংস্র আচরণের অধিকারী। এটি আবহাওয়ার প্রভাবে হয়ে থাকে। কিংবা ছোট বেলার শিক্ষার কারণে হয়ে থাকে– খাদ্যাভ্যাসের কারণে নয়। সম্ভবত গবেষণাকারিগণ যাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা ছিল হিংস্র আচরণের অধিকারী এবং তারা তাদেরকে বলেছে যে তারা এরূপ আচরণ করে। অন্যথায়, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মূল শব্দ 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। সুতরাং সর্বদা আমরা শান্তি বজায় রাখি এবং শান্তি আনতে চেষ্টা করি। ইসলাম সত্যিকার অর্থেই একটি শান্তিপ্রিয় এবং দয়ার ধর্ম। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ৭. পবিত্র কুরআন বলছে, আল্লাহ মহাক্ষমাশীল। পরবর্তীতে এটাও বলা হচ্ছে যে, অমান্যকারীদের জন্যে খুব কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং তিনি কি একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ? আল্লাহ কি প্রতিহিংসাপরায়ণ নাকি আল্লাহ ক্ষমাশীল?

উত্তর ঃ ভাই আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন। আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। আমি এ ক্ষেত্রে রয়েছি তাই আপনার প্রশ্নটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। ভাই আপনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তা হলো পবিত্র কুরআন বলছে আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, তার পরও তিনি কেন শাস্তির বিধান করছেন? এজন্য আপনি বলছেন আল্লাহ প্রতিহিংসাপরায়ণ অথবা আপনাকে আতঙ্কগ্রস্ত করছেন এবং আপনার জন্যে রয়েছে শাস্তি। যেমন আমি বলছি পৃথিবীতে ধর্ষণের জন্যে অর্থনৈতিক দণ্ডের বিধান রয়েছে। কুরআনে কিছু শাস্তির কথায় বলা হয়েছে দোজখের আগুনে জ্বালানো হবে।

ভাই, আপনাকে একটি বিষয় অনুভব করতে হবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল পাশাপাশি আল্লাহ একজন ন্যায়বিচারক। পবিত্র আল-কুরআনে তাঁর ৯৯টি নামের কথা বলা হচ্ছে। যার মধ্যে ক্ষমাশীল ও ন্যায়বিচারক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ জিনা করে, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আপনি বলতে পারেন না আল্লাহ মহাক্ষমাশীল। সুতরাং আল্লাহ ধর্ষণকারীকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। এটা কোনো ক্ষমাশীল আল্লাহ নন এবং একজন অবিচারক আল্লাহ। যদি আপনি ধর্ষককে মুক্ত

করে দেন তাহলে ধর্ষিতাকে কি জবাব দিবেন। বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, যে ব্যক্তি একবার জিনা করে এবং আবার সমাজে ফিরে আসে তার মধ্যে আবারো জিনা করার ৯৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে। সবাই বলছে প্রথমত, তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দাও এবং যদি সে আবারও করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।

বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানে আমেরিকা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যখন একজন মানুষ ধর্ষণ করে এবং আবারো সমাজে ফিরে যায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সে আবারো ধর্ষণ করে। আল্লাহ্ তাআলা একই সাথে ক্ষমাশীল এবং ন্যায় বিচারক। যে মহিলা ধর্ষিত হয় আল্লাহ্ তার কাছে ন্যায় বিচারক। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির কাছে যে আবারও ধর্ষণ করছে, যে ধর্ষণ করা তার জন্যে খারাপ। একইরকমভাবে যদি তুমি চুরি করো, পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে তার হাত কেটে দাও। আপনি এটাকে খুব নৃশংস আইন বলতে পারেন এবং বলতে পারেন ওহ্! ইসলাম খুবই নৃশংস, হাতকাটার ক্ষেত্রে। প্রথমত ইসলাম বলছে যাকাত প্রথার কথা। যেমন : আমি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ (আড়াই) ভাগ গরিবকে দেয়ার বিধানের কথা বলেছি। এটা দেয়ার পর যদি কেউ চুরি করে তখন তার হাত কেটে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط

অর্থ ঃ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড হিসাবে।

মানুষ ভাবতে পারে, আপনি যদি সৌদি আরবের এদিক থেকে ওদিকে যান প্রত্যেক দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের হাত কাটা থাকবে। আমি সৌদি আরবে গিয়েছি আমি একজনও মানুষ দেখিনি; যাদের হাত কাটা। সেখানে কিছু মানুষ এরকম থাকতে পারে কিন্তু আমি তাদের মধ্যে দিয়ে আসি, এটা খুব সাধারণভাবে চোখে পড়ে না। আপনি যদি বর্তমানে আমেরিকাতে শরিয়াহ্ চালু করতে চান, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে অথবা দান করবে এবং তারপর যদি কেউ চুরি করে তার হাত কেটে নেয়া হবে। এটা কি আমেরিকার খারাপ কাজকে বাড়াবে? একই রকম রাখবে? না কমাবে? এটা অবশ্যই আমেরিকার খারাপ কাজ কমাবে। সুতরাং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং ন্যায়বিচারকের পাশাপাশি এ দুটি কাজ করতে তিনি খুবই সতর্ক। এই তিনটি বিষয় একই সাথে তখনই করা সম্ভব, যদি কেউ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিছু করতে চায়। সব মানব জাতির জন্যে তিনি ক্ষমাশীল। সুতরাং তিনি জিনা বন্ধ করতে চান না। এটা কি ক্ষমাশীলতা নাকি ক্ষমাশীলতা না, আপনিই বলুন? ঠিক আছে এটা ক্ষমাশীলতা। সুতরাং আপনি

বলছেন মানুষ আনন্দ করুক। আর আজ আপনি ১,০০০ ধর্ষণ করছেন কাল থেকে প্রত্যেক দিন ১০,০০০ (দশ হাজার) করে করবেন এবং এটা বাড়তে থাকবে।

সুতরাং আল্লাহ্র এই আইন সমগ্র মানব জাতির জন্যে ক্ষমাশীলতাস্বরূপ। কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নয়। কেবল সৌদি আরবের জন্যে অনুমোদিত নয়। শুধু আমেরিকার জন্যে নয়। তিনি ক্ষমাশীল সমগ্র মানব জাতির জন্যে। এজন্যেই এ ধরনের শাস্তি রাখা হয়েছে, যার ফলে অন্যায়কারীরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারে এবং সুবিধাটা সকল মানবজাতি ভোগ করতে পারে। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ৮. আজ সবাই নারী অধিকার নিয়ে যেভাবে আওয়াজ তুলছে সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই নারীকে পুরুষের সমান অধিকার পেতে হলে তো তাকে পুরুষের সমান দায়িত্বও পালন করতে হবে, কিন্তু তারা দায়িত্ব পালন কম করে কিভাবে সমান অধিকারের কথা বলে?

অর্থ : ভাই, আপনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, নারীদের নিজেদেরকে উন্নতির স্তরে নিয়ে যেতে তাদের অনেক দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমি আপনার কথার সাথে একমত, এর বিস্তারিত আমার ভিডিও ক্যাসেটে রয়েছে। এটা কথার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখনো তাদের অধিকার সমান। কুরআন তাদেরকে নিচের স্তরে রাখেনি। কুরআন পরিষ্কারভাবে সূরা বাকারাহ-এর ২৩৮ নং আয়াতে বলছে–

অর্থ ঃ নারীদের পুরুষের ওপর তেমনি ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে। সে রকম রয়েছে পুরুষের নারীর ওপর।

তাদের সমান অধিকার রয়েছে। তাদের সেই অধিকারগুলো কি? ভাই, আপনি আমার বক্তব্যের ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। তাদের অধিকার রয়েছে কিন্তু তারা সমান। এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের ওপর অধিক বোঝা চাপানো হয়েছে, সুতরাং পুরুষরা আরাম করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিক চাপ গ্রহণ করতে হয় যেখানে পুরুষরা কম চাপ বহন করে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের অধিক বোঝা বহন করতে হয় সেখানে মহিলাদের কম দায়িত্ব গ্রহণ করলেও চলে। যেমন পরিবারের ভরণপোষণ পরিচালনার দায়িত্ব বা বোঝা পুরুষের ওপর বর্তায়। এটা পুরুষের দায়িত্ব যে, মহিলাদের থাকার, খাওয়ার ও পরিধানের ব্যবস্থা করবে। তার বিবাহ এর পূর্ব পর্যন্ত এই খাওয়ার, থাকার ও পরিধানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইয়ের এবং বিবাহের পর তার সব কিছু দেখার দায়িত্ব তার স্বামীর ও সন্তানের। যদি আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন, দেখবেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি পুরুষদের চেয়েও নারীদের দায়িত্ব বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব বেশি। সামগ্রিকভাবে তারা সমান। আশা করি এ উত্তর আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।

প্রশ্ন ৯. আপনি কি কাশ্মীরে গিয়েছেন এবং সেখানকার হিন্দু ও মুসলিমকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন?

উত্তর ঃ ভাই, একটি প্রশ্ন করেছেন আমি কাশ্মীরে গিয়েছি কিনা এবং সেখানকার মানুষকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছি কিনা এবং কৃতকার্য হয়েছি কিনা? আমি আশা করি কেউ সেখানে চেষ্টা করবেন। আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম যখন আমি খুব ছোট ছিলাম ঘুরে দেখার জন্যে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যাইনি। কিন্তু প্রত্যেকেরই কুরআনের পুরো অংশ মেনে চলা উচিত। আপনি কুরআনের একটি অংশ অনুসরণ করে বলতে পারেন না এটা কৃতকার্য হয়নি। যদি কেউ কাশ্মীরে বসবাস করে এবং সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন কুরআন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আশা করি এটা আপনার প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ১০. আমি একটি প্রশ্নে পরিষ্কার হতে চাই যে, চিরাচরিত ইচ্ছে আসলে কি? সেখানে ইসলামে বলা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বা ইচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছের কথা। ইসলাম ধর্মের মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় আল্লাহর চিরাচরিত ইচ্ছের ওপর ভিত্তি করে সব শক্তি পরিচালিত হয়। আবার বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যে সে নিজেই দায়ী। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছে সম্পর্কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাই।

উত্তর ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছের মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? এটা ঠিকভাবে সমর্থনযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বা ইচ্ছে ছাড়া একটি গাছের পাতাও পড়ে না। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী হয় তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছের কি ক্ষমতা থাকলো? ব্যক্তিগত ইচ্ছে বলতে বুঝায় প্রত্যেকটি মানুষের যে নিজস্ব ইচ্ছে থাকে সেটি। উদাহরণস্বরূপ, আমি আপনাকে বললাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ মূলত আসছে প্রধান শক্তিকেন্দ্র থেকে এবং আপনি এখানে তার সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন মাত্র। মূল শক্তিটি কিন্তু আসছে প্রধান শক্তিকেন্দ্র থেকে। একজন মানুষ যদি চলন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহে হাত দেয় সে শট করবে এটাই স্বাভাবিক। এর জন্যে কে দায়ী? সে নিজেই। আল্লাহ তাকে স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন সে তার হাত দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। এর জন্যে তুমি শক্তি কেন্দ্রকে দোষারোপ করতে পারো না। তুমি সেই মানুষকে দোষারোপ করতে পারো কেন সে চলন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহে হাত দিলো? সেই শক্তি কি আসছে আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহর শক্তি ছাড়া কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর শক্তি রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ আপনাকে বেছে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন খারাপের মধ্যে থেকে ভালোকে। তিনি আপনাকে একটি খুন করা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি আপনাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কেন? কারণ আমি আগেই বলেছি সূরা মুল্‌লুক-এর ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ ঃ তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের সর্বোচ্চ গড় আয়ুষ্কাল ৬০ বছর। কোনো কোনো মানুষ ২০ বছর বেঁচে থাকে। কেউ কেউ আশি (৮০) বছর, আবার কেউ ৯০ বছরের জন্য। গড়ে মানুষ ৫০ থেকে ৬০ বছর বাঁচে। সুতরাং আল্লাহ্ বলেন, এই জীবনটা পরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ্ আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছে দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। যদি তুমি কুরআন অনুসরণ করো তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, যদি তুমি অনুসরণ না করো তুমি অকৃতকার্য হবে। আল্লাহ্ আপনাকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১১. আমাদের মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশের ভ্রাতৃগণ মিলাদ মাহ্ফিল করতে নিষেধ করেন। আমি কেন শহরে মিলাদ মাহ্ফিল করা থেকে বিরত থাকবো? মিলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইসলামে কী বলা হচ্ছে?

উত্তর ঃ নবাব সাহেব একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং আমি এই তথ্যটি সৌদি আরব থেকে পেয়েছিলাম যে মাদ্রাজের কিছু নওয়াব মিলাদ অনুষ্ঠানের বিপক্ষে বলছেন এবং আমি বলেছিলাম আমি একজন নওয়াবকে চিনি যিনি প্রিন্স সারকত এবং আমি অন্য কাউকে চিনি না যারা একথা বলছে। সুতরাং আমি ভেবেছিলাম এটি একই ব্যক্তি যিনি মিলাদ অনুষ্ঠান থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে কুরআন এবং সহীহ হাদীসে কিছু উল্লেখ নেই এমন কিছু যদি ইসলামে সৃষ্টি করা হয় তাহলে তাকে 'বিদআত' অর্থাৎ আবিষ্কার বলে। আমি জীবন চলার পথে নতুন কিছু আবিষ্কার করি নি। আপনি কিভাবে একজন ডাক্তার হতে পারেন। যদি আমার একটি নতুন পদ্ধতি, নতুন আবিষ্কার থাকে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আপনি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কখনোই বলেন নি তোমরা আমার জন্মদিনে অনুষ্ঠান পালন করো অথবা আমার মৃত্যুর দিনে। আপনি হয়তো জানেন ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম ﷺ-এর জন্ম ও মৃত্যুর দিন। সুতরাং আমি লোকদের জিজ্ঞেস করি আপনারা কি তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যুদিনে অনুষ্ঠান পালন করতে চান? যদিও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি ৯ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ রবিউল আউয়াল মৃত্যুবরণ করেন। যা হোক, এটা কোনো সহীহ হাদীসে নেই এই দিনগুলো আপনি উদ্যাপন করতে পারেন। আপনি যদি একটি ভালো আলোচনা সভা করেন, ভালো কথা বলেন, অন্য মানুষকে নবী সম্পর্কে ভালো শিক্ষা দেন সেটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু আপনি অনুষ্ঠান করে

টাকার অপচয় করবেন, আপনি মিছিল করবেন, বাদ্য বাজনা করবেন, এগুলো সব ইসরাফ। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈল এর ২৭ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

আমাদের কিছু মুসলমান ভাই আছেন যারা ঐ দিন গান বাজনা করেন, বাজি ফোটান এবং রাস্তায় অনেক বড় র‍্যালি বের করে মিছিল করেন। স্লোগান দেন নবীরে কখনও ছাড়বো না কখনো ছাড়বো না। আমি তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই কোথায় পেলেন বা ধরলেন যে, তা ছাড়বেন না। ছাড়ার প্রশ্ন তখনই জাগে যখন আপনি ধরেন। সুতরাং প্রথমে ধরুন "আতি-আল্লাহ-আতিউর রসূল" বুঝে বুঝে কুরআন ও হাদীস পড়ুন এবং সেখানে আপনি প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১২. আল্লাহ এক, তিনি অনেক নবী পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে, মুসলমানরা ঈসা (আ)-কে তাদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন, খ্রিস্টানরাও তাদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। ঈসা (আ) সৃষ্টি, বহির্গমন, নবী সংখ্যাও বাইবেলের পঞ্চম পুস্তক অনুযায়ী মানবতাবাদের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি দশটি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এখানে খুব ভালো করে লেখা আছে– "সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছেন একমাত্র প্রভু" এর মধ্যে এক্সুডাস এর ২০তম অধ্যায়ের ৪ নং পংক্তিতে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছে, "শনিবারকে পবিত্র দিন মান্য করোও, সৃষ্টিকর্তা ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, ইসলাম দাবি করে ঈসা (আ) তাদের নবী এবং খ্রিস্টানরা বলে তাদের নবী তবে কেন সেই গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন?

উত্তর ঃ ভাই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন, আমি প্রশ্নের প্রতিটি পয়েন্ট এর উত্তর সুন্দর করে দিতে ভালবাসি। আপনি কিছু বাক্য বললেন এবং আমি বিশ্বাস করি সেখানে আমার জন্য ১০টি প্রশ্ন রয়েছে।

আমি একজন ধর্মীয় ছাত্র। আমি বাইবেল, কুরআন, বেদ, ভগবতগীতা পড়েছি এবং আমি পছন্দ করি এসব নিয়ে আলোচনা করতে, সত্যটা জানতে, যীশু বলেছেন– যা এক্সুডাসে উল্লেখ আছে, কিন্তু আপনি প্রথম কিছু আয়াত-এর কথা বলেন নি। আমি প্রথম আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করছি, আপনি যদি এক্সুডাস পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন, ২০ নং অধ্যায়ের ২ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে– তুমি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই, তুমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরি করনি। যেমন– বেহেশত, আসমান, জমিন, মাটির নিচের পানি। তুমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করো না এবং তুমি তাদের ওপর অনুগ্রহ করো না, তুমি ঈর্ষান্বিত প্রভু, একথা কে

বলেছে? সরাসরি এক্সুডাসে একথা বলা হয়েছে, কিন্তু আপনি চলে গেছেন ৮ম পংক্তিতে।

যীশু খ্রিস্ট ঠিক একই কথা বলেছেন যেমন মসীহ তার ডিউটেরনমি গ্রন্থের, ৬ অধ্যায়ের ৪৭ নং পংক্তিতে বলেছেন, 'হে ইসরাঈলবাসী, ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র প্রভু।' এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক, এখানে অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু সময় আমাকে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অনুমতি দিবে না। মূল প্রশ্নটা হলো "রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য কেন? ইহুদিদের মতে, শনিবার হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির দিন এবং যীশু তার প্রচারিত বাণীতে বলেছেন– তুমি হচ্ছ ধর্ম যাজক, তোমাকে প্রভুর বাণী অবশ্যই জানতে হবে, আমি মনে করি, আমি আইন ভাঙ্গতে আসিনি, আমি নবী এবং পরিপূর্ণতার জন্য।

যীশুখ্রিস্ট বাইবেলে বলেছেন, আমি ধ্বংস করতে আসিনি আইন এবং ধর্মযাজককে। আমি ধ্বংসের জন্য নয়, পরিপূর্ণতার জন্য এসেছি। এজন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত বেহেশত এবং পৃথিবী আলাদা, ততক্ষণ আইনের বাইরে কেউ না, পরিপূর্ণতার আগ পর্যন্ত, সেজন্য যে একটি নীতি ভাঙ্গবে এবং তা অন্যকে করতে বলবে তাকে বেহেশতে সবার পরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে এবং যে নীতি শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং অন্যকে করতে বলবে তাকে বেহেশত সম্মান জানানো হবে। ক্রাইচ এবং ফারাসেসদের থেকে– যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার সততা বেশি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। যীশু খ্রিস্ট বলেছেন– কেউ যদি ভাল খ্রিস্টান হতে চাও তাহলে তাকে তুরাহ এর প্রতিটি বিষয় অনুসরণ করতে হবে। ঈসা বলেছেন– তোমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। যদি কেউ আংশিক পালন করে তাহলে তারা বেহেশত-এ প্রবেশ করবে না। এটা কে বলেছে? যীশু বলেছেন– তাই খ্রিস্টানদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে কেন তারা শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে মানে না।

যীশু বলেছেন, আমি নিয়ম ভাংতে আসিনি, আমি নবী এবং এসেছি পরিপূর্ণতার জন্য কিন্তু যখন হযরত মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসেছিলেন তিনি তা বলেন নি। কুরআনের সূরা বাকারার ২য় পারার ১০৬ নং আয়াতে আছে, 'তোমাদের কাছে শেষ গ্রন্থ পাঠানো হলো, তোমাদেরকে আয়াত দেয়া হলো।' কিন্তু আমরা সেই সব জিনিস পরিবর্তন করতে পারি পূর্বের চেয়ে ভালো বা একই রকম। কুরআন বিশ্বাস করে মূসা (আ) আল্লাহর প্রদত্ত নবী, ইসলাম হচ্ছে অখ্রিস্টানদের বিশ্বাস, যারা যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর পাঠানো একজন নবী, আমরা আরো বিশ্বাস করি তিনি আশ্চর্যজনকভাবে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন– (যা আধুনিক খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে না) আমরা বিশ্বাস করি যীশুকে জীবন দেয়া হয়েছে মৃত্যুর জন্য প্রভুর নির্দেশে। আমরা আরও বিশ্বাস করি তিনি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করেছেন প্রভুর নির্দেশে।

কিন্তু আমরা কি বিশ্বাস করি এতক্ষণ যা বললাম? পূর্বের সব নবী এসেছেন নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা জাতির জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৩ পারার ৪৯ নং আয়াতে 'ঈসাকে পাঠানো হয়েছিল বনী ইসরাঈলদের কাছে, যীশু তার বাণীতে বলেছেন– তার ১২টি নীতির কথা ১০ নং পারার ৫-৬ নং আয়াতে তোমরা যেওনা ইহুদি ছাড়া অন্যদের পথে। কারা অইহুদি ছিল? ইহুদি নয় এমন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান। যীশু বলেছেন, তোমরা ইহুদি ছাড়া অন্যদের পথে যেওনা। তোমরা সামারিটাস শহরের দিকে যেওনা বরং খারাপ থেকে বিরত রাখে এমন ইসরাঈলের দিকে যাও। যীশু তার বিধানে বলেছেন আমাকে ইসরাঈল ছাড়া অন্য কারো জন্য পাঠানো হয়নি। অর্থাৎ যীশু শুধু ইহুদিদের জন্য এসেছিলেন অন্য কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এটা যীশু বলেছেন, এই কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে, কিন্তু হযরত মুহম্মাদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের শান্তিস্বরূপ। সুতরাং হযরত মুহম্মাদ ﷺ যে গ্রন্থ পেয়েছেন তা অন্যান্য গ্রন্থের মতো না। তবে প্রকৃত কথা একই– খোদা এক, তোমরা মূর্তিপূজা করো না। প্রকৃত কথা একই কিন্তু নীতি/নিয়ম আলাদা। অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক কানুনগুলোর পরিবর্তন, ইহুদিরা ইবাদাত করে শনিবারে, কিন্তু খ্রিস্টানরা রবিবারে, কিন্তু কেন করে তা জানি না, যীশু বলেছেন, তোমরা সামান্য নীতিও পরিবর্তন করো না। আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানবাদ থেকে আলাদা।

প্রকৃত পক্ষে ঈসা (আ) খ্রিস্টবাদ শিক্ষা দেয়নি। যা দিয়েছেন তা হচ্ছে ইসলাম। 'খ্রিস্টান' শব্দটি একটি ডাকনাম, যা খ্রিস্টের শত্রুদের দেয়া, এটা বাইবেলের উল্লেখ্য আছে, ধর্মযাজকগণ মনে হয় জানেন, খ্রিস্টের অনুসারীদের নাম হচ্ছে খ্রিস্টান, এটা একটি কটুকথা– যা আজ হচ্ছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানে বলা হয়েছে– যীশু ছিল মুসলিম, কুরআন বলেছে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল না। সুতরাং সারকথা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যা বলেছেন তা একই। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা না করা। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর আল্লাহ ফাইনাল বার্তা পাঠিয়ে দেন, এরপর আর কোনো বার্তা পাঠাবেন না, অন্য কোনো আইন আসবে না। আর আজকের আইন/নীতি হচ্ছে সবচেয়ে বাস্তবিক। যেমন, ঈসা (আ) বলেছেন : দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের পরিবর্তে চোখ এটাই ছিল আইন, আর এখন বলা হয়, যদি কেউ তোমার এক গালে থাপ্পড় মারে তবে তাকে অন্য গাল পেতে দাও। কেউ যদি তোমার কাছে জামা চায় তবে তাকে আলখাল্লা দিয়ে দাও। কেউ যদি বলে একমাইল হাঁটতে তবে তুমি দুই মাইল হাঁট। এটাই হচ্ছে সংশোধন। কেউ যদি কাঠি দিয়ে খেলার সময় ভুল করে তোমার চোখে লাগায় তার কারণে তুমি তার চোখ নিয়ে নিতে পার না। এটাই হচ্ছে সংশোধন, যীশুর নীতিতে সংশোধন আনা হয়েছে। তখন সঠিক ছিল, এজন্য যে তুমি ফেরত

দিতে পারতে, আর এখন নির্ভর করছে সমাধানের ওপর। যদি ভুলক্রমে হয় তার জন্য আইন আছে, ভুল-সঠিক নির্ধারণের জন্য আছে আইন। পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ কিতাব যা চিরকাল থাকবে এবং তা বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করা যায়, আশা করি উত্তর পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন ১৩. ধর্মের কারণে হিন্দুদের সাথে বৈষম্য করাটা কি ঠিক? কাজের জন্য সৌদি আরবে বলা হয়, শুধু মুসলিম এবং খ্রিস্টানরাই আবেদন করতে পারবে।

উত্তর ঃ আপনি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন, আমি সৌদি আরবে গিয়েছি কয়েকবার। এটা বাস্তবিক যে, আমি এর উল্টো অভিযোগ করেছি কয়েক বার। সৌদি আরবের উচ্চপদস্থ পদগুলো দখল করে আছে অমুসলিম; হিন্দু, খ্রিস্টানরা। আমি তাদের কাছে অভিযোগ করেছি সমান অধিকার দেয়ার জন্য। মুসলিমরা সেখানে ঝাড়ুদার আরো অন্য অনেক ছোট পদে আছে। বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাবেন উচ্চপদস্থ পদগুলো যেমন– জেদ্দার ট্রাইডেন্ট হোটেল একটা পাঁচতারা হোটেল। সেখানে আছে সব শ্বেতাঙ্গ অমুসলিমরা।

আর সেই সময়ের প্রধান অতিথি ছিল ভারতের বিমানের পরিচালক এবং সেখানে দেখেছি খুব কম অনারব মুসলিমদের; কিন্তু কেন? তা জানি না। সুতরাং এটা একটা ভুল ধারণা। তারপরও কিছু কাজের জন্য যেমন : মসজিদের ইমাম, এসব কাজের জন্য একজন মুসলিমই প্রয়োজন। যেহেতু অমুসলিমরা নামায পড়াতে পারে না। সুতরাং কাজের ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে লোক নেয়া হয়। যদি একজন হিসাব রক্ষক দরকার হয়, তাহলে এমন লোকই নেয়া হবে যে ভাল হিসাব জানে। সৌদি আরবে বৈষম্য আছে এটা ভুল ধারণা, এমনকি উচ্চ প্রতিনিধি যারা লোক পাঠায়, তারা অমুসলিম। সুতরাং এটা ভুল ধারণা, মুম্বাইতে উচ্চ ব্যক্তিবর্গ, প্রধান প্রধান ভ্রমণ প্রতিনিধিরা হচ্ছে অমুসলিম।

যদি আপনি একজন ভালো ডাক্তার হন, কি মুসলিম আর অমুসলিম আর যদি আমার মা অসুস্থ হয় এবং জানতে পারি যে আপনি একজন হিন্দু ডাক্তার তাহলে আমি কার কাছে যাব? আমি অমুসলিমের কাছে যাব, কারণ কুরআন বলেছে "যদি তুমি না জান তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করো যে জানে" কুরআনের সূরা আন-নাহল পারা ১৬, আয়াত ৪৩ এবং সূরা ফুরকান-এর পারা ২৫, আয়াত ৫৯-তে বলা হয়েছে– 'যদি তোমার সন্দেহ থাকে তবে তার কাছে যাও যে জানে' বিশেষজ্ঞের কাছে যাও, কুরআন বলে নাই যে, মুসলিমের কাছেই যাবে, যদি বিশেষজ্ঞটি মুসলিম হয় ইনশাআল্লাহ, আমি মুসলিমের কাছেই যাব। আর যদি অমুসলিম হয় তাহলে তার কাছে যাব, তবে অবশ্যই তাকে দক্ষ হতে হবে, আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ১৪. ইসলামে কি সন্ন্যাসী জীবন আছে? আল্লাহকে ধ্যান ইবাদাত ; ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পাওয়া যায়? ইসলাম উদার অর্থনীতি সম্পর্কে কী বলে?

উত্তর ঃ ভাই, ভাল একটা প্রশ্ন করেছেন উদার অর্থনীতি সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে– 'সুদ মুক্ত অর্থনীতি আলোচনা' এর ওপর অনেক ক্যাসেট আছে এটা জানবে কিভাবে সুদহীন অর্থনীতি, ইসলামিক অর্থনীতির বিষয়ে মালয়েশিয়া এটা অনুসরণ করেছে এবং তারা উন্নতি করেছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে– ধ্যান, ইন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি নিয়ে। আমাদের প্রধান ইবাদাত হচ্ছে ধ্যান করা, যাকে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিভিন্ন অর্থের মাধ্যমে, আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি। আল্লাহর ইবাদাতের একটা পথ হচ্ছে নামায। যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মুসলমান, আমরা ইবাদাত করি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য। আমরা নামাযের মাধ্যমে সঠিক পথটি বেছে নিতে পারি, কোন্টা ঠিক, কোন্টা ভুল মানুষের জন্য।

আপনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামে কি সন্ন্যাসী জীবন অনেকটা পুরোহিতদের মত, সাধু জীবন বলতে যদি মনে করেন জন্মগত কিছু, তাহলে কিছুই নেই, ইসলামের মতে প্রত্যেক মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, সাধু হিসেবেই। আমাদের নবী বলেছেন– প্রত্যেক মানুষ জন্মগ্রহণ করে 'দিন-উল-ফিতর' নিয়ে। 'দিন-উল-ফিতর' মানে, মুসলিম হয়ে, যদিও সে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, এমনকি একজন হিন্দু পরিবারের শিশু যদি পাঁচ বছর বয়সের আগে মরে যায় তাহলে সেও জান্নাতে চলে যাবে সরাসরি।

পরবর্তীতে সেই শিশুটি ভুলের দ্বারা জর্জরিত হতে পারে– 'কিন্তু প্রতিটা শিশু পাপমুক্তভাবে জন্ম গ্রহণ করে', পুরোহিত জন্মগ্রহণ বা পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণের মতো কিছুই নেই। যে ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন, যেমন আমাদের ইমাম। যেকোনো মুসলিম ভাল করে কুরআন পড়তে পারে, আর যে ভাল করে পড়তে পারে, সে ইমাম হতে পারে, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির অর্থাৎ যার বিশেষ কোনো দিকে জ্ঞান আছে তাকে জিজ্ঞেস করা যায়। কুরআন বলেছে– তাকে জিজ্ঞেস করো যে জানে, সুতরাং আপনি যদি ওষুধ সম্পর্কে জানতে চান আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আপনাকে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হলে একজন বিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে আর আপনাকে কিতাব সম্পর্কে জানতে হলে অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে একজন মাওলানার কাছে যেতে হবে যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, কিন্তু এমন কিছু নেই যে জন্মগত/পরিবারগত মাওলানা, আমাদের ইমাম আছে যিনি নামায পড়ান, আমাদের নেতা আছেন কিন্তু তিনি জন্মগত কারণে মাওলানা বা নেতা হন নি। আশা করি আপনি খুশি হয়েছেন ভাই।

সব মানুষই সমান। কেবল আপনি মহান হচ্ছেন, উচ্চতর মানব হচ্ছেন তা হচ্ছে আপনার সততা। আপনি যত বেশি সৎ হবেন আপনি তত ভালো মানুষ হবেন অন্য মানুষজন থেকে, আশা করি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ১৫. কেন বহুবিবাহ ছেলেদের জন্য, মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়? কেন ইসলাম জন্ম নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে না।

উত্তর ঃ প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে কেন বহুবিবাহ ছেলেদের/পুরুষের জন্য মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়?

বহুবিবাহ বলতে বুঝায়, একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী থাকাকে বুঝায়। আর বহুপতি একজন মহিলার একের অধিক স্বামী থাকাকে বুঝায়। আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, 'পৃথিবীতে কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে 'একটি বিয়ে কর' যদি আপনি রামায়ণ পড়েন, বেদ পড়েন, বাইবেল পড়েন, আরও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন– কোনো ধর্মেই বলা হয় নি একটি বিয়ে কর। আপনি যদি খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের নবী হযরত সোলায়মান (আ)-এর ছিল ১০০ শত স্ত্রী, ইব্রাহিম-এর ছিল একের অধিক স্ত্রী, বাইবেল-এ তিনটি বিয়ের উল্লেখ আছে এবং হিন্দু ধর্মে একাধিক বিয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, রামের পিতা দশরথের একের অধিক স্ত্রী ছিল।

কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, 'একটি মাত্র বিয়েই কর' পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৪ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে তোমার পছন্দমত দুটা, তিনটা, ৪টা পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পার, কিন্তু যদি ন্যায্য অধিকার দিতে না পার তাহলে একটি বিয়েই কর, ইসলাম একটা সর্বোচ্চ সীমা দিয়েছে, বিয়ের ক্ষেত্রে, অন্য কোনো ধর্মে বলা হয়েছে "তুমি যতটা ইচ্ছে ততটা বিয়ে করতে পার। কোন সর্বোচ্চ সীমা দেয়া নেই; ইসলামেই সর্বোচ্চ চারটা বিয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আরও বলা হয়েছে একের অধিক বিয়ে তখনই করতে পার যদি তুমি স্ত্রীদের মধ্যে সম অধিকার প্রদান করতে পার; আর স্ত্রীদের মধ্যে সম অধিকার প্রদান করাটা খুব কঠিন একটা কাজ, আর যদি ন্যায্য অধিকার দিতে না পার তাহলে একের অধিক বিয়ে করো না। এটা কোথাও উল্লেখ নেই যে, 'যদি তুমি একের অধিক বিয়ে কর তাহলে তুমি সৃষ্টিকর্তার অধিক অনুগ্রহ পাবে।' এটাই সর্বোচ্চ, তবে কেন ইসলামে একের অধিক বিয়ে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর কারণটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব, ছেলে-মেয়ের জন্মহার প্রায় সমান, কিন্তু আমরা যদি কোনো শিশু চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করি তাহলে সে বলবে মেয়ে শিশুর জীবাণু ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ছেলে শিশুটির চেয়ে বেশি, তারা যৌন দিক থেকেও অধিক শক্তিশালী, সেজন্য ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার মেয়ে শিশুর মৃত্যু হার অপেক্ষা বেশি।

এছাড়াও শিশুরা যখন বড় হয়, বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ দুর্ঘটনা, সংগঠিত হয় এবং সেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষদের মৃত্যুর হার বেশি।

বিশ্বের পরিসংখ্যান আলোচনা করে দেখা যায়, ভারত হচ্ছে একমাত্র দেশ, যেখানে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে বেশি, আপনি কি জানেন এর কারণ কি? বি.বি.সি.-তে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল, 'তার মৃত্যুর জন্য' নামক একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এসিলি চেক হিন্যান এক ব্রিটিশ ভারতে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে প্রতিদিন ৩,০০০-এর বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হয়, যখন জানতে পারে যে, শিশুটি হবে মেয়ে তামিলনাড়ুর এক সরকারি হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী 'দশজন মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণকারীর চারজনকে মেরে ফেলা হচ্ছে' ইসলামে মেয়ে শিশুর ভ্রূণ হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে, আল-কুরআনের সূরা আল তাকভীরের ৮ ও ৯ নং আয়াতে।

কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং এবং সূরা আনআমের ১৫১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা খাদ্যের জন্য তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। এই ভ্রূণ হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তা ছেলে কিংবা মেয়ে শিশুর ভ্রূণই হোক। আর এজন্যই ভারতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা বেশি, যদি মেয়ে ভ্রূণ হত্যার মত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় তাহলে কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে নারীদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, এছাড়া আমেরিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু আমেরিকাতে, ৭-৮ মিলিয়ন মেয়ে বেশি, শুধু নিউইয়র্কেই ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা প্রায় ১ মিলিয়ন বেশি। নিউইয়র্কের জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী, যারা মেয়ে সঙ্গীর সাথে থাকে না। এরকম পুরুষ সমকামীর সংখ্যা আমেরিকাতে প্রায় ২৫ মিলিয়ন। যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখা যাবে, এরকম ইংল্যান্ডে/যুক্তরাজ্যের মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি ৪ মিলিয়ন। শুধু জার্মানিতে মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি ৫ মিলিয়ন। শুধু রাশিয়াতে বেশি ৭ মিলিয়ন। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহই জানেন কত মিলিয়ন মেয়ে বেশি আছে ছেলের তুলনায় পৃথিবীতে। আর যদি এই রীতিতে বিশ্বাসী হয় যে, যতটা ইচ্ছে অতটা বিয়ে করতে পারবে একজন নারী, অথবা শুধু একটি বিয়ে আর আমার বোনটি যদি ভাগ্যক্রমে আমেরিকায় বাস করে আর যদি একটি পুরুষ মাত্র একটি নারীকেই বিয়ে করে তাহলে ৩০ মিলিয়ন নারী, যারা তাদের স্বামী খুঁজে পাবে না।

যদি আমার বোনটি ঐ দুর্ভাগা নারীদের একজন হয়, তার জন্য শুধু একটি রাস্তাই খোলা থাকবে, তাকে বিয়ে করা যে ইতোমধ্যেই একজন পত্নীগ্রহণ করেছে, অথবা সকলের সম্পদে পরিণত হওয়া, তৃতীয় কোনো পথ খোলা নেই। আর আমি ভদ্রলোকদের কাছে জানতে চাই আপনি আপনার বোনের জন্য কোন্‌টি চান? সকল ভদ্রলোকই বলবেন– তারা প্রথমটিই পছন্দ করবেন। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে,

কেন একজন মুসলিম নারী একের অধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। একের অধিক স্ত্রী থাকলেও বাবা-মা চিহ্নিত করা সম্ভব কিন্তু একের অধিক স্বামী থাকলেও মা চিহ্নিত করা গেলেও বাবা চিহ্নিত সম্ভব হবে না। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে, রক্ত পরীক্ষা ও ডি.এন.এ.-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভব। যা আদালতে আইনের জন্য প্রয়োজন হয়। এটা একটা কারণ যা পূর্বের জন্য প্রয়োজন।

আরও একটি কারণ হচ্ছে একজন পুরুষ একজন মহিলার চেয়ে অধিক যৌন ক্ষমতার অধিকারী এবং একজন পুরুষের যদি একের অধিক সঙ্গিনী থাকে তাহলে যৌন রোগের কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু একজন নারীর যদি একাধিক স্বামী থাকে তাহলে বিভিন্ন যৌন রোগের সম্ভাবনা থাকে, অধিক সম্ভাবনা থাকে এইডস হওয়ার। সেইজন্যই ইসলাম একের অধিক পতি গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। আশা করি উত্তর পাওয়া গেছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায়, জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, যে শব্দটা প্রায় সবাই ব্যবহার করে, ভারতে একটা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে– আমাদের জন্য সকলের জন্য– 'একটি হলে দুটো নয়, দুটি হলে আর নয়,' ধনী গরিব সকলের জন্য। দেখুন, যদি আমার পিতা-মাতা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতে পারতাম না।

আমি আমার পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান, যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারতো না। আর এজন্যই ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়া হয়নি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ– অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমার ভিডিও ক্যাসেট আছে কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, এটি একটি দীর্ঘ উত্তর। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ১৬. আপনি বলেছেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে, কিন্তু যদি একজন অমুসলিম ছেলে একজন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে কেউ মেনে নেয় না। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব কোথায় গেল?

উত্তর ঃ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন, তা সুন্দর একটা প্রশ্ন। আপনার মতো একটি বিষয় আমাকেও প্রশ্ন বিদ্ধ করে। ধরুন– 'আমরা একটি গাড়ি বানাব' যার একটি চাকা হবে সাইকেলের, আর একটি হবে ট্রাকের, তাহলে গাড়িটা কি চলবে? দেখুন– জীবনটাও ঠিক তেমনই। স্ত্রী হচ্ছে জীবন সঙ্গী, কুরআনে বলা হয়েছে বিয়েটা হচ্ছে 'মিসআক' পবিত্র বন্ধন, একটি পবিত্র চুক্তি, এটি এমন না যে সে তোমার গোলাম হয়ে গেল। এটি একটি পবিত্র বন্ধন। যেখানে দুজনেরই সমান অধিকার রয়েছে। যদি দু'জন ভিন্ন ধর্মের হয় একজন বলবে আজ গীর্জায় যাব, অন্যজন বলবে আমি মসজিদে যাব এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের উপাসনা করবে। তাহলে এটা একটা সঠিক যান হবে না। গাড়ি সঠিকভাবে চলবে না। সেজন্য পরিবারকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য, দু জনেরই একই মতের মতাদর্শী হতে

হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আদর্শ ভিন্ন হয় তাহলে সত্যিই চলবে না। আর পরিবারকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য দু'জনেরই একই মতের মতাদর্শী হতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, আমি বলেছি ইসলাম বিশ্বাস করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে– সমান মানুষই আমরা ভাই ভাই, কিন্তু মুসলমানরা হচ্ছে আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী ভাই ভাই। যদি একজন খ্রিস্টান আর একজন খ্রিস্টানের মতাদর্শী না হয় তাহলে সেই খ্রিস্টান এই খ্রিস্টানকে বিয়ে নাও করতে পারে, যাত্রা কত সুন্দর কত সহজ, আর এজন্যই দু জনের জীবন পথ, আদর্শ একই হতে হবে।

প্রশ্ন ১৭. কেন অমুসলিমদেরকে নিচু চোখে দেখা হয় এবং তাদেরকে কেন কাফির বলা হয়? এটা কি অন্যান্য ধর্মের সমালোচনা করে?

উত্তর ঃ প্রশ্নটা এমন যে কেন অমুসলিমদের কাফির বলা হয়? এবং কেন তাদেরকে নিচু চোখে দেখা হয়? ভ্রাতৃগণ, আরবি শব্দ কাফির এসেছে মূলত কুফর থেকে– যার অর্থ অস্বীকার করা। কুরআনের দৃষ্টিতে যে কোনো ইসলামের একটি সত্যকে অস্বীকার করে সে হচ্ছে অমুসলিম আর আরবি শব্দ কাফির এর প্রতিবাদ হচ্ছে অমুসলিম আর আপনি যদি অমুসলিম হন, তাহলে আপনাকে অমুসলিম বলেই ডাকবো। অমুসলিম শব্দের আরবি শব্দটাই হচ্ছে কাফির। যদি আপনি মনে করেন– কাফির বলাটা হচ্ছে গাল দেয়া, তাহলে আপনার মুসলিম হয়ে যাওয়া উচিত। দেখুন, কেউ যদি আমাকে বলে আপনি 'হিন্দু না' কেন আমার খারাপ লাগবে। আর আমি হিন্দু না বলে এর মানে এই নয় যে, সে আমাকে গালাগাল করছে। আপনি যদি অমুসলিম হন এবং আপনাকে অমুসলিম বলে তাহলে তো সে সত্যি কথাই বলছে। এটা অমুসলিমদের জন্য একটা শব্দ মাত্র। যদি আপনি ডাকাতি করেন এবং আপনাকে ডাকাত বলা যাবে না। তাহলে আপনার ডাকাতি ছেড়ে দেয়া উচিত। ঠিক তেমনি কেউ যদি আপনাকে বলে কাফির এবং আপনি মনে কষ্ট পান, তাহলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিন। কেউই আপনাকে কাফির বলবে না। আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ১৮. ইসলাম শান্তির শিক্ষা দেয় মানুষকে, তবে কেন অনেক হিংস্র ঘটনার সাথে মুসলিমরা জড়িত? যেমন– মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ। ইসলাম সমান অধিকারের কথা বলে তবে কেন আফগানিস্তানে নারী মুসলিমদেরকে কাজের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করা হয় না?

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন ইসলাম শান্তিতে বিশ্বাস করে, এটি একটি সার্বজনীন ধর্ম, তবে কেন সেখানে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কেন মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হয় না।

ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো ইসলামে মহিলাদের অধিকার, আধুনিকতা নাকি সেকেলে? এটা হচ্ছে দুই ঘণ্টার একটি বক্তৃতা এবং সেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সবাই সমান।

প্রথমত, বিশেষ কোনো জাতি-গোষ্ঠির ওপর মহিলাদের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়নি, তার মানে এই না যে, ইসলাম ভুল। আমি বলবো যে, ইসলামে মহিলাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি দ্বারা যাচাই করা সম্ভব নয়, নারী অধিকারের বিষয়টি প্রমাণাদির ওপর ভিত্তি করে করতে হবে। ইসলামই মহিলাদের দিয়েছে সবচেয়ে বেশি অধিকার। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর চেয়েও বেশি ইসলাম নারীদের এই অধিকার দিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। কি কি অধিকার নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার, আত্মিক অধিকার, ন্যায্য অধিকার, সামাজিক অধিকার? শিক্ষার অধিকার, কেন একটি নির্দিষ্ট সমাজ এমন করছে তাদের কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করুন ইসলাম তাদের এই অধিকার দেয় নি?

মৌলবাদ প্রসঙ্গে মুসলমানরা হচ্ছে শান্তিপ্রিয় মানুষ। কেন তারা মৌলবাদী হলো? তবে আমি গর্বিত এই বলে যে, আমি মৌলবাদী, ডা. জাকির নায়েক মৌলবাদী হওয়াতে গর্বিত। যে ব্যক্তি মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলে তাকে বলা হয় মৌলবাদী। যেমন : আপনি যদি একজন ভাল গণিতবিদ হতে চান, আপনাকে জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে গণিতের মৌলিক বিষয়গুলোকে, মৌলিক বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারবেন না। ঠিক একইভাবে, আমি গর্বিত এই জন্য যে, আমি একজন মৌলিক মুসলিম। আমি জানি, অনুসরণ করি এবং অনুশীলন করি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে, আপনাকে জানতে হবে আধুনিক অর্থে মৌলবাদ। মৌলবাদ বলতে বুঝায়, সন্ত্রাসবাদ, এর মানে এই নয় যে, প্রকৃত পক্ষে কি বুঝায়, একজন হিন্দুর জন্য আদর্শ হিন্দু হতে হলে তাকে অনুসরণ করতে হবে এবং পালন করতে হবে, জানতে হবে মৌলিক হিন্দুত্ববাদ সম্পর্কে। আর এজন্য আপনাকে হিন্দু মৌলবাদী হতে হবে।

একজন ভাল খ্রিস্টান হতে হলে আপনাকে খ্রিস্টান ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে, মানতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে, আর এই মৌলিক বিষয়গুলো না জানতে পারা পর্যন্ত আপনি একজন ভাল খ্রিস্টান হতে পারবেন না। আমি জানি যে, ইসলামের প্রতিটি মৌলিক বিষয়গুলো মানবতার পরিপন্থী নয়। ইসলামের সূক্ষ্ম কোনো মৌলিক বিষয়ও মানবতার পরিপন্থী নয়। আপনি আপনার জ্ঞানের অভাবের কারণে বলেন যে,এটা মানবতার পরিপন্থী। আপনি হয় ইসলামিক আইন ভাল করে জানেন না, না হয় আপনি বিশ্বের পরিসংখ্যান সম্পর্কে জ্ঞাত নন, সন্ত্রাসবাদী প্রসঙ্গে একজন ব্যক্তি ধরুন, ভারতে একজন মুক্তিযোদ্ধা, আপনি জানেন তাদেরকে আমরা দেশভক্ত বলি। আর ব্রিটিশরা তাদেরকে বলেছে সন্ত্রাসী, ঠিক একই লোক একই কাজের কারণে।

ভারতবাসী মনে করে, ব্রিটিশদের ভারত শাসনের কোনো অধিকার নেই। আর ব্রিটিশরা ভাবেন ভারতের ওপর তাদের অধিকার আছে এবং ব্রিটিশরা ভাবে ভারতীয়রা সন্ত্রাসী। একই মানুষ, একই কাজ শুধু স্তর দুটো আলাদা, এটা নির্ভর করে আপনার বিষয়টি কিভাবে মেনে নিচ্ছেন তার ওপর। যদি আপনি ব্রিটিশদের অভিমত মেনে নেন তাহলে তারা সন্ত্রাসী, আর যদি ভারতবাসীর অভিমত মেনে নেন তাহলে তারা দেশভক্ত। একই মানুষকে আলাদা আলাদা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যায়, আপনি যদি সঠিকভাবে একজন মানুষকে বিচার করেন তাহলে কোনো প্রকৃত মুসলমানই কোনোদিন সন্ত্রাসী হতে পারবে না, সত্যি বলতে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই যেমন– হিটলার, ছয় মিলিয়ন ইহুদি হত্যা করেছে। যে একজন খ্রিস্টান, তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে, খ্রিস্টধর্ম খারাপ। ঠিক তেমনি মুসোলিনি হাজারও সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে। তাই বলে খ্রিস্টধর্ম খারাপ? ঠিক তেমনিভাবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই, কিন্তু এর স্তরটা নির্ভর করবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মুসলিম মহিলাদের কেন সমান অধিকার দেয়া হয় না?

বিষয়টা এমন নয় যে, ইসলাম নারীদের সব কাজে সমান অধিকার দিয়েছে, তবে তা অবশ্যই হতে হবে শরিয়াহ ভিত্তিক। যেমন : একজন মহিলা মদের দোকানে কাজ করতে পারেন না, যেখানে একজন পুরুষ পর্যন্ত পারে না, একজন মহিলা জুয়ার আসরে কাজ করতে পারে না, একজন মহিলা শরীর প্রদর্শন করে কাজ করতে পারেন না। যেমন : মডেলিং অভিনয়, আমরা চাই আমাদের নারীদেরকে সম্মান দেখাতে, কিন্তু এসব কাজে হাজারও পুরুষ মহিলাদের সামনে বসে থেকে তাদেরকে দেখে এবং শিস দেয়। আমরা ভদ্র জীবন যাপনে বিশ্বাসী, তাই শরীর প্রদর্শন করে যেসব কাজ করা হয় তা ভদ্র জীবন দিতে পারে না। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মহিলাদের প্রতি উদারতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে মেয়েদের অসম্মান, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার একটা নতুন পথ। পশ্চিমা বিশ্ব বলছে মহিলাদের উপরে উঠানো হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদেরকে আরও নিচে নামানো হচ্ছে। ইসলাম এসব কাজে কখনো সমর্থন দেয় না, অন্যথায় অন্য যেকোনো চাকরি, যে কাজই হোক তা অবশ্যই হতে হবে ভদ্রতার মধ্যে, পর্দার ভেতর থেকে এবং যৌন বিষয়গুলো থেকে দূরে থেকে।

আমরা পত্রিকায় সংবাদ দেখি কিন্তু কখনো যাচাই করি না তা সত্য কি মিথ্যা। পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে, 'যখন কোনো সংবাদ পাও তখন তা খতিয়ে দেখ। আমি ভারতীয় পত্রিকায় পড়েছি, আফগানরা, মুজাহিদরা মহিলাদের

হত্যা করে, তারা মহিলাদের কাজে যেতে দেয় না, এমনকি মহিলা ডাক্তাদের কাজে যেতে দেয় না এবং তাদের বেতন বন্ধ করে দেয়, এরকম আরো অনেক কিছু। আমি 'টাইমস' ম্যাগাজিনে পড়েছি যে– মুজাহিদরা মহিলাদের অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু মহিলা ডাক্তারদের কাজে বাধা দেয় না এবং মহিলা শিক্ষিকাদের নিষেধ করে না, মুজাহিদরা যাদের কাজে যেতে বাধা দেয়, তাদের বাসায় বাসায় গিয়ে বেতনাদি পৌঁছে দিয়ে আসে, তাদেরকে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। দেখুন, আপনি যদি কোনো অশোভনীয় কাজ করেন, তাহলে আমরা বলি আপনি খারাপ; এরা অশোভনীয় কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। মডেলিং করো না, নাচ করো না, অভিনয় করো না। কিন্তু বিনিময়ে যা পেতে তা তোমাদের বাসায় দিয়ে আসা হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন যে, পত্রিকায় আমরা ভিন্ন রকম সংবাদ পাই। আপনি এখানে বসে বলতে পারবেন না কোন্টা সঠিক 'টাইমস অব ইন্ডিয়া 'না' টাইমস ম্যাগাজিন' আমরা জানি না, সেজন্য আল-কুরআন বলে, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো, কর্মক্ষেত্রে কর্মদক্ষ লোক আছে, কিন্তু আমরা যে সংবাদ পাই এবং আপনাদের যা দেয়া হয় তার সবই প্রচার মাধ্যম থেকে পাওয়া। আর প্রচার মাধ্যমগুলো পশ্চিমা বিশ্বের হাতে, তারা প্রচার মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর তারা অহেতুক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম

HINDUISM AND ISLAM

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ শামসুল ইসলাম
বি.এ (অনার্স), ইসলামিক স্টাডিজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

মোহাম্মদ নায়েক : অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে আমি উপস্থিত বিজ্ঞ বক্তাদের শ্রদ্ধা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের এ আনন্দ ঘন সন্ধ্যায় আমি ডা. মোহাম্মদ নায়েক, এ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছি। 'ডিসকভার ইসলাম এডুকেশনাল ট্রাস্ট' এবং 'আর্ট অব লিবিং ফাইন্ডেশনের' পক্ষ থেকে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ব্যাঙ্গালোরে এ প্যালেস গ্রাউন্ডে উপস্থিত সব দর্শক ও শ্রোতাকে। আরো অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদেরকে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে টেলিভিশনে আমাদের এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন।

'প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা' অনেকের কাছেই একটি ধাঁধা, একটি রহস্য, অনেকের কাছেই বোধের অতীত ধারণা মাত্র।

আজকের এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিকর্তা বা প্রভুকে জানার ও বুঝার চেষ্টা করবো। আর একথা সত্যি যে, ভারতের মানুষদের পাশাপাশি দুনিয়ার সব মানুষেরই এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন দুজন বিদগ্ধ বক্তা, যারা ধর্মের ওপর আলোচনা করে থাকেন। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁদের অসংখ্য ভক্ত শ্রোতা। শ্রী শ্রী রবি শংকরজী এবং ডা. জাকির নায়েক। তারা দুজনেই আজ আমাদের বুঝাবেন আর জানাবেন সৃষ্টিকর্তার ধারণা। হিন্দুধর্ম আর ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা, পরিচিতি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিকর্তা বা প্রভু বলতে আমরা কী বুঝি?

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে, বক্তারা দুজনেই পঞ্চাশ মিনিট করে তাদের আলোচনা করবেন।

আজ বিকেলে শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর অনুরোধে অনুষ্ঠানে রবি শংকরজীর পরিবর্তে প্রথমেই আলোচনা করবেন ডা. জাকির নায়েক, তাঁর সময় পঞ্চাশ মিনিট। তারপর রবি শংকরজী আলোচনা করবেন ষাট মিনিট। পরে ডা. জাকির নায়েক আবার আলোচনায় ফিরে আসবেন, তিনি ১০ মিনিট শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর বিভিন্ন কথার উত্তর দিবেন। বক্তৃতা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হবে আরো উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় পর্ব, উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। যে পর্বে সাংবাদিক ও শ্রোতামণ্ডলী আজকের বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন, আর আমাদের বক্তাদ্বয় তাদের সেসব

প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন। আমি আরো পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. বিনোদ মেননকে, যিনি আমার ডান পাশে এবং ডা. শোয়েব সাইয়াদকে যিনি ডা. জাকির নায়েকের পাশে। আমরা বক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করার জন্যে।

পিস টিভি এভাবেই মানবজাতির সমস্যা সমাধানে বিশ্বব্যাপী নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এ টিভি চ্যানেল ২৪ ঘণ্টার আধ্যাত্মিক বিনোদনমূলক আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। পিস টিভি বিনা মূল্যে ইংরেজি ও উর্দুতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। সৃজনশীলতা, প্রোগ্রাম সফটওয়্যার এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বমানবতার সামনে সত্য, ন্যায়-বিচার, সততা, সামঞ্জস্য আর জ্ঞানের কথা পিস টিভি সর্বাত্মকভাবে প্রচার করছে। আমি পিস টিভির কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করেছিলাম যে, 'কেন তারা শান্তির পেছনে ছুটছে?' তারা উত্তর দিয়েছিল, 'বিশ্বের এই শান্তিকে অনেক অত্যাচারী শাসকই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চরম অবহেলা করেছে। মানুষের জীবনে আসলেই শান্তি নেই। আর নিষ্ঠুর বাস্তবতা মানুষকে করেছে আরো ভীত, কামুক, হিংস্র আর লোভী। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস থেকে পালিয়ে বেড়ানো মানুষের নৈতিকতা আর মূল্যবোধে এনেছে অবক্ষয়। জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে সৃষ্টিকর্তা, ধর্ম ও জীবন দর্শনের আলোচনা জনপ্রিয় কোনো চ্যানেলেই প্রচার করা হয় না। এদিকে দিগভ্রান্ত, গোঁড়া, কট্টর গুটিকয়েক মানুষদের হিংস্র ধ্বংসাত্মক কাজকে মিডিয়ায় তুলে ধরা হচ্ছে। আর এজন্যেই তারা পিস টিভি নামক চ্যানেল চালু করেছেন।'

বক্তা পরিচিতি

এখন আমি অনুরোধ করবো ডা. শোয়েব সাইয়াদকে শ্রোতা দর্শকদের সাথে ডা. জাকির নায়েককে পরিচয় করে দেয়ার জন্য।

ডা. শোয়েব সাইয়াদ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েকের সাথে। যিনি প্রেসিডেন্ট ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মুম্বাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তিনি সুচিন্তিত মতামত এবং অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। গত দশ বছরে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বজুড়ে সর্বমোট এক হাজারেরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে। তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন টিভি, রেডিওতে। এমনকি প্রেসেও তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এগুলো ছাড়াও তিনি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। ভাই এবং বোনেরা, এখন আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করতে আসছেন ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী রবি শংকরজী, উপস্থিত আমার গুরুজনরা এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক রীতিতে, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সবার ওপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান্তি দয়া আর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আজকের আলোচনার বিষয় হলো ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। আমি আমার কথার শুরুতেই কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : বলো, হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তার সাথে কউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যই মুসলিম।

প্রথম সাদৃশ্যটা কী?

'আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করি না। কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবো না। আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। যদি তারা অমান্য করে, তোমরা সাক্ষী থাকো। আমরা মুসলমান।'

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানরা। এ কথা দিয়ে মূলত বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে।

'সেই কথায় এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের' এ কথার প্রথম সাদৃশ্যটা হলো, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করি না, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করি না' এটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না, যদি কোনো ধর্মকে বা কোনো ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে চান সেই ধর্মের কিছু অনুসারীদের দেখে। কেননা প্রায়ই দেখা যায়, ধর্মের অনুসারীরাই তাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না অথবা তাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেও জানে না। এটাও ঠিক হবে না। যদি আপনি সেই ধর্মের অনুসারীদের রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন। তাই আপনি যদি কোনো ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান বা সেই ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে চান তাহলে

দেখুন– সেই ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে ধর্ম সম্পর্কে অথবা সেই ধর্মের সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে কী বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ধর্ম গ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ধারণা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আসুন বুঝার চেষ্টা করি 'হিন্দুইজম ও ইসলাম' শব্দ এ দুটি দিয়ে আসলে কী বুঝানো হয়।

'হিন্দু' শব্দের একটি ভৌগোলিক বিশেষত্ব রয়েছে। এ শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা সিন্ধু নদের ওপারে বাস করে বা যে মানব সম্প্রদায় সিন্ধু নদের অববাহিকায় বাস করে। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই বলেন যে, এই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল আরবগণ। কেউ কেউ আবার বলেন, এ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিল পার্সিয়ানরা, যারা ভারতে এসেছিল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্সের ৬ নম্বর ভলিউমের ৬৯৯ নং রেফারেন্স অনুযায়ী, মুসলমানগণ হিন্দু শব্দটা ভারতের কোনো সাহিত্যে কখনো ব্যবহার করতো না। আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তিনি তাঁর বই 'ডিসকভারি অভ ইনডিয়া'তে লিখেছেন যে, এই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথমবার ব্যবহার করা হয়েছিল ৮ম শতাব্দীতে তান্ত্রিকদের বুঝানোর জন্যে। আর এ শব্দটা দিয়ে বুঝানো হতো একদল মানুষকে। কোনো ধর্মকে বুঝানো হতো না। ধর্মের সাথে এ শব্দটা যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। (পৃষ্ঠা-৭৪ ও ৭৫)

'হিন্দুইজম' শব্দটা এসেছে 'হিন্দু' শব্দ থেকে। আর এ শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল উনিশ শতকে বৃটিশ লেখকরা। তারা ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসকে বুঝাতে এ শব্দটা ব্যবহার করেছিল। নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ২০ নং ভলিউমের ৫৮১ নং রেফারেন্স অনুযায়ী 'হিন্দুইজম' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ লেখকগণ। আর সেটা ১৮৩০ সালে। ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসকে বুঝাতে যারা খ্রিস্টান হয়েছে তারা বাদে। ঠিক একারণেই বেশির ভাগ হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন 'হিন্দুইজম' শব্দটা আসলে সঠিক নয়। সঠিক শব্দটা হবে 'সনাতন' ধর্ম, চিরস্থায়ী ধর্ম অথবা বৈদিকধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'হিন্দুইজম' শব্দটা সঠিক নয় তাঁর মতে সঠিক শব্দটা হবে 'বেদান্তবাদী' বা বেদের অনুসারী।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ

আসুন, এবার বুঝার চেষ্টা করি 'ইসলাম' শব্দ দিয়ে কী বুঝায়? 'ইসলাম' শব্দটার উৎপত্তি আরবি 'সালাম' শব্দ থেকে। যার অর্থ শান্তি। ঠিক এ শব্দটিই এসেছে আরবি 'সিলম্' থেকে, যার অর্থ 'নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা'। এক কথায় ইসলাম অর্থ 'নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।' 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি সহীহ্ হাদীসেও। যেমন : সূরা আলে-ইমরানের ১৯নং আয়াতে এবং ৮৫ নং আয়াতে। উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সেই সত্যিকারের মুসলিম।'

এ 'মুসলিম' শব্দটা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে এবং সহীহ হাদীসেও আছে। আরো উল্লেখ আছে সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এবং সূরা হামীম সাজদার ৩৩ নং আয়াতে।

একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইসলাম নতুন ধর্ম, যে ধর্মটা পৃথিবীতে এসেছে ১৪০০ বছর আগে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ হলেন এ সত্য দ্বীনের প্রবর্তক। সত্যিকথা বলতে কি, ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয়েছে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে যখন মানুষ পৃথিবীতে পা রেখেছিল। আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার মুহাম্মাদ ﷺ ইসলাম ধর্ম প্রথম্ম প্রবর্তন করেন নি। বরং তিনি হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী যাকে আল্লাহ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হিসেবে দুনিয়ার জমিনে পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে ছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য।

দুটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো

এবার আসুন, দেখার চেষ্টা করি দুটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো কী কী?

হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো ২ ভাগে উপলব্ধি করা হয়েছে, বুঝে নেয়া হয়েছে, যেটা প্রকাশ করা হয়েছে, আর শ্রুতিগুলোকে বলা হয় ঈশ্বরের বাণী। এগুলো স্মৃতির চেয়ে বেশি পবিত্র। 'শ্রুতি' আবার ২ ভাগে বিভক্ত। যথা : বেদ ও উপনিষদ, 'বেদ' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে যা ছিল মূল 'ভিদ'। 'বেদ' অর্থ হলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান' পবিত্র জ্ঞান। 'বেদ'-সমূহ আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা : ঋগবেদ, যযুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। সর্বমোট ৪টি বেদ। তবে বেদগুলো কত পুরনো সেটা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে, যিনি ছিলেন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলেন যে, বেদগুলো ১৩১ কোটি বছর আগে লেখা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ হিন্দুধর্ম বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বেদগুলো আনুমানিক ৪০০০ বছর পূর্বে লেখা। বেদগুলো কীভাবে পৃথিবীতে এসেছে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

কোনো ঋষির ওপর প্রথম এ বেদগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল, এ বিষয়েও পণ্ডিতগণের মতভেদ রয়েছে। যদিও পণ্ডিতদের ভেতরে মতভেদ রয়েছে যে, বেদ কবে এসেছে? কীভাবে এসেছে, কোন্ অংশ প্রথম এসেছে, কে প্রথম পেয়েছেন, এসব মতভেদগুলো থাকা সত্ত্বেও বেদগুলোকে বলা হয় 'হিন্দু ধর্মের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র'। যদি অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের কথা 'বেদের' সাথে না মিলে তাহলে এটাকেই মানা হবে। এর পরের ধর্মগ্রন্থ হলো 'উপনিষদ'। উপনিষদ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে। যার অর্থ হল এরূপ 'উপ' অর্থ কাছে 'নি' অর্থ নিচে 'ষদ' অর্থ বসা অর্থাৎ কাছাকাছি নিচে বসা। যখন ছাত্ররা গুরুর কাছে বসে বিদ্যা অর্জন করার চেষ্টা করে, সেটাকেই মূলত 'উপনিষদ' বলে। উপনিষদকে আরো

বলা হয় এমন জ্ঞান যা অজ্ঞতা দূর করে। পৃথিবীতে ২০০-এর অধিক উপনিষদ আছে। তবে হিন্দুধর্মে এর সংখ্যা বলা হয় ১৮০।

হিন্দুধর্মের পণ্ডিতরা কিছু উপনিষদকে বলেছেন প্রধান প্রধান উপনিষদ। রাধা কৃষাণ বেছে নিয়েছেন ১৮টি উপনিষদ আর এই বিষয়ে বই লিখেছেন "প্রিন্সিপাল উপনিষদ"।

পরবর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে 'স্মৃতি'। 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ মনে করা, স্মরণশক্তি। স্মৃতিগুলো শ্রুতির চেয়ে কম পবিত্র। এগুলো স্রষ্টার বাণী নয়। এগুলো লিখেছেন বিভিন্ন মুনি-ঋষিরা আর নানান রকম মানুষ। এখানে আছে বিশ্বজগৎ স্মৃতির রহস্য, কীভাবে মানুষ জীবন ধারণ করে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, সমষ্টিগত ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে। এটাকে আরো বলা হয়ে থাকে ধর্মশাস্ত্র। 'স্মৃতির' বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন রয়েছে পুরাণ, পুরাণ অর্থ প্রাচীন, মহর্ষি ব্যসদেব, তিনি পুরাণ লিখেছেন সর্বমোট ১৮টি খণ্ডে। এমন একটি হলো 'ভবিষ্য পুরাণ'। এরপর আছে ইতিহাস মহাকাব্য। মোট দুটি মহাকাব্য রয়েছে, তাহলো 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।

রামায়ণে কী বলা হয়েছে তা বেশির ভাগ ভারতীয়রাই জানেন, তা হলো শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন কাহিনী। আর মহাভারতে আছে আরেক কাহিনী, তা হলো রাজত্ব নিয়ে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ। এতে আরো বলা হয়েছে শ্রী কৃষ্ণের কাহিনী।

এরপরে রয়েছে 'ভগবদগীতা'। ভগবতগীতা মহাভারতেরই একটা অংশ, মহাভারতের মোট ১৮টি পর্ব নিয়ে ভীষ্মপর্ব। এটা ২৫ নং অধ্যায় থেকে ৪২ নং অধ্যায় পর্যন্ত। ভগবতগীতা হলো অর্জুনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের উপদেশ। ভগবতগীতা সবচেয়ে জনপ্রিয়, আর হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এটাই বেশি পড়া হয়। এছাড়াও রয়েছে মনশ্রুতি এবং আরো অনেক। এগুলো হলো খুব অল্প কথায় হিন্দুধর্মের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। মোটকথা, সবচেয়ে পবিত্র ও খাঁটি গ্রন্থ হলো 'বেদ'। যদি কোনো কিছু বেদের বিপক্ষে যায় তাহলে বেদকেই মানতে হয়।

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ আলোচনা

আসুন এবার আমরা 'ইসলাম'-এর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করি। ইসলামে সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। এ কুরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব, যা মহান আল্লাহ নাযিল করেছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। পবিত্র কুরআনের সূরা রাদের ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন– وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ

অর্থ : তোমার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি।

পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান বেশ কিছু আসমানি কিতাব রয়েছে। কুরআন মজীদে ৪টি কিতাবের নাম উল্লেখ আছে। তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এছাড়াও আরো কিতাব রয়েছে। যেমন সুহফে ইব্রাহীম। উল্লেখ্য যে, যেসব ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ যেসব কিতাব নাযিল করেছেন পবিত্র কুরআন মজীদের আগে, সেই কিতাবগুলো আসলে গুটি কয়েক মানুষ বা সম্প্রদায়ের জন্যে। আর সেই কিতাবগুলোর নির্দেশনা মেনে চলার প্রয়োজন ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।

তবে যেহেতু কুরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব। তাই এই কিতাব শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, শুধু আরব জাতির জন্যে নয়, এ কিতাব সমগ্র মানবজাতির জন্যে। পবিত্র কুরআনে সূরা ইব্রাহীমে ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ لا

অর্থ : আলিফ লাম-রা, আমি এই মহান কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এজন্যে যে, যাতে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পার।

এখানে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কেবল মুসলমান কিংবা আরবজাতির কথা বলেন নি বরং সমগ্র মানবজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের মহানবী ﷺ যেসব কাজ করতেন অথবা যেসব কথা বলতেন তাই হলো হাদীস। হাদীসের অনেক কিতাব রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো সহীহ আল বোখারী, এছাড়াও রয়েছে সহীহ মুসলিম। এই হাদীস, আমাদের নবী করীম ﷺ-এর কথা ও কাজ, আর এই কথা ও কাজই হলো পবিত্র কুরআনের ধারা বিবরণী।

হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও সাহায্যকারী গ্রন্থ। হাদীস কখনোই কুরআনের বিপক্ষে যাবে না। কুরআন ও হাদীস এ কিতাব দুটিই ইসলামের পবিত্র দুটি ধর্মগ্রন্থ।

ধর্ম গ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা

এবার আমরা মূল আলোচনা শুরু করবো। পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে। ডা. জাকির নায়েক কী বলেন অথবা শ্রী শ্রী রবিশংকরজী কী বলেন, কিংবা অন্য মানুষরা কী বলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে দেখতে হবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো কী বলছে, মহান সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে। যদি আমি কিছু বলি বা শ্রী শ্রী রবি শংকর কিছু বলেন কিংবা অন্য কেউ কিছু বলেন যদি সেটা ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা অবশ্যই মেনে নিব। যদি আমি এমন কিছু বলি বা উদাহরণ দিই যা ধর্মগ্রন্থের সাথে না মিলে তাহলে আমরা সেটা বাদ দিয়ে দিব।

প্রথমেই আমরা হিন্দুধর্মের আলোকে সে ধর্মের ঈশ্বরকে নিয়ে আলোচনা করবো। যদি কোনো সাধারণ হিন্দুকে প্রশ্ন করেন যে, সে কতজন দেবতাকে বিশ্বাস করে, তাহলে তারা কেউ বলবে ৩ জন, কেউ বলবে ১০০ জন, কেউ বলবে হাজার জন আবার কেউ বলবে ৩৩ কোটি বা ৩৩০ মিলিয়ন। কিন্তু যদি কোনো জ্ঞানী হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন, যার হিন্দু ধর্মগ্রন্থের (রামায়ণ ও মহাভারত) সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে। তিনি জবাব দেবেন যে, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস ও পূজা করা উচিত এক ঈশ্বরকে। তবে উল্লেখ্য যে, একজন সাধারণ হিন্দু যে ধর্মমতে বিশ্বাস করে সেটি হলো প্যানথিজম। সব কিছুই স্রষ্টা। সাধারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে– গাছ, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ এমন কি সাপও স্রষ্টা। আর আমরা মুসলমানরা বলি সব কিছু স্রষ্টার। 'স্রষ্টা' শব্দটার পরে 'র' আছে। সবকিছুর একমাত্র একচ্ছত্র মালিক হলেন স্রষ্টা। গাছ, সূর্য, চন্দ্র, মানুষের একমাত্র মালিক স্রষ্টা। তাহলে একজন সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য হলো, হিন্দু বলবে সব কিছুই স্রষ্টা আর একজন মুসলমান বলবে সব কিছুই 'স্রষ্টার'সৃষ্টি। মুসলমানরা সব সময় 'স্রষ্টা' শব্দের পরে 'র' যোগ করে বলছে, তাহলে দেখা গেল প্রধান পার্থক্য হচ্ছে 'র' অক্ষরটি। আমরা যদি এই 'র' অক্ষরটির পার্থক্য দূর করতে পারি তাহলে হিন্দু আর মুসলমানরা এক হয়ে যাব। আমরা সেটা কীভাবে করবো? আল-কুরআন এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে–

'সেই কথায় এসো, যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক।' প্রথম সাদৃশ্যটা কী?' 'আমরা অন্য কারো ইবাদাত করি না আল্লাহ তাআলা ব্যতীত।'

এবার আসুন বুঝার চেষ্টা করি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে সেই ধর্মের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে কী বলে।

ছান্দগ্য উপনিষদ : অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২ ও ১-এ রয়েছে 'স্রষ্টা মাত্র একজনই। দ্বিতীয় কেউ নেই।' আমি ভালো করে জানি এখানে বেদের ওপর জ্ঞানসম্পন্ন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। তিনি আর কেউ নন আমি শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর কথা বলছি। এ বিষয়ে আমি একজন ছাত্র।

তাই যদি আমার সংস্কৃত উচ্চারণ শুদ্ধ না হয়, তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। উনি হলেন বেদের উপর একজন পণ্ডিত, আর আমি হলাম ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর একজন ছাত্র। পাশাপাশি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও বেদের ছাত্র।

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-৯-এ রয়েছে–

'তাঁর (ঈশ্বরের) কোনো বাবা মা নেই, তাঁর কোনো প্রভু নেই, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা নেই, তাঁর কোনো মা নেই তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।'

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯-এ রয়েছে– সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই।

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ ১০, অনুচ্ছেদ ২০-এ উল্লেখ আছে– 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না'। এছাড়াও ভগবদগীতা অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ ২০-এ রয়েছে– 'সেসব লোক যাদের বিচারবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, তারাই মূর্তি পূজা করে।'

আর এই উদ্ধৃতিটা শ্রী শ্রী রবিশংকরও দিয়েছেন তাঁর 'হিন্দুইজম অ্যান্ড ইসলামঃ দ্য কমন থ্রেট' বইয়ের 'নট ওয়ার শিপিং আইডল গড' অধ্যায়ে। তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু রেফারেন্স দেন নি। রেফারেন্সটা হলো ভগবদগীতা : অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২০; অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩-এ বলা হয়েছে–

'লোকে জানে আমি কখনো জন্মায় নি, কখনো উদ্ভূত হই নি। আমি এ বিশ্ব জগতের সর্বময় প্রভু।'

হিন্দুধর্মের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো বেদ। যযুর্বেদ : অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো মূর্তি নেই।' প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্তি, উপমা, রূপক, ফটো, ভাস্কর্য, মূর্তি প্রভৃতি।

যযুর্বেদ : অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র।' যযুর্বেদ-এর ৪০ নং অধ্যায়ে ৯নং অনুচ্ছেদে আছে, 'আন্ধাতমা' অর্থ হলো অন্ধকার। 'প্রবিশান্তি' অর্থ হলো প্রবেশ করা। আর 'আমানুতি' অর্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু যেমন : আগুন, পানি, বাতাস।

তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে। যেমন : আগুন, পানি, বাতাস। এখানে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, 'তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা সাম্বুতির পূজা করে। 'সাম্বুতি' হলো মানুষের তৈরি বস্তু, যেমন : চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। এটা বলা হয়েছে যযুর্বেদ-এর ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদে।

অথর্ববেদ : ২০ নং অধ্যায়ের ৫৮ নং স্তোত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সৃষ্টিকর্তা সুমহান।' আর বেদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো ঋগবেদ। এ ঋগবেদের গ্রন্থ-১, ১৬৪ নং পরিচ্ছেদ-৪৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

'সত্য একটাই। ঈশ্বর একজনই। জ্ঞানীরা এক ঈশ্বরকে ডেকে থাকেন অনেক নামে।' ঈশ্বর একজনই, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এক ঈশ্বরকেই অনেক নামে ডাকেন। কেবল ঋগবেদের ২ নং গ্রন্থের ১ নং অনুচ্ছেদে ঈশ্বরকে ৩৩টি আলাদা

নামে ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'ব্রহ্মা'। 'ব্রহ্মা' শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা। যদি আপনি সৃষ্টিকর্তা শব্দের আরবি করেন তাহলে হবে 'খালিক'।

আমাদের মুসলমানদের কোনো আপত্তি থাকে না যদি কেউ বলে যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হলেন খালিক। কিন্তু যদি কেউ বলে ঈশ্বরের ৪টি মাথা আছে : প্রত্যেক মাথায় একটা করে মুকুট আছে, তাহলে আমরা বলবো, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বানানো হচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায় তাহলে প্রবল আপত্তি জানাবে। এছাড়াও আপনি শ্বেতাসত্র উপনিষদের বিপরীত যাচ্ছেন।

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায় নং-৪, অনুচ্ছেদ নং ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে 'স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই'। 'ঋগবেদের' ২নং গ্রন্থের ১নং অধ্যায়ের ৩নং অনুচ্ছেদে স্রষ্টাকে বা ঈশ্বরকে আরেকটি নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'বিষ্ণু'। 'বিষ্ণু' হলো সেই ঈশ্বর যিনি রক্ষাকারী। যদি এই রক্ষাকারী শব্দটা আরবি করা হয় তাহলে কাছাকাছি শব্দ হল 'রব'। আমাদের মুসলমানদের কোনো ধরনের আপত্তি থাকার কারণ নেই যদি কেউ সৃষ্টিকর্তাকে 'রব' বা রক্ষাকারী বলে। কিন্তু যদি বলে থাকেন ঈশ্বরের ৪টি হাত আছে। তাহলে আমরা বলবো, এভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বানানো হয়েছে। তাঁর এক হাতে পদ্ম আরেক হাতে শাঁখ, সমুদ্রের ওপর ঘুরে বেড়ান সাপের পিঠে চড়ে। আমরা ইসলামের অনুসারীরা এতে অবশ্যই আপত্তি তুলবো। এছাড়া আপনি যযুর্বেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। যযুর্বেদ : অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ নং ৩-এ বলা হয়েছে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই। তাঁর কোনো রূপক নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই'। এছাড়া ঋগবেদ : গ্রন্থ-৮, পরিচ্ছেদ-১, অনুচ্ছেদ-১-এ বলা হয়েছে, 'শুধু তাঁরই উপাসনা করো। এক ঈশ্বরের এবং তাঁকেই বন্দনা করো।' ঋগবেদ : গ্রন্থ-৬, পরিচ্ছেদ-৪৫, অনুচ্ছেদ ১৬-তে উল্লেখ আছে, 'শুধু তাঁর বন্দনা করো। তাঁর উপাসনা করো।'

আর ব্রহ্মসূত্র, যেখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, আর কখনো ছিল না। তাহলে হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো যদি পড়েন সেই ধর্মের আলোকে আপনারা হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন।

আসুন এবার বুঝার চেষ্টা করি ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে। ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যদি কেউ বলতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই বলতে হবে আল-কুরআনের সূরা ইখলাস-এর (১-৪) আয়াত।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : হে রাসূল! আপনি বলে দিন 'তিনিই আল্লাহ, যিনি একক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে জন্ম নেন নি। তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই।

এ সংজ্ঞা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যা বলা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, সেই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, যদি সে এই চার লাইনের সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, আমরা মুসলমানরা বিনা দ্বিধায় তাকে 'সৃষ্টিকর্তা' বলে মেনে নিব। প্রথমটা ছান্দগ্য **উপনিষদ :** অধ্যায় নং ৬, পরিচ্ছেদ নং ২ অনুচ্ছেদ-১-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'বল তিনিই আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়। স্রষ্টা মাত্র একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।' এই একই কথা ভগবদ গীতা : অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩-এ বলা হয়েছে–

'লোকে জানে আমি কখনো জন্মাই নি, কখনো উদ্ভূত হই নি, আমি কোনো রকম শুরু ছাড়াই এই জগতের সর্বময় প্রভু।' তৃতীয়টা হলো তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি বা জন্ম নেনও নি। ঠিক একই কথা শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-৯-এ বলা আছে–

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা-মা নেই, তাঁর কোনো প্রভু নেই, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা নেই, মা নেই, তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই।'

আর চতুর্থটি হলো 'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' শ্বেতাসত্র উপনিষদ-৩-এ উল্লেখ আছে–

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এর প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, তাঁর কোনো রূপক নেই, তাঁর কোনো ছবি নেই। তাঁর কোনো মূর্তি নেই।'

যদি কেউ বলে, এই লোকটি ঈশ্বর, যদি সেই কুরআনের সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়। হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর সাথে মিলে যায়, সেই লোককে 'সৃষ্টিকর্তার' বলে মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। যদিও এটা আদৌ সম্ভবপর হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক লোক আছেন, যারা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে জানেন। একবার এক প্রশ্নোত্তর পর্বে এক হিন্দু ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, ভাই জাকির, আমরা হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানি। উত্তরে বলেছিলাম যে, আমি কখনোই বলি না হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানেন। আমি হিন্দুধর্মের ধর্ম গ্রন্থগুলো পড়েছি। ওইসব গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নেই যে, ভগবান রজনীশ হলেন ঈশ্বর। আমি বলেছি যে, কিছু মানুষ, কিছু কিছু হিন্দু বিশ্বাস করেন যে, ভগবান রজনীশ ঈশ্বর এবং অনেকেই তাকে ঈশ্বর বলে জানেন।

আসুন, আমরা আমাদের পবিত্র কুরআন-এর সূরা ইখলাস দিয়ে ভগবান রজনীশকে পরীক্ষা করে দেখি, আর হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো দিয়েও পরীক্ষা করে দেখি, ভগবান রজনীশ ঈশ্বর কিনা?

প্রথমত, 'বলো তিনিই আল্লাহ যিনি একক।' স্রষ্টা একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই। ভগবান রজনীশ কি অদ্বিতীয়? সেই কি একমাত্র মানুষ যে নিজকে ঈশ্বর বলে দাবি করে? অনেকেই দাবি করে, বিশেষ করে এই ভারত বর্ষে অনেকই দাবি করে, আমি ঈশ্বর। সে-ই একমাত্র নয়। তবে রজনীশের ভক্তরা কেন বলবে যে, রজনীশ অদ্বিতীয়।

এবার দ্বিতীয় পরীক্ষায় আসি 'আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।' যদি ভগবান রজনীশের আত্মজীবনী পড়েন, তাহলে সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে, রজনীশ অ্যাজমা রোগে ভুগতেন। পিঠেও ছিল প্রচণ্ড ব্যথা, এমনকি ছিল ডায়াবেটিস ম্যালাইটিস। চিন্তা করে দেখুন ঈশ্বরের পিঠে ব্যথা হয়, অ্যাজমা হয়, ডায়াবেটিস ম্যালাইটিসও হয়? তৃতীয় পরীক্ষা হলো 'তিনি কাউকে জন্ম দেন নি ও জন্ম নেন নি।'

আমরা জানি ভগবান রজনীশ জন্ম নিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে, তার বাবা মাও ছিল। তিনি আমেরিকায় যান ১৯৮১ সালে। ওখানে তিনি বহু সংখ্যক আমেরিকান ভক্ত তৈরি করেন। আর সেখানে তিনি অরিগন স্টেটে একটা গ্রাম তৈরি করেন যার নাম দেন 'রজনীশপুরম'। পরবর্তী আমেরিকান সরকার তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দি করে রাখে। তখন রজনীশ অভিযোগ করেন যে, আমেরিকান সরকার তাকে স্লো পয়জনিং করেছে। চিন্তা করতে পারেন? ঈশ্বরকে 'স্লো পয়জনিং' করা হয়েছে। এরপর ১৯৮৫ সালে আমেরিকান সরকার তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়। তিনি আবার ভারতে ফিরে আসেন পুণা শহরে তার আশ্রমে। যেটাকে বলা হয় 'ওশো কমিউন'। ওখানে যদি যান তাহলে দেখবেন, তার সমাধির ওপর খোদাই করে লেখা 'ভগবান রজনীশ ওশো'। কখনো জন্ম নেন নি, কখনো মরেন নি। তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।'

তার সমাধিতে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে, পৃথিবীর মোট ২১টি দেশ তাকে কোনোভাবেই ভিসা দিতে রাজি হয় নি। চিন্তা করুন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রজনীশ এই পৃথিবীতে এলেন পৃথিবীটা ভ্রমণ করতে, তার নাকি আবার ভিসা লাগবে! সে সময়ে গ্রিসের আর্চ বিশপ বলেছিলেন, যদি রজনীশকে এই দেশ থেকে তাড়ানো না হয়, তাহলে আগে ওর বাড়ি পোড়াবো, তারপর ভক্তদের বাড়ি পোড়াবো। আর মনে রাখবেন শেষ পরীক্ষা–এই পরীক্ষা এতোই কঠিন যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই'।

যখনই আপনি ঈশ্বরকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন, যদি করেন তিনি ঈশ্বর নন। আমরা জানি যে, ভগবান রজনীশ একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর দুটি চোখ, দুটি হাত, সাদা দাড়ি ছিল। যখনই আপনি ঈশ্বরকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন, এই পৃথিবীর বিশ্বজগতের তিনি অবশ্যই ঈশ্বর নন।

ধরুন, কেউ বললো যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরনল্ড শোয়ার্জনেগারের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি শক্তিশালী মানুষ। আপনারা হয়তো আরনল্ড শোয়ার্জনেগারের নাম শুনেছেন। এ লোক এক সময় ছিল মিস্টার ইউনিভার্স। ইউনিভার্সের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। ঈশ্বরকে পৃথিবীর যার সাথে তুলনা করুন সেটা আরনল্ড শোয়ার্জনেগার হোক, দারা সিং হোক বা কিং কিং হোক। এক হাজার গুণ হোক বা লক্ষ গুণ হোক, যখনই আপনি ঈশ্বরকে এই পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন, তিনি ঈশ্বর নন, হতে পারেন না।

'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' এটা হলো এক কথায় সর্বশক্তিমান স্রষ্টার চার লাইনের সংজ্ঞা। আমি এটাকে বলি 'লিটমাস টেস্ট'। ঈশ্বরকে পরীক্ষার জন্যে, ঈশ্বরকে চেনার জন্যে, বুঝার জন্যে সূরা বনী ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ ط الْحُسْنٰى ج

অর্থ: হে রাসূল আপনি এদেরকে বলে দিন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো আর রহমান নাম ধরে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো সব সুন্দর নামই তাঁর।

আল্লাহ তাআলাকে আপনি যে নামেই ডাকুন, ডাকতে পারেন, যেকোনো সুন্দর নামে। আর এই সুন্দর নামসমূহ তিনিই দিয়েছেন নিজেকে। এ কথাটার বিবরণ কুরআনে ৪ স্থানে দেয়া আছে। সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত-১১০, সূরা আরাফ : আয়াত ১৮০, সূরা ত্বোহা : আয়াত-৮, সূরা আল হাশর ঃ ২৪

অর্থাৎ সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার। আমরা জানি, সব মিলিয়ে ৯৯টি সুন্দর বিশেষ নাম রয়েছে আল্লাহ তাআলার যা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন : আর রাহমান, আর রাহীম, আল-করীম অর্থাৎ পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সবচেয়ে জ্ঞানী। আর সবার উপরে আল্লাহ। কেন তোমরা ঈশ্বরকে 'আল্লাহ' বলে ডাকো ইংরেজিতে 'গড' বলে ডাকো না? কারণ ইংরেজি গড (God) শব্দটাকে অনেক রূপান্তর করা যায় যেটা আরবি করা হয় না। 'গড'-এর সাথে 'এস' যোগ করলে হয় গডেস্ যা হয়ে যায় বহুবচন। অথচ আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই।

বলো, 'তিনিই আল্লাহ যিনি একক।'

যদি গড-এর পরে 'ইএস' যোগ করেন, সেটা হবে 'গডেস'। যার অর্থ একজন মহিলা ঈশ্বর। ইসলামে পুরুষ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো জেন্ডার নেই। গডের সাথে 'ফাদার' যোগ করলে হয় 'গড ফাদার'। সে আমার গডফাদার সে আমার অভিভাবক। ইসলামে 'আল্লাহ' ফাদার বা আব্বা বলে কিছু নেই। গডের সাথে মাদার যোগ করলে হয় 'গডমাদার'। ইসলামের মধ্যে আল্লাহ

মাদার বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু নেই। 'আল্লাহ' শুধু একটাই শব্দ। তাই আমরা সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলি আর এই শব্দটা আরবিতে 'আল্লাহ' হয়। আমরা মুসলমানরা ইংরেজিতে 'গড' শব্দ বলি না। তাছাড়া 'গড' শব্দটাকে অনেকভাবে রূপান্তর করা যায়। তবে যখন একজন মুসলমান কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলে, সে হয়তো 'আল্লাহ' শব্দটার অর্থ বুঝে না, তাই তারা সে জায়গায় 'গড' শব্দটি ব্যবহার করে।

যেমনটা আজকে আমি করছি। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে শুধু এটুকু বলতে চাই, ইংরেজি ভাষায় 'গড' শব্দটি আরবি আল্লাহ শব্দের সঠিক অনুবাদ নয়। আর এই আল্লাহ শব্দটা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি হিন্দুধর্মেও। ঋগবেদের গ্রন্থ-২ ১নং পরিচ্ছেদ-এর ১১নং অনুচ্ছেদে 'ঈশ্বর' শব্দের একটা নাম দেয়া হয়েছে তাহলো 'আল্লাহ'। 'আল্লাহ' শব্দটা আরো আছে ঋগবেদ : গ্রন্থ-৩, পরিচ্ছেদ-৩০, অনুচ্ছেদ-১০-এ। এছাড়া আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদ : গ্রন্থ-৯, পরিচ্ছেদ-৬৭, অনুচ্ছেদ-৩০। আরো একটা আলাদা উপনিষদ আছে যার নাম 'আল্লো উপনিষদ'। শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর বইয়েও তা উল্লেখ আছে এ বিষয়। এ হলো সংক্ষিপ্তভাবে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা।

এখানে খুব সংক্ষেপে খুব কম কথায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তা না হলে আমার এই আলোচনা হতো কয়েক ঘণ্টার। আমি প্রথমে ঠিক করেছিলাম এই আলোচনা হবে ৫০ মিনিটের সিনোপসিস। তখন শ্রী শ্রী রবিশংকর অনুরোধ করলেন আমি যেন আলোচনা করি। যদিও তার আলোচনা ছিল আগে, আমার আলোচনা করার কথা ছিল পরে। তাঁর অনুরোধে আমি আগে আসলাম তবে তিনি যখন আলোচনা পেশ করবেন তারপর ১০ মিনিট আমি কথা বলবো। তিনি আমাকে আগে আলোচনা করার কথা এই জন্য বলেছেন যে, তিনি আমার মতামত আগে জানতে চান। তাই আমিই শুরু করছি। কারণ, এখানে মতামতের আদান-প্রদান হচ্ছে। আমি আমার মতামত জানালাম যে, শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর বইগুলোর কয়েকটি পড়েছি। সেগুলোতে উনি অনেক কথাই লিখেছেন , যেগুলোর সাথে আমি নির্দ্বিধায় একমত। অনেক লেখার ওপর আমি একমত না। আমি এখন শ্রী শ্রী রবিশংকরের মতামতের ওপর মত জানাচ্ছি।

বিশেষ করে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে মতামত জানতে চাই এ জন্যে যে, যাতে করে সব হিন্দু এবং মুসলিম ভাই ও বোন যাতে করে তাদের স্ব-স্ব ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে পারে। আমি কাউকে আঘাত করার জন্যে এখানে আসিনি আর আমি নিশ্চিত যে, শ্রী শ্রী রবি শংকরের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত না হলেও তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না। এটা আমার দায়িত্ব ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে। আমি ইসলাম সম্পর্কে যা জানি বেদ সম্পর্কে যা জানি তাই

বলার চেষ্টা করবো। তাই এই মত বিনিময় সভা। তবে আমি বলবো এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বুঝতে পারা এবং দুই মহান ধর্মের অনুসারীদের একত্রিত করা যেটা আজ আমরা করছি। একবার ভেবে দেখুন এটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এখানে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন দুই ধর্মের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানতে।

শ্রী শ্রী রবিশংকরের বক্তৃতা আমি দেখেছি গত ১ সপ্তাহ আগে। ভিসিডি রেকর্ড করা বক্তৃতা আমি দেখলাম। তার আলোচনার বিষয় ছিল একজন আধ্যাত্মিক গুরুর সাথে আলাপ আলোচনা। এ বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ২০০২ সালের ৭ মে সান্তা মনিকা ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমি তার মুখ থেকে প্রথম যে বাক্যটা শুনি তাহলো– 'আধ্যাত্মিকতার দাবি দুটি। প্রথমত, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্থাৎ আপনি কতটা বিশ্বাসযোগ্য? দ্বিতীয়ত, প্রচণ্ডতা'। আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন যখন আমি শুনলাম 'আধ্যাত্মিকতার প্রথম দাবি বিশ্বাসযোগ্যতা। তখন আমি সত্যিকার অর্থেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি সম্পূর্ণ একমত এ বিষয়ে যে, 'আধ্যাত্মিকতার' প্রথম দাবি বিশ্বাসযোগ্যতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই প্রয়োজন। সত্যবাদিতার প্রয়োজন আছে বৈকি? বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়া কীভাবে একজন মানুষ আধ্যাত্মিক হবেন? আমি এ কথার সাথে অর্থাৎ তার মতের সাথে একমত।

পরে আমি উনার কয়েকটা বই পেয়েছি আয়োজকদের কাছ থেকে। ওখান থেকে পড়েছি 'হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম' দ্য কমন থ্রেট। আর যখন বইটা আমি পড়লাম, আমি তখন বুঝতে পারলাম শ্রী শ্রী রবি শংকরের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত হিন্দু আর মুসলমানদের একত্রিত করা। আমিও বই লিখেছি 'সিমিলারিটিজ বিটুইন হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম।' তাহলে এ বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে বেশ মিল আছে। তবে এ বইটাতে আমি বেশ কিছু জিনিস যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, বিশেষ করে ইসলামের ব্যাপারে। এ বিষয়ে আমার মতামত জানানো দরকার এ জন্যে যে, তাহলে আমরা আরো কাছাকাছি আসতে পারবো। শ্রী শ্রী রবিশংকর প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন 'বিশ্বাসের দাবি ঈশ্বর'। ২ পৃষ্ঠায় 'হিন্দু ধর্মকে মনে করা হয় বহুদেবতার ধর্ম'। তবে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

আমি এ কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমার ভাষণেও আমি এ কথাই বলেছি। তিনি এরপরে আরো বলেছেন, 'হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে অধিবিদ্যা, অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরবাদ।' যদিও সাতটা রঙ্গে হয় একটা রংধনু, মূলত এটার উৎপত্তি একটা সাদা আলোক রশ্মি থেকে। একইভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর দেবীর উৎপত্তি হয়েছে একটি পরমাত্মা থেকে। দেবতাদের দেবতা। ঈশ্বর! এ তুলনাটা যে, সাত রং মিলে হয় রংধনু, এর সাথে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী আসলে উৎপত্তি হয়েছে একটি পরমাত্মা থেকে। এ বিষয়ে আমার মনে হয়েছে যে, এটা অযৌক্তিক।

কারণ আমি একজন ডাক্তার এবং বিজ্ঞানের ছাত্র অবশ্যই। আমরা জানি যে, আলোর মধ্যে ৭টি রং আছে। 'বেনীআসহকলা' অর্থাৎ, বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। তবে এর প্রত্যেকটা পৃথকভাবে সাদা আলো নয়। সাতটা রং এর পরিমাণ ঠিক ঠিক অনুপাতে থাকলে সাদা আলো হবেই।

আর যদি কোনো একটা রং বাদ পড়ে যায় তাহলে আলোটা কখনোই পুরোপুরি সাদা হবে না। একথা এখন স্পষ্ট যে, এর সাথে যদি তুলনা করি, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী মিলে হয় একটি পরমাত্মা, তাহলে বলা হবে যে, মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি অংশ আছে। যেমন আমাদের মানবদেহে সব মিলিয়ে ১১টি অংশ আছে। যথা : ২টা পা, ২টা হাত, ১টা মাথা, ১টা ঘাড়, ২টা কাঁধ, ১টা বুক, ১টা পাকস্থলী ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা অংশ আলাদাভাবে সম্পূর্ণ একটা মানবদেহ নয়। সব অংশ ঠিকভাবে জায়গামতো থাকলে আমরা সেটাকে সম্পূর্ণ মানবদেহ বলবো। যদি ১টাও বাদ পড়ে তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে মানবদেহ হতে পারে না। এ উদাহরণটার ব্যাপারে যে, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী, সেখান থেকে একটা পরমাত্মা যদি বলেন ঈশ্বরের ৩৩ কোটি অংশ আছে, আমি তার সাথে অবশ্যই একমত না। আর যদি কোনো অংশ বাদ যায় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ঈশ্বর হবে না। তিনি এরপর আরো লিখেছেন যে, ঈশ্বরের আরো ১০৮টি নাম রয়েছে। একজন ঈশ্বরের ১০৮ নাম আছে, আমি এ বিষয়ে তার সাথে একমত। দেখুন, বেদ এ বিষয়ে একই কথা বলছে। ঋগবেদ গ্রন্থ-১; পরিচ্ছেদ-১৬৪, অনুচ্ছেদ ৪৬-এ বলা হয়েছে– 'সত্য একটাই, ঈশ্বর একজনই, জ্ঞানী ব্যক্তিরা এক ঈশ্বরকে অনেক নামে ডেকে থাকেন।'

তিনি আরো বলেন যে, ইসলামও ঠিক একই নির্দেশ দেয় যে, ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ৯৯ নাম রয়েছে। আমি এ বিষয়েও তার সাথে একমত এজন্যে যে, হিন্দুধর্মে যেকোনো নামে ঈশ্বরকে ডাকা যায়। তেমনি ইসলাম ধর্মেও সৃষ্টিকর্তাকে যেকোনো নামে ডাকা যায়, যে নামগুলো সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে দিয়েছেন। আর কুরআন ও হাদীসে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ৯৯টি নাম পাওয়া যায়।

আমি শুধু নামের ব্যাপারে বলতে চাই। উদাহরণস্বরূপ আমার নাম হলো জাকির আব্দুল করিম নায়েক। আপনি আমাকে আরো বলতে পারেন 'আবু ফারিখ জাকির নায়েক'। আমি পিতা ফারিখ নায়েকের। আপনি আমাকে আরো বলতে পারেন আবু জিকরা জাকির নায়েক। কেননা আমি জিকরা নায়েকের পিতা। অথবা আমাকে বলা যায় আবু রুশদা জাকির নায়েক। কেননা আমি রুশদা নায়েকের বাবা। চারটা নাম চারটা আলাদা নিয়মে ডাকা যায়, তবে নামগুলো কিন্তু একজনেরই। সব আলাদা, সবই নাম, সবই আমার নাম, অন্য কারো নয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম নামের ব্যাপারে ঠিক আছে। কুরআন যা বলেছে যখন

আমরা বলি সুন্দর নামের কথা। মনে রাখতে হবে, সুন্দর নামসমূহ সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে দিয়েছেন।

এরপর আরো আছে 'উপাসনা করার নিয়ম' অধ্যায়ে। ৩নং পৃষ্ঠার শ্রী শ্রী রবিশংকরের উদাহরণ দিয়েছেন। ধরুন– কোনো ছবি, কোনো মানুষের ছবি, মানুষটা নয়। কোনো মানুষের ভিজিটিং কার্ড সেই মানুষটা নয়। একইভাবে মূর্তিগুলো হলো ঈশ্বরের প্রতীক, সচেতনতা, ঐশ্বরিকতা। আমি প্রথম অংশটার সাথে একমত, সম্পূর্ণ একমত যে, কোনো মানুষের ছবি সেই মানুষটা নয়। কোনো মানুষের ভিজিটিং কার্ড সেই মানুষটা নয়। এটাও ঠিক। কিন্তু যখন বলা হচ্ছে মূর্তি হলো ঈশ্বরিকতার প্রতীক। তখনই যত সমস্যা। আমি স্বল্প জ্ঞানে বুঝি, যযুর্বেদ : অধ্যায় নং ৩২, ৩নং অনুচ্ছেদ-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো রকম প্রতিমূর্তি নেই, প্রতিকৃতি নেই, রূপক নেই, ফটো নেই, মূর্তি নেই এমনকি নেই কোনো ভাস্কর্য।'

একটি মূর্তি ঈশ্বরের ভিজিটিং কার্ড নয়। কারণ ভিজিটিং কার্ডে সেই ব্যক্তির ঠিকানা স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। হতে পারে তার বাসার ঠিকানা অথবা এমনও হতে পারে, তার অফিসের ঠিকানা। আসল কথা হলো ভিজিটিং কার্ডে ঠিকানা লেখা থাকবেই থাকবে। যদি আমরা তর্কের প্রয়োজনে ধরে নিই মূর্তি হলো ঈশ্বরের প্রতীক, তাহলে ঈশ্বরের ঠিকানা হবে মূর্তি। এটা ছবি অথবা ভিজিটিং কার্ড তর্কের প্রয়োজনে আমরা মেনে নিলাম। ধরুন, কোনো লোক আমাকে আর্থিক সহযোগিতা করার কথা দিল। এর কিছুদিন পর তার সেক্রেটারি আমাকে কথানুযায়ী টাকাটা দিল, সাথে তাঁর ভিজিটিং কার্ড। এটা আমার জন্যে অবশ্যই অযৌক্তিক হবে যদি আমি ভিজিটিং কার্ডকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা তাঁর ছবিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যেটা করতে পারি সেটা হলো আমি তার ভিজিটিং কার্ডের ফোন নাম্বরে কল করে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারি অথবা ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি দিয়ে ধন্যবাদ জানাতে পারি।

তাই আমি যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, মূর্তি হলো ঈশ্বরের প্রতীক, ছবি বা ভিজিটিং কার্ড। আমি মূলত একমত না, তারপরও তর্কের খাতিরে মানছি– তারপরেও মূর্তি, ভিজিটিং কার্ড, ছবিকে ধন্যবাদ জানানো ঠিক হবে না, অযৌক্তিক হয়ে যাবে। আর একটা বিষয় বেশির ভাগ হিন্দু পণ্ডিতই মেনে নেবেন যে, হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা করা আদৌ ঠিক নয়। তারা যেটা বলেন নিচের সারির দিকে, প্রাথমিক সচেতনতার স্তরে যে মানুষটা নিচের সারির, ঈশ্বরের উপাসনা করতে তার মূর্তির প্রয়োজন নেই। আর এ কথাটা শ্রী শ্রী রবিশংকরের কয়েকটি ভিসিডিতে বলেছেন যা আমি দেখে জানতে পেরেছি। উপরের স্তরের সচেতনতার ক্ষেত্রে মূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই। নিচের স্তরের জন্যে প্রয়োজন আছে। এই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা মুসলমানরা বলবো যে, আমরা সচেতন তার উপরের স্তরে অবস্থান করছি।

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা

ইবাদাত করতে আমাদের কোনো প্রকার মূর্তির প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও বলা দরকার, শ্রী শ্রী রবিশংকর তার বইতে লিখেছেন ৪নং পৃষ্ঠায়, ইসলাম কঠোরভাবে বিশ্বাস করে একজন নিরাকার সৃষ্টিকর্তাকে। তারপরেও তারা মনে করে সৃষ্টিকর্তার প্রতীক হলো মক্কা শহরের 'কা'বা শরীফ'। যদিও তারা বিশ্বাস করে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু তারা ইবাদাত করে কাবার দিকে মুখ করে। তিনি তারপরে লিখেছেন তাঁরা মুসলমানরা নিরাকারের ইবাদাত করছে আকারের মধ্যদিয়ে। যদি কেউ বলে যে, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করে কা'বাকে পূজা করার মাধ্যমে, সেটা সম্পূর্ণ ভুল হবে। এমন কথা উল্লেখ নেই ইসলামের কোনো গ্রন্থে, কোনো বিধানে। কোনো মুসলমান কখনো 'কাবা'কে পূজা করে না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন সূরা আল-বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে এভাবে–

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

অর্থ : তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো, অতএব, তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।

কা'বার দিকে ফিরে মানে মুখ করে। 'কা'বা' হলো আমাদের ক্বিবলা, নির্দেশিত দিক। আর আমরা একথা বিশ্বাস করি। যখন সবাই একসাথে নামাজ পড়ে, তাহলে কোন্ দিকে ফিরে পড়বে? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোনো দিকে? তাই একথার জন্যে একদিকে ফিরে নামাজ পড়ি। সেটা হলো কা'বা শরীফের দিকে, আর এটাই হলো মুসলমানদের ক্বিবলা। যখন মুসলমানরা পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল, প্রথম এঁকেছিলেন আলী দুরসী ১১৫৪ সালে। তিনি এঁকেছিলেন দক্ষিণ মেরু উপরে উত্তর মেরু নিচে। আর কা'বা একেবারে সেন্টারে। পরবর্তীতে পশ্চিমারা মানচিত্র আঁকতে শুরু করে, তাঁরা মানচিত্রটাকে উল্টে দেয়। উত্তর মেরু উপরে দক্ষিণ মেরু নিচে।

তারপরও কা'বা সেন্টারেই থাকলো। তাহলে দেখুন আপনি যদি উত্তরে থাকেন তাহলে দক্ষিণে ফিরবেন আর যদি দক্ষিণে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরবেন। পূর্বে থাকলে পশ্চিমে, পশ্চিমে থাকলে পূর্বে ফিরবেন। আমরা মক্কায় গিয়ে যখন কা'বার চারপাশ প্রদক্ষিণ করি, ওমরাহ ও হজ্জের সময় এটা আমরা করি আল্লাহর আদেশে। তবে যুক্তি দিয়ে বলি, আমরা প্রদক্ষিণ করি এই জন্যে যে, প্রত্যেক বৃত্তের একটি কেন্দ্র আছে। এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ কেবল একজনই। তাই যদি কেউ বলে আমরা নিরাকারের উপাসনা করি আকারের মধ্যদিয়ে, ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা একেবারেই ভুল, না হয় অমূলক।

এরপর শ্রী শ্রী রবিশংকর ২৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ যখন মক্কায় ফিরে আসনে তখন তিনি কা'বার সব মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন।

তবে মূর্তি পূজার প্রধান জিনিসটা বাদে 'কালো পাথর' অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি 'হাজারে আসওয়াদ'। যদি কেউ বলে কালোপাথর মূর্তি পূজার প্রধান বস্তু তাহলে সে অত্যন্ত ভুল বলে। এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কোথাও পাবে না। শুধু ইসলামের ধর্মগ্রন্থেই নয়, কোনো সময় কোনো কালে 'হাজারে আসওয়াদ'-কে কেউ পূজা করেছিল। আরব্য সমাজে কখনো এমনটা হয় নি। কেউ করেনি এটাই বাস্তব সত্য। শ্রী শ্রী রবিশংকর তাঁর বইয়ের ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, হাত ও পা ধুয়ে নেয় এবং এটা বৈধ রীতি হিসেবে আরবরা এটা করতো। পরবর্তীতে মুসলমানরা এটা শুরু করে। এটার জন্যে কোনো উৎস নেই। ইহুদি বা খ্রিস্টানরা এরূপ করে না বা তাদের ধর্মে এরূপ রীতি নেই।

আমি এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলমানরা নামাজ পড়ার পূর্বে ও হিন্দুরা প্রার্থনার পূর্বে হাত ও পা ধুয়ে নিবে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, এটা বৈদিক রীতি হিসেবে আরববাসী গ্রহণ করেছে তাহলে আমি একমত না। আর যদি বলা হয় ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে এটি নেই, তাহলে আমি তার সাথেও একমত নই । কারণ আমি মনে করি সেটা মারাত্মক ভুল। কেননা আমি বাইবেলেরও ছাত্র। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টেই নয় নিউ টেস্টামেন্টেও এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর বুক অব এক্সোডাস-এর ৪০ নং অধ্যায়, ৫১ ও ৩২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে "মূসা ও হারুন তারা হাত ও পা ধুলেন, তারপর মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন, যেভাবে করতে বলা হয়েছিল। নিউ টেস্টামেন্ট-এর বুক অব অ্যাক্টস : অধ্যায় ২১ অনুচ্ছেদ-২৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'পল ও তার সাথের লোকেরা হাত ও পা ধুয়ে প্রভুর প্রার্থনা করলেন, যেভাবে প্রার্থনা করার নির্দেশ ছিল।'

এটা হলো বাইবেলের একটা অংশ। যা ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয় অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যেটাকে বলা হয় 'ওজু'। আমি ডা. জাকির নায়েক ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর একজন ছাত্র। আমি মনে করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মানুষের জীবন দর্শন নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বই হলো পবিত্র 'কুরআন'। আর তাই আমি পবিত্র কুরআন মজীদের একটা ইংরেজি অনুবাদ উপহার দিতে চাই শ্রী শ্রী রবিশংকরকে।

ইসলাম ছাড়া বেশিরভাগ ধর্মের অনুসারীরা 'অ্যানথ্রোপোমরফিজম' এ ধারণায় বিশ্বাস করে। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পৃথিবীতে যখন আসেন মানুষের রূপ নিয়ে আসেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন অনেকবার আসেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন একবার। এখানেও যুক্তি আছে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এতো বিশুদ্ধ যে, এতো

পবিত্র যে, তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন না। তিনি জানেন না মানুষ কীভাবে অনুভব করে যখন সে রেগে যায়, যখন তার মন খারাপ থাকে, যখন ব্যথা পায়, তারা বলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন এ জন্য যে, তিনি দেখে যাবেন মানুষের জন্যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ। যুক্তিটা বলতে গেলে একদিক থেকে ভালোই। তবে আমি বলতে চাই, যদি আমি একটা টেপরেকর্ডার বানাই তাহলে কি টেপরেকর্ডারের জন্যে কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ তা জানার জন্যে কি আমাকেও টেপরেকর্ডার হতে হবে? আমি বলতে চাচ্ছি আমি টেপরেকর্ডার হবো না, আমি একটা নির্দেশিকা লিখবো। লিখবো এভাবে, যদি কেউ অডিও সেট চালাতে চান তাহলে ক্যাসেটটা ভেতরে লাগিয়ে প্লে বাটন চাপুন। যদি বন্ধ করতে চান তাহলে স্টপ বাটনে চাপুন। উপর থেকে ফেলে দিবেন না, তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ তাআলা, তিনি মানুষকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন । মানুষের জন্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা খারাপ তা জানা ও দেখার জন্যে তার মানুষ হওয়ার দরকার নেই। তিনি কি করবেন, তিনি আমাদের হাতে দেবেন একটা নির্দেশিকা বই। আর মানুষের জন্যে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ দিক-নির্দেশনা হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কেউ পৃথিবীর বুকে মানবজাতির জন্যে নির্দেশিকা এতো ভালো করে লিখতে পারবে না। সে জন্যেই আমি বলি মানবজাতির নির্দেশনার জন্যে এই বইটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

এটা মানবজাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর চূড়ান্ত নির্দেশিকা, আমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে। আমি আলোচনা শেষ করার আগে কুরআন মজীদের সূরা আল আনআমের ১০৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط
كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص

অর্থ : আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদের গালি দিও না। কেননা অজ্ঞতাবশত সীমালংঘন করে তারাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, নিন্দা করো না, গালি দিও না সেই সব দেবতাদের, যাদের পূজা লোকজন করে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে। আল্লাহ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অজ্ঞতাবশত তারা আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে, নিন্দা করবে।

মোহাম্মদ নায়েক : এ পর্যায়ে আমি শ্রী বিনোদ মেননকে অনুরোধ করবো আপনাদের সাথে শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে।

বিনোদ মেনন : নমস্কার! সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী ও দর্শকবৃন্দ, শ্রী শ্রী রবিশংকরের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সহমর্মিতার বার্তা ও অহিংস জীবন দর্শন পৃথিবীর লাখো মানুষের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানবিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের মাঝে তিনি পেয়েছেন বিশ্বশান্তির পথ। আর এজন্যেই বিশেষভাবে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়বদ্ধতা, পরোপকারের মনোভাব, সচেতনতা। রবিশংকর ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪ বছরে ভগবতগীতা পাঠ করে তিনি তার বাবা-মাকে মুগ্ধ করেন। তিনি বৈদিক এবং বৈভানিক, দু ধরনের শিক্ষাই গ্রহণ করেছেন।

আর গ্রাজুয়েশন করেছেন, ১৭ বছর বয়সে আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর ব্যাঙ্গালোর থেকে।

তিনি তার সাহিত্যকর্মের জন্যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন কুয়েমপা ইউনিভার্সিটি থেকে। ১৯৮২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আর্ট অব লিভিং ফাউন্ডেশন'। যা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আর এর কাজ চলছে পৃথিবীর ১৪০ টিরও বেশি দেশে। ১৯৯৭ সালে শ্রী শ্রী রবিশংকর প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব হিউম্যান ভ্যালুজ' যেটা পৃথিবীর প্রায় ২৫,০০০ গ্রামে উন্নয়ন কাজ করে চলছে আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে। আর সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুর্দশাপীড়িত মানুষদের এনে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা দেয়া হচ্ছে এমন দেশের মধ্যে আছে– আফগানিস্তান, বসনিয়া, ভারতের গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, পাকিস্তানে, ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। গুরুজীর স্বেচ্ছাসেবক দল এসব ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এশিয়ার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সুনামির ভয়াবহতায়।

গুরুজী ইরাকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্যে ডাক্তার, ওষুধ ও ব্যায়ামের জন্যে প্রশিক্ষক পাঠিয়েছেন। এছাড়াও সুস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, মানবিক মূল্যবোধ, বহুজাতিক একতা দরিদ্রদের জন্যে আবাসন। শ্রী শ্রী রবিশংকরজী প্রতি বছর ৩৫টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করে থাকেন। তিনি সব সময় সবখানে একটা কথাই প্রচার করেন যে, সব ধর্ম আর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মতবাদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি প্রধানত একটাই। মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার বাণী আর গভীর জীবন দর্শন আমাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্যে উৎসাহিত করার পাশাপাশি অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। তিনি বহুজাতি ও বহুধর্মের একতা ও সহমর্মিতায় বিশ্বাস করেন। গুরুজীর উদ্ভাসিত ক্রিয়া, ব্যায়াম মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন ব্যথা নিরাময় করে। গুরুজী এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন : 'গুরু মহাত্মা এওয়ার্ড' দিয়েছে মহারাষ্ট্রের সরকার।

ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রপতি তাকে 'যোগ শিরোমণি' পদবীতে ভূষিত করেছেন। 'ফিওনিক্স এওয়ার্ড' দিয়েছেন জর্জিয়ার মেয়র। 'ইলিয়ন'-এর গভর্নর তাকে গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান এওয়ার্ড' দিয়েছেন। তিনি আরো পেয়েছেন 'মার্টিন লুথার কিং এওয়ার্ড'। সতরুজী শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর ভেতরে আপনি পাবেন করিৎকর্ম মনোভাব, গভীর জ্ঞান, নীরবতা ও উচ্ছলতা। তাঁর সংস্পর্শে যারা আসেন তাদের জীবন দর্শন, ভাগ্য, জীবনযাপন বদলে যায়, সর্বোপরি তার জীবন বদলে যায়। পৃথিবীর সামনে তার বাণী হলো, তোমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভালোবাস।

মোহাম্মদ নায়েক : এখন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী আমাদের সামনে আলোচনা করবেন হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ধারণা। এখন আলোচনা করছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী।

শ্রী শ্রী রবিশংকর : সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা, সন্ত কবিরের একটি দোহাস এখন বলতে চাচ্ছি।

আপনি পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থ পড়ে তর্ক আর বিতর্ক করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন সেই তর্ক আর বিতর্ক কখনো শেষ হবে না। তবে দুটি ভালোবাসার কথা, সদিচ্ছা আর পাশাপাশি থাকার আন্তরিকতা আমাদের এক করে দিতে পারে। ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে কি সুন্দর করে উদ্ধৃতি দিলেন। আমি আশা করি পৃথিবীর সব মানুষ যেন এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করে অন্তত কিছুটা হলেও, যাতে করে তারা সংকীর্ণ মনা না হয়। তারা যেন মনে না করে, আমিই একমাত্র স্বর্গে যাবো, আর বাকি অন্য সবাই নরকে যাবে। বর্তমানে এ সুন্দর বসুন্ধরাটাই একটা নরক, কেননা এখানে সব ধর্মের মানুষই মনে করে, একমাত্র তারাই সঠিক পথে চলছে।

অন্য আর যা ধর্মমত আছে সবই ভুল ও সবই মিথ্যা। আমাদের মনকে আরো প্রশস্ত করা দরকার। আমি ডা. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমি নিজেও জানতাম যে, আমার বইটাতে কিছু ভুল আছে, আসলে কি বইটা ছাপানো হয়েছিল খুব তাড়াহুড়ো করে। কারণ, তখন গুজরাটে রায়ট চলছিল। তাই আমি বইটা খুব তাড়াতাড়ি করে ছাপতে দিয়েছিলাম। আমি ইসলামের কোনো পণ্ডিতের কাছে শিক্ষা নিই নি। আর আমি কুরআন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। এখানে আমি ইসলামের ওপর পণ্ডিত না। তবে আমার উদ্দেশ্য তিনি ঠিকই ধরতে সক্ষম হয়েছেন। আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে একত্রিত করা। যাতে করে হিন্দুরা মুসলমানদের আর মুসলমানরা হিন্দুদের পরস্পরকে ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে। আমি খুশি এ জন্যে যে, যদিও আমার বইটাতে কিছু ভুল আছে। আমি তা স্বীকার করছি, তিনি তা ক্ষমাও করেছেন, সবচেয়ে বড় কথা তিনি আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছেন।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো আসল কথা। দেখা যায়, কখনো 'মা' তাঁর সন্তানকে বলেন 'দূর হও'। তিনি কিন্তু সত্যি সত্যি তা বুঝান না। তবে যদি তাই ধরে নেয়া হয়, আমায় দূর হয়ে যেতে বলেছে আমি দূর হয়ে যাচ্ছি। তাহলে কিন্তু মাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। মহর্ষিনারদ, যিনি ভালোবাসার প্রবর্তক, ভক্তি সূত্র সম্পর্কে তিনি একটা সূত্র বলেছেন, 'যুক্তির উপর নির্ভর করো না, এমনকি তর্ক-বিতর্কের উপরেও'। বিতর্ক করে আপনি সব পাবেন না। আজ দেখা যায় ধর্মের মানুষদের মধ্যে অনেক বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক। কারণ, সবাই মনে করে থাকে তারা নিজেরাই ঠিক। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের মতবাদের বিশ্বাস আছে। সবাই লড়াই করছে আর বলে যাচ্ছে আমিই ঠিক। ইসলামেরও একই ব্যাপার। শিয়া আর সুন্নীর লড়াই চলছে তো চলছেই। তারপর দেখা যায় আহমদীয়া এসব আর কি? একজন বৃদ্ধ, একটা দর্শন।

আর আজকাল দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্মে ৩২টি মতবাদ। প্রতিটি মতবাদের রয়েছে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা। আর সবাই বলছে তাদের নিজেরটাই ঠিক। আমি সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই এভাবে আমাদের সাদৃশ্যগুলো দেখুন, আমরা সবাই একসাথে থাকতে পারি। ভাই এবং বোন হয়ে আমরা পরস্পরের প্রশংসা করতে পারি। একশত বছর পূর্বে আমরা হয়তো বা বলতাম সহ্য করার কথা, কিন্তু আজকের পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে সহ্য করাটা বেশ দুর্বল একটা শব্দ। আজকের পৃথিবী শুধু সহ্যই করবে না ভালোও বাসবে। আপনি সহ্য করেন, যেটা আপনি পছন্দ করেন না, দেখবেন একটা কিছু আপনি অপছন্দ করেন অথচ সেটাকে সহ্য করছেন। আজকের দিনে অন্যান্য ধর্মকে সহ্য করাটাই যথেষ্ট নয়। এসব ধর্মকে ভালোবাসতে হবে। আপনাদেরকে আমার বাস্তবজীবনের একটা ঘটনা বলি।

আমি তখন দিল্লীতে থাকতাম। সেখানে আমি একদিন গাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলাম। আমার সাথে একজন বয়স্ক লোক ছিলেন, যিনি কনার্ট প্যালেসে নামবেন। তবে সেখানে নেমে তাকে একটা ট্যাক্সি অথবা অটো ধরতে হবে। তাই আমি আমার গাড়িটা তাকে দিলাম এবং আমি আমার সহকারীকে নিয়ে একটা অটোতে উঠলাম। আমরা যে অটোতে উঠলাম তার ড্রাইভার ছিল খুবই ভদ্র, বিনয়ী ও দেখতে সুন্দর। অটো রিকশার দুদিকেই তাকিয়ে দেখি অনেক নায়ক নায়িকার ছবি। লোকটা আমাকে বললো গুরুজী মাফ করবেন, আমি এখানে যার ছবি লাগাতে চাই তার তো কোনো ছবি নেই। তাই ছবিগুলো লাগিয়েছি। তারপর লোকটা কিছুক্ষণ পর আবার বললো, আমার কি পরম সৌভাগ্য, তিনি আজ মেহমান হয়ে আমার গাড়িতে উঠছেন, আর গাড়িও চালাচ্ছেন তিনিই। সব জায়গায় তিনি আছেন 'কে বলে খোদাকে চোখে দেখা যায় না। দিওয়ানাকে প্রশ্ন করো, খোদাকে ছাড়া সে কিছুই দেখে না।'

এটা–এবং এটাই হলো ভালোবাসার পূর্বশর্ত। যদি বলেন যে, আপনি পেইন্টিং এর প্রশংসা করবেন না, কিন্তু পেইন্টারের প্রশংসা করবেন, আপনি আসলে পেইন্টারকে পুরোপুরি প্রশংসা করছেন না। আপনি যদি পেইন্টারের প্রশংসা করতে চান তাহলে আগে পেইন্টিংটার প্রশংসা করতে হবে। তাহলে দেখুন এ পুরো জগৎটাই হচ্ছে ঈশ্বরের। উপনিষদে আছে ডা. জাকির কয়েকটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরো কিছু শ্লোক আছে আরেকটু গভীরভাবে দেখলে তা বুঝতে পারবেন।

'প্রভু সৃষ্টি করে তার ভেতরেই প্রবেশ করলেন।' ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের অন্তরের গভীরে অবস্থান করেন। আর এ ভারতে কবি, সাধক, সুফিরাও এই দর্শন দিয়ে গান, কবিতা, তৈরি করে থাকেন। তুমি মানো বা না মানো অন্তর দিয়ে তোমায় খোদা মেনেছি। এ কথাগুলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের নয়। এগুলো বলেছেন তারা, যারা ঈশ্বরের প্রেমিক। আর আপনাকে বলছি শুধু ভালোবাসা দিয়েই আপনি সব জয় করতে পারবেন। আপনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন আসল সত্যটাকে। ঈশ্বরের ধারণাটা আসলে কী? যে সত্য, অসীম জ্ঞান ও অনুগ্রহ এসব কিছু মিলেই হয় ব্রহ্মা। আপনারা ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের কাছ থেকে শুনেছেন যে, বেদ আর উপনিষদের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বুঝতে হবে প্রয়োগটা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেখানে সেখানে আমাদের সাদৃশ্য আছে সেখানে আমরা এক সাথে থাকবো। তবে যেখানে আমাদের সাদৃশ্য নেই সেখানেও আমরা একসাথে থাকার চেষ্টা করবো। আর তাহলেই আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে পারবো। কেননা আপনি বহুজাতি ও ধর্মের মানুষের একতা চান। আপনি ভালোবাসবেন সব ধর্মের সব জাতির মানুষকে। চাই সে হোক হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, সুফিবাদী কিংবা যেকোনো ধর্মের যেকোনো মতবাদের লোক হোক না কেন?

ভালোবাসা হচ্ছে সবার উপরে। আর বেদের ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তিনটি জিনিসের দ্বারা তৈরি। যথা : আস্তি, ভাতি, প্রীতি। আস্তি অর্থ হলো যেটা আছে, ভাতি হলো অনুভূতি আর প্রীতি অর্থ হলো ভালোবাসা। নাম রূপম, নাম ও রূপ। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর নাম ও রূপ আছে। তবে সচেতনতা হলো আস্তির পরে যেটা সেটা হলো ভাতি, অনুভূতি প্রকাশ করা। গীতায় অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে, বেদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। ঋষিরা অন্তর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। পবিত্র কুরআন মজীদেও অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে বাইবেলসহ সব জায়গায় একই অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। আস্তি, ভাতি, প্রীতি। এ পুরো পৃথিবীটা নাম ও রূপ। আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, তারা আমাকে এ প্রশ্ন করেছিল 'আপনারা ভারতে এতো বেশি দেব-দেবীর পূজা করেন কেন? স্রষ্টা তো মাত্র একজনই। আপনিও বলছেন স্রষ্টা একজন।'

আমি তাদের বললাম যে, আটাতো একটাই। চাপাতি একটাই, সেটা দিয়ে সমুচা বানালেন, পুরি বানালেন, কচুরি বানালেন, পরোটা বানালেন, কেন এমন করলেন? শুধু মজার জন্যে, কেবল আনন্দের জন্যে। তাই আমি শুধু বলতে চাই যে, লীলা আমি হলাম একজনই, আবার অনেকজন। তাই প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটাই সচেতনতা। তবে তাদের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। এটাই হলো মূল কথা। যদি আপনি গভীরে প্রবেশ করেন, দেখবেন, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই যদি না হয় তাহলে কবির আর বুলে শা'র মতো লোকজন অনেক সুফী লোকই ছিলেন, ঋষি-মহর্ষিরা ছিলেন, তাদের মধ্যে কখনো মতের অমিল ছিল না। যারা ঈশ্বরকে ভালোবেসেছেন এবং তাঁকে অনুভব করেছেন, তাদের মধ্যে আদৌ মতের অমিল হয় নি। কারণ এটাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা, ভালোবাসার স্বরূপ। আর তাই আজকে আমাদের সেটাই করতে হবে।

তা না হলে ঝগড়া-বিবাদ, বিতর্ক, ঠিক-বেঠিক ভুল-শুদ্ধ, মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক নিচে নামিয়ে দেবে। প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে একই সরলতা থাকে। প্রত্যেকটা মানুষ এ জ্ঞান নিয়ে জন্মায়। এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। আপনাদের কি মনে হয়? আমি কি ঠিক বলেছি? আসলে সবাইকে আপন মনে করতে হবে। আমরা সবাই একে অপরকে চিনব, জানব। একটু একটু করে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে। যেমন : আজকের দিনটা একটা দৃষ্টান্ত, এখানে এ বইগুলো দেখে খুব ভালো লাগছে। আর আমি ভালো করেই জানি একজন হিন্দু ও উপনিষদের এতোকিছু জানেন না বা পড়েননি। আমাদের সবাইকে আজ একত্রিত হতে হবে। যদিও আমাদের মাঝে অনেক মতপার্থক্য আছে, আলাদা রীতিনীতি সংস্কৃতি, অভ্যাস আছে। সবাইকে জানিয়ে দিন, সবার উপরে রয়েছে একজন, একমাত্র ঈশ্বর, একটি ভালোবাসা। কেবল আমার কথাগুলোকে শুনবেন না, কথাগুলোর পেছনের উদ্দেশ্যেটাকেও ভালো করে দেখে নিবেন।

আমি এটাকেই বলি 'হার্ট অভ্ লিভিং'। অর্থাৎ উদার হৃদয়। অন্য কেউ আপনাকে পছন্দ করুক আর না করুক আপনি সবাইকে ভালোবাসবেনই। 'প্রত্যেক মানুষ আমার নিজের সম্পত্তি।' সব মানুষের চিন্তা-ভাবনা আমরা এক পথে নিয়ে আসতে পারবো না, যে একটাই দর্শন। আমাদেরকে এ বৈচিত্র্য নিয়েই বসবাস করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা আসলে মহান, অসীম। এখন আমি জানি বিষ্ণু মূর্তির চার হাত ও চারপা আছে। আসলে কি 'চতুর' শব্দটির দু'টি অর্থ আছে। সংস্কৃতিতে চতুর হলো 'বুদ্ধিমান'। সৃষ্টিটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। সৃষ্টি প্রক্রিয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন দেখুন, বিষ্ণুর চার হাত আছে। তার সেই চারটা হাতে কী কী আছে? আছে মোট চার, পাঁচটা উপাদান। আর বিষ্ণুর গায়ের রং নীল। নীল হলো স্পেস বা খোলা জায়গা। যেমন : আকাশ, কোনো আকার নেই, নিরাকার। আকাশতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, পৃথিবীতত্ত্ব, এই প্রপঞ্চ।

এটাকে বলা হয় 'প্রপঞ্চ'। পাঁচটি মূল উপাদান। এ দিয়ে পৃথিবী তৈরি, পুরোবিশ্ব জগৎ। আর এটা প্রাচীনকালের মানুষরা লিখেছিল। একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আর তা হলো 'পুরানা' নিয়ে। আমরা জানি 'পুরানা' হলো পুরানো। কিন্তু সংস্কৃতিতে 'পুরে' 'নওয়া' অর্থাৎ পুরানা। তাই যে জিনিসটা শহরে একেবারে নতুন এসেছে সেটাকে বলা হয় 'পুরানা'। তাই 'পুরানা' গুলোকে লেখা হয়েছিল একটা বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্যে। সেটি হলো আপনাকে অনুপ্রাণিত করা। সব মানুষকে কিছুটা বিনোদন, আনন্দ, ভালোবাসা দেয়া। সবাই যেন প্রেরণা পায় মানুষকে ভালোবাসার জন্যে। সব মানুষ যেটা বুঝে, যেটা করে আর যেটা মেনে চলে, অনুসরণ করে আমি জানি মানুষ যেটা মেনে চলে অনুসরণ করে তার অনেক কিছুই ঠিক না। আর প্রত্যেক ধর্মের লোককেই তার নিজ নিজ ধর্মের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে হবে।

অন্য কেউ এটা করতে পারে না। হিন্দুনেতাদের উচিত হবে, হিন্দুদের ভুলগুলো শুধরে দেয়া। একইভাবে এ দায়িত্ব মুসলমানেরও। মুসলমান নেতাদের উচিত নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেয়া। তাহলেই কেবল আমরা সংস্কার সাধন করতে পারবো। আর আজকের এই দিনে সংস্কার খুব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অহিংসাকে বেশি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। একথা ধর্মগ্রন্থেও বলা হয়েছে। যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, এই টেবিল কি অণু দিয়ে তৈরি? আমি উত্তরে বলবো, এ অণু এখন আমি পাবো কোথায়? আমি তখন তাই বলবো যে, এই টেবিলেই পাবেন, ঐ টেবিলে পাবেন। স্পিকারে পাবেন। কারণ সব কিছুইতো অণু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তাই নয় কি? অণুকে খুঁজতে আপনাকে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অণু আছে সর্বব্যাপী, সর্বত্র, সবখানে একজন নিউক্লিয়াস বিজ্ঞানী এবং একজন এটমিক বিজ্ঞানী বেদান্তের সব কথার সাথে একমত হবেন।

এখানে আপনি পাবেন 'থিউরি অভ্ রিলেটিভিটি'। স্রষ্টা কোনো একটা ব্যক্তি বা বস্তু নন। মনে রাখতে হবে এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। তার একটি মাত্র ইশারা দ্বারা এই পৃথিবী সৃষ্টি। তার মানে এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার অধীন। এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। আমি এখানে উপনিষদ থেকে ছোট একটা গল্প বলছি। একটা ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা ঈশ্বর আসলে কী? তিনি দেখতে কেমন? ছেলেটাকে তখন তার বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলেন, তারপর ছেলেকে বললেন, দেখো, ঐ যে বাড়িটা ওখানে আছে, তার আগে এখানে কি ছিল? ছেলেটা জবাব দিল, খালি জায়গা। বাড়িটা এখন কোথায়? খালি জায়গায়। বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেলে জায়গাটায় কী হবে? ছেলেটা বলল, কিছুই হবে না। জায়গাটা তখন আগের মতো থাকবে। বাবা বললেন, তোমার আত্মাও তাই, তুমিও ঠিক এমনই। আত্মা আছে, রূপ আছে, সচেতনতা আছে, তারপর

অবসানও আছে। কাম, ব্রহ্মা, এই জায়গার মতোই। যেখানে সবকিছু আছে, সবকিছু জন্মায়, আর সেখানেই সবকিছু অবসান হয়।

প্রিয় বন্ধুরা আপনারা দেখবেন, যখন আপনারা অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করবেন, যেখানে আপনার কথা প্রবেশ করতে পারে না, এমনকি মনও ঢুকতে পারে না। আপনার মনের সেই নীরব কোণায় প্রবেশ করে ধ্যানে বসে যান, গভীরে চলে যান। তাহলে বুঝতে পারবেন সেটাই ভালোবাসা, সেটাই ভাতি, সেটাই আস্তি এবং সেটাই প্রীতি। আসলে আমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। আরো বেশি করে সম্মেলন, আলোচনা অনুষ্ঠান করতে হবে। আমরা আমাদের পার্থক্য নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে চাই না। কারণ কেউ তার রীতি-নীতি ত্যাগ করবে না।

যদি কাউকে গিয়ে বলেন, তুমি গণেশের পূজা করছো কেন? সে কোনো কথা শুনবে না। কারণ এটা হচ্ছে তার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। কয়েকশো বছর ধরে এটা চলে আসছে। যদি আপনি গণেশ পূজার সময় যে শ্লোক বলা হয়ে থাকে তা শোনেন। তাহলে আপনি শুনতে পাবেন, পূজার সময় বলা হচ্ছে, তুমি নিরাকার, তুমি সর্বব্যাপী। তবে আমি তোমার সাথে কিছুদিন খেলা করতে চাই। তাহলে দেখুন, বলা হচ্ছে তুমি নিরাকার, স্রষ্টা তুমি সর্বব্যাপী, আমি এখন তার সাথে খেলা করবো। কিন্তু কীভাবে খেলা করবো? আমাকে যে উপহার দিয়েছ, তোমাকেও তাই দিব। তুমি আমার চারপাশে চন্দ্র ও সূর্যকে রেখেছ। আর আমি এ ছোট প্রদীপ জ্বেলে ভক্তি জানাতে তোমার চারপাশে ঘুরে বেড়াবো। আমাকে এ জীবন দিয়েছো। এখন আমি তোমার সাথে খেলবো, তোমাকে 'ভক্তি জানাবো'। এটাকে কেবল গুরুত্বের সাথে নিলে চলবে না। এটা হতে হবে ভক্তি সহকারে খেলা করা। এটাই হলো আনন্দ।

আনন্দকে প্রকাশ করা হলো, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পূজাকে বলা হচ্ছে এটা আমাদের পরিপূর্ণতা দেয়। আমি আমার জীবনে যা পেয়েছি তার জন্যে আমি এতো বেশি কৃতজ্ঞ যে, তোমাকে পূজা করছি, নিজেকে প্রকাশ করছি। আজকে আমি যখন এখানে আসলাম তখন সবাই আমাকে ফুল দিয়েছে। আমরা কাউকে ফুল দিই কেন? নিজের শুভ কামনাকে প্রকাশ করার জন্যে। রওশন বেগ সাহেব নিজের আসন থেকে উঠে এসে আমাকে ফুল দিলেন। কেন দিলেন? আমার মনে হয় তার মনে হয়েছিল গুরুজী এসেছেন, তাকে কিছু উপহার দেয়া উচিত। আর এটা অনুভূতি বিনিময়। কেননা অনুভূতিকে পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় না। যায় কি? তাইতো আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা প্রকাশ করি। যেমন ধরুন, মুসলমানরা মক্কা গিয়ে শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে, এটা হচ্ছে হৃদয়ের একটা অনুভূতি।

শয়তান দূর হয়ে যাবে কংকর নিক্ষেপের ফলে। এটা হলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। আর হিন্দুরা এটার সমালোচনা করতে পারে। মুসলমানরাও গণপতি বলতে পারে।

এসব কিছুতে আসলে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। দয়া করে আপনারা কেউ এই পথে যাবেন না। হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনেরা এটা আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি অনুরোধ। অন্য কারো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কখনো সমালোচনা করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। যদি আপনার কাছে কেউ জ্ঞানের জন্যে আসে তাহলেই কেবল আপনি তাকে কিছু বলতে পারেন। তা না হলে সবাই পরস্পরকে বলবে যে, তারা যা করছে সেটা সঠিক। আর একটা কথা মনে রাখবেন, সব মানুষকে একতাবদ্ধ করা কোনো অবস্থায়ই সম্ভব নয়, যদিও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, মূর্তি পূজারীদের সমালোচনা করবেন না।

কারণ এ দেশে হাজার বছর ধরে এ রীতি চলে আসছে। তবে যেটা করতে পারি তাদের কাজটাকে শ্রদ্ধা করতে পারি। আর যখন আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করবো তখন বিশ্বাসে একটা পরিবর্তন আসবে আমাদের সমাজে। আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস তখনই প্রতিফলিত হবে। কেউ তখন ভাববে না যে, আপনি তাদের বিপক্ষে আছেন। আমাদের সব মানুষের এক হতে হবে। আর এভাবেই কেবল আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় সেবক হতে পারি। অহিংসাকে রাখতে হবে সবার উপরে, সবার উর্ধ্বে। যোগ শাস্ত্রে আছে, মানবদেহে আটটা প্রত্যঙ্গ আছে। যদি আপনারা যোগ পাঞ্জাঞ্জ পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন, যোগ সূত্র এখনো আধুনিক। যেকোনো ধর্মের লোকজনই এটা করতে পারে। একটু আগে ডা. জাকির নায়েক 'আল্লাহর' যে সংজ্ঞা দিলেন, সেই একই কথা বলেছেন মহর্ষি পাতা লী।

আসলে ঈশ্বর কে? কায়া ক্লেশহীন। যার ভেতরে কোনো ক্লেশ নেই, কোনো ধরনের যন্ত্রণা নেই, যার কোনো আকার নেই, হৃদয়ের সেই সচেতনাই হলো ঈশ্বর। একথাই মহর্ষি পাতাঞ্জলী বলেছেন যোগসূত্রে। তিনি আরো বলেছেন যে, 'ইয়ামা' যার অর্থ অহিংসা। তিনি আরো বলেছেন শান্তির কথা। সাত্যিয়া বা সত্যির কথা। 'আস্তেয়া' অর্থাৎ কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চুরি করো না। 'ব্রহ্মচারিয়ে' একগুঁয়েমি। 'অপরিগ্রহ' অর্থাৎ কাউকে লজ্জিত না করা। আর এই ইয়ামা-নিয়ামা প্রাণয়ামা, প্রত্যাহার, ধ্যান-ধারণা, সমাধি এই আট প্রতঙ্গের কথাই মহর্ষি বলে গিয়েছেন। মহর্ষি যা বলেছেন তাতে উপকার হবে আমাদের মানুষেরই। দেখুন, আপনার নিঃশ্বাসেই লুকিয়ে আছে অনেক কিছু। নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে ভালো করতে পারেন। আপনি আপনার মনকে ভালো করতে পারেন। এতে করে আপনার মনের নেতিবাচক ধারণা দূর হয়ে যায়।

আপনি যখন প্রার্থনায় বসেন, আপনার মন সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যদি আপনি নিঃশ্বাসের দিকে মনোযোগ দেন, আপনার মন তখন পথ খুঁজে পাবে। ফলে আপনি থাকতে পারবেন খাঁটি বন্ধুর মতো। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষ এইসব

নিঃশ্বাসের কৌশল আর ব্যায়াম শিখছে। যদিও এটা অনেক প্রাচীন জ্ঞান। এ ব্যায়ামও তখনই শিক্ষা দেয়া হতো যখন শিক্ষার্থী আসলেই মনোযোগী আর বুদ্ধিমান হতো এটা ভালোভাবে বুঝার জন্যে। আমার মতে, এটা এতোই উপকারী জ্ঞান যে, পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই এটা পৌছানো উচিত। আর প্রত্যেক মানুষই এ জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারবে, তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন। আমি পৃথিবীর সামনে প্রাণায়াম আর যোগের দরজা খুলে দিতে চাই। আমি বলছি এটা কোনো ব্যাপারই না, আপনার বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছি না। আমি কথা বলছি আপনার নিঃশ্বাস নিয়ে।

নিঃশ্বাস আর আবেগ এর মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করলে দেখবেন মন শান্ত অচঞ্চল হয়ে গেছে। এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হয়েছে। 'অলইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউট নিম্‌হান্স' অনেক গবেষণা করেছে। আমরা যখন ইরাকে গেলাম, দেখলাম হাজার হাজার নারী ও শিশু প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। তারা রাতে ঘুমোতে পারছে না। ডাক্তাররা তাদের দিচ্ছে ওষুধ স্টেরয়েড। যাতে করে তারা ঘুমোতে পারে। আমরা তাদেরকে অতি সহজ নিঃশ্বাসের ব্যায়াম শিখিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই বেশির ভাগ রোগী এই সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। সেখানকার অনেক মানুষই বলেছিল যে, আমরা ভালোভাবে ঘুমোতে পারি না। আমাদের আতঙ্ককে দূর করতে পারি না। কাশ্মীরেও ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। এমন কি পাকিস্তানেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

তাহলে যদি পৃথিবীর কোনো ধর্মের মধ্যে ভালো আর জ্ঞানের কিছু থাকে তাহলে আমরা সেটা কেন গ্রহণ করবো না? অবশ্যই গ্রহণ করবো। আমরা তখন উগ্রপন্থী হয়ে বলবো না যে, আমার ধর্মে এটা নেই এটা তোমার ধর্ম। ইউনানি এর কথা আমরা বলতে পারি এটার উৎপত্তির সাথে ইসলামের যোগসূত্র আছে। আমরা সবাই এই কথা জানি। ইউনানী ওষুধ সবার জন্যে ভালো। একইভাবে চাইনিজ ওষুধ। আকুপাংচার আর আকুপ্রেমার পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে ভালো। তাহলে আমরা সবাই যদি পৃথিবীর সব জায়গার খাবার খেতে পারি। পৃথিবীর যেকোনো দেশের গানবাজনা শুনতে পারি, তাহলে কেন আমরা জ্ঞানটাকে গ্রহণ করতে পারি না। এ জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়া এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে এখন সবাই হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে। এখানে এরকম শান্তির উদ্যোগ দেখে আমার বেশ ভালোই লেগেছে।

এ বিশাল আয়োজন এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজ ধর্মসহ অন্য ধর্ম সম্পর্কে কিছু না কিছু জানা। এটা বললে চলবে না যে, আমার ধর্মই হলো সবার উপরে, সবার উর্ধ্বে আর তোমারটা নিচে। এটি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ঈশ্বর মানেই হচ্ছে ভালোবাসা তথা 'আস্তি', 'ভাতি', 'প্রীতি'। আসুন আমাদের মধ্যে কী সাদৃশ্য আছে সেটা খুঁজে বের করি। পাশাপাশি পার্থক্যটা নিরূপণ করার চেষ্টা করি। এ কাজটা করার জন্যে আমাদের একই ধর্মের অনুসারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা আলাদা ধর্মে থেকেও এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারি যদি আমাদের স্বদিচ্ছা থাকে। এখন থেকে আমাদের মূলনীতি হোক, আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করবো। মনে রাখবে মানুষকে অহিংসার বাণী শুনানোর বিকল্প নেই। আমার জানা মতে হিংসাত্মক কাজকে কোনো ধর্মেই অনুমোদন দেয়া হয় নি। কোনো ধর্মগ্রন্থেই হিংসাত্মক কাজের অনুমতি প্রদান করা হয় নি।

আর তাই আমাদেরকে অবশ্যই অহিংসার পথেই চলতে হবে। আপনাদের কি ধারণা বলুন? আপনারা কি একমত হচ্ছেন? আচ্ছা আমার সময় কি শেষ হয়ে গেছে, না কি আরো সময় আছে? আসলে কি আমি এতো বেশি কথা বলি না, আপনাদের কাছে এসে বলে ফেললাম। আমার তাহলে আরো ৩৩ মিনিট বাকি আছে। হা-হা-হা।

প্রাণ খুলে হাসতে শিখুন, আসুন আমরা আরো বেশি বেশি হাসি। সেই সাথে ক্রোধকে আমরা দমন করি। আমরা সবাই খুব সহজেই রেগে যাই, সেই তুলনায় হাসি খুব কম। আমাদের এ অভ্যাসটা অবশ্যই বদলাতে হবে। বেশি বেশি হাসতে হবে। মনে রাখবেন, ক্রোধকে একেবারে জীবন থেকে দুষ্প্রাপ্য করে দিতে হবে। ক্রোধ আসবে দুই একবার। আমি যদি অন্যায় কাজ দেখি তাহলে রেগে যাবো। কিন্তু যদি মনের মধ্যে শুধু ক্রোধটাই রাখেন, তাহলে সুবিচার নিশ্চিত করা যাবে না। সুবিচারের কথা বলতে গিয়ে যদি আমরা রেগে যাই তখন কী হয় জানেন? তখন আমরা বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ঠিক করে দেয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যবেক্ষণ আর প্রকাশের ভঙ্গি। আপনি যদি ক্লান্ত থাকেন তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি হবে এক রকম। যদি সংকীর্ণ মনের হন তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হয়ে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ শুভেচ্ছা জানায়, সেটাকেও মনে করবেন সে আপনার শত্রু। সেজন্যে সবার আগে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে। আর তাই সবচেয়ে খারাপ অপরাধীও অন্তরের দিক থেকে একজন সুন্দর মানুষ হতে পারে। অপরাধীকে ঘৃণা করবেন না বরং তার অপরাধকে ঘৃণা করুন। আমরা যাদের 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত করি তাদের মধ্যে একজনের সাথে আপনি কথা বলে দেখুন, মনের দিক থেকে সেও একজন ভালো মানুষ। অনেকদিন ধরে মানসিক ক্লান্তি আর চিন্তার জন্যে সে অপরাধ করছে।

তাদের প্রতি সমবেদনা থাকতে হবে, তাদের পাশে থাকতে হবে, তাদের আপন ভাবতে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে। অপরাধকে ঘৃণা করতে হবে, অপরাধীকে নয়। ঈশ্বরের মানে এই না যে, তিনি ওখানে বসে আছেন আর আপনাকে বাণী দিচ্ছেন। তিনি মূলত বিশ্বজগতের সব উপাদান। এ বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই

হলো ব্রহ্মা। সবকিছুই ব্রহ্মা দিয়ে তৈরি করা। বিশ্বজগতের এ সবকিছু অণু দিয়ে তৈরি, তরঙ্গ দিয়ে তৈরি। এ তরঙ্গের কোনো নাম নেই, আকার নেই। তারপরেও তাকে অনেক নামে ডাকা হয়, অনেক আকারে ডাকা হয়। সৃষ্টিকর্তা মানে হচ্ছে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর মনে রাখবেন, এ অসাধারণ প্রাচীন জ্ঞানের জন্ম হয়েছে এ দেশে। দেশের মাটি। সময়কে হারিয়ে এ জ্ঞান এসেছে। আমরা ভারতীয় হিসেবে গর্বিত এ জন্যে যে, এখানে বিভিন্ন জাতির মানুষ আমরা একত্রে বসবাস করতে পারি। অনেক সুফি-সাধক এ পবিত্র ভূমিতে জন্মেছেন। তারাও বলেছেন, অবশ্য তাদের এজন্যে অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে। সৎ পথের সন্ধান দিতে এদেশে ইরান থেকেও জ্ঞানী গুণীজন এদেশে এসেছেন। এ দেশের মানুষ সুফিদের সম্মান করে।

শুধু কি তাই, তারা ঋষি থেকে শুরু করে মহর্ষিদের সম্মান করে। সবাইকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সম্মান করতে হবে। সে জন্যেই বলছি, 'মায়ের মধ্যে স্বর্গ ও ভালবাসাকে দেখ। তোমার বাবার মধ্যে দেবতাকে দেখ।' এখানে বুঝতে হবে 'দেব' মানে কী? 'দেব' মানে ঈশ্বর নয়, এখানে 'দেব' বলতে আমরা বুঝবো 'আলো'। বাবা আপনার জন্যে আলো। বাবা-মা-ই আপনাকে পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিয়েছেন। তাই একজন পদার্থবিদ বেদান্তের সাথে একমত হবেন। সব কথায় একমত হবেন। একমত হতেই হবে। আসলে তাঁরা উভয়ে করছেনও। তাঁরা অনেক কাজ করছেন পদার্থ আর বেদান্ত নিয়ে। ডা. জাকির নায়েক যত বেশি জানেন আমি আসলে ততটা জানি না। আসুন আজ থেকে এটাই আমাদের মূলনীতি হোক, আমরা কিছুটা হলেও বুঝার চেষ্টা করবো। মনে রাখবেন, আপনি পৃথিবীর সবকিছু বুঝতে পারবেন না, সবকিছু পড়েও শেষ করতে পারবেন না। এটা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আসুন আমরা কিছুটা বুঝার চেষ্টা করি। আসুন বিশ্বাস যাই হোক না কেন কিছুটা হলেও চেষ্টা করি। আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা ঠিক থাকবে।

আসুন, আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি, সবাইকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। আসুন এভাবেই আমরা বেঁচে থাকি। ঋগবেদের একেবারে শেষে বর্ণিত আছে 'আসুন এক সাথে হাঁটি'। আসুন আমরা একত্রিত হই, মিলিত হই একসাথে। এই কথাটুকু বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করবো। এক ঘণ্টা ধরে কী বলবো বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় আমার যা বলার ছিল সবই বলে দিয়েছি। চমৎকার! এখানে এসে খুবই ভাল লাগলো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ নায়েক : এখন মঞ্চে আসছেন ডা. জাকির নায়েক। তিনি শ্রী শ্রী রবিশংকর এর কথার উপরে এখন শ্রোতাদের বলবেন।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী রবিশংকর, শ্রদ্ধেয় গুরুজন, ভাই ও বোনেরা আবারো আপনাদের সবাইকে ইসলামিক নিয়মে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাই।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবার উপরেই আল্লাহ তাআলার সুখ, শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

ইসলামী শুভেচ্ছা বলে শান্তির কথা। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ধারণা। যেহেতু আমি এখন শ্রী শ্রী রবিশংকরের আলোচনার উত্তর দিতে এসেছি। তাই আমি বলি, শান্তির কথা বলে, ইসলামী শুভেচ্ছা। এটা সব মুসলমানের কর্তব্য যে, পৃথিবীতে শান্তি ছড়িয়ে দেয়া। শুধু তাই না। শান্তি ছড়িয়ে দেয়া সব মানুষেরও কর্তব্য। যে এটা করে না সে মুসলমান নয়। হতে পারে না। শ্রী শ্রী রবিশংকর ঠিক কথাই বলেছেন যে, সবাইকে ভালবাসো। আমিও শ্রী শ্রী রবিশংকরকে ভালোবাসি। আমি তাঁকে ভালোবাসি তার যে কথার সাথে আমি একমত সেগুলোর জন্যে আমি তাঁকে ভালোবাসি।

রবিশংকর : আমাকে ভালোবাসা ছাড়া উপায় নেই।

ডা. জাকির নায়েক : একদম ঠিক কথা। তবে অন্য উপায়ে থাকলেও আমি আপনাকে ভালোবাসতাম। আপনি আপনার আলোচনায় বলেছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যগুলোতে আমাদের একমত হওয়া উচিত। আমি যেমন আমার আলোচনায় বলেছিলাম, 'আমাদের ভেতরের সাদৃশ্যগুলো লক্ষ করুন'। প্রথম সাদৃশ্যটা কী? এ সাদৃশ্যগুলো জানার জন্যেই আমরা আজ এখানে এসেছি। তবে মনে রাখতে হবে আজ আমরা একটি বিশেষ সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলছি। আর সেটা হলো যে, আমরা একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইবাদাত করি। তাহলে আসুন আমরা এ সাদৃশ্য মেনে নিই ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে। শ্রী শ্রী রবিশংকর ঠিক কথাই বলেছেন যে, আমাদের মাঝে অমিল থাকলেও আমরা যেন হাত মেলাই। যদিও রবিশংকরের সব কথার সাথে আমি একমত হতে পারি না। তারপরও আমি এখানে এসেছি, কেননা আমি তাঁকে ভালোবাসি। তার কারণ হলো আমাদের ভেতরের সাদৃশ্যগুলোর সাথে আমি একমত। কিন্তু আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি, বলা হয়, বাবা দয়ালু হওয়ার কারণেই নিষ্ঠুর হয়। কখনো কখনো মানুষকে শুধরে দিতে হয়। কারণ আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু ধরুন, কোনো বাচ্চা শিশু কোনো কথা বললো, যা ভুল অথবা সে দশতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিতে চাচ্ছে। আমরা কি বলতে পারি না যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি এগিয়ে যাও। যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি তাই আমি তাকে অবশ্যই থামাবো। আর তাই যেহেতু আমি শ্রী শ্রী রবিশংকরকে ভালোবাসি। এটা আমার মনের কথা যে, তাঁর আন্তরিকতার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর একটাই উদ্দেশ্য আর তা হলো হিন্দু আর মুসলমানদের একত্রিত করা। কিন্তু যারা আমার মতো খোলা মনের না তারা গুরুজীর কথাগুলো সঠিকভাবে ধরতে পারেন না। যেহেতু আমি গুরুজীকে

ভালোবাসি সে জন্যেই আমি এ পয়েন্টগুলোর কথা বললাম। আর আমি ভালো করেই জানি, তিনি আমার কথা ভালোভাবেই নিয়েছেন। তিনি রেগে যান নি।

শ্রী শ্রী রবিশংকর : আমিও ভালোবাসি।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, 'কে বলে খোদাকে দেখা যায় না। দিওয়ানাকে প্রশ্ন করো। সে বলবে, খোদাকেই সব জায়গায় দেখা যায়।'

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন, 'আমি আমার নির্দেশনাবলী ব্যক্ত করবো। বিশ্ব জাহানে ও তাদের নিজেদের মধ্যে যাতে এদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাই সত্য।'

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, তার নিদর্শনাবলী দেখবেন। যখন আমরা তা দেখি, তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তার কথা মনে পড়ে যায়। তিনিই সৃষ্টিকর্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যখন আমরা সূর্যকে দেখতে পাই, তখন আমাদের মনে পড়ে সূর্যের সৃষ্টিকর্তাকে। আবার যখন আমরা চাঁদ দেখি, তখনো আমরা তাঁর কথা মনে করি। তাই দিওয়ানা নয়, আল্লাহ্ বলেছেন কুরআনে বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানই তাঁর নিদর্শন দেখবে।" তিনি তাদেরকে তাঁদের নিদর্শন দেখাবেনই। শুধু দিওয়ানাই নয়, প্রত্যেক মানব সন্তানকেই আল্লাহ্ তাআলা কথা দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেনই। আল্লাহ তাদের আকাশ পর্যন্ত দেখাবেন। যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে, এটাই হলো আসল সত্য।

তাই এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নিদর্শন মাত্র, কোনোমতেই সৃষ্টিকর্তা নয়। আমি বলবো, দিওয়ানা আল্লাহকে দেখে। তাঁর অর্থ হলো সে আল্লাহর নিদর্শনগুলো দেখে। সে এটা বলতে পারে না যে, তারা অথবা চাঁদগুলো আল্লাহর প্রতীক। যেটা শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে আমরা জানি যে, সূর্য প্রচণ্ডভাবে তাপ বিকিরণ করে, যেখানে বাস করার অনুপযোগী। তিনি তার বইতে লিখেছেন, চাঁদ এবং তারা একজন মানুষকে শান্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই এটা একটা প্রতীক, ইসলাম ধর্ম আল্লাহর প্রতীক। চাঁদ ও তারা কখনো আল্লাহর প্রতীক হতে পারে না। এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না।

আবার দেখুন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে রাত, সূর্য ও চাঁদ কিন্তু তোমরা সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না। সিজদা করো একমাত্র মহান 'আল্লাহ'-কে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

যখন মহান আল্লাহর নিদর্শনগুলোর কথা বলা হচ্ছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সূর্য আল্লাহর নিদর্শন। এমন কি চাঁদও। তারার কথা বলা হয়নি। তবুও তারাগুলোও মহান সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন। তবে কথা হলো আমরা ভালোবাসবো সৃষ্টিকর্তাকে। তাঁর সৃষ্টিকে নয়। ইবাদাত করবো একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার। তাঁর সৃষ্টিসমূহের নয়। শ্রী

শ্রী রবিশংকর ঠিক কথাই বলেছেন যে, আমরা মূর্তি পূজারীদের নিন্দা করবো না, ঘৃণা করবো না। আমি তার সাথে একমত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার কথা শেষ করবো। তার আগে কুরআন মজীদের সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই। আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص

অর্থ : নিন্দা করো না, গালি দিও না তাদেরকে যাদেরকে তারা ডাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। কেননা তাহলে সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত তারাও আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।

আমি তার সাথে একমত। কেননা এটা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রী শ্রী রবিশংকর আরো বলেছেন, যখন তারা জ্ঞানের জন্যে আসে তখন তাদের জ্ঞান দিও। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে ২ + ২ = ৩; অথবা ২ + ২ = ৪; অথবা ২ + ২ = ৫ তাহলে আমি কখনোই বলতে পারি না যে, সব উত্তরই ঠিক। আমি বলবো যে ২ + ২ = ৪। কেননা আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর ভালোবাসার দাবিই হচ্ছে সঠিক জবাব দেয়া। তাহলে আমি বলবো যে ২ + ২ = ৪ হয়, অন্যগুলো সঠিক নয়। কেউ হয়তো আবার সুযোগ নিয়ে বলতে পারে। এই নাও দুই টাকা, এই যে নাও এক টাকা এবার আমাকে চার টাকা দাও। এই নাও ২ লাখ টাকা এই নাও ১ লাখ টাকা এবার আমাকে ৪ লাখ টাকা দাও। আমি তাকে শুধরে দিব, আমার কথা বলার শুরুতেই আমি কুরআন মজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াত বলেছিলাম। তা আবারও বলছি–

وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

অর্থ : বল, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ মিথ্যাতো বিলুপ্ত হবার জন্যেই।

শ্রী শ্রী রবিশংকর আরো বলেছেন, হাসিকে সহজলভ্য করার জন্যে। ক্রোধকে দুষ্প্রাপ্য করার জন্যে। আমি বলি হাসিকে ফ্রি করে দিন, হাসিকে একদম ফ্রি করে দিন। আমরা প্রত্যেক মানুষকে ভালোবাসবো। প্রত্যেক মানুষের সাথে হাসি দিয়ে কথা বলব। তবে একই সাথে যেহেতু তাদের ভালোবাসি, যেহেতু তারা আমাদের আপন। যেহেতু আমরা একে অন্যের ভাই, একজন সৃষ্টিকর্তাই আমাদের স্রষ্টা, একারণেই যদি কেউ কোনো ভুল করে। আমরা তার নিন্দা করবো না, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবো না, আমরা তাকে নিন্দা করবো না, তবে শুধরে নিব। যদি আমার কোনো সন্তান ভুল করে, আমি তাকে বলবো না, যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি।

আমি তাকে বাধা দিব না। যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি, তবে হ্যাঁ আমি তাকে শুধরে দিব। যাতে করে সে বুঝতে পারে কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা সঠিক। এছাড়া শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, 'যুক্তির ওপর নির্ভর করবেন না'। কিন্তু দেখতে পেলাম তিনি অনেক যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি তার আলোচনায় অনেক যুক্তি দিয়েছেন। যেমন : ড্রাইভারের উদাহরণসহ আরো বেশ কয়েকটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। এজন্যে কুরআন বলে যে, 'এটা তাদের জন্যে যারা বুঝতে পারে।'

আধ্যাত্মিকতার অন্যতম দাবি হলো বিশ্বাসযোগ্যতা। এমনকি আমার মতে, যুক্তিও তাই দাবি করে। এটাই আলাদা করে যে, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল। সময় যেহেতু কম তাই আমি আর বেশি বলতে চাই না। তবে আমাকে এটা বলতেই হবে যে, শ্রী শ্রী রবিশংকর অনেক ভালো কথা বলেছেন, সেজন্যে আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি তাঁকে বলতে চাই তিনি হয়তো কিতাবটা আগে পড়েছেন। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ। আমি তাকে আবার পড়তে অনুরোধ করবো। এই কিতাব। এই অনুবাদটা হলো, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। মহান সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণী। আমি আর দুই মিনিট কথা বলবো। এই অনুবাদ মহান সৃষ্টিকর্তার বাণী। আর আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'সৃষ্টিকর্তার ধারণা' ধর্মগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে। তাই আমি আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক কথাই বলতে চাচ্ছি। 'ধর্মগ্রন্থ'-গুলোর কথা বলছি। কারণ, আমার কথা শুনার জন্যে আপনারা এখানে আসেন নি। শ্রী শ্রী রবিশংকর যা বলেন, অথবা অন্য কেউ যা বলে সেটা শোনার জন্যেও এখানে আসেন নি। আপনারা এসেছেন সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা শুনতে। আর মনে রাখবেন এই কিতাবই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আমি বলবো জীবন দর্শনের ওপর পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ হলো কুরআন মজীদ। একথা এ কিতাবেই উল্লেখ করা আছে। আমন্ত্রণ জানাই শ্রী শ্রী রবিশংকরকে। তাকে আমন্ত্রণ জানাই আর্ট অভ লিভিং এর ক্লাবে, আমরা আছি ১৩০ কোটি মুসলমান। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই আমি আমার কথা শেষ করবো। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ـ

অর্থ : আমার কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন বিধান হলো ইসলাম।

একমাত্র দ্বীন, একমাত্র ধর্ম, একমাত্র জীবন ধারণের উপায়। একমাত্র আর্ট অভ লিভিং সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে যা গ্রহণযোগ্য সেটা হলো শান্তি অর্জন করা, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ করা। তাদের কাছে প্রমাণ পৌঁছে দেয়া হয়েছে শুধু পরস্পর ও হিংসা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আহ্বানকে অস্বীকার করবে, অতিসত্বর সে আল্লাহর হিসেব গ্রহণকারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

মোহাম্মদ নায়েক : আবার মঞ্চে আসছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী। আগে এভাবে ঠিক ছিল না। তারপরও সভাপতি হিসেবে আমি ঠিক করেছি যে, উনি ও ডা. জাকির নায়েকের আলোচনার উত্তরে কথা বলবেন আরো ৩ মিনিট।

শ্রী শ্রী রবিশংকর : আপনারা জানেন, বিশৃঙ্খলাময়, অশান্ত এ পৃথিবীতে মাঝে মধ্যে আমরা মানুষের উপকার করতে গিয়ে অপকার করে ফেলি। আমরা প্রায়শই ভাবি যে, আমরা অবশ্যই ঠিক পথে আছি। তাই আমরা অন্যদেরও আমাদের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। আমার মতে এটা করা উচিত না। শুধু তখনই আমরা একসাথে শান্তিতে থাকতে পারবো।

আপনি যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন যে, সন্তান উপর থেকে লাফ দিচ্ছে। এখন সন্তান চায় না যে, বাবা তার সব বিষয়ে নাক গলাক। আসলে বাবা বলতে আপনি কাকে বুঝাতে চাইলেন, আবার সন্তান বলতে এখানে কাকে বুঝাতে চাইছেন, আমরা এসব কুতর্ক করবো না, বিভিন্ন যুক্তি দিব না। বলবো না যে, আমরাই ঠিক, আমরাই ঠিক বলছি। আমাদের এমনটা করা উচিত না। দেখা যায় আমরা অনেক সময় অন্য মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ধর্ম নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠি। কারণ আমরা সবাই মনে করি যে, আমরাই ঠিক, ঠিক পথে আছি, আর আমাদের অধিকার আছে পৃথিবীটাকে বদলানোর। আসুন আমরা আগে আমাদের বদলে নিই। আসুন আমরা একে অপরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। আসুন আমরা অনুভব করি স্বর্গের সুখকে। একবার একটা কনফারেন্স হয়েছিল ডাক্তারদের নিয়ে। সেখানে কথা হচ্ছিল 'ব্যথা' নিয়ে আর সবাই এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক করছিল। তখন ওখানে একজন বয়স্কলোক একটা 'বেত' নিয়ে আসলেন এবং সবাইকে বেত দিয়ে আঘাত করলেন। বয়স্ক লোক তাদের বললো, এখন বুঝলে তো ব্যথা কী? আপনাকে আগে ব্যথাটা অনুভব করতে হবে। তা না হলে আমি আপনি ব্যথার কথা যতই বলি সেটা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। ব্যথা অনুভব করা আলাদা। মূলকথা হলো ব্যথাকে অনুভব করতে হবে। তেমনিভাবে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্য আরেকজনের কথায় আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা যায় না। এটা কখনো সম্ভব নয়। দুঃখিত। আমি ভগবান রজনীশকে নিয়ে কিছু কথা বলছি। তাকে নিয়ে এ ভারতে অনেক কথা হয়েছে। আমি বলতে চাই, একজন রজনীশ। তার নিজস্ব দর্শন থাকতে পারে, তবে এতে প্রলুব্ধ হতে হবে এমনতো কোনো কথা নেই। কারণ এমন দুই একটি খারাপ দৃষ্টান্ত সব ধর্মেই পাওয়া যায়। এদের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে কারো ধর্মকে ছোট করবেন না।

আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ। হোক সেটা জৈন ধর্ম হোক শিখ ধর্ম। শিখ ধর্মের লোকজন বলবে তাদের ধর্মগ্রন্থই পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ। হিন্দু ধর্মের লোকজন বলবে, তাদের ধর্মগ্রন্থই সর্বশেষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে আর এটাই হলো ঈশ্বরের চূড়ান্ত বাণী। তাহলে এই পার্থক্যটা সব জায়গায় আছে।

আমরা তাদের শ্রদ্ধা করবো, ভালোবাসবো। একেবারে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবো, ভালোবাসা মুখের কথায় নয়। মাঝে মধ্যেই আমরা বলে থাকি আমি আপনাদের খুব ভালোবাসি। এটা কিন্তু আমাদের শুধুই মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়। কোনো মতামত নয় প্লীজ। আমরা কোনো নিজস্ব মতামত দিব না। তবে আমরা ভালোবাসবো সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে। আসুন আমরা তাই করি। আসুন আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা এখন থেকে অনুসরণ করবো অহিংসা আর পরমত সহিষ্ণুতার পথ। কোনো ভায়োলেন্স চলবে না। যদি সন্তান লাফ দিতে চায়, সেখানে আপনি তাকে যেভাবে সাহায্য করতে পারেন সাহায্য করেন।

কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনি যেন সন্তানের ঘাড়ে না পড়েন। তাহলে সন্তান মারা যাবে। আপনার উদ্দেশ্য সন্তান রক্ষা করা, তাকে হত্যা করা নয়। কিন্তু যদি আপনি পড়ে যান আপনার সন্তানের ওপর। আপনার সন্তান মারা যাবে। আসুন চেষ্টা করে দেখি, আমরা সবাই মিলে পুরো পৃথিবীতে একটা পরিবারের মতো শান্তিতে বসবাস করতে পারি কিনা। ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি।

মোহাম্মদ নায়েক : ধন্যবাদ! শ্রী শ্রী রবিশংকরজী আপনার আলোচনার জন্যে। আমাদের সামনে এই দুজন শ্রদ্ধেয় বাকপটু, জ্ঞানী বক্তা এতোক্ষণ আমাদের আলোচনা শোনালেন। তারা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে বিশ্লেষণ করলেন। তারা দুজনেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ও আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করলেন। তারা কত ভালো বলেছেন আমি সভাপতি হিসেবে সে কথা বলতে চাই না। কারণ, এখানে আমার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত বলে আমি মনে করি।

সভাপতি হিসেবে এটাই আমার দায়িত্ব। সেই বিচারের ভার আমি দর্শক ও শ্রোতাদের দিতে চাই। কেননা তারাই নিরপেক্ষ। দর্শক, শ্রোতামণ্ডলি, আপনারা যা বুঝেছেন। যে তথ্য আপনারা পেয়েছেন। যে যুক্তি আপনারা শুনেছেন, আপনাদের বুদ্ধি দিয়ে আর মানুষ হিসেবে যে বিবেচনা বোধ আপনাদের আছে সেটা আপনারা বিচার করবেন। আপনারাই ঠিক করবেন। আপনারা শিখবেন, বিচার করবেন এই দুজন বক্তা যে বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা। আমি এবার শুরু করলো মূল অনুষ্ঠান। আপনাদের প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এখন শুরু হবে। এখন আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। যাতে করে এটা শুধু আলোচনার অনুষ্ঠান না হয়। এখন শ্রোতা দর্শকবৃন্দ। দুজন বক্তার কাছে তাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের ধারণাকে আরো পরিষ্কার করতে পারবেন। বিভিন্ন রকম সন্দেহ দূর করতে পারবেন। এখানে আপনি সুযোগ পাচ্ছেন আপনার সন্দেহকে দূর করার। আপনার মনের প্রশ্নটি করার।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের গ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে বুঝার জন্যে এখন শুরু হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এখানে উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকদের বলছি। যেহেতু আমার হাতে সময় কম, তাই সবাইকে বলতে চাই প্রশ্ন করার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলার জন্যে। আপনাদের প্রশ্নগুলো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আপনারা প্রশ্ন করবেন হিন্দুধর্ম আর ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা এ বিষয়ে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, অসামঞ্জস্য প্রশ্ন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে করা প্রশ্ন গ্রহণ করা হবে না। দয়া করে প্রশ্ন করবেন সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে বলুন। আমি বক্তাদের অনুরোধ করবো, প্রশ্নের উত্তর ৫-৬ মিনিটের মধ্যে দেয়ার জন্যে, সময়ের স্বল্পতা এবং আরো বিভিন্ন রকম কারণে। প্রশ্নোত্তর পর্বটি শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় করার জন্য, এখানে কোন্ প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য হবে। সে ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। দয়া করে প্রশ্ন করার পূর্বে আপনার নাম ও পেশা বলুন। যাতে করে আমাদের বক্তারা যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। প্রথমেই প্রশ্ন করছেন মাইকের বাম পাশের সামনে যিনি রয়েছেন। আপনি প্রশ্ন করুন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীকে।

প্রশ্ন ১. (পুরুষ) : আমার নাম আজিমদ্দিন ইলিয়াস। আমি একজন দা'য়ী। আমি ইসলামের সুমহান বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিই। আমার প্রশ্ন রবিশংকরের কাছে এই যে, ডা. জাকির নায়েক সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিভিন্ন শর্ত বললেন কুরআন ও বেদ থেকে। আপনি কি এই ঈশ্বরের ব্যাপারে একমত? বেদ ও কুরআন অনুযায়ী। নাকি একমত না? আশা করি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন।

উত্তর : রবিশংকর : উনি! কুরআন ও বেদের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে আর কোনো ভিন্নমত থাকতে পারে না। অবশ্যই আমি তার মতের সাথে একমত।

মোহাম্মদ নায়েক : দ্বিতীয় প্রশ্ন করবেন ডানপাশের জন, তিনি প্রশ্ন করবেন ডা. জাকির নায়েককে।

প্রশ্ন ২. (পুরুষ) : আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ডা. জাকির। আমার নাম সিকান্দার আহমদ সায়ালি। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো, 'হিন্দুইজম অ্যান্ড ইসলাম দ্য কমন গ্রেট' বইটা সম্পর্কে, আর এটি লিখেছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী। তিনি বইটা লিখেছেন পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে। আমার বাবা মুসলমান হওয়ার আগে হিন্দু ছিলেন। আমি ২০ বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু ছিলাম। আমার বাবা বেদ, বাইবেলসহ ধর্মগ্রন্থসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা সঠিক পথে এসেছি। আমি আমার বাবাকে

অনুসরণ করছি আর আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। আমিও বই নিয়ে গবেষণা করি। সেটা করতে গিয়েই 'হিন্দুইজম ইসলাম' বইটা পড়েছি। বইটা লিখেছেন শ্রী শ্রী রবিশংকর। বইটি পড়তে গিয়ে আমি দেখলাম যে, এর কিছু কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর। কখনো এটা কখনো ওটা। বলা হচ্ছে তিনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই প্রশ্ন করেছেন। আমার মতামত জানতে চেয়েছেন রবিশংকরের বই সম্পর্কে। বইটা বেশ বিভ্রান্তিকর। একটা কথা বলতে হয়। এই বইটা লেখার উদ্দেশ্য ছিল ঠিক। আমার মতে, তিনি চেয়েছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রিত হোক। হিন্দু, মুসলমানদের একত্রিত করার জন্যেই তিনি বইটা লিখেছেন। আমাদের মানতে হবে যে, বইটা তিনি তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন, যা তিনি নিজেও মঞ্চে এসে বলেছেন। বইটাতে বেশ কিছু ভুল আছে, তিনি তা স্বীকার করেছেন। যদি আমার পুরো মতামত জানতে চান তাহলে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে তা বিশ্লেষণ করতে। সময় যেহেতু কম তাই আমি কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে বলি যে বিষয়গুলো আজকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এখানে আমি বলতে চাই, বইটাতে মুসলমানদের বিভিন্ন রীতিনীতি সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি। তিনি তার বইয়ের ৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন। আরবি শব্দ 'রমজান' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'রামা' শব্দের থেকে এবং 'ধ্যান'। ধ্যান মানে উপাসনা 'রামা' মানে উজ্জ্বলতা। তাই তার মতে 'রমজান' শব্দটা সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল উপাসনার মাস। এই কথার সাথে আমি একমত না। কেননা আমি বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম বিষয়ের ছাত্র। তাই আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারলাম না। 'রমজান' আরবি 'রামাদা' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ সূর্যের প্রখর তাপে পৃথিবী গরম হয়ে আসছে। ইসলামী পঞ্জিকায় দেখবেন মাসগুলোর ক্রমধারায় রমজান হচ্ছে নবম মাস তখন থাকে গ্রীষ্মকাল। এভাবেই নামটা এসেছে। তাই যদি বলা হয় শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে তাহলে এর সাথে আমি মোটেও একমত না। সেভাবে বলা হয়েছে 'নামাজ' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'নাম' শব্দ থেকে, যার অর্থ উপাসনা করা। আর যাজা থেকে যার অর্থ ঈশ্বরের কাছাকাছি। কথা হলো 'নামাজ' শব্দটা কোনো আরবি শব্দ না। এই শব্দটা কুরআন ও হাদীসের কোথাও পাওয়া যাবে না। উপাসনা করা। ইবাদাত করাকে কুরআনে বলা হয়েছে 'সালাত'। 'নামাজ' শব্দটা মূলত ফারসি শব্দ, ভারত উপমহাদেশেও এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়। এটি ইসলামিক শব্দ না। 'নামাজ' ফারসি শব্দ যার অর্থ হল অধীনতা। এটা কোনো ইসলামিক শব্দ না আরবি শব্দও না। এরপর যদি আরো দেখেন, শ্রী শ্রী রবিশংকর তিনি তাঁর বইয়ে যে 'কা'বা' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'গারবাহ' থেকে এবং গ্রহ থেকে। একথা 'গাহবাহ' থেকে। আমি এটা কোথাও পাইনি যে,

'কা'বা' শব্দটার উৎপত্তি এভাবে হয়েছে। 'কাবা' শব্দটি আরবি শব্দ। যার উৎপত্তি হয়েছে আরবি শব্দ 'কাব' থেকে। যার অর্থ হল 'ফোলানো'। এছাড়া কা'বা অর্থ কোনো বাড়ির গম্বুজ, কা'বাতুল্লাহ কোনো বাড়ির উপর ফুলানো গম্বুজ। তাই আমি বলতে চাই যে, কা'বা শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে এটা কোনো অবস্থায়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এছাড়াও ঐ বইয়ে আরো বলা হয়েছে যে, 'হাজারে আসওয়াদ' কালো পাথর, যেটা রয়েছে কা'বা শরীফের পাশে, এই শব্দটির মূল 'সঙ্গো আশওয়াতা' যার অর্থ গাঢ় রঙের পাথর বা শিবলিঙ্গ। এ বিষয়েও আমি একমত না এ জন্যে যে, 'হাজরে আসওয়াদ' উৎপত্তি আরবি শব্দ 'হাজার' যার অর্থ 'পাথর' 'আসওয়াদ' হল কালো। দুটো মিলে হলো 'কালো পাথর'। এটাকে শিবলিঙ্গের সাথে তুলনা করা ঠিক না। এটি আরবি শব্দ-এর মূল শব্দগুচ্ছও আরবি ভাষায়।

যারা ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে জানেন না, তারা বুঝবেন এ বইয়ে যা বলা হয়েছে তা সঠিক এবং এ কথাগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করবেন। তবে যারা ইসলাম সম্পর্কে আগে থেকে জানেন তাঁদের তেমন সমস্যা হবে না।

রবিশংকর : আমি ইতোপূর্বেই বলেছি যে, এই বইটা দিয়ে আমাকে বিচার করবেন না। এখানে আমি বইটা ঠিক না ভুল সেটা বলতে আমি এখানে আসিনি। এর পেছনের উদ্দেশ্যটা দেখুন, আমি হয়তো খুব বেশি জানতাম না। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত করা। বইটা যদি ভুল কথা বলে তাহলে পড়ার দরকার নেই। তবে আমি যদি একটা ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আরেক ধর্ম গ্রহণ করি তাহলেই কিন্তু সমাধান হবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ডেনিশ কুকি খাওয়ার জন্যে আমাকে ডেনিশ হতে হবে না। সব জায়গা থেকে শেখার চেষ্টা করুন। আর একই সাথে অনুরোধ করতে চাই শুধু অন্যের ভুল খোঁজার চেষ্টা করবেন না।

আমি এই বইটা মাত্র ৩ দিনে লিখেছিলাম। আমি জানি ভালো করেই জানি, এই বইয়ের আরো অনেক ভুল আমি এখন আপনাদের বলতে পারি এবং এ বইয়ের অনেক ভুলের কথা আমিও আপনাদের সামনে বলেছি। তাই আমি বলতে চাই, বইটাতে যে ভুল আছে থাকুক সেটা। সেটা যেন আমাদের হৃদয়ে গেঁথে না যায়। বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি? বইটাকে বাদ দিন, বইটা পড়ার দরকার নেই। আমি নিজেও জানি বইটাতে ভুল আছে তাই। বইটা আর দ্বিতীয়বার কপি করা হয় নি। এটা একবারই ছাপা হয়েছিল। সব মানুষকে একত্রিত হতে হবে এটাই ছিল আমার বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। এটা কোনো পাণ্ডিত্যের বই না। আমি এই কথা বইয়ের ভূমিকাতেই লিখেছি। আর মুখেও বারবার বলেছি। বইটা যদি সব মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে তাহলে ভালো। তা না হলে আমি স্বীকার করছি বইটাতে ভুল আছে। আর আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কী বুঝাতে চেয়েছি।

মোহাম্মদ নায়েক : আমি আমাদের বক্তাদের আরো এ অনুষ্ঠানের কিছু নিয়ম-কানুন মনে করিয়ে দিতে চাই। প্রত্যেক বক্তাই পাঁচ-ছয় মিনিট সময় পাবেন তাদের কাছে করা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে। আমি অনুরোধ করবো যে, এখানে ২-৩ মিনিট বেশি লেগে গেলে এতে বেশ অসুবিধা হয়। যদিও আমার সামনে স্টপওয়াচ আছে, সময় বেশি গেল না কম গেল, সেটা হিসাব করার জন্যে। এতে করে আমার হিসাব রাখতে সমস্যা হয়। আমি আমাদের বক্তাদের অনুরোধ করবো, আমরা মেনে চললে অল্প সময়েই এ অনুষ্ঠান আরো ফলপ্রসূ হবে। আমি আবার শ্রোতাদের অনুরোধ করবো আপনারা প্রশ্ন করবেন সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে। শেষ ভদ্রলোক প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রায় দশটি বাক্য বলেছেন, প্রশ্নটা তিনি চারটা বাক্যে বলতে পারতেন। তখন প্রশ্ন বুঝতে ও উত্তর দিতে আরো সহজ হতো। এখানে আমরা প্রায় ২-৩ মিনিট সময় নষ্ট করলাম। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে ডা. জাকির নায়েককে ২-৩ মিনিট সময় দিতে চাই। আমি বক্তাকে অনুরোধ করবো তিনি যেন প্রশ্নটার উত্তর দেন।

যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সেটার উত্তর সরাসরি দিতে বলছি। আপনারা এ সময়ের মধ্যে পরের উত্তরটার সাথে আগের উত্তরটাও দিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রী শ্রী রবিশংকর বললেন যে, তিনি বইটা তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন। আমাদের মানতেই হবে যে তার আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না বা নেই। তিনি বলেছেন যে, বইটা দ্বিতীয়বার ছাপানো হয় নি। খুবই ভালো কথা, এজন্যে তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। যারা হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমার লেখা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সাদৃশ্য বইটি পড়তে পারেন। ব্যাপকভাবে বইটি ছাপা হয়েছে। খুব শিগগিরই বইটার লক্ষ কপি ছাপা হবে। আপনাদের সবাইকে বইটা পড়ার অনুরোধ করছি। নিশ্চয়ই এই বই হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করবে। এতে আমি সঠিক উদ্ধৃতি দেয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি আমাদের কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবার প্রশ্ন করা হবে শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে। মহিলাদের মধ্যে থেকে তিন নম্বর মাইক।

প্রশ্ন ৩. (মহিলা) : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আসিয়া সামিরা হাদিব। আমি পেশায় একজন কোয়ালিটি এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, লিডস সিসকো সিস্টেমস। আমার প্রশ্নটা রবিশংকরের কাছে। আপনি বলেছেন ভালোবাসা সম্পর্কে। অন্যকে না বদলানোর কথা বলেছেন। আরো বলেছেন পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসার সময় যুক্তি ব্যবহার না করতে। আমি তার সাথে একমত। কিন্তু আমার একটা বিষয় পরিষ্কার জানা দরকার,

আর তা হলো পৃথিবীতে আমরা প্রায়ই শুনি আত্মঘাতী বোমা হামলা, সন্ত্রাসী আক্রমণ ইত্যাদির কথা। এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধে যারা জড়িত তাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাই তাদের উদ্দেশ্যকে আমার শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে আপনি বললেন সবাইকে ভালোবাসতে হবে এবং আমিও তাদের ভালবাসবো। তা ছাড়াও আপনি যুক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

তাহলে কী দাঁড়ালো, সে যে ভুল করছে, এটা বলার কি কোনো অধিকার আমার নেই। এ ব্যাপারটি কি আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবেন?

উত্তর : রবিশংকরজী : ধন্যবাদ আপনাকে। আমি কখনোই যুক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করি নি। প্লীজ আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করবেন না। আমি বলেছি তর্ক করবেন না। ভুল যুক্তি ব্যবহার করবেন না। যুক্তি প্রদান করাই একমাত্র কথা নয়। হ্যাঁ আপনি অবশ্যই আত্মঘাতী হামলাকারীদের থামাবেন। কেননা তারা মনে করে, শুধু তারাই ঠিক। আর শুধু তাদেরই বাঁচার অধিকার আছে। অন্য মানুষ বা অন্য কোনো ধর্মের বিশ্বাসের উপর তাদের কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নেই। তারা এতোবেশি উগ্রপন্থী যে, তাদেরকে এ থেকে থামাতেই হবে। আমি কখনো বলি নি যে, যুক্তি ব্যবহার করবেন না। আমি বলেছি এমন যুক্তি দেবেন না যাতে মানুষ আলাদা হয়ে যায়। ভুল যুক্তি বা উক্তি ব্যবহার করে অন্য কাউকে দোষারোপ করতে যাবেন না। মানুষকে দোষারোপ করার জন্যে আমরা আসিনি। সবচেয়ে বড় অপরাধী যারা কারাগারে শাস্তি ভোগ করছে এমন লোক ১ লক্ষ ২৫ হাজার হবে যারা আমাদের প্রোগ্রাম অনুসরণ করছে। যার নাম ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা সুদর্শন ক্রিয়া। দেখেবেন তাদের ভেতরে এবং জীবন ধারায় কী পরিবর্তন এসেছে। তাই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই আমি কখনো যুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করি না, আমি আপনাদের অযৌক্তিক হতে বলছি না, বলছি না তাদের কিছু শিখবেন। তবে যুক্তির কথা বলে অন্য মানুষের ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করবেন না। এটাই সবার প্রতি আমার অনুরোধ।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে করবে ডা. জাকিরের কাছে।

প্রশ্ন ৪. (মহিলা) : হ্যাঁ আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তবে প্রথমেই আমি রবিশংকরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার জন্যে। ধন্যবাদ রবিশংকরজী। আমার প্রশ্ন জাকির ভাইয়ের কাছে। মহানবী ﷺ এর কথা কি হিন্দুধর্মে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, হিন্দুধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা বলা হয়েছে কিনা? আমি আবারো রবিশংকরের বইটার ২৬ নং

পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি লিখেছেন, নবী মোহাম্মদ ﷺ শিরোনামে। নবী মোহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বেদের ভবিষ্যৎবাণী। তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন ভবিষ্য পুরাণ-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫ ও ৬ থেকে। গুরুজী এই একটা রেফারেন্সই আপনার বইটাতে উল্লেখ করেছেন। এটা একদম খাঁটি, একদম ঠিক। আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। নবী মুহাম্মদ ﷺ শিরোনামের ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে। শ্রী রবিশংকর অনেক স্থানে বেদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শুধু নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা বলার সময় তিনি ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি এজন্যে রবিশংকরকে ধন্যবাদ দিতে চাই, ধন্যবাদ রবিশংকর। তিনি আরো উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটা হলো, ভবিষ্য পুরাণ পর্ব-৩, খণ্ড -৩, ৩-অধ্যায়, শ্লোক ৫ ও ৬ থেকে। আপনি যা বলেছেন একদম ঠিক, একশত ভাগ ঠিক।

আমি আরো বলি রেফারেন্স দেয়া থাকলেও শ্লোকটা সেখানে দেয়া নেই। যদি আপনি ভবিষ্য পুরাণ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত পড়েন তাহলে দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে– 'একজন বহিরাগত আসবেন। একজন বিদেশী অন্য ভাষায় কথা বলবেন। সংস্কৃত ছাড়া। তিনি আসবেন তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অর্থাৎ সাহাবাগণ এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ﷺ। আর ভোজ রাজা এই ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবেন সম্মানের সাথে এবং বলবেন হে মানবজাতির গর্ব, হে আরবের অধিবাসী'। সংস্কৃত শব্দটা হলো 'মবোস্থাল' সেই ব্যক্তি আসবেন বালির স্থান থেকে। একটি মরুভূমি থেকে এবং তিনি বিশাল বাহিনী তৈরি করবেন, শয়তানকে ধ্বংস করার জন্যে।

মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা আরো উল্লেখ আছে ভবিষ্য পুরাণের পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ১০ থেকে ২৭ পর্যন্ত। সেখানে বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন, এর আগের শত্রুকে হত্যা করা হয়েছে। এবার আরো শক্তিশালী শত্রু আসছে। আমি একজন ব্যক্তিকে পাঠাব যার নাম হবে 'মুহাম্মদ' যাতে করে মানুষজাতি সঠিক পথে থাকে এবং ও রাজা, তুমি পিশাচদের রাজ্যে কখনো যেও না। আমি আমার দয়া দিয়ে তোমাকে শুদ্ধ করবো। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি এসে বলবেন, ঈশ্বর পরমাত্মা তাকে পাঠিয়েছেন এজন্যে যাতে আর্যধর্ম বা সত্যধর্ম টিকে থাকে। আমি সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে যাব। আমার অনুসারীদের খৎনা দেয়া হবে। আমরা জানি যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারীদের খৎনা করানো হয়। তাদের মাথার পিছনে কোনো লেজ থাকবে না এমনকি কোনো পিণ্ডিও থাকবে না।

তাদের মুখে দাড়ি থাকবে, তারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করবে। তাদের ইবাদাতের পূর্বে আযান দেয়া হবে। তারা সব হালাল প্রাণী খাবে। তবে শূকরের মাংস খাবে না। আর কুরআনের ৪ জায়গায় বলা হয়েছে, সূরা আল বাকারা-১৭৩, সূরা মায়িদা-৩, সূরা আনআম ১৪৫ নং আয়াতে এবং সূরা নাহল-এর ১১৫ নং আয়াতে বলা আছে

যে, শূকর খাবে না। বলা আছে যে, তারা নিরামিষভোজী হবে না, তারা আমিষভোজী হবে। তাদের বলা হবে 'মুসলমান'। মহানবী ﷺ-এর কথা আরো বলা হয়েছে ভবিষ্য পুরানার পর্ব-৩, খণ্ড-১ অধ্যায়-৩, শ্লোক ২১ থেকে ২৩-এ। তাঁর কথা আরো উল্লেখ আছে অথর্ববেদ-এর ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের ১ থেকে ১৪নং অনুচ্ছেদে যাকে বলা হয় 'কুনতাপ সুপতাস'। 'কুনতাপ' হলো লুকানো গ্রন্থি সময় কম, তাই পরে জানা যাবে, সময় কম তাই পুরো বলছি না। তবে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'তিনি 'নারাশাংসা', 'যাকে প্রশংসা করা হয়। তিনি হলেন 'কাওরামা' অর্থাৎ 'শান্তির রাজপুত'। বা যিনি 'ক্ষমতাবান ব্যক্তি'। তাকে রক্ষা করা হবে ৬০ হাজার ৯০ জন শত্রু থেকে। এসবই মুহাম্মদ ﷺ নির্দেশ করে বলা হয়েছে। তাঁর কথা আরো বলা হয়েছে অথর্ববেদ ২০ নং গ্রন্থের ২১ নং অনুচ্ছেদের ৭ নং পরিচ্ছেদে, সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ২০ জন নেতাকে পরাজিত করবেন। সে সময় মোটামুটি এ কয়জন নেতা ছিল মক্কায়। এছাড়াও আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদের গ্রন্থ-১; অনুচ্ছেদ-৫৩, পরিচ্ছেদ ৯-এ। তাঁর কথা উল্লেখ আছে সামবেদে। অগ্নিমন্ত্র ৬৯ নম্বর-এ। বলা হয়েছে তিনি তার মায়ের দুধ পান করবেন না। আমরা জানি মহানবী ﷺ মায়ের দুধ পান করেন নি। তাকে আরো বলা হয়েছে 'আহম্মদ' 'যে নিজের প্রশংসা করেন'। যে নামটা এখানে বলা হয়েছে এটি 'মুহাম্মদ' ﷺ-এর আরেকটি নাম। সামবেদের উত্তরচিক ১৫০০ নং মন্ত্রে, সামবেদ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ। তাঁকে যযুর্বেদ অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১৮-তে বলা হয়েছে– 'আহম্মদ'।

অথর্ববেদের গ্রন্থ-৮, অনুচ্ছেদ-৫, পরিচ্ছেদ-১৬-এ অথর্ববেদ গ্রন্থ-২০ অনুচ্ছেদ-১২৬, পরিচ্ছেদ-১৪-এ। ঋগবেদ গ্রন্থ-৮, অনুচ্ছেদ-৬, পরিচ্ছেদ-১০-এ তাঁকে বলা হয়েছে 'নারাশাংসা'। নারাশাংসা একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো 'নর' অর্থ মানুষ 'শাংসা' অর্থ হলো প্রশংসনীয়। 'সেই মানুষ যিনি প্রশংসনীয়'। এই শব্দটিরই আরবি বলা হয় "মুহাম্মদ ﷺ"। তাহলে দেখা গেল নবী মুহাম্মদ ﷺ কে 'নারাশাংসা' নামে হিন্দুধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদ-এর গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-৯ ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-১০৬, পরিচ্ছেদ-৪, ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-১৪২, পরিচ্ছেদ-৩, ঋগবেদ গ্রন্থ-২, অনুচ্ছেদ-৩, পরিচ্ছেদ-২, ঋগবেদ গ্রন্থ-৫, অনুচ্ছেদ-৫, পরিচ্ছেদ-২, ঋগবেদ গ্রন্থ-৭, অনুচ্ছেদ-২, পরিচ্ছেদ-২এ।

আরো আছে– যযুর্বেদ ২০ নং অধ্যায়ের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে। যযুর্বেদ ২১ নং অধ্যায়ের ৩১ নং অনুচ্ছেদ। যযুর্বেদ এর অধ্যায় ২১ অনুচ্ছেদ-৫, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-১৯, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২-এ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় আরো বলা হয়েছে।

রবিশংকর ঃ তাহলে এখন আপনারা বেদকে সবাই শ্রদ্ধা করবেন। ডা. জাকির নায়েক নিজেই বলেছেন সবারই বেদকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর কথা হলো আপনারা ভাববেন না যে, এটা কাফির মুশরিকদের বই। প্রত্যেক মুসলমানেরই এই গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর আমি ডা. জাকির নায়েককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ তিনি বেদের সত্যটাকে সবার সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। বেদ একই শিক্ষা ,একই জ্ঞান, মানবতা, ভালবাসার কথা বলে থাকে। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : এর পরে প্রশ্ন পুরুষদের মধ্য থেকে তিনি প্রশ্ন করবেন রবিশংকরকে।

প্রশ্ন ৫. (পুরুষ) : আস্সালামু আলাইকুম, আমি সাইদ মহিউদ্দিন শামির। আমি এম, এম, এন, এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাব ম্যানেজার। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে। আপনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। আপনি বলছেন আমরা সব ধর্মকে ভালোবাসবো। কিন্তু কিছুদিন আগে এখানে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা হলো। আর আমি ঐ রাতে হাসপাতাল থেকে এর কিছুটা দেখেছিলাম। ১ জন প্রত্যক্ষদর্শী মিডিয়ার সামনে বলেছিল যে, সে একজন লোককে সেখানে গুলাগুলি করতে দেখেছে। তখন ছিল রাত পৌনে আটটা। তবে দেখা গেল যে, কেউ সে লোকের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না। আর তারপরের দিন মিডিয়ায়, ভারতের মিডিয়ায় সমালোচনা করা হলো শুধু ইসলামকে। আমার প্রশ্ন, আপনি সব ধর্মের মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন। কিন্তু ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে শুধু ইসলামের কথা বলা হয় কেন? কিন্তু ভারতে সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে শুধু ইসলামের সমালোচনা করা হয় কেন?

রবিশংকর : আজকের আলোচনা হলো ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে। না তবে আমি-
মোহাম্মদ নায়েক : আপনি চাইলে প্রশ্নটা বাতিল করতে পারেন। পরের প্রশ্ন করতে বলি?

উত্তর : রবিশংকর : আমি আপনাদের বলতে পারি যে, আমি মিডিয়ার মুখপাত্র নই। আমি সরকার কিংবা পুলিশের মুখপাত্র নই, আমি অন্য কারো হয়ে কথা বলতে পারি না। সেই একইভাবে আপনাদের ধর্মের মুখপাত্র শুধু, আপনি একা নন। আরো মানুষ আছে, প্রতিটি মানুষই তার নিজের ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন।

এখন এমন এক অবস্থা চলছে যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মানুষ এখন আতঙ্কিত। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু ইসলামকে এর সাথে জড়ানো হয়, যা একেবারেই ঠিক নয়। এ চেহারাটা, এ মন মানসিকতা আমাদের বদলাতে হবে। ইসলাম ধর্মের

অনুসারীরা অন্য ধর্মকে মেনে নিতে পারে না। এই চেহারা পাল্টে মুসলমানদের সংযমী হতে হবে। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে অনেকেই রয়েছেন। আপনারই এটা শুরু করতে হবে। যাতে করে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যায়। আমার ধারণা এটাই হলো প্রথম পদক্ষেপ। আজ যেমনভাবে আমরা হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হয়েছি। আবারো আমরা একত্রিত হবো। আর আমরা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিতে চাই আমরা শান্তিকে ভালোবাসি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করি। কাউকে দোষারোপ করি না। আমরা শান্তিপ্রিয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

প্রশ্ন ৬. (মহিলা) : আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে, হিংসাকে কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কৃষ্ণ কেন অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিল, সে যেন তার নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর : রবিশংকর : আপনি যদি যুদ্ধের পক্ষে যুক্তি খোঁজেন সেটা তাহলে সব ধর্মের মধ্যেই পাবেন। জিহাদীরা আছে। এছাড়াও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে যিশুখ্রিস্টই বলেছেন যে, আমি শান্তির জন্যে আসি নি। ঝগড়া বাঁধাতে এসেছি। বাবার সাথে ছেলের ঝগড়া, মায়ের সাথে মেয়ের ঝগড়া। এসব কথাকে ভুল পথে ব্যাখ্যা করলে চলবে না, মহাভারতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, যুদ্ধ করো কিন্তু ক্রোধ নিয়ে নয়। ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ করো। ধর্ম স্থাপনের জন্যে যুদ্ধ করো। আত্মঘাতী বোমা মেরে নিরীহ লোকজন মেরে আপনি পৃথিবীতে আতংক ছড়াতে পারেন না।

আপনাকে অবশ্যই ধর্ম আর ন্যায় পালন করতে হবে। আর গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। একজন যোদ্ধাকে লড়তে হবে। আমি এটা বলছি না যে, কোথাও গোলমাল দেখলে পুলিশ চুপচাপ বসে থাকবে। পুলিশ সেখানে অবশ্যই আসবে এবং যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নিয়ন্ত্রণ করবে। আর যদি কোনো দাঙ্গা হয় তাহলে মানুষকে রক্ষা করবে। সেটাই হলো তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অর্জুন একজন যোদ্ধা হিসেবে সে তার দায়িত্বে গাফিলতি করছিল, সে তার দায়িত্ব পালন করছিল না। তাই কৃষ্ণ তাকে বুঝিয়েছিল দায়িত্ব পালনের জন্যে। প্লীজ আপনারা এটাকে এই বুঝবেন না যে, এখানে যুদ্ধকে সমর্থন করা হয়েছে। কৃষ্ণ একথা বলেন নি, এভাবে বুঝান নি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন তোমার মধ্যে কারো প্রতি কোনো রকম রাগ বিদ্বেষ ঘৃণা ইত্যাদি পুষে রাখবে না। (সংস্কৃত) এই শ্লোকটা দেখেন না কেন? এ পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিকে ঘৃণা করবেন না।

সমবেদনা আর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রাখুন সবার প্রতি। তবে মনে রাখবেন, আপনার কর্তব্য আগে। আমি আপনাদের সবাইকে একটা অনুরোধ করবো, প্লীজ অন্য

ধর্মের সম্পর্কে কোনো ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না। আর তা না হলে আপনারা আমাকে এ ধরনের প্রশ্নই করবেন। অর্জুন কি ঠিক ছিল? বা রাম কি ঠিক ছিল? কেন সে গীতাকে ত্যাগ করেছিল? এ সব ব্যাপারই আসলে গভীর একটা চক্রান্ত। যা আপনাকে অনেক পড়তে হবে। মাত্র দু-একটি কথায় এর উত্তর শেষ করা সম্ভব নয়। এখানে আমরা বিতর্ক করতে আসিনি, আমরা এখানে পৃথক হওয়ার জন্যে আসিনি, আমরা এখানে এসেছি একত্রিত হওয়ার জন্য। আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করবো, সম্মান করবো, ভালবাসবো। সে জন্যেই আপনাদের বলি আপনারা গীতা পড়ুন। গীতার মধ্যে আপনারা ভালো অনেক কিছুই পাবেন। কি বুঝাতে পেরেছি?

প্রশ্ন ৭. (মহিলা) : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আরশিয়া রাজা। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তবে আমার প্রশ্নটা করার আগে একটা কথা বলতে চাই, আমি শ্রী শ্রী রবিশংকর-এর ব্রিদিং টেকনিকটা নিয়ে অনুশীলন করছি। আর এ অনুশীলন থেকে আমি যেটা পেয়েছি তাহলো এটা অনুসরণ করে আমি যতটা আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পেরেছি, আগে কখনো অনুভব করিনি। এজন্যে আমি রবিশংকরজীর কাছে কৃতজ্ঞ। ডা. জাকির নায়েক সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম ধর্ম আমি যতটা বুঝি সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো যে, সৃষ্টিকর্তা হলেন সর্বব্যাপী। এর অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টিকর্তা এই জগতের প্রত্যেকটা অণুতে প্রত্যেকটা পরমাণুতে উপস্থিত। এ ব্যাপার কি পরিষ্কার করবেন?

মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি! আপনি আপনার প্রশ্ন করবেন ভালো কথা, কিন্তু এত ভণিতা কেন? আমার ভলান্টিয়ার তথা স্বেচ্ছা সেবকদের এটা খুব খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের বক্তারা যথেষ্ট জানেন। তারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ।

আপনি প্রশ্ন করবেন সরাসরি প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন কোনো রকম ভূমিকা ছাড়া। ধরে নিচ্ছি আমাদের বক্তারা আপনাদের প্রশ্ন শুনলেই বুঝে নিতে পারবেন ভূমিকা কী। আর অনুগ্রহ করে প্রশ্ন করতে গিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। প্লীজ আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, ধৈর্য ধরেছেন, অনেক ভদ্রতা করেছেন। আর প্রশ্ন করার সময় যদি এগুলো খেয়াল করেন তাহলে আমরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে পারবো। হ্যাঁ ভাই।

প্রশ্ন ৮. (পুরুষ) : ডা. জাকির নায়েক যখন তাঁর লেকচার দিচ্ছিলেন তখন তিনি 'বিষ্ণুর' কথা বললেন, বিষ্ণু আসলে পাঁচটি উপাদান, যা দিয়ে পুরো পৃথিবীটাই তৈরি, আরো অনেক কিছু। আমি আপনাকে বলি বিষ্ণু সহস্র

হাজার কিন্তু একথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এটা দিয়ে আপনি আমাকে বিষ্ণুর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না।

আমি এখানে থেমে গেলাম এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হলো :

মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি, ভাই। দেখেন আপনি যা করেছেন প্রথমে বিশাল বড় একটা ভূমিকা নিয়ে তারপর প্রশ্নটা করেছেন। প্লীজ, আপনাদেরকে বারবার বলছি কোনো ভূমিকা ছাড়া সরাসরি প্রশ্ন করুন। ধরে নিচ্ছি আমাদের বক্তাগণ আপনার প্রশ্ন শুনে আপনারা ভূমিকাও তার বুঝে নেবেন। হ্যাঁ আপনার মাইক চালু করা হলো, আপনাকে ১ মিনিট সময় দেয়া হলো। আর আপনাকে এই প্রশ্নটা শেষ করতে হবে এই এক মিনিটেই। হ্যাঁ, আপনার মাইক চালু করা হলো।

প্রশ্ন ৯. (পুরুষ) : এক্সকিউজ মি, গুরুজী। এখন আপনি অনুগ্রহ করে যে বিষ্ণু সহস্র নামাটা বললাম, সেটির সারমর্মটা বলেন। আমি জানি আপনি পারবেন না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আল্লাহ একদিন আপনাকে হেদায়েত দান করবেন। আপনি দেখবেন সেদিন বেশি দূরে নেই। শুধু আপনিই না আপনার ভক্তদের হেদায়েত দান করবেন। আমি বলে রাখলাম।

মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি! স্বেচ্ছাসেবকদের আমি বলবো দয়া করে খেয়াল রাখবেন, প্রশ্নকর্তা ইমোশনাল না হয়ে যায়। এ অনুষ্ঠানের খাতিরে ভদ্র করে প্রশ্ন করুন। দয়া করে কোনো রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। আপনারা আপনাদের প্রশ্নটুকু করবেন। তারা এখানে তাদের প্রশ্নগুলো করবে এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমাদের এখানে দুজন জ্ঞানী লোক আছেন। তাদেরকে সম্মান করতে হবে। যদি এ ধরনের প্রশ্ন আর কেউ করেন, আমি বলবো স্বেচ্ছাসেবকদেরকে যে, তাকে পেছনে পাঠিয়ে দেবেন। প্রয়োজন হলে যদি বের করে দিতে হয় তাহলে তাদেরকে বের করে দিবেন। ধন্যবাদ।

রবিশংকর : এ যুবকের জন্য দুঃখ হচ্ছে। সে ভুল উদ্ধৃতি দিল, সে উন্মাদ হয়ে আছে। আর সে ভাবছে আল্লাহ একদিন হয়তো আমাকে আশীর্বাদ দেবেন। বাবাজী, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি আমার অনেক কাছে।

আর তাই সে কারণেই আমি বুঝতে পারি, আপনার মতো যুবকদের কারণেই পৃথিবীতে ইসলামের এতো বদনাম ছড়াচ্ছে। আপনার ধারণা আপনি একাই শুধু সত্যি কথাটা জানেন আর কেউ জানে না? বাবাজী, বুঝার চেষ্টা করুন। একটু সম্মান করুন। এসব ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো অনেক গভীরভাবে। আপনি যতখানি বললেন, তারপরে আরো আছে। সেগুলো পড়ুন। সেগুলোর গভীরে প্রবেশ করুন, শুধু শুধু বইয়ের মলাট দেখবেন না। কথাগুলোর গভীরে প্রবেশ করুন। ঠিক আছে আপনি একটা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারপর ইসলাম ধর্মগ্রহণ

করেছেন। খুব ভালো কথা, কিন্তু মনে রাখবেন কোনো কিছু বাতিল করে দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা শুধু এটাই বুঝায় যে, আপনি কতখানি অজ্ঞ। এটা দিয়ে বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপারে আপনি কতখানি বিজ্ঞ বা জ্ঞানী। এটা দিয়ে বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপারে আপনি কত সীমিত এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি কতটুকু অন্ধকারে আছেন। তাই আপনি যদি 'সহস্রনামা' বুঝতে চান এটা একটা বিশাল জিনিস। এর প্রত্যেকটা শব্দ দিয়ে বিশাল বড় বই লেখা যায়। অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু এমন পণ্ডিত হলে তো সমাজের ক্ষতি হবেই।

এমন পণ্ডিতের দরকার নাই, যে সামান্য পড়া পড়েই নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করে। একমাত্র ভালোবাসার সাথে পড়াশুনা করলেই পণ্ডিত হওয়া যায়। জ্ঞানকে আহরণ করা যায়। আপনি যে ধর্ম পালন করছেন, সে ধর্মের জন্যে আপনি সুনাম বয়ে আনতে পারেন যদি কখনো উগ্রপন্থী না হন এবং এটা মনে করতে পারবেন না যে, সবাইকে আমার ধর্ম মানতে হবে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আপনি আমাকে বদলাতে পারবেন না। এই জীবনে না। কারণ আমি শরীর মন সবই সঁপে দিয়েছি। আর আমাদের মধ্যে অনেকেরই শরীর-মন বদলাতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে তাদের নিজেদের হৃদয় দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আর জ্ঞানের প্রতিটি অভিজ্ঞতা দিয়ে। মনে রাখা দরকার কেবল উদ্ধৃতি আর বিবৃতি দিয়ে আর কথা বলে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সমাজের সমস্যাগুলো বাড়তেই থাকবে। অন্য আর কিছু হবে না। আসুন আমরা সবাই বন্ধুর মতো পাশাপাশি থাকি, ভাই বোনের মতো বসবাস করার চেষ্টা করি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। কোনো সমালোচনা না করি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ১০. (পুরুষ) : আমার নাম মোহাম্মদ অখিল। আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। আমার প্রশ্নটা শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে, তার লেকচারের সময় বেদের একটা শ্লোক বলেছেন, যেটা আসলে ঈশ্বর বলেছেন 'আমি একজন, কিন্তু অনেকের মধ্যে আছি।' এটা আপনি কতখানি মানেন? যদি মেনে থাকেন তাহলে কারণটা কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি বলেছেন যে, আমার মতামত কি এই বিষয়ে যে, শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, ঈশ্বর একজন আর সবার মধ্যে আছেন। এটাই জানতে চেয়েছেন বলে আমি মনে করি। আপনার কথা যা শুনেছি, সেই বিষয় যদি বুঝতে পারি পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে ও সূরা সাজদা'র ৯নং আয়াতে আছে, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানবজাতিকে রুহ আর জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কথা জ্ঞান মানবজাতির সবার মধ্যেই বিদ্যমান। এখন যদি মেলান, বিরোধ বাদ দিয়ে সাদৃশ্যগুলো দেখি, কুরআন আর বেদের সাদৃশ্য।

কুরআন বলছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, সৃষ্টিকর্তা তার জ্ঞান দিয়েছেন। এর মানে এই নয় যে, সব কিছুই সৃষ্টিকর্তা। এর মানে হলো প্রত্যেক মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান আছে। মানেন না বা না মানেন সেটা আলাদা কথা। তবে একথা মানতেই হবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান সবার মধ্যে কম-বেশি আছে। আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন রবিশংকরজীর কাছে।

প্রশ্ন ১১. (মহিলা) : আমি তানভীর ফাতেমা। আমি বিবিএস-এর ছাত্রী আরজিডিসি কলেজ। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে।

মহাভারতে একথা বলা আছে যে, অভিমন্যু মায়ের পেটে থাকার সময় কীভাবে চক্রব্যুহে ঢুকতে হবে সেটা শুনে ফেলেছিল। কিন্তু একথা বিজ্ঞানে প্রমাণিত যে , পেটের ভেতরে ভ্রূণ কিছুই শুনতে পায় না। আপনি এ ব্যাপারে কী বলবেন?

উত্তর : রবিশংকর : আসলে একটা কথা বহুল প্রচলিত আছে যে, পৃথিবী রহস্যে ভরপুর। আর আমরা আসলে জানি না। আমি এখানে অভিমন্যুর পক্ষ নিয়ে বলবো না। আপনি যেভাবে বলেছেন তাতে যদি ভালো কিছু পান গ্রহণ করেন। আর যদি মনে করেন এটা হতে পারে না। ঠিক আছে হতে পারে না।

তবে আর কয়েক বছর পর আপনি জানতে পারবেন এটা সম্ভব। কারণ এক সময় বিজ্ঞান মনে করতো টেস্টটিউব বেবী জাতীয় কিছু করা সম্ভব নয় কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আজ তা সম্ভব। দেখুন মহাভারতে লেখা আছে 'কুন্তী তার সন্তানের ভ্রূণ বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিয়েছিল। আর এই যেসব 'পুরাণ' আর 'ইতিহাস' এগুলো বইয়ের বাইরের অর্থটা নিলে চলবে না, এগুলোর গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এটাকে নিতে হবে অন্যভাবে। কারণ এটা কোনো ঐতিহাসিক দলিল না। সেভাবে এটা লেখা হয় নি। আসলে কি জানেন 'মহাভারত' আর 'পুরাণে' অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত আমরা এসব গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা করি নি। এই মুহূর্তে আমাদের সেটা উচিত এবং জরুরি। আমি এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।

প্রশ্ন ১২. (পুরুষ) : আমার নাম রাসেল। আমি বি.কমের ছাত্র। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে। আমার প্রশ্নটি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের উপরে। ইসলামের কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যেকোনো বিশ্বাস ও মতবাদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। আর ইসলামে যেসব ধর্মীয় নেতা আছেন তারা সবাই সেগুলো মানেন। কিন্তু দেখা যায়, হিন্দুধর্মে বিভিন্ন পুরোহিতরা বা উঁচু বর্ণের লোকেরা যেসব কিছু করে বা মেনে চলে অনেক ক্ষেত্রে তা বেদের সাথে মিলে না। আপনি বললেন যে, বেদ নিয়েই আমরা

আমাদের মতবাদগুলো পরখ করতে পারি। কিন্তু হিন্দুধর্মে পুরোহিতরা মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বেদের বিপরীত কথা বলে। অথচ বেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বেদ বলছে ঈশ্বরের কোনো মূর্তি বা ছবি নেই, কিন্তু পুরোহিতরা বলছে অন্য কথা। তাহলে একজন সাধারণ মানুষ কি করবে? কোন্‌টা মানবে? আর কোন্‌টা মানবে না? আপনি যদি বলেন পুরোহিতদের দরকার নেই, ধর্মগ্রন্থ মানতে হবে। পুরোহিতরাই যদি ভুল পথে থাকে তাহলে সাধারণ হিন্দু কীভাবে নিজেকে ঠিক পথে রাখবে? কীভাবে সে হিন্দুধর্ম পালন করবে?

উত্তর : রবিশংকর : হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমার বক্তৃতার প্রথমেই আমি বলেছিলাম, ধর্মগ্রন্থগুলো আছে, যদি আপনি প্রথম আলোচনা শুনে থাকেন তাহলে খুব সহজেই বুঝবেন। কিন্তু মানুষ এগুলো মেনে চলছে না। মানুষজন পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান মানছে না। শান্তির কথা বললেও মানুষ বিভিন্ন রকমের অশান্তি ধ্বংসাত্মক আর সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। শান্তিকে ছড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না সামান্য কয়েকজনের কারণে।

ঠিক একইভাবে যদি আপনি দেখেন যে, কোনো পুরোহিত ভুল বলছে তাহলে সেটা হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দুধর্মে এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, বেদ পরিষ্কার অনুমতি দিয়েছে, উপনিষদও দিয়েছে, বেদান্ত অনুমতি দিয়েছে। যোগের মাধ্যমে আপনি পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ অনুভব করতে পারবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ সাধনা করছে উপকারও পাচ্ছে। আমাদের ভারতে যুগে যুগে অনেক সাধু সন্ন্যাসী এসেছেন। তারা হচ্ছেন মহাপুরুষ তারা হচ্ছেন নারদ, চৈতন্য, মহাপ্রভু, গুরুনানক, গুরুগোবিন্দ সিংজীসহ আরো অনেকে। এজন্যেই বেদে বলা হয়েছে ঋগবেদ-এর ২নং শ্লোকে 'ঋষিরা অতীতে এসেছেন এবং তারা ভবিষ্যতেও আসবেন।' এই বিশ্বজগৎ মূলত অসীম-এর কোনো শেষ নেই, কিনারা নেই। আর বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমি প্রত্যেক যুগে আসবো, পৃথিবীর ভুলগুলো শুধরানোর জন্যে আসবো। এখানে বিশেষভাবে আপনাদের বলতে পারি যে, শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা ভালো করে পড়ুন। আর অন্য আরো একটা বই আপনাদের পড়তে বলবো সেটা হলো 'যোগবৈশিষ্ট্য'। এই বইটা বৈজ্ঞানিক, বিস্ময়কর, আর গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ। এ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে। আজকের এই দিনে পুরো পৃথিবী বইটার গুরুত্ব মেনে নিচ্ছে। এ 'যোগবৈশিষ্ট্য' বইটা আমাদের সচেতনতা শেখায় এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে। তাই আমি বলতে চাই আমাদের যা করা উচিত তাহল, সব জায়গা থেকে জ্ঞান ও ভালো জিনিস গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানের ভালো জিনিস নিতে হবে উপনিষদ থেকে গীতা আর বেদান্ত থেকে। আর আশেপাশের সবাইকে মন থেকে ভালোবাসতে হবে আর সহযোগিতা করতে হবে ঠিক আছে।

প্রশ্ন ১৩. (মহিলা) : আমার নাম নুসরাত ফাতিমা। আমি একজন গৃহিণী। আমি প্রথমে ডা. জাকির নায়েককে তার সুন্দর লেকচারের জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করুন। আমাদের হাতে সময় একদম কম।

মহিলা : আমার প্রশ্নটা হলো, আজ কথা বললাম শান্তি আর ভালোবাসা নিয়ে, যাতে করে আমরা এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাস করতে পারি। অন্য কথায় আমাদের জীবন হবে সহজ সরল নিরাপদ। শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে আমার প্রশ্ন, আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের দায়িত্ব কি? এই পৃথিবীর সব মানুষের প্রতি নাকি আমাদের দায়িত্ব এই পৃথিবীর মানুষ আর সৃষ্টিকর্তার প্রতি? ধন্যবাদ।

উত্তর : রবিশংকর : হ্যাঁ একটা ব্যাপারে আমি ভিন্নমত পোষণ করি সেটা হলো 'পুনর্জন্ম'। আগের প্রশ্নটার ব্যাপারে বলছি।

আমরা ভারতের হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি।পৃথিবীজুড়ে মনোবিজ্ঞানীরা রিগ্রেশনের মাধ্যমে সুস্থতার জন্যে রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন। যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না তাদের কিছু চমৎকার অভিজ্ঞতা আছে। তারাও সেটা মেনে নিচ্ছেন। কারণ হলো মন বা সচেতনতা আসলে শক্তি আর বুদ্ধি ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। থার্মোডায়ামিকসের প্রথম সূত্র এটা বলে যে, সচেতনতা অসীম। এমনকি বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত যে, সচেতনতা হচ্ছে চলমান। এটা চলতেই থাকে। এটা দিয়ে আবার শিশুদের ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তিন-চার বছরের শিশু ভায়োলিন বাজাতে পারে বীণা বাজাতে পারে। কারো কাছে না শিখেই সে বাজাতে পারে। আমি নিজেই এর দৃষ্টান্ত, আমি ছোট সময়েই গীতা জানতাম। অথচ আমাকে কেউ শেখায় নি। আসলে কি এগুলো হচ্ছে সংস্কার যেগুলো আমরা মানি। তাই আমার নিজস্ব মতামতটা এখানে প্রকাশ করছি। জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখধর্ম, হিন্দুধর্ম, তাওইজম, শিন্টোইজম এসব ধর্মই পরজন্মে বিশ্বাস করে। এরা সবাই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে। এবার আমি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে বলছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, সবার আগে যা দরকার আমাদের ভালোবাসা আর বিশ্বময় শান্তি কাজ করা মানে, আমরা বিশ্বাস করি [সংস্কৃত] যেলোক অন্যের সেবা করে সে আসলে ঈশ্বরেরই সেবা করছে। তাই অন্যকে সেবা করার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত শরীফ সাহেবসহ আরো অনেকেই আছেন যারা এ মতবাদের প্রশংসা করেছেন, ভালো বলেছেন। এটা আসলে আমাদের সবার জন্যেই ভালো।

'কাইকভি কৈল্লাসা' শব্দের অর্থ হলো মানুষকে সাহায্য করা। আর মানুষকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হবে। মানবজাতিকে সেবা করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হবে। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।

প্রশ্ন ১৪. (মহিলা) : আমার নাম আমিনা। আমি পড়াশোনা করি। আমি যে প্রশ্নটা করতে চাই তা হলো যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে অবতার বলতে কী বুঝানো হয়েছে? আর কল্কি অবতার কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনার প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার আগে আমি বলতে চাই যে, আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার। তাই আপনাকে জানিয়ে রাখি মায়ের পেটে ভ্রূণ শব্দ শুনতে পায়। গর্ভধারণ করার ৫ মাস থেকে কানে শুনতে পায়। কুরআনেও এটা উল্লেখ আছে সূরা ইনসানের ২নং আয়াতে, আল্লাহ্ বলেন, 'আমি মানুষকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি দিয়েছি'। প্রথমে শ্রবণশক্তি তার পর দৃষ্টি। গর্ভধারণের ৫ মাস থেকে ভ্রূণ শুনতে পায়। এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। তাই ডাক্তারগণ গর্ভবতী মহিলাদের ভায়োলেন্ট সিনেমা দেখতে নিষেধ করেন। এ সমস্ত সিনেমা দেখলে ভ্রূণের ক্ষতি হয়। কারণ তখন ভ্রূণ শুনতে পায়। সরি, আগের প্রশ্নটার সাথে আমি একমত ছিলাম না। এখন এই প্রশ্নটার ব্যাপারে আসা যাক, অবতার আসলে কী? ও কল্কি আবার কে? অবতার শব্দের অর্থ– সংস্কৃত শব্দ 'আও' এবং ত্র অর্থাৎ নেমে আসা। এর সাধারণ অর্থ হলো, বেশির ভাগ হিন্দুই মনে করে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। তবে কিছু কিছু পণ্ডিত এভাবে বলে থাকেন, 'অবতার' কাজটা আসলে ঈশ্বরের মানুষ রূপ বুঝায় না। হতে পারে ঈশ্বর কাউকে পাঠিয়েছেন। যেমন : ঋষী, সন্ন্যাসী।

কুরআন মজীদেও এমন কিছু ব্যাপার আছে যে, স্রষ্টা মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেন, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তার মাধ্যমে। যাকে আমরা বলি প্রেরিত দূত। তাহলে দেখা গেল ইসলাম প্রেরিত দূত বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, 'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্কবাণী যায় নি।' কুরআনের সূরা রাদ-এর ৭নং আয়াতে আছে 'প্রত্যেক যুগে আমি দূত পাঠিয়েছি।' যদি আপনি বেদ পড়েন বেদেও লেখা আছে যে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনেক জ্ঞানী লোক, অনেক ঋষী পাঠিয়েছেন।' আর তাদের মধ্যেই একজন হলো কল্কি অবতার। এর উল্লেখ আছে ভগবত পুরাণের ১২নং খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ১৮-২০ অনুচ্ছেদে। যে, তার জন্ম হবে বিষ্ণু ইয়াশের ঘরে অর্থাৎ সাম্বালা শহরের প্রধান। তার নাম হবে কল্কি এবং প্রভু নেমে আসবেন। আরো উল্লেখ আছে তার থাকবে ৮টি অসাধারণ গুণ। তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন, হাতে থাকবে তরবারি এবং তিনি দুর্বৃত্তদের ধ্বংস করবেন।

এছাড়াও ভগবদ পুরাণের খণ্ড-১; অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-২৫-এ আছে, কলি যুগে যখন রাজারা হবেন ডাকাতের মতো, যখন রাজারাই হবে ডাকাত।

বিষ্ণু ইয়াশের ঘরে কল্কি জন্ম নেবে। আরো উল্লেখ আছে, পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদ কল্কি আসবে তার বাবার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াশ। কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ৪ জন সহচর তাকে সহযোগিতা করবে । কল্কি পুরানের ২য় অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে আছে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে বিভিন্ন দেবদূত ও ফেরেশতা সাহায্য করবে। কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদে আছে, তার জন্ম হবে বিষ্ণু ইয়াশ ঘরে সুমতির গর্ভে। কল্কি পুরানের ২য় অধ্যায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে আছে। তিন মাসের ১২ তারিখে তিনি জন্মাবেন। এক কথায় কলিত অবতার নিয়ে আরো কথা বলা যায়। এক কথায় বলা যায়, তার বাবার নাম বিষ্ণু ইয়াশ, যার অর্থ সৃষ্টিকর্তার পূজারি। আর তার মায়ের নাম হবে সুমতি। যার অর্থ শান্তিপূর্ণ, অঞ্চল। মোহাম্মদ ﷺ এর মায়ের নাম হলো আমিনা যার অর্থ হলো শান্তিপূর্ণ, অঞ্চল। তার জন্ম হবে সাম্বালা শহরের একটি এলাকায়। সাম্বালা অর্থ হলো শান্তিপূর্ণ এলাকা। আর মক্কাকে বলা হয় দারুল আমান বা শান্তিপূর্ণ এলাকা। বলা আছে যে, তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধান ব্যক্তির ঘরে। আমরা জানি মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন মক্কার প্রধান ব্যক্তির ঘরে।

তিনি জন্মাবেন মাসের দ্বাদশ দিনে। আমরা জানি, মুহাম্মদ ﷺ রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বলা হয় যে, তিনি হবেন অন্তিম ঋষি। তিনিই হবেন সর্বশেষ ঋষি। মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে সূরা আহ্যাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط

অর্থ : মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

আরো বলা আছে তিনি আসমানি কিতাব পাবেন। সেটা তিনি পাবেন গুহার মধ্যে। তারপর দক্ষিণে গিয়ে ফিরে আসবেন। আমরা অবশ্যই জানি যে, রাসূল ﷺ ওহী পেয়েছিলেন জাবালে-ই-নূর এর আঙ্গারে হেরা আলোর পাহাড়ে বসে। তিনি দক্ষিণে মদিনায় গিয়ে আসেন। বলা আছে যে, তাঁর ৮টি অসাধারণ গুণ থাকবে। এই গুণগুলোর নাম হলো– জ্ঞান, আত্মসংযম, জ্ঞান বিতরণ, সম্ভ্রান্ত বংশ, সাহস, শক্তি, পরোপকার ও মহানুভবতা এ আটটা গুণই মুহাম্মদ ﷺ-এর ছিল।

আরো আছে যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করবেন। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা সাবা-এর ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তিনি (মুহাম্মদ) সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা।' আরো বলা আছে তাঁর থাকবে একটি

সাদা ঘোড়া। আমরা জানি যে, মহানবী ﷺ বোরাকে চড়ে মিরাজ গমন করেছিলেন। বোরাক হল সাদা ঘোড়া। তার ডান হাতে একটি তরবারি থাকবে। মুহাম্মদ ﷺ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তার সব তিনি করেছিলেন আত্মরক্ষার জন্যে। তিনি যুদ্ধে ডান হাতে তরবারি ধরতেন। বলা আছে চারজন সহচর তার সাহায্য করবেন। এখানে আমরা খোলাফায়ে রাশেদীন তথা আবু বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে বুঝবো। বলা আছে, তাকে দেবদূত সাহায্য করবে। আমাদের জানা আছে যে, বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ-কে ফেরেশতারা সাহায্য করেছিল। একথা কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ১২৩ ও ১২৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ভবিষ্যৎবাণী নির্দেশ করে মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন ডা. জাকিরের কাছে।

প্রশ্ন ১৫. আমার নাম বিজয় কুমার। আমি একজন T.V টেকনিশিয়ান। ডা. জাকির নায়েকের কাছে আমার প্রশ্ন ইসলামে পুনর্জন্ম বলে কিছু আছে কিনা? কিছু মুসলমান বলে পুনর্জন্ম আছে। আরেকটা প্রশ্ন হলো কিয়ামতের দিন কি? ঐদিনে যারা মারা যাবে তাদের বিচার কাজ কখন হবে।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করেছেন ইসলামে পুনর্জন্ম আছে কিনা? আর কিয়ামতের দিন যারা মারা যাবে তাদের বিচার কখন হবে? এখানে পুনর্জন্ম নিয়ে যখন কথা বলা হচ্ছে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা দিয়ে শুরু করবো। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেন– আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাদের মৃত্যু দিবেন। তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তারপর মৃত্যু দিবেন, তারপর আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। তাহলে বুঝা গেল; এই পৃথিবীর জীবনের পর আমাদেরকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হবে সেটা পরকালে। তাহলে দেখুন আপনি যদি মৃত্যুর পরে জীবন নিয়ে বলেন তাহলে বলতে হবে ইসলামে পরকাল আছে। কিন্তু যদি আপনি হিন্দু দর্শনের মতো কোনো নিয়মের কথা, বিধানের কথা বলেন যেটা বলেছে, আপনি জন্ম নিবেন। তারপর একদিন মারা যাবেন। তারপর আবার জন্মাবেন, আবার মারা যাবেন, যেটাকে বলে জন্ম আর পুনর্জন্মের চক্র। আসলে আমরা একবারই দুনিয়ায় এসেছি এবং একবারই যথেষ্ট। যদি ভালো করে দেখেন আমি বেদসহ অন্যান্য ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, এই দর্শন বা সংস্কারটা এসেছে ভগবতগীতার একটা শ্লোক তথা অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২২-এ উল্লেখ আছে যে, মানুষ যেমন কাপড়-চোপড় ছেড়ে নতুন কাপড়-চোপড় পরে, একইভাবে আত্মা

একটা শরীর ছেড়ে নতুন আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। আরো উল্লেখ আছে ভ্রদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ৩ অনুচ্ছেদে শুয়া পোকা যেমন ঘাস খেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর অন্য ঘাসে লাফ দেয়, একইভাবে মানুষের আত্মা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। তবে এ দর্শনটা আমার মতে বেদে উল্লেখ নেই। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা, গ্রন্থ-১০ পরিচ্ছেদ-১৬, অনুচ্ছেদ-৪-৫ বলা হয়েছে পুনরংল সরসতী জনম মানে জীবন। পুনর্জীবন, পরবর্তী জীবন এসব ঠিক আছে। কুরআনেও পরবর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তবে এভাবে বলা হয় নি যে, জন্ম→মৃত্যু →জন্ম→মৃত্যু→জন্ম →মৃত্যু→জন্ম→মৃত্যু। আমার জানামতে বেদের কোথাও নেই।

শ্রী শ্রী রবিশংকর নিজেই বলেছেন যে, বেদ হলো সবার উপরে। তাহলে যদি বেদ আর ভগবতগীতা মিলিয়ে দেখেন সেই সঙ্গে উপনিষদ তাহলে সব ঠিক আছে। আমার দেহ আছে, আত্মাও আছে, শরীরের মৃত্যু হওয়ার পর আবার পরবর্তী জীবনে ফিরে আসবো। আমি একথার সাথে একমত যে, মৃত্যুবরণ করার পর আবার জীবন আছে। তবে সেটা অবশ্যই এমন হবে না যে, জন্ম→মৃত্যু→ জন্ম→ মৃত্যু→জন্ম →মৃত্যু। এই ধরনের সংস্কার এনেছিলেন হিন্দু পণ্ডিতরা। কারণ, তারা বুঝতে পারে নি কেন একজন মানুষ বোবা, কালা, অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কারো হৃৎপিণ্ডের মারাত্মক অসুখ থাকে, কারোর থাকে না। কেউ হয় স্বাস্থ্যবান আবার কেউ অসুস্থ। কেউ জন্ম নেয় বড়লোকের ঘরে, কেউ জন্ম নেয় গরীবের ঘরে। তারা যে দর্শনটা বিবেচনা করলেন সেটা হলো কর্ম। মানুষের কার্যকলাপ, বিভিন্ন কাজ, যেটা করবেন ধর্মের নিয়মে। তাহলে দেখা গেল হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, পরবর্তীতে জন্মানোর পদ্ধতি কাজের উপর নির্ভরশীল, আপনি কি কাজ করলেন এর উপর ভিত্তি করে পরের জীবনে ভালো কাজ করলে বড় ঘরে, খারাপ কাজ করলে জন্মাবেন নীচু পর্যায়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনি বদলাতে থাকছেন। কখনো মানুষ, কখনো গাছ আবার মানুষ। মনে রাখতে হবে আল্লাহর সৃষ্টি সবচেয়ে উপরে হলো মানুষ, যেটা সাতবার ঘটতে পারে। এ মতাদর্শের সাথে ইসলাম একমত নয়। বেদে যেভাবে পুনর্জন্ম পরবর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে সেটা মানলাম। আমরা একবার পৃথিবীতে এসেছি সেটাই যথেষ্ট।

ইসলাম কী বলে? কুরআনের সূরা মুল্‌কের ২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوتَ لِيَبْلُوَكُمْ ـ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَيۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَالۡجُوۡعِ وَنَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَالۡاَنۡفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيۡنَ ۔

অর্থ : তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করবেন ভয়, ক্ষুধা, জীবনের ক্ষতি, ফসলের ক্ষতি এবং ধন-সম্পদের ক্ষতি দিয়ে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।

তাহলে দেখা গেল আল্লাহ্ আমাদের এই জীবন দিয়েছেন পরকালে পরীক্ষা করার জন্যে। এই দর্শন দিয়ে বলতে চাইলে বলা যায়, কেন মানুষ পঙ্গু হয়, গরিবের ঘরে হয়, ধনীর ঘরে হয়? পবিত্র কুরআনের সূরা আনফাল-এর ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَاَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ۙ

অর্থ : জেনে রাখ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য।

তাহলে একথা স্পষ্ট যে, এ জীবন দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে, পরকালের পরীক্ষা। তাই আল্লাহ কাউকে পাঠিয়েছেন গরিবের ঘরে আবার কাউকে বড়লোকের ঘরে। এটা আসলেই একটা পরীক্ষা, এই চূড়ান্ত সত্যটা আমাদের বুঝতে হবে। এখন দেখুন পরীক্ষা কীভাবে হয়, আল্লাহ ধনীলোকদের বলছেন তোমরা যাকাত দাও যাদের অতিরিক্ত সম্পদ আছে। প্রতি বছর যাকাত দিবে শতকরা ২$\frac{1}{2}$ টাকা হারে। যাকাত হবে যদি কারো ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ সম্পদ থাকে। গরিব লোকদের যাকাত দেয়া লাগবে না। আমরা বলি গরিব লোক আদমী, তার টাকা পয়সা নেই, যাকাতের পরীক্ষায় সে পাবে ১০০ থেকে ১০০ মার্ক। ধনী ব্যক্তি সঠিকভাবে যাকাত দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। যদি ধনী লোক ঠিকভাবে যাকাত দেয় তাহলে সে ১০০ থেকে ১০০ ভাগ মার্ক পাবে, যদি অল্প করে দেয় তাহলে অল্প পাবে আর যদি না দেয় তাহলে শূন্য নম্বর পাবে। অপরদিকে গরিব লোক এক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে। এটাই হলো পরীক্ষা। একইভাবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে কাউকে দেন সুস্বাস্থ্য, আবার কাউকে দেন অসুস্থতা। কারো সন্তান জন্মায় অসুস্থ হয়ে। এটা আগের জন্মের পাপের জন্যে নয়।

কারণ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ মাসুম। এটা বাবা-মায়ের জন্যে পরীক্ষা। যদি কারো হৃৎপিণ্ড অসুস্থ থাকে, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি না যে. এটা তার আগের জন্মের ফল। এটা আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্যে দিয়েছেন। গরিব হয়ে জন্মগ্রহণ করা কোনো পাপ নয়। কারণ বেহেশতে যেতে হলে আপনার টাকা পয়সা কাজে লাগবে না, স্বাস্থ্য কাজে লাগবে না। আল্লাহ তাআলা মা-বাবা,

ধনী, গরিব সুস্বাস্থ্য, অসুস্থ প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করছেন। তাহলে দেখা গেল এভাবেই আমরা পরের জীবনে বিশ্বাস করি। সেখানেই আমাদের বিচার হবে। কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط

অর্থ : প্রত্যেক জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। যদি পৃথিবীতে আংশিক পাপ করেন, আংশিক শাস্তি পাবেন, আবার নাও পেতে পারেন।

চূড়ান্ত শাস্তি হবে পরকালে গিয়ে। বেদেও এ কথা বলা আছে। যেমন : স্বর্গ আর নরক। যদি কাজ ভালো করেন তাহলে যাবেন স্বর্গে। আর যদি খারাপ কাজ করেন তাহলে যাবেন নরকে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই, যারা যারা গেছেন এ পর্যন্ত সবাইকে, প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সবাইকে কিয়ামতের দিন বাঁচিয়ে তোলা হবে। সেখানে আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচার করবেন। যার যা প্রাপ্য সে তাই পাবে সে যা করেছে। ভালো কাজ করলে পুরস্কার পাবে খারাপ কাজ করলে শাস্তি পাবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : এবার আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের শেষ প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে।

১৬. প্রশ্ন. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম মিত্রা। আমি ওরাকলে চাকুরি করি। আপনার লেকচার শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি যখন বললেন, যে ব্যক্তি শান্তি ছড়ায় না সে মুসলমান নয়। আমি তখন আনন্দে হাততালি দিয়েছিলাম। তাহলে শুধু ভারতে না, পুরো পৃথিবীতে কেন সন্ত্রাসমূলক কাজের সাথে ইসলামকে জড়ানো হচ্ছে? আর এই বিষয়ে আপনাদের নেতারা কি করছেন? ইসলামের নামে এ বদনাম হওয়া তো ঠিক না।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমরা লক্ষ করছি ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এটা আসলে ঘটেছে মিডিয়ার কারণে। টাইম ম্যাগাজিন অনুযায়ী এই খবরটা ছাপা হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে, মাত্র ১৫০ বছরের মধ্যে। ১৮০০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন একটার বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। আর ৯ সেপ্টেম্বর এর পরে এর পরিমাণ আরো বাড়ছে। মানুষ উদ্ধৃতি দিচ্ছে কুরআন থেকে কিন্তু প্রসঙ্গ বাদ দিচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে এমন সব বক্তব্য দেয়া হচ্ছে যা সত্য নয়। এগুলোর একটা হলো পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৫নং আয়াত। 'যখনই কোনো কাফেরকে সামনে পাবে তাকে মেরে

ফেলবে।' এটা বলা হয়েছে প্রসঙ্গ ছাড়া। এই আয়াতের প্রসঙ্গ বলা হয়েছে প্রথম দিকের আয়াতে। একটা শান্তি চুক্তি হয়েছিল মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সাথে। এই চুক্তি আবার মুশরিকরাই ভঙ্গ করেছিল। এই সময় আল্লাহ্ সূরা তাওবার উক্ত আয়াত নাযিল করেন এবং বলেন তোমরা চার মাসের মধ্যে সব ঠিক করো তারপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আর মনে রাখবে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্ মুসলমানদের পরীক্ষা করেন।

যখন তোমার শত্রুরা, যখন কাফিররা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমাকে মারার জন্যে আসে, তখন যুদ্ধ করো, তাদের মারো। ঠিক একইভাবে আর্মি জেনারেলগণ তার সৈনিকদের মরণপণ যুদ্ধ করতে বলবেন। তাদের মরে যেতে বলবেন। তাই আমি বলবো, ঐ উদ্ধৃতি যা উগ্রপন্থীরা দিয়েছে তা প্রসঙ্গ ছাড়া। আর ভারতে ইসলামের একজন সমালোচক, অরুণ শুরী, তিনি বই লিখেছেন 'দ্য ওয়াল্ড অব ফতোয়া'। আর তিনি এই বইয়ে সূরা তাওবার ৫নং আয়াত থেকে ৭নং আয়াতে বলে দিয়েছেন। এর কারণ কী জানেন? কারণ ৬নং আয়াতে ৫নং আয়াতের জবাব দেয়া আছে। ৬নং আয়াতে বলা আছে। 'যদি কোন কাফির আশ্রয় চায়, শান্তি চায়। তার ক্ষতি করো না। তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও।' মনে রাখবেন কুরআন যুদ্ধের কথা বলে শেষ অস্ত্র হিসেবে, যখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তবে কুরআন সবসময় বলে যে, শান্তিই ভাল, শান্তিই কল্যাণ। যদি তারা শান্তিতে থাকতে চায় তাহলে শান্তি দাও। আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, পৃথিবীর সব ধর্মে, তাদের ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তবে শেষ উপায় হিসেবে, যাতে শান্তি বজায় থাকে।

শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন গীতার কথা। কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন– গীতার অধ্যায়–১ম অনুচ্ছেদ ৪৩–৪৮-এ এভাবে অর্জুন বলেছে, সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিবে। আরো বলেছে, আমার আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ না করে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাবো। এরপরে আছে ভগবতগীতার ২৩৩ নং অনুচ্ছেদে, শ্রী কৃষ্ণ বলেন কীভাবে এমন চিন্তা তোমার মাথায় আসলো। কীভাবে তুমি শক্তিহীন হয়ে পড়লে। তারপর ভগবতগীতার ৩১ থেকে ৩৩ নং অনুচ্ছেদে, তুমি একজন ক্ষত্রিয় তুমি একজন যোদ্ধা। যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য। সেই ক্ষত্রিয় সেই সৌভাগ্যবান যে, যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। আর যদি মহাভারত পড়েন তাহলে কুরআন থেকে বেশি যুদ্ধের কথা পাবেন। তবে মজার কথা হলো, হিন্দুরা আমাকে বলে 'এটা মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ।'

আমি বলছি কুরআনও একই কথা বলছে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমরা সবাই একমত। তাই, আপনি যদি প্রসঙ্গসহ পড়েন তাহলে দেখবেন সব ধর্মই শেষ উপায়

হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের কথা বলে, অনুমতি দেয়। শ্রী শ্রী রবিশংকর নিজেও বলেছেন যে, যোদ্ধার কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। এখন প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে। তাই অপরাধীদের থামিয়ে রাখার জন্যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে। সে জন্যে পবিত্র কুরআনও অনুমতি দেয়। তবে কিছু লোক প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলে তারা ইসলামের নিন্দা করে। আর এ কারণেই লোকজন ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে জড়িয়ে ফেলে। আরো বিস্তারিত জানতে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন 'জিহাদ অ্যান্ড টেরোরিজম : ইন দ্য রাইট পারসপেকটিভ'। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : আমি আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সবার আগে ধন্যবাদ জানাবো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। তাঁর ইচ্ছেতেই আমরা অনুষ্ঠানটা সফলভাবে শেষ করতে সক্ষম হলাম। সবাই আমরা একত্রিত হতে পারলাম। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো আজকের অনুষ্ঠানের বক্তাদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে থেকে সহযোগিতা করলেন, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আস্‌সালামু আলাইকুম। সবাই শান্তিতে থাকুন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

UNIVERSAL BROTHERHOOD

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

লোকদের ইসলামের কল্যাণের সাথে পরিচিতি করানো, এ স্বর্গীয় ধর্মের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা অপনোদন করা দায়ী'র প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আলহামদু লিল্লাহ, একদল পণ্ডিত দায়ী' ইসলামকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার এ ধরনের স্বনির্ধারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে সব অমুসলিমের মাঝে যারা ইসলাম এবং এর অনুসারীদের সম্পর্কে ভুল তথ্য লাভ করেছে, বেশিরভাগই অমুসলিম পণ্ডিত ও সাথে সাথে নকল মুসলিমদের ভুল নির্দেশনার ফলে। এ ধরনের পণ্ডিতগণ তাদের লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে সব সময়ই দোষ খোঁজার চেষ্টা করে। বদলি লোকের বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই পায় না। এই ইসলাম বিরোধী শক্তি সব সময়ই অর্থ ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করছে। এরা লোকদের লেখনি ও প্রচারের মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তারা সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের বদনাম করার মাধ্যমে। এ ধরনের লেখক ও বক্তাদের অধিকাংশই ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা পার্থিব স্বার্থে ধীরে ধীরে ইসলামী শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা অজ্ঞ এবং নির্দোষ অমুসলিমদের মাঝে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অতএব এখন সময়ের দাবি হচ্ছে তাদের লেখা ও বিদ্যমান থাকা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার সমুচিত জবাব দেয়া; যা হবে নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রীয় ও অন্যান্য উদ্ধৃতি দিয়ে লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে।

স্বল্প সংখ্যক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দায়ী'র মধ্যে মুম্বাই-এর IRF-এর প্রেসিডেন্ট ডা. জাকির নায়েকের নাম আসে, যাঁর জোর প্রচেষ্টা ও ইসলামী দাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ক্রিয়া-কর্ম প্রবল মূল্যে ডানপন্থী লোকদের মধ্যে ব্যাপক উপলব্ধি ছড়িয়েছে। পাল্টা জবাব আকারে তাঁর বক্তব্য লোকদের সন্দেহ দূরিকরণার্থে এক কার্যকরী যন্ত্রে রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেহেতু তাঁর বক্তব্য পূর্ণ থাকে শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক তথ্যে এবং প্রায়োগিক যুক্তিতে। এতে করে খুব কমই তাঁর বক্তব্যের পর সন্দেহ ও প্রশ্ন থাকে, এতেও কিছু লোক যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন প্রশ্ন করে তাঁকে বিরক্ত করে থাকে।

আজ অনেক ধরনের বিষয় ও অনুশীলনের ওপর আলোচনা ও ব্যাখ্যা হবে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো– 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব'। যখন এ বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে

ইসলামের মহত্ত্ব ইসলামের শিক্ষার আলোকে লোকের সামনে পেশ করা হয়, অজ্ঞ ও ভুল নির্দেশিত অমুসলিমগণ কুরআন হাদীসের গভীরে না গিয়ে যুক্তি পেশ করে যে, এক সময়ে এ ধর্ম তরবারির সাহায্যে প্রসার লাভ করেছিল। অতএব তা কীভাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রদান করে?

তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য রেখে মুম্বাই AQSA শিক্ষা সোসাইটি একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করে এবং ডা. জাকির নায়েককে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয় এবং তিনি প্রোগ্রামের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করবেন।

ডা. জাকির নায়েক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ওপর কুরআনের আয়াত, হাদীসের উদ্ধৃতি ও ভ্রাতৃত্বের অনুশীলনের উদাহরণ বিশেষত সালাত এবং হাজ্জ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা করেন। তিনি হিন্দু মতবাদের কিছু শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিও দান করেন, যার মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথাও আছে। যাহোক, তিনি কিছু মিলের বিষয়ে জোর দেন, যা হলো বিভিন্ন ধর্মের লোকদের ভ্রাতৃত্বের একই প্লাটফর্মে একত্র করার মৌলিক বিষয়। তিনি অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিও দান করেন যা তাদের অনুসারীদের একক খোদায় বিশ্বাস ও গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রদান করে, যা হলো এক মিল থাকা বিষয়ের পরিপূর্ণ উদাহরণ।

যদিও ডা. জাকির নায়েককে কিছু অপ্রাসঙ্গিক ও উপদ্রবকর প্রশ্ন শ্রোতাদের পক্ষ থেকে করা হয়, তবুও তিনি তাঁর সৌম্য মূর্তি ত্যাগ না করে তিনি শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি ও গ্রহণযোগ্য যুক্তির মাধ্যমে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেন, যেহেতু তিনি জানেন হেদায়াত দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ্।

এ বইয়ের পাতাগুলোতে ডা. জাকির নায়েকের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রদত্ত বক্তৃতা ও তার পরবর্তী প্রশ্নোত্তর পর্বের উত্তরগুলোই পেশ করা হলো। আশা করা যায় এর দ্বারা ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জনগণের মাঝে বিশেষত অজ্ঞ ও ভুল পথে পরিচালিত অমুসলিমদের মধ্যে সৃষ্ট ভুল ধারণাগুলো দূরিভূত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

মুম্বাই AQSA শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ সংগঠনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবৃন্দ সংগঠনের পরিচিতি প্রদান করেন। প্রধান অতিথি এবং শ্রোতামণ্ডলীকে আজকের বিষয় 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' এবং এর বক্তা IRF-এর সভাপতি ডা. জাকির নায়েকের পরিচিতি প্রদান করেন।

সর্বপ্রথম ভাই মইন ডন এভাবে তাঁর পরিচিতিমূলক বক্তব্য শুরু করেন– আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, শুভ সকাল। আজ সত্যিই সব ভিওয়ান্দী (মুম্বাই) বাসীদের জন্য বড় ধরনের আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, আজ আমাদের মাঝে ডা. জাকির নায়েক উপস্থিত আছেন। আমি ডা. জাকির নায়েক এবং সম্মানিত মেহমানবৃন্দকে AQSA শিক্ষা সোসাইটির আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানোর সুযোগ গ্রহণ করছি।

প্রোগ্রামের আরেকটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, পূর্বে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, পুলিশ কমিশনার মি. বহিত্য এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে তিনি তার অপারগতা প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এটা মি. হিংগোরেনের দয়া যিনি সিনিয়র অ্যাডভোকেট, যে তিনি অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করার জন্য রাজি হয়েছেন। আমি AQSA শিক্ষা সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বন্ধুগণ! আমরা এখনই বিধি অনুযায়ী আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। আমি এখন ক্বারী আব্দুস সালামকে ডেস্কে এসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ করছি।

ক্বারী আব্দুস সালাম সবাইকে ইসলামী অভিভাষণে সম্বোধন করেন, আসসালামু আলাইকুম। অতঃপর তিনি পবিত্র কুরআন থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং ভাই মইন ডন আয়াতটির অনুবাদ করেন কিছু প্রাথমিক শব্দের দ্বারা, যেমন জাজাক আল্লাহ। ক্বারী আব্দুস সালাম আল-কুরআনের সূরা নিসার ১ম আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। সবাই যাতে এ থেকে সুবিধা পেতে পারেন সেজন্য আমি অনুবাদসহ আয়াতটি পেশ করছি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম–পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

অর্থ : ওহে মানবমণ্ডলী! ভয় করো তোমাদের রবকে যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। এ দু জন থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভয় করো সেই আল্লাহকে যার নামে তোমরা পরস্পর অধিকার যাচ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছেন।'

এ হলো সূরা আন নিসার প্রথম আয়াতের অনুবাদ। এখন আমি আহ্বান জানাচ্ছি AQSA শিক্ষা সোসাইটির চেয়ারম্যান জাভেদ ফরিদকে AQSA শিক্ষা সোসাইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়ার জন্য।

মি. জাভেদ ফরিদ প্রধান মেহমান, প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর, আজকের বক্তা ডা. জাকির নায়েক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগতম জানান। অতঃপর তিনি প্রোগ্রামের আয়োজক AQSA শিক্ষা সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য ও অর্জনসহ সব ধরনের পরিচয় তুলে ধরেন।

ভাই মইন ডন মি. জাভেদ ফরিদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রধান মেহমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করেন এবং ডা. জাকির নায়েকের বিচারবুদ্ধি, ইসলামি দাওয়াহর ব্যাপারে বীরত্ব প্রদর্শন এবং তাঁর পেশা চিকিৎসায় ভালো করা এবং মর্যাদাপূর্ণ এ পেশা ত্যাগ করে দাওয়াতের কাজে যোগদান সম্পর্কে প্রশংসামূলক কিছু কথা বলেন।

এরপরই প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর ডা. মুহাম্মদ নায়েক কথা বলেন। সবাইকে প্রোগ্রামের সূচি ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য বলেন। তিনি ভাই মইন ডনকে 'জাযাকাল্লাহ খাইর আপনার ভূমিকার জন্য' একথা বলে ধন্যবাদ জানান। আমাদের প্রোগাম এভাবে চলবে যে ডা. জাকির নায়েক 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের' ওপর বক্তব্য রাখার পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে যাতে আমাদের শ্রোতৃমণ্ডলী, সাংবাদিকমণ্ডলী, এখানে উপস্থিত সবাই, সাথে সাথে আমাদের প্রধান মেহমান, সভাপতি অত্র অঞ্চলের DCP সবাইকে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব'-এর ওপরে তাঁকে জেরা করা, যে কোনো বিষয়ে তথ্য নেয়ার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের মাধ্যমে আমরা 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে'র ওপরে যে আলোচনা করছি তা ভালোভাবে বুঝার ব্যবস্থা করা যাবে।

ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব-এর ওপর বিশ্বাস করে

ডা. জাকির : আলহামদু লিল্লাহ। সম্মানিত অ্যাডভোকেট হেজ, সম্মানিত এডভোকেট হিংগোরেন, আমার সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠগণ এবং আমার প্রিয় ভাই

এবং বোনেরা। আপনাদের সবাইকে ইসলামী সম্ভাষণ দিয়ে স্বাগতম জানাচ্ছি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান্তি, অনুগ্রহ ও দয়া আপনাদের সবার প্রতি বর্ষিত হোক।

আজকের সকালের আলোচনার বিষয় হলো 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব'। বিভিন্ন ধরনের ভ্রাতৃত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্ব, আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্ব, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু এসব ভ্রাতৃত্বই সীমিত। আল-হামদু লিল্লাহ ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে। এটা এ বিশ্বাস করে না যে, মানুষ বর্ণে বিভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বা বিভিন্ন স্তরে জন্ম লাভ করেছে এবং আমি পবিত্র কুরআনের ৪৯ নং সূরা আল-হুজুরাত-এর ১৩ নং আয়াতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে ইসলাম যে ধারণা দেয় তা উল্লেখ করছি। সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো; কিন্তু আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে বেশি ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন।

আল-কুরআনের এ বাণী– 'হে মানবমণ্ডলী আমরা তোমাদেরকে মাত্র এক জোড়া নারী-পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি।' অর্থাৎ সব মানবজাতির মূল হলো এক জোড়া মানব-মানবী। এ পৃথিবীর সব মানুষের একই পরদাদা-দাদি। আর আল্লাহ বলেন, তিনি সব মানবজাতিকে জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছেন যাতে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। এজন্য নয় যে, তারা পরস্পর বিদ্বেষ ও ঝগড়া-বিবাদ করবে এবং এখানে আল্লাহর দৃষ্টিতে বিচারের মান দেয়া হয়েছে। যেমন এ আয়াত বলছে, এটা নারী-পুরুষের ভেদাভেদ, বর্ণ, সাদা-কালো, গোত্র ও সম্পদের ওপর নির্ভর করে না; বরং তাকওয়ার ওপর নির্ভর করে। তাকওয়া হলো খোদাভীতি, দয়া ও সত্যপরায়ণতা। যে কেউ অধিক ন্যায়-পরায়ণ, অধিক ধর্মভীরু, অধিক আল্লাহভীতি সম্পন্ন সেই লোক আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত এবং আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে তিনি সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।

অত:পর ৩০ নং সূরা আর রূম-এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : তার নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা, নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

পবিত্র কুরআন বলে, আল্লাহ্ বিভিন্ন ধরনের ভাষা ও বিভিন্ন ধরনের বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। কালো মানুষ, সাদা, বাদামি, হলুদ এবং এগুলো হলো নিদর্শনাবলী। এই যে, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য একে অপরকে ঘৃণা করার জন্য নয়। কারণ পৃথিবীতে আপনাদের যে ভাষাগুলো রয়েছে, তা সুন্দর। আপনি যে ভাষাগুলো শুনেন নি তার শব্দ আপনার নিকট হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু যাদের ভাষা তাদের নিকট এটা সবচেয়ে সুন্দর ভাষা। অতএব আল্লাহ বলছেন যে, তিনি বিভিন্ন ধরনের ভাষা ও রং সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে ও চিনতে পারো।

পবিত্র কুরআনের ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈলের ৭০ নং আয়াতে আল্লাহ্ আরো বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ ـ

অর্থ : অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে সম্মান দান করেছি।

আল্লাহ বলেন নি যে, তিনি আরব, আমেরিকান বা কোনো নির্দিষ্ট জাতিকে সম্মানিত করেছেন বরং গোত্র, বর্ণ, রং, উপদল ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন এবং বহু বিশ্বাস ও ধর্ম রয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে, মানবজাতির মূল হলো এক জোড়া মানব-মানবী তথা আদম ও হাওয়া (আ) থেকে। যা হোক, কিছু বিশ্বাস এমনও রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, নারীর পাপে অর্থাৎ হাওয়া (আ)-এর কারণে মানবজাতি পাপের মধ্যে জন্মলাভ করেছে এবং তারা কেবল নারীর ওপরে দোষ চাপায়, তিনি হলেন হাওয়া (আ), মানুষের পতনের জন্য তিনি দায়ী।

বস্তুত, আল-কুরআন আদম ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছে; কিন্তু সব স্থানে দোষ উভয়ের ওপর চাপিয়েছে। আদম ও হাওয়া (আ)-এর ওপর এবং আপনি যদি ৭নং সূরা আরাফের ১৯ থেকে ২৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন, এতে বলা হয়েছে– আদম ও হাওয়া (আ)-কে এক ডজনেরও বেশি বার সম্বোধন করা হয়েছে এবং আল-কুরআন বলে যে, তাঁদের উভয়ে আল্লাহকে অমান্য করেছিলেন, উভয়ে তাওবা করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং উভয়কে ক্ষমা করা হয়েছিল। তারা উভয়ে ভুলের জন্য সমভাবে দোষী ছিলেন। কুরআনে এমন একটি আয়াতও নেই যাতে দোষ শুধু হাওয়া (আ)-এর ওপর দেয়া হয়েছে। কিন্তু ২০ নং সূরা ত্বাহা-এর ১২১ নং আয়াতে শুধু আদম (আ)-এর দোষ উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ـ

অর্থ : আদম (আ) তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করে ভ্রমে পতিত হলো।

তারপরও আপনি যদি কুরআন অধ্যয়ন করেন, তাঁরা উভয়ে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন সমানভাবে এবং তারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছিলেন। আবার তাদের উভয়কে ক্ষমা করা হয়েছিল এবং কোনো কোনো ধর্ম বিশ্বাসে বলা হয়েছে, যেহেতু হাওয়া (আ) আল্লাহকে অমান্য করেছিলেন এজন্য পূর্ণ মানবতার পাপের জন্য তিনি দায়ী। ইসলাম এ কথার সাথে একমত নয়। তারা আরো বলে, আল্লাহ নারীদের অভিসম্পাত করেছেন আরো বলেছে যে, তাকে প্রসব বেদনা সহ্য করতে হয়। তার অর্থ গর্ভধারণ একটি অভিশাপ, কিছু লোকের মতে–যার সাথে ইসলাম মোটেও একমত নয়।

ক্বারী সাহেব কুরআনের ৪নং সূরা নিসা'র ১ম আয়াত তিলাওয়াত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, 'ঐ গর্ভকে সম্মান করো, যা তোমাকে বহন করেছে।' ইসলামে গর্ভধারণ একজন নারীর মর্যাদা কমায় না, এটা নারীর মর্যাদা বাড়ায়।

৩১ নং সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ -

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি, ভালো ব্যবহারের জন্য, তার মা তাকে কষ্টের ওপর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বুকের দুধ ছাড়ান দুই বছরে।

৪৬ নং সূরা আহকাফ-এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

অর্থ : আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি, সে যেন নিজের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে; অনেক কষ্ট সহ্য করে তাকে জন্ম দিয়েছে।

গর্ভধারণ একজন নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে, এটা মর্যাদা হানী করে না। ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। সহীহ্ বুখারীর ভলিউম নং-৮, কিতাবুল আদব-এর ২ নং অধ্যায়ের ২ নং হাদীস অনুযায়ী– এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও সম্মান লাভের হকদার কে? নবী ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? নবী করীম ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? নবী করীম ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'এরপর কে?' অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার পিতা।'

পিতা অপেক্ষা মাতার তিনগুণ বেশি সম্মানের অধিকারী এবং উভয়ে সঙ্গ লাভের হকদার

সংক্ষেপে সন্তানের ৭৫%শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের হকদার হলেন মা। ২৫% সম্মান ও সঙ্গলাভের হকদার হলেন পিতা। আরো সংক্ষেপে মা পাবেন স্বর্ণপদক, তিনি (বাপ) অন্য কথায় রৌপ্য পদক পাবেন অথবা ব্রোঞ্জ পদক, যেখানে পিতাকে কেবল একখানা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা।

ইসলামে নারী-পুরুষ সমান; কিন্তু এই সমতা মানে– সমরূপ নয়

ইসলামে নারী-পুরুষ সমান, কিন্তু এ সমতা মানে সমরূপ নয়। অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। বিশেষত নারী যখন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয়। অনেক মুসলিম ও অ-মুসলিমের ভুল ধারণা রয়েছে, সেটা দূর হওয়া সম্ভব যদি আপনারা নির্ভরযোগ্য উৎস কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস সঠিকভাবে অধ্যয়ন করেন।

পূর্বে আমি যা উল্লেখ করেছি, পুরুষ ও নারী সামগ্রিকভাবে সমান। কিন্তু সমতা (equality) অর্থ হুবহু অনুরূপ (identicality) নয়। আমি একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। ধরুন, একটি শ্রেণীতে দু'জন ছাত্র 'ক' ও 'খ'। তারা দু'জনই প্রথম হয়েছে। দু'জনই পরীক্ষায় ১০০-তে ৮০ নম্বর পেয়েছে। যদি আপনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, দেখা যাবে তাতে মোট ১০টি প্রশ্ন রয়েছে, প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে ক পেয়েছে ১০-এর মধ্যে ৯, অন্যদিকে খ-পেয়েছে ১০-এর মধ্যে ৭। সুতরাং ১ নং প্রশ্নের উত্তরে খ-এর তুলনায় ক কিছু মাত্রায় অগ্রগামী। আবার ২নং প্রশ্নের উত্তরে খ ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে, আর ক-পেয়েছে ১০-এর মধ্যে ৭। সুতরাং ২ নং প্রশ্নের ক্ষেত্রে– ক-এর চেয়ে খ কিছু মাত্রায় অগ্রগামী। বাকি ৮টি প্রশ্নের উত্তরে ক ও খ উভয়ে প্রতিটি প্রশ্নে ১০ এর মধ্যে ৮ করে পেয়েছে। সুতরাং উভয় ছাত্রের সব প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল ১০০ তে ৮০। সুতরাং সার্বিক মূল্যায়নে ক ও খ উভয় ছাত্রই সমান। কিন্তু কিছু বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে খ-এর তুলনায় ক কিছু মাত্রায় অগ্রগামী। আবার কিছু প্রশ্নের উত্তরে ক-এর চেয়ে খ কিছু মাত্রায় এগিয়ে। কিন্তু সর্বোপরি উভয়ে সমান।

একইভাবে ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে ইসলাম শুধু নারী-পুরুষের সমতায়ই বিশ্বাস করে না। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের অর্থ হলো গোত্র, বর্ণ, উপগোত্র এমনকি নারী-পুরুষের বিভক্তি সত্ত্বেও সবাই সর্বোপরি সমান। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ডাকাত আমার ঘরে ঢোকে; আমি বলবো না যে, আমি নারী অধিকারে বিশ্বাস করি, আমি নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। অতএব আমার বোন, আমার স্ত্রী এবং আমার মায়ের অগ্রসর হয়ে ডাকাতের মোকাবিলা করা উচিত। কেননা ৪ নং সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ পুরুষকে অপর (নারী) থেকে বেশি শক্তিশালী করেছেন।' যে, পুরুষের নারীর চেয়ে বেশি

শক্তি আছে। সুতরাং যেখানে শক্তির প্রশ্ন, সেখানে পুরুষের মর্যাদা এক ডিগ্রি ওপরে। যেহেতু তাদেরকে শক্তি বেশি দেয়া হয়েছে, নারীদের সংরক্ষণের দায়িত্ব পুরুষের। যেখানে সম্মান ও সঙ্গদানের বিষয় জড়িত, যেখানে সন্তানদের তাদের পিতা-মাতাকে সঙ্গদানের বিষয়, সেখানে নারীদের সুবিধা এক স্তর ওপরে।

আমি যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মাতা, পিতার চেয়ে তিন গুণ বেশি সম্মান এবং সঙ্গলাভ করবে। এখানে নারীর এক স্তর মর্যাদা বেশি আছে। কিন্তু সর্বোপরি যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন, তাহলে আপনারা ইসলামে নারী-পুরুষ সমান অধিকারই পাবেন এবং আরো বিস্তারিত জানতে আপনারা আমার **'ইসলামে নারীর অধিকার: আধুনিক নাকি সেকেলে'** এ ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন, সেটা হলো বক্তৃতা এবং দ্বিতীয় খণ্ড হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। (এই প্রকাশনা থেকে এ দুটি বই পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে– অনুবাদক।) এ বিষয়টা এ দুটি পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং মানব মনে উদিত অনেক ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। এ আলোচনায় আমি নারী অধিকারকে বড় বড় ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছি। সেগুলো হলো–

১. আত্মিক অধিকার; ২. অর্থনৈতিক অধিকার; ৩. সামাজিক অধিকার; ৪. আইনগত অধিকার; ৫. শিক্ষার অধিকার; ৬. রাজনৈতিক অধিকার।

আর আমি সেখানে আলোচনা করেছি সার্বিকভাবে নারী-পুরুষ সমান।

ইসলামে আল্লাহ নির্দিষ্ট কোনো গোত্র বর্ণের নন

ইসলামে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ধারণা এ নয় যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান খোদা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অথবা নির্দিষ্ট কোনো জনদলের, বরং ১ নং সূরা ফাতিহায় কুরআন বলে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : প্রশংসা সারা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের।

এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বুঝাতে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সমস্ত পৃথিবীর প্রভু' বলা হয়েছে। ১১৪ নং সর্বশেষ সূরা নাস-এর ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ

অর্থ : বলুন! আমি মানবজাতির প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ সব মানুষের প্রভু, কোনো নির্দিষ্ট মানুষের দল অথবা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রভু নন। কুরআনের বহু আয়াত আছে যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন– 'হে মানবমণ্ডলী' 'ওহে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করেছেন।

এমনকি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে যে দুটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতেও 'ওহে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

২ নং সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ز وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ـ

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা জমিনের বুকে যা কিছু বৈধ তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে হলো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

পৃথিবীতে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' থাকা ও রাখার জন্য এর একটা নৈতিক কোড আছে... এর একটি নৈতিক আইন আছে, যা পৃথিবীব্যাপী সার্বজনীন এলাকা ও পরিধিতে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' বজায় রাখতে সাহায্য করে। ৫ নং সূরা মায়িদা-এর ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا م بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط

অর্থ : যে ব্যক্তি হত্যার প্রতিশোধ কিংবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রতিবিধান ব্যতীত কাউকে হত্যা করলো, সে যেন সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো, সে যেন সব মানুষকেই রক্ষা করলো।

আল-কুরআন বলে যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি মুসলিমই হোক কি অমুসলিম। এ আয়াত কোনো সম্প্রদায়, বর্ণ বা রং অথবা উপগোত্রকে বিশেষায়িত করে নি। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মানুষকে হত্যা করে, এ হত্যা যদি হত্যা কিংবা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শাস্তির কারণে না হয়। এ হত্যা যে গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করা। আর যদি কেউ একজন মানুষকে রক্ষা করে সে বিপন্ন মানুষটি মুসলিম হোক কি অমুসলিম, যেকোনো বর্ণ, কিংবা উপগোত্রের হোক না কেন, সে যেন গোটা মানবজাতিকেই রক্ষা করলো।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানব-মানবী যাকাত দিত তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন হতো।

আল-কুরআন নৈতিক আচরণের বিভিন্ন আইন দিয়েছে যাতে 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' সারা পৃথিবীতে থাকতে পারে। আল-কুরআন বলে : কারোরই কখনো চুরি করা উচিত নয়, এটা অপরাধ, এটা পাপ। ইসলামে যাকাতের পদ্ধতি রয়েছে, তাহলো যেকোনো ধনী ব্যক্তির যদি নিসাবের অধিক অর্থাৎ ৮৫ গ্রামের অধিক স্বর্ণ সঞ্চিত থাকে; সে নারী-পুরুষ যাই হোক না কেন, তাকে প্রতি চন্দ্র বছরে ২.৫% অর্থ প্রদান করতে হবে। যদি পৃথিবীর সব (ধনী) লোক যাকাত দিত, তাহলে পৃথিবী

থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হতো। পৃথিবীতে একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করতো না।

আল-কুরআন প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে ও সাহায্য করতে বলে

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলে : তোমার প্রতিবেশীকে তোমার ভালোবাসা ও সাহায্য করা উচিত। আল-কুরআনের ১০৭ নং সূরা মাউনের (১-৭) নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ـ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

অর্থ : তুমি কি এ ব্যক্তিকে দেখছো না যে প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে। সে হলো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতিমকে ধমক দেয়। মিসকিনকে খাদ্য দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। ঐ সব নামাযীদের ধ্বংস অনিবার্য যারা সালাতে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে এবং প্রতিবেশীদের ছোট-খাটো সাহায্য করতেও চায় না।

আর আমাদের প্রিয় নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'সে মুমিন নয় যে পেট পুরে খেয়ে ঘুমায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ণ এক পেট খেয়ে ঘুমায়, অর্থাৎ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকে, যে অবস্থায় তার প্রতিবেশীরা অভুক্ত থাকে, এরা আল্লাহর নির্দেশ মানে না এবং তার রাসূলের নির্দেশও মানে না।

আল-কুরআন বলে : অপচয়কারী হয়ো না। একথা ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ـ

অর্থ : কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।

যদি আপনি অপব্যয়কারী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ক্ষতি করতে বাধ্য। যদি কোনো ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে, তাহলে এটা শত্রুতাচরণের জন্ম দেয়, এটা শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং এটা ভাইদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি করে।

আল-কুরআন খারাপ কাজের মূল উৎস দূর করার জন্য উদ্দীপ্ত করে

কোনো ব্যক্তির চুরি করা উচিত নয়, একজনের যাকাত দেয়া উচিত। একজনকে প্রতিবেশীদের সাহায্য করা উচিত। এ সবই নৈতিক আচরণ আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তোমার ঘুষ দেয়া উচিত নয়।' ২ নং সূরা বাক্বারার ১৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ـ

অর্থ : তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য এর একাংশকে বিচারকদের সামনে ঘুষ হিসেবে পেশ করো না।

তার অর্থ তোমরা সম্পদকে ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করো না, যাতে তোমরা অন্যের সম্পদ ভোগ করতে পারো। ইসলাম আপনাদের ভাইদের সম্পদ খেয়ে ফেলার ব্যাপারে সম্মতি দেয় না।

৫ নং সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা! মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো, আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

সমাজের বিভিন্ন ধরনের শয়তানি কাজের মূল কারণ মাতাল হওয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে

আমরা জানি যে, মাতলামি হলো সমাজের অগণিত শয়তানি কাজের একটি মূল কারণ। এটা 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব'-এর পথে বাধার সৃষ্টি করে। পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে,.... আমেরিকায় গড়ে প্রতিদিন এক হাজার নয় শতের অধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়তো ধর্ষক অথবা ধর্ষিতা ছিল মাতাল। আমেরিকার পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, আমেরিকার শতকরা ৮ ভাগ হলো অজাচার। তার মানে হলো আমেরিকার প্রত্যেক ১২তম বা ১৩তম ব্যক্তি অজাচারী। অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যৌন সম্পর্ক করা, অর্থাৎ পিতা ও কন্যার মধ্যে, পুত্র ও মায়ের মধ্যে, ভাই ও বোনের মধ্যে এবং বেশির ভাগ প্রায় সব ক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধ মাতাল অবস্থায় সংঘটিত হয়।

এইডস বিশ্বব্যাপী ছড়ানোর একটি মূল কারণ হলো মাদকাসক্তি। অতএব আল-কুরআন বলে, মাতলামি ও জুয়া একটি শয়তানের কাজ। এ ধরনের শয়তানি কাজ থেকে বিরত থাকতে পারলে আপনারা সফলতা অর্জন করতে পারবেন। যদি আপনারা এ ধরনের শয়তানি কাজ থেকে বিরত থাকতে পারেন, তাহলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব পৃথিবীব্যাপী থাকার ব্যাপারে সাহায্য করা হবে।

আল-কুরআন গীবত (পরচর্চা) করাকে একজনের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করার শামিল মনে করে।

আল-কুরআনের ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ـ

অর্থ : তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট আচরণ।

ইসলাম ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, পবিত্র কুরআনের ৪৯ নং সূরা আল হুজুরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াতে ঘোষণা করে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা হতে পারে যে, যাদের উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম। আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে। কারণ উপহাসকারীদের চেয়ে উপহাসকৃতরা উত্তম হতে পারে। একজন আরেকজনকে অযথা দোষারোপ করবে না, খারাপ নাম ধরে ডাকবে না, ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা বড় ধরনের মন্দ। যারা এগুলো করে তাওবা করবে না তারাই জালিম।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী ধারণা ও অনুমান থেকে বিরত থাকো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুমান অপরাধ। একে অপরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আরেকজনের গীবত (পরচর্চা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? আর তোমরা একে ঘৃণা করো, এসব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও দয়াবান।

এখানে আল-কুরআন বিশদ বিবরণ দিচ্ছে যে,...যদি তোমরা গীবত করো, যদি তোমরা কারো পরচর্চা করো, এটা এরকম যে তুমি যেন তোমার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করছো এবং তোমার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা দ্বিগুণ গুনাহ। মৃতের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ, তোমার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা দ্বিগুণ অপরাধ, এমনকি রাক্ষসেরা যারা মানুষ খায় তারাও স্বজাতির গোশ্‌ত খায় না। সুতরাং যদি আপনারা গীবত করেন, যদি আপনারা কারো পশ্চাতে খারাপ কথা বলেন এটা দ্বিগুণ অপরাধ। এটা হলো আপনার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করা।

সালাত নিজেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের একটি প্রতীক

আল-কুরআন উত্তর দেয় যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'না, তোমার ঘৃণাভরে এটা ত্যাগ করা উচিত...কেউ এটা পছন্দও করবে না।' আল-কুরআনে ১০৪ নং সূরা হুমাযা হতে ১ নং আয়াতে বলেন :

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۔

অর্থ : ধ্বংস প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে পশ্চাতে ও সম্মুখে বদনাম করে।

এসব নৈতিক আচরণ যা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে এসেছে তা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে উন্নত করে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলার সাথে সাথে ইসলাম বাস্তবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন করে এটাই ইসলামের এককত্ব। মুসলিমদেরকে প্রতিদিন পাঁচ বার সালাতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রদর্শনী করতে হয়। আমরা যখন সালাত আদায় করি, তখন আমরা বাস্তবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রদর্শনী করি। এটা সহীহ্ বুখারী শরীফের ভলিউম ১ কিতাবুল আযান-এর ৭৫ নং অধ্যায়ে, ৬৯২ নং হাদীসে...হযরত আনাস (রা) বলেন যে, 'যখন আমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হতাম, তখন সাহাবীদের একের কাঁধের সাথে অন্যদের কাঁধ স্পর্শ করতো, আমাদের একের পা অন্যদের পা স্পর্শ করতো। এটা সুনানে আবু দাউদের ভলিউম ১ কিতাবুস সালাত-এর ২৪৫ নং অধ্যায়-এর ৬৬৬ নং হাদীসে প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেন : সালাত শুরুর পূর্বে তোমাদের কাতারগুলো সোজা কর, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, কোনো ফাঁক রেখো না, শয়তানের জন্য জায়গা রেখ না। এখানে রাসূল ﷺ বলতে চাচ্ছেন, তোমরা নামাযে একে অপরের সঙ্গে মিশে মিশে এবং কাঁধ মিলিয়ে নামাযে দাঁড়াও এবং শয়তানের "জন্য কোনো জায়গা রেখো না।" নবী করীম ﷺ অবশ্য ঐ শয়তানের কথা বলেন নি, যাকে আপনারা অনিদা TV-A-তে দেখেন। আপনারা অনিদা TV-A-তে যে শয়তান এর চেহারা দেখেন, দুই শিং ও একটি লেজবিশিষ্ট শয়তান। নবী করীম ﷺ সেই শয়তানের কথা বলেন নি। তিনি বর্ণ প্রথা, সাদা-কালোর পার্থক্য এবং সম্পদ প্রভাবিত শয়তানের কথা বলেছেন। ধনী-গরিব, আমির-ফকির যখনই আপনারা সালাতের জন্য দাঁড়াবেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন যাতে ভ্রাতৃত্ব জাগ্রত হয়। গোত্র, শ্রেণী, বর্ণ, উপগোত্র ও সম্পদের ব্যবধান যাতে ভেতরে আসতে না পারে।

হজ্জ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম উদাহরণ হলো ইসলামের তীর্থ যাত্রায়, তা হচ্ছে হজ্জ-এর সময়। প্রায় আড়াই মিলিয়ন লোক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে মক্কায় হজ সম্পাদন করার জন্য আসে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া সহ পৃথিবীর নানান অংশ থেকে এখানে আসে এবং পুরুষরা মাত্র দু-খণ্ড অ-সেলাইকৃত পোশাক পরে এবং যার রং হবে সাদা। আপনি চিনতে পারবেন না, আপনার পাশে যিনি আছেন তিনি আমির না ফকির। এটা আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম উদাহরণ।

এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সম্মেলন। প্রত্যেক বছর আড়াই মিলিয়ন (২৫ লক্ষ) লোক জমায়েত হয়। আপনি ধনী বা গরিব, সাদা বা কালো, পৃথিবীর যেকোনো অংশ থেকেই আসুন না কেন, আপনাকে একই পোশাক পরতে হবে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ বিদায় হজ্জে বলেছেন, আল্লাহ এক এবং কোনো আরবের অনারবের ওপরে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো অনারবের আরবের ওপরেও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপরে সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোরও সাদার ওপরে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া' সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং খোদাভীতি। সে যে উপগোত্রেরই আপনি হোন না কেন, অথবা যে বর্ণেরই আপনি হোন না কেন? তা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বানাবে না।

আল্লাহর দৃষ্টিতে সবাই সমান, যদি আপনারা বেশি ধার্মিক, বেশি আল্লাহভীরু, অধিক ন্যায়পরায়ণ হতে পারেন, তাহলে আপনারা অন্য লোকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবেন এবং হজ্জ যখন সম্পাদিত হয় সবাই পাঠ করে– لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ তারা এগুলো বলতে থাকে এমনকি, তারা হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরেও বলতে থাকে। যা সব সময় তাদের মনে জাগরুক থাকবে। যার অর্থ, আমি হাজির, হে আমার প্রভু! আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির। সব প্রশংসা তোমারই– সব অনুগ্রহ তোমারই। সব রাজত্ব, সব বিশ্ব তোমারই এবং তোমার কোনো শরিক নেই।' এটা প্রত্যেক বিশ্বাসের একটি ভিত্তি যে, একমাত্র একক স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস করবে, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। একমাত্র তিনিই উপাসনা পাওয়ার হকদার। একক আল্লাহতে বিশ্বাস করার কারণেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব হতে পারে। তার অর্থ একই আল্লাহ সব মানবতাকে সৃষ্টি করেছেন, সে আপনারা ধনী-গরিব, পুরুষ-নারী, সাদা-কালো, যেকোনো বর্ণ, রং উপগোত্রেরই হোন না কেন? সবাই সমান। কারণ তারা এক ও একক স্রষ্টা আল্লাহরই সৃষ্টি যিনি সর্বশক্তিমান প্রভু। একমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাস করলেই আপনি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অনুশীলন করতে পারেন। এ কারণেই সব বড় বড় ধর্ম যা খোদায় বিশ্বাস করে, উচ্চস্তরে তারা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করেন।

সাধারণ মিলের বিষয়ে আসলে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উন্নতি করা সম্ভব

Oxford Dictionary অনুযায়ী ধর্ম হলো অতি মানবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, একজন বা অনেক খোদায় বিশ্বাস করাই হলো ধর্ম। যে খোদা ইবাদাত এবং আনুগত্য লাভ করেন। এভাবে সংক্ষেপে যদি আপনারা কোনো ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে চান, আপনাকে ঐ ধর্মের খোদার ধারণা উপলব্ধি করতে হবে। আর কোনো ধর্মের খোদার ধারণা বিশ্লেষণ করতে তাদের অনুসারীদের কর্ম তৎপরতা দেখে নয়। কেননা অনুসারীরা নিজেরাই জানে না যে, তাদের ধর্মশাস্ত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে কী আছে। সর্বোত্তম পন্থা হলো তাদের ধর্মশাস্ত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে কী বলে সে কথা বিশ্লেষণ করা এবং মহান আল-কুরআন-এর ৩ নং সূরা আলে ইমরান-এর ৬৪ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! বলুন, হে কিতাবধারিগণ! আসো আমরা একটা কথার ওপর একমত হই যার ব্যাপারে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমতা রয়েছে তাহলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবো না, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবো না, আল্লাহকে বাদ দিয়ে। আমরা আমাদের পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না। এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা আত্মসমর্পণকারী মুসলমান।

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা

আসুন, আমরা প্রথমে হিন্দু মতবাদে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা বিশ্লেষণ করি। আপনি একজন সাধারণ হিন্দুকে যে একেবারে চলমান তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে....সেখানে কতজন ঈশ্বর আছে? কেউ বলতে পারে তিন, কেউ বলতে পারে ১০০ জন, কেউ বলতে পারে ১,০০০ জন, অন্যরা বলতে পারে ৩৩ কোটি, তিনশত ত্রিশ মিলিয়ন। কিন্তু আপনি যদি একজন শিক্ষিত লোককে জিজ্ঞেস করেন যিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে ভালো জানেন, তিনি আপনাকে বলবেন যে,...হিন্দুদের বাস্তবিকপক্ষে একজন সৃষ্টিকর্তারই ইবাদাত করা উচিত এবং তাদের একজন সৃষ্টিকর্তাকেই বিশ্বাস করা উচিত। তবে সাধারণ হিন্দুরা একটা দর্শনে বিশ্বাস করে যার নাম 'সর্বেশ্বরবাদ'। সাধারণ হিন্দুরা যা বলে তাহলো 'সবকিছুই ঈশ্বর'। গাছ ঈশ্বর, সূর্য ঈশ্বর, চন্দ্র ঈশ্বর, বানর ঈশ্বর, মানব ঈশ্বর, সাপ ঈশ্বর, যেখানে আমরা

মুসলমানরা বলি 'সবকিছুই খোদার' খো-দা'র দিয়ে। সবকিছুর মালিক খোদা। গাছ খোদার, সূর্য খোদার, চন্দ্র খোদার, বানর খোদার, মানব খোদার, সাপ খোদার।

এভাবে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, সাধারণ হিন্দুরা বলে, 'সবকিছুই ঈশ্বর', যেখানে আমরা মুসলিমরা বলি 'সবকিছুই খোদার'। খোদা'রসহ পার্থক্য শুধু ('র) এর। যদি আমরা এ ('র) এর পার্থক্য ঘুচাতে পারি, তাহলে হিন্দু-মুসলিমরা একতাবদ্ধ হতে পারি। আমরা কীভাবে তা করতে পারি? আল-কুরআন বলে, 'আসুন আমরা আপনাদের ও আমাদের মধ্যকার মিলিত বিষয়ে আসি।' প্রথম বিষয়টা কী? প্রথম বিষয় হলো আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবো না।

হিন্দুশাস্ত্র সন্দেহাতীতভাবে সৃষ্টিকর্তার একতার প্রমাণ দেয়

বহুল প্রচলিত শাস্ত্র যা হিন্দুদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি পঠিত হয়। সেটা হলো 'ভগ্বদগীতা'। যদি আপনি 'ভগ্বদগীতা'-এর ৭ নং অধ্যায় ২০ নং শ্লোক পড়েন এতে বলা হয়, 'ঐ সব লোক যাদের জ্ঞান পার্থিব আকাঙ্ক্ষায় লোপ পেয়েছে তারাই উপদেবতার পূজা করে।' তার অর্থ যাদের জ্ঞান পার্থিব স্বার্থে লোপ পেয়েছে তারাই মূল সৃষ্টিকর্তার সাথে অন্যান্য দেবতার পূজা করে।' আর আপনি যদি উপনিষদ পড়েন যেটা হিন্দু শাস্ত্রের আরেকটি পবিত্র শাস্ত্র। এর চান্দগয়া উপনিষদ এবং ৬ নং অধ্যায়-এর ২ নং সেকশন-এর ১ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে , 'সৃষ্টিকর্তা একজনই, দ্বিতীয় নয়।' সেভ্টাসভাতারা উপনিষদ-এর ৬ নং অধ্যায়-এর ৯ নং শ্লোকে যা বলা হয়েছে তার অর্থ– 'তাঁর...সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার, কোনো প্রভু নেই। এমনকি তাঁর পিতা-মাতাও নেই।' এটা সেভটাসভাতারা উপনিষদ-এর ৪ নং অধ্যায়, ১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'তার সমকক্ষ কেউ নেই।' সেভ্টাসভাতারা উপনিষদ-এর ৪ নং অধ্যায়-এর ২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, 'তিনি কোনো আকৃতি ধারণ করেন নি...কেউই তাকে তার চক্ষু দ্বারা দর্শন করতে পারে না।' হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে, সবচেয়ে' পবিত্র হলো বেদ।

মূল বেদ ৪ খানা। যথা : ১. ঋগ্বেদ, ২. যযুর্বেদ, ৩. সামবেদ, ৪. অথর্ববেদ।

যদি আপনারা যযুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। এর ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, 'তাঁর কোনো প্রতিমূর্তি নেই।' সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রতিমূর্তি নেই। এটা যযুর্বেদ-এর ৪০ নং অধ্যায়, ৮ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, 'সর্বশক্তিমান খোদা হলেন অশরীরি এবং খাঁটি' এবং যযুর্বেদের পরবর্তী শ্লোক ৪০ নং অধ্যায়-এর ৯ নং শ্লোকে বলা হয়, 'তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে যারা অসামভূতির পূজা করে।' অসামভূতি অর্থ প্রাকৃতিক জিনিস। যেমন, বাতাস, পানি, আগুন এবং এ শ্লোক চলমান...'তারা অধিক পরিমাণে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে– যারা সামভূতির পূজা করে' সামভূতি হলো তৈরি জিনিস যেমন, চেয়ার, টেবিল,

মূর্তি ইত্যাদিকে। এটা যযুর্বেদে ৪০ নং অধ্যায়-এর ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। এরপর আপনি যদি অধ্যয়ন করেন এটা অথর্ববেদে ২০ নং অধ্যায়-এর ৫৮ নং স্তোত্র-এর ৩ নং শ্লোকে– 'সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, খুবই মহান।'

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ হলো সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। ঋগ্বেদের ১ নং পুস্তক স্তোত্র ১৬৪, ৪৬ নং শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে, 'সাধক এবং সন্ন্যাসীরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকে।' আর যদি আপনি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন ২ নং পুস্তক ১ নং স্তোত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে, তার একটি ঋগ্বেদে ২ নং পুস্তক, ১ নং স্তোত্র-৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম'। যদি আপনি ব্রহ্ম অনুবাদ করেন, তাহলে একটি অর্থ দাঁড়ায় 'স্রষ্টা'। যদি আপনি আরবিতে অনুবাদ করেন এর অর্থ হবে– خالق (খালিক)। আমাদের মুসলমানদের এ ব্যাপারে কোনোই আপত্তি নেই। যদি কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে, 'খালিক' বা 'স্রষ্টা' অথবা 'ব্রহ্ম' বলে। কিন্তু যদি কেউ বলে ব্রহ্ম হলেন এমন এক সর্বশক্তিমান খোদা যার চারটি মাথা আছে এবং প্রত্যেক মাথায় একটি মুকুট আছে। আমরা মুসলমানরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও আপনারা সেভ্টাসভাতারা উপনিষদ-এর বিরুদ্ধে যাচ্ছেন (দেখুন) ৬ নং অধ্যায়, ৪৯ নং শ্লোকে বলে, 'তাঁর কোনো স্বরূপ নেই।' এর অর্থ (অর্থাৎ বিভিন্ন আকৃতির বর্ণনা দ্বারা) আপনারা (হিন্দুরা) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দাঁড় করাচ্ছেন।

আরেকটি সুন্দর নাম ঋগ্বেদের ২ নং পুস্তক, ১ স্তোত্র-এর ৩ নং শ্লোকে দেয়া হয়েছে 'বিষ্ণু'। যদি এর অনুবাদ করা হয় এর অর্থ দাঁড়াবে 'প্রতিপালক' 'প্রভু' যদি আরবিতে এর অনুবাদ করেন দাঁড়াবে رب (রব)। আমাদের মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই যদি সর্বশক্তিমান খোদাকে কেউ 'রব' 'প্রতিপালক' 'প্রভু' বা 'বিষ্ণু' বলে। কিন্তু যদি কেউ বলে 'বিষ্ণু' হলেন এমন এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা যার চারটি হাত আছে, যার প্রত্যেকটি হাতে একটি চক্র আছে...ভারী চক্র, এর একটি হাতে একটি পদ্ম আছে। তাহলে আমাদের মুসলমানদের তীব্র আপত্তি রয়েছে। এ ছাড়াও আপনারা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন। আপনারা যযুর্বেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন ৩২ নং অধ্যায়, ৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'তাঁর কোনোই প্রতিমূর্তি নেই।' এটা ঋগ্বেদ-এর ৮৯ নং ভলিউম ১ নং অধ্যায় ১ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, 'সব প্রশংসা শুধুই তাঁর, ইবাদাত করো শুধু তাঁরই।' এটা ঋগ্বেদের ৬ নং ভলিউমে ৪৫ নং স্তোত্রে ১৫ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'সৃষ্টিকর্তা একজনই, শুধু তাঁরই ইবাদাত করো।'

এবং 'ব্রহ্মসূত্র' হিন্দুধর্মের মৌলিক ধর্ম বিশ্বাস হলো 'ভগবান এক হি হ্যায়, দোসরা নেহি হ্যায়, নেহি হ্যায়, নেহি হ্যায়, জারা ভি নেহি হ্যায়।' অর্থাৎ 'সৃষ্টিকর্তা একজনই, দ্বিতীয় নেই, আদৌ নেই, আদৌ নেই, একেবারেই নেই।' সুতরাং যদি

আপনারা হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আপনারা হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা বুঝতে পারবেন।

ইহুদি ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

আসুন আমরা ইহুদি ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা বিশ্লেষণ করি। ওল্ড টেস্টামেন্টের ডিউটারোনমি পুস্তকের ৬ নং অধ্যায়ের ৪ নং শ্লোকে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে মুসা (আ) বলেন : 'ওহে ইসরাঈল তোমরা শোন! আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু, তিনি একক প্রভু।' একথা ইসাইয়াহ পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায় ৪৩ নং অধ্যায়, ১১ নং শ্লোকে, 'আমি এমনকি আমিই প্রভু, আমি ছাড়া আর কোনো ত্রাণকর্তা নেই।' ইসাইয়াহ পুস্তকের ৪৬ নং অধ্যায়, ৯ নং শ্লোকে উল্লেখ পাওয়া যায় 'আমিই সৃষ্টিকর্তা, এছাড়া আর নেই, আমিই সৃষ্টিকর্তা, আমার সমকক্ষ আর কেউ নেই।'

এক্সোডিস পুস্তকের ২০ নং অধ্যায় ৩ নং ও ৫ নং শ্লোকে উল্লেখ পাওয়া যায় একইভাবে ডিউটারোনমি পুস্তকের ৫ নং অধ্যায় ৭ থেকে ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো দেবতা নেই।' সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এখানে বলছেন যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো দেবতা নেই। তোমরা আমার কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না, আমার মতোও কিছু নয়, কোনো কিছুই ওপরের স্বর্গেও নেই। নিচের পৃথিবীতেও নেই, পৃথিবীর নিচে পানিতেও নেই। তোমরা তাদের কোনো খেদমত করবে না, তাদের সামনে কুর্নিশ করবে না, (এগুলো) তোমাদের প্রভুর জন্য, পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং আপনি যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট অধ্যয়ন করেন, তাহলে ইহুদি ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা বুঝতে পারবেন।

খ্রিস্টান ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

খ্রিস্টান ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা আলোচনার পূর্বে আমি কয়েকটি পয়েন্ট পরিষ্কার করতে চাই।

প্রথমত ইসলাম একমাত্র অখ্রিস্টান ধর্ম, যাতে যীশুখ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রদান করেন। কোনো মুসলমানই মুসলমান থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তিনি যীশুখ্রিস্টের [ঈসা 'আঃ] (নবুওয়তের) ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি 'মাছীহ' ছিলেন অনুবাদ করলে 'খ্রিস্ট'। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মলাভ করেছিলেন। যেকোনো ধরনের পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে। যা অনেক আধুনিক দিনের খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি অনেক জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সুস্থ করেছিলেন। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি নিয়ে মৃতকে জীবিতও করেছেন। যীশুখ্রিস্ট নিজে কখনোই খোদাই দাবি করেন নি।

আমরা মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা এক সঙ্গে চলি, কিন্তু কিছু খ্রিস্টান আছে যারা বলে যে, যীশুখ্রিস্ট খোদাই দাবি করেছিলেন। বাস্তবে যদি আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন, তাহলে পুরো বাইবেলে একটি বর্ণনাও এমন পাবেন না, যেখানে যীশু নিজে বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা। অথবা যেখানে তিনি বলেছেন 'আমার ইবাদাত করো।' প্রকৃত বিষয় হলো, যদি আপনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন যীশু নিজে বলেছেন– জোহন-এর গস্পেল ১৪ নং অধ্যায় ২৮নং শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।' জোহনের গস্পেল ১০ নং অধ্যায়, ২৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আমার পিতা সবার চেয়ে মহান।' মথিউর গস্পেল ১২ নং অধ্যায় ২৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আমি সৃষ্টিকর্তার রূহের দ্বারা শয়তানকে আটক করি।' লুকের গস্পেল ১১ নং অধ্যায়, ২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আমি সৃষ্টিকর্তার আঙ্গুল দ্বারা শয়তানকে আটক করি।' জোহনের গস্পেলে ৫ম অধ্যায়, ৩০ নং শ্লোক, 'আমি শুনে বিচার করি এবং আমার বিচার বরং আমার পিতার ইচ্ছেয় করি।' যে কেউ বলে যে, আমি আমার ইচ্ছে খুঁজি না, বরং সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছেকে আল্লাহ সর্বশক্তিমানের ওপর ন্যস্ত করা। আর এটা যদি আপনি আরবিতে অনুবাদ করেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'ইসলাম' (আত্মসমর্পণ করা) এবং যে ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছাকে সর্বশক্তিমান খোদার ওপর সোপর্দ করলো সে হলো 'মুসলিম' (আত্মসমর্পণকারী)।

যীশু কখনোই আইন বা নবুওয়াত ভঙ্গ করার জন্য আসেননি। বাস্তবে তিনি তাদেরকে দৃঢ় করার জন্য এসেছিলেন। আর যীশু বলেন, মথিউর গস্পেল ৫ নং অধ্যায়, ১৭ থেকে ২০ নং শ্লোকে বলেন, 'মনে করো না যে, আমি বিধান অথবা নবুওয়াত ধ্বংস করার জন্য এসেছি।' এ সব উদ্ধৃতি কিং জেমস্ ভার্সন-এর বাইবেল থেকে নেয়া। যীশুখ্রিস্ট বলেন যে,...মনে করো না যে, আমি বিধি ও নবুওয়াত ধ্বংস করার জন্য এসেছি। আমি ধ্বংস করার জন্য নয়; বরং পরিপূর্ণ করার জন্য এসেছি। অবশ্যই যতক্ষণ না স্বর্গ ও পৃথিবী অতিক্রম করবে, কেউই ছোট বা বড় আইন অতিক্রম করবে, যতদিন না তা পরিপূর্ণ হবে। আর যে কেউ-ই একটা ছোট্ট নির্দেশও ভঙ্গ করবে এবং লোকদের তা করতে বলবে, তাকে স্বর্গের রাজ্যে একেবারেই অল্প ডাকা হবে (ডাকাই হবে না) এবং যে ব্যক্তি ঐ আইনগুলো রক্ষা করবে এবং অন্যদেরও স্বর্গের রাজ্যে ডাকা হবে। যদি আপনাদের সত্যতা স্ক্রাইবস্ ও ফরীসিদের সততাকে অতিক্রম না করে। কোনোভাবেই আপনারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। যীশু বলেন যে, যদি আপনারা স্বর্গে যেতে চান, আপনাকে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রত্যেকটি আইন অনুসরণ করতে হবে। এর সাথে...খোদা একজন, তাঁর কোনো শরিক নেই, আপনি খোদার কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করতে পারেন না। যীশু কখনো দাবি করেন নি যে, তিনি সর্বশক্তিমান খোদা ছিলেন। বাস্তবে তিনি বলেন যে, তিনি খোদা কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন। এটা

জোহনের গস্পেল ১৪ নং অধ্যায়, ২৪ নং শ্লোকে যীশু বলেন, 'যে বাক্য তোমরা শোনো তা আমার নয়; বরং আমার পিতার যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।' জোহনের গস্পেলের ১৭ নং অধ্যায় ৩ নং শ্লোকে উল্লেখ পাওয়া যায়, 'এ জীবন হলো স্থায়ী। সুতরাং আপনার জানা উচিত খোদা একজনই এবং যীশুখ্রিস্ট যাকে তিনি প্রেরণ করেছেন।'

কার্য পুস্তক ২ নং অধ্যায় ২২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'শোনো হে ইসরাঈল! এ বাক্যগুলো শোনো! নাজারেথ এর যীশু একজন মানুষ তোমাদের খোদার অনুমোদিত, আশ্চর্য ও অলৌকিক দ্বারা যা খোদা তার মাধ্যমে করবেন এবং তোমরা এর সাক্ষ্য থাকবে।' এতে বলা হয়–

আর যখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'নির্দেশ– এর প্রথমটি কী?' তিনি বারবার বলেছেন যা পূর্বে মূসা (আ) কর্তৃক বলা হয়েছে। এটা মার্কের গস্পেলে ১২ নং অধ্যায় ২ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে, শোনো হে ইসরাঈল! আমাদের খোদা প্রভু, একমাত্র প্রভু।

সুতরাং আপনি যদি বাইবেল অধ্যয়ন করেন, আপনি খ্রিস্টধর্মের খোদার ধারণা বুঝতে পারবেন।

ইসলামে খোদার ধারণা

আসুন ইসলামে খোদার ধারণা আমরা বিশ্লেষণ করি। ইসলামে আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে যে কেউ সর্বোত্তম উত্তর দিবে তা হলো ১১২ নং সূরা ইখলাসের ১ থেকে ৪ নং আয়াত দ্বারা। বলুন! তিনি আল্লাহ এবং একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন নি এবং তিনি জাতও নন, তার সমকক্ষ কেউ নেই।

এটা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর চার লাইনের সংজ্ঞা। যদি কোনো ব্যক্তি বলে তিনি সর্বশক্তিমান খোদা এবং এ চার লাইনের সংজ্ঞা দান করে, তাহলে আমাদের মুসলিমদের এতে কোনো আপত্তি নেই। আমরা এ সত্তাকে সর্বশক্তিমান খোদা হিসেবে গ্রহণ করবো।

প্রথম হলো, বলো! তিনি আল্লাহ! একক। দ্বিতীয়, আল্লাহ স্থায়ী এবং অমুখাপেক্ষী। তৃতীয় হলো, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেন নি এবং চতুর্থ হলো, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এই ১১২ নং সূরা ইখলাস হলো Theology-এর মূল কথা। Theo-অর্থ খোদা Logy-অর্থ অধ্যয়ন।

'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' ছড়িয়ে দেবার জন্য, এটা আবশ্যক যে আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে এবং ইবাদাত করতে হবে এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর। সুতরাং যদি কেউ এই চার লাইনের সংজ্ঞা যুক্ত হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হওয়ার দাবি করে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করতে।

আপনারা জানেন অনেক মিথ্যুক আছে যারা নিজেদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলে দাবি করে। আসুন আমরা দেখি তারা পরীক্ষায় পাস করে কিনা এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে ভগবান রজনীশ একজন। আমার এক বক্তব্যের সময় প্রশ্নোত্তর পর্বে আমাদের এক হিন্দু বললেন : হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে বললাম...আমি একমত এবং আমি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও উল্লেখ নেই যে, ভগবান রজনীশ সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান। আমি যা বলছি তা হলো কিছু লোকে বলে যে, ভগবান রজনীশ হলো সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান। আমি ভালোই জানি যে, হিন্দু মতে ভগবান রজনীশকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিবেচনা করে না।

আসুন, তাদের দাবি বিশ্লেষণ করি যারা বলে যে, ভগবান রজনীশ হলো সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। প্রথম পরীক্ষা হলো, তিনি এক এবং একমাত্র। ভগবান রজনীশ কি এক এবং একমাত্র? আমরা জানি অনেক লোক আছে যারা সর্বশক্তিমান খোদা হওয়ার দাবি করে। বিশেষত এদেশে (ভারতে)। সেকি এক এবং একমাত্র। কিন্তু তার অনুসারীরা বলে : না, তিনি এক এবং একক।

চলুন আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষায় যাই। আল্লাহ স্থায়ী এবং অমুখাপেক্ষী। ভগবান রজনীশ কি স্থায়ী এবং অমুখাপেক্ষী ছিলেন? আমরা তার জীবনী থেকে জানতে পারি যে, তিনি অ্যাজমা রোগে ভুগছিলেন, ক্রণিক পিঠ ব্যথা, ডায়াবেটিস এবং ম্যালাইটিস রোগেও ভুগছিলেন এবং তিনি বলেন যে, যখন আমেরিকার সরকার তাকে গ্রেফতার করলো, তারা তাকে ধীর বিষ প্রয়োগ করে। ভাবুন! সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে ধীর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

তৃতীয় পরীক্ষা হলো, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম লাভও করেন নি। আমরা তার জীবনী থেকে জানলাম যে, রজনীশ মধ্য প্রদেশে জন্ম লাভ করেছিলেন। তার পিতা-মাতা ছিল, যারা পরবর্তীতে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮১ সালে রজনীশ আমেরিকা যান এবং হাজার হাজার আমেরিকানকে রাইড দেন এবং ওরিগণ রাজ্যে তিনি তার নিজ জনপদ (গ্রাম) গড়ে তোলেন। যার নাম ছিল রজনীশ পুরাম। পরবর্তীতে আমেরিকার সরকার তাকে গ্রেফতার করে এবং তাকে আইনের মুকাবিলায় নিক্ষেপ করা হয়। আর ১৯৮৫ সালে তাকে নির্বাসন (দেশ থেকে বের করে) দেয়া হয়। এরপর সে ১৯৮৫ সালে ভারতে ফিরে আসে। আর পুণা শহরে তার নিজস্ব কেন্দ্র শুরু করে। যার নাম 'আশা কমিউন'। আর আপনি যদি সেখানে যান, সেখানকার এক পাথরে উল্লেখ আছে, "ভগবান রজনীশ অশো রজনীশ কখনো জন্ম নেন নি, কখনো মৃত্যু বরণ করেন নি; বরং ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত পৃথিবী দর্শন করেছিলেন। তারা ভুলে গিয়েছে যে, তাকে পৃথিবীর ২১টি বিভিন্ন প্রকারের দেশে

ভিসা দেয়া হয় নি। বুঝুন! সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, তিনি পৃথিবী পরিদর্শন করছেন এবং তার ভিসারও প্রয়োজন।

আর সর্বশেষ পরীক্ষা হলো, 'তাঁর মতো কেউ নেই।' এটা এতোই শক্তিশালী যে, কেউই আল্লাহ্ ছাড়া এ পরীক্ষায় টেকে না। যখনই আপনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার সাথে এ দুনিয়ার কারো তুলনা করবেন, পৃথিবীর যে-কোনো জিনিসের সাথে, তিনি আর সৃষ্টিকর্তা নন। ধরুন, কেউ বললো যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আর্নল্ড স্কোয়া জেনেগারের চেয়ে এক হাজার গুণ শক্তিশালী, আপনারা জানেন আর্নল্ড স্কোয়াজেনেগার, কিংকং অথবা দারা সিং যেই হোক না কেন, সে এক হাজার গুণ বা এক মিলিয়ন গুণ যাই হোক না কেন। যে মুহূর্তে আপনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে তুলনা করবেন সে মুহূর্তে তিনি আর সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না।

পবিত্র কুরআনের ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ج

অর্থ : আপনি বলুন! তোমরা আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাকো, তার সব নামই উত্তম।

আপনারা আল্লাহকে যে নামে ইচ্ছে ডাকতে পারেন। কিন্তু সেটা সুন্দর নাম হতে হবে, এতে মনের পটে কোনো ছবি আসতে পারবে না। আর পবিত্র কুরআন আল্লাহর কমপক্ষে ৯৯ নাম দিয়েছে। আর রাহমান, আর রাহীম, পরম দয়ালু ও পরমদাতা (এরকম) নাম ৯৯টির কম নয়।

আমরা মুসলমানরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আরবি 'আল্লাহ' নামে ডাকি। আমরা আল্লাহ্ নামটির অগ্রাধিকার দেবার কারণ হলো, ইংরেজি GOD শব্দের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনারা GOD শব্দের সাথে 'S যোগ করেন তাহলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হয়ে যায় অথচ আল্লাহ্ শব্দের কোনো বহুবচন নেই। 'Say... তিনি আল্লাহ্ এক এবং একমাত্র।' যদি আপনারা God-এর সাথে dess যোগ করেন, তাহলে Goddess অর্থাৎ মহিলা God; অথচ আল্লাহ শব্দের কোনো নারী-পুরুষ হয় না। তিনি নারীও নন নরও নন। আল্লাহ্ একটি একক শব্দ। যদি আপনারা God-এর সাথে father-শব্দটি যোগ করেন, তাহলে হবে Godfather— যেমন : সে আমার Godfather-সে আমার অভিভাবক। আল্লাহ্ ফাদার বা আল্লাহ্ আব্বা বলে ইসলামে কিছু নেই। যদি আপনি God-এর সাথে Mother শব্দটি যোগ করেন, তাহলে হবে Godmother। অথচ আল্লাহ মাদার বা আল্লাহ্ আম্মা বলে ইসলামে কিছু নেই। আল্লাহ্ হলো একক শব্দ। যদি

আপনি God শব্দের পূর্বে উপসর্গ Tin যোগ করেন তাহলে শব্দটা হবে Tingod অর্থাৎ মিথ্যা গড, অথচ টিন আল্লাহ বলে ইসলামে কিছু নেই। এ কারণেই মুসলমানরা আরবি শব্দ 'আল্লাহ' ব্যবহার করে, ইংরেজি শব্দ God ব্যবহার করে না। কিন্তু কিছু লোক বা মুসলমান যদি 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে God শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে আমার মতে আপত্তি থাকার কিছু নেই। কিন্তু আল্লাহর জন্য 'আল্লাহ' শব্দটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী ইংরেজি God শব্দটির চেয়ে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব রক্ত সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতমানের

ইসলামে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব শুধু সমান্তরাল বা সমতলভাবেই চলে না। অর্থাৎ এটা শুধু সমস্ত অঞ্চলকে শামিল করে এবং সারা বিশ্ব ও মহাবিশ্বের সব লোককেই শামিল করে তা নয় এটা খাড়াভাবেও চলে। ইসলামে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব খাড়াভাবেও অন্তর্ভুক্ত। যে প্রজন্ম পূর্বে গিয়েছে এবং সামনে আসবে তাদেরও। ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব জীবন্ত মানুষ এবং একইভাবে অতীতের লোকদেরও শামিল করে। একজন লোক বা একটা জাতিকেও। এ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব হলো বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব যা সমতল রেখায় ছড়ায় এবং সাথে সাথে খাড়াভাবেও ছড়ায়। আর এ বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর হলো, সকল ধর্মের যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দাঁড়ায়– এক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস। এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এটা কেবল একারণেই যে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সারা পৃথিবীতে থাকতে পারে এবং এ বিশ্বাস রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর।

আল-কুরআনে উল্লেখ আছে, তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কর। ১৭ নং সূরা ইসরায় (বনি ইসরাঈল) ২৩ এবং ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا .

অর্থ : আপনার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদত করো না এবং তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার সামনে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের সাথে বিরক্তিসূচক কোনো কিছু বলো না, আর কখনো তাদের ধমক দিও না, তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাঁদের ওপরে দয়ার দুটি হাত প্রসারিত করো, আর বলো হে আমাদের প্রভু! তুমি তাঁদের প্রতি সেভাবেই দয়া করো, যেমনি শৈশবে তাঁরা আমাকে স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।

ভালোবাসা ও তার অর্থ তোমাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করা উচিত, তাদেরকে সব প্রকারের সম্মান ও মর্যাদা দান করবে। একই সময়ে মহান কুরআন ৩১ নং সূরা লুকমানের ১৫ নং আয়াতে 'তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান করতে হবে' একথার পর আল-কুরআন বলে,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ز

অর্থ : যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের পিতা-মাতার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে, যতক্ষণ না তাঁরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বা তাঁর নির্দেশের বাইরে না যেতে বলেন। তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক। তবে যদি তাঁরা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে যান, তাহলে সর্বশক্তিমান (আল্লাহ্)ই অগ্রগণ্য। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব সার্বজনীন।

আল-কুরআনের ৯ নং সূরা তাওবাহ-এর ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন−

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ -

অর্থ : হে নবী! 'বলুন! যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পরিবার পরিজন।'

আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমাদের বিবেচনা কী?' তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্বামী বা স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এসব আত্মীয়-স্বজনেরা তোমাদের প্রিয় হবে....?

আল্লাহ্ আরো বলছেন−

وَأَمْوَالُنِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا -

অর্থ : তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য যা মন্দা যাবে বলে তোমরা ভয় করো, তোমাদের বাড়ি-ঘরসমূহ যাকে নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট।

আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের **বিবেচনা** কী?

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস এক খোদার ইবাদাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর মহান কুরআন ৪ নং সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ج إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا قف

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবসময়ই ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহ্ তাআলার জন্য সত্যের সাক্ষী হিসেবে নিজকে পেশ করো, যদিও তা নিজের, নিজের পিতা-মাতার কিংবা নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়। সে ধনী হোক বা গরিব, আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর।

অর্থাৎ যদি তোমাকে ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে হয়, সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। আল্লাহ্ বলেন, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াও এমনকি যদি তোমাকে তোমার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়। তোমার পিতা-মাতা, তোমার আত্মীয়দের, এমনকি সে লোক ধনী-গরিব যাই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়, আল্লাহ্ সবাইকে রক্ষা করবেন। তার অর্থ যেখানেই ন্যায়বিচার সেখানেই সত্য। ন্যায় বিচার রক্ত সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে। বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব অন্য সব ভ্রাতৃত্বের ওপরে এবং বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এক স্রষ্টার ওপরে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন সর্বশক্তিমান খোদা। এক আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই সব ধর্ম প্রচার করেছে এবং আল্লাহ্ আরো বলছেন, যদি তোমরা এ আটটি জিনিসকে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও জিহাদ আল্লাহ্‌র পথে সাধনা করার চেয়ে বেশি ভালোবাস। আল্লাহ্ বলেন, যদি তোমার পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যেতে বলে, তারা তোমাকে চুরি করতে বলতে পারে, প্রতারণা করতে বলতে পারে, ঘুষ খেতে বলতে পারে, অযথা মানুষ হত্যা করতে বলতে পারে, অথবা যদি তোমার পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধে নির্দেশনা দেয়, সে তোমার পুত্র, ভাই, স্বামী/স্ত্রী অথবা তোমার আত্মীয় অথবা তুমি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অর্জিত সম্পদের জন্য, ব্যবসার জন্য, বাড়ির জন্য কাজ করো। আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি তুমি এ আটটি জিনিস আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা সংগ্রামের চেয়ে বেশি ভালোবাসো। আল্লাহ্ বলেন–

فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۔

অর্থ : অপেক্ষা করো আল্লাহ্‌র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

(আয়াতের নির্দেশনায় এটা পরিষ্কার হলো, রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্ব মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে; কিন্তু বিশ্বাস ও ঈমানের

ভ্রাতৃত্ব শুধু কল্যাণের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর ভালোবাসাই তার মূল লক্ষ্য। – অনুবাদক

যখন এটা বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বের ওপর আসবে, তখন এটা আত্মীয়তার ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম।

আমি যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পবিত্র কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরান-এর ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ـ

অর্থ : আসো তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মিল রয়েছে সেদিকে। তাহলো আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবো না এবং তার সাথে কাউকে শরিক করবো না।

একমাত্র এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়, আপনাদের একক সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপরে বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদাত করা, যিনি এক–এর মধ্যেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব নিহিত। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপরে ধারণা ছাড়া ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আল-কুরআনের ৬নং সূরা আনআম-এর ১০৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থ : যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে, তাদের গালি দিও না, তাহলে তারা না বুঝে সীমালংঘন করে আল্লাহকে গালি দিবে।

আমি আল-কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ১ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আল্লাহ বলেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! ভয় করো তোমাদের রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন আর উভয় থেকে অনেক নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ডা. জাকির নায়েক প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য ঘোষণা দান করেন, যাতে শ্রোতৃমণ্ডলী আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করবেন এবং ডা. জাকির নায়েক শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, গ্রহণযোগ্য যুক্তি এবং যে পন্থায় গ্রহণীয় ও সন্দেহ নিরসন হতে পারে তার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করেন।

প্রশ্ন ১. ধন্যবাদ ডা. নায়েককে তাঁর 'ইসলামে আল্লাহর ধারণা' বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। আমার সাধারণ একটি প্রশ্ন তা হলো– আপনি জাতিগত ভ্রাতৃত্ব, ভাষাগত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন এবং সেগুলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণার সাথে বৈপরীত্য বহন করে। কিন্তু আপনি কাফির সম্পর্কে কিছু বলেন নি, যেটা আমি মনে করি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বড় বাধা।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই আমি কি আপনার নাম জানতে পারি, যাতে আমি উন্নত পন্থায় আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। আচ্ছা ইনি ভিওয়ান্দি কলেজের প্রফেসর নিগাদ।

অধ্যাপক সাহেব একটা প্রশ্ন করেছেন যে, আমি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক ধরনের ব্যাখ্যাই করেছি। আরো বলেছি যে, ভ্রাতৃত্বের ধারণা রক্ত সম্পর্ক জাতি, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি কাফিরের ধারণার ওপরে আলোচনা করি নি।

কাফির সম্পর্কে ভুল ধারণা

কাফির একটি আরবি শব্দ, যা কুফর (كفر) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ : ঢেকে ফেলা, লুকানো। এর অর্থ প্রত্যাখ্যান করা ও বাতিল করাও হয়। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো– যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করে এ ধরনের ব্যক্তিকে কাফির (كافر) বলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করে যে, আল্লাহ এক, আমি যা বললাম সে কাফির। যেকোনো ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বাসের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অন্য যেকোনো কিছুর ভিত্তিতে সে ভ্রাতৃত্ব তার মধ্যে পড়ে।

শতশত প্রকারের ভ্রাতৃত্ব হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভিত্তিতে যেমন : ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব। এ সব অন্যান্য ভ্রাতৃত্ব যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে ভ্রাতৃত্ব তার আওতাভুক্ত নয় .... এক ঈশ্বরের ভিত্তিতে গঠিত ভ্রাতৃত্ব সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। এমনকি কাফিরের ভ্রাতৃত্ব। তারা কি সমস্যার সৃষ্টি করে? হ্যাঁ, যেগুলো সমস্যার সৃষ্টি করে। কাফিরের অর্থ কী? যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে।

কিছু অমুসলিম আমাকে প্রশ্ন করে। প্রশ্নোত্তরের সময়–একটা ক্যাসেটে আছে সে বলে, কেন মুসলিমরা আমাদের 'কাফির' বলে গালি দেয় এবং লোকেরা বলে যে, তাদের আঁতে ঘা লাগে। আমি বলি, দেখুন, 'কাফির' হলো একটি আরবি শব্দ যার অর্থ 'যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে।' যে ব্যক্তি ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজিতে তাকে, যদি আমি অনুবাদ করি তাহলে দাঁড়াবে নন-মুসলিম/অমুসলিম। যে ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করে এভাবে তাকে কাফির বলে। এটা ইংরেজি নন-মুসলিম শব্দের অনুবাদ। সুতরাং আপনি যদি অমুসলিম বলতে বাধা দেন, তাহলে আমি কি করতে পারি? সুতরাং যদি কেউ বলে... কেন আপনি আমাকে কাফির বলেন? আমাকে কাফির বলবেন না। তাহলে আমি তাকে বলতে পারি আপনি ইসলাম কবুল করলে আমি আপনাকে কাফির বলা বন্ধ করবো। এটা অমুসলিম/নন-মুসলিম শব্দের আরবি মাত্র। আশা করি উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ২. ডা. নায়েক, আমি অ্যাডভোকেট মাধব পাদকী। আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছেন, খোদা জীবন্ত অনুভবের বাইরেও আকারবিহীন যেমন–হিন্দু ধর্মে বলে। তবে কেন আপনারা মুসলিমরা হজ্জ বা তীর্থযাত্রা করেন? ওখানে লোকেরা তীর্থস্থানের পূজা করে যেমনভাবে হিন্দুরাও করে।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা যেটা করলেন তা খুবই ভালো প্রশ্ন, ইসলামে খোদার যদি কোন অনুভবের ধারণা না থাকে। আল্লাহর কোনো আকার নেই। তবে কেন মুসলমানরা হজ্জে বা তীর্থযাত্রায় গিয়ে পবিত্র কাবার পূজা করে?

মুসলমানরা কা'বার পূজা করে না, এটা হলো শুধু ক্বিবলাহ (নামাযের দিক নির্দেশনা) ঃ

ভাই এটা একটা ভুল ধারণা। আমরা শুধুই আল্লাহর ইবাদাত করি যাকে আমরা এ পৃথিবীতে দেখতে পাই না। আমরা কা'বাকে কিবলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করি, আরবিতে কিবলাহ্ যার অর্থ 'দিক নির্দেশনা'। কা'বা হলো কিবলা, কারণ আমরা মুসলিমরা একতায় বিশ্বাসী। উদাহরণত, যদি আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত করতে চাই, যদি আমরা সালাত আদায় করতে চাই, কেউ বলতে পারে, আসুন আমরা দক্ষিণ দিকে মুখ করি, কেউ বলতে পারে উত্তর দিকে, কেউ বলতে পারে পূর্ব দিকে, কেউ পশ্চিম দিকে। আমরা কোন্ দিকে ফিরব? আমরা একতায় বিশ্বাসী। তাই সারা পৃথিবীর সব মুসলিমের কিবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা হলো দিক-নির্দেশনা, আমরা এর পূজা করি না।

প্রথম যে লোকেরা বিশ্ব মানচিত্র অংকন করেছিলেন, তারা ছিলেন মুসলমান এবং মুসলমানরা যখন বিশ্ব মানচিত্র অংকন করেন তারা দক্ষিণ দিককে উপরের দিক এবং উত্তর দিককে নিচে স্থাপন করেন, তখন কা'বা ছিল কেন্দ্রে। যখন পশ্চিমারা

এলো তারা ওপরের দিককে নিচে স্থাপন করলো, উত্তর দিক ওপরে, দক্ষিণ দিক নিচে, আলহামদুলিল্লাহ তখনও কা'বা কেন্দ্রেই পাওয়া যায়। কারণ মক্কা হলো কেন্দ্র এবং যেহেতু মক্কা কেন্দ্রে অবস্থিত। যেকোনো মুসলিম বিশ্বের যে অংশেই থাকুন, যদি তিনি কা'বার উত্তরে থাকেন তিনি দক্ষিণে মুখ করবেন, যদি তিনি কা'বার দক্ষিণে থাকেন, তাহলে উত্তরে মুখ করবেন। পৃথিবীব্যাপী সব মুসলিম একই দিকে মুখ করবেন।

আর আমরা যখন হজে যাই, তীর্থ যাত্রায়, আমরা কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করি, যাতে সবাই জানতে পারে যে, সব চক্রের একটাই কেন্দ্র। সুতরাং আমরা কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করি এ প্রমাণ দেবার জন্য যে, আল্লাহ একজনই। এ কারণে নয় যে, আমরা কা'বার পূজা করি এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কথা, যা সহীহ মুসলিমে কিতাবুল হজে দ্বিতীয় ভলিউমে এসেছে, তিনি বলেন, আমি কালো পাথরকে চুম্বন করি, যা হলো কা'বার হাজারে আসওয়াদ। এ কারণে যে আমার নবী একে চুম্বন করতেন। অন্যথায় এ কালো পাথর আমার কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে পারে না। তিনি এটা পরিষ্কার করে দিলেন যে, কোনো মুসলিম কালো পাথরের ইবাদাত করতে পারে না। এটা আমাদের কোনো উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না।

এর আরো ভাল উদাহরণ হলো রাসূল ﷺ-এর সময়ে রাসূল ﷺ-এর সাহাবা তথা সঙ্গিগণ কা'বার ওপর উঠে আযান দিতেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি কোনো পৌত্তলিক সে যে পুতুলের পূজা করে তার ওপরে দাঁড়াবে? সুতরাং এগুলোই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, কোনো মুসলমানই কা'বার পূজা করে না; বরং কা'বা হলো কিবলা, আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি, যাঁকে আমরা চোখে দেখি না। আশা করি উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ৩. আমি ডা. ভিয়াস, চিকিৎসা সেবী। আমরা এখানে এসেছি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্য, আমরা ইসলামের ভাউদ্দিক (উকালতি) এর জন্য এখানে আসি নি। আমি আপনাকে এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে কথা বলতে অনুরোধ করবো। এখন এটা হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, আমি জানতে চাই বিশ্বের অন্য অংশেও কি আমাদের ভাইয়েরা আছেন? ভারতে আমাদের ভাইয়েরা আছেন, সুতরাং আমরা ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলি। সুতরাং এদেশের ভ্রাতৃত্ব কিভাবে বিগত একশত বছর যাবত এদেশের ইতিহাসের ওপর প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই একটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, একটি খুবই সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন। তিনি বলেন যে, আপনি জানেন তিনি এখানে এসেছেন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জানার জন্য এবং আমি শুধু এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছি এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও আমাদের ভাইয়েরা আছেন কিনা? ভাই একজন ডাক্তার আল-হামদুলিল্লাহ।

যদি আপনি আমার কথা শুনে থাকেন, যদি ভাই আমার বক্তব্যের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকেন, আমি বলেছি, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করি, যিনি বিশ্বের প্রতিপালক, সারা পৃথিবীর রব, বিশ্বের প্রতিপালক অর্থ এ পৃথিবীর বাইরেও যে জগৎ আছে তারও প্রতিপালক।

এরই মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলতে বলেছেন যে, যা হলো ভ্রাতৃত্ব এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অর্থ শুধু এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব নয়; বরং বিশ্বগুলোর ভ্রাতৃত্ব, মহাবিশ্বের ভ্রাতৃত্ব।

আল-কুরআন অনুসারে ৪২ নং সূরা শুরার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط

অর্থ : তার নিদর্শনের মধ্যে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি, এ দুয়ের মাঝে বিচরণশীল প্রাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

অর্থাৎ কুরআন বলে এ বিশ্বের বাইরেও জীবজন্তু সৃষ্টি রয়েছে। বিজ্ঞান তত দূর পৌঁছাতে পারে নি, এ প্রমাণ দিতে যে, এ পৃথিবীর বাইরেও সৃষ্টি রয়েছে। আপনি জানেন বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে প্রাণী আছে এটা ভ্রমণের জন্য রকেট, উপগ্রহ এবং মোমশীপ পাঠাচ্ছেন। এটা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তারা বলে খুব সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কুরআন বলে, এ পৃথিবীর বাইরেও জীবন আছে এবং আমি এতে বিশ্বাস করি। সুতরাং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বলতে শুধু এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না। এটা অন্যান্য বিশ্বের ভ্রাতৃত্বও বুঝায়। যেমন আপনি ঠিকই বলেছেন–এমনকি ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব। ভারতীয় ভ্রাতৃত্বও বিশ্বব্যাপী।

এ ধরনের ভ্রাতৃত্ব থাকার জন্য যদি আপনি আমার বক্তব্য শুনে থাকেন। আমি আমার পূর্ণ বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। যে একটা নৈতিক চুক্তি থাকা উচিত যে, কোনো মানব অন্য মানবকে হত্যা করবে না, সে চুরি করবে না, তাকে যাকাত দিতে হবে, তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে, তাকে গীবত পরিহার করতে হবে, তাকে এটা দেখতে হবে যে, সে যখন পেট পুরে খেয়ে ঘুমায় তার প্রতিবেশীও ভালোভাবে খেল কিনা। তাকে এটাও দেখতে হবে যে, তাকে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা বিদ্যমান বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে ব্যাহত করে। তাকে গীবত করা চলবে না, সে কাউকে ঠকাবে না। এ সব জিনিস সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উন্নয়ন ঘটাবে শুধু ভারতেই নয়, শুধু পৃথিবীতেই নয়, বরং সারা মহাবিশ্বে। হতে পারে যে, আপনি আমার বক্তব্যের কিছু অংশে মনোযোগ দেন নি।

আমার বক্তব্য আলহামদু লিল্লাহ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে। এটা ভারত আমেরিকা সারা পৃথিবী এমনকি মহাবিশ্বকে শামিল করেছে এবং এটা মূলত ধর্মেরও স্থলাভিষিক্ত, যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, মানব স্রষ্টা, সবার স্রষ্টা তা

ভারত আমেরিকা এমনকি এ পৃথিবীর বাইরে যা আছে তারও স্রষ্টা। তিনি এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং সব ধর্মই মূলত এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতে বলে, যা আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে আমি Concept of God in Major Relegions-এ বিস্তারিত বলেছি। এতে অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে যেমন শিখ ও পার্সী ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলেছি। বিস্তারিতই বলেছি, তারপরেও যদি কেউ ভালভাবে জানতে চান, তাহলে "Concept of God in Major Relegions"-এর ওপর যে ক্যাসেট আছে তা সংগ্রহ করতে পারেন, ফয়েরের বাইরে তা পর্যাপ্ত রয়েছে।

প্রশ্ন ৪. আমি উলহাস নগরের সাবকাটাল মালানি। আমি মনে করি ডা. জাকির বক্তব্যের খেলা খেলছেন। তিনি শুধু বক্তব্যের ভোজবাজি খেলছেন। ইসলাম সারা পৃথিবীর মানুষকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে। একদল মুমিন আরেকদল কাফির। নিশ্চিতভাবেই ইসলাম যা বলে তার অনেক কিছুই আমরা বিশ্বাস করি না। ইসলাম আমাদের ওপর যা চাপিয়ে দিতে চায়, তাতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভব নয়। ইসলাম শুধু বিভক্ত শক্তি সৃষ্টি করে। এমনকি আমরা শিয়া সুন্নী সম্পর্কে জানি এবং ইসলামের মধ্যেই আরো ৭০টি সম্প্রদায় রয়েছে। ইসলাম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব দিতে পারবে না। শুধু হিন্দুধর্মই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব দিতে পারে, যেটা আপনি উদ্ধৃত করেছেন। ইসলাম স্বীকার করে না, গোহত্যা, কাফির হত্যা, সম্পদ অধিগ্রহণ, লুট, নারী সম্পর্কে যা ইসলাম বলে। কীভাবে ভ্রাতৃত্ব আসবে? আপনি ভ্রাতৃত্বের কথা বলেন। এটা কথার ফুলঝুরি মাত্র। বাস্তবে বলতে গেলে, আপনি ইসলামের নামে হিন্দুধর্মের কথাই বলছেন।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা অনেক মন্তব্য করেছেন এবং ইসলাম বলে–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

ভ্রাতৃত্ব পেতে হলে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমি যদি ধৈর্য না ধরি তাহলে আমার ও দাদার মধ্যে যুদ্ধ হবে। ইসলাম ২ নং সূরা আল বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। আমি আমার বড় দাদাকে এখানকার বাইরেও শ্রদ্ধা করি। তার হয়তো হিন্দুধর্মের ওপর ভালো পড়া-শুনা আছে; কিন্তু আমি দুঃখিত যে আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না আমি আরো বলতে চাই যে, ইসলাম সম্পর্কে তার পড়াশুনা কিছুটা দুর্বল।

আমি এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ দু ধরনের। এক প্রকার হলো বিশ্বাসী মুমিন, অন্য প্রকার হলো কাফির তার বক্তব্য মতে। প্রত্যেক ধর্মে এমনকি হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতেও মানুষ দু ধরনের হিন্দু ও অহিন্দু। খ্রিস্ট ধর্মে খ্রিস্ট ও অখ্রিস্টান। ইহুদি ধর্মে ইহুদি ও অইহুদি। ইসলামে একজন মুসলিম ও অন্যজন অমুসলিম। সুতরাং ইসলাম কোথায় পার্থক্য করলো? আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করবো না। কিন্তু যেহেতু আপনি শিক্ষিত বক্তা, আমি হিন্দুধর্মের ওপর কথা বলতে চাই। কারণ আমি তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্বের একজন শিক্ষার্থী। আমি (ধর্ম তত্ত্ব) বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু শুধু একটা ছোট্ট মন্তব্য করি, বেদ অনুসারে সেখানে উল্লেখ আছে যে, মানবজাতি সর্বশক্তিমান খোদার চার অংশ থেকে সৃষ্ট। মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষ থেকে ক্ষত্রীয়, উরু থেকে শুদ্রগণ সৃষ্টি হয়েছেন। এ বক্তব্যই বর্ণ প্রথার জন্ম দিয়েছে।

আমি এখানে এ ধরনের বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমি আমার হিন্দু ভাইদের অনুভূতিতে আঘাত করতে চাই না। ইসলাম এর সাথে একমত নয়। আমিও ঐ সব বিষয়ের ওপর মন্তব্য করতে চাই না। আমি কোনো ধর্মের সমালোচনা করবো না।

আমি বলি নি যে, অমুক ধর্ম ভুল। কিন্তু যদি আপনি আপনার বেদ ভালোভাবে জানেন, আপনি শ্রোতাদেরকে পরীক্ষা করতে দিন, বেদ কি বলে না যে, মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষ থেকে ক্ষত্রীয়, উরু থেকে বৈশ্য–ব্যবসায়ী শ্রেণী, শিক্ষিত ও যোদ্ধা শ্রেণী? শুদ্রদের মনে হয় পদদলিত করা হয়েছে। ড. এমবেডকার-এর লিখিত অনেক বই আছে, আমি বিস্তারিত আলোচনার দিকে যেতে চাই না, দাদা আমি হিন্দু ধর্ম ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি হিন্দুদের অনেক বিষয়কে শ্রদ্ধা করি, তবে কিছু বিষয়ের সাথে একমত হতে পারি না। আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে কারণ আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করছেন। আল-কুরআনের ৬ নং সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের তারা ডাকে তোমরা তাদের গালি দিও না, যাতে সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত তারা আল্লাহকে গালি- না দেয়।

আমি যা বলেছি তা হলো হিন্দুদের ভালো দিক। তা হলো তারা এক খোদার ধারণায় বিশ্বাস করে।

আপনার প্রশ্নানুযায়ী ..... যে আপনি জানেন মুসলমানরা লোক হত্যা করে, আপনি বলেছেন, তারা গো হত্যা করে, সঠিক। আপনি বলেছেন যে, প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান প্রয়োজন। সময় অনুমতি দেয় না, আমি মাত্র কয়েকটি তুলে ধরবো। অন্যগুলো আপনি পরবর্তীতে আসকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি ভুল ধারণা

দূর করার জন্য এখানে আছি। এতে আমার জন্য ভালোই হবে। শুধু আমি যদি ভুল ধারণা দূর করতে পারি, তাহলে হয়তো ঐ লোকটা ভালোভাবেই ইসলামকে বুঝতে পারবে। অতএব আমাদের এ অধিবেশন শুধু প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং আমরা যে কোনো ব্যক্তিকে আমাদের সমালোচনা করার জন্য স্বাগতম জানাবো, আমি একেই ভালোবাসি। যে ব্যক্তি বেশি সমালোচনা করে, সে যুক্তি দ্বারা বেশি আশ্বস্ত হয়, সে ইসলামকেও ভালোভাবে বুঝতে পারবে, এটাই আমি করি। ইসলাম তাঁর সত্য বাণীকে হিকমতের সাথে শিক্ষা দিতে চায়। আল-কুরআনের ১৬ নং সূরা নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

অর্থ : ডাক তোমার প্রভুর পথে, প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশ দিয়ে।

আমরা কি আমিষভোজী হতে পারি? এ ধারণা অনুযায়ী গো বা এ ধরনের হত্যার ব্যাপারে অনেক অমুসলিম আছেন যারা বলেন ... আপনারা জানেন, আপনারা মুসলিম, আপনারা সবাই নিষ্ঠুর লোক, আপনারা সবাই প্রাণী হত্যা করেন। শুধু আপনার সদয় অবগতির জন্য বলি, একজন মুসলিম শুধু নিরামিষ ভোজন করেও ভালো মুসলিম হতে পারে, এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, তাকে মাংসাশী হতেই হবে। ভালো মুসলমান হতে হলে; কিন্তু যেহেতু আল-কুরআন বহু স্থানে বলেছেন, আপনি গরু খেতে পারেন। তাঁকে কেন আমরা খাব না? ৫ নং সূরা মায়িদা ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّ مَا يُتْلٰى ـ

অর্থ : তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে, তবে সেগুলো ব্যতীত যা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৬ নং সূরা নাহল-এর ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্যে, ওতে রয়েছে শীত উপকরণসহ আরো অনেক ধরনের উপকার এবং তাদের গোশত তোমরা ভক্ষণ করো।

২৩ নং সূরা মুমিনূন-এর ২১ নং আয়াতে এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এভাবে–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে অবশ্যই এই চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে প্রচুর শিক্ষণীয় আছে, তাদের পেটের মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে আমি তোমাদের দুধ পান করাই, এ ছাড়াও আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে, এ ছাড়া তার গোশতও তোমরা খাও।

আপনারা জানেন আমিষজাতীয় খাদ্যে প্রচুর আয়রন আছে এবং অনেক পুষ্টিকরও। এটা এখানে যে চিকিৎসকরা রয়েছে তারা নিশ্চিত করবেন। এমনকি আমিও একজন চিকিৎসক আমিও তা জানি। অন্যান্য খাদ্য এবং যে পরিমাণ প্রোটিন আপনি গোশতজাতীয় খাদ্যে পাবেন, আপনি অন্য সবজিজাতীয় খাদ্যে তা পাবেন না। সবজিজাতীয় খাদ্যের মধ্যে সয়াবিন যাকে সর্বোত্তম প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, তাও গোশতজাতীয় খাদ্যের প্রোটিন মানের ধারে কাছেও না।

আর গোহত্যা বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে যদি আপনি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আপনি পাবেন যে, তারাও এক ব্যক্তিকে মাংসাশী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আমি এখানে কোনো ধর্মের সমালোচনা করতে চাই না। যেহেতু ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন, সেহেতু আমাকে সত্য বলতে হবে। যদি আপনি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখবেন সাধক-সন্ন্যাসীরা মাংসাশী ছিলেন। এমনকি তারা গোমাংসও ভক্ষণ করতেন। পরবর্তীতে জায়ন বা এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে, লোকেরা অহিংসা দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হন। অর্থাৎ প্রাণী হত্যা করা যাবে না। তারা জীবনের ক্ষেত্রে এ দর্শন অবলম্বন করেন। অন্যথায় ইসলামও প্রাণী অধিকারের পক্ষে।

আমি প্রাণী অধিকারের ওপরও বক্তব্য দিতে পারি। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বলে– প্রাণীদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিও না, তাদের সাথে ভাল আচরণ করো, তাদের আহার্য দাও। কিন্তু প্রয়োজনে তারাও আহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আপনারা যদি অন্য ধর্ম বিশ্লেষণ করেন, যাতে এ দর্শনে বিশ্বাস করে যে 'আপনাকে মাংসাশী হওয়া চলবে না।' এ দর্শন ঐ ধারণার ওপরে ছিল যে, 'তোমার প্রাণী হত্যা করা উচিত নয়, কারণ তারা জীবিত। অতএব মাংস ভক্ষণ করা পাপ।' আমি তাদের সঙ্গে একমত। এ পৃথিবীতে যদি কেউ কোনো জীবন্ত সৃষ্টি হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমি হবো প্রথম ব্যক্তি।

হিন্দু ধর্মে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের নমুনা হলো প্রত্যেক জীবিত জিনিস আপনার ভাই। প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী চাই, সে প্রাণী পাখি বা পোকা-মাকড় যাই হোক না কেন। আমি একটি সাধারণ প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে একজন মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন তার ভাইকে হত্যা না করে পাঁচ মিনিটও জীবিত থাকতে পারে? যারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে জানে, তারা আমি যা বলছি তা বুঝতে পারবেন। যে যখনই আপনি শ্বাস নেন, তখন লক্ষ লক্ষ জার্ম আপনি শ্বাসের সাথে গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে

হত্যাও করেন। তার অর্থ এ ধর্মের মর্মানুসারে আপনি আপনাদের ভাইদের হত্যা করছেন নিজেদের বেঁচে থাকার তাগীদে।

ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক মানব আপনাদের ভাই। বিশ্বাসের ভাই অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান একজন ভাই। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিসই আমার ভাই নয়, যদিও প্রত্যেক জীবিত জিনিসের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অপ্রয়োজনে তাদের কষ্ট দেয়া যাবে না, অত্যাচার করা যাবে না। অবশ্য প্রয়োজনে আপনারা তাদেরকে খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।

সুতরাং এ দর্শন বলে যে, মাংস ভক্ষণ করা পাপ, কারণ আপনি জীবিত জিনিস হত্যা করছেন। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, '.....এমনকি গাছেরও জীবন আছে।' আপনি কি তা জানেন? এভাবে এ যুক্তি যে, জীবিত জিনিস হত্যা করা পাপ এটা ব্যর্থ। সুতরাং এখন তারা তাদের যুক্তি পরিবর্তন করছে এবং তারা বলে, দেখুন গাছেরও জীবন আছে, কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারে না। অতএব প্রাণী হত্যা করা, বৃক্ষ হত্যা করার চাইতেও বেশি পাপ। আপনারা কি জানেন আজ বিজ্ঞান আরো অগ্রসর এবং আমরা জানতে পেরেছি, এমনকি বৃক্ষও ব্যথা অনুভব করতে পারে। তারা কাঁদতে পারে, তারা সুখানুভব করতে পারে– গাছপালা ব্যথা অনুভব করতে পারে না। কি কারণে গাছের ক্রন্দন মানবকর্ণ শুনতে পারে না, কারণ মানবকর্ণ প্রতি সেকেন্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ সাইকেল পর্যন্ত শুনতে পায়। এর মাঝে যা আছে তা মানুষ শুনতে পায়। এর নিচে বা উপরে যা আছে তা মানবকর্ণ শুনতে পায় না। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো মানব কুকুরের বাঁশি বাজায় আপনারা জানেন কিছু কুকুরের বাঁশি আছে।

এগুলোকে নীরব কুকুরের বাঁশি বলা হয়, এটা এমন বাঁশি বাজায় যার ফ্রিকোয়েন্সি ২০,০০০ সাইকেল এরও ওপরে এবং ৪০,০০০ সাইকেলেরও নিচে প্রতি সেকেন্ডে। কুকুর প্রতি সেকেন্ডে ৪০,০০০ সাইকেল পর্যন্ত শুনতে পারে। সুতরাং মনিব যখন বাঁশি বাজায়, তখন কুকুর তা শুনতে পায়; কিন্তু মানুষ তা শুনতে পায় না। একে বলে নীরব কুকুরের বাঁশি।

একইভাবে গাছ-পালার ক্রন্দন মানুষ শুনতে পায় না; কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা কাঁদে এবং ব্যথা অনুভব করে। আমাদের এক ভাই ছিলেন যিনি বেশির ভাগ যুক্তি পেশ করতেন এবং আমাকে বলেন, ভাই জাকির, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, গাছেরও জীবন আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে; কিন্তু আপনি জানেন, গাছের দুটি অনুভূতি কম আছে। তাদের মাত্র তিনটি অনুভূতি আছে যেখানে প্রাণীর আছে পাঁচটি অনুভূতি। সুতরাং প্রাণী হত্যা করা গাছ হত্যা করার চেয়ে বেশি পাপ। আমি তাকে বললাম, ভাই মনে করেন আপনার একজন ছোট ভাই আছে; যে জন্মগতভাবে বধির এবং বোবা–দুটি অনুভূতি কম। সে বড় হওয়ার পর যদি কেউ

গিয়ে তাকে হত্যা করে, তাহলে কি আপনি বিচারককে বলবেন, জনাব, আপনি হত্যাকারীকে কম শাস্তি দিন, কেননা আমার ভাইয়ের দুটি অনুভূতি কম ছিল। আপনি কি তা বলতে পারবেন? আপনি বলবেন, তাকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি দিন; কারণ সে এমন একজনকে হত্যা করেছে যে ছিল অসহায়।

অতএব ইসলামে যুক্তি ঐরূপ কাজ করে না– দুই অনুভূতি বা তিন অনুভূতি। ২ নং সূরা বাকারার ১৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا .

অর্থ : তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র জিনিস থেকে খাও।

অর্থাৎ যাই ভালো ও আইনসিদ্ধ তা তুমি খেতে পার এবং ঐ কারণেই তো আপনারা পৃথিবীর গরু, বাছুরকে বিশ্লেষণ করেন। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় গরু-বাছুরের উৎপাদন অনেক বেশি। এমনকি মানুষের তুলনায়ও সেগুলো খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আমি যদি আপনার সঙ্গে একমত হই যে, কোনো মানুষ গরু-বাছুর খাবে না; তাহলে গরু-বাছুরের উৎপাদন পৃথিবীতে অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে এবং গরু হত্যার ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল করীম পারিখ-এর 'গোহত্যা'–গো-জবাই নামে একটা বই রয়েছে। কে দায়ী?

আপনি যদি চর্ম শিল্পে যে লোকেরা কাজ করে, তাদের ওপরে বিশ্লেষণ করেন যারা গোচর্মের ওপর কাজ করে। আপনি সেখানে মুসলমানের চেয়ে অমুসলমানের সংখ্যাই বেশি পাবেন। চামড়া জেইনগুলো ওখানে কাজ করে। সুতরাং যে লোকেরা গোহত্যার দ্বারা উপকৃত হয়, তাদের বেশির ভাগই অমুসলিম। সুতরাং আপনি যদি ইতিহাস ভালোভাবে জানেন এবং আপনি যদি যুক্তি ভালোভাবে জানেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ্ বলেন, 'পবিত্র জিনিস খাও, যা আমরা তোমাদের দিয়েছি।' যদি আপনার থাকে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এরপরও যদি আপনি গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করেন সেগুলো শুধু সব্জি খায় এ কারণে দাঁতের পাটি চ্যাপ্টা। যদি আপনি, সিংহ, বাঘ, চিতা ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করেন, তাদের দাঁত ধারাল। কারণ তারা শুধু আমিষ ভোজন করে। যদি আপনি মানব দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করেন আপনি আয়নার সামনে গিয়ে নিজের দাঁতগুলো দেখেন, আপনি দেখবেন আপনার সুচালো দাঁতও আছে আবার চ্যাপ্টা দাঁতও আছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইতেন যে আমরা যেন নিরামিষভোজী হই, তাহলে তিনি কেন আমাদের সুচালো দাঁত দিলেন? কেন? স্বাভাবিকভাবে যেন আমরা মাংসভোজী হই।

যদি আপনি গরু, ভেড়া ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণীর পাচন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন, তাহলে আপনি পাবেন যে, এগুলোর পাচন প্রক্রিয়া এমন যে, এগুলো শুধু তৃণ হজম

উপযোগী। আবার সিংহ বাঘ, চিতা এরূপ মাংসাশী প্রাণীর পাচন প্রক্রিয়া মাংস ভোজন উপযোগী। মানুষের পাচন প্রক্রিয়ায় উভয় মাংস ও সবজি সব প্রকারের হজম শক্তিই রয়েছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইতেন যে আমরা নিরামিষভোজী হবো তাহলে তিনি কেন আমাদের এমন হজম প্রক্রিয়া দান করলেন যাতে আমিষ, নিরামিষ, উভয় প্রকারের জিনিসই হজম হয়? সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে পরিষ্কার হয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের উভয় প্রকারের ভোক্তা হবার ব্যবস্থাই রেখেছেন। আমিষ ও নিরামিষভোজী। আশা করি উত্তর হয়ে গেছে। যদি আরো কিছু জানার থাকে আরো কোনো ভুল ধারণা থাকে, তাহলে আমি উত্তর দিব। একবারে একটি ভুল ধারণার উত্তর। কারণ আমাকে সব ভুল ধারণার সাথে ইনসাফ করতে হবে। দাদা আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৫. (হিন্দিতে) নেহি বুরা হায় বেদ আওয়ার শাস্ত্র নেহি কুরআন বুরা হায়, বিনা সমঝে বাতইন, আওর বি সমঝা ভায়াখিয়ান বুরা হায়, সমঝো হাম আপনি বাতাউ, আউর সবকা ধিয়ান বুরা হায়, আপনি আপনি হিসাব সি ঘোকো, কি আস উসবা প্রভুকা সাম্মান নেহি বুরা হায়, আউর ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড কি পাহলি সি, জাহাভি কুই বাতইন হোনি চাহিয়ে উহাঁ পর মাযহাব কি কুই বাত হোনী নেহি চাহিয়ে। মাযহাব সী উপার উঠ কর বাত হোনি চাহিয়ে, কিউঁ কি মাযহাব মে উপার উঠনা হি উস আল্লাহ তায়ালা কো বানা হায়–উস পরমত কো পানা হায়। আউর পহেলী গডকা মিনিং সমঝোকো গডকো মেনিং কিয়া হায়। গড গাওস কুচ নাহি হোতা হায় G-O-D ঐ সুপার পাওয়ার আমাদের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ঐ প্রকৃতির তিনটি অংশ আছে G-O-D G-দ্বারা জেনারেটর (পরিচালক) O-দ্বারা অপারেটর (শক্তি প্রয়োগকারী) D-দ্বারা ডিস্ট্রয়ার (ধ্বংসকারী) বুঝায়। অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের শক্তি প্রয়োগে পরিচালনা করে এবং আমাদের ধ্বংসও করে। আমারা পরিচালিত, প্রয়োগিত এবং ধ্বংস হই। ইস মেইন গডেস আওর গড কা মিনিং কুঝভী নেহি হায়, আউর গডকা আসলি মিনিং কুঝভী নেহি হায়, আল্লাহ তাআলা গড সী উপার হায়, পরমেশ্বর গড সী উপার হায়, পরমেশ্বর গড সী উপার হায়।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভাই আমার বক্তব্যকে খুবই সংক্ষেপে সার-সংক্ষেপ করেছেন আলহামদু লিল্লাহ। আমি তাকে ধন্যবাদ দেই। তিনি সঠিকই বলেছেন সেখানে কোনে গড গডেস নেই, যা আমি ব্যাখ্যা করেছি। তিনি হিন্দিতে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে যারা ইংরেজি না জানে তারা বুঝতে পারে। তিনি ভালোই ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো গড গডেস নেই আল্লাহ তাআলাই সর্বোপরি এবং আমি তার সাথে একমত এবং তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, ধর্মের মধ্যে কোনো বিভক্ত করা উচিত নয়। আমি তার সঙ্গে একমত যে ধর্মের

বিভিন্নতা থাকা উচিত নয়। কারণ ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে আল-কুরআন বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ـ

অর্থ : আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ)।

আর আপনার সঙ্গে ভাই আমি একমত যে, যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে মারামারি করেন, তাহলে যদিও সেগুলোর মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। আপনারা নিজেরাই পার্থক্য সৃষ্টি করলেন।

ভাই সুনির্দিষ্ট মন্তব্যও করেছেন যে, শিয়া ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে এবং সেখানে ৭৩ ফিরকা সম্পর্কে বলেছেন। আমি এরও উত্তর দিতে পারি; কিন্তু সময় সাপেক্ষ, যদি আপনি এটা জানতে চান তাহলে আপনি বেশি করতে পারেন, আমি তারও উত্তর দিব ইনশা-আল্লাহ। কেন........ বিভিন্ন ফিরকা সম্পর্কে আলোচনা? ভাই সঠিকই বলেছেন যে, ধর্ম একটি থাকা উচিত। জীবন চলার একটিই পথ এবং তা হলো আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা। আপনি যদি এতে বিশ্বাস করেন, তাহলে 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হবে। যদি আপনি এটা না করেন, তাহলে অবশ্যই বিভেদ হবে। ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৬. জাকির ভাই আমার একটা খুবই সাধারণ প্রশ্ন আছে। আমি অধ্যাপক দেবার। আমি কোনো ধর্ম অধ্যয়ন করিনি এবং আমি ধর্মে বিশ্বাসও করি না এবং আমার সাধারণ প্রশ্ন হলো আপনি কি বিশ্বাস করেন বিভিন্ন ধর্ম আছে এবং বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত? কারণ আপনার ভাষণে আপনি বলেছেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি পৃথিবীর সব লোক সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে ইত্যাদি...... ইত্যাদি। যাতে তারা পরস্পরের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে পরস্পরকে বুঝতে পারে। আপনি কি দয়া করে আমাকে ক্রুসেডগুলোর উদ্দেশ্য এবং হিন্দু-মুসলিম পার্থক্যের আপনার নিজস্ব মতামত তুলে ধরবেন? আপনি বলেছেন যে এটা হিন্দুবাদ এবং এটা ইসলাম ধর্ম, আপনি কখনো বলেন নি যে হিন্দু মতবাদ একটি ধর্ম। আপনি বলেছেন হিন্দুবাদ ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তা হলো, যে হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, সব কিছুই খোদা বা দেবতা আর মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই আল্লাহর (খোদার)। কেন এখানে এত হত্যাযজ্ঞ, ভারতে বা দুনিয়ার অন্য স্থানে এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও? আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই খুবই ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পূর্ণ মানবতা মাত্র এক জোড়া মানব মানবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। ভাই আমি কখনো বলি নি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। এটা রেকর্ড করা আছে, আমি কখনো বলি নি, 'বিভিন্ন ধর্মে'। আমি বলেছি বিভিন্ন গোত্র উপ-গোত্রে ধর্মে নয়। আল্লাহ্ বলেন, 'ধর্ম একটাই' সর্বশক্তিমান আল্লাহ লোকদেরকে কখনোই বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেন নি; বরং বিভিন্ন জাতি ও বর্ণে এবং বিভিন্ন ভাষায় যাতে একে অপরকে চিনতে পারে। ঐটাই যথেষ্ট। এ ব্যক্তি এ বর্ণ থেকে এসেছে, এ অঞ্চল থেকে। এটা অঞ্চল ধর্ম নয়। সুতরাং আপনার ধর্ম বর্ণনা সঠিক নয়। অন্যান্য জিনিস সঠিক আপনি যে বলেছেন, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বর্ণে, বিভিন্ন জাতিতে। আমি একমত। তবে এভাবে করা হয়েছে যাতে একে অপরকে চিনতে পারে; এ জন্য নয় যে, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নয়।

আপনি বলেছেন যে আমি কখনোই হিন্দুত্ববাদকে ধর্ম বলি নি। আমি পুনরায় আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি। আমি বলেছি– অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী ধর্ম হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস। হিন্দু মতবাদকে বুঝতে, হিন্দুধর্ম মতকে বুঝতে আপনাকে খোদার ধারণা বুঝতে হবে। ইহুদি ধর্মমতকে বুঝতে হলে, ইহুদি ধর্মমতে আল্লাহর ধারণাকে বুঝতে হবে। খ্রিস্ট মতবাদ বুঝতে হলে, খ্রিস্ট মতে আল্লাহর ধারণাকে বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্মকে বুঝতে হলে ইসলামে আল্লাহর ধারণাকে বুঝতে হবে, এটাই আমি বলেছি।

পার্থক্যের বিষয়ে...... কে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ্ নন। আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে ৬ নং সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই আপনার উপরে নেই।

আপনি ধর্মকে বিভক্ত করতে পারেন না। যদি কেউ ভাগ করে সে ভুল করে। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, কেন লোকেরা একে অপরকে হত্যা করছে? সে আপনারই তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত। ধরুন, একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি ছাত্রকে বললেন, 'নকল করো না' এ সত্ত্বেও সে তা করলো, কাকে দোষ দেবেন? শিক্ষক না ছাত্রকে? অবশ্যই ছাত্রের দোষ। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছায় যা চাও করতে পার। তিনি আপনাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বমোট ও চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। করণীয় বর্জনীয় এখানে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ্ বলেন এবং আমি আমার বক্তব্যে ৫ নং সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

অর্থ : কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি (সে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন) কে হত্যার প্রতিবিধান বা জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ছাড়া হত্যা করলো, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো, আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর হাত থেকে অন্য মানুষকে রক্ষা করলো, সে যেন সব মানুষকে জীবিত করলো।

সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ লোকদের একে অপরের হত্যাকে পছন্দ করেন না; কিন্তু মানব যদি তা অনুসরণ না করে তাহলে কে দায়ী? অবশ্যই মানুষ। ৬৭ নং সূরা মুলক-এর ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ـ

অর্থ : যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষার মধ্যে বাছাই করে নিতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে ভাল আমল করে?

আল্লাহ জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, কে ভাল কাজ করে তা যাচাই করার জন্য। আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করেন না। যদি তিনি চান তাহলে করতে পারেন। কুরআন বলে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে সব লোককে ঈমানদার করতে পারতেন। কিন্তু যখন পরীক্ষার প্রশ্ন। যদি শিক্ষক চান তাহলে সব ছাত্রকে পাস করিয়ে দিতে পারেন, যদিও পাস না করার মতো হয়। শিক্ষক পারেন.....কিন্তু সেটা হবে যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের প্রতি অবিচার।

সেখানে ছাত্রদের স্বাধীনতা কোথায়? যদি তারা একটা পরীক্ষার অধীনে থাকে এবং কেউ যদি সঠিক উত্তর না দেয়, তারপরও শিক্ষক পাস করিয়ে দেন। তাহলে যিনি কঠোর শ্রম দিয়েছেন তিনি জিজ্ঞেস করবেন– "আমি এতটা জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছি পরীক্ষার জন্য এ ব্যক্তি যে নকল করেছে এবং চিটিংবাজি করেছে ভুল উত্তর দিয়েছে এরপরও সে পাস করলো এবং পরবর্তী ব্যাচের ছাত্ররা যদি জানে যে, শিক্ষক সব ছাত্রকেই পাস করিয়ে দেন সে সঠিক উত্তরই লিখুক বা ভুল, তাহলে তারা সবাই পড়াশুনা বন্ধ করে দেবেন। এরপর আপনি একটি ডিগ্রি (ধরুন) মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করবেন, যখন ডাক্তারি সনদ নিয়ে তিনি বের হয়ে যাবেন, তিনি রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে লোক হত্যাই করবেন বেশি।

অতএব আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এরূপভাবে হত্যা করো না, অন্যদের ক্ষতি করো না, লোকদের ভালোবাসো, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।

আমি আমার বক্তব্যে বলেছি এই সব। কিন্তু জনগণ যদি এভাবে কাজ না করে। অর্থাৎ তারা কুরআনের অনুসরণ করছে না। সে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো স্থানেরই হোক না কেন, সে আমেরিকা কিংবা পাকিস্তান কিংবা পৃথিবীর যেকোনো স্থানেরই হোক না কেন। লোকেরা বলতে পারে, মনে করুন আপনাকে মুসলিম নাম ধারণ করে যেমন আব্দুল্লাহ অথবা জাকির অথবা মুহাম্মদ আপনি জান্নাতের টিকিট পেতে পারেন না, শুধু একথা বলে যে, আপনি মুসলমান, মুসলিম কোন লেবেল নয়। এই সঠিক যদি আমি বলি আমি মুসলিম। আমি মুসলিম। মুসলিম হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিকট নিজের স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু কোন ব্যক্তিকে জাকির আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ শাকিব ইত্যাদি বলার সাথে সাথে যদি তারা কাজও করে, যদি তারা তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে, তাহলে তারা মুসলিম। আল-কুরআন বলে– কিছু মুসলিম আছে তারা শুধু মুখেই মুসলিম। অতএব লোকেরা যদি হত্যা করে, তারা কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে না। যদি তারা কুরআন অনুসরণ করে, তাহলে সারা পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসতো। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ৭. (চলমান) সুতরাং জাকির ভাই, যদি কোনো হিন্দু কুরআনের নীতি অনুসরণ করে। যা হিন্দুদের বহু গ্রন্থের রীতির মতোই। তাহলে কি একজন হিন্দু নিজেকে মুসলিম বলতে পারে? অন্য দিকে একজন মুসলমান কি নিজেকে হিন্দু বলতে পারবে? কারণ আপনার আলোচনার ভাষণে আপনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথাই বলেছেন?

ভৌগোলিকভাবে প্রত্যেক ভারতীয়ই হিন্দু; কিন্তু বিশ্বাসের দিক দিয়ে নয় ঃ

উত্তর : ডা. জাকির ঃ ভাই একটি খুবই ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। যদি আপনি পরীক্ষার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আমি উত্তর দিতে পারি আল-হামদুলিল্লাহ। ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, কোনো হিন্দু কি ইসলামের কুরআনের নীতি অনুসরণ করতে পারে এবং হিন্দুত্ববাদীকে কি মুসলিম বলা যাবে এবং একজন হিন্দুকে কি মুসলিম বলা যাবে? ভাল কথা। আসুন আমরা মুসলিম এবং হিন্দুর সংজ্ঞা জানার চেষ্টা করি। আমি যেমন বলেছি– মুসলিম ঐ ব্যক্তি যিনি তার ইচ্ছার স্বাধীনতাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ। 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা কি? আপনি কি জানেন? হিন্দু একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। যেকোন ব্যক্তি ভারতে বাস করে, যে কেউ ভারতীয় উপত্যকার সভ্যতার এ এলাকায় বাস করে সেই হিন্দু। সংজ্ঞানুযায়ী আমি হিন্দু, আপনি কি তা জানেন? হিন্দু হলো ভৌগোলিক

সংজ্ঞা। আপনি যেকোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'হিন্দু' একটি ভুল নাম।

ভৌগোলিকভাবে আমি একজন ভারতীয়, ভৌগোলিকভাবে আমি হিন্দু। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তাদেরকে 'বেদানিস্ট' বলা উচিত। হিন্দু নয়। এরূপ আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আমি কি ভৌগোলিকভাবে হিন্দু? আমি বলতে পারি, হ্যাঁ। আমি হিন্দু। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি বেদান্ত বেদের অনুসারী? আমি বলবো বেদের ঐ অংশগুলো মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যেগুলো কুরআনের সাথে মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ একজন খোদা আছেন। কিন্তু যদি আপনি বলেন যে, সর্বশক্তিমান খোদা ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে, আলাদা বর্ণ যারা সর্বোত্তম বর্ণ। ক্ষত্রীয়রা বুক থেকে সৃষ্ট। এটা হলো বেদের কথা আমি যা উদ্ধৃত করলাম। যদি আপনি বেদে বিশ্বাস না করেন আপনার সমস্যা। কিন্তু এটা হলো বেদ আমি যা উদ্ধৃত করলাম। এখানে যেসব বেদিক পণ্ডিত আছেন, আপনি তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। বেদ বলে যে, আমি নই। বৈষ্ণরা উরু থেকে এবং শুদ্ররা পায়ের পাতা থেকে। আমি এ ধারণার প্রতি একমত নই যে, এটাই সঠিক। সুতরাং আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি বেদের এ দর্শনের সাথে একমত? আমাকে বলতে হবে 'না'। এই সুনির্দিষ্ট দর্শন।

প্রশ্ন ৮. (চলমান) আপনার মতে, যে ব্যক্তি এ ভূখণ্ডে বাস করে সে কি হিন্দু?

উত্তর : ডা. জাকির ঃ হ্যাঁ, ভৌগোলিকভাবে আমি বলি হ্যাঁ। ভাই ঠিকই বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ভূখণ্ডে বাস করে সে হিন্দু। কিন্তু স্বভাবগতভাবে যে ব্যক্তি আমেরিকায় বসবাস করে সে আমেরিকার নাগরিক; তাকে আমেরিকান হতে হবে।

শ্রোতাবৃন্দ ঃ এখানকার প্রত্যেকেই হিন্দু। ইয়ে রিয়েল ব্রাদারহুড হ্যাঁয়। (এটা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব।)

উত্তর : ডা. জাকির ঃ হ্যাঁ এটাই। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে একমত। ভৌগোলিকভাবে যারা ভারতে বাস করে তারা হিন্দু। সুতরাং আমি সম্পূর্ণরূপে এর সঙ্গে একমত। ভৌগোলিক সংজ্ঞায় যদি আপনি বলেন, ভারতে যারা বাস করে তারা হিন্দু তাহলে এটা সঠিক। যেকোনো পণ্ডিত এর সাথে একমত হবেন। যেকোনো ব্যক্তি ভারতে বাস করে সে হিন্দু। ভৌগোলিকভাবে আমি হিন্দু। ভারতে বাস করা সত্ত্বেও আমি কি মুসলিম হতে পারি? অবশ্যই।

শ্রোতৃমণ্ডলী ঃ অনুগ্রহ করে এটা ব্যাখ্যা করুন।

ডা. জাকির ঃ অবশ্যই, সুতরাং একজন মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিন্দুও হতে পারে। হ্যাঁ একজন মুসলিম যদি ভারতে বাস করে তাহলে সে হিন্দু; কিন্তু যদি অনুরূপ কথিত কোন হিন্দু; আমেরিকায় বাস করে তাহলে সে হিন্দু নয়। আপনি কি তা জানেন? তিনি একজন আমেরিকান সুতরাং হিন্দুবাদকে বিশ্বজনীন ধর্ম

বলা যাবে না। পণ্ডিতদের মতে হিন্দু শুধু ভারতের ধর্ম। এটা কোনো ধর্ম নয়, এটা হলো ভৌগোলিক সংজ্ঞা। বড় পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দের মতে হিন্দু হলো ভুল নাম। আপনি 'মিসনোমা' (ভুল নাম) কি তা জানেন? 'মিসনোমা' অর্থ হলো ভুল লেবেল লাগানো। তাদেরকে বেদানুসারী বলা উচিত। যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি হিন্দু? আমি বলবো এ ভূখণ্ডে বসবাসকারীর পরিচয় যদি হিন্দু হয়, তাহলে সব দিক দিয়েই আমি হিন্দু। কিন্তু আপনি যদি বলেন হিন্দু হলো এমন এক ব্যক্তি যিনি পূজা করেন। যেমন আপনি এক ব্যক্তির কথা বলেছেন, আপনি জানেন যে আপনি যদি ঐরূপ দেবতায় বিশ্বাস করেন, যে আকৃতি ধারণ করে ইত্যাদি এবং যার মাথা ও হাত আছে ইত্যাদি তাহলে আমি হিন্দু নই। একইভাবে একজন হিন্দু মুসলিম হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো ভারতীয় পুতুলের পূজা করে সে মুসলিম হতে পারে না। কারণ ৪ নং সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার সাথে কেউ শরিক করলে সেই গুনাহ মাফ করেন না, এছাড়া যেকোনো গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করলো সে বড় ধরনের মিথ্যারোপ করলো ও মহাপাপে নিমজ্জিত হলো।

সুতরাং একজন ভারতীয় ভারতে বসবাসকারী ভৌগোলিকভাবে হিন্দু.... মুসলিম হতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ ভৌগোলিক হিন্দু "ভারতীয় আল্লাহর মৌলিক ধারণার নির্দেশ অমান্য করেন, তার সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতে বিশ্বাসও করেন, তাতেও মুসলিম হতে পারবেন না। যেকোনো মুসলমান যিনি আল-কুরআন অনুসরণ করেন এবং ভারতে বসবাস করেন তিনি ভারতীয় মুসলমান। আশা করি আপনার নিকট পরিষ্কার হয়েছে।

প্রশ্ন ৯. কেন বেশির ভাগ মুসলমান মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী?

উত্তর : ডা. জাকির ঃ এ প্রশ্নটি ভাই মেহতা করেছেন কেন বেশির ভাগ মুসলমান মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী? আমি উত্তর দেব। যদি আপনি এটা পছন্দ করেন, তাহলে গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি অপছন্দ করেন, তাহলে প্রত্যাখ্যান করুন। আল কুরআন ২ নং সূরা বাকারা-এর ২৫৬ নং আয়াতে বলেন–

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ لا قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج

অর্থ : দীনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই, মিথ্যা থেকে সত্য বের হয়ে এসেছে।

আমাকে আপনার সামনে সত্যকে পেশ করতে হবে। যদি আপনি পছন্দ করেন গ্রহণ করুন, যদি আপনি পছন্দ না করেন প্রত্যাখ্যান করুন কোনো সমস্যা নেই।

সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে 'মৌলবাদী' অর্থ কী? মৌলবাদী এমন এক ব্যক্তি যিনি মৌলিক জিনিসগুলো অনুসরণ করেন। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি ভালো গণিতবিদ হতে চান। তাকে গণিতের মৌল বিষয়গুলো জানতে, অনুসরণ করতে ও অনুশীলন করতে হবে। তাকে ভালো গণিতবিদ হতে গণিতের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। একজনকে ভাল বিজ্ঞানী হতে হলে তাকে বিজ্ঞানের মৌল বিষয়গুলো জানতে অনুসরণ ও অনুশীলন করতে হবে। তাকে ভালো বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে ভালো ডাক্তার হতে হলে, তাকে মেডিসিন-এর মৌল বিষয়গুলো জানতে ও অনুসরণ করতে হবে। ভালো ডাক্তার হতে হলে তাকেও মেডিসিনের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। আপনি সব মৌলবাদীকে এক পাল্লায় ওজন দিতে পারেন না। আপনি বলতে পারেন না যে, সকল মৌলবাদীরা খারাপ অথবা সব মৌলবাদীরা ভালো। উদাহরণস্বরূপ আপনি চৌর্য বৃত্তিতে মৌলবাদী, চুরি কাজে দক্ষ; কিন্তু আপনি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আপনি লোকের জিনিস চুরি করেন। ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করেন না, আপনি ভালো লোক নন। অপর দিকে যদি আপনি মৌলবাদী ডাক্তার হয়ে থাকেন। যিনি মেডিসিনের মৌল বিষয় অনুসরণ ও অনুশীলন করেন এবং মানুষের অসুস্থতা নিরসন করেন, আপনি একজন ভালো লোক। আপনি মানুষকে সাহায্য করেন। এভাবে আপনি সব মৌলবাদীকে এক রকম ভাবতে পারেন না।

'মুসলিমরা মৌলবাদী' এ বিষয়ে আমি বলতে চাই যে, আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত। কারণ আমি জানি, আমি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের মৌল বিষয়গুলো অনুসরণ ও অনুশীলনের চেষ্টা করি এবং মুসলমানকে ভালো মুসলমান হতে হলে মৌলবাদী মুসলিম হতে হবে। অন্যথায় সে ভালো মুসলমান হতে পারবে না। প্রত্যেক হিন্দুকে ভালো হিন্দু হতে হলে মৌলবাদী হিন্দু হতে হবে। অন্যথায় সে ভালো হিন্দু হতে পারবে না। প্রত্যেক খ্রিস্টানকে ভালো খ্রিস্ট হতে মৌলবাদী খ্রিস্টান হতে হবে অন্যথায় সে ভালো খ্রিস্টান হতে পারবে না।

ইসলামী মৌলবাদী মুসলিম ভালো না মন্দ? সেটা একটা প্রশ্ন আলহামদুলিল্লাহ ইসলামে এমন একটা মৌল বিষয়ও নেই যা মানবতার বিরুদ্ধে যায়। অনেকে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ছাড়েন, ভুল ধারণার কারণে। আপনি হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে, ইসলামের এই শিক্ষাটা ভুল। যেমন ভাই বলেছেন, গরু খাওয়া ভুল এবং আমি উত্তর দিলাম। ভাই কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বললেন আমি তারও উত্তর দিলাম। সুতরাং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কেউ চিন্তা করতে পারেন যে, ইসলামের কিছু মৌল বিষয় আছে যা কিনা ভুল। কিন্তু যে ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আছে তিনি বলবেন যে, এমন একটা শিক্ষাও নেই যা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যায়।

আমি যে কাউকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি, কেবল এ হলঘরই নয়; বরং সারা পৃথিবীর সব মানুষকে চ্যালেঞ্জ করছি ইসলামের একটা বিষয়ের পয়েন্ট আউট করতে যা মৌলিক মানবতার বিপক্ষে যায়। কিছু লোক হয়তো অস্বস্তিবোধ করতে পারেন; কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সার্বিকভাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পক্ষে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সক্রিয়।

ভাই পরবর্তী প্রশ্ন আপনি রাখতে পারেন, একবারে এক প্রশ্ন। যখন সেখানে আপনার পালা এসেছিল আপনি তখন কোনো উত্তর দেন নি। দেখুন, বিষয়টা হল আপনাকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে। মাইক আধা ঘণ্টা বন্ধ ছিল এবং কেউ এগিয়ে আসেন নি। আমি দাদাকে বলেছি আপনাকে স্বাগতম, আপনি মাইকে এসে দাঁড়ান, কেউ আসেন নি। আপনি একবারে একটি প্রশ্ন করতে পারেন। প্রত্যেক তৃতীয়টি আপনার প্রশ্ন হবে। সমস্যা নেই সময়ে কুলালে আপনি যতো ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পারবেন। যেহেতু অডিটোরিয়াম ভাড়া করা হয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। আমি গর্বিত যে আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম।

যদি আপনি (বিখ্যাত) ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে 'মৌলবাদের' সংজ্ঞা দেখেন, এতে বলা হয়েছে– 'মৌলবাদিত্ব হলো এমন একটি আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একদল খ্রিস্টানের দ্বারা শুরু হয়েছিল। (যারা ছিলেন) আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্টস, যারা প্রতিবাদ করে বলে যে, শুধু বাইবেলই নয়, বাইবেলের সব শিক্ষাই খোদার বাণী; বরং আক্ষরিক অর্থেই বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ খোদার বাণী। সুতরাং মৌলবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল আমেরিকার একদল প্রেটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের দ্বারা। যারা প্রতিবাদ করে বললো : বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর ও শব্দ খোদার বাণী। যদি কোন মানুষ প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ খোদার বাণী তাহলে আন্দোলন ভালো। কিন্তু যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ খোদার নয় তাহলে এ আন্দোলন ভালো নয়।

যদি আপনি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে মৌলবাদী শব্দের অর্থ খুঁজেন, আপনি এ অর্থটি পাবেন যে, 'মৌলবাদ' অর্থ হলো কোনো ধর্মের সনাতন আইনগুলোকেই, বিশেষ করে ইসলামের আইনগুলো শক্তভাবে ধরে রাখা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে তারা বিশেষ করে ইসলাম কথাটি লিখেছে। এই বিশেষ করে ইসলাম কথাটি অক্সফোর্ড ডিকশনারির সর্বশেষ সংস্কার। তার অর্থ 'মৌলবাদী' ইসলামের প্রতি বর্তমানে নির্দেশ করে। কেন?

মিডিয়া জনগণের ওপর কামান দাগিয়ে যাচ্ছে যে, আপনারা জেনে নিন... মুসলমানরা মৌলবাদী, তারা সন্ত্রাসী। এভাবে যখন আপনি মৌলবাদীর চিন্তা করবেন, জনগণ সাথে সাথে একজন মুসলমানের কথাই চিন্তা করে এবং 'সন্ত্রাসী' শব্দটা চিন্তা করে।

'সন্ত্রাসী' শব্দের অর্থটা কী? একজন সন্ত্রাসী ঐ ব্যক্তি যার দ্বারা ভীতি বা ত্রাসের সঞ্চার হয়। মাঝে মাঝে শান্তি রক্ষার জন্যও ভীতির সঞ্চার করা লাগে। যখন কোনো চোর/ডাকাত পুলিশকে দেখে, সে ভীত হয়। সুতরাং চোরের জন্য পুলিশ সন্ত্রাসী। ঠিক না ভুল? আমি ইংরেজিতে কথা বলছি, আমি শব্দ নিয়ে খেলছি না। সন্ত্রাসী এমন এক ব্যক্তি যে ত্রাসের কারণ হয়। সুতরাং চোরের জন্য, অপরাধীর জন্য, সমাজ বিরোধীর জন্য, পুলিশ হলো সন্ত্রাসী। এদিক দিয়ে প্রত্যেক মুসলমানেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত।

যখনই কোনো সমাজবিরোধী লোক কোন মুসলমানকে দেখে তার ভীত হওয়া উচিত। কোনো ধর্ষণকারী যখন কোনো মুসলমানকে দেখে সে ভীত হবে। কিন্তু আমি একমত যে, সন্ত্রাসী এমন একটি শব্দ যা সাধারণ লোকদের ভীত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যারা হলো নিরপরাধ জনগণ। এ অর্থে কোনো মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়া এবং নিরপরাধ লোকদের ভীত করা উচিত নয়। কিন্তু যেখানে সমাজবিরোধীর বিষয়, চোরের বিষয়, অপরাধীর বিষয়, পুলিশ যেমন অপরাধীদের জন্য সন্ত্রাসী, মুসলমানদেরও অপরাধীদের জন্য সন্ত্রাসী হওয়া দরকার।

যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন অনেক সময়ই একই ব্যক্তির একই কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুটি লেবেল তাকে দেয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনারা জানেন বহু ভারতীয় যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। যখন ব্রিটিশরা ভারত শাসন করতো, তখন বহু ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলন। ব্রিটিশরা তাদের সন্ত্রাসী ভাবতো। তারা বলতো, এ লোকরা 'সন্ত্রাসী'। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা তাদের 'দেশপ্রেমিক' ভাবতাম। ঠিক না বেঠিক? তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। একই লোক একই কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুটি লেবেল পাচ্ছে। ব্রিটিশরা তাদের বলছে সন্ত্রাসী ভারতীয় নাগরিকরা বলছে, 'দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার যোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা।' সুতরাং লেবেল দেবার আগে আপনাকেই চিন্তা করতে হবে আপনি কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন? যদি আপনি ব্রিটিশদের সঙ্গে একমত হন, তাহলে ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসনের অধিকার ছিল। তাহলে আপনি এ লোকগুলোকে সন্ত্রাসী বলবেন। কিন্তু যদি আপনি ভারতের নাগরিকদের সঙ্গে একমত হন, যে ব্রিটিশরা ব্যবসা করতে এসেছিল এবং তারা অবৈধভাবে শাসনকার্য শুরু করেছিল, তাহলে আপনি এ লোকদের লেবেল দেবার পূর্বে, আপনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আপনার আছে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের লোকদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লেবেল পেতে পারে। এ বিষয়ে আমি বলতে চাই, যেখানে ইসলামের বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া উচিত। কারণ ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় মূল্যবোধ ও মানবতাবোধকে জাগিয়ে তোলে। আর জাগিয়ে তোলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধকে। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ১০. আমি ভিওয়ান্দি কলেজ থেকে ডাক্তার দিভারী। ভালো, প্রত্যেক ধর্মই জীবনের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান। ভুল নেই, যেখানে ধর্মের মৌলনীতি জড়িত। কিন্তু নীতি তৈরি করা এক আর নীতি প্রয়োগ করা আরেক। বাস্তবে যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই সেখানে ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। বস্তুত আমরা যা পাই (সংস্কৃত ও হিন্দুতে) ইস সনসার মেইন শান্তি প্রস্তাপিতহোনে কি বাদ অশান্তি মত ফেলাও– ইয়া পয়গাম হামে ইন মিলা হায়। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি পাই, আমরা কি উপলব্ধি করি? আমরা কিন্তু অভিজ্ঞতা পাই, তাহলো বেশিরভাগ রক্তপাতই হয়েছে ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে। সুতরাং ভুলটা কোথায়? আমি বুঝাতে চাচ্ছি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? আপনি কিভাবে ধর্মীয় নীতি এবং এ সব গণ্ডগোলের মধ্যে সমন্বয় করবেন? যা কিন্তু ধর্মের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি? ধন্যবাদ।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ অধ্যাপক সাহেব একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন যে, প্রত্যেক ধর্মই মূলত ভালো কথা বলে। কিন্তু প্রয়োগে পার্থক্য হয়। সেগুলো ভালো জিনিস শিখায় অথচ আজ পৃথিবীতে দেখুন অনেক লোকই ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে। আপনি কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করবেন? এটা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং আমি যে কথা বলেছি তার একটা অংশ এবং আমি বলেছি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের কোনো মানুষকে হত্যা করা চলবে না। এটাই ৫ নং সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

অর্থ : যে ব্যক্তি হত্যা অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করলো, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করলো। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো সে যেন সব মানুষকে রক্ষা করলো।

কীভাবে আমরা সম্মিলিত বিষয়ে আসবো? আমরা কিভাবে পার্থক্য নিরসন করবো? তাও আমি আমার বক্তব্যে বলেছি। ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

অর্থ : আসো এমন একটি বিষয়ের দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মিল রয়েছে।

মনে করুন, আপনার দশটি পয়েন্ট রয়েছে, এ দশটি পয়েন্টের মধ্যে যদি পাঁচটির মিল থাকে এবং বাকি পাঁচটির অমিল থাকে, তাহলে কমপক্ষে মিল থাকা পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি, পার্থক্যের বিষয়ে আমরা পরে আসি। আল-কুরআন ঘোষণা করে– তোমাদের ও আমাদের মাঝে যেসব বিষয়ে মিল রয়েছে সেদিকে আসো। প্রথম বিষয়টা কি? তাহলো আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবো না। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবো যে, তার কোনো অংশীদার নেই। আপনি ঠিকই বলেছেন কিভাবে এর সমাধান সম্ভব? আমি সমাধানের পদ্ধতি দিয়েছি। কিন্তু একটা পয়েন্ট নোট করার আছে তা হলো, অনেক লোক ধর্ম মানে; কিন্তু তাদের ধর্মশাস্ত্রে কি কথা আছে তা তারা জানেনা। সমস্যাটা ওখানেই। অনেক মুসলমানই জানেনা কুরআন এবং সহীহ হাদীসে কী আছে? অনেক হিন্দুই জানে না তাদের হিন্দু শাস্ত্রে কী আছে? অনেক খ্রিস্টান ও ইহুদি জানে না বাইবেলে কি আছে। দায়ী কে? নিঃসন্দেহে অনুসারীরা।

অতএব আমি লোকদের তাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বলি। পার্থক্যের বিষয়গুলোতে পরে আসি। কমপক্ষে মিলের বিষয়গুলোতে আসি। আমি ইসলাম এবং খ্রিস্টবাদের মিলের আর একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি বলি যে বিষয়ে আমাদের অমিল আছে তাতে পরে আসি। কমপক্ষে বাইবেলও কুরআনে কি বলে– আসুন আমরা মিল বিষয়গুলোতে একমত হই। যুদ্ধের সমাধান আসবে। আমি এখন কোনো বিষয়ে কথা বলছি? আমি কি কখনো কোনো ধর্মকে সমালোচনা করেছি? আমি বাধ্য হয়েছি যখন নির্দিষ্ট কিছু ভাইয়েরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করে যাতে করে আমি কিছু সত্য কথা বলতে বাধ্য হই। আপনি ভিডিও ক্যাসেট গ্রহণ করতে পারেন। আমি কোনো একটি বিষয়েও কোনো ধর্মের সমালোচনা করি নি। আমি কখনো পার্থক্যের বিষয়গুলো বলিনি। আমি শুধু মিলের বিষয়গুলোতেই এসেছি।

পার্থক্যের বিষয়ে, আমি ইসলাম এবং হিন্দু মতবাদের পার্থক্য বিষয়ে এবং ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্বের ছাত্র। আমি বিশ্ব শাস্ত্রের কোয়েটেশন দিতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। পার্থক্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি যখন প্রয়োজন তখন বলবো যখন কেউ প্রোগ্রামে ডিস্টার্ব করতে চায়, আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু আমি কখনো আমার কথায় বলিনি, আমি সাধারণ লোকদের সামনে এ ধরনের কথা বলিনি। আমি সাধারণদের বলি শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন। আপনি আপনার শাস্ত্রের নিকটে আসতে পারবেন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দিকে আসতে পারবেন। কমপক্ষে এক প্রভুতে বিশ্বাস করুন।

ইহুদিধর্ম বলে, খ্রিস্টধর্ম বলে, হিন্দু ধর্ম বলে, ইসলাম ধর্ম বলে, শিখ ধর্ম বলে, পার্সি ধর্ম বলে যে, এই এই... খোদায় বিশ্বাস করো এবং একমাত্র তারই ইবাদাত করো। কেন আপনারা অন্যান্য দেবতার পূজা করেন? ঐ পয়েন্টে আসুন... অতঃপর অন্যান্য বিষয়ে আসুন। আমরা যদি এ সমস্যার সমাধান করতে পারি, এমনকি যদি

দশটার মধ্যে একটারও মিল থাকে। কমপক্ষে এ মিল বিষয়গুলোর সাথে একমত হই। অন্যান্য পয়েন্টগুলোর মধ্যে দ্বিমত করার ব্যাপারে একমত হতে পারি। সে ব্যাপারে পরে আসি। সুতরাং আমরা যদি মিলের বিষয়গুলোতে আগে আসতে পারি, তুলনামূলক অধ্যয়নের পরে বিশ্বাস করুন বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সেটাই আমি করছি।

আমি বিশ্বব্যাপী সফর করেছি। আমি অমুসলিম শ্রোতাদের মধ্যে বক্তব্য দিয়েছি। তাদের অনেকেই তাদের শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে প্রশ্ন ছুঁড়েছে। এমনকি মুসলমানরাও তাদের শাস্ত্র সম্পর্কে সচেতন নয়। সুতরাং তারাও এমন প্রশ্ন করে যে বিষয়ে তারা সচেতন নয়। অতএব আমি তাদেরকে কুরআন হাদীস, বেদ ও বাইবেলের শিক্ষা দেই এবং আমি যখন উদ্ধৃতি দিই, আমি রেফারেন্স নাম্বার দিই যাতে কেউ বলতে না পারে তা! জাকির দ্রুত টেনে যাচ্ছে এবং এ সব শাস্ত্র যার উদ্ধৃতি আমি দিই। এ মওজুদ আছে। আমাদের লাইব্রেরিতে বেদ-এর বিভিন্ন অনুবাদ রয়েছে। আমাদের শতশত প্রকারের বাইবেল আছে। সুতরাং আপনি যে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট– আপনি ইহুদি, প্রোটেস্ট্যান্ট অথবা ক্যাথলিক হোন না কেন। আমি তাদের নিজ নিজ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলি। সুতরাং আপনি যদি বলেন জাকির ভুল করেছে, তখন আপনাকে বলতে হবে শাস্ত্রে ভুল আছে। আমি উদ্ধৃতি দেই...এবং আমার বেশির ভাগ বক্তব্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি রয়েছে। যদি আপনি শাস্ত্রের সাথে দ্বিমত করেন সেটা আপনার ব্যাপার। যদি আপনি দ্বিমত করতে চান তাহলে এজন্য আপনাকে স্বাগতম। কারণ কুরআন বলে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ لا قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج

অর্থ : ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই, মিথ্যা থেকে সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

আমি আপনার নিকট হিন্দু মতবাদের সত্যটি পেশ করছি। যদি আপনি একমত হতে চান হতে পারেন। যদি আপনি একমত না হতে চান না হতে পারেন। সেখানে একটি সিম্পোজিয়াম ছিল। তৃতীয় ক্যাসেটে যেটা ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মে খোদার ধারণা। লোকেরা একে বিতর্ক বলতে পারে। একজন হিন্দু পণ্ডিত কেরালা ও কলিকট থেকে, একজন খ্রিস্ট পণ্ডিত এসেছিলেন কালিকট থেকে, আমি নিজে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। এটা ছিল সাড়ে চার ঘণ্টার বিতর্ক...-এর ক্যাসেটও বাইরে পর্যাপ্ত রয়েছে। হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের পণ্ডিতগণ ছিলেন আমি তো শুধু একজন ছাত্র। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করছিলাম। যেটা শ্রোতামণ্ডলীর বিচারের ওপর ছিল। আমি মিলগুলো তাদের শাস্ত্রের অধ্যায় ও শ্লোক নাম্বারসহ উদ্ধৃত করছিলাম। সর্বোত্তম পন্থা হলো লোকদের মিল বিষয়গুলোর প্রতি একমত হওয়ার আহ্বান করা। পার্থক্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে পরে বলুন। আশা করি উত্তর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ১১. মিঃ রাজু মালহোটরা জিজ্ঞেস করছেন ইসলাম শান্তির ধর্ম তবে কীভাবে এটা তরবারির মাধ্যমে ছড়িয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্ন করেছেন...যদি ইসলাম শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে, তবে কীভাবে এটা তরবারির মাধ্যমে প্রচার লাভ করল? ইসলাম শব্দটি মূল سلام (সালাম) থেকে এসেছে। যার অর্থ 'শান্তি' এর আরেক অর্থ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট। সংক্ষেপে ইসলাম অর্থ– ঐ শান্তি যা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কিন্তু পূর্বে আমি যেমন উল্লেখ করেছি, পৃথিবীর সকলেই পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক তা চায় না। কিছু সমাজ বিরোধী লোক আছে যারা নিজেদের স্বার্থে শান্তি চায় না, এ ধরনের লোকেরা চোর-ডাকাত ও অপরাধীদের সঙ্গে হাত মেলায়। যদি শান্তি থাকে তাহলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব তাদের নিজেদের স্বার্থে কিছু লোক আছে তারা চায় না যে, সমাজে শান্তি বজায় থাকুক। সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা লাগতে পারে, পুলিশ লাগে ইত্যাদি। এভাবে ইসলাম শান্তির জন্য তবে মাঝে মাঝে সমাজবিরোধী লোকদের তাদের স্বস্থানে বাধ্য রাখতে ক্ষমতা/শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে এবং এ প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর হলো...ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচারিত হয়েছে এ তথ্য ডিলে সী ওলারীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। যে হলো অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিখ্যাত। তাঁর "Islam at the Cross Roads" বইতে ৮ম পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, ইতিহাস একে পরিষ্কার করেছে যে, সারা পৃথিবীতে অনুরক্ত মুসলমানদের সাধু জীবনী যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ছড়িয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় লাভ করেছে, এ হলো উদ্ভট ও অযৌক্তিক কল্পকাহিনী, যাকে ঐতিহাসিকগণ বারবার উল্লেখ করেছেন।

আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, আমরা মুসলমানরা পৌনে ৮শত বছরের ওপরে স্পেন Spain শাসন করেছি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা আসলো এবং মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করলো। এমনকি প্রকাশ্যে আযান দেবার মতো একজন মুসলমানও ছিল না। আমরা কোনো শক্তি প্রয়োগ করিনি। আপনারা জানেন আমরা আরবে চৌদ্দশত বছরেরও ওপরে শাসন করছি। অল্প কয়দিনের জন্য ব্রিটিশরা এসেছিল, অল্প দিনের জন্য ফরাসিরাও এসেছিল; কিন্তু সর্বোপরি আরবের রাজত্বে মুসলমানরাই ১৪০০ বছরের মতো দখল করে রেখেছিলেন। আপনারা কি জানেন এখনো আরবে ১৪ মিলিয়ন কপটিক খ্রিস্টান আছে। কপটিক খ্রিস্টান হচ্ছে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খ্রিস্টান। যদি মুসলমানরা চাইতেন তাহলে প্রত্যেক অমুসলিমকে তরবারির মাধ্যমে মুসলমানে পরিণত করতে পারতেন; কিন্তু আমরা করি নি। ১৪ মিলিয়ন আরব, যারা কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসারিত হয় নি।

আপনারা জানেন ভারত শতশত বছর মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল এবং আমরা তরবারি ব্যবহার করিনি। যদি কিছু লোকে ভুল করে, আপনি সবাইকে ধরতে পারেন না এবং ঐ কারণে ধর্মকে দোষারোপ করতে পারেন না। যদি কিছু লোক ধর্মের অনুসরণ না করতে পারে এটা তাদের দোষ। আপনি খ্রিষ্টধর্মকে এ কারণে খারাপ বলতে পারেন না যে, হিটলার ছয় মিলিয়ন ইহুদিকে হত্যা করেছিল। যদি হিটলার ছয় মিলিয়ন ইহুদীকে পুড়িয়ে থাকে তার জন্য খ্রিস্ট ধর্মকে দোষারোপ করতে পারেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কলঙ্ক থাকে। আমরা মুসলিমরা শত শত বছর ভারত শাসন করেছি এবং আমরা যদি চাইতাম আমরা প্রত্যেকটি অমুসলিমকে তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা মুসলিমে পরিণত করার জন্য জোর করতে পারতাম। আমরা তা করিনি। আজ শতকরা ৮০ ভাগ ভারতীয় অমুসলিম এ সাক্ষ্য দিচ্ছে, আপনারা যারা অমুসলিম এখানে রয়েছেন তারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রচার হয় নি। যদিও আমাদের ক্ষমতা ছিল আমরা তা করিনি। যেহেতু ইসলাম তাতে বিশ্বাস করে না।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান। কোন্ মুসলমান সৈন্য সেখানে গিয়েছিলেন? কোন্ মুসলমান সৈন্য মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন? যাতে শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমান জনতা রয়েছে। কোন্ সৈন্য বাহিনী সেই আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? কোন্ মুসলিম সৈন্য? কোন্ তরবারি? থমাস কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Heroes and Hero Worship'-এ এর উত্তরে লিখেছেন যে, আপনাকে এ তরবারি পেতে হবে, কিছু শুভ ইচ্ছে এটা করতে পারে, যে তার তরবারির মাধ্যমে প্রচার করা উচিত। সারা পৃথিবীতে একটি নতুন মত প্রাথমিকভাবে শুরু হয় একজনের মনে, এক ব্যক্তি সব মানবতার বিরুদ্ধে। এটা খুবই সামান্য কল্যাণ করে যে, সে তরবারি নিয়ে তা প্রচার করে। কোন্ তরবারি? যদি আমাদের তরবারি থেকেও থাকে আমরা একে ব্যবহার করিনি। ২ নং সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ لا قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ......

অর্থ : দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই, মিথ্যা থেকে সত্য প্রকাশিত হয়েছে। যে কেউ আল্লাহর হাতকে আঁকড়ে ধরে এবং শয়তানের হাতকে প্রত্যাখ্যান করে সে মূলত সর্বশক্তিমানের হাতকেই আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছুটবে না।

যে কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে ... আল্লাহ তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন, আর যে কেউ শয়তানের ওপর বিশ্বাস করে যে, তাকে আলো থেকে

অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। কোন তরবারি? বুদ্ধির তরবারি। ১৬ নং সূরা আন নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

অর্থ : ডাক তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর তাদের সাথে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।

"Plain Truth" নামক ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল। যেটা 'রিডার্স ডাইজেস্টের আল-ম্যানেজার ১৯৮৬-এর একটা পুনর্মুদ্রণ ছিল। এটা বিশ্ব ধর্মের ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত ৫০ বছরের বর্ধনশীলতার পরিসংখ্যান দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে, বড় বড় ধর্মের মধ্যে এক নম্বর বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। এটা হলো ৩৫%। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ অমুসলিমকে মুসলিম বানানোর জন্য কোন্ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? আপনারা কি জানেন বর্তমানে আমেরিকার সবচেয়ে বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম? যে আমেরিকানদের তরবারির আগা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে? ইউরোপের তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাদের একাজ করতে বাধ্য করছে? আল-কুরআন কমপক্ষে তিন স্থানে এর জবাব দিচ্ছে–

৯ নং সূরা তাওবার এর-৩৩ নং আয়াতে;

৪৯ নং সূরা ফাত্হর এর-২৮ নং আয়াতে

৬১ নং সূরা আস্সফ-এর ৯ নং আয়াতে

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি তাকে (সত্য দীনকে) সব বাতিল ধর্মমতের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।

ইসলাম সবার ওপর বিজয় লাভ করতে, সবাইকে পরিচালনা করতে, সবার ওপর কর্তৃত্ব করতে এসেছে। সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

আমি এ প্রশ্নের উত্তর ড. আদম পায়ার্সন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই, যিনি বলেছেন, যেসব লোকে ভয় পায় যে, একদিন আরবদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র পতিত হবে, তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা পতিত হয়েছে– এটা সেদিনই নিক্ষিপ্ত হয়েছে যে দিন নবী মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ১২. মিঃ সুনিল জিজ্ঞেস করছেন যে, ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রচার করছে, সেখানে মুসলমানদের মাঝে কেন বিভিন্ন উপদলের বিভক্তি রয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্নটি ছোঁড়া হয়েছে যে, যেখানে ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রচার করছে, কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্তি দেখা যায়? এর উত্তর ৩ নং সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ط

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আল্লাহর রজ্জু কি? মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু। এতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের আল্লাহর রজ্জু ধারণ করতে হবে এবং তাদের বিভক্তি হওয়া চলবে না এবং আল-কুরআন ৬ নং সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ط اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

অর্থ : নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে টুকরো করে নিজেরাই নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই আপনার ওপরে নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে। (আল্লাহর নিকট ফিরে গেলে) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হবে।

অর্থাৎ ইসলামে বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উপদল সৃষ্টি প্রত্যেকের জন্য ইসলামে নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু যখন আপনারা সুনির্দিষ্ট কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি? কেউ বলে আমি হানাফী, কেউ বলে আমি শাফী, কেউ বলে আমি হাম্বলী, কেউ বলে আমি মালেকী। আমাদের প্রিয়নবী কি ছিলেন? তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন? তিনি কি হাম্বলী ছিলেন? তিনি কি মালেকী ছিলেন? তিনি কি ছিলেন? তিনি মুসলিম ছিলেন।

আল-কুরআনের ৩ নং সূরা আলে-ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– যীশু একজন মুসলিম ছিলেন। এ সূরার ৬৭ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে– ইবরাহীম (আ) মুসলিম ছিলেন। অতএব আমাদের প্রিয়নবী কি ছিলেন। তিনি মুসলিম ছিলেন। ৪১ নং সূরা হা-মীম আস সাজদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ : তার কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও সৎ কাজ করে আর বলে আমি মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এরপরও যখন কেউ প্রশ্ন করে 'আপনি কী?' আপনার বলা উচিত 'আমি একজন মুসলমান।' আমার কোনোই আপত্তি নেই যদি কেউ বলে, আমি নির্দিষ্ট রায়, নির্দিষ্ট মত যেমন ঃ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র)-এর মতানুসরণ করি। আমি এসকল পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করি। কেউ যদি কিছু ইমাম শাফেয়ী ও কিছু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসরণ করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করে 'আপনি কী?' আপনার উত্তর দেয়া উচিত যে, আপনি মুসলিম।

আর পূর্বে যে ভাই দাবি করলেন, পূর্বে আল-কুরআন বলেছে ৭৩টি দল হবে। তিনি যেটা বলছিলেন সেটা হলো প্রিয়নবী করীম ﷺ এর বাণী, যা আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস নং ৪৫৭৯ এতে বলা হয়েছে, ইসলাম ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। এবং আপনি যদি নবী করীম ﷺ এর কথাকে নোট করেন তিনি বলেন, দীন বিভক্ত হবে। তিনি বলেন নি, তোমাদের ধর্মকে ভাগ করা উচিত। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যদি কুরআন বলে, 'বিভক্ত হয়ো না'। মুসলমানরা বিভক্ত হতে বাধ্য। আরেকটা হাদীস যেটা তিরমিযী শরীফে উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীস নং ১৭১ প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেন, যেখানে ৭৩টি উপদল হবে এবং একটি দল ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামে যাবে। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন কোন্ দলটি? নবী করীম ﷺ বলেন, যা নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের পথ এবং ঐটি যা কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করে সেই সত্য পথে রয়েছে। ইসলাম বিভক্তিতে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকে যে কুরআন হাদীস অনুসরণ করে সে মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মকে বিভক্ত ও উপদলে ভাগ করার বিপক্ষে। সুতরাং আপনি যদি কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস অধ্যয়ন করেন। মুসলমানদের কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের অনুসরণে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। আশা করি সেটাই প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ১৩. আমি লাক্সম্যান ডকরাস গুরুজী এবং আমি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন্টি প্রকৃত গ্রহণীয় পথ। আমরা কোন্ বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিব? ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, নাকি রাজনীতিকে? আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই একটি প্রশ্ন রেখেছেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রসারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কি, এটা কি ধর্ম, নাকি সমাজবিজ্ঞান, নাকি রাজনৈতিক কাজ-কর্ম? ভাই আমি পূর্ণ বিষয়ের ওপর একটি বক্তৃতা দিয়েছি। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করবো না। আমার উত্তর একই হবে। সব ধর্মের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কাজটি করা দরকার তাহলো এক আল্লাহতে বিশ্বাস করা এবং শুধু তাঁরই ইবাদাত করা। সেটাই মৌলিক অগ্রাধিকার। মৌলিক অগ্রাধিকার সমাজবিজ্ঞান কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়। সেটা পরে আসবে। রাজনীতি সীমিত ভ্রাতৃত্বের ওপর কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানও সীমিত। এক আল্লাহতে বিশ্বাসই হলো সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। তিনিই একক সত্তা যিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানবকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সাদা-কালো, ধনী-গরিব সবাইকে। সুতরাং আপনি যদি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁরই ইবাদাত করেন, তাহলেই শুধু বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হবে। আশা করি এটাই প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন ১৪. মি. প্রভু জিজ্ঞেস করছেন, সব ধর্মই মূলত ভালো জিনিস প্রচার করে। এভাবে একজন যেকোনো ধর্মই অনুসরণ করতে পারে। এটা কি একই কথা নয়?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সব ধর্মই মৌলিকভাবে ভালো জিনিস শিক্ষা দেয়। সুতরাং আপনি যেকোনো ধর্ম অনুসরণ করতে পারেন। এটা কি একই রকম নয়?

আমি তার সঙ্গে প্রশ্নের প্রথম অংশের বিষয়ে একমত যেসব ধর্মই মূলত ভালো জিনিস প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ, সব ধর্মই মিনতি করে, তোমাদের চুরি করা উচিত নয়, তোমাদের কোনো নারীকে উত্যক্ত করা উচিত নয় এবং তোমাদের তাকে ধর্ষণ করা উচিত নয়। হিন্দুধর্মে এটা বলে খ্রিস্টধর্মে এটা বলে, ইসলাম এটা বলে। কিন্তু ইসলাম এবং অন্য ধর্মের বলার সাথে সাথে ঐ সব ভালো জিনিস বাস্তবায়নের পন্থাও বলে দেয়। যেমন সব ধর্মই ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। কিন্তু ইসলাম বাস্তবে দেখায় কীভাবে প্রাত্যহিক জীবনে তার অনুশীলন করতে হবে, সালাত, হজ্জ ইত্যাদিতে। এভাবে ইসলাম তত্ত্বদানের সাথে সাথে দেখায় কীভাবে এটা আপনার জীবনে কার্যকরি করবেন। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু মতবাদে বলা হয়, তোমরা চুরি করো না, খ্রিস্টধর্মে বলে তোমরা চুরি করো না, ইসলাম বলে চুরি করো না। সুতরাং ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে পার্থক্য কী? ইসলাম আপনাকে এমন অবস্থানে পৌছানোর পথ দেখায় যেখানে গেলে লোকেরা চুরি করবে না।

ইসলামে যাকাত দানের পদ্ধতি রয়েছে। তাহলো প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির যার সঞ্চয় নিসাব পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের সমান হয় তার ২.৫% প্রত্যেক চন্দ্র বছরে প্রদান

করতে হবে। যদি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত দিতো তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য মূলোৎপাটিত হতো। একজন ব্যক্তিও না খেয়ে মারা যেত না।

এরপর ৫নং সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط

অর্থ : চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের হাত কেটে দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে।

কিছু লোক বলতে পারে, হাত কাটা তাও এই বিংশ শতাব্দীর যুগে! সুতরাং ইসলাম একটা অসভ্য ধর্ম, এটা নিষ্ঠুর আইন এবং আমি জানি হাজার হাজার লোক আছে চুরি করে, যদি আপনি সব লোকের হাত কেটে দেন, তাহলে বহু লোক তাদের হাত হারাবে। কিন্তু আইনটা এতো কঠিন যে, যদি এটা কার্যকরি করা হয় এবং কোনো ব্যক্তি জানতে পারে যে, যদি সে চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মন থেকে চুরির চিন্তা উধাও হয়ে যাবে।

আপনারা নিশ্চয় জানেন আজ আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সেদেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ পরিমাণ চুরি ডাকাতি হচ্ছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যদি আপনি আমেরিকাতে ইসলামী শরিআহ্ কার্যকরি করেন যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে তার বর্ধিত সম্পদের, যদি ২.৫% যাকাত দানে উদ্বুদ্ধ করা হয়, এরপর কোনো নারী পুরুষ যদি চুরি করে, এরপর তার হাত কেটে ফেলা হয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, তাহলে আমেরিকার চুরি, ডাকাতি কি বৃদ্ধি পাবে? নাকি সমান সমান থাকবে, নাকি কমবে? অবশ্যই এ অনুপাত কমবে, যেহেতু এটা বাস্তব আইন। আপনি শারিআহ্ কার্যকরি করবেন এবং ফলাফলও পাবেন।

আসুন আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই। বেশিরভাগ ধর্মই বলে, তোমার কোনো নারীকে উত্যক্ত করা উচিত নয়। তোমার কোনো নারীকে ধর্ষণ করা উচিত নয়। হিন্দুমতে তা বলে, খ্রিস্টধর্মে তা বলে, ইসলাম একই কথা বলে। কিন্তু ইসলাম ঐ অবস্থানে পৌছাতে পারে। যাতে পুরুষরা নারীদের উত্যক্ত করবে না, ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করেছে, লোকেরা সাধারণত নারীদের পর্দার কথা বলে কিন্তু আল্লাহ পবিত্র কুরআনে প্রথম পুরুষের হিজাবের (পর্দার) কথা বলে। অত:পর নারীদের পর্দার কথা বলে। ২৪ নং সূরা আন নূরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط

অর্থ : মুমিনদের বলুন তারা যেন নিজেদের চক্ষুকে নিচু রাখে ও লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে।

যখনই কোনো নর কোনো নারীকে দেখবে এবং কোনো কু-চিন্তা তার মনে আসবে, অথবা লজ্জাহীনতার কোন আলামত তার মনে আসবে তার দৃষ্টি অবনত করা তার জন্য উচিত হবে। একদা আমার এক বন্ধু যে ছিল মুসলমান বন্ধু, সে এক বালিকার দিকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকিয়ে ছিল। সুতরাং আমি তাকে বললাম, ভাই আপনি কি করছেন? ইসলামে কোনো বালিকার দিকে তাকিয়ে থাকা নিষেধ। উত্তরে সে আমাকে বললো, প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রথম দৃষ্টি জায়েয এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ এবং এখনো আমি আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেকও শেষ করি নি প্রিয়নবী করীম ﷺ তাঁর বক্তব্য প্রথম দৃষ্টি অনুমোদন এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি বলেন নি যে, তুমি একজন নারীর দিকে একাধারে ২০ মিনিট পর্যন্ত কোনোরূপ পলক না ফেলেই তাকিয়ে থাকবে। নবী করীম ﷺ যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো, যদি তুমি কোনো নারীর দিকে অনিচ্ছায় দৃষ্টিপাত করে ফেল, তাহলে দ্বিতীয়বার তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকিও না, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না, এটাই নবী করীম ﷺ বুঝিয়েছেন।

পরবর্তী আয়াতে নারীদের হিজাবের কথা বলা হয়েছে। ২৪ নং সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ -

অর্থ : হে নবী! মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, নিজে নিজে প্রকাশিত হওয়া ছাড়া তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। আর তারা তাদের বক্ষদেশে যেন অতিরিক্ত কাপড় ফেলে রাখে, আর তাদের স্বামীদের ছাড়া .... অন্যদের সামনে যেন নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে।

মুহরিম অর্থাৎ ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের একটা বড় তালিকা দেয়া হয়েছে যাদেরকে সে বিয়ে করতে পারে না এবং সেখানে পর্দার মৌলিক ছয়টি বিষয় আছে।

প্রথমত, বিস্তারিত যা হলো নারী পুরুষের মধ্যে। পুরুষের পর্দা হলো নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর নারীর পূর্ণ দেহ আবৃত থাকতে হবে। শুধু যে অংশটা দেখা যাবে তাহলো দুহাত ও চেহারা হাতের কব্জি পর্যন্ত। কিছু পণ্ডিত বলেন...। এমনকি এ দুটি অঙ্গও ঢাকা থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যে পোশাক তারা পরবে তা এমন টাইট হতে পারবে না যে, অঙ্গের আকৃতি দেখা যায়।

তৃতীয়ত, পোশাক এতোটা স্বচ্ছ ও পাতলা হতে পারবে না যার মধ্যদিয়ে ভেতরের অংশ দেখা যায়।

চতুর্থত, এ পোশাক এতটা উজ্জ্বল ও অদ্ভুত হতে পারবে না, যাতে বিপরীত লিঙ্গের লোকদের আকৃষ্ট করে।

পঞ্চমত, অবিশ্বাসীদের সদৃশ বা তাদের ধর্মীয় বা জাতীয় পরিচয় বহন করে এমন পোশাক পরা যাবে না।

ষষ্ঠত, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক হতে পারবে না। অর্থাৎ পুরুষের পোশাক নারীরা অথবা নারীদের পোশাক পুরুষরা পরতে পারবে না।

এ হলো হিজাবের ছয়টি মূল বিষয় যা কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী সংকলিত।

৩৩ নং সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে হিজাব বা পর্দার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ط ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের অংশ চেহারার ওপর টেনে দেয়, এটা অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায়। এবং তাদের কষ্টও না দেয়া হয়। (পূর্বের বিষয়ে) আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

আল-কুরআন বলে, হিজাব নারীদের জন্য এ কারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে তারা উত্যক্ত করা থেকে রক্ষা পায় এবং ইসলামী শরিআহ বলে, যদি কেউ কোনো নারীকে ধর্ষণ করে তাহলে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড। লোকেরা বলতে পারে যে এই বিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ শাস্তি একটি নিষ্ঠুর আইন এবং যেহেতু ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করেছে এটি একটি অসভ্য আইন।

আপনি কি জানেন যাকে আপনারা সবচেয়ে উন্নত দেশ বলেন, যেখানে সর্বোচ্চ হারে ধর্ষণ হচ্ছে? পরিসংখ্যান অনুযায়ী গড়ে সেখানে প্রত্যেক দিন ১,৯০০ এরও অধিক নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। যখন আমি এই অডিটোরিয়ামে আছি আড়াই ঘণ্টা যাবত। কতজন ধর্ষিতা হয়েছেন? কতজন? একশতেরও অধিক। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি আপনি আমেরিকায় ইসলামী শরিয়াহ বাস্তবায়ন করেন, তাহলে প্রত্যেক লোক যখন মহিলাদের দিকে তার দৃষ্টি যাবে সে তার চোখ নামিয়ে নিবে,

মহিলা যথাযথভাবে হিজাব পরিধান করবে এবং এরপরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হবে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তাতে কি ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, সমান হার থাকবে, না কমবে? এটা নিশ্চিতই কমবে। কারণ এটা বাস্তব আইন। আপনারা শরিয়াহ বাস্তবায়ন করেন, ফলাফল পাবেন।

আমি বহুদিন যাবত অমুসলিমদের এ প্রশ্ন করে আসছি,. "মনে করুন দুর্ভাগ্যবশত কেউ আপনার স্ত্রী বা আপনার মাকে ধর্ষণ করলো এবং আপনি যদি বিচার করেন এবং ধর্ষককে যদি আপনার সামনে হাজির করা হয়, তাকে আপনি কি ধরনের শাস্তি দিবেন? আমাকে বিশ্বাস করুন, তাদের সবাই বলেছে, 'আমরা তাকে হত্যা করবো। কেউ কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেছে, আমরা তাকে শাস্তি দিতে দিতে মারবো। সুতরাং কেন আপনাদের এই দ্বিমুখী নীতি? কেউ যদি অন্য লোকের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তখন এ শাস্তি হয়ে যায় অসভ্য আইন অথচ সেই লোকই আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে আপনি তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিবেন। কেন এ দ্বিমুখী নীতি?

আপনারা জানেন ভারতে ক্রাইম ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি ধর্ষণের কেস রেকর্ড করা হয়। কতগুলো স্থানে? মাত্র কয়েক মিনিটে হতে পারে একটা কেন এবং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যদি আপনি দশ দিন আগের পেপার পড়ে থাকেন, ২০ অক্টোবরের পত্রিকা, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল. কে. আদভানী আপনি কি জানেন তিনি কি বলেছেন? এটা তো The Times of India-(দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া) এর প্রধান শিরোনামে এসেছে– এতে যা বলা হয়েছে "আদভানী ধর্ষকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করেছেন এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করেছেন। এ বক্তব্য ২০ অক্টোবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রধান শিরোনামে এসেছে, দশ দিন পূর্বে। মঙ্গলবারে একদিন পূর্বে ২৭ আক্টোবর ১৯৯৮ তিনি বলেছেন যে, তিনি ধর্ষকদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড চান। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম যা বলেছে ১৪০০ বছর পূর্বে এল. কে. আদভানী একই কথা বলছেন এবং আমি এজন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। আমি এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে আসি নি; আমি রাজনীতিবিদ নই; কিন্তু যদি কেউ সত্য কথা বলে, আমাকে তার উৎসাহিত করা উচিত এবং যদি আপনারা (একে বাস্তবায়ন করতে পারেন, নিশ্চিত যে ধর্ষণের হার নিঃশেষের দিকে চলে যাবে।)

হতে পারে যে, পরবর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে ইসলামী হিজাব কার্যকর করবেন। সুতরাং আমরা আশা করবো ইনশাআল্লাহ ধর্ষণ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যাবে। তারাও ইসলামের নিকটে আসছেন। আমি একে মনে করি আমাদের ও আপনাদের মধ্যেকার মিলিত বিষয়গুলোর একটি উদাহরণ। মি. এল. কে. আদভানী উপলব্ধি করেছেন যে, ভারতে ধর্ষণ দিন দিন বাড়ছে এবং তিনি সঠিকভাবেই সেই সুপারিশ করেছেন যে, আইনের সংশোধন করা উচিত এবং ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডই দেয়া

উচিত। আর আমি এর পক্ষে, ভারতের সমর্থকদের মধ্যে আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি। সুতরাং আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, ভালো জিনিস বলার সাথে সাথে ইসলাম সে পথও দেখায় যার মাধ্যমে আপনি ভালোর অবস্থানে পৌঁছতে পারেন।

অতএব আমি বলি ইসলাম অন্য ধর্মের মতো নয়, ইসলাম ভালো জিনিস বলে, আবার আপনাকে সে পথ দেখায় যার মাধ্যমে ভালো অর্জন করতে পারবেন। সুতরাং যদি আমাকে কোনো ধর্মের অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে সে ধর্মেরই অনুসরণ করবো যাতে ভালো জিনিসের কথাও বলে আবার ভালো অর্জন করার যথাযথ রাস্তাও বাতলে দেয়। এটাই ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ .

অর্থ : আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একই ধর্ম হলো ইসলাম (যার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।)

প্রশ্ন ১৫. আমার নাম মনোজ রাইচা, আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে, 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের' নামে আপনি ইসলামের প্রচারই করছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে আপনি যখন 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' সম্পর্কে বলছেন, তাহলে আপনার বিষয়টা ব্যাখ্যা করুন যে ভ্রাতৃত্ব শুধু মুসলিমদের জন্য নাকি আপনি যাদের 'কাফির' বলেন, তাদের জন্যও? যারা আর যাই হোক মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে পড়ে না, এটাই যথেষ্ট হবে।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা একটা প্রশ্ন করেছেন যে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের নামে আমি ইসলামের প্রচার করছি। ধরুন, আমাকে বলতে হয় "আপনি কাপড় সম্পর্কে জানেন... আমি বাজারের ভালো কাপড়ের কথা বলি।" সুতরাং এটা বাস্তব, আমি রায়মণ্ড কাপড়ের কথা বলছি, যেটা সর্বোত্তম কাপড়, যাহোক আমি রায়মণ্ডের কোনো ভর্তুকি পাই না, এটা শুধু একটা উদাহরণ, আমি রায়মণ্ডের ডিলার নই। কিন্তু আমি যদি বলি রায়মণ্ড হলো সর্বোত্তম কাপড় এবং কথা যদি বাস্তবের সাথে মিল থাকে, আমাকে বলতে হবে। ধরুন, আমি যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার কে? এবং আমি যদি x y z যেকোন ব্যক্তির নাম বলি এবং তিনি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার প্রচার করবই।

আমি বলছি যে, ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের' কথা বলে এবং এটা অর্জন করার পথ দেখায়। আপনার প্রশ্নানুপাতে যে 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' আপনি কি মুসলিম অমুসলিম সবার ভ্রাতৃত্ব বুঝাচ্ছেন, নাকি শুধু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা বলছেন?

ইসলামের 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব' হলো যে, সব মানুষ আপনার ভাই এবং আমি আমার বক্তব্যে এটাকে পরিষ্কার করেছি। আমি বাক্যে কোনরূপ কোমলতা করিনি। আমি একেবারে পরিষ্কার করেছি, হতে পারে এটা স্লিপ হয়েছে, হয়তো আপনি এটা শুনেন নি'। আমি আমার বক্তব্য সূরা আল-হুজুরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম। ৪৯ নং সূরা আল-হুজুরাতের ১৩ নং আয়াত–

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ .

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে এবং তোমাদের গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত করেছি, তোমাদের পরিচিতির জন্য। আল্লাহর নিকট সেই বেশি সম্মানিত যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সব মানব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে, সে ব্যক্তি তাকওয়া বা সৎপথ প্রাপ্ত। আমার দু জন ভাই আছে, একজন ব্যক্তি হিসেবে ভালো। বাস্তবে আমার ভাই একজনই। ধরুন, আমার দু'জন ভাই আছে, একজন মেডিক্যাল ডাক্তার, এ ভাইয়ের মতো, যিনি রোগীর চিকিৎসা করেন, তাদের আরোগ্য করেন। অন্য ভাই মদ্যপ, যে কিনা ধর্ষক। দু জনই আমার ভাই। কোন্ ভাই ভালো? স্বাভাবিকভাবেই যে ভাই ডাক্তার, যিনি মানুষের চিকিৎসা করেন এবং সমাজের কারো কোনো ক্ষতি করেন না। তিনিই ভালো অন্যজনও আমার ভাই, কিন্তু ভালো ভাই নন। এমনিভাবে সব মানুষই আমার ভাই, কিন্তু তারা আমার বেশি নিকটবর্তী যাদের তাকওয়া আছে, যাদের সততা আছে এবং আছে খোদাভীতি, তারাই আমার নিকটবর্তী। এটা খুবই পরিষ্কার। আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, আমি তা পুনরাবৃত্তি করলাম। আশা করি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬. আপনি হিন্দু মতবাদ, ইসলাম এবং খ্রিস্টবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ তিন ধর্মেই ভালো জিনিস আছে, বিশেষ করে ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে, আপনি হিন্দু এবং খ্রিস্ট ধর্মের ভ্রাতৃত্বের কথা বলেন নি।

উত্তর : ডা. জাকির ঃ দাদা বলেছেন যে, আমি ইসলামের ভালো জিনিস বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছি; কিন্তু আমি হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের ভালো জিনিস সম্পর্কে বলি নি'। আমি নির্দিষ্ট কিছু ভালো জিনিস সম্পর্কে বলেছি। আমি হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মের সব ভালো জিনিস সম্পর্কে কথা বলি নি। কারণ এখানে এসব জিনিস সবার পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। আমাকে ধৈর্য ধরতে হয়। আমি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানি এবং আমি বাইবেল অধ্যয়ন করেছি, আমি হিন্দুশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছি। আমি যদি এ বিষয়ের ওপর কথা বলি, আমি এখানে ফাটল সৃষ্টির জন্য নয়। আমার কাজ হলো এখানে

মিল বিষয়ে আলোচনা করা। সুতরাং মিল যা আছে তা সম্পর্কেই কথা বলব। হিন্দুধর্মে বলে চুরি করো না, খ্রিস্টবাদ বলে চুরি করো না, উত্যক্ত করো না, ধর্ষণ করো না। সুন্দর ভ্রাতৃত্বের অন্য জিনিসগুলো, আপনি কি জানেন, কেবল স্যাম্পল হিসেবে আমি আপনাকে দিচ্ছি। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, যা মথির গস্‌পেলে উল্লেখ আছে– অধ্যায় নং ১০ শ্লোক নং ৫ ও ৬ এতে বলা হয়– এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি রাসূলদের বলেছেন, তোমরা জেনটাইলস এর রাস্তায় যেও না, বরং ইস্রাঈলের ঘর থেকে হারানো ভেড়ার দিকে যাও। জেনটাইলস কারা? অইহুদি, হিন্দু, খ্রিস্ট তারা হলো জেনটাইলস। শূকরের গলায় মুক্তার মালা দিও না। তিনি আমাদের শূকর বলেছেন। আপনি আমাকে কি সে সম্পর্কে কথা বলতে বলেছেন? যীশুখ্রিস্ট মথির গস্‌পেলে ১৫ নং অধ্যায় শ্লোক নং ২৪-এ তিনি বলেন–

আমি শুধু প্রেরিত হয়েছি ইস্রাঈলের ঘর থেকে হারানো ভেড়ার জন্য।

আমি অধ্যায় ও শ্লোক নম্বর উল্লেখ করেছি। এর অর্থ ধর্ম ইহুদিদের জন্য, বিশ্ববাসীর জন্য নয়।

অন্যান্য ধর্মে, বৈরাগ্যবাদের ওপরে বিশ্বাস আছে। আপনি যদি আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চান, আপনাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে। বেশির ভাগ বড় বড় ধর্মে বিশেষত হিন্দু ও খ্রিস্ট ধর্মে বলে, খোদার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আপনাকে দুনিয়া ত্যাগী হতে হবে।

আল-কুরআনের ৫৭ নং সূরা হাদীদের ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে এটা বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে। বৈরাগ্যবাদের অনুমতি ইসলামে নেই। আমাদের প্রিয়নবী করীম ﷺ বলেছেন– ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই। একথা সহীহ্ বুখারী ভলিউম নং ০৭ কিতাবুন নিকাহ ৩ নং অধ্যায়, ৪ নং হাদীস হে যুবকেরা! যাদের বিবাহের সামর্থ্য আছে, তাদের বিবাহ করা উচিত। – হাদীস একথা বলে।

আমি যদি একমত হই যে, আপনি যদি দুনিয়া ত্যাগী হন, তাহলে আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন, আজ যদি পৃথিবীর সব মানুষ দুনিয়া ত্যাগী হয়, তাহলে ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে একজন মানুষও জীবিত থাকবে না। যদি দুনিয়াব্যাপী সবাই এ আইন মেনে চলে, তাহলে কোথায় সেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব? অতএব ভাই! আমাকে একটা ভালো বিষয়ের ওপরই কথা বলতে হবে, অন্যথা আপনাকে অন্য ধর্মের ওপর জ্ঞানার্জন করতে হবে। এটা আমার কাজ। আমাকে সত্যই বলতে হবে। আল-কুরআনের ১৭ নং সূরা বনি ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যা বিদায় হওয়ার জন্যই।

আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, শ্রোতৃমণ্ডলীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত ডা. জাকির নায়েকের সর্বশেষ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর অ্যাডভোকেট ডা. মুহাম্মদ প্রভাকর রাও হেজকে অডিটোরিয়ামের সবার উদ্দেশে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি ডা. জাকির নায়েক ও প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রশংসামূলক কিছু বক্তব্য পেশ করেন। এরপর ডা. মুহাম্মদ মি. কে. আর. হিংগোরেনকে তাঁর সভাপতির বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এরপর ডা. মুহাম্মদ মাওলানা আতাউল্লাহকে সমাপনি বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ করেন। AQSA-এর এডুকেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে মাওলানা আতাউল্লাহ প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েকসহ উপস্থিত সব মেহমানকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি সব লোককে নিকটবর্তী করার ও ভুল ধারণার অপনোদনের জন্য এ ধরনের সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করার প্রত্যাশ্যা ব্যক্ত ও প্রার্থনা করেন।

চাঁদ ও কুরআন
THE MOON & THEHOLY QURAN

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ আব্দুল কাদের মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

চাঁদ ও কুরআন

এখানে আল-কুরআনের তথ্যাবলী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, আল-কুরআনের আদব, নামসমূহ, পরিভাষা, সব কিতাবের ওপর আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য, পরিচয় ও কুরআন মাজীদের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য, এসব ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আদব বা শিষ্টাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. অজু করে নেয়া,
২. মিসওয়াক করা,
৩. আতর-খোশবু লাগানো,
৪. যে স্থানে তেলাওয়াত করা হচ্ছে সেখানে ধূমপান না করা,
৫. সম্ভব হলে আগরবাতি জ্বালানো,
৬. কুরআন পাক তিলাওয়াতের শুরু ও শেষে চুম্বন করা,
৭. তিলাওয়াতের শুরুতে তাআউজ ও তাসমিয়াহ পড়া,
৮. কুরআন পাক তিলাওয়াতের সময় কিবলামুখী হয়ে আদবের সাথে (নম্র হয়ে) বসা,
৯. কুরআন পাক পড়ার সময় পা ভেঙ্গে বসা,
১০. ওয়াজ এবং খুতবার সময় শ্রোতাদের দিকে মুখ করে তিলাওয়াত করা,
১১. কুরআন পাক তিলাওয়াতের সময় কাপড় পাক হওয়ার সাথে সাথে সাফ-সুতরাও হওয়া আবশ্যক,
১২. কুরআন শরীফ উঁচু স্থানে- রিহাল কিংবা তাকিয়া ইত্যাদির ওপর রেখে তিলাওয়াত করা,
১৩. তিলাওয়াত করার পর কুরআন শরীফ উঁচু স্থানে রাখা,
১৪. বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা,
১৫. ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা, আয়াত এবং সূরাগুলোকে ধারাবাহিক-ভাবে তিলাওয়াত করা,
১৬. সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা,
১৭. ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করা,
১৮. তাজভীদ এবং ক্বিরাআতের সাথে তিলাওয়াত করা,

১৯. কুরআন শরীফের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অর্থ এবং আশ্চর্য ও বিরল বিষয়াবলীর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা,

২০. খুশি ও আনন্দের সাথে তিলাওয়াত করা,

২১. প্রত্যহ তিলাওয়াত করা,

২২. কুরআন শরীফের আয়াত দেখে দেখে তিলাওয়াত করা,

২৩. আরবি নিয়ম-পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা,

২৪. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা,

২৫. কুরআন শরীফের ওপর হেলান দেয়া ও তাঁর ওপর ভর দেয়া যাবে না।

২৬. খুশু-খুযুর সাথে (ভয় ও নম্রতার সাথে) তিলাওয়াত করা,

২৭. তিলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা,

২৮. কুরআন তিলাওয়াতকে উপার্জনের মাধ্যম না বানানো,

২৯. কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ভুলে না যাওয়া,

৩০. বিপদজনক স্থান, যেখানে কুরআন শরীফের অবমাননা হতে পারে সেখানে না নেয়া,

৩১. শোর-গোলের স্থান, বাজার এবং মেলায় না পড়া,

৩২. যেখানে অধিক লোকের ভিড় সেখানে নিম্নস্বরে পড়া,

৩৩. অন্যের তিলাওয়াতের অসুবিধার সৃষ্টি না করা,

৩৪. তিলাওয়াতের মাঝে দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা,

৩৫. যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও উঠতে হয় তাহলেও কুরআন শরীফ বন্ধ করে যাওয়া,

৩৬. তিলাওয়াতের মাঝে হাঁচি আসলে তাকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা, এরপর মুখে হাত রেখে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া,

৩৭. কুরআন শরীফের কোনো আয়াত দ্বারা ভাগ্য গণনা গ্রহণ না করা,

৩৮. বিপদগ্রস্ত সময়ে আয়াতকে ভুল স্থানে ব্যবহার না করা,

৩৯. কুরআন শরীফ আদান-প্রদানের সময় ডান হাত ব্যবহার করা,

৪০. প্রত্যহ কুরআন শরীফ যিয়ারত করা এবং তাকে দেখা,

৪১. কুরআন শরীফের যে ধরনের আয়াত তিলাওয়াতে আসে সে মুতাবিক দুয়া করা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ এর ওপর জান্নাতে প্রবেশের দুয়া এবং জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি প্রার্থনা করা,

৪২. কোনো ক্বিরাআত ও তাজভীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক থেকে পড়া,

৪৩. তিলাওয়াত শেষ করে صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ 'আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন' বলা,

৪৪. যখন কুরআন শরীফ খতম হবে, তখন পুনরায় শুরু করা,

৪৫. কুরআন পাকের ওপর অন্য কোনো কিতাব, কলম, এবং কালি ইত্যাদি না রাখা,

৪৬. কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে ফুঁক দেয়া পানি কোনো নাপাক স্থানে না ফেলা,
৪৭. কুরআন লেখা তাবীজ অথবা ইসলামী লিখিত অংশ নিয়ে বাথরুমে না যাওয়া,
৪৮. অসঙ্গত দেয়ালে কুরআনের আয়াত না লেখা,
৪৯. কুরআন শরীফের ছেঁড়া পাতাগুলো পুঁতে ফেলা,
৫০. যখন কোনো আয়াত তক্তা বা শ্লেটের ওপর লেখা হয় তখন তাকে থু থু দ্বারা না মোছা,
৫১. কুরআন শরীফকে সুন্দর করে আরবি নিয়মে লেখা,
৫২. যে বস্তু হারামের সঙ্গে মিলিত হবে এমন বস্তুতে না লেখা,
৫৩. বড় তক্তির আয়াতকে ছোট তক্তিতে না লেখা,
৫৪. ছাত্রদের নিকট উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত না করা,
৫৫. যখন কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো,
৫৬. যদি তিলাওয়াতের মাঝে বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে কুরআন শরীফ বন্ধ করে যেতে হবে।
৫৭. যদি কুরআন শরীফের কোনো শব্দ বুঝা না যায় তাহলে অন্যকে জিজ্ঞেস করা,
৫৮. মাথা থেকে তিলাওয়াত করা,
৫৯. কুরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যার আলোচনা করা,
৬০. সপ্ত তিলাওয়াতের মধ্যে যে পদ্ধতিতে শুরু করা হবে ঐ পদ্ধতিতে শেষ করা,
৬১. বেশি বেশি কুরআন মজীদের তিলাওয়াত করা,
৬২. কুরআন শরীফের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত অথবা শুনার পর সিজদা করা,
৬৩. কুরআন শরীফের তিলাওয়াতকে সব যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করা,
৬৪. কুরআনের উপকারিতাকে ব্যাখ্যা করা, কুরআনের আয়াত দ্বারা আরোগ্য লাভ হলে তা প্রচার করা,
৬৫. কালামে ইলাহীর শক্তি ও প্রভাবের বক্তা হওয়া, এর দ্বারা আরোগ্য লাভ হয় এবং বিবাদ দূরিভূত হয়।

আল-কুরআনের নামসমূহ

একথা খুবই পরিষ্কার যে, কারো সত্তা, ব্যক্তি অথবা বস্তুর অধিক নাম এবং সুন্দর উপাধি এর অধিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ওপর নির্দেশ করে। যেমন– আল্লাহ্ তাআলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, যা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) মহত্ত্ব ও মর্যাদার দলিল বা প্রমাণ। এভাবে দেখলে কুরআন মাজীদেরও অনেক নাম ও

উপাধি রয়েছে যা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, মহান শান এবং বুলন্দ স্থানের নির্দেশ করে। নিম্নে আল-কুরআনের আলোকে কুরআনের নাম ও উপাধির উল্লেখ করা হলো–

১. আল-কুরআন ঃ আল-কুরআন কুরআন মাজীদের সত্তাগত নাম। এছাড়াও আল-কুরআনকে 'আল-কুরআন' বলার কতিপয় কারণ নিয়ে উল্লেখ করা হলো–

(ক) এ শব্দ তৈরিকৃত নয় এবং আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবকে বলা হয়। যেমন- তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিল অন্যান্য আসমানী কিতাবের নাম।

(খ) আল-কুরআন قرن শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ মিলানো। কেননা এর মধ্যে সূরা, আয়াত এবং অক্ষরগুলোকে মিলানো হয়েছে। এ কারণে একে القران বলা হয়।

(গ) القران শব্দটি قرء এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ- 'পড়া'। القران শব্দটি কর্মবাচক অর্থে, যার অর্থ হয়– 'পঠিত কিতাব'। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআন মাজীদ ইলহামী এবং বিনা ইলহামী কিতাবগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি পঠিত কিতাব।

২. আল-কিতাব ঃ লিখিত অথবা একত্রিত কিতাব, নিম্নলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদকে الكتاب (আল-কিতাব) বলা হয়।

(ক) الكتاب শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল যার অর্থ 'একত্রিত করা' এটা কর্মবাচক مكتوب (লিখিত) অর্থে ব্যবহৃত। 'কিতাব' শব্দ থেকে মেধায় এক সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত বস্তুর ধারণা জন্মে। বিশৃঙ্খল পাতাকে কিতাব বলা যায় না। এ দিক থেকে কুরআন মাজীদকে এজন্য 'কিতাব' বলা হয় যেহেতু এর মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঘটনা, কাহিনী এবং সংবাদগুলোকে সুশৃঙ্খল ও বন্ধনযুক্ত আকারে একত্রিত করা হয়েছে।

(খ) الكتاب -এর অর্থ যদি 'লিখিত' করা হয়, তাহলে এদিক থেকে হবে যে, কুরআন লাহওহে মাহফুজে লিখিত।

এও সম্ভব যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এটাকে 'কিতাব' এজন্য বলা হয় যে, নবী হযরত মুহাম্মাদ মুজতবা ﷺ কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। যখন কুরআন মাজীদের কোনো অংশ অবতীর্ণ হতো, তখন হুযুর ﷺ অহী লেখক কোনো সাহাবীকে ডেকে লেখার নির্দেশ প্রদান করতেন।

(গ) একত্রে সন্নিবেশিত আইন বা বিধানগুলোকেও الكتاب (সংবিধান) বলা হয়। বরং এ কিতাবকে الكتاب বলা অধিক তথ্য প্রদান করে। যার মধ্যে বিধানের সাথে সাথে আইনও রয়েছে। কুরআন মাজীদে একে আইনি কিতাব হওয়ার ঘোষণা সূরা নিসার ১০৫ নং আয়াতে এভাবে রয়েছে –

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ .

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনার ওপরে এ কিতাব সত্যতার সাথে অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত-এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন।

(ঘ) الكتاب। শব্দটি 'চিঠি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরা নাহল-এ মহান রবের ইরশাদ– 'আমার পক্ষ থেকে এক সম্মানিত চিঠি এসেছে।' এদিক থেকে 'কুরআন মাজীদ' মহান রব্বুল আলামিন এর পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীবাসীর জন্য এক খোলা চিঠি।

৩. আল-মুবীন ঃ المبين। - শব্দের অর্থ প্রকাশ্য অথবা পরিষ্কার বর্ণনাকারী 'কিতাব'। কুরআন মাজীদ সব জিনিসকে স্পষ্ট এবং খুবই স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী কিতাব। চিন্তা-ভাবনা ও খালিস নিয়তের সাথে পাঠকারীর জন্য এতে অবশ্যই কোন জড়তা নেই। এর বিধান, আদেশ-নিষেধ খুবই স্পষ্ট। কুরআনকে এজন্যও المبين। বলা হয়। কেননা এটা সত্যকে বাতিল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে।

৪. আল-কারীম ঃ কুরআন মাজীদকে 'আল কারীম'-ও বলা হয়। যার অর্থ সম্মান ও মর্যাদাশীল। কুরআন মাজীদের এক আদব ও সম্মান তো এই যে, একে তারতীল ও তাজভীদের সাথে পড়তে হবে এবং একে বুঝে এর দাবি অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে। যে ব্যক্তি কুরআন বিরোধী জীবন-যাপন করে, সে কুরআন মাজীদের সম্মান ও মর্যাদাকারী নয়।

দ্বিতীয় এর প্রকাশ্য আদব এবং এও প্রকৃত বিষয় যে, লোকেরা একে যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দেয় তা অন্য কোনো কিতাবের ভাগে আসে না।

৫. কালামুল্লাহ্ ঃ কুরআন মাজীদকে কালামুল্লাহ্ও বলা হয়। যার অর্থ আল্লাহ্‌র কালাম। এটা কি আল- কুরআনের কম মর্যাদা যে তা সৃষ্টিকর্তা মালিকের বাণী?

৬. আন-নূর ঃ কুরআন মাজীদকে 'আননূর'-ও বলা হয়। যার অর্থ ঃ আলো। কুরআন মাজীদ মূর্খতা, গোঁড়ামি এবং ভ্রষ্টতার অন্ধকারে প্রকাশ্য আলোর কাজ করে।

৭. হুদা ঃ কুরআন মাজীদকে هدى (হুদা)-ও বলা হয়। তার অর্থ হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন করা। হুদা শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল, যা কর্তৃবাচক শব্দের অর্থ দান করে। এর অর্থ পথপ্রদর্শক। এ পথপ্রদর্শনের ফল এই যে, কুরআনে বর্ণিত মূল বিষয়াবলী সম্পর্কে শুবা-সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কুরআন মাজীদের পথপ্রদর্শন সব মানবজাতির জন্য, তবে তা থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা বিশ্বাসী এবং মুত্তাকীরাই গ্রহণ করে।

৮. রহমত ঃ কুরআন মাজীদ ও কুরআনে হামীদ-এর এক নাম 'রহমত'-ও। যার অর্থ ঃ রবকত, দয়া ও ভালোবাসা। মানবতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, কুফরী ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ অবস্থায় কুরআন-মাজীদ ও ফুরকানে হামীদ কিতাব রহমত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্ষতি ও উদ্দেশ্যহীনতার ঝড়-ঝঞ্ঝার মুকাবিলায় কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ মানুষকে নিজ রহমতের দ্বারা ঢেকে নেয় এবং এ রহমত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য জীবন-যাপন, সামাজিক ও চারিত্রিক লক্ষ্যহীনতাকে দূর করে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে।

৯. আল-ফুরকান ঃ কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদকে فرقان (ফুরকান)-ও বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী বাণী। কুরআন মাজীদকে 'ফুরকান' বলার এও একটা কারণ যে, কঠিন পরিবর্তন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাকে পৃথক করে দিয়েছে। হক ও বাতিল বা সত্য-মিথ্যা, তাওহীদ ও শিরকের মাঝে শক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য চিঠি প্রেরণ করেছেন।

১০. শিফা ঃ কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ-এর সম্মানিত এক নাম 'শিফা'-ও। যার অর্থ আরোগ্য লাভ; বা নিরাময়। কুরআন মাজীদ রূহ ছাড়াও দেহের জন্যও নিরাময়। এর মধ্যে আশ্চর্যজনক প্রভাব রয়েছে। লাখ-লাখ, কোটি-কোটি, রোগ ব্যাধি এর কিছু কিছু আয়াত ও কিছু কিছু সূরা পড়ে নিরাময় লাভ করা যায়। যেমন– খবর ও রিসালাহর মধ্যে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে কিছু দিন পূর্বে এক রোগী চিকিৎসার্থে ইংল্যান্ড গিয়েছে ডাক্তারগণ তার রোগকে দূরারোগ্য হিসেবে স্থির করে। তিনি সূরা ইয়া-সীন পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করা শুরু করেন এবং কিছু দিনে আরোগ্য লাভ করেন। যখন ডাক্তারগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন এটা কুরআন মাজীদের সূরা ইয়া-সীন-এর বরকত। একথা শুনে সূরা ইয়া-সীন পড়ে ফুঁক দেয়া পানি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয় এবং এতে আরোগ্য ও নিরাময়ের জীবাণু মওজুদ ছিল। এ মুজিযা দেখে ইংল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন ডাক্তার ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরআন মাজীদের আয়াত ও দুয়া পড়ে ফুঁক দেয়া নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে।

১১. মাওয়িজাহ ঃ কুরআন মাজীদকে 'মাওয়িজাহ' নামেও চিহ্নিত করা হয়। যার অর্থ উপদেশসম্বলিত কিতাব। কুরআন মাজীদ এক দিকে সাধারণ সব মানুষের জন্য সত্য দীনের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার রয়েছে। অপর দিকে মুমিন মুত্তাকীদের জন্য এ কিতাব হিদায়াত ও উপদেশ। হেদায়াত ও উপদেশ-এর পদ্ধতি যৌক্তিক, যে জিনিস পথ প্রদর্শন করে এ জিনিস পথের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করে। 'মাওয়িজাহ' অর্থ হলো, আমলের ভাল-মন্দের ফল সম্পর্কে এ সংবাদ দেয়া যে, হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন হবে।

শাব্দিকভাবে وعظ, শব্দের অর্থ হুকুম বা নির্দেশ দেয়া এবং (খারাপ কাজ থেকে) বিরত রাখা। কুরআন ভালো কাজের নির্দেশ দান করে এবং খারাপ কাজ ও ভুল

কাজের ফল সম্পর্কে সাবধান করে এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে।

১২. যিকর ঃ কুরআন মাজীদকে যিকরও বলা হয়। এর অর্থ 'স্মরণ'। 'যিকর' তাকে বলে যা মগজে এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যে, ভুলে না যায় এবং স্মরণে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদের সংরক্ষণ এ পরিমাণ করেন যে, তা মানুষের বুকের মধ্যে সংরক্ষিত করে দিবে।

দুনিয়ার মধ্যে এটা একমাত্র কিতাব যাকে মানুষ মুখস্থ করে। আজ পর্যন্ত অগণিত বয়স্ক ও বাচ্চাদের মনের মধ্যে এ কিতাব মওজুদ রয়েছে। এ কারণে যে, চৌদ্দ শতাব্দীর অধিক কাল অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো কুরআনের কপিতে এক বর্ণেরও পরিবর্তন হয় নি। 'তাজ'-এর লেখক আল্লামা ইবনে মুকাররাম লিখেন, 'যে কিতাবে ধর্মীয় বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং জাতিসমূহের বিধানাবলীর বর্ণনা রয়েছে তাকে 'যিকর' বলে। কুরআন মাজীদে দীনের বর্ণনা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এজন্য তাকে 'যিকর' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৩. মুবারক ঃ কুরআন মাজীদ ফুরকান হামীদকে 'মুবারক কিতাব' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ বরকতময় কিতাব। বরকত এর অর্থের মধ্যে কল্যাণ, অধিক, বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে কিতাব সঠিক পথ ও হেদায়েত-এর উৎস, বিজ্ঞান ও হিকমতের উৎসস্থল দীনী বর্ণনার তালিকা, আত্মিক ও দৈহিকরোগের ওষুধ, রোগের নিরাময়, পড়ার উপদেশ, নসীহত এবং শিক্ষাগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রকারের সহজ। যার শিক্ষা সব মানুষের জন্য। যার এক হরফ পড়লে দশ নেকি পাওয়া যায়। যার ওপর আমল করার দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতে সফলতার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তা হলো নিশ্চিতভাবেই 'মুবারক' উপাধিধারী কিতাব কুরআন মাজীদ।

১৪. আলী ঃ আরবি ভাষার একটি প্রবাদ রয়েছে- كلام الملوك ملوك الكلام অর্থাৎ 'বাদশাহর কথা, কথার বাদশাহ' হয়ে থাকে। আল্লাহ বাদশাহগণের বাদশাহ। তাই তার বাণীও বালাগাত ফাসাহাত, ওয়াজ ও নসীহত, কবিতা ও তারতীব, সহজ বর্ণনা ও এজাজ এবং সব প্রকারের সৌন্দর্যের ভিত্তিতে সব কালামের থেকে সুউচ্চ ও আলী।

১৫. হিকমত ঃ কুরআন মাজীদ ও ফুরকান হামীদকে 'হিকমত' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। হিকমত বলতে সাধারণভাবে বিজ্ঞতার বর্ণনাকে বলে, যাতে তার বুঝের মধ্যে শক্তি, ফায়সালা, ন্যায়বিচার, সুন্দর এবং সুসম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুরআনে হাকীমকে 'হিকমতে বালিগা' বলা হয়। কেননা এটা মানবের সব ফায়সালা, এ সব সম্পর্ক এবং ন্যায়বিচারের স্থলে পৌছায়, যা তার মনযিল। হিকমতের মধ্যে শক্তির

উপাদানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ইসলামী উপাদান রাষ্ট্রীয় বিধানকে এক প্রজ্ঞাময় বিধানে পরিণত করে।

১৬. হাকীম ঃ কিতাবে হাকীম অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় কিতাব, হাকীম যদি হিকমত ওয়ালা কিতাবের অর্থ দান করে, তাহলে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটবে। আর যদি হাকীম মুহকাম (মজবুত, টেকসই এবং শক্ত) অর্থে হয়, তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এ কিতাব যার মধ্যে হালাল-হারাম, হদ এবং বিধান মজবুতভাবে রয়েছে। এর মধ্যে কখনো পরিবর্তন আসবে না এবং যা ভুল এ বৈপরীত্য থেকে পবিত্র কিতাব, একে কিতাবে হাকীম বলা হয়। কুরআন মাজীদ যেহেতু সব ভালো গুণে গুণান্বিত। তাই একে 'কিতাবে হাকীম' বলা হয়।

১৭. মুহাইমিন ঃ মুহাইমিন শব্দের অর্থ– পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক ও সাক্ষ্য প্রদানকারী। অন্যান্য আসমানী কিতাবের সঙ্গে কুরআন মাজীদের বিশেষত্ব এই যে, এ কিতাব সেগুলোর জন্য সংরক্ষক এবং সাক্ষ্যদাতা। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে যেহেতু পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, সে জন্য অবিকৃত কুরআন মাজীদ তাদের মধ্যে ফায়সালা দানকারী কিতাব।

১৮. হাবলুল্লাহ ঃ হাবলুল্লাহ (حبل الله) শব্দের অর্থ আল্লাহর রশি। যে কুরআন মাজীদকে শক্ত করে ধরে এবং এর ওপর আমল করতে শুরু করে। যে হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন অর্জন করবে এবং তার আল্লাহ তাআলার মারেফাত হাসিল হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া আখিরাতের সফলতাও নসীব হবে। আল-কুরআন এজন্য হাবলুল্লাহ। যেহেতু এ কিতাব আল্লাহ তাআলার মারিফাত পর্যন্ত পৌছানোর কিতাব।

১৯. সিরাতুল মুস্তাকীম ঃ সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থ 'সোজা রাস্তা'। কুরআন মাজীদ এমন এক সোজা রাস্তা যা জান্নাত পর্যন্ত যায়, এর মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। নিঃসন্দেহে যে কুরআনের বিধানাবলীর ওপর আমল করে সে সিরাতুল মুস্তাকীম-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২০. আল কাইয়্যিম ঃ কুরআন মাজীদকে 'কাইয়্যিম' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ সোজা ও পরিষ্কার হওয়া। কুরআন মাজীদ মিথ্যা, ব্যভিচার, গীবত, চোগলখুরী এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের নির্দেশ প্রদান করে। এ কারণে একে الكتاب القيم -'আল-কিতাবুল কাইয়্যিম' বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদ আল্লাহ তাআলার অবতারিত কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ কিতাব এবং এটাই একমাত্র কিতাব যা যেকোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব্যতীত নিজে নিজেই মওজুদ ও সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো একটি শব্দেরও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি। এটা শব্দ ও অর্থ

উভয় দিক থেকেই আল্লাহ তাআলার অবতারিত। স্বয়ং কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদে সুস্পষ্টভাবে আছে যে, এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা নিজ জিম্মায় গ্রহণ করেছেন। শুধু শব্দাবলীই নয় বরং এর উচ্চারণ এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা এর জিম্মাদারিও স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। রাসূল ﷺ-এরও এ স্বাধীনতা ছিল না যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে এক শব্দ কম-বেশি করবেন।

দুনিয়ার কোনো ভাষায় এমন কোনো ধর্মীয় পুস্তক নেই, যা শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের দিক থেকে কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। এ মুজিযাপূর্ণ মর্যাদা শুধু কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য কোনো কিতাব এ মর্যাদা লাভ করতে পারে নি।

কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ

কুরআন মাজীদ খণ্ডাকারে অবতীর্ণ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একে লিখিয়ে নিতেন এবং সাহাবিগণ এর তালীম দিতেন। সাহাবিগণ কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ শুধু মুখস্থই করতেন তা নয় বরং যারা লেখা-পড়া জানতেন তারা লিখে হিফাযত করে নিতেন। স্বয়ং দুজাহানের বাদশাহ নবী করীম ﷺ অবতারিত আয়াতের লিখনির নির্দেশ দিতেন যে, এটা অমুক সূরার আয়াত এবং এ অংশ অমুক আয়াতের পরে এবং অমুক আয়াতের পূর্বে লেখ। এভাবে যখনই কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই একই দিনের মধ্যে এর অনেক হাফিজ হয়ে যেতেন এবং লিখিত কপিও তৈরি হয়ে যেত।

যদি কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ সম্পূর্ণ একবারে অবতীর্ণ হতো অথবা লিখিত কিতাবাকারে অথবা তক্তির আকারে আসতো তাহলে এর সংরক্ষণ এরূপ হতো না, যেরূপ আজ আছে। কে সারা কুরআন শরীফ একদিনে মুখস্থ করতো? এবং কে এক দিনে বিভিন্ন কপি তৈরি করতো? অথচ মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের পর আর কোনো কিতাব নাযিল করবেন না এবং রাসূল ﷺ-এর পর আর কোনো নবী প্রেরণও করবেন না। এজন্য কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদকে নাযিল করতে, মুখস্থ করতে এবং লিখিত আকারে সংরক্ষিত রাখতে অসাধারণ পন্থা অবলম্বন করেছেন। নামাজের মধ্যে কুরআন মাজীদের অংশ পড়া বাধ্যতামূলক ও ফরজ করে দিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সাহাবিগণের এ ধরনের আগ্রহ ছিল যে, যে পরিমাণ কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হতো, তা নিজে সালাতের মধ্যে বারবার পড়তেন। শুধু পুরুষই নয়; মহিলা সাহাবিগণও কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদকে মুখস্থ করে নিতেন। যিনি লেখা-পড়া জানতেন তিনি তা লিখে রাখতেন।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় পূর্ণ কুরআন শরীফ লিখিত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর একে এক কিতাবের আকারে সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। এ

কাজের আঞ্জাম হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে করা হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালেও কুরআনে মাজীদ এর বহু কপি লেখা হয় এবং হযরত উসমান গণী (রা) কুরআন মাজীদের নতুন বিন্যাস করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃত কপিগুলোকে দূর-দূরান্তের রাজ্যগুলোতে পৌছান। এক কপি মদিনা মুনাওয়ারায় রাখেন এবং বাকি কপিগুলো মক্কা মুকাররমা, বসরা, কুফা, সিরিয়া, ইয়ামন এবং বাহরাইনে পাঠান।

কুরআন মাজীদ আরবে অবতীর্ণ হয়। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। তারা আরবি ভাষা জানতেন। এজন্য ইরাবের (যের, যবর, পেশ) প্রয়োজন বোধ করতেন না। অথচ এরপর ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অনারবিগণ ইসলাম গ্রহণ করেন, যেহেতু অনারবিরা আরবি কম জানতেন এবং কুরআনে ইরাব (যের, যবর, পেশ)ও ছিল না এজন্য কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ইরাবের ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৮৬ হিজরিতে কুরআন শরীফে ইরাব বা হরকত সন্নিবেশ করেন। এভাবে কুরআন বর্তমান আকৃতি লাভ করে।

কুরআনের বিন্যাস

কুরআন মাজীদে

- ১১৪টি সূরা
- ৬৬৬৬ টি আয়াত
- ৩০ পারা
- ৭ মঞ্জিল
- ৬০ হিযব
- ৫৪০ রুকূ', এভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।

সূরাগুলো অবতীর্ণের ধারা

এখন কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদ-এর সূরাগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার হিসাব অনুযায়ী, স্থান-কাল এজন্য উল্লেখ করা হলো, যাতে পাঠকগণ এ কথা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন যে, সূরাগুলো কোন্ ধারা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন্ নির্দেশ ও নিষেধগুলো প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন্গুলো পরে। অপর পাতাগুলোতে এ সংক্রান্ত ছক দেয়া হলো–

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণ স্থান
আলাক	১	৯৬	১৯	হিজরতের পূর্বে	মক্কা
মুদ্দাচ্ছির	২	৭৪	৫৬	ঐ	ঐ
মুজ্জাম্মিল	৩	৭৩	২০	ঐ	ঐ
দুহা	৪	৯৩	১১	ঐ	ঐ
ইনশিরাহ	৫	৯৪	৮	ঐ	ঐ
ফালাক	৬	১১৩	৫	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণ স্থান
নাস	৭	১১৪	৬	ঐ	ঐ
ফাতিহা	৮	১	৭	ঐ	ঐ
কাফিরুন	৯	১০৯	৬	ঐ	ঐ
ইখলাস	১০	১১২	৪	ঐ	ঐ
লাহাব	১১	১১১	৫	ঐ	ঐ
কাওছার	১২	১০৮	৩	ঐ	ঐ
হুমাযাহ	১৩	১০৪	৯	ঐ	ঐ
মাউন	১৪	১০৭	৭	ঐ	ঐ
তাকাসুর	১৫	১০২	৮	ঐ	ঐ
লাইল	১৬	৯২	২১	ঐ	ঐ
কলম	১৭	৬৮	৫২	ঐ	ঐ
বালাদ	১৮	৯০	২০	ঐ	ঐ
ফীল	১৯	১০৫	৫	ঐ	[illegible]
কুরাইশ	২০	১০৬	৪	ঐ	ঐ
ক্বদর	২১	৯৭	৫	ঐ	ঐ
ত্বারিক	২২	৮৬	১৭	ঐ	ঐ
শামস	২৩	৯১	১৫	ঐ	ঐ
আবাসা	২৪	৮০	৪২	ঐ	ঐ
আলা	২৫	৮৭	১৯	ঐ	ঐ
ত্বীন	২৬	৯৫	৮	ঐ	ঐ
আসর	২৭	১০৩	৩	ঐ	ঐ
বরুজ	২৮	৮৫	২২	ঐ	ঐ
কারিয়্যাহ	২৯	১০১	১১	ঐ	ঐ
যিলযাল	৩০	৯৯	৮	ঐ	ঐ
ইনফিতার	৩১	৮২	১৯	ঐ	ঐ
তাকভীর	৩২	৮১	২৯	ঐ	ঐ
ইনশিকাক	৩৩	৮৪	২৫	ঐ	ঐ
আদিয়াত	৩৪	১০০	১১	ঐ	ঐ
নাযিয়াত	৩৫	৭৯	৪৬	ঐ	ঐ
মুরসালাত	৩৬	৭৭	৫০	ঐ	ঐ
নাবা	৩৭	৭৮	৪০	ঐ	ঐ
গাশিয়াহ	৩৮	৮৮	২৬	ঐ	ঐ
ফজর	৩৯	৮৯	৩০	ঐ	ঐ
কিয়ামাহ	৪০	৭৫	৪০	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণ স্থান
তাতফীফ	৪১	৮৩	৩৬	ঐ	ঐ
হাক্কাহ	৪২	৬৯	৫২	ঐ	ঐ
যারিয়াত	৪৩	৫১	৬০	ঐ	ঐ
তুর	৪৪	৫২	৪৯	ঐ	ঐ
ওয়াকিয়াহ	৪৫	৫৬	৯৬	ঐ	ঐ
নাজম	৪৬	৫৩	৬২	ঐ	ঐ
মায়ারিজ	৪৭	৭০	৪৪	ঐ	ঐ
রাহমান	৪৮	৫৫	৭৮	ঐ	ঐ
কামার	৪৯	৫৪	৫৫	ঐ	ঐ
সাফ্‌ফাত	৫০	৩৭	১৮২	ঐ	ঐ
নূহ	৫১	৭১	২৮	ঐ	ঐ
দাহর	৫২	৭৬	৩১	ঐ	ঐ
দুখান	৫৩	৪৪	৫৯	ঐ	ঐ
ক্বাফ	৫৪	৫০	৪৫	ঐ	ঐ
ত্বহা	৫৫	২০	১৩৫	ঐ	ঐ
শুয়ারা	৫৬	২৬	২২৭	ঐ	ঐ
হিজর	৫৭	১৫	৯৯	ঐ	ঐ
মারইয়াম	৫৮	১৯	৯৮	ঐ	ঐ
ছোয়াদ	৫৯	৩৮	৮৮	ঐ	ঐ
ইয়াসীন	৬০	৩৬	৮৩	ঐ	ঐ
যুখরূফ	৬১	৪৩	৮৯	ঐ	ঐ
জ্বিন	৬২	৭২	২৮	ঐ	ঐ
মুল্‌ক	৬৩	৬৭	৩০	ঐ	ঐ
মুমিনুন	৬৪	২৩	১১৮	ঐ	ঐ
আম্বিয়া	৬৫	২১	১১২	ঐ	ঐ
ফুরকান	৬৬	২৫	৭৭	ঐ	ঐ
বনী ইসরাঈল	৬৭	১৭	১১১	ঐ	ঐ
নামল	৬৮	২৭	৯৩	ঐ	ঐ
কাহফ	৬৯	১৮	১১০	ঐ	ঐ
সাজদাহ	৭০	৩২	৩০	ঐ	ঐ
হামীম সাজদাহ	৭১	৪১	৫৪	ঐ	ঐ
জাছিয়াহ	৭২	৪৫	৩৭	ঐ	ঐ
নাহল	৭৩	১৬	১২৮	ঐ	ঐ
রূম	৭৪	৩০	৬০	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণ স্থান
হুদ	৭৫	১১	১২৩	ঐ	ঐ
ইবরাহীম	৭৬	১৪	৫২	ঐ	ঐ
ইউসুফ	৭৭	১২	১১১	ঐ	ঐ
মুমিন	৭৮	৪০	৮৫	ঐ	ঐ
কাসাস	৭৯	২৮	৮৮	ঐ	ঐ
যুমার	৮০	৩৯	৭৫	ঐ	ঐ
আনকাবুত	৮১	২৯	৬৯	ঐ	ঐ
লুকমান	৮২	৩১	৩৪	হিজরতের পূর্বে	মাক্কী
শুরা	৮৩	৪২	৫৩	ঐ	ঐ
ইউনুস	৮৪	১০	১০৯	ঐ	ঐ
সাবা	৮৫	৩৪	৫৪	ঐ	ঐ
ফাতির	৮৬	৩৫	৪৫	ঐ	ঐ
আরাফ	৮৭	৭	২০৬	ঐ	ঐ
আহকাফ	৮৮	৪৬	৩৫	ঐ	ঐ
আনআম	৮৯	৬	১৬৬	ঐ	ঐ
রায়াদ	৯০	১৩	৪৩	ঐ	ঐ
বাকারা	৯১	২	২৮৬	হিজরতের পরে	মদীনা
বাইয়িনাহ	৯২	৯৮	৮	ঐ	ঐ
তাগাবুন	৯৩	৬৪	১৮	ঐ	ঐ
জুমুয়াহ	৯৪	৬২	১১	ঐ	ঐ
আনফাল	৯৫	৮	৭৫	ঐ	ঐ
মুহাম্মাদ	৯৬	৪৭	৩৮	ঐ	ঐ
আলে ইমরান	৯৭	৩	২০০	ঐ	ঐ
ছফ	৯৮	৬১	১৪	ঐ	ঐ
হাদীদ	৯৯	৫৭	২৯	ঐ	ঐ
নিসা	১০০	৪	১৭৭	ঐ	ঐ
তালাক	১০১	৬৫	১২	ঐ	ঐ
হাশর	১০২	৫৯	২৪	ঐ	ঐ
আহযাব	১০৩	৩৩	৭৩	ঐ	ঐ
মুনাফিকুন	১০৪	৬৩	১১	ঐ	ঐ
নূর	১০৫	২৪	৬৪	ঐ	ঐ
মুজাদালাহ	১০৬	৫৮	২২	ঐ	ঐ
হাজ্জ	১০৭	২২	৭৮	ঐ	ঐ
ফাতাহ	১০৮	৪৮	২৯	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণ স্থান
তাহরীম	১০৯	৬৬	১২	ঐ	ঐ
মুমতাহিনা	১১০	৬০	১৩	ঐ	ঐ
নাছর	১১১	১১০	৩	ঐ	ঐ
হুজুরাত	১১২	৪৯	১৮	ঐ	ঐ
তাওবাহ	১১৩	৯	১২৯	ঐ	ঐ
মায়িদাহ	১১৪	৫	১২০	ঐ	ঐ

নোট ঃ কিছু কিছু সূরা অবতীর্ণের স্থানকালের ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। কারো কারো মতে সেগুলো মক্কায়, কারো কারো মতে মদিনায় অবতীর্ণ। এ মতানৈক্যের মূল কারণ এই যে, ঐ সব সূরার কিছু অংশ হিজরতের পূর্বে এবং অপর অংশ হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। মতানৈক্যের কারণ এটাই।

কতিপয় পরিভাষা

আল-কুরআন ঃ কুরআন আরবি ভাষার একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ– পড়া। পড়া যিনি জানেন তার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনকে এ নামে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ নাম এসেছে। এ ছাড়াও কুরআন মাজীদের আরো ৮৫টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন– আল বায়ান, আল-বুরহান, আযযিকর, তিবইয়ান ইত্যাদি। এ নামও কুরআন মাজীদে এসেছে।

সূরাহ ঃ সূরাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ পরিবেষ্টিত বাগান এবং শহর। কুরআন মাজীদ তাঁর ১১৪টি পৃথক পৃথক অংশের জন্য এ নাম নির্দিষ্ট করেছেন। এ পরিভাষা স্বয়ং কুরআন মাজীদই নির্ধারণ করেছেন। কোনো মানুষ কুরআন মাজীদের সূরার জন্য এ নাম নির্ধারণ করে নি। এ নাম ২নং সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ঃ আয়াত এর শাব্দিক অর্থ পতাকা, বিশেষ চিহ্ন। এগুলো কুরআনের একটা ক্ষুদ্র অংশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ নামও স্বয়ং কুরআন মাজীদ নিজের জন্য ব্যবহার করেছে। اية শব্দের বহুবচন ايات আসে। কুরআনে স্বয়ং নিজের জন্য সূরা মুহাম্মাদের ২০ নং আয়াতে এবং সূরা আনকাবুতের ৪৯ নং আয়াতে আয়াত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ তিনটি পরিভাষাই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ব্যবহার করেছেন। ছোট অংশের জন্য 'আয়াত'। পূর্ণ অংশের সম্বোধনের জন্য 'সূরা' এবং পূর্ণ কিতাবের জন্য 'কুরআন' মাজীদ শব্দ স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জত বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কোনো মানুষের মেধা, মগজ, বা চিন্তা-ভাবনার কোনো অন্তর্ভুক্তি এর মধ্যে নেই।

ওহী ঃ ওহী অবতরণের শুরু হয় মাহে রমজানুল মুবারক-এ রাসূল ﷺ এর জন্মের ৪১ সাল মুতাবিক ৬১০ ঈসায়ী মাগরিবের পর রাসূল ﷺ মক্কা মুকাররমা খানায়ে কাবার তিন মাইল দূরে ওয়াদী মুহাসসাব এর পাহাড়ের গুহায় মাবুদের স্মরণে মশগুল ছিলেন, যাকে তখন 'হিরা' পর্বত বলা হয়। আজ সকলে 'জাবালে নূর' বা নূর পর্বত বলে। বর্তমানে 'মুহাসসাব' উপত্যকায় বড় বড় মহল্লা তৈরি হচ্ছে এবং এ উপত্যকাকে 'মুয়াবাদা' বলা হয়।

প্রথমে যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলো হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। এরপর বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে। কখনো কোনো সূরা পূর্ণও অবতীর্ণ হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই অল্প অল্প অংশ অবতীর্ণ হতে থাকে এবং রাসূল ﷺ মহান প্রভুর নির্দেশনা অনুযায়ী এ অবতীর্ণ আয়াতগুলো সূরার মধ্যে তারতীব অনুযায়ী বিন্যাস করে লিখিয়ে নেন। এমনকি সর্বশেষ অহী আরাফার ময়দানে সন্ধ্যার সময় শুক্রবারে ৯ যিলহজ্জ ১০ম হিজরি মুতাবিক ৬৩২ ঈসায়ীতে অবতীর্ণ হয়। এ সর্বশেষ ওহী সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত। এভাবে পূর্ণ কুরআন মাজীদের অবতরণে পূর্ণ ২২ বছর ২ মাস সময় লাগে। যেহেতু রাসূল ﷺ ৫৪ বছর বয়সে মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করেন এবং সেখানে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এজন্য কুরআন নাযিলের সময় দু অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম মাক্কী এবং দ্বিতীয় মাদানি।

মাক্কী দাওর ঃ জন্মের ৪১ বছরের রমজানুল মুবারক থেকে জন্মের ৫৪ বছরের রবিউল আওয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বছর ৫ মাস সময়ে কুরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয় তাকে মাক্কী বলা হয়। মক্কা মুকাররমায় সর্ব প্রথম সূরা আলাক এবং সর্বশেষ সূরা মুতাফফিফীন অবতীর্ণ হয়।

মাদানি দাওর ঃ ৫৪ জন্ম সালের রবিউল আউয়াল থেকে (যে সময় হুজুর ﷺ এর বয়স ৫৪ বছর ছিল) থেকে ৬৩ জন্ম বর্ষের নবম যিলহজ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ বছর ৯ মাস যে আয়াত বা সূরাগুলো অবতীর্ণ হয় তাকে মাদানি বলা হয়।

এভাবে পূর্ণ কুরআন শরীফের ১১৪ সূরার মধ্যে ৯৩টি সূরা মাক্কী এবং ২১টি মাদানি। মদিনায় প্রথম সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয় এবং সর্বশেষ সূরা নাসর অবতীর্ণ হয়।

মানযিল ঃ কুরআন মাজীদে বর্তমানে সাতটি মঞ্জিল-এর চিহ্ন প্রান্ত সীমায় দেখা যায়। এ বিভক্তি হযরত উসমান (রা)-এর সাপ্তাহিক তিলাওয়াতের চিহ্ন থেকে বানানো হয়েছে। আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা) সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। এ ভাগ নিম্নলিখিত নিয়মে–

শনিবার ১ম মঞ্জিল সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা

রোববার ২য় মঞ্জিল সূরা মায়িদা থেকে সূরা তাওবাহ

সোমবার ৩য় মঞ্জিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহল

মঙ্গলবার ৪র্থ মঞ্জিল সূরা বনী ইসরাঈল থেকে সূরা ফুরকান
বুধবার ৫ম মঞ্জিল সূরা শুয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন
বৃহঃ বার ৬ষ্ঠ মঞ্জিল সূরা ছফফাত থেকে সূরা হুজুরাত
শুক্রবার ৭ম মঞ্জিল সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

পারা ঃ সাহাবিগণের সময় এক মাসে পূর্ণ ত্রিশ দিনে একবার খতম করার জন্য কুরআনকে পারায় বিভক্ত করেন। যদি প্রতিদিন এক পারা তিলাওয়াত করা হয় তা হলে ত্রিশ দিনে পূর্ণ খতম করা যায়। একে জুয বা পারা বলা হয়। এটা কাছাকাছি সংখ্যক আয়াতকে গণনা করে তৈরি করা হয়েছে। এরপর প্রত্যেক পারাকে কাছাকাছি দু'অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং তার নাম দেয়া হয়েছে হিজব (حزب) এভাবে কুরআন শরীফ ত্রিশ পারা (জুয) এবং ষাট হিজব হয়েছে। প্রত্যেক পারাকেও বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ এ শব্দগুলো প্রান্তে পাওয়া যায়। যার অর্থ পারার এতটুকু পর্যন্ত অংশ আপনি পড়েছেন। যদি আপনি এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত পৌছেন তাহলে দাঁড়ালো আপনি এক পারার চার অংশের এক অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি আপনি অর্ধেক পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে দাঁড়ালো আপনি চার অংশের দুই অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে অর্থ দাঁড়ালো আপনি চার অংশের তিন অংশ তিলাওয়াত করেছেন আর মাত্র এক অংশ বাকি রইলো।

তাবেয়িগণের (র) জামানায় পাঁচ আয়াত পরপর চিহ্ন দেয়া হয়েছিল এবং একে 'খুমাসী' নাম দেয়া হয়। কেউ আবার ১০ আয়াত পরপর চিহ্ন দিয়েছে, তারা 'আশারিয়াত' নাম দিয়েছেন। অতঃপর পাক ভারতের হাফিজগণ নিজেদের কপির ওপর রুকূ'র চিহ্ন লাগিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, রমজানে তারাবীহ পড়ার সময় এক রাকআতে এ পরিমাণ আয়াত পড়বেন। এভাবে রমজানের সাতাশ রাতের প্রতি রাতে বিশ রাকআত করে সম্পূর্ণ ৫৪০ রুকূ' হলো।

হুরূফে মুকাত্তায়াত ঃ কুরআন মাজীদের ২৯ সূরার প্রথমে একক বর্ণমালা রয়েছে যাকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন হরফ বলা হয়। যেমন- كهيعص . الر . الم . حم ইত্যাদি।

এগুলোকে এককভাবেই তিলাওয়াত করা হয়। এ সব একক হরফ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল-এর মাঝে ইঙ্গিত ছিল।

ওয়াক্‌ফের চিহ্ন ঃ প্রত্যেক ভাষাভাষি যখন কথা বলে তখন কোথাও একটুও থামে না, কোথাও কম থামে, কোথাও বেশি থামে। এ ধরনের থামা না থামার বর্ণনা সঠিকভাবে করা এবং তা সঠিকভাবে বুঝার প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন মাজীদের বাণী কথাবার্তার মতই, এজন্য জ্ঞানবান লোকেরা এতে থামা না থামার চিহ্ন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকে কুরআন মাজীদের থামার চিহ্ন বলা হয়।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারীদের এসব চিহ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা আবশ্যক।

ہ ঃ যেখানে বক্তব্য পূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে ছোট একটা বৃত্ত লেখা থাকে। এটা মূলত গোল (ۃ) এবং এটা পূর্ণ ওয়াকফের চিহ্ন অর্থাৎ এখানে থামা উচিত। এখন ۃ লেখা হয় না বরং ছোট একটু বৃত্ত রাখা হয়, এ চিহ্নকে আয়াতের চিহ্ন বলা হয়।

م ঃ এটা ওয়াক্ফ লাযিমের চিহ্ন। এরপর অবশ্যই থামতে হবে। যদি না থামে তাহলে অর্থ এদিক সেদিক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর উদাহরণ বাংলায় যদি বুঝতে চান তাহলে ধরুন, কাউকে বলা হলো। উঠ, বসো না। যাতে উঠার আদেশ এবং বসতে নিষেধ করা হয়েছে, এখানে 'উঠ' এরপর থামা আবশ্যক। যদি এখানে না থামা হয় তাহলে উঠ বসো না, যার মধ্যে উঠা বসা উভয়টিকেই নিষেধ করা হয়েছে (যেন ডাক্তারের নিষেধ) অথচ এটা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এরূপভাবে কুরআন শরীফ ওয়াকফে লাযিম এর স্থলে না থামলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ط ঃ ওয়াক্ফে মুতলাক-এর আলামত। এখানে থামা উচিত, তবে এ চিহ্ন ঐ স্থানে বসে যেখানে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় নি এবং আরো কিছু বলতে চাচ্ছেন।

ج ঃ ওয়াক্ফে জায়েয এর চিহ্ন। অর্থাৎ এ স্থানে থামা ভালো এবং না থামাও জায়েয আছে।

ز ঃ ওয়াকফে মুজাওয়াজ এর আলামত। এখানে না থামা ভালো।

ص ঃ ওয়াক্ফে মুরাখখাস-এর আলামত বা চিহ্ন। এখানে মিলিয়ে পড়া উচিত, তবে যদি কেউ হঠাৎ করে থেমে যায়, তাহলে অবকাশ আছে। ص -এর ওপর মিলিয়ে পড়া ز এর চেয়েও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

صلے ঃ 'আল অসলো আওলা' এর সংক্ষিপ্তরূপ, এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

ق ঃ قيل عليه الوقف এর সংক্ষিপ্ত রূপ। (দুর্বল কওল অনুযায়ী) এখানে থামা উচিত।

صل ঃ কখনো কখনো মিলিয়ে পড়া হয় তার চিহ্ন। এখানে থামা না থামা উভয়টি করা জায়েয, তবে থামা উত্তম।

قف ঃ এর অর্থ থামো। এ চিহ্ন ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের না থামার সম্ভাবনা রয়েছে।

س ঃ (سكت) সাকতার চিহ্ন। এখানে কিছুটা থামতে হবে, তবে শ্বাস বাকি রাখতে হবে।

وقفه ঃ দীর্ঘ সাকতার আলামত। এখানে সাকতার অধিক থামা উচিত, তবে শ্বাস ছাড়া যাবে না। সাকতা এবং ওয়াক্ফের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে সাকতার

মধ্যে কম পরিমাণ থামতে হবে এবং শ্বাস বাকি রাখতে হবে। ওয়াকফের মধ্যে বেশি থামতে হবে এবং নিঃশ্বাসও ছেড়ে দিবে।

ﻻ ঃ ﻻ এর অর্থ নাই। এটা কখনো কখনো ওয়াকফের চিহ্নের ওপর আবার কখনো কখনো ইবারতের মধ্যেও বসে। ইবারতের মধ্যে বসলে কখনো থামা যাবে না। আয়াতের চিহ্নের ওপর বসলে থামা না থামার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে থামা ভালো, কারো মতে না থামা ভালো। তবে থামা না থামার মধ্যে মূলত কোনো সমস্যা নেই।

ك ঃ كذلك এর চিহ্ন। অর্থাৎ ঐরূপ। অর্থাৎ যে চিহ্ন পূর্বে গিয়েছে, এখানেও সেই চিহ্ন বুঝতে হবে।

অনুবাদকের নোট ঃ ওয়াকফের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এসেছেন আমার উস্তাদজী মাও ঃ এ, কে, এম, শাহজাহান। যিনি তালীমুল কুরআনের কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তাদ এবং টিভি চ্যানেল ATN-এর নিয়মিত শিক্ষক। তাঁর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হলো–

ওয়াকফ চিহ্নকে দ্বায়েরা বলে।

لا	⊛ ⊛ ق قف صلى ص ز ج ط	م ⊛	⊛

দ্বায়েরার ওপর মীম থাকলে শুধু মীম থাকলে ওয়াকফ করতেই হবে, তাই তাকে ওয়াকফ লাযিম বলে। ত্ব জীম যা সোয়াদ, সেলে, কিফ, ক্বফ, দ্বায়েরার ওপর লাম আলিফ থাকলে শুধু দ্বায়েরা থাকলে ওয়াকফ করা না করা উভয়টা চলে। শুধু লাম আলিফ থাকলে ওয়াক্ফ করা নিষেধ।[১]

কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

১. বাক্যের সংখ্যা	ঃ	৮৬,৪৩০ (ছিয়াশি হাজার চারশত ত্রিশ)
২. অক্ষর সংখ্যা	ঃ	৩,২৩,৭৬০
৩. পারার সংখ্যা	ঃ	৩০
৪. মনজিল সংখ্যা	ঃ	০৭
৫. সূরা সংখ্যা	ঃ	১১৪
৬. রুকূ' সংখ্যা	ঃ	৫৪০
৭. আয়াত সংখ্যা	ঃ	৬,৬৬৬
৮. ফাতহা (যবর) সংখ্যা	ঃ	৫৩,২২৩
৯. কাসরা (যের) সংখ্যা	ঃ	৩৯,৫৮২
১০. দম্মা (পেশ) সংখ্যা	ঃ	৮,৮০৪

১. তালিমুল কুরআন কায়েদা ঃ পৃ-৪৫ মাওঃ এ, কে, এম, শাহজাহান।

১১. মদ সংখ্যা	ঃ	১,৭৭১
১২. তাশদীদ সংখ্যা	ঃ	১,২৭৪
১৩. নুকতা সংখ্যা	ঃ	১,০৫,৬৮৪

আয়াতের প্রকারভেদ

ওয়াদার আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
ওয়ায়ীদ (শাস্তির) আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
নিষেধের আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
নির্দেশের আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
দৃষ্টান্তের আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
কাহিনীর আয়াত	১০০০ (এক হাজার)
হালালের আয়াত	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
নিষিধের আয়াত	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
তাসবীহের আয়াত	১০০ (একশত)
বিভিন্ন প্রকারের আয়াত	৬৬ (ছেষট্টি)
নাযিলের সময়কাল	২২ বছর ৫ মাস
ওহী লেখক সাহাবীর সংখ্যা	৪০ জন।

প্রথম ওহী ঃ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (৯৬ নং সূরা আলাক ১-৫নং আয়াত)

সর্বশেষ ওহী وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ (২ নং সূরা বাকারার ২৮১ নং আয়াত)

অথবা ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (৫নং সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত)

মনজিল এর বিভাগ

১ম মনজিল	সূরা ফাতিহা	থেকে	সূরা নিসা
২য় ,, ,,	মায়িদা ,,	,,	তাওবা
৩য় ,, ,,	ইউনুস ,,	,,	নাহল
৪র্থ ,, ,,	বনী ইসরাঈল	,,	ফুরকান
৫ম ,, ,,	শুয়ারা	,,	ইয়াসীন
৬ষ্ঠ ,, ,,	স-ফফাত	,,	হুজুরাত
৭ম ,, ,,	ক্বাফ	,,	নাস

অক্ষর-এর সংখ্যা

অক্ষরের উচ্চারণ	**কত বার ব্যবহৃত**
ا – আলিফ	৪৮৮৭৪ বার
ب – বা	১১৪২৮ বার
ت – তা	১১৯৯ বার
ث – ছা	১২৭৬ বার
ج – জীম	৩২৭৩ বার
ح – হা	৯৭৩ বার
خ – খা	২৪১৬ বার
د – দাল	৫৬০১ বার
ذ – যাল	৪৬৭৭ বার
ر – র	১১৭৯৩ বার
ز – যা	১৫৯০ বার
س – সীন	৫৯৯১ বার
ش – শীন	২১১৫ বার
ص – ছোয়াদ	২০১২ বার
ض – দ-দ	১৩০৭ বার
ط – ত্ব	১২৭৭ বার
ظ – জ়	৮৪২ বার
ع – আইন	৯২২০ বার
غ – গাইন	২২০৮ বার
ف – ফা	৮৪৯৯ বার
ق – ক্বাফ	৬৮১৩ বার
ك – ক্বাফ	৯৫০০ বার
ل – লাম	৩৪৩২ বার
م – মীম	৩৬৫৩৫ বার
ن – নূন	৪০১৯০ বার
و – ওয়াও	২৫৫৩৬ বার
ه – হা	১৯০৭০ বার
لا – লাম আলিফ	৩৭২০ বার
ى – ইয়া	৪৫৯১৯ বার

তিলাওয়াতের সিজদা ঃ সকলে একমত ১৪ স্থানে সিজদা করতে হবে।

মতানৈক্য ১ স্থানে।

নিজ দৃষ্টিতে আল-কুরআন

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদ ও ফুরকান হামীদ এর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করেছেন। এ মর্যাদা বর্ণনা এক নজরে নিম্নে পেশ করা হলো। সূরা এবং আয়াত নং লিখে দেয়া হলো–

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার অবতারিত
   ২০ নং সূরার ৪ নং আয়াত
   ২০ নং সূরার ৮নং আয়াত
   ২৬ নং সূরার ১৯২ নং আয়াত
   ৩৩ নং সূরার ২ নং আয়াত
   ৪১ নং সূরার ২ নং আয়াত
   ৪১ নং সূরার ৪২ নং আয়াত
   ৫৬ নং সূরার ৮০ নং আয়াত
   ৬৯ নং সূরার ৪৩ নং আয়াত

২. কুরআন মাজীদ জিবরাঈল (আ) নিয়ে এসেছেন–
   ২৬ নং সূরার ১৯৩ নং আয়াত।

৩. কুরআন মাজীদ রাসূল ﷺ-এর ওপর অতবীর্ণ হয়।
   ১৫ নং সূরা হিজর-এর ৬ নং আয়াত
   ২০ নং সূরা ত্বহার-এর ২ নং আয়াত
   ৪৭ নং সূরা মুহাম্মাদ-এর ২ নং আয়াত
   ২৬ নং সূরা শুআরা-এর ১৯৪ নং আয়াত
   ৬৯ নং সূরা হাক্কাহ-এর ৪০ নং আয়াত
   ৭৬ নং সূরা দাহর-এর ২৩ নং আয়াত

৪. কুরআন নাযিলের মাস
   ২ নং সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াত

৫. কুরআন নাযিলের মাস বরকতময়
   ৯৭ নং সূরা ক্বদর-এর ১ নং আয়াত
   ৪৪ নং সূরা দুখান-এর ৩ নং আয়াত

৬. কুরআন মাজীদের ভাষা আরবি
   ২৬ নং সূরা শুআরা-এর ১৯৫ নং আয়াত
   ৩৯ নং সূরা যুমার-এর ২৮ নং আয়াত
   ৪২ নং সূরা শূরা-এর ৭ নং আয়াত
   ৪৩ নং সূরা যুখরুফ-এর ৩ নং আয়াত
   ৪৬ নং সূরা আহক্বাফ-এর ১২ নং আয়াত

৭ কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ার কারণ

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা-এর ৪৪ নং আয়াত

৪৪ নং সূরা দুখান-এর ৫৮ নং আয়াত

৪২ নং সূরা শূরা-এর ৭৭ নং আয়াত

৮. আল-কুরআনে কি আছে?

১৪ নং সূরা ইবরাহীম-এর ৫২ নং আয়াত

৯. কুরআন মাজীদ সন্দেহ-শুবাহের ঊর্ধ্বে

২ নং সূরা বাকারার ২ নং আয়াত

১০. কুরআন মাজীদ শোনার সময় চুপ থাকা।

৭ নং সূরা আরাফ-এর ২০৪ নং আয়াত

৭৫ নং সূরা কিয়ামাহ-এর ১৬ নং আয়াত

৪৬ নং সূরা আহক্বাফ-এর ২৯ নং আয়াত

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদাহ্-এর ২৬ নং আয়াত

১১. কুরআন মাজীদের নাম

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদার ৪৪ নং আয়াত

৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়াহ-এর ৭৭ নং আয়াত

৪৩ নং সূরা যুখরুফ-এর ৩ নং আয়াত

১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ৬০ নং আয়াত

৪২ নং সূরা শূরা-এর ৭ নং আয়াত

৫৯ নং সূরা হাশর-এর ২১ নং আয়াত

২৭ নং সূরা নামল-এর ১ নং আয়াত

১৫ নং সূরা হিজর-এর ১ নং আয়াত

২৫ নং সূরা ফুরকান-এর ৩২ নং আয়াত

১২. কুরআনের গুণাবলি, রাসূলের গুণাবলি

১৬ নং সূরা নাহল-এর ৮ নং আয়াত

১৩. কুরআনকে পবিত্র লোকে স্পর্শ করবে

৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়াহ-এর ৭৯ নং আয়াত

১৪. আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ

২ নং সূরা বাকারা-এর ২৩ নং আয়াত

১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৩৮ নং আয়াত

১১ নং সূরা হুদ-এর ১৩ নং আয়াত

১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ৮৮ নং আয়াত

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদার ৪২ নং

৫২ নং সূরা তুর-এর ৩৪ নং আয়াত

১৫. স্মরণ করার জন্য কুরআন সহজ
৫৪ নং সূরা ক্বামার-এর ১৭ নং আয়াত
৫৪ নং সূরা ক্বামার-এর ৪০ নং আয়াত
৪৪ নং সূরা দুখান-এর ৫৮ নং আয়াত

১৬. কুরআন পাক ধীরে ধীরে পড়ার নির্দেশ
২০ নং সূরা ত্বোয়াহা-এর ১১৪ নং আয়াত
৭৩ নং সূরা মুযযাম্মিল-এর ৪ নং আয়াত

১৭. কুরআন মাজীদের বিপরীতে পিঠ করে বসা
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ৩২ নং আয়াত

১৮. কুরআন মাজীদের অবমাননাকারীর শাস্তি
১৫ নং সূরা হিজর-এর ৯১ নং আয়াত

১৯. আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের হিফাযতকারী
১৫ নং সূরা হিজর-এর ৯ নং আয়াত
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৬ নং আয়াত
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৯ নং আয়াত

২০. পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে কুরআন মাজীদের উল্লেখ
২৬ নং সূরা শুয়ারা-এর ১৯৬ নং আয়াত

২১. কুরআন মাজীদ এবং বয়স্কদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসা
৮০ নং সূরা আবাসা-এর ১৪ নং আয়াত
৮৮ নং সূরা গাশিয়াহ-এর ২৩ নং আয়াত

২২. নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কথাবার্তা
৬৯ নং সূরা হাক্কাহ-এর ৪০ নং আয়াত

২৩. কুরআন মাজীদ উপদেশ
৭৩ নং সূরা মুযযাম্মিল-এর ১৯ নং আয়াত
৮০ নং সূরা আবাসা-এর ১২ নং আয়াত
৮০ নং সূরা আবাসা-এর ১৬ নং আয়াত
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ-এর ১ নং আয়াত
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ-এর ৮৭ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আস্‌সাজদা-এর ৪১ নং আয়াত
৪৫ নং সূরা জাছিয়াহ-এর ২০ নং আয়াত

২৪. কুরআন মাজীদ এবং আল্লাহ তাআলার আয়াতকে যারা নিচু দেখে তাদের শাস্তি
৩৪ নং সূরা সাবা-এর ৩৮ নং আয়াত

২৫. কুরআন মাজীদ মুমিনদের জন্য হেদায়াত এবং সুখবর
১৬ নং সূরা নাহল-এর ৬৪ নং আয়াত
২৭ নং সূরা নামল-এর ২ নং আয়াত
২৭ নং সূরা নামল-এর ৭৭ নং আয়াত
৩১ নং সূরা লুকমান-এর ১ নং আয়াত
৩১ নং সূরা লুকমান-এর ৫ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ৮২ নং আয়াত
১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৫৭ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা-এর ৪৪ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম-এর ১৫৭ নং আয়াত
৩৯ নং সূরা যুমার-এর ৪১ নং আয়াত

২৬. কুরআনে বিজ্ঞান
৬ নং সূরা আনআম-এর ৩৮ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম-এর ৫৯ নং আয়াত
৩৫ নং সূরা ফাতির-এর ১১ নং আয়াত
১৬ নং সূরা নাহল-এর ৮৯ নং আয়াত
১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৩৭ নং আয়াত
১০ নং সূরা ইউনুস-এর ৬১ নং আয়াত
২৭ নং সূরা নামল-এর ৭৫ নং আয়াত
৫৪ নং সূরা ক্বামার-এর ৫ নং আয়াত
৩৪ নং সূরা সাবা-এর ৩ নং আয়াত
১২ নং সূরা ইউসুফ-এর ১১১ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ১২ নং আয়াত
২২ নং সূরা হজ্জ-এর ৭০ নং আয়াত

২৭. কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত
৩৫ নং সূরা ফাতির-এর ২৯ নং আয়াত

২৮. কুরআন মাজীদ শয়তান নিয়ে আসে নি
২৬ নং সূরা শুআরা-এর ২১০ নং আয়াত

২৯. কুরআন মাজীদ বুঝে পড়া
৪ নং সূরা নিসা-এর ৮২ নং আয়াত
৩ নং সূরা আলে ইমরান-এর ১১৮ নং আয়াত
২ নং সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত
২ নং সূরা বাকারার ২৪২ নং আয়াত
২ নং সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াত
৭ নং সূরা আরাফ-এর ১৭৬ নং আয়াত

১০ নং সূরা ইউনুস-এর ২৪ নং আয়াত
১৬ নং সূরা নাহল-এর ৪৪ নং আয়াত
২৩ নং সূরা মুমিনুন-এর ৬৮ নং আয়াত
২৪ নং সূরা নূর-এর ১ নং আয়াত
২৯ নং সূরা আনকাবুত-এর ৪৩ নং আয়াত
৩০ নং সূরা রূম-এর ২৮ নং আয়াত
৪৭ নং সূরা মুহাম্মাদ-এর ২৪ নং আয়াত
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ-এর ২৯ নং আয়াত
১২ নং সূরা ইউসুফ-এর ২ নং আয়াত
৩৯ নং সূরা যুমার-এর ২৮ নং আয়াত
৪৩ নং সূরা যুখরুফ-এর ৩ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা-এর ৩ নং আয়াত
৫৯ নং সূরা হাশর-এর ২ নং আয়াত
৫৯ নং সূরা হাশর-এর ২১ নং আয়াত।

৩০. আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কসম খেয়েছেন
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ-এর ১ নং আয়াত

৩১. কুরআন মাজীদের পর কাফিরদের ঝগড়া
৪০ নং সূরা মুমিন-এর ৪ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা-এর ৪০ নং আয়াত

৩২. কুরআন মাজীদ অনেক কাফিরকে উন্নতি দেয়
৫ নং সূরা মায়িদা-এর ৬৪ নং আয়াত
৫ নং সূরা মায়িদা-এর ৬৮ নং আয়াত

৩৩. কুরআন মাজীদে প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ স্তরে স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে
১৮ নং সূরা কাহফ-এর ৫৪ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ৮৯ নং আয়াত
৩০ নং সূরা রূম-এর ৫৮ নং আয়াত
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ৪১ নং আয়াত

৩৪. কুরআন মাজীদ থেকে মুখ ফিরালে তার হিদায়াত বাতিল হয়ে যায়
১৮ নং সূরা কাহফ-এর ৫৭ নং আয়াত
৪৫ নং সূরা জাসিয়াহ-এর ২৩ নং আয়াত

৩৫. কুরআন মাজীদ সংযুক্ত ও ধারাবাহিক
২৮ নং সূরা কাসাস-এর ৫১ নং আয়াত

৩৬. জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কুরআন মাজীদ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ-এর ২৯ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদাহ-এর ৩ নং আয়াত

৫০ নং সূরা ক্বাফ-এর ৪৫ নং আয়াত
১৪ নং সূরা ইবরাহীম-এর ৫২ নং আয়াত

৩৭. এই কুরআন উপদেশ, তোমরা কি তা অস্বীকার করতে চাও?
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ-এর ২৯ নং আয়াত
২১ নং সূরা আম্বিয়া-এর ৫০ নং আয়াত
৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা-এর ৪১ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম-এর ৯২ নং আয়াত
৬ নং সূরা আনআম-এর ১৫৫ নং আয়াত

৩৮. যদি কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তাহলে-এর ভেতরে অনেক বৈপরিত্য পাওয়া যেত।
৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াত

৩৯. কুরআন মাজীদ উত্তম কিতাব-এর তিলাওয়াত আল্লাহর যিকর-এর দিকে ধাবিত করে।
৩৯ নং সূরা যুমার-এর ২৩ নং আয়াত

৪০. জ্বিনদের কুরআন মাজীদ শোনা
৪৬ নং সূরা আহ্কাফ-এর ২৯ নং আয়াত
৭২ নং সূরা জ্বিন-এর ১নং আয়াত

৪১. কাফিররাও কুরআন মাজীদ শুনতো, তাদের শোনার কারণ
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ৪৭ নং আয়াত

৪২. কুরআন মাজীদ কাফিরদের হেদায়েত-এর জন্য
৬ নং সূরা আনআম-এর ১৪ নং আয়াত

৪৩. মিথ্যাকে জোর দেবার জন্য কুরআন পেশকারী জাহান্নামী
২২ নং সূরা হজ্জ-এর ৫১ নং আয়াত

৪৪. যে কুরআন মাজীদ থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে তার ওপর শয়তান কর্তৃত্ব করে
৪৩ নং সূরা যুখরুফ-এর ৩৬ নং আয়াত

৪৫. কুরআন মাজীদ প্রথম থেকে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল
৪৩ নং সূরা যুখরুফ-এর ৪ নং আয়াত

৪৬. কুরআন মাজীদ সোজা রাস্তা
৬ নং সূরা মায়িদা-এর ১২৬ নং আয়াত

৪৭. কুরআন মাজীদে হিকমতও আছে, বর্ণনাও আছে
১১ নং সূরা হুদ-এর ১ নং আয়াত
৫৪ নং সূরা ক্বামার-এর ৫ নং আয়াত

৪৮. সূরা ফাতিহা এবং কুরআন মাজীদের মর্যাদা
১৫ নং সূরা হিজর-এর ৮৭ নং আয়াত

৪৯. কুরআন মাজীদ সত্যকে স্পষ্টকারী কিতাব
২৩ নং সূরা মুমিনুন-এর ৬২ নং আয়াত

৫০. কুরআন মাজীদ লোকদের শিক্ষার জন্য
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ১০৬ নং আয়াত

৫১. পরবর্তী আসমানী কিতাবগুলোর পণ্ডিত আলেমগণ হুজুর পাক ﷺ এবং আল কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় স্বীকৃত ছিলেন
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল-এর ১০৭ নং আয়াত
২৬ নং সূরা শুআরা-এর ১৯৬ নং আয়াত

৫২. জালিম কুরআন মাজীদ বুঝে না
১৮ নং সূরা কাহফ-এর ৫৭ নং আয়াত

৫৩. কুরআন মাজীদে হুজুর পাক ﷺ-এর সাহাবীদের উল্লেখ আছে
২১ নং সূরা আম্বিয়ার ২৪ নং আয়াত

৫৪. কুরআন মাজীদের মর্মার্থ হুজুর পাক ﷺ-এর দিলের ওপর নাযিল হয়েছিল
২৬ নং সূরা শুআরা-এর ১৯৪ নং আয়াত

৫৫. ইবাদতকারীদের হেদায়াত লাভের জন্য কুরআন মাজীদই যথেষ্ট
২১ নং সূরা আম্বিয়ার ১০৬ নং আয়াত

৫৬. আল্লাহ তায়ালা হুজুর পাক ﷺ কে কুরআন মাজীদ শিখিয়েছেন
২৭ নং সূরা নামল-এর ৬ নং আয়াত
৫৫ নং সূরা আর রাহমান-এর ২ নং আয়াত

কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য

ইহুদি ধর্ম ঃ বর্তমানে আমাদের সামনে বাইবেল, ইঞ্জিল এবং বেদ-এর কিছু কপি বর্তমান আছে, যেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। কুরআন মাজীদে যাবুর, তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে আসমানী কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেন্ট-এর ৪২ খানা কিতাব আছে যার অনুসারীদের বিশ্বাস এই যে, এ সব কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ পেয়েছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ খানা কিতাব-এর মধ্যে যা ঈসা (আ)-এর যুগে ইলহাম হয়েছিল। এগুলো ঐ সব কিতাব যার অধিকাংশের ব্যাপারে প্রথমে ঈসায়ী আলেমদের মধ্যেও সংশয় ছিল; কিন্তু ঈসায়ী চতুর্থ শতাব্দীতে নাইস-এর থস এবং ফ্লারেন্স-এ বসে খ্রিস্টীয় আলেমগণ পরামর্শ করে সন্দেহযুক্ত পুস্তকগুলো গ্রহণ করে নেন। (আসমানী ছহীফা পৃষ্ঠা নং- ১৪)

এ সব একারণে অগ্রহণযোগ্য যে, এগুলোর গ্রহণকারী এবং নকলকারীদের আমাদের কোনো পাত্তাই মিলে না, সে কি সত্যবাদী ছিল নাকি মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট ছিল নাকি সুপথ প্রাপ্ত, শক্তিশালী মুখস্থশক্তিসম্পন্ন নাকি ভুল-ভ্রান্তিপ্রবণ। অতঃপর যিনি পৌঁছে দিলেন তিনি নিজেই পৌঁছে দিলেন নাকি মিল-ঝিল করে পৌঁছালেন। যার সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ জাগে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। তাহলে কে নিজের বিশ্বাস, নিজের আমল বরং স্বয়ং নিজে নিজেকে এধরনের সনদহীন কিতাবের বরাত দিবে।

খ্রিস্টধর্ম ঃ খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র ইঞ্জিল-এর ওপর। অতঃপর ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য কি? আপনি নিশ্চিত জানুন যে, বর্তমানে ইঞ্জিলগুলোও সনদ বিহীন। সহীহ মূল ইঞ্জিল পৃথিবী থেকে বিলীন হয়েছে।-এর অনুবাদ আছে এবং তাও ইবারত (মূল) বিহীন এবং লূক এবং মার্কস থেকে যে ইঞ্জিলগুলো সম্পৃক্ত-এর মূল বিষয় এই যে, এ দুই বুজুর্গ হযরত ঈসা (আ)-এর যুগেও ছিলেন না। যে কারণে তৃতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিলগুলোর সত্যতা সম্পর্কে মতানৈক্য আরম্ভ হয়েছিল এবং খ্রিস্টীয় পণ্ডিতদের এক বড় দলের মানতে হয়েছিল যে, এ ধরনের সম্পৃক্ততা ভুলের ওপরে ছিল, অতঃপর বিদ্যমান ইঞ্জিলগুলোর শিক্ষা শিরক এবং কুফরীর সাথে জড়িয়ে গিয়েছে যা আসমানী প্রশিক্ষণের বিপরীত। অনেক বক্তব্য অশ্লীল এবং অনেক বক্তব্য আমলের অযোগ্য। এ জন্য এগুলো মূল ইঞ্জিল নয়। ইদানীং আমেরিকায় এক কমিটি বসেন, যারা ফায়সালা করেন যে, প্রত্যেক বছর ইঞ্জিলগুলোর যে তাজা সংস্করণ বের হয়ে আসছে, এগুলোর সাথে ইঞ্জিলের সত্যতা আরো বেশি সংমিশ্রণ হচ্ছে। এজন্য বর্তমানে আর অধিক সংস্করণের প্রয়োজন নেই এবং বর্তমানে নতুন সংস্করণ বের করা যাবে না।

একটা ইঞ্জিল যাকে হওয়ারী বার্ণাবাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা বাবায়ে রোম লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত, যেহেতু সেটা খ্রিস্টীয় পণ্ডিতদের বহু অপারেশন থেকে কোন প্রকারে বেঁচে রয়েছে, এ জন্য-এর বিষয়াবলী বেশির ভাগ কুরআনের সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু বর্তমানে তাও মূল হিসেবে নেই। ইঞ্জিলগুলোর বর্তমান বিশ্বাসগুলো বর্ণনা করা হলে মানবতা লজ্জিত হয়ে পড়বে।

সনাতন ধর্ম ঃ সনাতন ধর্ম অর্থ হিন্দু মতবাদ। এদের 'বেদ'-এর পুস্তকগুলোর একটা অংশও আসমানী নয়। কেননা-এর নিজেরই আসমানী কিতাব হবার ব্যাপারে কোন দাবি নেই। তার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তিও পাওয়া যায় না। কিছু হিন্দু পণ্ডিত বলেন যে, এগুলো ভিয়াজ জীর বিন্যাসকৃত যিনি জরুথ্রস্ট-এর যুগে ছিলেন এবং বলখ গিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ লিখেন, 'এটা কোনো ব্রাহ্মণের তৈরি।' প্রফেসর পণ্ডিত কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য কোলকাতা কলেজ, ভারতে সংস্কৃত-এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঋগ্বেদের অংশগুলো এদেশের কবি এবং ঋষিগণ লিখেছেন এবং তা বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। অতঃপর উঁচু-নিচু, জাত পাত, অধিক খোদা, এ সব ঐ বক্তব্য যা জ্ঞান এবং মানবতা উভয়দিক দিয়েই অসংলগ্ন। কখনো এই একক খোদা রব্বুল আলামিন-এর শিক্ষা ছিল না।-এর মধ্যে কিছু এমন লজ্জাহীন বক্তব্য বরং শিক্ষা পাওয়া যায়, যাকে কলম প্রকাশ করতে অপারগ। এসব কারণে একথা মানতেই হয় যে, এগুলো কখনোই আসমানী কিতাব নয়।

'মহাভারতে বেদগুলোর বিধানাবলী একে অপরের বিপরীত, এরূপভাবে স্মৃতি (বেদ)-এর বিধানগুলোও। এমন কোনো ঋষি নেই যার শিক্ষা অন্য ঋষির বৈপরীত্য করে না।' (হিন্দু মতবাদ, পৃ- ৬২)

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন কবিগণ, নিজ পরিবেশে, সমাজ, সংস্কৃতি, রসম ও বর্ণনা, কিস্‌সা-কাহিনী অনুযায়ী যেসব কবিতা গেয়েছেন, সেগুলো আর্যদের ভোগ বিলাসী জীবন-যাপন এবং পরবর্তীতে কান্তকারীর যুগে মুখরোচক সৃষ্টি ছিল। পরবর্তীতে ভিয়াস জী-এর মধ্যে নিজ আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা যোগ করেন এবং লিখে নেন। এটাও সম্ভব যে, বেদ-এর কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষাও রয়েছে। কেননা এগুলোর মধ্যে অংশীবাদী শিক্ষার সাথে সাথে কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষার ঝলকও দেখা যায়।

মিতাপুরা হিন্দুত্ববাদের ৯০ নং পৃষ্ঠার বরাতে লিখেন— এক বেদ-এর ওপর অনেকবার পরিবর্তন ঘটেছে। ঋষিদের পরবর্তীরা-এর ওপর খারাপ দৃষ্টি আরো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে অনেক বিপরীতধর্মী জিনিস প্রবেশ করায়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কালপ মতদের হস্তক্ষেপে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ঋগ, যযুর

এবং সাম বেদের বারবার সংকলন হয়েছে। প্রথমে যযুর্বেদ একই ছিল,-এরপর দুই অংশ হয়ে গেল। এভাবে দুয়াপরা যুগে তিন বেদের মধ্যেই হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ফ্রান্সের পণ্ডিত ডাঃ লিবইয়ান লিখেন– 'এই হাজার হাজার খণ্ডের মধ্যে যা হিন্দুগণ তিন হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যে লিখেছেন যা এক ঐতিহাসিক ঘটনা, সত্যের সাথে যা সমতা রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এ সময়ের মধ্যে কোনো ঘটনাকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা সম্পূর্ণ সাহারায় হাবুডুবু খাচ্ছি। এ ধরনের ঐতিহাসিক পুস্তক-এর মধ্যে এ ধরনের আশ্চর্য ও অপরিচিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসকে ভুল এবং অপ্রাকৃতিক আকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পাওয়া যায় এবং মানুষকে এ ইচ্ছার ওপর জবরদস্তি করে যে তার মেধা অকেজো। অতীত হিন্দুদের কোনো ইতিহাসই নেই এবং দালান এবং স্মৃতিসৌধেরও কোনো সন্ধান নেই। ... ভারতের ঐতিহাসিক যুগ বাস্তবে মুসলমানদের সেনা শাসনের পর শুরু হয় এবং হিন্দুস্তানের প্রথম ঐতিহাসিক মুসলমানই। হিন্দুদের সম্মানিত পুস্তক বেদ যার সংখ্যা হল চার–

১. ঋগ্বেদ
২. সামবেদ
৩. যযুর্বেদ
৪. অথর্ববেদ

বেদকে স্মৃতিও বলা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো শোনা বক্তব্য। এতে দু'হাজার বছর পর বিশাল নড়াচড়া হয়। সবচে' পুরাতন হলো ঋগ্বেদ। এ থেকে অন্যান্য বেদ বানানো হয়েছে। এক সময় এমনও হয়েছিল যে, ঋগ্বেদ ধ্বংস হয়েছিল। এই বেদ ব্রাহ্মণদের একজন থেকে অন্য জনের সীনায় বর্ণনাকারে স্থানান্তর হচ্ছিল। (তামাদ্দুনে হিন্দ ১৪৪ পৃঃ থেকে ১৪৭ পৃঃ)

যদিও হিন্দু মতবাদের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা যাবে। কিন্তু যখন আমরা এ ধর্মের শিক্ষা এবং হিন্দুদের প্রাত্যহিক পূজা অর্চনার দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে তাওহীদের স্থলে আমাদের কুফরী ও শিরক, মূর্তিপূজা, শক্তিপূজা ছাড়া আর কিছু নজরে আসে না। হিন্দুদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি। হিন্দুগণ জমিনের সব প্রাণী-অপ্রাণীকে দেবতা বানিয়েছে। যদি সৃষ্টির সব মুক্তা ও তারকাকে দেবতা নির্ধারণ করি, তাহলে ৩৩ কোটি কেন অসংখ্য দেবতা বানানোর দরকার হবে।

বেদগুলোর সামগ্রিক শিক্ষা নিম্নরূপ

১. বেদের শিক্ষা মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে অবমাননা, কমশক্তি এবং নিচু জাতওয়ালাকে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।

২. বেদগুলো বিভেদ প্রচার করে, লুট-পাট এবং প্রতারণার উঁচু জাতগুলোর জন্য বৈধ করে দেয়, এবং উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করে অসম আচরণের নির্দেশ দেয়।

৩. বেদ পূজার ক্ষেত্রে– মূর্তিপূজা, কুফর, শিরক-এর শিক্ষা দেয়, যা মারাত্মক প্রকারের গুনাহ।

৪. বেদগুলোর শিক্ষা মানব মস্তিষ্কপ্রসূত, যার ক্ষুদ্র অংশেও অণুপরিমাণ আল্লাহর শিক্ষার সাথে সম্পর্ক নেই।

৫. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের জন্য অন্যায়ের সীমা পর্যন্ত অধিকার দিয়েছে, যে কাজ অন্যদের জন্য অপরাধ তা ব্রাহ্মণদের জন্য বৈধ। অব্রাহ্মণদের অধিকারকে শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের হক নষ্ট করা হয়েছে।

৬. বেদ স্বয়ং শক্ত দেবতা, তারকা, আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটির পূজা করার অনুমতি দেয়।

৭. বেদগুলোতে মানুষকে খোদার মর্যাদা দিয়েছে।

৮. বেদগুলোতে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা দেবতাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের নিষিদ্ধ যৌনাচারের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে, যা তাঁদেরকে সাধারণ ভালো লোকদেরও নিচু স্তরে নামিয়ে প্রকাশ করে। এ আকারে নিকৃষ্টভাবে তাদের বেইজ্জতী করা হয়েছে।

৯. বেদগুলোতে লজ্জাস্থানের পূজা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত আদিম মূর্তিপূজক জাতিগুলোর মধ্যেও দেখা যায় না।

১০. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সব প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত; কিন্তু বেদগুলোতে সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বরং দেবতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১১. দেবতাদের সব মাখলুকের মতো ধারণা করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীও রয়েছে যাদের নাম শ্রীদেবী, কালী; কালকাতা, ওয়ালী এবং লক্ষ্মী দেবী।

১২. বেদগুলোর মধ্যে নারীদের নিকৃষ্টরূপে অপমানিত করা হয়েছে, তাদের বৈধ হক দেয়া হয় নি।

১৩. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের দেবতার মতো করেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ জী, কৃষ্ণ লীলা, হনুমান জী ইত্যাদি।

১৪. আখেরাতের ধারণাও অপ্রকৃত, বিশ্বাসের অযোগ্য।

১৫. বেদ পড়ে এও জানা যায় যে,-এর অনুসারীদের জন্য বিয়ের রীতি রহিত, এ লোক মায়ের পরিচয়মুক্ত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য অশ্লীলতার সুযোগ নিত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য নিজ মা, বোন, কন্যার সাথেও যৌন সম্পর্ক রাখতো। বেদের শিক্ষার মধ্যে আজও ঐ সব প্রভাব বাকি আছে।

প্রচলিত আছে যে, রাজা দাহির নিজ বোনকে বিয়ে করেছিল। ধর্মের নামে আজও এ লোকগুলো জৈবিক অসততার শিকার।

১৬. বেদের অনুসারী লোকেরা মন্দিরের মধ্যে যৌনকর্ম করাকে বড় পূজা মনে করতো। যদিও পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবেল ও নিনওয়াই সংস্কৃতিতে মন্দিরগুলোতে এমন পণ্ডিত ছিল এবং শাম প্রধান, যুবকদের মন্দিরমুখী করে নিতেন। এ সময়ে দেবদাসী (যুবতী স্ত্রীলোক)-দের মগজে এ ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হতো যে, পুরুষদের সাথে যৌন লীলা অনেক বড় পূজা এবং পুণ্যের কাজ। এ ধরনের বর্ণনা মন্দিরগুলোতে আজও দেখা যায়। এ পর্যায়ে অশ্লীলতার যাবতীয় আকৃতি মওজুদ ছিল।

ব্যস, প্রমাণিত হলো যে, আজ ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে কুরআন মাজীদ ব্যতীত এমন কোনো ধর্মীয় পুস্তক নেই যা আল্লাহর অবতারিত এবং তার মূল অবস্থায় নিরাপদে রয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রত্যেকটি হরফ, প্রত্যেকটি নুকতা এবং হরকত সংরক্ষিত, যার শিক্ষা একজন মৃত পণ্ডিত/আলেমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করে, যা আজও জীবিত আছে এবং কোটি কোটি বুকের মধ্যে সংরক্ষিত আছে, এবং যার শিক্ষার দিকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইউরোপ, আমেরিকাসহ দুনিয়ার সকল জাতি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

শক্ত এবং অনস্বীকার্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে যারা পৃথিবী বাস্তবমুখিতা, ধর্মহীনতার সন্দেহ, বেদ্বীনী ও পথহীনতার মারাত্মক অবস্থায় পৌছায়, যার কারণে পৃথিবী এমন এক হেদায়েতের অপেক্ষায় ছিল, যা সন্দেহমুক্ত এবং এমন এক পথ প্রদর্শকের জন্য অস্থির ছিল, যিনি সারা পৃথিবীবাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হবেন। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর ওপর দয়া পরবশ হলেন এবং তাদের প্রতি রহমতের নবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে প্রেরণ করেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় বাণী কুরআন মাজীদ দান করেন, যার দ্বারা সারা পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অমুসলিম পণ্ডিতদের সাক্ষ্য

১. খ্রিস্টীয় এবং ইহুদি পণ্ডিতগণ

এ সব বক্তব্য ঐ সব লোকের জন্য যাদের নিকট কোনো বক্তব্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সম্পৃক্ত না হয়। যাহোক এ সব বক্তব্য ذكرى مصر (যিকরা মিসর) প্রথম খণ্ডের ৩২৭- থেকে ৩৩৩ পৃঃ থেকে নেয়া হয়েছে।

ক্যাম্ব্রীজ ইনসাইক্লোপেডিয়া : 'কুরআন জুলুম, মিথ্যা, ধোঁকা, শাস্তি, গীবত, লোভ, অতিরিক্ত খরচ, হারাম কাজ, খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং কুধারণাকে খুবই বড় অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং এটাই তাঁর বড় সৌন্দর্য।'

ড. গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসী ঃ 'কুরআন হৃদয়ের মধ্যে এমন জীবন্ত এবং শক্তিশালী বিশ্বাসের জোশ সৃষ্টি করে যে,-এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।'

স্যার উইলিয়াম ম্যুর ঃ 'কুরআন প্রকৃতি ও সৃষ্টিকুলের প্রমাণাদির দ্বারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানবমণ্ডলীকে আল্লাহর আনুগত্য এবং শোকর গুজারির দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।'

প্রফেসর এডওয়ার্ড জী.-ব্রাউন. এম. এ ঃ 'যখনই কুরআনের ওপর চিন্তা করি এবং-এর বুঝ ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করি, আমার হৃদয়ে-এর মর্যাদা ও আসন বেড়ে যায়। কিন্তু জিন্দাবেস্তা (যা প্রফেসর সাহেবের ধর্মীয় পুস্তক)-এর অধ্যয়নে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, সময় জ্ঞান অথবা ভাষা বিশ্লেষণ অথবা এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে পড়লে তবীয়তের (স্বভাব/প্রকৃতির) মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং সমস্যার সৃষ্টি করে।'

মিস্টার ইমানুয়েল ডি ইন্‌শ ঃ 'কুরআনের আলো ইউরোপে ঐ সময় পর্যন্ত পড়তে থাকে যতক্ষণ তারিকী মহাসাগর থাকে এবং-এর দ্বারা গ্রিকের মৃত বিবেক ও জ্ঞান জীবিত হয়।'

ড. জনসন ঃ 'কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্যাবলী এমন উপযোগী ও সাধারণের বোধগম্য যে, পৃথিবী সেগুলোকে সহজেই গ্রহণ করে, আমাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর আফসোস যে, আমাদের দেখে দেখে দুনিয়া এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।'

প্রফেসর রলিণ্ডা এ নিকোলসন ঃ 'কুরআনের প্রভাবে আরবি ভাষা সারা ইসলামী দুনিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআন মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে শেষ করে দিয়েছে।'

মিস্টার এইচ. এস. লিডার ঃ 'কুরআনের শিক্ষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এবং এতদূর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে যে, নিজ যুগের ইউরোপীয় বড় বড় রাজ্যের শিক্ষাও বিজ্ঞান থেকে বেড়ে যায়।'

মিস্টার আই. ডি. মারীল ঃ 'ইসলামের শক্তি-সামর্থ্য কুরআনের মধ্যেই, কুরআন হলো মৌলিক জ্ঞান ও অধিকারের রক্ষক।'

জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জার্মানি দার্শনিক ঃ 'যখন নবী করীম ﷺ-এর মুখে কোনো বিধর্মী কুরআন শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে সিজদায় পড়ে যেতেন এবং মুসলমান হয়ে যেতেন।'

থিওডোর নোলডীকী ঃ 'কুরআন লোকদের আগ্রহ ও প্রশিক্ষণের দ্বারা বাতিল উপাস্যদের দিক থেকে ফিরিয়ে এক খোদার ইবাদাতের দিকে দাওয়াত দেয়। কুরআন মাজীদের মধ্যে বর্তমান এবং আগামীর নাম, জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।'

মিস্টার স্ট্যানলি লেইনপুল ঃ 'কুরআনে সব কিছু আছে, যা একটি বড় ধর্মে থাকা উচিত এবং যা একজন বুজুর্গ লোক (মুহাম্মাদ)-এর মধ্যে ছিল।'

মিস্টার জে, টি, বুটানী ঃ 'কুরআন অসীম ও অসংখ্য লোকদের বিশ্বাস এবং চাল-চলনের ওপর প্রকৃত প্রভাব ফেলেছে এবং বৈজ্ঞানিক পৃথিবী কুরআনের প্রয়োজনকে আরো প্রকাশ করে দিয়েছে।'

এইচ, জি, ওয়েলস ঃ 'কুরআন মুসলমানদের এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, যা বংশ এবং ভাষার পার্থক্যের অনুসরণ করে না।'

পাদরী ওয়ালারশন ডি. ডি. ঃ 'কুরআনের ধর্ম, নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম।'

মিস্টার বসুরথ ইসমথ ঃ 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাবি এই যে, কুরআন তার স্বাধীন এবং স্থায়ী মুজিযা এবং আমি স্বীকার করি যে, বাস্তবে এটা এক মুজিযা।'

গড ফ্রি হেঙ্গিস ঃ 'কুরআন অপরিচিত লোকের বন্ধু ও দুঃচিন্তা দূরকারী, বয়স্ক লোকদের ওপর অবিচার সব ক্ষেত্রে অবদমন করেছে।'

মিস্টার রিচার্ডসন ঃ 'গোলামীর অপছন্দনীয় নিয়ম দূর করার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকে কুরআন দ্বারা পরিবর্তন করা দরকার (অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাবগুলো যেমন বেদের স্থানে যদি কুরআন মাজীদের শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে গোলামী শেষ হয়ে যেতো।')

ডীম স্টেনলি ঃ 'কুরআনের শিক্ষা উত্তম এবং মানুষের মগজের ওপর দাগ কেটে যায়।'

মেজর লিউনার্ড ঃ 'কুরআনের শিক্ষা সর্বোত্তম এবং মানব সমাজে অংকিত হয়ে যায়।'

আখবার নীরায়েস্ট ঃ 'যদি আমরা কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা এবং সৌন্দর্য ও সুগন্ধিকে অস্বীকার করি তাহলে আমরা জ্ঞান ও বিবেকশূন্য হয়ে যাব।'

স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস সি, আই, এ, ঃ 'কুরআন মজীদ এ কথার উপযুক্ত যে, ইউরোপের প্রতি প্রান্তে মধ্যে পড়া হবে।'

ড. চার্টেন ঃ 'কুরআনের আলোড়ন হৃদয়গ্রাহী, সংক্ষিপ্ত এবং **অল্প কথায় অনেক** বুঝায় এবং এটা আল্লাহর স্মরণ ক্ষুরধার পদ্ধতিতে করে।'

মিস্টার আরনল্ড ভিহারেট ঃ 'কুরআন মুসলমানদের **যুদ্ধপদ্ধতি** শিখার সহমর্মিতা, কল্যাণ ও সমবেদনা। কুরআন ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম পেশ করে যা বিজ্ঞানের **ক্রমবর্ধমান** উন্নতিকে রোধ করে না।'

ডাক্তার মরিস ফ্রান্সিসী ঃ 'কুরআনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার বাগ্মিতা ও সুস্পষ্টতা। উদ্দেশ্যের সৌন্দর্য ও লক্ষ্যের সুন্দর পদ্ধতির দিক দিয়ে কুরআনকে সব আসমানী কিতাবের ওপর মর্যাদা দিতে হয়।'

মিস্টার লুডলফ কারমাল 'কুরআনে বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিপূর্ণ বন্ধন ও বিধান বর্তমান। প্রশস্ত গণতন্ত্র সঠিক পথ ও হিদায়াত, ন্যায় ও আদালত, প্রশিক্ষণ এবং অর্থ, দরিদ্রদের সাহায্য এবং উন্নতির সর্বোচ্চ পদ্ধতি মওজুদ আছে এবং এ সব বক্তব্যের ভিত্তি বারী তাআলা সত্তার ওপর বিশ্বাসের।'

জর্জ সেল ঃ 'কুরআন কারীম নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব। কোনো মানুষ এমন অলৌকিকগ্রন্থ লিখতে পারেন না এবং এটা মৃতকে জীবিত করার চাইতেও বড় অলৌকিক।'

রিওনার্ড জি, এম, রডওয়েল ঃ 'কুরআনের শিক্ষায় মূর্তিপূজা দূর করে, স্বর্গ এবং পৃথিবীর শিরক দূর করে, আল্লাহর ইবাদাত প্রতিষ্ঠা করে, সন্তান হত্যা করার কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করে।'

আর্যু রন্ড মাক্সওয়েল কং ঃ 'কুরআন ঐশী বাণীর সমষ্টি। এতে ইসলামের নিয়মাবলী, বিধান এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশনা রয়েছে এ দিক দিয়ে খ্রিস্টবাদের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে,-এর ধর্মীয় শিক্ষা এবং (রাষ্ট্রীয়) বিধানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

মসিয়ে ডাগিন ক্ল্যাফিল ফ্রান্সি ঃ 'কুরআন শুধু ধর্মীয় নীতিমালা এবং (রাষ্ট্রীয়) বিধানের সমষ্টিই নয়, বরং-এর মধ্যে সামাজিক বিধানও রয়েছে যা মানবজীবনের জন্য সার্বক্ষণিক উপকারী।'

ডায়োন পোর্ট ঃ 'কুরআন মুসলমানদের সামগ্রিক বিধান। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ব্যবসায়িক, সামরিক, বিচারিক এবং ফৌজদারি সব আচরণ-এর মধ্যে রয়েছে। এ সত্ত্বেও এটি একটি ধর্মীয় পুস্তক। এটা সব জিনিসকে সুশৃঙ্খল বানিয়েছে।'

প্রফেসর কার্লাইল ঃ 'আমার দৃষ্টিতে কুরআনে সর্ব প্রথম থেকেই নিষ্ঠা ও সততা রয়েছে এবং সত্য তো এটাই যে, যদি কোনো ভাল জিনিস সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এ থেকেই হয়েছে।'

কোন্ট হেজরী তিকাসরী ঃ 'কুরআন দেখে হতবুদ্ধি হতে হয় যে, এধরনের বক্তব্য এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে কীভাবে নিঃসৃত হলো যিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।'

ডক্টর গীবন ঃ 'কুরআন একত্ববাদের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। একত্ববাদী কোনো দার্শনিকের যদি কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে হয় তাহলে তা হলো ইসলাম। যারা পৃথিবীতে কুরআনের উপমা মিলবে না।'

আলকেস লাওয়াঝু ফ্রান্সি দার্শনিক ঃ 'কুরআন আলো এবং বিজ্ঞানময় কিতাব।-এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে, তা এমন এক ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হয়, যিনি সত্য নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছিলেন। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এমন বিষয়াবলী যাদের সমাধান আমরা জ্ঞানের (বিজ্ঞানের)

জোরে করেছি, এসব বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোনো কথা নেই যা কুরআনী বিশ্লেষণের পরিপন্থী। আমরা খ্রিস্টানগণ, খ্রিস্টবাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বানানোর জন্য আমরা এ পর্যন্ত যতখানি অগ্রসর হয়েছি ইসলাম এবং কুরআনে এগুলো পূর্ব থেকেই আছে এবং পূর্ণভাবেই আছে।

মসিয়ো সিড ফ্রান্সী ঃ 'ইসলামকে যে লোক পাশবিক ধর্ম বলে, সে কুরআনের শিক্ষা দেখে নি, যার প্রভাবে আরবিদের খারাপ এবং দুষ্ট অভ্যাসগুলোর আকৃতি পাল্টে গিয়েছিল।'

মসিয়ো কাস্টন কার ঃ 'পৃথিবী থেকে যদি কুরআনের হুকুমত চলে যায়, তাহলে পৃথিবীর নিরাপত্তা কখনোই টিকে থাকবে না।'

একিম ডি, বুলফ জার্মান ঃ 'কুরআন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং পাক বিষয়ে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি তার ওপর আমল করা যায়, তবে রোগের জীবাণু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মিস্টার রূডুল ঃ 'যতই আমি এ কিতাবকে উলট-পালট করে দেখি, এই পরিমাণ প্রথম অধ্যয়নে অনাকাঙ্ক্ষিত নতুন নতুন রঙে রঞ্জিত হই। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়, হয়রান করে দেয়, সর্বশেষ আমাকে সম্মান করতে বাধ্য করে।-এর বর্ণনা পদ্ধতি,-এর বিষয়াবলী ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, বিরাট মর্যাদা ও ভয়ানক।-এর উদ্দেশ্য চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উদ্দেশ্য: এই কিতাব প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকের ওপর জোর প্রভাব দেখায়।'

গ্যেটে ঃ 'আমি এই কিতাবের যতই নিকটবর্তী হই অর্থাৎ-এর ওপর বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করি তা এতো পরিমাণ দরূর খেন্তি যায় অর্থাৎ, খুব উঁচু মনে হয়, তা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে, অতঃপর আশ্চর্য করে দেয়, খুশির আমেজের আন্দোলনও দেয়, সর্বশেষ তাঁকে সম্মান করিয়ে ছাড়ে, এভাবে এ কিতাব সব দৃষ্টিতে সম্মান করিয়ে ছাড়ে, এভাবে এ কিতাব সব দৃষ্টিতে সর্বদা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।'

পপুলার ইনসাইক্লোপেডিয়া ঃ 'কুরআনের ভাষা আরবি, খুবই স্পষ্ট উঁচুমানের,-এর রচনার সৌন্দর্য একে আজ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত ও উপমাহীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়াও-এর বিধানগুলো এ পরিমাণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী যে, যদি মানুষ তাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে, তবে সে এক পবিত্র জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়ে যায়।'

২. হিন্দু পণ্ডিতগণ

কুরআন মাজীদের ব্যাপারে আজ অজ্ঞ ভারতীয় এবং মূর্খ হিন্দু মাঝে মাঝেই কু ভাষা ব্যবহার করছে। এখানে কিছু হিন্দু পণ্ডিতগণের বক্তব্য পেশ করা হলো, যাতে বুঝা যায় যে, স্বয়ং তাদের গোত্রের লোকরা কুরআন মাজীদের মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এডমন্ড বারক ঃ 'ইসলামী বিধান (কুরআন মাজীদ) বাদশাহ থেকে নিচু প্রকারের একটি রাখালেরও সাহায্যকারী। এটা এমন এক বিধান যা এক জ্ঞান সীমার আওতায় বিজ্ঞ আইনের ওপর ব্যাপ্ত। যার দৃষ্টান্ত সারা দুনিয়ায় আর নেই।'

বাবা নানক (গুরু নানক)

تورات زبور انجیل اور وید وغیرہ سب کو پڑھ کر دیکھ لیا قران ھی قابل قبول اور اطمینان قلب کی کتاب نظرائی۔ اگر سچ پوچھوتوا سچی اور ایمان کی کتاب جسی کی تلاوت سے دل باغ باغ ھو جاتاہے وہ قران شریف ھی ھے۔

অর্থাৎ 'তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং বেদ ইত্যাদি পড়ে দেখলাম কুরআনই হলো গ্রহণযোগ্য এবং হৃদয়ের প্রশান্তিদায়ক কিতাব যা আমার নজরে এলো। যদি সত্য চাও তাহলে সত্য এবং ঈমানের কিতাব যার তিলাওয়াতের দ্বারা হৃদয় বাগ বাগ (আনন্দে ভরপুর) হয়ে যায়, তা কুরআন শরীফই।'

বাবা ভুপেন্দ্রনাথ বসু ঃ 'তেরশত বছর পরে (এ কথা বাবা ভুপেন্দ্র আজ থেকে দেড়শত বছর পূর্বে লিখেছেন।) এ কুরআনের শিক্ষার এই প্রভাব বর্তমান আছে যে, এক দীনহীন মুসলমান হবার পর বড় বড় বংশীয় মুসলমানদের সমতা দাবি করতে পারে।'

বাবু বিপেন চন্দ্র পাল ঃ 'কুরআনের শিক্ষার মধ্যে হিন্দুদের মতো জাত পাতের পার্থক্য নেই, কাউকে শুধু বংশমর্যাদা এবং সম্পদশালীর ভিত্তির ওপর বড়ও মনে করা হয় না।'

মিসেস সরোজিনী নাইডু ঃ 'কুরআন কারীম অমুসলমানদের থেকে অগোঁড়ামি এবং উদারতা শিক্ষা দেয়, দুনিয়া-এর অনুসরণের দ্বারা ভালো অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।'

মহাত্মাগান্ধী ঃ 'কুরআনকে ঐশী কিতাব মেনে নিতে আমার মধ্যে অণুপরিমাণ চিন্তার প্রয়োজন নেই।'

চাঁদ এবং কুরআন

প্রকৃতির প্রকাশ ঃ চাঁদ মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুলের অগণিত প্রকৃতির মধ্যে থেকে একটি। মানুষ সর্বদা প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার জন্য উদগ্রীব রয়েছে। আসমানের দিকে দৃষ্টি বুলায়, সে অগণিত তারকা, গ্রহ, সূর্য, চাঁদ দেখে চিন্তা করে এদের সৃষ্টি কীভাবে হলো? এই শক্তিশালী এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনার মূল কোথায়? এই সুন্দর প্রকৃতির প্রকাশ-এর সৃষ্টির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়া কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এসব নির্দশন এবং বাস্তবতার ওপর চিন্তা করার আহ্বান জানায়।

চাঁদ এবং কুরআন মাজীদ ঃ বহু কুরআনের আয়াত এ সব প্রকৃতির প্রকাশের রহস্যের পর্দা উঠিয়ে থাকে। ৩১ নং সূরা লুকমানের ২৯ নম্বর আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِىْ النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِىْ الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ـ

অর্থ : তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ তআলা রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে? তিনি সূর্য এবং চাঁদকে নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

সূরা নূহ-এর ১৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

অর্থ : এবং আল্লাহ্ চাঁদকে জ্যোতি বানিয়েছেন এবং সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল প্রদিপের মতো।

চাঁদের চলমানতা সম্পর্কে আল-কুরআনের ১০ নং সূরা ইউনুসের ৫ নং আয়াতে তিনি বর্ণনা করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَاخَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : তিনিই সে মহান সত্তা (আল্লাহ্) যিনি সূর্যকে প্রখর তেজোদীপ্ত করে বানিয়েছেন এবং চাঁদকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময়। অতঃপর আকাশে তার জন্যে

কিছু মনযিল তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে এ নিয়ম দ্বারা তোমরা বছর গণনা এবং (দিন তারিখের) হিসাবটা জানতে পার। আল্লাহ্ তাআলা যেসব জিনিস পয়দা করে রেখেছেন তার কোনোটাই তিনি অনর্থক করেন নি'। যারা এ সম্পর্কে জানতে চায় তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা তার নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন।

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ -

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলাই রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকেই মহাকাশের কক্ষ পথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

১৪ নং সূরা ইবরাহীমের ৩৩ নং আয়াতে ....

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

অর্থ : তিনি চন্দ্র-সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, উভয়ে (একই নিয়মে) চলে আসছে, আবার রাত দিনকেও তোমাদের অধীন করেছেন।

৫৫ নং সূরা আর রাহমানের ৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন– اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 'সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব মোতাবেক চলছে।'

চাঁদ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ঃ সব খোলা দেহের মধ্যে সবচে' নিকটবর্তী মানুষের নিকট পরিচিত একটি পুরাতন আকৃতি হলো চাঁদ। অতীত কাঠামোতে দক্ষগণ এই চাঁদ ব্যতীত অন্য কোন চাঁদের অস্তিত্বের বক্তা ছিলেন না। অথচ নতুন কাঠামোতে-এর সংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সূর্যের ব্যবস্থাপনায় চন্দ্রের সংখ্যা চল্লিশেরও অধিক। কিছু কিছু গ্রহের পাশে কয়েকটি চাঁদ ঘূর্ণন করছে। চাঁদ ততটা সুন্দর নয়, সাধারণ চোখে যতটা সৌন্দর্য চোখে পড়ে। কবিগণ চাঁদের অনেক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন অথচ এ সবই ভাসা ভাসা জ্ঞানের কথা। বাস্তবে চাঁদ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত।-এর উপরিভাগ পৃথিবী থেকেও অসমতল।

চাঁদের উপরিভাগে অসংখ্য পাহাড়, টিলা, নিচু এবং গভীর স্থান, পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা, প্রশস্ত ময়দান, আলোহীন নিশানা ও চিহ্ন, আগ্নেয়গিরি, পাহাড় সমান দাবানো ঢাল, বহু বর্গমাইল নিয়ে অসংখ্য গভীর খাদ ও গর্ত রয়েছে। অভিজ্ঞগণ বড় বড় দূরবীন দ্বারা প্রত্যক্ষ করার পর বলেছেন যে, চাঁদের এই দিকে যা আমাদের দিকে তাতে আগ্নেয়গিরির গর্তের সংখ্যা ষাট হাজার (৬০০০০)-এর অধিক। চাঁদের এসব গর্ত খুবই গভীর।-এর কয়েকটির গভীরতা ৫৪০০ (পাঁচ হাজার চার শত) মিটার।

অভিজ্ঞগণ এও বলেছেন যে, চাঁদের উপত্যকার সংখ্যা, আমাদের দিকের পিঠে ১০,০০০ (দশ হাজারের) ও অধিক।-এর মধ্যে কিছু উপত্যকা খুবই প্রশস্ত এবং কিছু সংকীর্ণ মনে হয় যেন, সেগুলো সাগর নদীর স্থান।

চাঁদের উপরিভাগে পাহাড়ের অসংখ্য ধারা, প্রত্যেক দলে অনক পাহাড়-এর মধ্যে একটি দলে তিন হাজারের অধিক পাহাড়ের চূড়ার সমাবেশ রয়েছে। এ পাহাড়গুলোর মধ্যে কিছু একেবারেই উঁচু এবং কিছু কম উঁচু-এর মধ্যে কিছু পাহাড় এমনও রয়েছে যা পৃথিবীর পাহাড়ের চাইতেও উঁচু। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিমালয়ের এভারেস্ট যা ২৯,০০০ (উনত্রিশ) হাজার ফুটের চাইতে একটু বেশি, যেখানে চাঁদের একটি পাহাড়ের উচ্চতা ছত্রিশ হাজার (৩৬,০০০) ফুট, এবং আরেকটি পাহাড়ের উচ্চতা আটাশ হাজার ফুট (২৮০০০)। বিজ্ঞানিগণ এ সব পাহাড়ের নাম বিখ্যাত পণ্ডিতদের নামানুসারে রেখেছেন। যেমন ঃ এরিস্টোটল, প্লেটো, বাটলিমুস, পাকরান, কোপার্নিকাস ইত্যাদি পাহাড়।

চাঁদের দুটি অংশ সুন্দর। যা আমাদের দৃষ্টিতে আসে। বাস্তবে তা এসব উঁচু পাহাড়, যাতে সূর্যের আলো সুন্দরভাবে আমাদের দিকে প্রতিবিম্বিত হয়। বাকি চাঁদের উপরিভাগে আমাদের নজরে আসে কিছু কালো দাগ। এ দাগগুলো বাস্তবে দু'জিনিস। প্রথমে পাহাড় এবং টিলার কালো ছায়া যা থেকে সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত হতে পারে না।

পৃথিবীতে বাতাস রয়েছে, এজন্য পৃথিবীর ছায়ায় উত্তম বিশেষ আলো হয় কিন্তু চাঁদের ওপর বাতাস নেই। এজন্য ওখানে দিনের বেলায়ও ছায়ায় রাতের অন্ধকার হয়। এটা চাঁদের কলঙ্কের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো ঐ প্রশস্ত ময়দান যাতে আগ্নেয়গিরির উৎস ছড়িয়ে আছে। ঐ উৎসগুলো যেহেতু কালো/অন্ধকার, এজন্য এখান থেকে সঠিকভাবে সূর্যের আলো, প্রতিবিম্বিত হয় না, এই কারণে আমাদের নিকট চাঁদের উপরিভাগে কালো দাগের মত দৃষ্টিগোচর হয়।

এ সব কালো দাগ অর্থাৎ 'নিমজ্জিত'-এর দিকে ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা)-এর ১২ নং আয়াতে মহান রব ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً ـ

অর্থ : আমি রাত দিনকে দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, রাতের নিদর্শনকে আমি নিমজ্জিত করে দিয়েছি, আর দিনের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকময় যাতে

তোমরা তোমাদের মালিকের রিযিক সংগ্রহ করতে পার। তোমরা-এর মাধ্যমে বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার। এর সব বিষয়ই আমি খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।

চাঁদের দৈর্ঘ্য বা গুরুত্ব ঃ চাঁদ খুবই ছোট। চাঁদ পৃথিবীর ৪৯ (উনপঞ্চাশ) ভাগের এক ভাগ।

চাঁদের ব্যাস ঃ চাঁদের ব্যস দুই হাজার একশ ষাট (২১৬০) মাইল। যা পৃথিবীর ব্যাসের চারভাগের এক ভাগ থেকে কিছু বেশি।

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঃ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়ে ছয় গুণ বেশি। চাঁদের ব্যাস এবং গুরুত্ব পৃথিবীর মুকাবিলায় অনেক কম। এজন্য-এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও অনেক কম।-এর ফল এই যে, যে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ছয় মণ হবে, চাঁদে তার ওজন এক মণ হবে। (যদিও উভয় পাল্লার বস্তুর ওজন একই হারে কমে যাবে। অর্থাৎ ছয় মণ ওজনের পাথর দ্বারা ওজন করলে ছয় মণ ওজনের বস্তুই পাওয়া যাবে। তবে দুনিয়ার মানুষের নিকট তা হাল্কা মনে হবে মাত্র।)

পানি এবং হাওয়া ঃ চাঁদে পানি এবং বায়ু নেই। তা একটি বিরাণ এবং উষর স্থান। এরূপে চাঁদের ওপর বীজ, সব্জি, বৃষ্টি এবং জীবনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ এ বিষয়গুলো পানি এবং বায়ুর ফলাফল এবং-এর প্রভাবেই হয়।

শব্দের অনুপস্থিতি ঃ আমাদের মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হয়-এর মাধ্যমে বায়ুতে-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। যখন তা কানের ওপর আঘাত করে তখন আমরা শব্দ শুনতে পাই। অতএব শব্দ মূলত বায়ুর এ সব-তরঙ্গমালার নাম। আর যেহেতু চাঁদের মধ্যে বায়ু নেই, এজন্য ওখানে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের আওয়াজ শুনবে না।

চাঁদের ঘূর্ণন ঃ পৃথিবী থেকে চাঁদের মধ্যম দূরত্ব দু লক্ষ চল্লিশ হাজার (২৪০০০০) মাইল। চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চক্কর দেয়। চাঁদের এই ঘূর্ণনকে এক চান্দ্র মাস বলা হয়। চাঁদের এই ঘূর্ণনে ২৭ দিন সাত ঘণ্টা ৩৪ মিনিট লাগে।

চাঁদের কেন্দ্রীয় ঘূর্ণন ঃ চাঁদ নিজের কেন্দ্রের ওপরও ঘোরে। চাঁদ তার কেন্দ্রীয় ঘূর্ণনের চক্রও এ সময়ে শেষ করে, যে সময়ে পৃথিবীর চার দিকে এক বার ঘোরে। চাঁদের উভয় ঘূর্ণনের সময় একই যাতে চাঁদের দিন এবং মাসের সময় একই হয়। দ্বিতীয় ফল এই যে, চাঁদের রোখ সর্বদা একই আমাদের দিকে হয় এবং দ্বিতীয় দিক আমাদের দিক থেকে গোপন থাকে। এজন্য চাঁদের একদিন আমাদের চৌদ্দ দিনের সমান এবং এক চাঁদের রাত চৌদ্দ রাতের সমান হয়। চাঁদের দিন প্রচণ্ড গরম হয় এবং-এর রাত সীমাহীন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

চাঁদের বিভিন্ন প্রকাশ ঃ যেহেতু চাঁদের নিজের আলো নেই। সে জমিনের মতই ময়লা, ধুলা, পাথুরে মাটি এবং অনুজ্জ্বল ময়দানে ভরা। সে অন্ধকার রাতের মত, আলো সূর্য থেকে অর্জন করে। চাঁদ পৃথিবীর দিকে আছে, এজন্য সে সূর্যের আলোকের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিতে আসে। এ কারণে সর্বদা চাঁদের অর্ধাংশ যা সূর্যের দিকে তা সূর্যের দ্বারা আলো নজরে আসে, একই সময়ে বিপরীতে দ্বিতীয় অর্ধেক অংশ সর্বদা অন্ধকার এবং অনালোকিত হয়।

যেহেতু চাঁদ সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত করে চমকিত হয় এবং নিজস্ব আলো নেই, এজন্য আমরা চাঁদকে বিভিন্ন আকার-আকৃতি (পূর্ণ চাঁদ, নতুন চাঁদ, অর্ধ চাঁদ) ইত্যাদিতে দেখি। যদি চাঁদের নিজস্ব আলো থাকতো তাহলে সর্বদা চাঁদকে পূর্ণ দেখা যেত। ৩৬ নং সূরা ইয়াসীনের ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۔

অর্থ : চাঁদের জন্য আমি বিভিন্ন চলার স্থান নির্ধারণ করেছি, পরে তা খেজুরের শুকনো ডালের ন্যায় হয়।

৮৪ নং সূরা ইনশিকাকের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ **অর্থ :** চাঁদের কসম, যখন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান কুরআনের বর্ণনাকেই পরিষ্কার করছে। বিজ্ঞান যা আজ বর্ণনা করছে কুরআন তা চৌদ্দশত ত্রিশ বছর পূর্বেই বর্ণনা করেছে।

কুরআন এবং ১৯-এর প্রকৌশল ঃ এ অধ্যায়ে বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার-এর সাক্ষ্য দ্বারা কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআন কারীমের সাথে ১৯-এর প্রকৌশল সম্পর্কে বড়ই সৌন্দর্যের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআন ঃ ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন কোন দ্বীনের নবী এসে আল্লাহ তায়ালার বাণী দুনিয়াবাসীকে দেয় তখন লোকেরা সর্বদাই তাঁদের নিকট এ বাণীর সত্যতার জন্য প্রমাণ চেয়েছেন। এরূপে যখন সত্যের পথপ্রদর্শক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ আগমন করেন এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর একত্ববাদ এবং স্বীয় রিসালাত-এর ঘোষণা করেন তখন লোকেরা ঐ ভাবে প্রমাণ চাওয়া আরম্ভ করল যেমনভাবে পূর্ববর্তী লোকেরা করছিল। তাদের দাবি কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

২৯ নং সূরা আনকাবুত আয়াত নং - ৫০

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط

অর্থ : এবং কাফেররা বলল– কেন তাঁর ওপর তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না?

এসব লোক রাসূল ﷺ-এর নিকট বলল যে, আপনি আসমান পর্যন্ত সিঁড়ি লাগান এবং আমাদের সামনে-এর ওপরে চড়ে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব নিয়ে আসুন তখন আমরা ঈমান আনব। এ সময় ২৯ নং সূরা আনকাবুত-এর ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হুজুর ﷺকে নির্দেশ দিলেন–

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থ : আপনি বলে দিন যে, নিদর্শন তো আল্লাহর নিকট, আমি তো শুধু একজন ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র।

কুরআন মাজীদে কাফিরদের প্রকৃতির বাইরে নিদর্শন দাবির প্রেক্ষিতে উত্তর দিয়েছেন। ২৯ নং সূরা আনকাবুত-এর ৫১ নং আয়াতে–

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ : ঐ লোকদের জন্য এই নিদর্শন কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করি যা তাদের সামনে পড়া হয়, নিশ্চয়ই-এর মধ্যে রহমত, উপদেশ রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

মাবুদের কালাম ঃ

কুরআন মাজীদ স্বয়ং আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে দুটি প্রমাণ পেশ করে।

১. নবী করীম ﷺ নিরক্ষর ছিলেন। নবী করীম ﷺ কারো থেকে পড়া শিখেন নি। কোথাও কোনো শিক্ষাগ্রহণ করেন নি। (এ বিষয়ের সত্যায়ন অগণিত অমুসলিম ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞবানদের দ্বারা প্রমাণিত– এক কথায় এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য) এজন্য এ মহান কিতাব রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বারা সম্ভবই নয়। এভাবে কুরআন মাজীদ সাক্ষ্য প্রদান করে।

২৯ নং সূরা আনকাবুত-এর ৪৮ নং আয়াতে, মহান রব ইরশাদ করেন –

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনি তো ইতোপূর্বে কোনো কিতাব পড়েন নি, আর আপনি আপনার ডান হাত দ্বারা লিখেনও নি, অথচ বাতিলপন্থীরা সন্দেহ করে।

যদি নবী করীম ﷺ জ্ঞানী হতেন এবং লেখা-পড়া জানতেন, তা হলে এ ধরনের সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতো যে, নবী পাক ﷺ ইহুদি খ্রিস্টানদের কিতাব এবং প্লেটো এরিস্টোটলের লেখা পড়ে সুন্দর করে মিষ্টি ভাষায় কুরআন রচনা করেছেন। অথচ কুরআন মাজীদ এবং ইতিহাস এ ধরনের সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে নি।

২. কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ স্বয়ং এ কথার প্রমাণ যে, এটা আল্লাহর কালাম। এটা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ করে যে, তোমরা পূর্ণ কুরআন মাজীদ, কিংবা কমপক্ষে-এর একটি সূরা নিয়ে আসো। যদি এক সূরা না পার তাহলে কুরআনের অনুরূপ একটি আয়াত নিয়ে আসো। কিন্তু তোমরা সারা পৃথিবীর লোক মিলেও কুরআনের মতো করে একটি আয়াতও আনতে পারবে না। কেননা এটা আল্লাহর কালাম এবং সৃষ্টি স্রষ্টার মতো কালাম আনতে পারবে না। মহান রব ২ নং সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : এবং যদি তোমরা (হে কাফিরগণ) সন্দেহের মধ্যে থাক, আমি আমার বান্দার ওপর যা অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো এবং তোমাদের সাহায্যকারীদের ডাক, আল্লাহকে ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা তা না পার এবং তোমরা কখনোই তা পারবে না, তাহলে তোমরা ভয় করো সে আগুনকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, তা নির্ধারণ করা হয়েছে কাফিরদের (কুরআন অস্বীকারকারীদের) জন্য।

তিনি ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৮৮ নং আয়াতে আরো ইরশাদ করেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ : (হে রাসূল) বলুন! যদি জ্বিন এবং ইনসান একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের মতো একটা জিনিস নিয়ে আসবে, তারা আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।

এর বাইরেও কুরআন মাজীদ কাফিরদের বলে যে, একে অধ্যয়ন করো এবং কোনো গবেষণার চোখ দিয়ে দেখ, তোমাদের মানতে হবে যে, এটা আল্লাহর কালাম।

৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে মহান রব বলেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا۔

অর্থ : তারা কি কুরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা-এর মধ্যে অনেক মতানৈক্য পেতো।

কোন মানুষের লেখা যা তেইশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল একরূপ এবং এক রং-এর হবে না। বিশেষত যখন কোনো লেখকের জিন্দেগী অগণিত সমস্যা ঘেরা থাকবে। যাকে রাজনৈতিক, সামাজিক, জীবন এবং প্রতিরোধমূলক কার্যাবলী রাত দিন যাকে পেশ করতে হয়েছে, শত্রুর রাগের প্রবাহ যার বিপরীত ধারাবাহিকভাবে চলছিল। এ ধরনের মানুষের লেখার মধ্যে নিশ্চিতই কোথাও না কোথাও বিপরীত হবে, এলোমেলো, ভিন্নতা এবং উঁচু-নিচু হবে এবং ভাষা ও পরিভাষার পার্থক্য হবে অবশ্যই। অথচ কুরআন মাজীদ পুরোপুরি এক রং এক ধরনের। কোথাও কোনো মতানৈক্য নেই, বৈপরীত্য নেই, কোনো অজ্ঞতা নেই। ভাষার মিষ্টতা এবং বাগ্মিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জারি এবং চালু আছে। এভাবে কুরআন মাজীদ, ফুরকানে হামীদ স্বীয় সত্যতার চিহ্ন, অকাট্য প্রমাণ, এক জীবন্ত, অঢেল এবং নিশ্চিত মুজিযা।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্য ঃ বর্তমান দুনিয়ায় প্রায় ৯০ কোটি (কেউ ১০০ কোটি অন্যরা ১২০ কোটি বলে থাকেন। তবে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের সংখ্যা ৯০ কোটির বেশি হবে না। অনুবাদক,)-এরও বেশি মুসলমান আছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, কুরআন মাজীদ, ফুরকানে হামীদ কিতাবে ইলাহী এবং এক স্থায়ী মুজিযা। মুসলমানদের ওপর কি আর সীমাবদ্ধ থাকবে দুনিয়ার কয়েকজন বড় বড় অমুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তিও-এর মুজিযার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পাদ্রী বাসভার্থ স্মীথ বলেন–

'নিঃসন্দেহে কুরআনে হাকীম বর্ণনা, বীরত্ব ও সত্যবাদিতার এক মুজিযা।'

অন্য একজন ইংরেজ এ. জে. বেরী লিখেন ঃ

'কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার স্বর মাধুর্যের আনন্দ এবং হৃদয়ের কম্পন শুনিয়ে দেয়।'

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত অমুসলিম অথবা নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ একথা বলে যে, আমি আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ জন্য আমি কুরআন মাজীদের ভাষার বড়ত্ব এবং শিক্ষার অনুমান করতে পারি না। যেহেতু আমরা এগুলো বুঝি না তাহলে আমরা কীভাবে বুঝবো যে, কুরআন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং

তা একটি মুজিযা? এ ধরনের পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের নিকট পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর মিলবে যে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে এ সৃষ্টিকুল বস্তুর একটি বিশাল পিণ্ড ছিল এবং বস্তুর একটি বিশাল বড় টুকরা ছিল, অতঃপর এই বিশাল খণ্ডের মধ্যে মহা বিস্ফোরণ ঘটলো তখন বস্তুর বড় বড় অংশ ছুটে খালি স্থানের সব কক্ষ পথে উড়তে লাগলো। এই বিস্ফোরণের ফলে আমাদের শৃঙ্খলায় সূর্য এবং গ্রহ ও নক্ষত্রগুলোও অস্তিত্বে আসে এবং সব গ্রহ-নক্ষত্র স্ব-স্ব পথে ঘুরতে থাকে।

অতঃপর আমরা এ সব বৈজ্ঞানিকদের নিকট জিজ্ঞেস করি আপনাদের এ বিষয়ে জ্ঞান কবে হলো? তখন সে উত্তর দেয় যে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে এ কথার আবিষ্কার হয়েছে। এরপরে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে, সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে বালুময় আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তির এ জ্ঞান ছিল? তাহলে জওয়াব আসবে কখনো নয়। তখন আমি তাকে বললাম আরবের এই নবী যিনি নিরক্ষর চৌদ্দশত ত্রিশ বছর পূর্বে এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছিলেন।

২১ নং সূরা আম্বিয়ার আয়াত নং - ৩০

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط

অর্থ : অবিশ্বাসীরা কি দেখে নাই যে, আসমানসমূহ ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমিই তাদের পৃথক করেছি।

এবং এ আয়াত ও কুরআন মাজীদে রয়েছে, যাকে এই নিরক্ষর নবী তিলাওয়াত করেছিলেন–

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াত–

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকে (নিজ নিজ) কক্ষপথে ঘুরছে।

কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদের এ আয়াতগুলো বৈজ্ঞানিকগণ এবং অভিজ্ঞ আকাশ বিজ্ঞানীদের জন্য চিন্তার আহ্বান জানায়। সে কি বুঝে না যে, বিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কার আধুনিক যুগে করেছে ঐ সব ঘটনার আবিষ্কার আজ থেকে ১৪০০ (চৌদ্দশত) বছরেরও পূর্বে আরবের মরুভূমির একজন নিরক্ষর নবী করীম ﷺ এর ওপর ভার আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে দিয়েছিলেন এবং এ

নিরক্ষর নবী ঐ সময় এসব আয়াত তিলাওয়াত করে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যার আবিষ্কার বিজ্ঞান আজ মাত্র করলো।

অতঃপর কিছু দক্ষ জীববিজ্ঞানী (Biologist)-এর নিকট জিজ্ঞেস করি এ পৃথিবীতে জীবন সর্বপ্রথম কোনো স্থান থেকে অস্তিত্বে আসে? উত্তর আসবে কোটি কোটি বছর পূর্বে সামুদ্রিক বস্তুর মধ্যে জীবনের বস্তু আরম্ভ হয় যা থেকে এ্যামিবা (Ameba) সৃষ্টি হয় এবং এ সব এ্যামিবা থেকে সব প্রাণীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনের শুরু সমুদ্র অন্য কথায় পানি থেকে, ব্যাখ্যা দানের পর জীববিদ্যার অভিজ্ঞরা এও বলবে যে, এই সত্যের জ্ঞান আধুনিক যুগে হয়েছে এবং আমি-এর থেকে যদি জিজ্ঞেস করি যে, যদি এ কথার জ্ঞান আরবের মরুভূমির অধিবাসিগণ নিরক্ষর ব্যক্তি যদি আজ থেকে চৌদ্দশত ত্রিশ বছর পূর্বে পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সে না বোধক উত্তর দিবে। আবার বলা হলো আল্লাহ তাআলা একথার প্রকাশ তো আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে নিরক্ষর নবীর ওপর করেছিলেন। যদি সে না মানে তাহলে তাকে কুরআন মাজীদের এ আয়াত শুনান–

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াত -

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۔

অর্থ : এবং আমি পানি থেকে সব জীবিত জিনিস সৃষ্টি করেছি, সে কি বিশ্বাস করে না?

এভাবে উদ্ভিদ বিদ্যার (Boilogist) প্রাণী বিদ্যার (Zoologist) প্রকৃতি বিদ্যার (Physicists) পণ্ডিতদের প্রশ্ন করুন যে, প্রাণী বস্তুর সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম কী? সকলে এই উত্তরই দিবে যে আধুনিক যুগে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ এবং প্রাণীর সৃষ্টির পদ্ধতি এমনকি গাছপালার সৃষ্টিও জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ নারী-পুরুষ থেকে হয়ে থাকে। অথচ এ সত্যের প্রকাশ আমাদের নবী করীম ﷺ বহু বছর আগে করেছিলেন যার জ্ঞান আল্লাহ তাআলা অহীর মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে প্রদান করেছিলেন। চিন্তা করুন আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের ৩৬ নং সূরা ইয়াসীন-এর ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সকলকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যা ভূমি উৎপন্ন করে। আর যা তোমাদের মধ্যে থেকে, আর যা সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিজ্ঞান এবং মানুষ মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি আবিষ্কার থেকে কুরআন মাজীদের মুজিযাগুলোর প্রমাণ মিলে যায়, এ হলো ঐ সব নিশানা যা মহান রব জ্ঞানবানদের জন্য স্থায়ী কিতাব কুরআন মাজীদে বারবার এসেছে। ৩০ নং সূরা রুম-এর ২২ নং আয়াতে–

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ ۔

অর্থ : নিশ্চয়ই-এর মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য নিদর্শন রয়েছে।

গণিত এক কম্পিউটারের সাক্ষ্য

কম্পিউটার বলে যে, ৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ জন মানুষ মিলেও কুরআনের মতো এতো বড় কিতাব লিখতে পারবে না।

পিছনে বর্ণিত কুরআনি মুজিযাগুলো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোকদের জন্য ছিল অথচ আজ যখন কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও গণিতে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে যে কম্পিউটারের এ যুগের জন্যও কি কুরআন মাজীদে মুজিযা রয়েছে?

'মুজিযা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'ঐ কাজ যা মানুষের ক্ষমতা ও আওতার বাইরে।' শুকরিয়ার বিষয় হলো এই যে, এ যুগের বিজ্ঞানী, নাস্তিক এবং অমুসলমানদের ওপর বিজ্ঞান, গণিত এবং কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা এটা প্রকাশ করতে পারছি যে, কুরআন মাজীদ সর্বশেষ এবং স্থায়ী মুজিযা। গণিতের নিয়ম সর্বদা একরূপ এবং অপরিবর্তনীয় এবং কম্পিউটার ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সত্যগুলো বর্ণনা করে। এ যুগে কুরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।

গণিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের মুজিযা বুঝার জন্য আরবি ভাষা জানা আবশ্যক নয়। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ এ মুজিযাকে দেখার জন্য চোখ রাখবে এবং এক থেকে উনিশ পর্যন্ত গুণতে জানবে। কুরআন মাজীদের ধারা অহী অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতায় নয় বরং বর্ণনা অনুযায়ী করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ স্বয়ং নিজ হায়াতে তাইয়েবায় এ ধারা বর্ণনা করেছেন। কুরআনের আয়াত প্রয়োজনানুযায়ী অবতীর্ণ হতে থাকে। প্রথম অহী হেরা গুহায় রমজানের ছাব্বিশ তারিখ (দিবাগত রাতে) আসে যখন হযরত জীব্রাঈল (আ) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে এটা সাতানব্বই নম্বর সূরা। হুজুর ﷺ এ অস্বাভাবিক ঘটনার পরে পেরেশান হয়ে ঘরে ফিরেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-কে পূর্ণ বক্তব্য বললেন। তিনি হুজুর ﷺ -কে সান্ত্বনা দিলেন।

অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ, তাঁর রিসালাত এবং আখিরাতের ওপর ঈমান আনার জন্য তাবলীগ শুরু করেন, যা মক্কার কাফিরদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো না। প্রত্যুত্তরে মক্কার কাফিরগণ প্রোপাগান্ডা চালালো যে মুহাম্মাদ ﷺ দিওয়ানা ও পাগল (নাউযুবিল্লাহ)। মক্কার কাফিরদের এ প্রোপাগান্ডার মধ্যে সূরা 'আল কলম' অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদে এটা ৬৮ নং সূরা। এতে একথার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, তিনি পাগল নন এবং সাথে সাথে হুজুর ﷺ কে উসওয়াতুন হাসানা (উত্তম আদর্শ) এবং উচ্চ মর্যাদাশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অহী সূরা মুয্‌যাম্‌মিল-এর কয়েকটি প্রাথমিক আয়াতের আকারে এসেছে। এটা ৭৩ নং সূরা ৫ নং আয়াত যার আখেরী আয়াত হলো–

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً .

"আমি শীঘ্রই আপনার ওপর ভারী কালাম নাযিল করবো।"

নবী করীম ﷺ ইসলামের দাওয়াতবিধি মোতাবেক চালু রাখেন। লোকেরা আস্তে আস্তে ঐ দাওয়াতের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং বুঝতে থাকে যে, কুরআন মাজীদ কোনো পাগলের প্রলাপ হতে পারে না এবং এটা সুমহান রবের মহান কালাম। কেননা এরূপ স্পষ্ট ও বাগ্মী কালাম কোনো পাগলের হতে পারে না। যখন লোকেরা নবী করীম ﷺ এবং কুরআনের সত্যতা মানতেই শুরু করলো-এরপর মক্কার কাফিরগণ এটা বলতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ যাদুকর এবং কুরআন মুহাম্মাদের কালাম, আল্লাহর কালাম নয়। এ সময় চতুর্থ অহী আসে যা কুরআন মাজীদের ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছির-এর প্রাথমিক ৩০ আয়াত হিসেবে অবতীর্ণ হয়। হযরত জীব্রাঈল (আ) হুজুর ﷺ -কে এই সূরার প্রাথমিক ২৯ নং আয়াত দিয়ে ৩০তম আয়াতের দিকে মনোযোগ দেন যা হলো ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছির, ৩০ নং আয়াত–عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ তাঁর ওপরে রয়েছে ঊনিশ। বিশতম এবং পঁচিশতম আয়াতে মক্কার কাফিরদের যে প্রোপাগান্ডার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যে বর্ণনা করেন তা যাদু এবং এই যে, কুরআন নবী করীম ﷺ-এর নিজের বাণী– ..... এবং ছাব্বিশতম আয়াতে মক্কার কাফিরদের এই কর্মের ওপর আল্লাহ তাআলা নিজের রাগ ও গোস্বার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার ওপর এরূপ অভিযোগকারীদের খুব তাড়াতাড়ি দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। ২৮নং এবং ২৯ নং আয়াতে দোযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে,-এর মধ্যে মানুষের রং হবে কালো.... এবং-এর পরেই ৩০ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭৪ নং সূরা র৩০ নং আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর ঊনিশ'।

জীব্রাঈল (আ) এখানে সূরা মুদ্দাচ্ছির-এর ৩০ তম আয়াত পর্যন্ত থেমে গেলেন এবং-এরপর তৎক্ষণাৎ সূরা ইকরা (আলাক)-এর বাকি ১৪ আয়াত নবী করীম ﷺ কে দিলেন।

এ প্রশ্ন উঠেছে যে, এরূপ কেন হলো? কুরআন মাজীদের এ আয়াত 'এরপর ১৯'-এর উদ্দেশ্য কি? এবং এ বিষয়টাই বা কি? মুফাস্‌সিরীনগণ এ আয়াতের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন দোযখের উল্লেখের পর-এর আয়াত এসেছে। এজন্য-এর উদ্দেশ্য ঐ ১৯ ফেরেশতা যারা দোযখে পাহারাদার। কেউ বলেন, এটা ইসলামের ১৯টি মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু প্রত্যেকেই লিখেছেন যে মূল বিষয়টি আল্লাহই জানেন। এরূপ মনে হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা এ জটিলতার সমাধান

বিংশ শতাব্দীর কম্পিউটারের যুগের জন্য রাখা হয়েছে। যেমন ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব্রাঈল (আ) প্রাথমিক অহী সূরা ইকরা (আলাক)-এর (যার প্রথম পাঁচ আয়াত প্রথম অহীতে অবতীর্ণ হয়েছিল) বাকি ১৪ আয়াত নবী করীম ﷺ কে দেন। এভাবে সূরা ইকরা (আলাক)-এর ১৯ আয়াত পূর্ণ হয়ে গেল। অর্থাৎ সূরা মুদ্দাসসির-এর عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর উনিশ' বলার পর তৎক্ষণাৎ উনিশ আয়াতের সূরা ইকরা পূর্ণ হয়ে গেল।

১৯-এর প্রকৌশল

মহান রব-এর ঘোষণা ঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর উনিশ' ৭৪ নং সূরা মুদ্দাসসির-এর ৩০ নং আয়াত।

এই ১৯-এর প্রকৌশল-এর কিছু ব্যাখ্যার দিকে গেলে হতভম্ব করা কথাবার্তা সামনে আসবে। এমন মানব মস্তিষ্ক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার ঘেরাও-এর মধ্যে ডুবে যায় এবং হৃদয় অজান্তে বলে উঠে যে, এই কিতাব ... এই কুরআন ... কোনো মানুষের বাণী নয় বরং এটা রহমান, রাহীম-এর বাণী। কিছু ব্যাখ্যা পেশ করা হলো–

১. সূরা আলাক-এর ১ম পাঁচ আয়াতে ১৯টি শব্দ এবং ঐ উনিশ শব্দের মধ্যে ৭৬ টি অক্ষর যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি ভাগ হয়ে যায়। ৭৬ ÷ ১৯ = ৪

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৪ = ৭৬।

যোগের উদাহরণ ১৯ + ১৯ + ১৯ + ১৯ = ৭৬

২. কুরআন মাজীদে ১১৪ টি সূরা আছে, এ সংখ্যাও ১৯ দ্বারা পূর্ণভাবে ভাগ করা যায়।

ভাগের উদাহরণ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৬ = ১১৪

৩. কুরআন মাজীদের সূরাগুলো উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ ১১৪ নং সূরা নাস, ১১৩ নং সূরা ফালাক, ১১২ নং সূরা ইখলাস, এভাবে গুণে আসলে ১৯ নং সূরা অর্থাৎ ৯৬ নং সূরাটি পড়ে সূরা আলাক।

৪. একথা কি পরিমাণ গুরুত্ব রাখে যে, কুরআন মাজীদের শুরু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। যার মধ্যে ১৯টি অক্ষর বা হরফ রয়েছে।-এর মধ্যে চারটি শব্দ ঃ ১. اسم ২. الله ৩. الرحمن ৪. الرحيم। এ আয়াতের প্রত্যেক শব্দ যতবার কুরআন মাজীদ এসেছে তা ১৯ দ্বারা বিভক্ত।

প্রথম শব্দ اسم। কুরআন মাজীদে ১৯ বার এসেছে। দ্বিতীয় الله। কুরআন মাজীদে ২৬৯৮ বার এসেছে। যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২

গুণের উদাহরণ ১৯ × ১৪২ = ২৬৯৮

তৃতীয় শব্দ الرحمن। ৫৭ বার এসেছে যা ১৯ দ্বারা পূর্ণভাবে বিভাজ্য। ভাগের উদাহরণ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩ গুণের উদাহরণ ১৯×৩=৫৭ চতুর্থ শব্দ الرحيم। একশত চৌদ্দ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৬ = ১১৪

চিন্তা করুন চার শব্দের সংখ্যাই ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য। এ ধরনের হওয়া কোনো সাধারণ বিষয় নয়।

৫. بسم الله الرحمن الرحيم আয়াত সূরা আন নামলে দুবার এসেছে। একবার শুরুতে এবং দ্বিতীয়বার ভেতরে। ... এ জন্য সূরা তাওবার শুরুতে بسم الله। الرحمن الرحيم। নেই, অন্যথায়-এর সংখ্যা ১১৫ হয়ে যেত এবং ১১৫ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না (কুরআন মাজীদে সমগ্র সূরার সংখ্যা ১১৪ এবং সূরা তাওবাহ ব্যতীত সব সূরার প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم আছে।

৬. কুরআন মাজীদের ২৯টি সূরার শুরু হরফ দ্বারা হয়েছে অর্থাৎ হরূফে মুকাত্তায়াত দ্বারা হয়েছে। আরবি ভাষার ২৮ হরফের ১৪টি বর্ণ বিভিন্ন জোড়ের মাধ্যমে এ সূরাগুলোর শুরুতে অবস্থান নিয়েছে। এ হরফগুলো নিচে দেয়া হলো ঃ

১. الف ২. ح ৩. ر ৪. س ৫. ص ৬. ط ৭. ع ৮. ق ৯. ك ১০. ل ১১. م ১২. ن ১৩. ه ১৪. ى

এ ১৪ হরফ দ্বারা যে ১৪ সেট হরূফে মুকাত্তায়াত তৈরি হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. এক হরফবিশিষ্ট

১. ص ২. ق ৩. ن ৩ সেট

২. দুই হরফবিশিষ্ট ঃ

১. طه ২. يس ৩. طس ৪. حم ৪ সেট

৩. তিন হরফবিশিষ্ট ঃ

১. الم ২. الر ৩. طسم ৪. عسق ৪ সেট।

৪. চার হরফবিশিষ্ট

১. المر ২. المص ২ সেট

৫. পাঁচ হরফবিশিষ্ট ঃ

১. كهيعص ১ সেট

উল্লিখিত চিত্রের ওপর এবার চিন্তা করুন, বুঝা যায় যে, হরফে মুকাত্তায়াত যা ২৯ সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে, এগুলোর সংখ্যা ১৪টি এবং তাদের সেট সংখ্যা

১৪টি, এখন ১৪ হরফ + ১৪ সেট + ২৯ সূরা = ৫৭ সর্বমোট সংখ্যা ৫৭ ও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩ = ৫৭

যোগের উদাহরণ ঃ ১৯ + ১৯ + ১৯ = ৫৭

৭. হরফে মুকাত্তায়াত-এর মধ্যে ق নিন। এই হরফ ق দুই সূরার প্রথমে এসেছে, অর্থাৎ সূরা ق এবং সূরা শূরা حم عسق-এর আকারে। এগুলোর প্রত্যেক সূরায় ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩ = ৫৭

সূরা ق এ-ও ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে এবং حم عسق সূরার মধ্যেও ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে, যদিও শেষোক্ত সূরাটি অনেক দীর্ঘ।

উভয় সূরার মধ্যে ق-এর সমষ্টি ১১৪ এবং কুরআন মাজীদে সূরা সংখ্যাও ১১৪টি। অর্থাৎ কুরআন মাজীদে ১১৪টি সূরা রয়েছে এবং ق হরফ যা কুরআন মাজীদের প্রথম হরফ এবং তার নামের প্রতিনিধিত্ব করে তাও ১১৪ বার এসেছে। এভাবে এ কথা বলা বৈধ হবে যে, কুরআনের ঐশী আকারের হিসাবের ব্যবস্থা ১১৪ সূরার ওপর হয়েছে।

৮. কুরআন মাজীদে অতীতকালের গোত্রগুলোকে قوم শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ قوم نوح، قوم ثمود অথচ সূরা ق-এর ১৩ নং আয়াতে আল-কুরআন বর্ণনা করেন وعاد وفرعون واخوان لوط (এখানে) اخوان لوط বলার কারণ, হযরত লুত (আ)-এর কওম-এর উল্লেখ কুরআনে قوم শব্দ দ্বারাই সাধারণত উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ শুধু এ আয়াতে قوم শব্দের পরিবর্তে اخوان বিশেষভাবে কেন ব্যবহার করা হলো?

এর কারণ এই যে, যদি এখানে قوم শব্দটি ব্যবহার করা হতো তাহলে একটি ق বেড়ে যেত এবং এই সূরায় ق হরফের ব্যবহার ৫৭-এর পরিবর্তে ৫৮ হয়ে যেত তাহলে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না। এভাবে কুরআনের হিসাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যেতো।

৯. সূরা আল কলম-এর শুরুতে ن হরফ এসেছে এ সূরায় ن হরফটি ১৩৩ বার এসেছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৩৩ ÷ ১৯ = ৭

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৭ = ১৩৩

১০. হরফ ص টি কুরআন মাজীদের তিন সূরার প্রথমে এসেছে। সূরা আল আরাফে المص।-এর আকৃতিতে, সূরা মারিয়ামে كهيعص-এর আকৃতিতে,
সূরা হুদে ص-এর আকৃতিতে এই সূরার মধ্যে ব্যবহৃত ص-এর সংখ্যা ১৫২ যাকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

১১. সূরা আল আরাফের ৬৯তম আয়াতে একটি শব্দ بصطة এসেছে। আরবি এ শব্দ س দ্বারা লেখা যায় কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন এ নির্দেশও ছিল যে শব্দকে ص দ্বারা লেখা যাবে,-এর কারণ কি ছিল?

কারণ এই ছিল যে, যদি এই শব্দ س দ্বারা লেখা হয় এ অবস্থায় একটি ص কম হয়ে যায় এবং উল্লিখিত সূরাগুলোতে ص হরফের পূর্ণ সংখ্যা ১৫২-এর পরিবর্তে ১৫১ হয়ে যায় যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না এবং কুরআনে কারীমের হিসাবি নিয়ম ভুল হয়ে যাবে।

১২. যেসব সূরার শুরুতে এক হরফের অধিক হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা। এ সূরাগুলোর মধ্যে প্রত্যেক হরফ পৃথক পৃথক জমা করা যায়, তাহলে-এর সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। শুধু এই নয় বরং এ হরুফগুলোর স্ব স্ব সংখ্যা যদি একত্র করা হয় তাহলেও সামগ্রিক সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(ক) সূরা طه-এর মধ্যে দু হরফ ط এবং ه আছে। এ সূরায় ط অক্ষরটি ২৮ বার এবং ه ৩১৪ বার এসেছে এবং উভয়ের সমষ্টি ৩৪২ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৩৪২ ÷ ১৯ = ১৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৮ = ৩৪২

(খ) সূরা ইয়াসীনে ي আছে ২৩৭ বার এবং س আছে ৪৮ বার এবং উভয়ের সমষ্টি ২৮৫ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৫ = ২৮৫

আরো একটি বিস্ময়কর হাকীকত

কুরআন মাজীদের ২৯ নং সূরার শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তায়াত আছে এবং এ সূরাগুলো যতবার এ সূরাগুলোতে এসেছে এদের সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। বিস্তারিত নিয়ে পেশ করা হলো ঃ

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
বাকারা	الم	৯৯৯১	বার
আলে ইমরান	الم	৫৭১৪	বার
আন কাবুত	الم	১৬৮৫	বার
রূম	الم	১২৫৯	বার
লুকমান	الم	৮২৩	বার
সাজদাহ	الم	৫৮০	বার
রা'দ	المر (ر কে বাদ দিয়ে)	১৩৬৪	বার
আরাফ	المص (ص কে বাদ দিয়ে)	৫২৬০	বার

যোগ ফল ঃ ২৬৬৭৬ বার

এ সমগ্র সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ২৬৬৭৬ ÷ ১৯ = ১৪০৪

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৪০৪ = ২৬৬৭৬

২. হরূফে মুকাত্তায়াত الر নিম্নোক্ত সূরাসমূহের পূর্বে এসেছে। এ সূরাগুলোর মধ্যে এ হরফগুলোর সংখ্যার সমষ্টি নিচে দেয়া হলো এবং সূরা رعد-এর ر-এর হিসাব-এর টোটালের সঙ্গে যোগ করা হলো–

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
ইউনুস	الر	২৫২২	বার
হূদ	الر	২৫১৪	বার
ইউসুফ	الر	২৪০৫	বার
ইবরাহীম	الر	১২০৬	বার
হিজর	الر	৯২৫	বার
রা'দ	المر (শুধু ر)	১৩৫	বার

যোগ ফল ঃ ৯৭০৯

এই ৯৭০৯ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য

ভাগের উদাহরণ ঃ ৯৭০৯ ÷ ১৯ = ৫১১

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৫১১ = ৯৭০৯

৩. নিম্নলিখিত সূরাগুলোতে حم হরফ প্রথমে এসেছে। এদের সংখ্যা = ০৭ বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
মুমিন	حم	৪৫৩	বার
হামীম আসসাজদা حم	৩৩৪	বার	
যুখরুফ	حم	৩৬২	বার
দুখান	حم	১৬১	বার
জাছিয়া	حم	২৩১	বার
আহকাফ	حم	২৬৪	বার
শূরা	حم عسق	৩৬১	বার (শুধু ح এবং م)

মোট সংখ্যা ২১৬৬

২১৬৬ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য

ভাগের উদাহরণ ঃ ২১৬৬ ÷ ১৯ = ১১৪

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১১৪ = ২১৬৬

৪. সূরা শূরার মধ্যে পাঁচ হরুফ حم عسق রয়েছে।

এ পাঁচ হরফ ق، س، ع، م، ح এ সূরার মধ্যে সর্বমোট ৫৭০ বার রয়েছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭০ ÷ ১৯ = ৩০

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩০ = ৫৭০

৫. নিম্নলিখিত সূরাগুলোর মধ্যে ط-এর পরে س হরফ এসেছে।-এর মোট সংখ্যার ওপর চিন্তা করি

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
নামল	طس	১২০	বার
শূয়ারা	طسم	১২৬ বার (م বাদ দিয়ে)	
কাসাস	طسم	১১৯ বার (م বাদ দিয়ে)	
ত্বহা	طه	২৮ বার (ه বাদ দিয়ে)	
ইয়াসিন	يس	৪৮ বার (ي বাদ দিয়ে)	
শূরা	حم عسق	৫৩ বার (শুধু ع ও ق বাদ দিয়ে)	

মোট সংখ্যা = ৪৯৪

৪৯৪ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৪৯৪ ÷ ১৯ = ২৬

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ২৬ = ৪৯৪

৬. সূরা ص এ ص হরফটি ২৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আরাফের শুরু المص। দ্বারা হয়। এ সূরার ص আটানব্বই বার এসেছে। সূরা মারইয়ামের শুরু كهيعص দ্বারা, এ সূরায় ص হরফ ২৬ বার এসেছে। বিশ্লেষণ করি–

সূরা	হরফ	সংখ্যা
সাদ	ص	২৮ বার
আরাফ	ص	৯৮ বার
মারইয়াম	ص	২৬ বার

মোট সংখ্যা ঃ ১৫২

১৫২ দ্বারা সংখ্যাটি নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

৭. সূরা মারইয়ামের শুরুতে كهيعص দ্বারা হয়েছে। এ সূরায় এ সব হরফের সংখ্যা

হরফ	সংখ্যা	
ك	১৩৭ বার	
ه	১৬৮ বার	মোট সংখ্যা ৭৯৮
ى	৩৪৫ বার	এ ৭৯৮ সংখ্যাটি
ع	১২২ বার	১৯ দ্বারা নিঃশেষে
ص	২৬ বার	বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৭৯৮ ÷ ১৯ = ৪২

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৪২ = ৭৯৮

৮. যেমন প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদে ২৯ নং সূরায় হরূফে মুকাত্তায়াত এসেছে। হতভম্ব হওয়ার প্রান্তসীমায় গিয়ে আমরা দেখতে পাই এসব সূরার প্রত্যেক হরফকে আলাদা আলাদা যোগ করা হলে, প্রত্যেক হরফের সংখ্যার সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

(ক) এ ২৯টি হরফে মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরাগুলোতে الف।-এর সংখ্যা ১৭৪৯৯ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৭৪৯৯ ÷ ১৯ = ৯২১

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৯২১ = ১৭৪৯৯

(খ) এ ২৯টি সূরায় ل হরফ এসেছে ১১৭৮০ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১১৭৮০ ÷ ১৯ = ৬২০

গুণের উদাহরণ ঃ ৬২০ × ১৯ = ১১৭৮০

(গ) এ ২৯টি সূরায় م-এর মোট সংখ্যা ৮৬৮৩ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৮৬৮৩ ÷ ১৯ = ৪৫৭

গুণের উদাহরণ ঃ ৪৫৭ × ১৯ = ৮৬৮৩

(ঘ) এ ২৯টি সূরায় ر হরফটি এসেছে ১২৩৫ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১২৩৫ ÷ ১৯ = ৬৫

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৬৫ = ১২৩৫

(ঙ) এ ২৯টি সূরায় ص হরফটি এসেছে ১৫২ বার। ১৫২ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

(চ) এ ২৯টি সূরার ح হরফটি এসেছে ৩০৪ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ৩০৪ ÷ ১৯ = ১৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ১৬ = ৩০৪

(ছ) এ ২৯টি সূরায় ق হরফটি এসেছে ১১৪ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৬ = ১১৪

(জ) এ ২৯টি সূরায় ن হরফটি এসেছে ১৩৩ বার, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৩৩ ÷ ১৯ = ৭

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৭ = ১৩৩

৯. ১৯-এর সংখ্যাগত প্রকৌশলটি ১ এবং ৯ দ্বারা গঠিত। যা আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণের দিকে সম্পৃক্ত। এক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রকাশ এবং নয় সংখ্যাটি আল্লাহর অদৃশ্য গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব ১৯-এর সংখ্যা যা ১ এবং ৯-এর মিলিত রূপ, তা আল্লাহর তাআলার দুটি গুণ জাহির (প্রকাশ) এবং বাতিন (অপ্রকাশ্য)কে বুঝায়।

হিসাবের দিক থেকে ১-এর পূর্বে কোনো সংখ্যা নেই এবং ৯-এর পরেও কোন একক সংখ্যা নেই। অর্থাৎ ১৯-এর সংখ্যা প্রথম এবং শেষ-এর নির্দেশক। সম্ভবত এ জন্যই কুরআনের হিসাবী ব্যবস্থা এ সংখ্যার ভিত্তিতে রাখা হয়েছে।

(এর বাইরেও পরবর্তী গবেষণায় আরো অনেক সংখ্যাগত অথবা অন্য প্রকারের অলৌকিক বিষয়াবলী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এ জন্য আমরা আমাদের বিশ্বাসকে আল-কুরআনের ওপরই ভিত্তিশীল রাখবো। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেহেতু কুরআনের মুজিযাই প্রকাশ করছে আমরা সেহেতু এগুলো বিশ্বাস করি, তবে যদি কখনো বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা বিকৃতির চেষ্টা করা হয়। আমরা কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে তা প্রতিহত করার জন্যও সর্বদা প্রস্তুত থাকবো ইনশা আল্লাহ– অনুবাদক)

উপসংহার ঃ এ সব বিশ্লেষণ থেকে একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, কুরআন মাজীদের হিসাবী ব্যবস্থাপনা এতো পেঁচানো অথচ সুশৃঙ্খল যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে নয়। ইলাহী হিকমতের দ্বারা-এর এক এক শব্দ নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবে এ সব গাণিতিক ধারা হতভম্বকারী এবং নিঃসন্দেহে সব জিন এবং ইনসান মিলেও এ ধরনের জ্ঞানকে হতভম্বকারী কিতাব লেখা সম্ভব নয়।

এধারায় পুরা কুরআন মাজীদকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। এরপর কম্পিউটারের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, যদি মানুষ এ ধরনের কিতাব লিখতে চায় তাহলে কতবার চেষ্টা করার দ্বারা একথা বা কাজ করা সম্ভব? কম্পিউটার জবাব দিয়েছে, “৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০” বার চেষ্টা করার প্রয়োজন হবে। এক বাক্যে বলতে হবে এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, কোনো মানুষ অথবা দুনিয়ার সব মানুষ এবং জিন মিলেও এরূপ কিতাব লিখবে। মহান রব ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা)-এর ৮৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ : বলুন ঃ (হে মুহাম্মদ) যদি জিন, ইনসান এ বিষয়ের ওপর একত্রিত হয় যে, এ কুরআনের অনুরূপ আরেকটি রচনা করবে, তারা তা করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।

(১৪০০ বছরেরও ওপরে চলছে আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ। আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে অসেনি কোনো আরব

অনুরূপ এক সাহিত্য রচনা করতে, এগিয়ে আসেনি কোনো বিজ্ঞানী কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভুল ধরতে, এগিয়ে আসেনি কোনো দার্শনিক কুরআনে বর্ণিত দর্শন তত্ত্বের ভুল প্রমাণে। তবে এ পর্যন্ত যারাই কুরআন গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন অথবা কুরআনকে বিশ্লেষণ করে এর ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, তারাই কুরআনের অলৌকিক মুজিযা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন ঃ

لَيْسَ هٰذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ.

অর্থ : এটা কোনো মানুষের বাণী নয়। আসুন না আমরা এ কুরআনের পূর্ণ অনুসরণ করে আলোকিত হই। (অনুবাদক)

আল-কুরআন বুঝে পড়া উচিত

AL-QURAN SHOULD IT BE READ WITH UNDERSTANDING

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

আছাদুল হক
বি.এস.এস (সম্মান), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল-কুরআনে বুঝে পড়া উচিত

শেষ করুণা ও দয়ার আঁধার মহান আল্লাহর সমীপে অভিশপ্ত শয়তান থেকে মুক্তি চাই। মহান ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি দাতা ও দয়ালু।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনাদের প্রতি সালাম তথা শান্তির বার্তা প্রদান করে অভিনন্দন জানাই, যা কিনা আমরা যাঁরা মুসলিম তাঁদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট রীতি। শান্তি, দোআ ও রহম আপনাদের সাথী হোক। আজকের আলোচ্য বিষয় হলো : আল-কুরআনে ব্যুৎপত্তি বা বোধগম্যতাসহ তিলাওয়াতের আবশ্যকতা।

পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ বা বাণী সংকলনই হলো কুরআনে। আরো বিশদভাবে বলা যায়, পবিত্র কুরআনে হলো সর্বোত্তম পাণ্ডুলিপি যা পুরো মানবজাতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ইশতেহার। একজন অবিশ্বাসীর জন্য নিশ্চিতভাবেই এটি একটি হুশিয়ারি বার্তা যেমনি বিপরীতক্রমে বিশ্বাসী তথা মুমিনের জন্য সুসংবাদের সবিশেষ উৎসস্থল। কোনো সন্দেহের অবকাশ না রেখেই যে কোনো ভুক্তভোগীর জন্য সর্বময় সমস্যার সুস্পষ্ট সুলিখিত সমাধান। নিরাশ ব্যক্তিরা এর মধ্যে খুঁজে পায় পরম আশার আলো।

এটা কীভাবে সম্ভব অথবা কীভাবে আশা করতে পারেন যে, যথাযথ অন্তর্নিহিতভাব, অর্থ, নির্দেশনা ও মর্মভেদ না করেই কোরআনের সর্বময় কল্যাণে নিজেদের রাঙাবেন? কোরআনি অনুশাসনের প্রয়োগ ও সার্বক্ষণিক চর্চাই এ কল্যাণ নিশ্চিত করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

১. কুরআনে, মুসলিম জাতির এক শ্রেষ্ঠত্বের উৎস

আলহামদুলিল্লাহ্, পবিত্র কুরআনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াতকৃত তথা পঠিত গ্রন্থ। কিন্তু এটি এর একটি দিক, এর বিপরীত দিকটি সম্ভবত ক্বারী তথা পাঠকদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকর। আর তা হলো বেশির ভাগ পাঠকই ব্যুৎপত্তি বা অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করে থাকেন যা পাঠক ও কোরআনের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন ও বোঝাপড়া সৃষ্টির বড় অন্তরায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা কুরআনে থেকে যে উপকারিতা ও সুযোগ পাওয়ার কথা তা থেকে বঞ্চিত হই। এর চেয়ে মর্মপীড়ার কারণ আর কী হতে পারে যে, তোমার নিকট কুরআনে

বর্তমান আর তুমি খালি হাতে ফিরে চলছো? কুরআনে তিলাওয়াত হচ্ছে অথচ হৃদয় অবিচল ও জীবন অপরিবর্তনীয়! অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

অর্থ : তোমরা যারা মুসলিম, তারা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট।

এই যে 'খাইরা উম্মাহ্' তথা সর্বোত্তম জাতি মুসলিমগণ, এর কারণও কিন্তু কোরআনের এ স্থানেই বিবৃত করা হয়েছে। আর তা হলো আমরা কল্যাণ, ভালো ও সুন্দরকে আঁকড়ে ধরি। একই সাথে অকল্যাণ, অসুন্দর তথা মন্দকে আমাদের থেকে পৃথক করে রাখি। তাহলে কোরআনের বিবৃতি অনুযায়ী মঙ্গল ও কল্যাণের সাহচর্য আর অমঙ্গল ও অকল্যাণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার শর্ত ও কারণ। আর এই যে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন এটি পুরোপুরি নির্ভরশীল ভালো ও মন্দ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ও জ্ঞানের ওপর। যদি আমাদের জ্ঞানের বাইরেই থেকে যায় কোন্‌টি ভালো, গ্রহণীয় আর কোনটি মন্দ ও অস্পৃশ্য। তবে কীভাবে গ্রহণ ও বর্জনের কর্ম আমরা সম্পাদন করতে পারি কুরআনে থেকেই এ ধারণাগুলো পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়।

২. কোরআনের পরিচয়

'কুরআনে' আরবি শব্দ যা এসেছে 'ক্বারা' থেকে অর্থাৎ পড়া। তাই কোরআনে এর শাব্দিক অর্থ একটি বই যা পড়ার, অনুধাবনের, গবেষণার ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের। কোরআনের অন্য একটি প্রতিশব্দ 'ফোরকান' যা কোরআনের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। ফোরকান এজন্য যে, কুরআনে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল এবং সর্বোপরি গ্রহণীয়-বর্জনীয় কর্মগুলোকে পৃথক করে, একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। কোন্‌টি ন্যায় ও কোন্‌টি অন্যায় তাই আল-কুরআনে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করে।

৩. কুরআনে কেন বুঝে পড়বো?

ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য, ভালো ও মন্দের ব্যবধান ও কল্যাণ অকল্যাণের দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে কুরআনে অর্থসহকারে বুঝে পাঠ করা অতীব জরুরি। আসুন বিষয়টি পরখ করে দেখি, যে কারণে মুসলমানদের নিকট প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি কেন বোধগম্য তথা উপলব্ধি ছাড়াই পঠিত হয়। অর্থাৎ কোরআনের অর্থ না বুঝেই পড়া হয়।

এর সর্বপ্রধান কারণটি হলো– কুরআনে নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়, যার সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশেরই ন্যূনতম ধারণা বা জ্ঞান নেই। বর্তমান পৃথিবীর মোট

জনসংখ্যা ৬৫০ কোটিরও বেশি যার ২০ ভাগ তথা ১০০ কোটিরও বেশি মুসলিম। এর মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ আরবি ভাষা-ভাষী লোক, যারা কেবল আরবি ভাষাতে কথা বলতে, পড়তে ও লিখতে পারে। এছাড়া খুব নগণ্য সংখ্যক মুসলিমই আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। মোটকথা, মুসলিম বিশ্বের আশি ভাগেরও অধিক মানুষ আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ।

যখন কোনো শিশু জন্ম নেয় তখন সে ভাষাহীন অর্থাৎ সব ভাষা সম্পর্কেই অজ্ঞাত থাকে। কালক্রমে পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ থেকে পর্যায়ক্রমে যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ভাষা আয়ত্ত করতে থাকে যা তার মাতৃভাষা। এরপরে সময়ের সাথে সাথে কেউ কেউ একাধিক এমন কি অনেকে চার, পাঁচ বা তারও অধিক ভাষা আয়ত্ত করে থাকে। একথা সর্বজনবিদিত যে, ভাষা আয়ত্ত করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই শৈশবে অনেক সহজসাধ্য। তবে বয়স বাড়লে যে তা অসম্ভব হয়ে যায় ব্যাপারটি তেমন নয়, বিশেষত, তা যদি সৎ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত হাজির করার লোভ আমি সংযম করতে পারছি না। আর যার সম্পর্কে উদাহরণটি সম্পৃক্ত তিনি ফ্রান্সের ড. মরিস বুকাইলি। বুকাইলি একজন ফরাসি বিজ্ঞানী ও সার্জন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন বাইবেলে উল্লিখিত ফারাও হযরত মূসা (আ)-এর কিস্সা। কিন্তু এ সম্পর্কিত গবেষণা করতে গিয়ে তিনি অবাক বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তিনি যা এইমাত্র আবিষ্কার করলেন তা হাজার বছরেরও অনেক পূর্বেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। বিষয়টি তাকে এতোটাই নাড়া দেয় যে, তাঁকে আরবি ভাষা শিখতে উদ্যোগী করে তোলে। তিনি খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর বয়সে আরবি ভাষা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করেন, যাতে কোনো অনুবাদের সহযোগিতা ছাড়াই সরাসরি কুরআনে অনুধাবন করতে পারেন। বিষয়টি তাঁকে এতোদূর পর্যন্ত নিয়ে যায় যে, তিনি শুধু আরবি লিসান (ভাষা) সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হন নি, পরবর্তীতে একটি গ্রন্থও লিখে ফেলেন। যার শিরোনাম 'বাইবেল, কুরআনে ও বিজ্ঞান' *(The Bible, The Quran and Science)*। এতে সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে পবিত্র কোরআনের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য, পক্ষান্তরে বর্তমান বাইবেলের সাংঘর্ষিক অবস্থান।

৪. আল-কুরআনে বুঝে পড়ার উপায়

এক্ষেত্রে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ড. মরিস একজন নাসারা তথা খ্রিস্টান হয়েও পবিত্র কুরআনে সম্পর্কে এতোটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে আরবি ভাষা রপ্ত করতে শ্রম ব্যয় করেছিলেন এবং সর্বোপরি সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে আমি এতোটাও আশা করি না যে, সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ই আরবি ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হবে। তবে ইচ্ছে থাকলে, উদ্যমী হলে অনেকেই যে,

সফল হবে না তা আশা করতে বাধা কোথায়? অবশ্য এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, যারা আরবি ভাষা বুঝেন না তারা পবিত্র কুরআনে অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করবেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাসহ অন্য আরো অনেক ভাষাতেই তা অনূদিত ও ভাষান্তরিত হয়েছে। মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদীর কথা অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের ভাষান্তর অন্য যে কোনো ভাষায় গ্রন্থিত যে কোনো পুস্তক থেকে নিশ্চিতভাবেই বেশ আয়াসসাধ্য কাজ। যেহেতু পবিত্র কোরআনের ভাষা স্বর্গীয়, মহৎ, মৌলিক ও অলৌকিক, তাই অনুবাদ অসম্ভব মেধার দাবী রাখে। অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরের জন্য কুরআনে সত্যিই অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ।

পবিত্র কোরআনের ভাষা এতোই উৎকৃষ্ট ও উঁচু মানের যে, কোনো একটি শব্দ বুঝতে গেলে একাধিক শব্দ এমন কি পুরো বাক্যটিও দরকার হতে পারে। একটি আরবি শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে জন্য মূল আরবি ভাষার সৌন্দর্য অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ সত্যি সত্যিই অসম্ভব। এতোসব বাধা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন পণ্ডিত ও মনীষী বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনেকে অনুবাদ করেছেন। তাই আপনি যে ভাষাতে সবচেয়ে বেশি দক্ষ সেই ভাষায় কোরআনের অনুবাদটি পড়লেই সবচেয়ে বেশি কোরআনের কল্যাণ লাভে সমর্থ হবেন। তাই ভাষাটি উর্দু, হিন্দি, তামিল, গুজরাটি, ফারসি, ফরাসি, বাংলা বা ইংরেজি যাই হোক না কেন। আমরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ঘণ্টা ব্যয় করে কত লাখ লাখ বই পড়ে কিছু অংশ মুখস্থ করে থাকি, যার অনেক অংশই কোনো কাজেও লাগে না। এর মধ্যে একটু সময় বের করে পবিত্র কুরআনে দৈনন্দিন বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করলে কতটুকুই বা সময় লাগে?

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, যা তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে, যে তিনদিনে কুরআনে শেষ করলো সে কিছুই জানলো না। আপনি যদি ধীরে সুস্থে বুঝে পড়েন হয়তো, মাসের মধ্যে শেষ করতে পারবেন। আর ভালোভাবে বুঝে প্রতিদিন এক পারা পরিমাণ তিলাওয়াত করেন, তবে ত্রিশ দিন তথা এক মাসেই শেষ হয়ে যাবে।

তার চেয়ে কে আর চরম হতভাগ্য যে কিনা পবিত্র কোরআনের সংস্পর্শে এলো অথচ কিঞ্চিৎ পরিমাণও কল্যাণ গ্রহণ করতে পারলো না তা থেকে? আপনি অনেক অধ্যবসায় করে, অনেক শ্রম বিনিয়োগে অনেক সার্টিফিকেট অর্জন করেন। কিন্তু কি নিশ্চয়তা আছে যে, সেটি কাজে লাগবেই? আমরা অনেক স্নাতক উত্তীর্ণকেই চিনি যারা বেকার বা চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আবার অনেক স্নাতকোত্তরও আছেন যাঁদের সারা জীবনের অধ্যয়ন পেশা জীবনে কোনো কাজে আসে না। তবে এটা পরিষ্কার যে, সাধারণভাবে শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তাই বলে কুরআনে শিক্ষাকে অন্য শিক্ষার থেকে কম গুরুত্ব দেয়া বা ভাবা

কোনোভাবেই গ্রহণীয় নয়। যে কোরআনের চেয়ে মূল্যবান কিছুর আশায় ঘোরে, তার ঘোরা সবই মায়া, মরীচিকার পেছনে, অহেতুক সময় ও শ্রমের অপব্যয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ্‌র ১ ও ২নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

الٓمٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : আলিফ, লাম, মীম। এটা সেই গ্রন্থ যার মধ্যে নেই সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ। এটি মুত্তাকীদের জন্য পাথেয়।

এছাড়া সূরা যুমার-এর আয়াত নং ২৭-এ বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ

অর্থ : আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি যেন তারা অনুধাবন করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে মানুষকে সফলতা, কল্যাণ ও মঙ্গলের নিশানায় ধাবিত করে ইহলোক ও পরলোক তথা পার্থিব ও অপার্থিব দুই জীবন ও জগতেই।

মনে করুন, আপনার একজন জার্মানি বন্ধু আছে। সে আপনার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আপনার কাছে এলো। অনেক কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে দু জন ভাব-বিনিময় করলেন। যেহেতু আপনারা ভালো বন্ধু, আশা করি বাক্যালাপ যত কষ্টেরই হোক দু'জনেই তা উপভোগ করবেন। কিন্তু বন্ধুটি যদি জার্মান ফিরে গিয়ে জার্মান ভাষায় পত্র লিখে আপনি কী তা বুঝবেন, উনি আপনার যত কাছের বন্ধুই হোন না কেন? অবশ্যই আপনাকে আগে অনুবাদ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে যেতে হবে অনুবাদকের কাছে। কেন যাবেন? নিশ্চয় আপনার প্রিয় বন্ধু আপনাকে কী লিখেছে তা জানার জন্য অধীর আগ্রহ থাকবে আপনার মধ্যে। তাই যদি হয়, তবে পবিত্র কোরআনের মতো মহান বন্ধু আপনাকে কি বললো তা জানতে ও বুঝতে কী এতোটুকুও ইচ্ছে হয় না! আমরা মুসলিমরা সব সময়ই জানি এবং স্বীকার করি যে, এ পৃথিবীতে সবার ইচ্ছের ওপরে আল্লাহর ইচ্ছে। কারো ইচ্ছেই সে যেই হোক না কেন, সব সময় বা সত্যি বলতে অধিকাংশ সময় পূরণ হয় না, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে সর্বদা পূরণীয়। তাহলে আমাদের কেন ইচ্ছে হয় না তাঁর কথা জানার ও বুঝার? অথচ আন্তরিকভাবে ইচ্ছে করলেই যে কোনো অনুবাদ সংগ্রহ করে যে কোনো সময় আমরা কোরআনের অর্থ অনুধাবন করে অনেকটাই অগ্রগামী হতে পারি।

৫. কুরআনে সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ

মুসলমানদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা বেশ প্রচলিত। তা হলো পবিত্র কুরআনে কেবল মুসলমান জাতির জন্য নাযিলকৃত। তাই তারা এ ভেবেই বসে থাকেন

কোনো মুসলিমেরই উচিত হবে না কোনো অমুসলিমকে পবিত্র কুরআনে উপহার দেয়া। অথচ পবিত্র কোরআনের সূরা ইবরাহীমের ১নং আয়াতেই বলা হয়েছে,

الٓرٰ ـ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থ : এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি আপনার নিকট এ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষ পায় এর দ্বারা আলোর দিশা, ঘোর অন্ধকার হতে।

কোথাও এমন বলা হয় নি যে, শুধু মুহাম্মাদ ﷺ-এরই দায়িত্ব মানব সম্প্রদায়কে মুক্তির পথে নিয়ে আসা। আর সমগ্র মুসলিম জাতিরই দায়িত্ব ভ্রষ্ট ও অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে আলোকজ্জ্বল পথে বের করে আনা।

সূরা ইবরাহীম-এর ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ : এটি মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা এবং এর দ্বারা যাতে মানুষ ভীত হয় এবং জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

সূরা বাকারার আয়াত নং ১৮৫-এ বলা হয়েছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থ : রমজান মাস হলো কুরআনে নাযিলের মাস। কুরআনে হলো মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে বিভেদ নির্দেশকারী।

সূরা যুমার-এর আয়াত নং ৪১-এ বলা হয়েছে,

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ـ

অর্থ : মানুষের কল্যাণ নিমিত্তে আমি আপনার নিকট প্রেরণ করেছি সত্য ধর্মসহ কিতাব। আর যে ব্যক্তি কল্যাণের পথে আসে সত্য ধর্মসহ সে কল্যাণ নিশ্চিত করে আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয়, সে নিজেই অনিষ্ট করে। আপনি তার জন্য দায়ী নন।

এখানে শুধু আরব জাতিকেই নির্দেশ করা হয় নি বরং আপামর সম্পূর্ণ মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আল ক্বালাম-এর আয়াত নং ৫২ এবং সূরা তাকভীর-এর আয়াত নং ২৭-এ নির্দেশ করে,

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আর এটি (কুরআনে) পুরো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।

অর্থাৎ এটা শুধু আরবদের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য।

সূরা আম্বিয়া-এর ১০৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণস্বরূপ।

সূরা সাবা-এর আয়াত নং ২৮-এ বলা হয়েছে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

৬. অমুসলিমকে কুরআনে দেয়ায় কোনো বাধা নেই

অনেক মুসলিম আছে যারা মনে করেন পবিত্র কুরআনে কোনো অমুসলিমকে দেয়া যাবে না। তারা এক্ষেত্রে সূরা ওয়াকিয়াহ্-এর আয়াত নং (৭৭-৮০)-কে দলিল হিসেবে পেশ করেন,

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ـ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ـ لاَّ يَمَسُّهٗٓ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে সম্মানিত যা অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ নিষিদ্ধ। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

এর যথার্থ হিসেবে তারা ধরেই নেন যে, পবিত্র কুরআনে পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ অননুমোদিত। আর যেহেতু অমুসলিমরা অপবিত্র তাই তাদের স্পর্শে কোনোভাবেই কুরআনেকে নেয়া যাবে না। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

আরবি শব্দ 'কিতাবিম্মাকনুন' দ্বারা এ পৃথিবীতে আমাদের সামনে যে কুরআনে রয়েছে তা নির্দেশিত হয়নি। আবার 'মুতাহ্‌হারিন' দ্বারা কেবল পরিচ্ছন্নতাই বুঝানো

হয়নি। প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো, তবে যে কোনো অমুসলিম মার্কেটে যেত আর ৮০ থেকে ১০০ টাকায় একটি কুরআনে খরিদ করতো এবং কুরআনেকে মিথ্যা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেত। কেননা অর্থ করা হয়ে থাকে যে, অপবিত্র ব্যক্তি এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আসলে এখানে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআনে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। আর ঐ সংরক্ষিত কুরআনেটি ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো অপবিত্র ও লৌকিক বস্তু কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না।

অনেকেই আবার মত প্রকাশ করে থাকেন যে, যদি অমুসলিমকে কুরআনে প্রদানের একান্তই অভিপ্রায় থাকে তবে যেন আরবি বর্ণমালা ছাড়া কেবল অনুবাদকৃত কুরআনে দেয়া হয়।

অনূদিত কুরআনে দেয়াতে আমার কোনো দ্বিমত নেই। তবে যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই কুরআনে দিতে চায় তবে আরবিসহ দিতে অসুবিধা কোথায়? যদি অনুবাদে কোনো ভুল থাকে তবে আরবি অংশই একমাত্র অবলম্বন তা শুধরে নেয়ার। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি অমুসলিমকে আরবিসহ অনুবাদকৃত কুরআনে প্রদান করতে।

৭. অমুসলিমদের নিকট কুরআনে দেয়া, মহানবী (স)-এর দৃষ্টান্ত

যদি শেষ বিচার দিনে মহান আল্লাহ্ আমাকে কৈফিয়ত তলব করেন আরবিসহ কুরআনে কেন আমি অমুসলিমদের দিয়েছি, তাতেও আমার ভয়ের কারণ নেই। কেননা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি আমি মুহাম্মদ ﷺ কে আমার পক্ষে পাব। তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় অমুসলিম বাদশাহদের নিকট আরবি ভাষায় লিখিত পত্র প্রেরণ করতেন যার মধ্যে কোরআনের আয়াতও থাকতো। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্, সম্রাট হিরাক্লিয়াস, ইয়েমেনের রাজা, মিসরের বাদশাহের নিকটেই মহানবী ﷺ এমন পত্র দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক, ইসলাম গ্রহণ করলো, কেউ কেউ পত্র ছিন্ন করে, অনেকেই পদতলে পিষ্ট করলো। তাই মহান আল্লাহ যদি সত্যিই আমাকে অভিযুক্ত করেন তবে মহানবী ﷺ-কে অবশ্যই কাছে পাব। এ ধরনের একটি পত্র এখনো ইস্তাম্বুলের একটি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এ পত্রে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নং ৬৪-তে স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ আছে,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : হে আহলি কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, আর তা হলো আমরা কেউই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরিক মানবো না এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা গ্রহণ করবো না। এরপরও যদি তারা মেনে না নেয় তবে ঘোষণা করে দিন 'সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম'।

প্রিয় নবী করীম ﷺ অমুসলিম রাজাদের নিকট যে পত্র পাঠাতেন তাতে কোরআনের আয়াতগুলো থাকতো।

যারা বলেন, অমুসলিমদের শুধু পবিত্র কোরআনের অনুবাদ দেয়া যায়, আরবি অংশ ছাড়া তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা– আরব বিশ্বে আরবি ভাষা-ভাষী যে ১৪ মিলিয়ন প্রকৃত খ্রিস্টান রয়েছে আমরা তাদের কোন্ অনুবাদ দিব? বংশ পরম্পরায় খ্রিস্টান থাকা এ মানুষগুলো কোন্ ভাষায় অনূদিত কুরআনে বুঝবে? তাই পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় অনুবাদকৃত কোরআনের সাথে মূল আরবি ভাষার কুরআনে দেয়া উচিত।

৮. কুরআনে বুঝা সহজ

আবার অনেক মুসলিম মনে করে থাকেন কুরআনে অর্থসহ বুঝে তিলাওয়াত করা শুধু আলিমদের জন্যই উন্মুক্ত থাকা দরকার। তারা মতামত দেন যে, সাধারণ মানুষ অর্থ পড়তে গিয়ে বিভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি অনেকবার ভেবেছি পবিত্র কোরআনের চারটি আয়াত নিয়ে যা কিনা একটি সূরায় চারবার ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আল ক্বামার-এর আয়াত নং ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০-এ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۔

অর্থ : আমি কুরআনেকে উন্মুক্ত করেছি ও তোমাদের বুঝার জন্য সহজ করেছি।

সুতরাং ভাবনার কি? আল্লাহ নিজেই কুরআনেকে বুঝার ও মনে রাখার জন্য সহজ বলে যেখানে নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন কীভাবে এটা ভাবার অবকাশ থাকে যে, আলিম ছাড়া অন্য কেউ বুঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ হয়ে যাবে? তাহলে কাকে বিশ্বাস করবেন আল্লাহ্‌কে নাকি যারা ভ্রষ্টতার অভিযোগ করে তাদেরকে?

পবিত্র কোরআনে বারবার বুঝে পড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। সূরা বাক্বারাহ্-এর ২৪২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔

অর্থ : এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

সূরা হিজর-এর ১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

الٓرٰ ـ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ـ

অর্থ : এগুলো পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নিদর্শন যা পুরোপরি বোধগম্য।

তাহলে যারা বলে যে, পথচ্যুতির সম্ভাবনা আছে তাদেরকেই বিশ্বাস করবো নাকি আল্লাহকে বিশ্বাস করবো?

একই সাথে পবিত্র কোরআনের সূরা নাহ্ল-এর ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমাদের জানা না থাকে।

সূরা ফুরকানের আয়াত নং ৫৯-এর শেষাংশে বলা হয়েছে,

اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ـ

অর্থ : তিনিই 'রাহমান' তার সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে প্রশ্ন করে জেনে নাও।

এখানে বলা হচ্ছে, কুরআনে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তবে তার কাছে জিজ্ঞাসা কর যে জানে বা যার কাছে তথ্য আছে।

৯. আলিমের পরিচয়

'আলিম' অর্থ কী? 'আলিম' অর্থ জ্ঞানী, যার জ্ঞান আছে তিনি আলিম, আলিম অর্থ এটা নয় যে, কোনো বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় ১২-১৪ বছর পড়াশোনা করেছে। আপনি যদি কোরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো অংশের ব্যাখ্যা জানতে চান তবে কার কাছে যাবেন? কোনো নাপিত না কোনো চামারের কাছে? নিশ্চিতভাবেই কোনো বিজ্ঞানীর কাছে। কেননা বিজ্ঞানী হচ্ছে বিজ্ঞান-এর আলিম, আবার যদি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো বিষয় জানার থাকে তবে আপনি কার কাছে যাবেন? অবশ্যই কোনো চিকিৎসক-এর কাছে যাবেন তিনি এ বিষয়ের আলিম। অনুরূপভাবে যদি পবিত্র কোরআনের 'নুযুল' বা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত কোনো তথ্য জানার থাকে তবে অবশ্যই আপনার গন্তব্য হওয়া উচিত কোনো আলিমের নিকট যিনি দারুল উলুম বা এমন প্রতিষ্ঠানে ১২-১৪ বছর অধ্যয়ন করেছেন এভাবে আপনি যখন যে বিষয় সম্পর্কিত সমস্যায় পড়বেন, আপনার উচিত সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাওয়া।

১০. কুরআনে ও আধুনিক বিজ্ঞান–একটি দৃষ্টান্ত

চার বছর পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল ঠিক করলেন নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত যত তথ্য কোরআনে বর্ণিত তা তারা একত্রিত করবেন এবং পবিত্র কোরআনের পথ নির্দেশ পালন করবেন। যা সূরা নাহলের আয়াত নং ৪৩ ও সূরা ফুরকানের আয়াত নং ৫৯-এ আছে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : অতএব জ্ঞানীদের প্রশ্ন করো যদি তোমাদের জ্ঞানের বাইরে থাকে। (এটা সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তাদের সওয়াল কর ও জেনে নাও।)

তাই তারা ঠিক করলেন যে, নৃবিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতগুলো তারা কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টের প্রধানের নিকট তার অনুবাদ করবেন। যখন তার নিকট সেগুলো দেয়া হলো তখন তিনি দেখলেন সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত বিষয়টিও শতভাগ মিলে যায় পবিত্র কোরআনে দেড় হাজার বছর আগের বর্ণনার সাথে। তিনি বললেন যে, তিনি কিছু অংশ বুঝতে পারছেন না। কেননা তার এ সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই। এ অজানা বিষয়গুলোর মধ্যে একটি অংশ ছিল সূরা আলাকের ১ ও ২নং আয়াত,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।

ড. বিট মোর বললেন, তিনি ঠিক জানেন না যে, শিশু মাতৃগর্ভে আসার প্রাক্কালে সত্যি সত্যিই জমাটবাঁধা রক্ত হিসেবে থাকে কিনা। বিষয়টি গবেষণায় তিনি নেমে পড়লেন। তিনি ভ্রূণকে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নিরীক্ষণ করে জমাট বাঁধা রক্তের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবির সাথে তুলনা করে দেখতে লাগলেন। এটা করতে গিয়ে তার চোখ তো ছানাবড়া। একি! পবিত্র কোরআনের বর্ণনারই যেন অবিকল সঞ্চালন ঘটলো তার যন্ত্রের সামনে। তখন তাকে কোরআনে বর্ণিত নৃবিজ্ঞান বিষয়ক ৮০টি প্রশ্ন করা হলো। তিনি তার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, এ প্রশ্নগুলো যদি তাকে ৩০ বছর আগেও করা হতো তবে তিনি ৫০ ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। কেননা নৃবিজ্ঞান বিষয়টি ৩০ বছর আগে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ বিষয়গুলো পবিত্র কোরআনে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে অনেক যুগ আগেই।

এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি বই লিখলেন যাতে তিনি কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যাচাই করে ঐ বইয়ে

সন্নিবেশিত করলেন, বইটি তাঁর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ বইয়ের মর্যাদা পেল। এমনকি এখনো যারা এম.বি.বি.এস. পড়াশোনা করে তাদেরকে বলা হয় যদি ভালোভাবে বুঝে ভালো নম্বর পেতে চাও তবে ড. কীট মোরের লিখিত বইটি অবশ্যই আত্মস্থ করতে হবে। তাই দেখা যায়, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অধিকতর যথার্থরূপে বর্ণনা করতে পারেন। ড. কীট মরিস এরপর স্বীকার করেন যে, তার একথা বলতে কোনো কার্পণ্য নেই যে, পবিত্র কুরআনে নির্ভুল একটি মহাগ্রন্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সত্যি সত্যিই আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।

১১. মানবজাতির ম্যানুয়াল-১ : আল-কুরআনে

আমরা বাজার থেকে যখন নতুন কোনো যান্ত্রিক পণ্য খরিদ করি তখন একটি ম্যানুয়াল দেয়া হয়। কেন দেয়া হয়? কারণ ঐ যন্ত্রটি কীভাবে চালাতে হবে, কীভাবে কোন্ সুইচ দিয়ে কোন্ কাজ সমাধা করা যাবে তার বিশদ বর্ণনা থাকে ঐ ম্যানুয়ালে। ধরা যাক, আপনি একটি টেপ রেকর্ডার কিনলেন, আপনাকে ম্যানুয়েল দেয়া হবে। তাতে বর্ণনা করা হবে কোন সুইচ দিয়ে ক্যাসেট ঢুকানো হবে, কোন্টা দিয়ে চালাতে হবে, কোন্টা দিয়ে কিছু সময়ের জন্য থামাতে হয়, আবার কোন বাটন টিপ দিলে বন্ধ হয়। এভাবে আপনি যদি পণ্যটি ভালোভাবে অপারেট করতে চান তবে অবশ্যই ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা বইটি মেনে চলতে হবে।

এমনকি পণ্যটির পরিচর্যার বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ম্যানুয়েলে বর্ণনা করা হয়, যেমন ওপর থেকে ফেলবেন না, পণ্যটি ভিজে গেলে কী ক্ষতি হবে, কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখা যাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ ভালোভাবে পণ্যটি ব্যবহার করতে চাইলে অবশ্যই ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা পুস্তক প্রয়োজন। আবার লক্ষ করুন, ঐ ম্যানুয়েল কিন্তু অন্য কেউ সরবরাহ করে না বরং পণ্যটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই দিয়ে থাকে। কেন নিজেরা দেয়? কেননা যেহেতু পণ্যটি তাদের উৎপাদন তারাই এর টেকনোলজি সম্পর্কে ভালো জানে, তারাই এর দিক-নির্দেশনা ও চালানোর রীতিনীতি বেশি ভালো করে দিতে পারবে। অর্থাৎ বিষয়টি কী দাঁড়ালো? যারা যে যন্ত্র নির্মাণ করে তারাই তার পরিচালনা পদ্ধতি, ম্যানুয়াল বা দিক-নির্দেশনামূলক পুস্তক যা-ই বলি না কেন, সেটা দিতে পারবে।

আমি প্রসঙ্গটি এজন্যই আনলাম যে, মানুষ একটি জটিল যন্ত্র, একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ জটিল হচ্ছে মানুষের দেহযন্ত্র। তাই এটিও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একটি সুন্দর এবং যথাযথ ম্যানুয়াল। আর এ ম্যানুয়াল তথা জীবন পরিচালনা পদ্ধতি বা দিক-নির্দেশনাই হচ্ছে আল-কুরআনে। লক্ষ করে দেখবেন যে, পণ্য প্রস্তুত বা নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই ম্যানুয়াল বই দিয়ে থাকে। তেমনিভাবে মানুষের চলার পদ্ধতি, জীবনাচার, দিক-নির্দেশনা

সম্বলিত সামগ্রিক তথ্য ও নির্দেশনা মানুষের নির্মাতা, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ-ই দেয়ার ক্ষমতা, এখতিয়ার ও সামর্থ্য রাখেন অন্য কেউ নয়। কোনো পণ্য যেমন নিজের ম্যানুয়াল তৈরি করতে পারে না বরং তার নির্মাতাই সেটা করার একমাত্র ক্ষমতাবান, তেমনি মানুষও নিজের চলার দিকনির্দেশনা তৈরি করার ক্ষমতা রাখে না বরং মানুষের নির্মাতা ও সৃষ্টিকর্তার হাতেই সেটি শোভা পায়, এরই ফল হলো আল-কুরআনে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, বিশেষ করে যে পণ্যটি একেবারেই নতুন, পণ্যের ক্রেতা সেটি পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ থাকেন।

এমন একটি ঘটনা শোনা যায় যে, যখন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মোটরকার আসে তখন পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে গাড়ি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ি চালানোর জন্য চালক সরবরাহ করতো। তো কোনো এক নবাব একটি গাড়ি কিনলেন। সেই সাথে একজন চালকও আনলেন। চালক ছিল অতি ধূর্ত। সে জানতো নবাব গাড়ি সম্পর্কে একদমই বেওয়াকিফহাল। তাই নবাব যখন একদিন বললেন, 'এই তাড়াতাড়ি গাড়ি বের কর আমার বেগম এখন বাইরে যাবে।' তখন চালক বললো গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। মেরামত করতে দশ কেজি খাঁটি ঘি, ২০ কেজি সরু চাল, ২০ কেজি তেল প্রয়োজন। নবাব তাকে তাই দেবার নির্দেশ দিলেন। চিন্তা করুন তো আপনার গাড়ি চালক যদি আপনাকে বলে গাড়ি মেরামত করতে ১০ কেজি ঘি, ২০ কেজি চাল ও ২০ কেজি তেল লাগবে তখন আপনি তাকে কী করবেন? আপনি অবশ্যই তার প্রতারণা বুঝতে পারবেন। কারণ, আপনার গাড়ি সম্পর্কে বেশ ধারণা আছে। তাই আপনি গাড়ি সংক্রান্ত কোনো বিশেষ সমস্যায় পড়লেই কারো নিকট যাবেন। তেমনি মুসলমানদেরও কুরআনে সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা ও ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার যেন সব সময় অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়।

অনেকে কুরআনে না বুঝে তিলাওয়াত করার এক অদ্ভুত অজুহাত খাড়া করে। তারা বলে, যদি কেউ কুরআনে বুঝে অপরাধ করে তার সাজা অধিক, আর না বুঝে অপরাধ করলে সাজা কম। তাই বেশি না বুঝাই ভালো। আমি তাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আইনে আছে যখন কোনো চালক গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণকালে অর্থাৎ শিক্ষানবিস সময়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে তার যে জরিমানা তা যে ব্যক্তি ঐ প্রশিক্ষণ শেষ করেছে তার অর্ধেক। ধরা যাক, যে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে অর্থাৎ পাকা চালক সে দুর্ঘটনা করলে ২ হাজার টাকা জরিমানা আর শিক্ষানবিস ঐ একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটালে ১ হাজার টাকা জরিমানা।

এখন কেউ যদি মনে করে যেহেতু শিক্ষানবিসের জন্য জরিমানা অংশ কম তাই প্রশিক্ষণ শেষ না করাই ভালো। তখন সে কি লাভবান হবে? একটু লক্ষ্য করুন, যে

প্রশিক্ষণ শেষ করেছে সে পাকা চালক হওয়ায় হয়তো বছরে একবার দুর্ঘটনা ঘটালো। তখন তাকে জরিমানা দিতে হবে দু হাজার টাকা। আর যে শিক্ষানবিস অর্থাৎ কাঁচা চালক সে যদি অপরিপক্ক হওয়ার কারণে ৫০টি দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে তাকে কত টাকা মাশুল গুনতে হবে? নিশ্চয়ই ৫০ হাজার টাকা। তাহলে লাভ কার বেশি। যে প্রশিক্ষণ শেষ করলো তার নাকি যে চালাকি করে শেষ করলো না তার? তেমনিভাবে যারা কুরআনে বুঝে তিলাওয়াত করে যে গুনাহ বেশি হওয়ার খোড়া অজুহাত খাড়া করে না বুঝটাকেই ভালো মনে করেন তাদের অবস্থাটা কিন্তু শিক্ষানবিস চালকের চেয়ে খুব একটা ভালো হবে না।

১২. মানবজাতির ম্যানুয়াল-২ : আল-কুরআনে

আপনি যদি আরবদেশগুলোতে যান, তবে দেখবেন সেখানে নামাজের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেউ শুধু শুধু বসে নেই। সবাই কুরআনে তিলাওয়াতে মশগুল। যেহেতু তারা আরবিভাষী, তারা কুরআনে বুঝেই তিলাওয়াত করতে পারেন। আমাদের এখানে ক'জনকে পাবেন জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বের সময়টুকুতে কুরআনে তিলাওয়াত ও বোঝার কাজে ব্যয় করতে? যদি কেউ করেও থাকেন তবে সেটা সামনের কাতারের দুএক জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পেছনের কাতারের কেউ এ কাজটি করেন না। যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে কেউ এটি করতে থাকেন তবে অনেকেই এসে আপত্তি তোলেন যে, সামনের কাতারের লোকদের পেছন দিকটা কোরআনের দিকে পড়ে বলে কখনো ২য় বা ৩য় কাতারে বসে এভাবে কুরআনে তিলাওয়াত করা অনুচিত!

আমি মসজিদে হারামে দেখেছি সেখানে যখন কোরআনের দারস হয় তখন অনেকেই কুরআনে হাতে রাখেন যাদের সামনের লোকগুলোর পেছন দিকটা কোরআনের দিকে ফেরানো। এতে সমস্যাটা কী? লোকগুলো তো এজন্য এমনটা করছে না যে, তারা কুরআনেকে অবমাননা করতে চায়। বরং নিজেদের বসার সুবিধার জন্য যাতে ভালো করে দারসে মনোযোগ দিতে পারে ও কুরআনে ভালোভাবে বুঝতে পারে। এজন্য এমন করে বসা দোষের মধ্যে পড়ে না।

আমাদের ভারতবর্ষের কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র কুরআনে সামনে নিয়ে কা'বাকে পেছন দিক ফিরে বসে থাকে তবে তার স্থান আর ভারতবর্ষে থাকবে না। সবাই মিলে তাকে বের করে দেবে। অথচ হারাম শরীফে আমি বহুলোককে দেখেছি কা'বাকে পেছন ফিরে বসতে। অথচ এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ভুল বুঝাবুঝি মুসলিম উম্মাহ্‌কে গ্রাস করেছে। আমাদের কতই দুর্ভাগ্য।

ভারতবর্ষের একজন ইমাম ছিলেন যাঁর তিলাওয়াত ছিল খুবই শ্রুতিমধুর। তিনি সৌদি আরব গেলে সেখানকার ইমাম সাহেব তাঁকে সালাতের ইমামতি করতে বলেন। সালাত শেষ হলে একজন আরব তাঁর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে

ওঠে। তখন তিনি তার নিকট কারণ জানতে চাইলে লোকটি বলে, 'আপনার তিলাওয়াত অতি মিষ্টি। তবে আপনি সালাতের মধ্যে মূসা (আ)-কে যে মাঠে নিয়ে গেলেন, আরতো ফিরিয়ে আনলেন না।'

তখন ইমাম সাহেব বুঝতে পারলেন যে, আরবরা কত মনোযোগ দিয়ে কুরআনে পাঠ শুনে থাকে। এমন কি সালাতের মধ্যে কোনোভাবের অসঙ্গতি রেখে তারা কুরআনে শেষ করে না। কেনই বা তারা কুরআনে বুঝে তিলাওয়াত বা শ্রবণ করবে যেখানে আল্লাহ্ স্বয়ং এ বিষয়ে তাকিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের সূরা মুহাম্মাদের আয়াত নং ২৪-এ বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ -

অর্থ : তারা কি কুরআনে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না?....

সূরা বাকারাহ্-এর আয়াত নং ১৫৯-এ বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ -

অর্থ : নিশ্চয় যারা গোপন করে আমি যেসব হেদায়েতের তত্ত্ব নাযিল করেছি মানুষের জন্য বিস্তারিতভাবে কিতাবের মধ্যে, তাদের প্রতি আল্লাহর ও অন্যান্য অভিসম্পাতকারীর অভিশাপ।

অর্থাৎ কোরআনের ভাব অনুযায়ী যারা কোরআনের আয়াত গোপন করে তারা অভিশপ্ত। সূরা ফুরক্বান-এর আয়াত নং ৩০-এ বলা হয়েছে,

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا -

অর্থ : আর রাসূল বলবে হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় কুরআনেকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ বস্তুতে পরিণত করেছে।

এখানে 'সম্প্রদায়' বলতে কোরাইশদের বুঝানো হয়েছে। চিন্তা করুন, কোরআনের বার্তাবাহক পর্যন্ত আশঙ্কা করেন যে মানুষ হয়তো কুরআনেকে প্রলাপ ভাবতে পারে।

১৩. কুরআনে তিলাওয়াতের বিভিন্ন উপায়

পবিত্র কুরআনে অনেকভাবেই তিলাওয়াত করা যায়। যেমন মনে করুন আয়াতগুলো শুধু অর্থসহ মোটামুটি পড়ে যাওয়া। এটা খুবই সহজ এবং এতে অনেক সময়ও লাগে না। একজন মানুষ অল্প কয়েক দিনেই এভাবে সম্পূর্ণ

কুরআনে পড়তে সক্ষম হবে। আরেকটি হচ্ছে গভীর জ্ঞানের সাথে পড়া। পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত গভীরভাবে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা। এভাবে তিলাওয়াত করে কেউ কোনো দিনই বলতে পারবে না তিনি পবিত্র কুরআনে শেষ করতে পেরেছেন। গভীর অর্থসহ আপনি যত পড়বেন ততই নতুন নতুন পথ আপনার সামনে খুলে যাবে। আপনি যদি একহাজার বারও তিলাওয়াত করেন প্রতি বারই মনে হবে আপনি নতুন কিছু পড়ছেন যা আগে বুঝেন নি। এভাবে কোরআনের গভীর অর্থ অনুধাবনের প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে, কখনো শেষ হবে না। তাই আমাদের প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে কুরআনে তিলাওয়াত করা উচিত।

আমাদের দরকার প্রত্যেক পরিবারের কমপক্ষে একটি কুরআনে পবিত্র ভাষা আরবিসহ যে ভাষা বুঝে সে ভাষায় অনুবাদসহ ঘরে রাখা। অনেকের বুকসেলফে কোরআনের অনুবাদ সাজানো থাকে, কিন্তু কখনো ছুঁয়েও দেখে না। এতে লাভ কি? অবশ্যই আমাদেরকে কুরআনে বুঝে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের প্রথম স্থানে থাকবে কুরআনে। আপনার সন্তানের জন্য প্রথম বইটি হোক কুরআনে। আপনার সন্তানের জন্য কোনো প্রথম উপহারটি হোক কুরআনে। এর অর্থ কী? এর অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে প্রথম থেকেই আপনি আপনার সন্তানকে কল্যাণ ও সত্যের পথে সন্তানের ভবিষ্যতের সুন্দর পথ খুলে দিলেন। যখন আপনার সন্তান বর্ণমালা শেখা শুরু করে তখন আরবি বর্ণমালাগুলোও শেখান। আরবিকে একটি ভাষা হিসেবে শেখাতে আরম্ভ করুন ছোটবেলা থেকেই। ছোট বেলায় ভাষা শেখা যতটা সহজ বয়স্ক হলে তা আর থাকে না। তখন নতুন ভাষা শেখাটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। অনেকে তাদের সন্তানদের মাদরাসায় পাঠান। আল হামদুলিল্লাহ্, আমি তাদের প্রশংসা করি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, শুধু মাদরাসায় পাঠিয়েই কি শেষ?

পরিবারের সবাই মিলে কি কখনো কুরআনে তিলাওয়াত করা হয়? হ্যা, এটাও পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পরিবারের সবাই মিলে সালাতুল ফজর বা সালতুল ইশা বা অন্য যে কোনো সুবিধা মতো সময়ে যদি আমরা প্রতিদিন এক রুকূ'ও অর্থসহ কুরআনে পড়ি তাহলে সহজেই কুরআনে পড়া শেষ হয়ে যাবে। এভাবে মাত্র দু বছরেই আমরা পবিত্র কুরআনে একবার পড়া শেষ করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ফাউন্ডেশনে একটি নিয়ম চালু আছে। আমাদের এখানে যখন কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী আসেন তখন সাথে সাথেই তাকে তার কার্ডটি ঘষতে হয়। এতে আপনা আপনি কম্পিউটারে রেকর্ড হয়ে যাবে এ কর্মকর্তা বা কর্মচারী কয়টার সময় অফিসে ঢুকলেন। এরপর তাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হয় তাহলো পবিত্র কোরআনের ১ রুকূ' অনুবাদসহ তিলাওয়াত করতে হয়। তারপর অফিসের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। আমার মনে হয় আমরা সকলেই আমাদের প্রতিষ্ঠানে বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে এ নিয়ম চালু করতে পারি।

অনেকে বলেন, আমার প্রতিষ্ঠানে অনেক চাকরিজীবী। তারা সবাই মিলে ১৫-২০ মিনিট এভাবে ব্যয় করলে অনেক টাকাই শুধু শুধু দেয়া হয়ে গেল না? আমি তাদের বলি আপনি এ সময়টা ব্যয় ধরছেন কেন? আপনি এটাকে বিনিয়োগ মনে করুন। পবিত্র কুরআনে থেকে সত্যবাদিতা ও অফিসে কর্তব্য পালন, ঘুষ নেয়ার শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তারা যে ধারণা পাবে তা অনেক উপকারে আসবে। ঘুষ সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ـ

অর্থ : এবং তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করো না। জনগণের সম্পদের সামান্য অংশও পাপপন্থায় আত্মসাৎ করার জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।

তাই পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজে যে একনিষ্ঠতা ও কর্তব্যবোধ আসবে তা আপনার ১৫-২০ মিনিটের অভাবকে মুছে দেবে। এছাড়া এটা একটা বড় বিনিয়োগও বটে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার আয়াত নং ২৬১-এ বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط

অর্থ : যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় এবং প্রত্যেক শীষে একশতটি দানা থাকে।

অতএব ১৫-২০ মিনিট কুরআনে তিলাওয়াতের জন্য বরাদ্দ করলে ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানে ক্ষতি হয়ে যাবে এমন ভাবাটি মোটেও যুক্তি যুক্ত নয়। আমাদের অনেকে আবার বলেন, জাকির ভাই, আমার প্রতিষ্ঠানে অনেক অমুসলিম কর্মকর্তা, কর্মচারী আছে। আমি বলি তাদেরকেও অনুবাদিত কুরআনে দিন এবং বলুন কোন্ অংশ তাদের কাছে ভুল বা অসঙ্গত মনে হয় তা বের করুন। তারপর তার জবাব দিন, বুঝিয়ে বলুন কোরআনের যথার্থতা। অপনি নিজে না পারলে যিনি জানেন তার কাছে যান। আমাদের ফাউন্ডেশনে আসুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ফাউন্ডেশনে অমুসলিমদের মনে ইসলাম ও কুরআনে সম্পর্কে কী প্রশ্ন জাগতে পারে তা নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি চালু আছে। অতএব, এখানে আসতে পারেন। আসলে ইচ্ছেটাই হলো মূলকথা।

১৪. কোরআনের অনুবাদ নির্বাচন

অনেকে বলেন, কোন্ অনুবাদ পড়বো? আমি ইংরেজি অনুবাদগুলো সম্পর্কে বলবো। যেহেতু আমার লেকচার হয় ইংরেজিতে। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, কোনো অনুবাদই একশো ভাগ নির্ভুল নয়। কেননা এগুলো মানুষের লেখা আর মানুষ কখনও ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে আমি শুধু অনুবাদগুলোর সুবিধার কথাই বলবো, দুর্বলতা নিয়ে কিছু বলবো না। অনুবাদ পড়ার বেলায় অনেকেই প্রাচীনত্বকে গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ যত প্রাচীন ততই গ্রহণযোগ্য। আমার কিন্তু মনে হয় নতুন অনুবাদও ভালো হতে পারে। যেহেতু পুরাতন অনুবাদ পড়ে তাদের দুর্বলতা অনুধাবন করে নতুনরা লিখতে বসেন। তাই নতুন অনুবাদও ভালো হতে পারে। অনেকে আবার সর্বজন গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি দেখেন অর্থাৎ কত জন মানুষ এটাকে গ্রহণ করেছে। হ্যা, এটাও একটা ভালো দিক। যেটি অনেকেই গ্রহণ করেছে আপনিও সেটি নিতে পারেন। তবে মূলকথা হচ্ছে কোনোটিই ১০০ ভাগ শুদ্ধ নয়। একশো ভাগ পরিশুদ্ধ শুধু আল্লাহর নাযিলকৃত মূল আরবি কুরআনেটিই।

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত কুরআনেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আব্দুল্লাহ্ ইউসুফের অনুবাদটি। এটি বেশ সহজ বোধ্য, না বেশি সংক্ষিপ্ত আবার না বেশি বিস্তৃত। মধ্যম আকারের এবং বেশ প্রাঞ্জল।

এরপর আসে আবুল কাশেম অনূদিত এ তাফসিরটি। এটি একেবারেই নতুন প্রকাশক। এটি আমাকে দিয়েছেন পড়ার জন্য এবং আপনাদের এটি সম্পর্কে জানানোর জন্য। এটিও আপনারা পড়ে দেখতে পারেন।

কুরতুবি, ইবনে কাসির ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে এ অনুবাদটিও সুন্দর। ক্রটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোরআনের আলোচনার সাথে সাথে বুখারী শরীফের সম্পৃক্ত হাদিসগুলোও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে একই সাথে বুখারি শরীফ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান পাওয়া যাবে।

এছাড়া আপনি সাথে রাখতে পারেন এ ছোট সংস্করণটি। এটি ছোট, সহজে বহনযোগ্য এবং সব জায়গায় নেয়ার মতো। দেখে থাকবেন বাইবেলসহ অনেক ধর্মীয় বইয়ের এরকম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থাকে যা পকেটে বহনযোগ্য। এর পৃষ্ঠাগুলো উন্নত, কিন্তু পাতলা তাই এতো ছোট। এর মধ্যে পুরো কুরআনে অনুবাদসহ দেয়া আছে। আমার দেখা অনুবাদসহ আয়তনে সবচেয়ে ছোট কুরআনে এটিই। এটি কাছে রাখলে বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে বসে অযথা সময় নষ্ট না করে অহেতুক বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে কুরআনে তিলাওয়াত করতে পারেন।

'দ্যা মেসেজ অব দ্যা হলি কুরআনে' নামের এ অনুবাদটিও পড়তে পারেন। এটি যুক্তিসঙ্গত দিকগুলো অর্থাৎ কুরআনেকে যৌক্তিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি একজন বিখ্যাত ইহুদি সাহিত্যিক কর্তৃক লিখিত যিনি পরে মুসলিম হয়েছেন।

আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী লিখিত তাফসীরগ্রন্থ 'তাফসিরুল কুরআনে'টিও পড়তে পারেন। এটি চার খণ্ডে লিখিত। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের আরো লিখিত ইংরেজিতে কোরআনের তাফসীরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি। এছাড়া মাহমুদুল হক লিখিত এ অনুবাদটিও বেশ ভালো ও সহজ সরল ভাষায় সুলিখিত।

অনেক অমুসলিমই পবিত্র কুরআনে অনুবাদ করেছেন। তবে ধর্মীয় জ্ঞানের অজ্ঞতার জন্য তাদের অনুবাদে অনেক ভুল দেখা যায়। তবে অমুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে অনুবাদটি আমার জানা মতে আছে সেটি হচ্ছে আর্থার আদ্রিব করা অনুবাদ। এতে অনেকটাই চেষ্টা করা হয়েছে কোরআনের কাব্যিক ভাবটি ধরে রাখা। যদিও আরবির কাব্যিকভাব ইংরেজিতে ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন, তবুও লেখক সেই কাজটিই বেশ কষ্টের সাথে হলেও করার চেষ্টা করেছেন।

এডুইন নামের একজন আমেরিকান খ্রিস্টান কিন্তু পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াত ও বোধগম্য মাধ্যমেই মুসলিমে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর বর্তমান নাম আলহাজ্জ তালেব আলী। তাঁর অনূদিত এ কুরআনেটি বেশ সহজ সরল এবং আমেরিকানরা যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করে সেটাই ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় এটি করতে গিয়ে বেশ হালকা শব্দও ব্যবহার করেছেন। কোনো আমেরিকান লিখিত কোরআনের প্রথম অনুবাদ হিসেবে এটি স্বীকৃত।

কেউ যদি ইংরেজিতে অনূদিত কুরআনে পড়তে চান তবে তার সরাসরি আরবি থেকে, ইংরেজিতে অনূদিত কুরআনে পড়াই ভালো। কেননা আরবি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তারপর আবার ইংরেজিতে অনূদিত হলে তার মধ্যে অসামঞ্জস্যতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, এরপরও অন্য ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত কোরআনের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর লিখিত 'তাফহীমুল কুরআনে' বেশ প্রচলিত। মূল তাফসীরটি উর্দু ভাষায় লিখিত। এটি দুজন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। একজন মুহাম্মদ আখতার ৭ খণ্ডে অন্যজন ফাযরী শাহ্ আনসারী ৫ খণ্ডে। আনসারীর ৫ খণ্ডে অনুবাদটি বেশি সংক্ষিপ্ত। কোরআনের আয়াতগুলো নাজিলের প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক ঘটনা, নাজিলের সময়, অবস্থান ইত্যাদি জানতে চাইলে এটি থেকে বেশি উপকৃত হবেন। কোরআনের আয়াতগুলো নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এটিতে অনেক সাবলীল ভাষায় বিধৃত হয়েছে। আমি নিজে অবশ্য এটির ইংরেজি অনুবাদ পড়িনি।

এছাড়া উর্দু ভাষায় রচিত 'দাওয়াতে কুরআনে' যা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন আবদুল করিম। এটিও পড়তে পারেন। তবে একটি কথা আবারও বলতে চাই আর তা হচ্ছে কোনো অনুবাদই শতভাগ বিশুদ্ধ নয়। কিছু কিছু ভুল অবশ্যই আছে, কারণ এগুলো মানব রচিত। আর কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা হাশর-এর ২১ নং আয়াতে বলেন,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থ : আর আমি যদি এ কুরআনে পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তাহলে আপনি দেখতেন পাহাড় চিন্তিত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

মহান আল্লাহ্ এখানে পাহাড়ের কথা উল্লেখ করেছেন কেননা পাহাড় হচ্ছে স্থির, শক্তভাবে দণ্ডায়মান, উচ্চশীর, কঠিন ও কাঠিন্যের প্রতীক, পাহাড়ে আরোহণ অনেক কঠিন একটি কাজ। আল্লাহ্ তাই পাহাড়ের উদাহরণ আনার মাধ্যমে বুঝাতে চান পাহাড়ের মতো শক্ত, কঠিন, উচ্চ ও দুর্দমনীয় জিনিসও কোরআনের ভার বহনে অক্ষম ও অপারগ। তাই মানুষের জন্য সত্যিই এটি তুচ্ছ কোনো কিছু নয়।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা নাহল-এর ১২নং আয়াতে বলেন,

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শনাবলী।

তাই আমি আশা করি মুসলিম ভাইয়েরা পবিত্র কুরআনে বুঝে পড়ার দিকে মনোযোগী হবেন। যে দিনগুলো চলে গেছে সেগুলোর কথা না ভেবে আজ থেকে বাকি দিনগুলোতে আমরা নিয়মিতভাবে কুরআনে তিলাওয়াত করবো, বুঝবো এবং সে অনুযায়ী আমল করবো। প্রথমত, আমাদের কাজ হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝতে পারা, এরপর আমাদের দায়িত্ব সে অনুযায়ী আমল করা। আমি আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই মহানবী ﷺ -এর একটি হাদিস দিয়ে। বুখারী শরীফের ৬ষ্ঠ খণ্ড হাদিস নং ৫৪৫-এ মহানবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে পবিত্র কুরআনে বুঝে পড়ে ও অন্যদের সেভাবে বুঝায়।' তাই আমরা সকলে কুরআনে বোধগম্যতার সাথে পড়ার উদ্যোগী হবো সে আশা আমি সবার কাছে করতে পারি। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখির ..... আলামিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

১৫. সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন বর্ণ সমষ্টি, তাৎপর্য ও অর্থ

প্রশ্ন ১. পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার শুরুতে الم। এসেছে। এগুলো কেন? এর অর্থই বা কী?

উত্তর : এখানে কথা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার শুরুতে কিছু বিক্ষিপ্ত বর্ণ এসেছে সেগুলো নিয়ে। এ হরফগুলোকে বলা হয়, হরূফে মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এ বর্ণমালা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এমন কি অনেক বইও লিখিত হয়েছে। সেগুলোতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আমরা জানি আরবি বর্ণমালা ২৯টি এবং ১টি থেকে সর্বোচ্চ ৫টি পর্যন্ত আছে। যেমন ১টি করে বর্ণ আছে ৩টি সূরায় সেগুলো হলো নুন্, ছোয়াদ ও ক্বফ। দুটি বর্ণ আছে ১০টি সূরায় যেমন : طه (ত্বোয়া হা,) يس: (ইয়াছিন) ইত্যাদি ৩টি বর্ণ আছে। এভাবে বেশ কয়েকটি সূরায়। যেমন : আলিফ, লাম, মিম ৬টি সূরায়, আলিফ, লাম, রা, ৬টি সূরায় এবং তোয়া, সিন, মীম ২টি সূরায়। আবার ৪টি বর্ণ আছে ২টি সূরায় এবং ৫টি বর্ণ আছে দুটি সূরায়।

এখন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন, এগুলোর অর্থ কী? আমি আগেই বলেছি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেক বড়। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ বলেন ن (নূন) দ্বারা বুঝানো হয়েছে نور তথা আলোক রশ্মি, এমনিভাবে একেক বর্ণের দ্বারা তারা একেকটি শব্দ নির্দেশ করেন, কেউ কেউ মনে করেন, এগুলো আল্লাহর গুণবাচক নাম (সিফাত)। কারো কারো ব্যাখ্যা আবার কোনো কোনোটি আল্লাহর নাম হিসেবে, কোনোটি রাসূল ﷺ-এর নাম হিসেবে আবার কোনোটি কোরআনের নাম হিসেবে। অনেকেই মনে করেন, এগুলো সূরার নামকরণের জন্য করা হয়েছে। যেমন : সূরা ইয়াছিন, সূরা নূর, সূরা ছোয়াদ, সূরা ত্বোহা ইত্যাদি। অনেকে আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা বলেন, এগুলো হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা নির্দেশক বর্ণমালা। কিছু কিছু মুফাসসীর মত প্রকাশ করেন যে, এগুলো হযরত জিবরাঈল (আ) পড়েছিলেন মহানবী ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। আর আমরা তিলাওয়াত করি মনোযোগ সৃষ্টির জন্য।

১৬. একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ

তবে আমি ইমাম তাইমিয়ার সাথে একমত পোষণ করি যিনি বলেছেন, এগুলো দ্বারা মূলত আল্লাহ্ আরবদের বুঝিয়েছেন। আমি কুরআনে অবতীর্ণ করেছি তা তোমাদের ব্যবহৃত বর্ণমালা দিয়েই। তোমরা তোমাদের কথায়, লেখায়, ভাষায় যে বর্ণসমষ্টি, যেমন আলিফ, ছোয়াদ, তোয়া, নূন ব্যবহার করো আমার কুরআনেও

সেই বর্ণমালার সাহায্যে নাযিলকৃত গ্রন্থ। এখন তোমরা যদি বিশ্বাস না কর এটা আল্লাহর বাণী, তবে ঐ একই বর্ণমালা দিয়ে তোমরা একটা সূরা একটা আয়াত ইত্যাদি রচনা করে দেখাও। এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার জন্যই মূলত এ বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, যে তোমাদের বর্ণ আর আমার বর্ণ ভিন্ন নয়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে বলেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط

অর্থ : তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু অংশ সুস্পষ্ট এবং এটিই আসল অংশ, অন্যগুলো রূপক।

অর্থাৎ কিছু বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন বোধগম্যতা সমৃদ্ধ। যেমন : قل هو الله احد 'বলুন আল্লাহ এক'। এটি সবাই বুঝে আবার কিছু আয়াত আছে যেগুলো সবাই বুঝতে পারে না। যেমন : الم। (আলিফ, লাম, মীম) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কোরআনের অন্য আয়াতের সাহায্যে নিতে হয়। কোরআনের এটি একটি উল্লোখযোগ্য দিক যে যখন একটি আয়াত পড়তে গিয়ে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হয় এবং সেটির উত্তর ঐ আয়াতেই পাওয়া যায় না, তখন দেখা যায় অন্য আয়াতে ঠিকই তার উত্তর বিদ্যমান। এখন আমরা যদি বলি আল্লাহ্ এভাবেই কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন অন্য আয়াতে। যেমন সূরা বাকারায় (২৩-২৪) নং আয়াতে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : আর যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মদ ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছি, তবে তোমরা এর একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করো, তোমরা তোমাদের সাহায্যকারীদের সঙ্গে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর যদি তোমরা না পারো, তবে জেনে রেখো পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর।

আল্লাহ্ কোথাও দশটি সূরা আবার কোথাও একটি আয়াত রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ মূলত মানুষকে বুঝাতে চান তাদের বর্ণিত, লিখিত ও

পঠিত বর্ণমালা আলিফ, লাম ইত্যাদিই আমি ব্যবহার করেছি অথচ তারা এগুলো ব্যবহার করে একটি ছোট আয়াতও রচনা করতে ব্যর্থ। আসলে এই যে বর্ণগুলো ইংরেজি বর্ণমালার কথা ধরলে আমরা বলতে পারি a, b, c, d, e, f, ইত্যাদির কথা। এই একই বর্ণমালা ব্যবহার করে সবাই কি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?

একটা উদাহরণ দেয়া যাক, মানুষের সৃষ্টিতে যে উপাদানগুলো আছে মাটি ও পৃথিবীর সৃষ্টিতেও প্রায় সে একই ধরনের উপাদান আছে। মানুষের শরীর যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তা আপনি কম-বেশি কয়েক হাজার টাকা হলেই কিনতে পারবেন। তাই বলে কি এর অর্থ এই যে, আপনি মানুষ তৈরি করতে পারেন? অবশ্যই না। আপনি কোনোভাবেই প্রাণ দিতে পারবেন না। যদিও সব উপাদানই বিদ্যমান আপনার হাতে তবুও আপনি পারবেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ও বলেন, 'তোমরা যে আলিফ, লাম, নূন, মীম ইত্যাদি বর্ণমালা ব্যবহার করো আমিও তাই ব্যবহার করেছি। পারলে তোমরা একটি সূরা বা আয়াত রচনা করো।' সেই চ্যালে টি প্রতিষ্ঠার জন্য এ বর্ণমালাগুলো হতে পারে। যেমন : আমরা দেখতে পাই সাধারণত এই ইরাব (اعراب) বা বর্ণ বিন্যস্ত আয়াতগুলোর পরপরই কোরআনের মহিমা বিধৃত আয়াত উল্লেখ করা হয়। যেমন : সূরা বাকারার ১ ও ২ নং আয়াত যেখানে প্রথম আয়াতে আলিফ, লাম, মীম বলেই ২য় আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন,

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : এটা সেই কিতাব যাতে নেই সন্দেহের লেশ মাত্র, আর এটি মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।

অনুরূপভাবে সূরা ইবরাহীম-এ আলিফ, লাম, রা এর পরেই বলেছেন,

الٓرٰ ـ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থ : এটা সেই কিতাব যা মানুষকে নেতৃত্ব দেয় অন্ধকার থেকে আলোকের পথে।

এভাবে হয় তো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কোরআনের মহত্ত্ব বর্ণনাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৭. কুরআনে তিলাওয়াত ও পুণ্য অর্জন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ২. আমি রিয়াজ বলছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– কোরআনের প্রতিটি সূরা পড়ার জন্য আমরা সওয়াব পাই। এখন কোরআনে তো 'ইবলিস' শব্দটিও আছে। সারাদিন আমি যদি 'ইবলিস', 'ইবলিস' করি তবে কি সওয়াব পাবো?

উত্তর : ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, কুরআনে তিলাওয়াত করলে আমরা সওয়াব পাই প্রতিটি বর্ণের বিনিময়েই, যা এসেছে তিরমিজি শরীফে ১০০৩ নং হাদিসে এসেছে তাহলে 'ইবলিস ইবলিস' যিকির করলে সওয়াব পাব কি না? ভাই আমি আগেই বলেছি কুরআনে বোধগম্যতার সাথে পড়তে হবে। আপনি যদি 'ইবলিস' শব্দটি বুঝে পড়েন যে আমাদের শত্রু। সে আমাদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। ইবলিসের ধোঁকা থেকে বাঁচতে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে ইত্যাদি। তবে আপনি অবশ্যই সওয়াব পাবেন।

১৮. কুরআনে বুঝে পড়া ধারণাটি কী নতুন?

প্রশ্ন ৩. আমি অশোক কুমার। আমি তুলনামূলক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছি। এখন আমি একটি স্থানীয় পত্রিকায় আছি। আমি অনুমতিক্রমে পবিত্র কুরআনে ও বেদে উল্লিখিত কালিমা পাঠ করছি। এরপর আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আপনি বলেছেন কুরআনে বোধগম্যতার সাথে পড়তে। অথচ এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা কুরআনে না বুঝেই পড়ছে। তাহলে আপনার কথার ভিত্তি কী? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে– এর আগে আমাকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'শাকাহারি' অর্থাৎ নিরামিষাসি ও মুসলমান থাকতে পারে, তাহলে ইসলামে পশু খাওয়া কেন হালাল করা হলো? এটা কি নৃশংসতা নয়?

উত্তর : ভাই বলেছেন, পবিত্র কুরআনে এতোদিন ধরে মুসলমানরা না বুঝেই পড়ে যাচ্ছে তাহলে আমি কীভাবে বোধগম্যতার সাথে পড়ার কথা বলছি? আসলেই কি তাই? আসলেই কি মুসলমানরা কুরআনে না বুঝেই ১৪০০ বছর ধরে পড়ছে? অবশ্যই না। মুসলামনরা যতো দিন পর্যন্ত কুরআনে বুঝে পড়ে এসেছে ততদিন পর্যন্ত ছিল তাদের স্বর্ণযুগ। ৬০০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত যে অন্ধকার যুগ সেটা ইউরোপের অন্ধকার যুগ। মুসলমান বা সেই সময় ছিল নতুন স্বর্ণালি সভ্যতার নির্মাতা। বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় তারা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও লালনকারী। তারা তখন কুরআনে বুঝে পড়তেন, কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন বলেই তারা এতোটা আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আস্তে আস্তে যখন কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগলো তখনই তাদের বিচ্যুতি ঘটলো। মুসলমানরা উন্নয়ন হতে পিছিয়ে পড়লো। কেননা তারা সত্য ধর্ম ইসলাম ও সত্য গ্রন্থ কুরআনে থেকে বিচ্যুত হলো। অনুরূপভাবে অমুসলিমরা উন্নত হতে লাগলো। কারণ তারা তাদের মিথ্যা ধর্ম অনুসরণ করা বাদ দিল বলে। তাই মুসলমানরা যদি আবার কুরআনে বোধগম্যতার সাথে পড়া শুরু করে তবে অবশ্যই তারা উন্নত হতে পারবে।

১৯. ইসলামে জীব সংহার করে খাওয়ার অনুমতি দান

আপনার ২য় প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, একজনকে মুসলিম হতে হলে আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মুসলমান হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই কেউ বলতে পারে 'আমি ডাক্তার না হয়েও মুসলমান। আমি ইঞ্জিনিয়ার না হয়েও মুসলমান'। কেননা মুসলমান হতে এগুলো হওয়া শর্ত নয়। অনুরূপভাবে কেউ নিরামিষাসী হয়েও কিংবা না হয়েও মুসলমান হতে কোনো বাধা নেই। তবে এটা তাকে মানতে হবে যে, আল্লাহ্ যা আমাদের জন্য হালাল করেছেন তা খাওয়া কোনো অন্যায় নয়। এখন তিনি সেটা না খেলে কার কি করার আছে?

আসল কথা হচ্ছে খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে আল্লাহ্ নীতিমালা দিয়েছেন। যেমন সূরা মায়িদার আয়াত নং ৫-এ বলা হয়েছে,

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ـ

অর্থ : তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহ্ চতুষ্পদ জন্তু হালাল করেছেন। অনুরূপভাবে সূরা মুমিনূন-এর ২১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থ : তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তার বিষয় আছে। আমি তোমাদের তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আছে অনেক উপকারিতা। তোমরা তাদের থেকে ভক্ষণ করো।

এখন আপনি বলতে চান মানুষ প্রাণী হয়ে অন্য জন্তুর গোশত খাবে এটা কতটুকু বাস্তব সম্মত? দেখুন ভাই, যেসব মাংশাসী প্রাণী আছে তাদের দাঁতগুলো তীক্ষ্ণ ও ধারালো। আবার যেসব প্রাণী তৃণভোজী যেমন– গরু, ছাগল, ভেড়া এদের দাঁত চ্যাপ্টা। আপনি যদি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান তবে দেখতে পাবেন মানুষের দাঁত তীক্ষ্ণ, ধারালো, আবার চ্যাপ্টা দু ধরনেরই। কেন এমনটা? কারণ, মানুষ এমন প্রাণী যা আমিষ ও নিরামিষ তথা গোশত ও শাক-সজি দুটোই খায়। মানুষকে যেহেতু এভাবে সৃষ্টিই করা হয় তবে খেতে বাধা কোথায়? আবার মানুষের পরিপাকতন্ত্রের দিকে খেয়াল করুন। যে সব প্রাণী তৃণভোজী তাদের পরিপাকতন্ত্র একভাবে তৈরি। তারা আমিষ তথা গোশত খেয়ে হজম করতে পারে না। বিপরীতক্রমে যেসব প্রাণী আমিষাসী তথা গোশতভোগী তারা লতা, পাতা হজম করতে পারে না। অথচ মানুষের পরিপাকতন্ত্র এমনভাবে কাজ করে যে তা আমিষ ও নিরামিষ উভয়টিই হজম করতে পারে। এতেই কি বুঝা যায় না মানুষ আমিষ ও নিরামিষ দুটোই খাবে?

আপনি এখন বলছেন মানুষ রান্না করে খায় বলেই হজম হয়। আচ্ছা কোনো ছাগল বা গরুকে গোশ্‌ত রান্না করে খাওয়ান তো দেখি হজম করতে পারে কি না। শুনুন, ইউরোপে একবার গরুকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমিষ খাওয়ানো হলে ম্যাড কাউ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এতেই বুঝা যায় আল্লাহ্ যে প্রাণীর যা দরকার সেভাবেই সেই প্রাণীকে সৃষ্টি করেন। অতএব আমিষ খাওয়াতে মানুষের কোনো অপরাধ নেই। আপনি যে যুক্তিতে আমিষ খাওয়ার বিরোধিতা করছেন তা হলো যে প্রাণী জবাই করা হবে তার কষ্টের কথা চিন্তা করেন। এখন কথা হচ্ছে মানুষ তাহলে কী খাবে? বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে 'গাছেরও প্রাণ আছে'। তারা ব্যথা পায়, এমন কি আনন্দিতও হয়। তাহলে কি মানুষ শাকসবজি খাওয়াও বন্ধ করে দেবে? এটা যেহেতু অসম্ভব তাই আমিষ ও নিরামিষ খেতে বাধা কোথায়– যে ক্ষেত্রে খাওয়া ও না খাওয়ার দুটোর ক্ষেত্রেই এক?

হ্যাঁ, আপনি এখন বলছেন, গাছের অনুভূতি শক্তি কম তাই খাওয়া যাবে। আচ্ছা আপনার কথা না হয় মেনেই নিলাম। এখন কথা হচ্ছে ধরুন, আপনার এক ভাই বোবা ও অন্ধ অর্থাৎ অনুভূতি শক্তি কম। এখন কেউ তাকে খুন করলো। আপনি কি আদালতে বলবেন, 'মহামান্য আদালত, আমার ভাইয়ের অনুভূতি শক্তি কম ছিল তাই খুনির শাস্তি কম হোক।' অবশ্যই তা বলবেন না। আসলে অনুভূতি শক্তি কম বা বেশি এ যুক্তিতে নিরামিষ খাওয়া বৈধ আর আমিষ খাওয়া অবৈধ এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না। প্রিয় আশেক ভাই, আপনি এখানে আরো আসুন এবং প্রশ্ন করুন তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে কথা হচ্ছে, এটা প্রশ্নোত্তর পর্ব। এখানে আরো অনেকের প্রশ্ন আছে, তাদেরও সুযোগ দিন। এ বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণসহ দুই-তিন ঘণ্টার আলোচনাও করতে পারবো। কিন্তু এমন সময় কোথায়? আশা করি এর মধ্যেই উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ।

প্রশ্ন ৪. আপনি বলেছেন অমুসলিমদেরকে আরবিসহ অনূদিত কুরআনে উপহার দেয়াই উত্তম। আবার বলেছেন, পকেট কুরআনে নিয়ে ট্রেনে বসে কুরআনে পড়ার কথা। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এতে কুরআনে পবিত্র অবস্থায় তিলওয়াতের যে বিধান আছে তা ক্ষুণ্ন হয় কি-না? অমুসলিম কীভাবে পবিত্র হবে আর ট্রেনে বা বাসে কি সব সময় অজু থাকে?

উত্তর : আপনি কোন্ অজুর কথা বলেছেন। আসলে অজু ছাড়াও কুরআনে তিলাওয়াতের অনেক পন্থা আছে। এ উদ্ধৃতিটি ফেরেশতাদের জন্য যা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। তবে এটা নিয়ে অনেক কথা আছে, আছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা। একেকজন একেকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এটা ফেরেশতাদের জন্য নাকি মানুষের জন্য এ নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তেমনি কুরআনে অজু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়েও বেশ মতভেদ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন জন, যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম হাম্বলী, ইমাম মালেকীসহ

বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা মনে করেন, বিনা অজুতে কুরআনে ছোঁয়া নিষিদ্ধ, তবে কাপড়ে পেঁচানো থাকলে বা কাপড়ের আবরণ থাকলে ধরতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, খালি দু মলাটই কাপড়ের কাজ করে। তাই আলাদা কাপড় না হলেও চলবে। যাহোক, অনেকের মতামত আবার একটু অন্য রকম। যেমন হাম্বলী মনে করেন, এমনি কুরআনে, অজু ছাড়া স্পর্শ করতে কোনো সমস্যা নেই, তবে আরবি লিখিত অংশে হাত দেয়া যাবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জন্য ও শিক্ষকেরা শেখানোর নিমিত্তে কোরআনের যে কোনো অংশই অজু ছাড়া স্পর্শ করতে পারবে। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রাখলে কোনো না কোনোভাবে তাদের শিক্ষা করা ও দেয়া দুটোতেই বাধার সৃষ্টি হতে পারে যা তাদের জন্য কুরআনে ভুলে যাওয়ার পথ সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বেশ উদার।

এভাবে দেখা যায়, এ বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত বর্তমান তবে ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি এ বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, তিনি মত প্রদান করেন যে, পবিত্র কুরআনে অজু ছাড়াও তিলাওয়াত করা যায়। অজু ব্যতীত কুরআনে স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনেক মতানৈক্য থাকলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত আর তাহলো অজুসহ কুরআনে তিলাওয়াত উত্তম। ইবনে হাজার কোরআনের অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে হাদিস থেকে বিভিন্ন উক্তি দিয়ে স্ববিস্তারে বর্ণনার পর যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তা হলো, কুরআনে তিলাওয়াত-এর ব্যাপারে কোনো পূর্ব শর্ত নেই। এটা হাজার আসকালানীর মত। অন্য অনেকের মতও পাওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে হাদিসেও এসেছে 'ত্বাহারাত' অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া কুরআনে স্পর্শ করা যাবে না।

কিন্তু 'ত্বাহারাত' বা পবিত্রতা বলতে কি অজু বুঝায়? বিষয়টি বিশ্লেষণের দরকার আছে। অজু থাকলেই কি একজন 'ত্বাহির' তথা পবিত্র আছেন বলা যায়? যদি কেউ আনুষ্ঠানিক বড় অপবিত্রতা তথা স্ত্রী সহবাসের পর অজু করে সে 'ত্বাহারাত' অর্জন করে না। তাই যেসব হাদীসে 'ত্বাহারাত' তথা পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে তিলাওয়াতের ব্যাপারে সেসব হাদীসে মূলত বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। কেননা ঐ অবস্থায় অধিক সময় থাকা অনুচিত। এ ব্যাপারে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও ইবনে আজিজসহ অনেকেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আর ইবনে হাজার আসকালানী বিস্তারিত বর্ণনার পর এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অজু ছাড়াও কুরআনে তিলাওয়াত বৈধ। সুতরাং তার ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। এবার আসা যাক অমুসলিমদের ব্যাপারে। আমার মনে হয় আমরা যদি মনে করি পবিত্র কুরআনে অমুসলিমদের দেয়া বৈধ, তবে তাঁর পক্ষে পবিত্র কোরআনের সূরা নাহল-এর ১২৫নং আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ـ

অর্থ : মানুষকে ডাক আল্লাহর পথে প্রজ্ঞা ও কৌশলে।

যদি আমি কুরআনেই তাকে না দিই তবে কোন্ কৌশল অবলম্বন করবো? এছাড়া আল্লাহ্ সূরা বাকারাহ্-এর ২৩ নং আয়াত ও সূরা বনী ইসরাঈলে কাফেরদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন এভাবে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ

অর্থ : তারা যদি কুরআনেকে মানব রচিত কোনো গ্রন্থ মনে করে, তবে এর মতো একটি সূরা এমন কি আয়াত তারা রচনা করে দিক।

এই যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ্ ছুঁড়ে দিয়েছেন এটা যদি কাফেররা গ্রহণ করে তবে অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র কুরআনে পড়তে হবে। শুধু পড়তেই হবে না অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সবরকম কৌশলেই তাদের পড়তে হবে। আর যদি পড়তে চায় তবে স্পর্শ করতে বা ধরতে হবে। বিনা স্পর্শে তারা পড়বে কীভাবে? তাহলে আল্লাহ্ যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কাফেরদের কুরআনে স্পর্শ করার পথ খুলে দেন, তবে আমি আপনি নিষেধ করার কে?

আমরা কীভাবে তাদের বাধা দিব কুরআনে পড়ার ব্যাপারে? এছাড়া আমি আগেও বলেছি, আল্লাহ্ যদি আমাকে অমুসলিমদের কুরআনে দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তবে আমি নিশ্চিতভাবেই আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে আমার পাশে পাব যেহেতু তিনি নিজেই কোরআনের আয়াত সম্বলিত পত্র বিভিন্ন অমুসলিম রাজাদের কাছে লিখতেন। তাছাড়া একটু মনোযোগ দিয়ে কোরআনের হেদায়েত বিষয়ক আয়াতগুলো ব্যাখ্যাসহ পড়লে ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিমদের কুরআনে দেয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকার কোনো কারণ দাঁড় করানো যায় না।

২০. কুরআনে সংকলনের ইতিহাস প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ৫. আমি আজকের এই বিশেষ আলোচনায় আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি দোআ করি আল্লাহ্ যেন আমি ও অন্যসব শ্রোতাকে কুরআনে সম্পর্কিত এ মূল্যবান আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করার ও তার ওপর আমল করার তৌফিক দেন। যা হোক আমি আমার মূল প্রশ্নের দিকে সরাসরি যেতে চাই। আর তা হলো, অনেক অমুসলিম বলে থাকে, তোমাদের নিকট যে কুরআনে আছে সেটি তো তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত। এটিতো আল্লাহ্ অবতীর্ণ মূল কুরআনে নয়। এ অভিযোগটি কীভাবে খণ্ডানো যাবে?

উত্তর : আপনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। অনেকেই এ অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে যে, পবিত্র কোরআনের এ সংকলনটি হযরত উসমান (রা) থেকে এসেছে। আসলে যারা এটা বলে, তারা ভুল বলে। এটা বুঝার জন্য আপনারা দেখতে পাবেন ভিডিও ক্যাসেট 'ইজ দ্যা কুরআনে দ্যা ওয়ার্ড অব গড।'

আসল কথা হলো এটি মুহাম্মদ ﷺ-এরই সংকলন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। যখন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন মুহাম্মদ ﷺ সাথে সাথে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। অনেক সাহাবী (রা)ও সেটা মুখস্থ করে ফেলতেন। তারপরও মহানবী (সা) সেই অংশগুলো নির্বাচিত কয়েকজন সাহাবী (রা)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্তূপ যেমন তালের পাতা, পাতলা পাথর, তরবারির পাত ইত্যাদির ওপর লেখাতেন। পরে বিভিন্নভাবে সেগুলো পরখ করতেন। যদিও তিনি পড়তে পারতেন না তবুও একজনের লিখিত অংশ অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে নিজে শুনতেন এভাবে বিভিন্নভাবে পরখ করে কোরআনের বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতেন। এরপর মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পূর্ববর্তী রমজানে তিনি দু বার পবিত্র কুরআনে খতম করেন এবং সাহাবী (রা) তা শুনে আবার মিলিয়ে নেন।

এছাড়াও কুরআনে বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হয়েছিল। এ পর্যায়ে মহানবী ﷺ নিজে কোনো আয়াত কোন্ সূরার কোন্ আয়াতের পরে অবস্থান পাবে তা তিনি বলে দিলেন এবং এভাবে পবিত্র কোরআনের পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও সুসামঞ্জস্য একটি সংকলন মহানবী নিজে করে দিয়ে গেলেন। আমরা এখন যেভাবে কুরআনে সাজানো ও ধারাবাহিকভাবে সূরায় সূরায় বিন্যস্ত পাই, এটিও কোনো সাহাবী (রা) বা খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে নয় বরং মহানবী ﷺ তত্ত্বাবধানে সমাপ্তি। তাই এটিকে হযরত উসমান (রা) এর সংকলন বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ব্যাপারটা হলো মহানবী (সা) কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সাজানো ও বিন্যস্ত কোরআনের অনুলিপি কপি অনেক ছিল না। ছিল স্বল্প কয়েকটি। কিন্তু সাহাবী (রা) যেহেতু মুখস্থ করে রেখেছিলেন, তাই কোনো প্রয়োজনও পড়ে নি অনেক কপি করার। কিন্তু তখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজ সাহাবী (রা) শহীদ হলেন তখন প্রয়োজন পড়ে মহানবী ﷺ কর্তৃক সুবিন্যস্ত কোরআনের কপি করার। এটিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা হয়। এমন কি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কুরআনে নকলকারী সাহাবী যায়েদ বিন সাবিত (রা)-এর তত্ত্বাবধানে এ কাজটি সমাধান করা হয়।

এতে বুঝা যায় তাঁরা কোরআনের পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে কতোটাই আন্তরিক ও সচেষ্ট ছিলেন। আসলে এগুলো ছিল নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশিত সংকলনেরই অনুলিপি। নতুন কোনো সংকলন নয়। এর একটি কপি হযরত আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর নবী করীম ﷺ-এর পত্নী ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মেয়ে হযরত হাফছা (রা)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। হযরত উমর (রা)-এর

ওফাতের পর হযরত উসমান (রা)-এর সময় যে সমস্যাটি দেখা দিল তা হচ্ছে ইসলামী খিলাফত ততদিনে অনেক বিশাল এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) যে কয়েকটি কপি করেছিলেন তা অপ্রতুল হয়ে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সে কপিগুলো পৌছানো অসম্ভব হয়ে যায়।

ইত্যবসরে অন্যান্য সাহাবী (রা) যারা মহানবী ﷺ -এর তত্ত্বাবধানের বাইরে কুরআনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাদের অনেক কপিই বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হলো যেগুলো মহানবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানের বাইরে ছিল সেগুলো কোনোটি ছিল অসম্পূর্ণ কোনোটি ছিল অগোছালো অর্থাৎ মহানবী ﷺ যেভাবে আয়াতগুলো বিন্যস্ত করেছিলেন সেভাবে ছিল না। তবে এটি নিশ্চিত কোনোটিই ভুল ছিল না। তবুও কোরআনের বিশুদ্ধতা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে মহানবী ﷺ কর্তৃক সংকলিত প্রতিলিপি বাদ রেখে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত সব পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে মহানবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে পরিসমাপ্ত কপি থেকে অনেক কপি করে পুরো মুসলিম বিশ্বে পাঠানো হয়। তাই সত্যি বলতে এটি হযরত উসমান (রা)-এর সংকলন বলাটা একদিক থেকে ভুল। বরং এটি মহানবী ﷺ কর্তৃক সংকলিত। হযরত উসমান (রা) যা করেছেন তা হলো মহানবী ﷺ-এর তত্ত্বাবধানের বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত অংশগুলো পুড়িয়ে ফেলে কোরআনের বিশুদ্ধতার পরিপূর্ণ রূপ দেন ও ভবিষ্যতে ভুল হবার সব পথ রুদ্ধ করে দেন।

আমি আগেও বলেছি যখন কুরআনে নাযিল হতো উপস্থিত সব সাহাবী তা লিখে রাখতেন। কিন্তু মহানবী ﷺ -এর পক্ষে সম্ভব ছিল না সব পরখ করে দেখা। হযরত উসমান (রা) শুধু এই কপিগুলোই পুড়িয়ে ফেলেন। তাই যদি কেউ বলে অনেক সংকলন থেকে একটি রেখে বাকিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তবে তা ভুল। কেননা কোরআনের সংকলন একটিই ছিল আর তা সংকলিত হয়েছিল স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে। হযরত উসমান (রা) শুধু সেটিকেই অবশিষ্ট রেখে বাকিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন এবং সেটাকেই অনুসরণ করে, কপি করে তাঁর খেলাফতের সকল এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অতএব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নিকট মহানবী ﷺ কর্তৃক সংকলিত কুরআনেই রয়েছে, অন্য কারো নয়। এরপর শুধু মারওয়ান ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় অনারব মুসলিমদের পড়ার সুবিধার জন্য হরকত, তানভীন অর্থাৎ আমরা যাকে যের, যবর বলি এগুলো সংযোজন করা হয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন আসে নি। কেননা যখন কোনো আরবীয় ব্যক্তি হরকত ছাড়া ও হকরতসহ কুরআনে তিলাওয়াত করে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই এটি বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ ও মহানবী ﷺ নির্দেশিত সংকলিত কুরআনে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

২১. একটি অমূলক অভিযোগ এবং তা খণ্ডন

প্রশ্ন ৬. যদি কোনো অমুসলিম বলে যে, কুরআনে শয়তান রচিত বা শয়তান এটির বাহক যা সে বহন করার সময় ইচ্ছে মাফিক পরিবর্তন করেছে তখন আমরা কী বলে এ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারি?

উত্তর : বোন আপনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ যা কিনা অমুসলিমদের মাধ্যমে অনেক সময় উত্থাপিত হয়ে থাকে অবতারণা করেছেন। আমার মনে হয় একবার প্রত্যুত্তরে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যদি কুরআনে শয়তান রচিত হতো তবে কেন তিনি সূরা নাহ্ল-এর আয়াত নং-৯৮-এ উল্লেখ করলেন,

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থ : বল, আমি বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান হতে মুক্তি চাই।

শয়তান কেন তাকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত বলবে? কেন সে তার বাণীর মাধ্যমে সকলকে তার থেকে দূরে থাকার, মুক্ত থাকার দোআ শেখাবে? অতএব এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এটা কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না। বস্তুত পুরো কুরআনে জুড়েই মানুষকে সেসব পথের দিকে যাবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা থেকে শয়তান মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। বিপরীত ক্রমে শয়তান মানুষকে যা করাতে চায় কোরআনের অবস্থান তার থেকে সবসময় বিপরীতমুখী। আর শয়তানের সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহ্। অথচ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে আল্লাহর গুণগান ও গুণবাচক নাম রয়েছে। উপরন্তু সূরা আরাফের ২০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ

অর্থ : যখনই শয়তান তোমাদের কুমন্ত্রণা দেয় তখনই আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইবে।

লক্ষ্য করুন, এখানে শয়তানকে প্ররোচনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান কেন নিজেকে প্ররোচনা দানকারী বলবে ও তাঁর খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য তার সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলবে। নিজের রচিত গ্রন্থে কে এমন বলে? আবার যারা বলে, কুরআনে শয়তান বহন করার সময় ইচ্ছে করে পরিবর্তন করেছে তাদের জন্য সূরা ওয়াকিয়াহ-এর (৭৭-৭৯) নং আয়াতগুলোই যথেষ্ট। এ আয়াতগুলো আগেও বলেছি,

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ـ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ـ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ـ

অর্থ : নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআনে, যা সংরক্ষিত পবিত্র লাওহে মাহফুজে, যেখানে অপবিত্র অবস্থায় কেউ ছুঁতেও পারে না।

এ আয়াতগুলো অবশ্য কাফেরদের এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল যা অনেকেই কুরআনে স্পর্শ করার শর্ত হিসেবে অজু করার নির্দেশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে লাওহে মাহফুজ এমন সংরক্ষিত স্থান যেখানে কোনো অপবিত্র কিছুই প্রবেশ করতে পারবে না। শয়তান অপবিত্র ফলে তার সেখানে প্রবেশ অসম্ভব। তাই কোরআনের পরিবর্তন শয়তানের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। কুরআনে নাযিলে শয়তানের যে কোনো ধরনের সংশ্রব নেই তা সূরা শূয়ারা-এর আয়াত (২১০-২১২) নং আয়াত পড়লেও বুঝা যায়। সেখানে বলা হচ্ছে,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ . وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ .

অর্থ : এই কুরআনে শয়তান অবতীর্ণ করে নি। তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং ক্ষমতাও রাখে না। তাদেরকে শ্রবণের জায়গা হতেও অনেক দূরে রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আলহাজ আমির, প্রশ্ন হচ্ছে এটি কি ঠিক যে, কেউ মারা গেলে কুরআনেখানী করতে হবে বা এতে কি কোনো লাভ আছে?

উত্তর : প্রশ্নটা করা হয়েছে যে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে কারো মৃত্যুতে দল বেঁধে কুরআনেখানী করা কতটুকু ঠিক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কুরআনে কি এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, মানুষ সেটি দল বেঁধে খতম করবে? কুরআনে কি এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, কেউ মারা গেলে পড়লেই চলবে? নাকি কুরআনে এজন্য অবতীর্ণ যে মানুষ সেটি বুঝে পড়বে। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে। কোনো সহীহ্ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, কোনো সাহাবীর মৃত্যুতে বা তাঁর জানাযায় মহানবী ﷺ এভাবে দল বেঁধে সবাইকে নিয়ে কুরআনে খতম করেছেন। যদিও তাঁরা আরবি ভাষী এবং তিলাওয়াতই তাঁদের বুঝার জন্য যথেষ্ট। তাই আমার কথা হচ্ছে, ঠিক আছে যদি কুরআনে খতমের একান্তই ইচ্ছে থাকে তবে ৩০ জন লোক না নিয়োগ করে ৬০ জনকে বললেই হয় যেন তাঁরা শুধু না পড়ে প্রত্যেকে আধা পারা অর্থসহ বুঝে পড়ুক। অথবা ধীরে সুস্থে এক ঘণ্টার পরিবর্তে দু ঘণ্টা ধরে অর্থসহ বুঝে শুনে তিলাওয়াত করুন। তাতেই কি কুরআনে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য বেশি করে সফল হয় না? আমার মনে হয় আপনারা আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।

২২. কোরআনের রহিত আয়াত প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ৮. আলোচনার এ পর্যায়ে আমার মনে একটি প্রশ্ন এসেছে। সেটি যে সমস্ত মুসলমান কোরআনের 'সংক্ষেপক' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে। আমরা জানি পবিত্র কোরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলোর পরিবর্তে অন্য আয়াত নাযিল হওয়ায় রহিত হয়ে গেছে। তারা বলে যে, আল্লাহ প্রথমে সে আয়াতগুলো ভুলবশত নাযিল করেছিলেন পরে অন্য আয়াত নাযিল করে তা সংশোধন করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই আল্লাহ ভুল করে পরে শুদ্ধ করেছেন কিনা?

উত্তর : পবিত্র কোরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলো অন্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। বোনের প্রশ্ন এটি আল্লাহ ভুল করে করেছেন কিনা? আল্লাহ্ সূরা বাকারাহ্-এর আয়াত নং ১০৬-এ উল্লেখ করেছেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ـ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ : আমি কোনো আয়াত রহিত করলে তদপেক্ষা উত্তম বার্তার বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর শক্তিমান?

একইভাবে সূরা নাহ্লের ১০১ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ لا

অর্থ : যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় অন্য একটি আয়াত প্রতিস্থাপন করি অর্থাৎ আল্লাহ্ কখনো আয়াত রহিত করে না। তবে প্রতিস্থাপন করেন এর থেকে উত্তম বা সমমান আয়াত দিয়ে।

এ আয়াতে আরবি শব্দ যার অর্থ 'প্রতিস্থাপন' বা 'কোরআনের বাক্য'। যদি আমরা 'প্রতিস্থাপন' অর্থ গ্রহণ করি, তবে বলতে পারি পূর্ববর্তী যেসব আসমানি গ্রন্থ যেমন তৌরাত, যবুর, ইনজিল ইত্যাদিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কোরআনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ঐ গ্রন্থগুলোর পরিবর্তে এখন কুরআনে অনুশীলন করতে হবে, এটিও এগুলোর চেয়ে উত্তম। আবার আয়াতের অর্থ যদি 'পবিত্র' কোরআনের বাক্য গ্রহণ করা হয় তখন উপরোল্লিখিত আয়াত দুটোর ভাবার্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ কোরআনের কিছু বাক্য রহিত করে তার সমমান বা তার চেয়ে উত্তম বাক্য নাযিল করেন। এর অর্থ এ বুঝায় না যে, যে আয়াতগুলো পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর আর প্রয়োজন নেই বা সেগুলো পরস্পর বিরোধী– অনেক মুসলিমই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তারা মনে করেন কোরআনের কিছু বাক্য অন্য বাক্য দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

তারা মনে করেন, যেগুলো রহিত হয়ে গেছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ও তা মানা অনুচিত। তারা মতামত দেন যে, একই বিষয়ে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হলে কেবল শেষেরটি পালন করা উচিত, আগেরগুলো নয়। তারা অনুভব করেন সেগুলো সংঘটিত ও প্রথম আয়াতগুলো অপ্রয়োজনীয়। এ নিয়ে বেশ ভুল বোঝাবুঝি আছে। আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে, পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াত অধিক তথ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আগে নাযিলকৃত আয়াতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক। বরং বলা যায়, অতিরিক্ত তথ্যপূর্ণ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আপনাদের হয়তো মনে আছে আমি উল্লেখ করেছি কোরআনের একটি চ্যালেঞ্জের কথা। আল্লাহ অমুসলিমদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৮৮-এ বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۔

অর্থ : বল, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।

এরপর সূরা তূর-এর ৩৪ নং আয়াতে চ্যালেঞ্জ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এটিও যখন অমুসলিমরা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তখন সূরা হুদ-এর ১৩নং আয়াতে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ অধিকতর সহজ করে দশটি সূরা রচনার সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দেন। যখন এটি মোকাবেলা করতেও সমস্ত কাফির সম্প্রদায় পুরোপুরি অকৃতকার্য হয় তখন আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ আরো সহজ করেন। তিনি এবার সূরা ইউনুস-এর ৩৮নং আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ অধিকতর সহজ করে দেন। এবার তিনি দশটি নয় বরং একটি সূরা রচনা করার সামর্থ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কাফেরদের প্রতি। দেখা যায় সত্যি সত্যি তারা এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতেও সম্পূর্ণরূপে অপারগ ও অকৃতকার্য হয়। তখন মহান আল্লাহ সূরা বাকারাহ্-এর (২৩-২৪) নং আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জকে সবচেয়ে সহজ করে দেন। এবার তিনি কোরআনের ছোট একটি সূরা বা আয়াত রচনার ক্ষমতা নিয়েও অমুসলিমদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা তুলে ধরেন এবং এটি যে মানব রচিত নয় তা আবারো নিশ্চিত করেন।

এ নিশ্চয়তাকে ভুল প্রমাণিত করতে তিনি চ্যালেঞ্জকে পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে সহজতর করে মূলত তার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ ও মানুষের অক্ষমতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে কুরআনে যে সম্পূর্ণ রূপেই ঐশীগ্রন্থ সেটি শক্তভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যদি কেউ বলে সূরা ইসরা আয়াত নং-৮৮ কোরআনের মত দেয়া হয়েছিল তার কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু সূরা

বাকারাহ্-এর সর্বশেষে মাত্র একটি সূরা বা আয়াত রচনায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। এ ছোট চ্যালেঞ্জই যদি যথেষ্ট তবে এতো বড় চ্যালেঞ্জ দেয়ার প্রয়োজন কী? অতএব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত পূর্বের সব আয়াত অপ্রয়োজনীয় এবং এটির সাথে সাংঘর্ষিক।

যারা এ ভাবনাটি ভেবে থাকেন তারা আসলে কোরআনের নয়। যদি আমি কাউকে প্রথমে বলি যে এস.এস.সি. পাস করতে পারবে না। তারপরে যদি তার বোকামি ধরা পড়ে, আবার বলি সে অষ্টম শ্রেণীও পাস করতে পারবে না। তার অর্থ এই নয় যে, প্রথম চ্যালেঞ্জটি অপ্রয়োজনীয় ও দ্বিতীয়টির সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা ২য় চ্যালেঞ্জ অষ্টম শ্রেণী পাস না করার চ্যালেঞ্জ দ্বারা এটি বুঝায় না যে, সে দশম শ্রেণী পাস করতে পারবে। বরং পূর্বেরটিকে আরো শক্তভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাই আগের চ্যালেঞ্জটি অপ্রয়োজনীয় বা সাংঘর্ষিক কোনোটিই নয়।

উপরন্তু এভাবে পর্যায়ক্রমে যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া যায় যে, পঞ্চম শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী এবং সর্বশেষ নার্সারিও পাস করতে পারবে না, তবে আগের কোনোটিই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না বা ভুলবশত প্রমাণিত হয় না। বরং প্রথমেই নার্সারি পাসের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে লোকটার অক্ষমতা যতটা প্রমাণিত হয়। এভাবে ধাপে ধাপে করার বক্তব্য তার চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত ভিত্তির ওপর স্থান পায়। আল্লাহ সেটিই করেছেন এভাবে বার বার চ্যালেঞ্জকে সহজতর করে। তাই যারা পূর্বের চ্যালেঞ্জগুলো নিষ্প্রয়োজন মনে করেন তারা বুঝতে ভুল করেন। সমস্যা তাদের বোধগম্যতার। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়, আল্লাহ তাআলা মাদকদ্রব্য গ্রহণ সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আদেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা বাকারাহ-এর ২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز

অর্থ : তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে। আপনি বলে দিন এতে কিছু উপকার আছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

এরপর সূরা নিসা-এর ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -

অর্থ : হে মুমিনগণ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছে যেয়ো না।

এভাবে আল্লাহ প্রথমে মদ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে পরে সীমিত আকারে সেটি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রথমে মদ সম্পর্কে যে সামান্য উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, তা বাতিল হয়ে গেছে। না সেটাও সত্য, কিন্তু সালাতে সেটা অগ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দেয়া হয়। আসলে সে সময় আরব

সমাজে মাদক ও জুয়া এতো ব্যাপক ছিল যে, হঠাৎ সেটা বন্ধ করা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারতো। এজন্যই ধাপে ধাপে করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটি অন্যটির সাথে সাংঘার্ষিক তা নয়। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে মাদকদ্রব্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু লক্ষ করুন, কোনোটার সাথেই কোনোটি সাংঘর্ষিক হয়নি।

যদি আল্লাহ বলতেন, সালাতের সময় মাদকগ্রহণ করা যাবে না কিন্তু অন্য সময় গ্রহণ করা যাবে তাহলে সাংঘর্ষিক হতো। কিন্তু আল্লাহ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত নিষিদ্ধ করেছেন জেনে পেছনের কারণ তিনি জানতেন। তিনি আসলে শেষ পর্যন্ত কোনো আদেশ দেবেন। এজন্যই কোরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকে না। ধরুন, আমি কোনো বন্ধুকে বললাম, নিউ ইয়র্ককে যেও না। তারপর আবার বললাম ইউ.এস.এ যেও না। এরপর সর্বশেষ বললাম, আমেরিকা মহাদেশে যেও না, তবে আমার কোনো কথাই সাংঘর্ষিক নয়, কেননা আমি যখন আমেরিকা মহাদেশে যেতে বারণ করি তার মধ্যে ইউ.এস. এ. এবং নিউ ইয়র্ক দুটোই বিদ্যমান। তাই আগের দুটো আদেশও বলবৎ থাকে। কোনোটাই বাতিল হয় না। এভাবেই দেখা যায় কোরআনের আয়াতগুলোও সাংঘর্ষিক হয় না। আল্লাহ্ সূরা নিসা-এর ৮২নং আয়াতে বলেন,

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا۔

অর্থ: তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এর মধ্যে বহু বর্ণনাগত অসংগতি খুঁজে পেতো।

কোরআনে এমন সাংঘর্ষিক তথ্য নেই বরং অতিরিক্ত তথ্য সমৃদ্ধ আয়াত থাকতে পারে। আশা করি সবাই বুঝেছেন।

২৩. ইসলামী ঐক্য ও কুরআনে

প্রশ্ন ৯. জাকির ভাই, বলবেন কি একই কুরআনে হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে এমন বিভেদ কেন?

উত্তর : আমার এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, আমরা সব মুসলিম এক কুরআনে অনুসরণ করলেও কেন এতো ইখতেলাফ আমাদের মধ্যে। আল হামদুলিল্লাহ আমাদের সব সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান কোরআনেই আছে। তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো এটাই কথা ছিল। মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরান-এর ১০৩ নং আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ـ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরো।

এখানে 'রজ্জু' বলতে কুরআনেকে বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআনে সবাই সম্মিলিতভাবে পালন করবে– এটাই হলো আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা আনআম-এর ১৯ নং আয়াতে আরো নির্দেশ দেন,

অর্থ : বল সাক্ষ্য হিসেবে কোন জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ? তুমি বল, তোমার ও আমার মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু আমরা কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি 'তুমি কে', সে বলে, 'আমি শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন নিজেকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে। আপনি যদি হানাফী বা হাম্বলী হন, আপনার মনে প্রশ্ন জাগে না মহানবী ﷺ ও সাহাবীগণ (রা) কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী না কি হাম্বলী? তিনি যদি কোনোটাই না হোন, তবে আপনি কেন? অথচ আল্লাহ বলেন, 'আমরা সবাই মুসলিম।' আল্লাহ সূরা আলে ইমরান-এর ৬৭নং আয়াতে বলেন,

مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ

অর্থ : ইবরাহীম (আ) না ছিলেন ইহুদি, না ছিলেন খ্রিস্টান, বরং তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ মুসলিম।

এভাবে মহান আল্লাহ আমাদের সকলের পরিচয় দিয়েছেন 'মুসলিম' হিসেবে। অথচ আমরা নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, শিয়া, সুন্নী কত রকম পরিচয় তৈরি করে ফেলেছি।

না, আমি কোনো মুসলিম দার্শনিক বা চিন্তাবিদকে ছোট করছি না। আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেকী, ইমাম হাম্বলী, সকলের ওপর আল্লাহ্র শান্তি বর্ষিত হোক। তাঁরা সকলেই ইসলামের বড় বড় দার্শনিক ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের এই ইল্‌ম ত্যাগ সবকিছুর জন্যই ইনশাল্লাহ আল্লাহ্ অনেক মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান দেবেন। তাই বলে আমরা কেন আমাদের মুসলিম হিসেবে না রেখে তাদের নামে রাখবো? আমরা কেন বলবো, 'আমি হানাফী, আমি হাম্বলী ইত্যাদি ইত্যাদি?' অথচ আল্লাহ সূরা আলে ইমরান-এর আয়াত নং ৬৪-এ বলেছেন,

'বলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি মুসলিম।'

মহানবী ﷺ বলেছেন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৪৫৭৯)

'আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।'

এই যে কথা, এখানে মহানবী ﷺ বলেন নি 'তোমরা ৭০ ভাগে বিভক্ত হও।' বরং বলেছেন যে, বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআনে সম্মিলিতভাবে একসাথে আঁকড়ে ধরতে।

আসল কথা হচ্ছে, আপনি যে কোনো মুসলিম দার্শনিকের কোনো মতামত ততটুকুই গ্রহণ করতে পারবেন যতোটুকু কুরআনে অনুযায়ী হয়। কোরআনের সাথে সামঞ্জস্য নেই এমন মত, পথ বা দর্শন কখনোই গ্রহণ করা যাবে না, তা যত বড় দার্শনিক চাই কি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিকই দিন না কেন। এজন্যই সবচেয়ে বেশি দরকার কুরআনে বুঝে পড়া। মহানবী ﷺ-এর বাণী যা তিরমিজি শরীফে ১৭১ নং হাদীসে এসেছে সেখানে মহানবী ﷺ বলেছেন,

অর্থ 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে যার মধ্যে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে।'

সাহাবী (রা) প্রশ্ন করলেন, "কোন্ দল জান্নাতে যাবে?"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ বললেন, 'যারা আমাকে, আমার সাহাবী ও কুরআনেকে মেনে চলবে।'

এজন্যই কুরআনে বুঝে পড়া দরকার। আমরা আবার কোরআনের আমল করবো এবং জান্নাতের পথ পাব। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন।

২৪. কুরআনে আরবিতে নাযিলের হেতু

প্রশ্ন ১০. এরপরের প্রশ্নগুলো চিরকুট-এর মাধ্যমে সংগৃহীত। এ প্রশ্নটি হলো প্রথমত পবিত্র কুরআনে কেন আরবিতে নাযিল হলো এবং দ্বিতীয়ত, আপনার ভাষ্য অনুযায়ী যেহেতু সব মুসলমানের শৈশব থেকেই আরবি শেখা উচিত, এ ব্যাপারে আই.আর.এফ. কী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, বিশেষত, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে?

উত্তর : হ্যা, প্রশ্ন হচ্ছে কুরআনে সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াত গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন আরবিতে নাযিল হলো। উত্তরে অনেক কারণ বলা যায়। প্রথমত, কুরআনে যে জাতির ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তারা ছিল আরবি ভাষী। আল্লাহ্ তাআলা সকল ঐশী গ্রন্থই যে সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল করেছেন সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যেমন তৌরাত, যবুর যথাক্রমে হিব্রু ও ইউনানি ভাষায়। যে সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ সেই সম্প্রদায়ই যদি না বুঝতে পারে তবে তারা গ্রহণ করবে কীভাবে?

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কুরআনে অবতীর্ণ যে নবীর ওপর সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ভাষাও আরবি। যদি কুরআনে আরবি ভাষায় নাযিল না হয়ে অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো যা মহানবীর মাতৃভাষা নয় তাহলে সে ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা আপত্তি তুলতো, আমাদের মাতৃভাষা আমাদের শেখাতে এসো না। এ আপত্তির উত্তর দেয়া বড় কঠিন হতো। এছাড়াও আরবি ভাষা একটি উন্নত ও জীবন্ত ভাষা। কুরআনে যখন নাযিল হয় তখন পৃথিবীতে যেসব উন্নত ভাষা ছিল তা

মৃতভাষা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরের ভাষা। গুটি কতক গবেষকমাত্র সেসব ভাষা জানেন। অথচ আরবিতে এখনো কয়েক কোটি লোক কথা বলেন। এই যে, এতো বিশাল পরিমাণ লোক আরবিতে কথা বলেন, তারা আরবি বুঝেন। ফলে কুরআনেও বুঝেন। আরবি ভাষার আরেকটি সুবিধা হলো এটি উন্নত ও সমৃদ্ধভাষা। এর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ব্যাপক। এমন অনেক শব্দ আছে যার অর্থ ১২–১৩টি পর্যন্ত আবার একই শব্দের খাস সমার্থক পাওয়া যায়। ফলে ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি মিল রেখে এ ভাষায় কোনো কিছু রচনা বেশি সার্থক হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, প্রথম নাযিলকৃত দুটি আয়াতের কথা, যা সূরা আলাক-এর ১ ও ২নং আয়াত,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ ـ

প্রথম শব্দ 'ইক্বরা' এর অর্থ পড়া, আবৃতি করা ও ঘোষণা করা। এরপর 'রব' শব্দের দ্বারা বুঝায় প্রভু, শাসনকর্তা ও সরবরাহকারী। তারপর আসুন 'খালাক' শব্দটির ব্যাপারে। এটির দ্বারা শুধু সৃষ্টি করাই বুঝায় না। পরিকল্পনা করা, নমনীয় করা ইত্যাদিও বুঝায়। এরপর আসুন সর্বশেষ শব্দ 'আলাক' এর সম্পর্কে– এ শব্দটির অর্থ জমাট রক্ত, আঠালো বস্তু প্রভৃতি বুঝায়।

এখন আমরা যদি ঠিকভাবে অনুবাদ করি তাহলে অর্থ দাঁড়ায় : 'পড়, আবৃতি করো, ঘোষণা করো তোমার প্রভু মহান দাতার নামে। যিনি তৈরি করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং নমনীয় করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত, আঠালো পিণ্ড হতে।'

তাই দেখা যায়, 'আরবি' ভাষায় যে ব্যাপ্তি নিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায় অন্য ভাষায় তা কল্পনাতীত। এজন্যই আমি আগেই বলেছি কুরআনে তিলাওয়াতের বিভিন্ন পন্থা আছে। যথা : সাধারণ অর্থ বুঝে পড়া ও গভীর অর্থ বুঝে পড়া। সাধারণ অর্থসহ কুরআনে তিলাওয়াত দ্রুতই শেষ করা যায়। কিন্তু গভীর অর্থ বুঝে কুরআনে তিলাওয়াত করে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়।

আরবি ভাষায় কুরআনে নাযিল হওয়ায় আরো সুবিধা হলো, এতে জায়গা কম লাগে। যেমন ধরুন 'মুহাম্মদ' শব্দটি। 'মিম', 'হা', 'মিম', 'দাল' মাত্র চারটি বর্ণ। অথচ ইংরেজিতে এম, ইউ, এইচ, এ. এম. এ, ডি অথবা এম, ও, এইচ, এ, এম. এ. এ ডি অর্থাৎ ৮টি বর্ণ দরকার। ফলে অন্য ভাষায় লিখতে স্থান, সময়, শক্তিকাল সবকিছুই বেশি লাগে। দেখা গেছে আরবি ভাষায় কোনো কিছু লিখলে যে পরিমাণ সময়, শ্রম, স্থান ও শক্তিকাল দরকার অন্য ভাষায় ঐ একই বিষয় লিখতে তার চেয়ে ৩ গুণ বেশি শ্রম, সময়, স্থান ও কালি প্রয়োজন হয়। এ সব প্রয়োজন ও সুবিধার কথা মাথায় রাখলে পবিত্র কুরআনে আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ার যুক্তি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, যদি কেউ

ফরাসি ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয় কিছু আবিষ্কার লিখে থাকেন, সেটা আমেরিকা বা অন্য দেশে ব্যবহার করা যাবে না। বরং ফ্রেঞ্চ ভাষা, লিখে সেটি অনুবাদ করে সবদেশেই সব ভাষার লোকই ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ১১. অনেকেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' না লিখে '৭৮৬' লিখে থাকে। এটা কি ঠিক?

উত্তর : প্রশ্নটি হচ্ছে অনেক মুসলিম 'বিসমিল্লাহ্'--- পুরোপুরি না লিখে ৭৮৬ লিখে থাকে। এটা ঠিক কিনা। কিছু লোক আছে যারা আরবি বর্ণমালাগুলোকে নির্দিষ্ট মান দিয়ে সেগুলোর যোগফল বের করে ঐ সংখ্যা দিয়ে আয়াত বা দোআ বা কোনো নাম নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর 'বা' 'আলিফ', 'সিন' এ বর্ণমালাগুলোর মান বসিয়ে তারা বের করেছেন ৭৮৬ আবার ৯২ দ্বারা বুঝান মুহাম্মদ ﷺ এভাবে আরো অনেক কিছু। কিন্তু এমন ব্যবহার কুরআনে বা হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। কিছু লোক তর্ক করে যে, আমরা যখন আরবি বর্ণমালা না পাই, তখন দাওয়াতপত্র ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি ছাপতে সংখ্যাগুলো লিখি। কিন্তু আমার কথা হলো, যদি আরবি ফন্ট বা লিপি না থাকে, তুমি ইংরেজিতেই বানান করে লেখ। আর যদি মনে করো তা বুঝবে না, তবে অনুবাদই লিখতে পারো যে, 'পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে।' এ সহজ উপায় থাকতে এমন কঠিন ও বিদঘুটে বিষয়ের প্রয়োজন কি?

আসলে বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন ধারণা বিভিন্ন সমাজে দেখা যায়। যেমন পশ্চিমা সমাজে ১৩ সংখ্যাটিকে অপয়া ভাবা হয়। তারা বলে 'আনলাকি থার্টিন।' আবার তারা ৬৬৬ দ্বারা বুঝায় শয়তান। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে চোর, বাটপার, ফটকাবাজদের ৪২০ বলা হয়। এর অবশ্য কারণ আছে, ভারতীয় উপমহাদেশের সবদেশেই যদি কোনো চোর বাটপার বা ফেরেববাজ ধরা পড়ে, তবে তাকে যে ধারায় শাস্তি দেয়া হয় সেটি পেনাল কোডের ৪২০ নং ধারায় বর্ণিত। তাই যদিও কারণ আছে, এটি বলা অনেকে না জেনেই এটি বলে থাকে। যেমন দেখা যায় ভারত থেকে কেউ যুক্তরাজ্যে অধিবাসী হলে তাকে ৪২০ বলা হয়। অবশ্য যারা বলেন যে, বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানগত মান যোগ করে ঐ শব্দের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা বের করেছেন, আমি তাদের সমর্থন করি না।

কারণ, একই মান দিতে পারে এমন সংখ্যা এমন দুটি শব্দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যার একটি ভালো অন্যটি খারাপ। সে ক্ষেত্রে আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন? উদাহরণ দিই, যদি বলি, ইংরেজি বর্ণের B-এর মান ১ এবং A -এর মান ৭ আর

ধরুন D-এর মান চার। এখন যোগ করলে আমরা পাই ১২। অর্থাৎ BAD (খারাপ) এর সংখ্যাগত মান পেলাম ১২। এখন G এর মান ২, O এর মান ৩ এবং D এর মান ৪ ধরলে Good-এর মান কত পাই? দেখুন ২ + ৩ + ৩ + ৪ = ১২ অর্থাৎ ভালো। তাহলে ১২-কে এখন ভালো বা মন্দ কোনটা নির্দেশক বলবো ? যদি প্রথমটি মেনে বলি ১২ একটি মন্দ নির্দেশক তখন পরে আবার দেখলাম সংখ্যাটি যে মান ধরে নেয়া হয়েছে তা ভালোকেও নির্দেশ করে। তাই যারা 'বিসমিল্লাহ্'-এর বিভিন্ন বর্ণের মান বসিয়ে যোগফলকৃত সংখ্যা ৭৮৬ তাই এটি বিসমিল্লাহ্ প্রকাশক তাদেরকে বলি আরো এমন অনেক শব্দ ও বাক্য পাওয়া যাবে যাদের মান বসিয়ে যোগ করলে যোগফল ৭৮৬ পাওয়া যায়। সে শব্দ বা বাক্যগুলোর কিছু হবে ভালো নির্দেশক, কিছু হবে মন্দ নির্দেশক। তাই কোনো মুসলমানকেই সমর্থন করি না যখন সে বলে ৭৮৬ দিয়ে তিনি বিসমিল্লাহ্ প্রকাশ করতে চান। আশা করি সবাই বিষয়টি বুঝেছেন।

প্রশ্ন ১২. আমি হিন্দু ভাইয়ের সম্পূরক প্রশ্ন দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করবো। হিন্দু ভাইটি প্রশ্ন করেছেন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কাফেরদের মেরে ফেল ও নিষিদ্ধ করো" এর পটভূমি কি একটু ব্যাখ্যা করবেন? সূরা তাওবার "কিতাল আল কাফির"-এর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : হিন্দু ভাই প্রশ্ন করেছেন সূরা তাওবা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যে, তোমরা কাফেরদের কেটে বা মেরে ফেল। তাদের নিষিদ্ধ করো। সূরা তাওবার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ -

অর্থ : যেখানে তুমি কাফের ও মুশরিকদের পাবে, তাদেরকে সেখানেই মেরে ফেল।

এ আয়াতের উদ্ধৃতিটি ইসলামের বিভিন্ন সমালোচকগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকেন। তসলিমা নাসরিনের মতো লোকেরা বলে, 'ইসলাম একটি উগ্রধর্ম' যেহেতু এটি কাফেরদের মেরে ফেলার কথা বলে। তারা আবার 'কাফির' শব্দের পর বন্ধনীর মধ্যে 'হিন্দু' শব্দটি উল্লেখ করে বুঝাতে চায় যেখানে হিন্দু পাবে সেখানে মেরে ফেল। তারা আসলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা ও অপচেষ্টা চালায়। বিভ্রান্তি সৃষ্টিই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ধরুন আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ হচ্ছে। যখন যুদ্ধ চলছিল তখন আমেরিকার আর্মি জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন, যেখানে ভিয়েতনামীদের পাও মেরে ফেল। যেহেতু যুদ্ধাবস্থা, তাই এ নির্দেশ তিনি দিতেই পারেন। কিন্তু আজকে ঐ যুদ্ধের এতোগুলো বছর পরে যদি

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা আর্মি জেনারেল বলেন, যেখানে ভিয়েতনামী পাও মেরে ফেল, তবে তা হবে নরঘাতকতার শামিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি তা বলবেন না।

প্রথম আদেশটির পূর্বসূত্র ছিল। এজন্যই আয়াতটির পূর্বসূত্র জানা জরুরি। পূর্বসূত্র জানতে আগের আয়াতগুলোও পড়তে হবে। যখন আয়াতগুলো নাযিল হয় তখন মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে একটি শান্তিচুক্তি হয়েছিল যা কাফিররা একতরফাভাবে ভঙ্গ করে। তখন তাদেরকে চার মাসের সময় দেয়া হয়। তাও যখন তারা মুসলমানদের ঘর থেকে বের করে দিতে থাকে এবং হত্যা করতে থাকে তখন এ আয়াত নাযিল করে যুদ্ধে নামার কথা বলা হয়। তাই আয়াতটি যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য যখন মুসলমানদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং হত্যা করা হয় সেই অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু যারা বিভ্রান্তি ছড়ায় তারা শুধু এ আয়াত অর্থাৎ ৫ নং আয়াত বলে ৭নং আয়াতে লাফ দেয়। তারা ৬ নং আয়াত পড়ে না। কেন পড়ে না? তাহলে বিভ্রান্তি ছড়ানো অসম্ভব হতো তাই। কেননা ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি কাফের এবং মুশরিকদের যে কেউ আশ্রয় চান তবে আশ্রয় দাও।' কুরআনে এখানেই ক্ষান্ত হয় নি। আরো অগ্রসর হয়ে বলেছে, "নিরাপত্তার সাথে তাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। যাতে তারা আল্লাহর বাণী শুনতে পারে।" কুরআনে বলেনি যারা আশ্রয় চাইবে তাদের শুধু মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তাদের মতো করে ছেড়ে দাও। বরং আদেশ দিয়েছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করার।

আমাকে বলুন, আজকের দিনের কোন আর্মি জেনারেল তার সৈন্যদের বলবে যে, তোমাদের শত্রুরা আশ্রয় চাইলে নিরাপত্তা দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোনো আর্মি জেনারেলই বলবে না। অথচ কুরআনে নির্দেশ দিয়েছে কাফের বা মুশরিকরা যদি আশ্রয় চায় তবে তাদের নিরাপত্তাই শুধু দিবে না বরং নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিল তখন নির্দেশ করা হয়েছে তোমরা ভয় পেও না। যারা তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তাদের খুঁজে বের করো ও হত্যা করো। আবার এটাও নির্দেশ দিয়েছে যে আশ্রয় চাইলে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। তাই ইসলাম মুসলিমদের যে পরিমাণ হৃদ্যতার প্রতি উৎসাহ দেয় যে, কোনো সংস্থা UN হোক বা মানবাধিকার সংস্থাই হোক যাদের কথা সব সময় বলা হয় তারা যেসব অধিকারের কথা বলে তা কুরআনেপাকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলে এসেছে।

আজ 'হিউমান রাইট',' উইমেন রাইটস' সম্পর্কিত সব সংস্থা বলে 'শান্তি চাই', 'শান্তির সাথে বাঁচতে চাই'। এ শান্তির কথা বহু আগেই কোরআনে এসেছে। যদিও এ শান্তির কথা কুরআনে থেকে নেয়া এবং এটা মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ, তাই তারা এটার কোনো উদ্ধৃতি দেয় না। আজকে হিউম্যান রাইটসের প্রবক্তারা যে কথা বলছে যে মানুষের লিঙ্গ, গোত্র, বর্ণ, ইত্যাদির পার্থক্য করা উচিত নয়। সবাই

সমান মর্যাদা প্রাপ্য সেটা কুরআনেই সর্বাগ্রে বলেছে। তাই এটি আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়। বরং পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় এটি অনুবাদ করে বিনা মূল্যে বিতরণ করা উচিত।

আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, আজকের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে শেষ করতে পেরেছি। আই.আর.এফ-এর পক্ষ থেকে অতিথি ও শ্রোতা ভাই-বোনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধৈর্যের সাথে শোনার জন্য। আমরা মিডিয়া ধারণের কলাকুশলীদেরও ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক, আয়োজক সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি জাকির নায়েকের পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২৫. আল কোরআনের মৌলিক তথ্য

কুরআনের কয়েকটি নাম

আল-কুরআনের সেফাতী বা গুণগত নাম প্রায় ৫৬ প্রকার। যেমন : আল-কুরআনে, আল-হুদা, আন-নুর, আয-যিকর, কিতাবুল-মুমিন, আল-কালাম, কিতাবুল মাসানী, আল-হিকমত, কিতাবুল হাকীম, সিরাতুম-মুস্তাকিম, আল-ফুরকান, কুরআনে মজীদ, কুরআনুল কারীম, কুরআনুল সেফা, কুরআনুদ্দোয়া, কুরআনুল হাকিম।

কুরআনে অধ্যয়নের সমস্যা ও সমাধানের উপায় কী?

সমস্যাসমূহ :

১. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের মতো মনে করা।

২. একই বিষয়ের বার বার উল্লেখ।

৩. কোনো বিষয়সূচি নেই।

৪. কুরআনে নাজিলের প্রেক্ষাপট না জানা।

৫. নাসেখ ও মানসুখ সমস্যা। এক আয়াতের পরিবর্তে যে আয়াত নাযিল হয় তাকে 'নাসেখ' বলে। যে আয়াত রহিত হয় তাকে 'মানসুখ' বলে।

সমাধানের উপায়

১. অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মগজ নিয়ে বসা।

২. কুরআনে নাযিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূলের ﷺ বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।

৩. ঘরে বসে কুরআনে বুঝার সাথে সাথে কুরআনে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হতে হবে।

আয়াত কত প্রকার?

হুকুমের দিক থেকে ৩ প্রকার যথা : ১. হালাল, ২. হারাম এবং ৩. আমছাল। শব্দের দিক থেকে ২ প্রকার যথা : ১. মুহকামাত (স্পষ্ট আয়াত) ২. মুতাশাবিহাত

(অস্পষ্ট আয়াত)। (মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। এর বহু বচন 'মুহকামাত'। মুহকামাত আয়াত বলতে বুঝায়, কোনো প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ আয়াতগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ইসলামের আহ্বান জানানো হয়েছে। 'মুতাসাবিহাত' অর্থ যেসব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহ-সংশয়ের ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেবার অবকাশ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, তাফহীমুল কুরআনে ব্যাখ্যা অংশ।)

সূরা কত প্রকার ও কী কী? বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করো।

সূরা দুই প্রকার। যথা : ক. মাক্কী ও খ. মাদানী।

ক. মাক্কী সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল ﷺ-এর মাক্কী জীবনে অথবা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে ঐ সব সূরাকে মাক্কী সূরা বলা হয়।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট, সহজে মুখস্থ করার যোগ্য ও ছন্দময়।
২. তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা।
৩. মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনে হেদায়াতপূর্ণ।
৪. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তা শক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
৫. রাসূল ﷺ-কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

খ. মাদানী সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূলের ﷺ হিজরতের পরে অথবা মদীনা যুগে অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাদানী সূরা বলা হয়।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. দীর্ঘ সূরা ও আয়াত।
২. সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকারী বিধান, বিয়ে-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।
৩. জয়-পরাজয়, শান্তি, ভীতি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্যের আলোচনা।
৪. দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।
৫. যুদ্ধ, সন্ধি, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা।

হুরুফে মুকাত্তাআত কী?

সূরা শুরুতে একক উচ্চারণের কিছু হরফকে বলা হয় 'হুরুফে মুকাত্তাআত'। যেমন : আলিফ, লাম, মীম। আলীফ, লাম, রা।

এক নজরে আল-কুরআনে

১. পারা ৩০, সূরা ১১৪, মাক্কী ৮৬/ ৮৯/ ৯২/ ৯৩, মাদানী ২৮/ ২৫/ ২২/ ২১, আয়াত ৬৬৬৬/ (৬২৩৬) রুকূ' ৫৫৪/ ৫৪০, সিজদা ১৪, অক্ষর ৩,৩৮,৬০৬/ ৩,৩৮,৬৭১, ওয়াকফ ৫,০৫৮টি।

২. সূরা তাওবায় বিসমিল্লাহ নেই। সূরা নমলে বিসমিল্লাহ ২ বার।

৩. ১১৪টি সূরার মধ্যে দুটি সূরার নামকরণের শব্দ নেই। যথা সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস।

৪. কুরআনে পাকের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণ সূরা হলো সূরা মুদ্দাসসির।

৫. কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো–সূরা নাসর।

৬. সর্বাপেক্ষা বড় সূরা হলো–সূরা আল-বাকারা।

৭. সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা হলো–সূরা আল-কাওসার।

৮. কুরআনের হরকত দেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (উমাইয়া খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় ৭০৮ খ্রি. বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরামদের দ্বারা কুরআনের জের, জবর, পেশ ইত্যাদি বসানো হয়)।

৯. কুরআনের প্রথম আংশিক বাংলা অনুবাদ করেন মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া।

১০. পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন গিরিশ চন্দ্র সেন।

১১. আল-কুরআনে মহানবী ﷺ -এর বাসনাক্রমে আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কুরায়েশী ভাষায় নাযিল হয়।

আয়াতের শ্রেণীবিভাগ

ওয়াদা ১,০০০ আয়াত, ভীতি প্রদর্শন ১,০০০ আয়াত। অবিশ্বাসী ফাসেক, মুনাফিক ও শয়তানের অনুসারীদের পরিণতি ও শাস্তির কথা ১,০০০ আয়াত। আদেশ ১,০০০ আয়াত। নিষেধ ১,০০০ আয়াত। হালাল বিষয়ক ২৫০ আয়াত, হারাম ২৫০ আয়াত। দৃষ্টান্তের ১,০০০ আয়াত। কেচ্ছা-কাহিনী ৫০০ আয়াত, আল্লাহ পাকের তাসবিহ সম্বন্ধে ১০০ আয়াত। নামায সম্বন্ধে ১৫০ আয়াত। নাসেখ মানসুখ বা হুকুম সংশোধন সম্পর্কিত বর্ণনা ৬৬টি আয়াত। এমনিভাবে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি বিষয়ে এ বিভক্ত করা যায়। নিচে কতিপয় বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াত তুলে ধরা হলো :

১. **রাষ্ট্রবিজ্ঞান** : সূরা নাস, সূরা মায়িদা ১৮, ১৯; সূরা আল-বাকারা ১৩০, ১৬৫; সূরা আরাফ ৫৪; সূরা ইউসুফ ৪০; সূরা ইউনুস ১৯; সূরা আলে ইমরান ৩২,৩৩; সূরা নূর ৫৪; সূরা মুহাম্মাদ ৩৩।

২. **অর্থনীতি :** সূরা বাকারা ২১৯, ১৭৭; সূরা নিসা ৫, ৭, ২৯, ৩২; সূরা আনফাল ৬৯; সূরা সাফ্ ১১; সূরা যারিয়াত ১৯।

৩. **সমর বিজ্ঞান :** সূরা আনফাল ১৫, ১৭, ৩৯, ৪১, ৬০, ৬১, ৬৫; সূরা তাওবা ৯০-৯২।

৪. **যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র :** সূরা রা'দ ৩; সূরা নূর ১৫; সূরা ত্বোহা ৫৩-৫৪; সূরা বনি ইসরাঈল ৮৪; সূরা রহমান ১-৪, ২৬-২৭; সূরা বাকারা ৩; সূরা হাশর ২২; সূরা ইব্রাহিম ৪৮; সূরা নুহ ১৭, ১৮; সূরা হা-মিম আস সাজদা ১০, ৩৯; সূরা আম্বিয়া ৩৪, ৩৫, ১০৪।

৫. **নীতি বিজ্ঞান :** সূরা মা' আরিজ ১৯; সূরা তাকাছুর ১; সূরা বনী ইসরাঈল ১৬, ২৩, ২৭; সূরা আরাফ ১০, ৩১; সূরা নাহল ৯, ৯০; সূরা নিসা ১০, ২৮, ২৯, ৫৮; সূরা আলাক ১; সূরা বালাদ ১৪-১৬; সূরা বাকারা ৪৩।

৬. **আইন বিজ্ঞান :** সূরা বাকারা ১৭৮,-১৮৩; সূরা ইয়াসীন ৪০; সূরা রা'দ ৩৭; সূরা মুমতাহীনা ১২।

৭. **মনোবিজ্ঞান :** সূরা ফাতির ৩৮; সূরা মা'আরিজ ১৯; সূরা ইউসুফ ৪৩, ৫৩; সূরা বাকারা ২৩৩; সূরা লোকমান ১৪; সূরা হা-মিম আস সাজদা৩৬।

৮. **সৌন্দর্য বিজ্ঞান :** সূরা তীন ৪; সূরা কাহাফ ৪৬; সূরা আরাফ ৩১, ৩২, ১৬০; সূরা ত্বোহা ৮১; সূরা মুল্ক ৫; সূরা নূর ৩৫।

৯. **ভাষা বিজ্ঞান :** সূরা বাকারা ৩১; সূরা আলাক ১-৫; সূরা আর রাহমান ৩, ৪; সূরা রূম ২২।

১০. **পরিবেশ বিজ্ঞান :** সূরা জাসিয়া ৪; সূরা ইসরাঈল ৫৩; সূরা আর রাহমান ৩, ৪; সূরা নিসা ৩৬; সূরা রূম ৪৬; সূরা ফুরকান ৪৫, ৪৬।

১১. **ইতিহাস বিজ্ঞান :** সূরা আরাফ ৮০-৮১; সূরা বুরুজ ২২; সূরা জ্বিন ২৮; সূরা ত্বীন ৮; সূরা ক্বা-ফ ১৭-১৮; সূরা গাসিয়া ২৬; সূরা যিলযাল ৭-৮; সূরা নিসা ৬।

১২. **ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান :** সূরা সাজদা ৫; সূরা আল-বাকারা ২৫৫; সূরা মুযাদিলা ৯; সূরা আনআম ৭৫; সূরা হা-মিম আস সাজদা ৯-১২; সূরা মুল্ক ৩।

১৩. **সমাজবিজ্ঞান :** সূরা ফুরকান ৫৪; সূরা আরাফ ৩৪; সূরা ইউসুফ ১৩-১৪; সূরা তাওবা ৬০; সূরা নাহল ৯০।

১৪. **পরিসংখ্যান বিজ্ঞান :** সূরা ফুরকান ২; সূরা ইনফিতার ১০-১২; সূরা মুদ্দাসির ৩০; সূরা মুমিনূন ১৭; সূরা হিজর ৪৪; সূরা তালাক ১২।

১৫. **ধর্ম বিজ্ঞান :** সূরা ইখলাস ১; সূরা আল-বাকারা ৪৩, ১৮৩, ১৯৬; সূরা আল মায়িদা ৬।

১৬. **খাদ্য বিজ্ঞান :** সূরা আরাফ ৩১; সূরা মায়িদা ৩, ৪; সূরা নাহল ১১ সূরা মরিয়ম ২৫; সূরা আল-বাকারা ৬১।

১৭. **জ্যোতির্বিজ্ঞান :** সূরা আরাফ ১৮৫; সূরা আলে ইমরান ১৯০; সূরা ক্বা-ফ ৬; সূরা নাবা ১২; সূরা রাদ ২; সূরা হামীম ১২; সূরা ইবরাহিম ৩৩।

১৮. **ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান :** সূরা হা-মীম ৯, সূরা নাযিয়াত ৩০,৩২ সূরা নাবা ৬, ৭; সূরা লুকমান ১০; সূরা ফাতির ২৭; সূরা নূহ ১৯; সূরা নাহল ১৫, সূরা যারিয়াত ৪৮।

১৯. **পুষ্টি বিজ্ঞান :** সূরা ইয়াসিন ৩৪-৩৫; সূরা নাহল ৬৯; সূরা ইয়াসিন ৭১, ৭৩।

২০. **আবহাওয়া বিজ্ঞান :** সূরা-বাকারা ১৪৬; সূরা জাসিয়া ৫।

২১. **নৃ-বিজ্ঞান :** সূরা আনআম ২, ৬; সূরা রহমান ৪; সূরা ইউনুস ১৯; সূরা হুজুরাত? সূরা মুমিনুন ৪২; সূরা নজম ৫৩; সূরা রূম ২২; সূরা ফাতির ২৮; সূরা হাদিদ ২৫।

২২. **পানি বিজ্ঞান :** সূরা নূর ৪৩; সূরা মুলক ৩০; সূরা যুমার ২১; সূরা মুমিনূন ১৮; সূরা ওয়াকিয়া ৬৮-৭০।

২৩. **স্থাপত্য বিজ্ঞান :** সূরা লুকমান ১০; সূরা মুল্ক ৩; সূরা ক্বা-ফ ৬; সূরা মুমিনূন ১৭; সূরা সাফ্ফাত ৩৬।

২৪. **সামুদ্রিক বিজ্ঞান :** সূরা নাহল ১৪; সূরা ফুরকান ৫৩।

২৫. **মৃত্তিকা** বিজ্ঞান : সূরা ফাতির ২৭।

২৬. **চিকিৎসা বিজ্ঞান :** সূরা নাহল ৬৯; সূরা আল-বাকারা ২৩৩; সূরা দাহর ৫, ১৭; সূরা ত্বীন ১।

২৭. **স্বাস্থ্য বিজ্ঞান :** সূরা রাদ ২৭; সূরা মুদ্দাচ্ছির ৩-৫।

২৮. **প্রজনন বিজ্ঞান :** সূরা ইয়াসিন ৩৬; সূরা নাহল ৪; সূরা দাহর ২; সূরা নজম ৪৫-৪৬; সূরা নুহু ১৪; সূরা লুকমান ১০; সূরা ত্বোহা ৫৩।

২৯. **ভ্রূণ বিজ্ঞান :** সূরা নাহল ৪; সূরা দাহর ২; সূরা সাজদা ৮, ৯; সূরা মুমিনূন ১১, ১৩।

৩০. **উদ্ভিদবিজ্ঞান :** সূরা নাযিয়াত ৩১; সূরা ত্বোহা ৫৩; সূরা রা'দ ৪; সূরা নুহু ১৭-১৮।

৩১. **গ্রহ গতিবিজ্ঞান :** সূরা ইউসুফ ৪; সূরা আম্বিয়া ৩৩; সূরা ইয়াসিন ৪০; সূরা আরাফ ৫৪; সূরা ফুরকান ৬১; সূরা তাকভীর ১-২।

৩২. **রসায়নবিজ্ঞান :** সূরা আম্বিয়া ৩০; সূরা নাহল ৬৬; সূরা ওয়াকিয়া ৫৮, ৫৯।

৩৩. **পদার্থবিজ্ঞান :** সূরা যুখরুখ ১২ ; সূরা যারিয়াত ৪৯ ; সূরা হিজর ১৯ ; সূরা কামার ৪৯ ; সূরা ফুরকান ২ ; সূরা তালাক ৩ ; সূরা হাক্কাহ ১৩-১৫; সূরা সাবা ৩।

৩৪. **জীববিজ্ঞান :** সূরা নূর ৪৫; সূরা শূরা ১১; সূরা আরাফ ১৮৯; সূরা নাজম ৪৫-৪৬; সূরা নূর ৪৫।

৩৫. **কৃষিবিজ্ঞান :** সূরা যুমার ২১; সূরা ইয়াসিন ৩৪; সূরা মুমিনূন ১৮; ২০; সূরা হজ্জ ৫; সূরা আনআম ৯৯।

৩৬. **গার্হস্থ্যবিজ্ঞান :** সূরা আরাফ ৩১; সূরা দাহর ৫, ১৫, ১৬, ২১; সূরা মুদ্দাচ্ছির ৪, ৫; সূরা মুমিনূন ২০।

৩৭. **যৌনবিজ্ঞান :** সূরা নূর ২৭, ৩০-৩৩, ৮৬; সূরা তারিখ ৬, ৭; সূরা আল-বাকারা ২২৩।

৩৮. **ভূবিজ্ঞান :** সূরা আম্বিয়া ৩০; সূরা শামস ৬; সূরা মূলক ১৫, সূরা সাজদা ৪, সূরা তাওবা ৩৬; সূরা লুকমান ১০, ২৯; সূরা নাহল ১৫।

৩৯. **প্রেমবিজ্ঞান :** সূরা আল-বাকারা ১৯৫, ২৩৫-২৩৭; সূরা আনআম ১৬২; সূরা ইউসুফ ২৩-৩৭; সূরা সাফ্ ৪।

৪০. **ইতিহাস বিজ্ঞান :** সূরা আল-বাকারা ৬৭-৭৩, ১৩৫-১৪১, ২৪৮; সূরা আলে ইমরান ৪; সূরা মায়িদা ১৫, ১৭; সূরা ইউসুফ ৩-৫, ১৯-২১; সূরা কাহ্ফ ৬৫-৮২, ৯৪-৯৮, সূরা মরিয়ম ৭, ৩৪, ৫১, ৫২; সূরা হজ্জ ৪১-৪৪, ৭৮; সূরা আসসাফ্ফাত ১০০-১০৫; সূরা আত তাহরীম ১০-১২।

৪১. **হিসাববিজ্ঞান :** সূরা জ্বিন ২৮; সূরা ত্বীন ৮; সূরা ক্বা-ফ ১৭-১৮; সূরা গাশিয়া ২৬; সূরা যিলযাল ৭-৮; সূরা নিসা ৬; সূরা ইউনুস ৫, সূরা তাওবা ৩৬।

উলুমুল কুরআনে অধ্যায়ের শেষে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষায় বলতে চাই। মহান আল্লাহ্ সুরা আরাফ-এর ৪০ নং আয়াতে বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থ : নিশ্চই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে এমনই অসম্ভব ব্যপার যেমন– সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করানো। আমি এমনিভাবে পাপীদের শাস্তি প্রদান করি।

সূরা আর রাহমান-এর ৩৩ নং আয়াতে তিনি বলেন,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ .

অর্থ : হে জ্বিন ও মানুষের দল! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করে কোথাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হও, তবে পালিয়ে গিয়ে দেখাও। কিন্তু না, পালিয়ে যেতে পারবে না। কেননা সে জন্য খুব বেশি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন।

তাই আসুন আমরা সবাই এই কিতাব অধ্যয়ন করি। কেবল তিলাওয়াত আর খতম দিলেই এর প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কিরামগণ দীর্ঘ সময় ধরে এ কিতাবের এক একটি সূরা অধ্যয়ন করেছেন এবং তার আমল প্রতিষ্ঠা করে অন্য সূরায় হাত বুলিয়েছেন। বিশেষ করে হযরত উমর ফারুক (রা) এ কাজ করতেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে আল-কুরআনে কেবল মুসলমানদের জন্য নয়। এটি বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলেন,

الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

অর্থ : যা (আল-কুরআনে) মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।

'গৌরবহীন বেঁচে থাকার তুলনায় গৌরবময় মৃত্যুও অনেক ভালো।

২৬. সাহিত্য সৌন্দর্য বর্ণিত কুরআনে নবী-রাসূল

এক ঐতিহাসিক সত্যতার মধ্য দিয়ে হেরা পর্বতের গুহায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবতীর্ণের সূচনা হয়। ৬১০ খ্রিস্টাব্দের কোনো একদিনে 'ইকরা' আল-কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত শব্দ। ১০৪ খানা আসমানি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। কিন্তু আরবের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। যার অধিবাসীরা তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধাবোধ করতো না। হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার-অবিচারসহ হাজার বছর ধরে গোত্রীয় যুদ্ধ তাদের অধিবাসীদের করেছিল হিংস্র ও বর্বর। আবার হাজারো বর্বর লোকদের মাঝে আতিথিয়তার গুণ ছিল প্রবল। এ সময়টাকে 'আরবের অন্ধকার যুগ' বলা হয়। ভারতে কিছুটা জ্ঞান-চর্চা থাকলেও আরব ছিল তখন আইয়্যামে জাহিলিয়ার যুগ। মূলত এটা ছিল অজ্ঞতার যুগ। তবে অজ্ঞতার এই মরুপিঠে কিছু শান্ত-জ্ঞানী এবং সাহিত্যমোদি লোক ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলোভীর ভাষ্যমতে, 'সে সময়

আরবে মাত্র হাতে গোনা ১৮ জন মানুষ লেখাপড়া জানতো।' এতে ক্ষুদ্র লোকের মাঝে এ গ্রন্থের সাহিত্য সৌন্দর্য কীভাবে বিস্তার লাভ করলো তা আলোচিত হলো :

২৭. আল-কুরআনে সংকলনের ইতিহাস

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে কুরআনে কণ্ঠস্থ করার অভ্যাস ছিল। এমনকি মহানবী ﷺ নিজের কাতেবদের (সেক্রেটারিদের) সাহায্যে বিভিন্নভাবে লিখে রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামা নামক স্থানে ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শাহাদতবরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর উদ্যোগে, হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পরামর্শে মহানবী ﷺ -এর প্রধান কাতেব (সেক্রেটারি) হযরত যায়েদ বিন সাবিতের ওপর সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর মূল পাণ্ডুলিপি হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উমর (রা)-এর কন্যা ও রাসূল ﷺ-এর পত্নী বিবি হাফসার নিকট রেখে যান।

ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মাঝে কুরআনের উচ্চারণ ভিন্ন হতে থাকে। তাদের মাঝে আঞ্চলিকতার প্রভাব দেখা যায়। এ অবস্থায় হযরত উসমান (রা), হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা), আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা), হযরত সাঈদ বিন আস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন সাআদ (রা) ও হযরত হিশাম (রা)-কে নিয়ে কুরআনের প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরি করার সংস্থা গঠন করা হয়। গঠিত সংস্থা নির্ভুলভাবে যে অনুলিপিগুলো তৈরি করেন তা হযরত উসমান (রা) সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এমন একটি নিখুঁত গ্রন্থ যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২৮. সাহিত্য সৌন্দর্য আল-কুরআনে

সাহিত্য তার নিজস্ব সত্তাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজ নিজ ভাব, ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ-মূর্ছনা, উপমা, ভাষার লালিত্ব, ভাবের গভীরতা, মর্মস্পর্শী সুর-ঝংকারের জয়গান গাইতে চায়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শুরুতে সেই ঝংকারের জয় ডংক্কা প্রতিধ্বনিত হয়। বিশ্বসাহিত্যের রূপকার স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি, হুদাল্লিল মুত্তাকিন।' অর্থাৎ, 'এটা সেই কিতাব এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ।' (সূরা আল-বাকারা)

আল-কুরআনের সাহিত্যরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর 'The Religion of Islam' গ্রন্থের এক স্থানে বলেন, "সত্য বলতে গেলে আল-কুরআনের পূর্বে আরবির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যে কয়েকটি কবিতার অস্তিত্ব ছিল তা মদ, নারী, ঘোড়া কিংবা তলোয়ারের বাইরে কখনো যেতে পারে নি। কুরআনে শরীফ নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আরবি এক শক্তিশালী সাহিত্য হিসেবে গণ্য হয়ে বহুদেশে সমাদৃত হয় এবং বহু জাতীয় সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত খুশি হয়ে ফেরেশতাকুলের সাথে গর্ব করে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে মানুষদের পথ প্রদর্শনের জন্য কালে কালে নবী-রাসূল ও কিতাব নাযিল করেন। কিন্তু হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) থেকে মহানবী ﷺ-এর নবুওয়াত ঘোষণা পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৬০০ শত বছর পৃথিবীর কোনো এলাকায় নবী-রাসুলের আগমন ঘটেনি। মানব কল্যাণের জন্য কোনো কিতাব-সহীফাও নাযিল হয়নি। দীর্ঘ সময় পর যে কুরআনের আগমন ঘটে ছিল সেই কুরআনে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি আমি এই কুরআনে পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম। তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।'

কুরআনের মান স্টাইল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক P.K. Hitti উল্লেখ করেন,

"The style of the Quran is Gods style. It is different in comparable and inimitable. This basically what constitutes the miraculous character of the Quran." অর্থাৎ 'কোরআনের ব্যাখ্যা (বিষয়বস্তু, বর্ণনা, নিয়ম) হলো স্রষ্টার বিষয়। কুরআনে কোনো কিছুর সাথে তুলনা ও অনুকরণ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। কোরআনের গঠন শৈলীতে এক প্রকার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।'

আল-কুরআনের এ অভিনব প্রচলিত সাহিত্যের দৃষ্টিতে গদ্যও নয়, পদ্যও নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে হচ্ছে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে বিশুদ্ধ রচনা। সকালের সূর্য তাপে যেমন কোনো দূর্বা ঘাসের ওপর শিশির থাকতে পারে না ঠিক তেমনি আল-কুরআনের ওপর কোনো সাহিত্যের কল্পনা করা যায় না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যেমন : বাংলা, ইংরেজি ভাষার নতুনত্ব আসছে। ঠিক তেমনিভাবে আরবি ভাষার এমন কিছু রদবদল হলে এর প্রভাব কুরআনের ওপর বর্তাতো। কিন্তু স্রষ্টা তার মহান সৃষ্টির শৈল্পিক মান, অর্থের ব্যাপকতা এতোই রঙে রাঙিয়েছেন যে, সব কালের সব মানুষের সমস্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে একত্রে জমা করেও আল-কুরআনের একটি বাক্য তুল্য শব্দ বা অক্ষর সংযোজন করা সম্ভব নয়। স্বয়ং

আল্লাহ বলেন, 'এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও–এক আল্লাহ ছাড়া যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর যদি তা না পারো অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না। তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩-২৪)

যদি এ কুরআনের মধ্যে মানুষের তৈরি বাক্য যোগ করার সুযোগ থাকতো বা মিশ্রণ হতো তাহলে এর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআনো ওয়ালাও কানা মিন ইনদি গাইরুল্লাহি লা ওয়া জাদুও ফিহিখ তিলাফান কাছিরা।' অর্থ : 'তারা কি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআনেকে চিন্তা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসতো, তবে এর মধ্যে অনেক কিছুই বর্ণনা বৈষম্য পাওয়া যেত।' (সূরা নিসা, আয়াত- ৮২)

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, হালাল, হারাম, বিবাহ-তালাক, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সামরিক নীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি হাজারও বিষয়ের সন্ধান লাভ করি। যার অর্জিত জ্ঞান দ্বারা আমরা ইহকালীন নাজাতের পথ এবং পরকালীন মুক্তির পথ বাছাই করতে পারি। আল-কুরআনে সাহিত্যের সে অনুপম ঝরণাধারা প্রবাহিত। যুগ সংশয়ের যুগ ধরে সব সাহিত্যমোদিরা কুরআনে হতে সাহিত্য সুধা পান করে তাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আল-কুরআনের সাহিত্য মান প্রসঙ্গে মহাকবি গ্যেটে বলেন, "যত বেশি বিরক্তি নিয়েই আমরা এ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থ সব বিরক্তির অবসান ঘটায়। পাঠককে শান্ত ও সন্তুষ্ট করে। আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাঠককে বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এর স্টাইল, এর ভাষা এতো বেশি জোরালো, প্রত্যয়দীপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ যেকোনো যুগে ও কালের যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থ সঠিক অর্থেই শাশ্বত ও জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।'

তাই এই সাহিত্যগ্রন্থের অমিয়সুধায় অমিয় যাদু লুকিয়ে আছে। এ বিদ্যুৎ যাকে একবার স্পর্শ করে তা তাকে সত্যের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছায়। হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের আগে তার বোন ফাতিমা ও ভগ্নীপতি সাঈদকে কুরআনে থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ে নিজেই কুরআনের প্রেমিক হয়েছিলেন। এর সাহিত্যছন্দ এতো বেশি যাদুকর যে, মহানবী ﷺ এবং কুরআনের প্রথম শ্রেণীর বিরোধীরাও গোপনে রাসূলের তিলাওয়াত শুনতে যেতেন। সাহাবীদের মনোমুগ্ধকর তিলাওয়াতে আকাশ থেকে ফেরেশতাকুলসহ জ্বিন জাতিরা ছুটে আসতো। "হে

নবী! বলুন, আমার প্রতি অহী নাজিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনছে। অতঃপর (নিজেদের) এলাকায় গিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকট বলেছে, আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআনে শুনেছি। (সূরা জ্বিন, আয়াত-১)

সার্বজনীন সাহিত্য সৌন্দর্য

পৃথিবীর এমন কোনো ভাষা নেই যা সর্বকালের এবং সর্বযুগের মানুষের জীবনাদর্শ উপস্থাপন করতে সক্ষম। এটা সব ভাষা-ভাষীর, বর্ণ ভেদাভেদ মুক্ত ও সব সমস্যার সমাধানযোগ্য। এর প্রতিটি বিধান সার্বজনীনতা ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত। সব প্রকার মানুষের অধিকার সম্বলিত এ পবিত্র আল-কুরআনে। যেমন হত্যা সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য খুবই সার্বজনীনতা পূর্ণ। আল-কুরআনের ঘোষণা :

'মান ক্বাতালা নাফছান বিগাইরি নাফছিন আউফাসাদি ফিল আরদি ফাকাআন্নামা ক্বাতালান্নাসা জামিয়া। ওয়া মান আহ ইয়াহা ফাকা আন্নামা আহইয়ান্নাসা জামিয়া।'

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো মানবকে হত্যা করলো ও জমিনে সৃষ্টি করল ফ্যাসাদ, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো, আর যে কোনো মানবের জীবন বাঁচালো সে যেন সমগ্র মানবের জীবন বাঁচালো। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত-৩)

নানামুখী ষড়যন্ত্র

ইসলামী আন্দোলনগুলোর নেতৃবৃন্দ সামান্য একটু চিন্তা করলে এক মহাসত্যে পৌছে যাবে যে, সাহিত্য সৌন্দর্য এ কুরআনের দাবি আজ নানামুখী ষড়যন্ত্রের কারণে যথাস্থানে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না। কেউ মনে করছেন, নামাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সব মানুষ ভালো হয়ে যাবে। আবার কেউ কিতালের মাধ্যমে এ দেশের ওয়ার্ড থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত কুরআনের আলো পৌছাতে চান। ইসলামী আন্দোলনসমূহের এ মজবুত ভিত্তির সুযোগে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আল-কুরআনেকে নিয়ে নানামুখী নতুন নতুন ষড়যন্ত্র করছেন। এক শ্রেণীর মুসলমান পাশ কাটিয়ে দূরে গিয়ে বসেন। তারা মনে করেন যারা কুরআনে বুঝে তাদের এবং বিরোধীদের মধ্যে নানা সমস্যা দেখে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। বিরোধী ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের আরো বজ্র কঠোর হতে সাহায্য করেন। তাদের নীরবতার সুযোগকে তারা যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করেন। যার ফলে আমাদের মা-বোনদেরকে ঘর থেকে পর্দাহীনভাবে বের করার ব্যবস্থা তারা অব্যাহত রেখেছে।

ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষাকে বন্ধ করার নেশায় মেতে উঠেছে। তারা আজকে সন্ত্রাসংবাদের নাম ধরে কুরআনে পাগল নারী-শিশু, অন্ধ

দেশপ্রেমিকদের নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছে। তাদের এক মহান পৃষ্ঠপোষক সাবেক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেক্রেটারি ফর কলোনি জর্জ গ্লাড স্টোন এক ভাষণে বলেছেন,"So long as the Muslims have the Quran, We shall be unable to dominate them, or make them lose their love of it." অর্থাৎ 'যতদিন মুসলমানদের হাতে আল-কুরআনে থাকবে আমরা তাদেরকে বশ করতে পারবো না, হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যেন এর প্রতি ভালবাসা হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

এমনিভাবে মহান আল্লাহ্ ফেরাউন, নমরুদ, উতবা, শাইবাদের মতো যুগে যুগে এক শ্রেণীর মানুষকে তার দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিজের জাহান্নাম রচনার সুযোগ দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে যারা এ গ্রন্থকে বুকে ধারণ করেছিল তাদের অনেকেই দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের মনের ইচ্ছা ও আবেগের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছে অহরহ। তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র নূর নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেন। অপর এক ঘোষণায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

'ইন্না নাহ্নু নাজ্জালনাজ যিকরা ওয়া ইন্নাল্লাহু লা-হাফিজুন।'

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি নিজেই আল-কুরআনে অবতীর্ণ করেছি। আর আমি নিজেই এর রক্ষক।' (আল-হিজর, আয়াত-৯)

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত